অমিয়ভূষণ



অমিয়ভূষণ মজুমদার

অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র

১ নিজের কথা গড শ্রীখণ্ড প্রমীলার বিয়ে মধুছন্দার কয়েকদিন
নন্দরানী তাঁতি বউ সান্যালদের কাহিনী ইতিহাস
গাবদ সুনীতি গড অন দি মাউন্ট সিনাই
রচনাপ্রসঙ্গ অংশে সংযোজিত উদ্বাস্তু

২ প্রথম পরিচ্ছেদ নয়নতারা রাজনগর দীপিতার ঘরে রাত্রি
কলঙ্ক দুলারহিনদের উপকথা অঘটনা শহিদ সাগ্নিকা মহাসত্ত্ব

৩ কেন লিখি দুখিয়ার কুঠি নির্বাস সাদা মাকড়সা হনিড লার্ক গল্প
একটি বিপ্লবের মৃত্যু অনঘমিত্রা সুশোভনার কাহিনী রানী ইন্দুমতী
পদ্মিনী ভূকম্পন ভদ্রলোকের বাড়ি পলদহ বাঙাদি



অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র

৪

গ্রন্থনা

অপূর্বজ্যোতি মজুমদার এণাক্ষী মজুমদার

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০০৭৩

AMIYABHUSHAN RACHANASAMAGRA (Vol IV)
Collected Works of Amiyabhushan Majumdar
Published By Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone 2241 2330, 2219 7920 Fax (033) 2219 2041
e-mail deyspublishing@hotmail.com
Rs 300 00

ISBN 81-295-0792-7

দাম ৩০০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩
বর্ণ-সংস্থাপন : দিলীপ দে। লেজার অ্যান্ড গ্রাফিক্স্‌
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

নিবেদন

রচনাসমগ্রের গ্রন্থনায় বিশেষত উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে কালানুক্রমের ধারাবাহিকতা সর্বাংশে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। তৃতীয় খণ্ডে ছোটগল্পের প্রকাশকালের কালানুক্রম অনিয়মিত রয়ে গেছে। বর্তমান খণ্ড থেকে উপন্যাস ছোটগল্প, নাটকের প্রথম প্রকাশের কাল অনুযায়ী রচনাসমূহ বিন্যস্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে। অমিয়ভূষণের প্রবন্ধও এই খণ্ড থেকে কালানুক্রমে বিন্যস্ত হবে।

রচনাসমগ্রের সাধারণ রীতি অনুসারে অমিয়ভূষণের রচনাগুলিকে কালানুসারে বিন্যস্ত করার সব চাইতে বড় বাধা হল, অনেক রচনাই বহু অনুসন্ধানের দ্বারা সংগ্রহ করতে হয়েছে। কয়েকটি এখনও আমাদের হস্তগত হয় নি। ব্যক্তিগত ভাবে নিজের রচনাগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণে লেখক মনোযোগী ছিলেন না। পারিবারিক সংগ্রহ থেকেও অনেক পত্রিকা অত্যুৎসাহী পাঠক-গবেষকের দ্বারা স্থানচ্যুত হয়েছে। এ অবস্থায় সবগুলিকে খুঁজে পাওয়া ও সালওয়ারী বিন্যাসে সাজানো দুরূহ।

অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র

চতুর্থ খণ্ড

সূচি

আমার সম্বন্ধে

আমি জানিনা কি করে মন তৈরী হয়, কিন্তু আমার এই জীবনে আজ পর্যন্ত কিছু extra-ordinary ঘটেনি।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। পৈতৃক নিবাস পাবনা জেলায়, সাবা থানা (চলতি কথায় সব চাইতে অপবাধপ্রবণ থানা), পাকুড়িয়া গ্রাম। হার্ডিঞ্জ ব্রীজ থেকে তিন মাইল দূবে। হার্ডিঞ্জ ব্রীজ যেখানে শেষ সেখানে পাকশি স্টেশন (আসলে নাম তো পাকশে) . যেখানে নেমে পায়ে হেঁটে, গোরুব গাড়িতে কিম্বা পাল্কীতে বাড়িতে যেতে হত। পদ্মার সমান্তবাল উঁচু কাঁচা পথ দিযে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর ছোট রাস্তা ধরে পাল্কী চলল। চষা জমি আর কৃষকদের নিচু নিচু বাড়ি, বোদে তপ্ত আর কাঁটাসর্বস্ব বাবলা গাছ। আরও খানিকটা গিয়ে একদিকে বাঁশ ঝোপেব লাইন চলেছে, অন্যদিকে বাগান। ডান দিকের বাঁশ ঝোপের পিছনে ঘববাড়ি, সেদিকে ছোট ছোট গলি। সঙ্গের লোকটি, বোধহয় তাব গায়ে পশ্চিমী পিরহান ছিল, হাতে লাঠি ছিল। সে মাকে বললে না আমাকে বললে-[কাবণ মার তো জানারই কথা (পাল্কীটাতে মা, আমি আব আমার ছোটভাই ছিলাম, আমাব এখন মনে পড়ে না আমার দুই দিদি তখন কোথায়)]—ওটা দাসপাড়া। পরে জেনেছি ওবা মাহিষ্য দাস, খাজনা দেয় না। দরকাব হলে কাজকর্ম কবে দেয়। পাল্কীটা বাগান ঘুরে বাঁযে চলল, এখানে একটার গায়ের সঙ্গে অন্যটার গায়ে লাগা অনেক খড়েব চালার উঁচু নিচু বাড়ি।

হঠাৎ পাল্কীটা একটা দরজাব সামনে এসে দাঁড়াল। দরজার বাইরে উঁচু কাঠের থামে চৌকোনা একটা বড় চিমনি। এর আগে অন্যত্র রাজপথের ধারে সন্ধ্যাবেলায় মই কাঁধে একজন লোক আলো জ্বালায় দেখেছি। সামনের দরজাটা পনের ফিট উঁচু হবে। গায়ে লোহার চৌকো বসানো। পরে কাছারির দেয়ালে বসানো ঢালে এমন সব লোহাব গুল দেখেছি। একটা পাল্লা খোলা ছিল, অন্য পাল্লাটা খোলার জন্য পাল্কী থেমেছিল। আটজন একই চেহারাব লোক। আমার মনে পড়ছে পাল্কীটার রং বাইরে সবুজ, ভিতরে মেহগনি। দুপাশেব দরজার গায়ে কাচের হ্যান্ডেল। ছাদেব কাছে জানালাব কাঁচ। কি করে আমি নেমে পড়েছিলাম। মাকে আর ভাইকে নিযে একটা তামা রঙের দরজা পেরিয়ে পাল্কীটা কোথায় চলে গেল। আমি দাঁড়িয়েছিলাম যেখানে সেটা একটা কোয়াড্র্যাঙ্গল। আমায় সামনে উঁচু দেয়ালের মধ্যে বসানো জানালাব সাবি, তার মাঝখানে সেই প্রকাণ্ড তামাটে দরজা। আমার বাঁ হাতের দিকে সাদা দেওয়ালের টিনের ছাদের লম্বা একসারি ঘর। আমার ডান হাতের দিকে আর একসারি। তাদের সামনে লাল বাঁধানো টেবাস, টেরাস শেষ হয়েছে ছফুট উঁচু প্রাচীরে। পরে এগুলোর নাম জেনেছিলাম—সাদা দেওয়ালের ওটা কাছারী, লাল দেওয়ালের ওটা গোলাঘর আর উঁচু বাঁধানো লাল টেরাসকে বলা হত হৌস ; কেন হৌস পবে তা জেনেছিলাম। কাছাবীতে বাবাকে দেখলাম। কিন্তু ভয় কিম্বা লজ্জা করলো কাছে যেতে। তখন একটা জানালায় মাকে দেখলাম এবং দৌড়ে সে তামাটে দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। আমার মনে হল সে দরজাটা বার তের ফিটের বেশী উঁচু নয়, কিন্তু একেবারে নিরেট লোহার পাতের।

ভাগ্যে দরজাটা খোলা ছিল তাই পার হতে পারলাম, টেনে সরানো ছ-সাত বছরের কেন বার তের বছরের একজনের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। কিন্তু সেটাও একটা কোযাড্র্যাঙ্গল। তেমনি বাঁধানো

লাল টকটকে উঠোন (কী দিয়ে বাঁধাতো? সিমেন্ট তো ছিল না তখন। আমার ভাই-এর বিয়ের সময় ১৯৪৪-এ গাঁইতি দিয়ে কলাগাছ পুঁতবার গর্ত করতে গিয়ে দিনের বেলাতেও ফুলকি ছিটেছে গাঁইতির মুখে)। এ কোয়াড্র্যাঙ্গলটাব আযতন ছোট, চারিদিকে ঘর। আর একটি লোহার দরজা যেখানে দক্ষিণ আব পশ্চিম বাহু মিশেছে। উত্তব, পূর্ব আর দক্ষিণে লম্বা লম্বা দালান, কিন্তু পশ্চিমে এগারো ফুট দেয়াল।

এই কোযাড্র্যাঙ্গলেব পশ্চিমে আর একটা কোয়াড্র্যাঙ্গল, একটা উঁচু টেরাস আবার লাল রঙের পশ্চিমেব দেয়ালের গায়ে। পাতকুয়োব দিকে উঁচু প্রাচীর। দক্ষিণে উঁচু হবিষ্য ঘব। খিড়কি দরজা খুলে পুকুরটার দিকে কেউ গেল। সেই ফাঁকে দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। পুকুর তার ওপারে বাগান। ঠিক এমন সময়ে তালগাছ থেকে কেউ আমাকে ধমকে দিল হুতুম হুতুম করে। দৌড়ে মাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। আর তখন দেখলাম সেখানে অনেক স্ত্রীলোক। কেমন যেন চেহারা। এখন বুঝি তাবা অধিকাংশই গ্রাম্য বিধবা।

পবে আবও বুঝেছিলাম কোয়াড্র্যাঙ্গলগুলো আছে কিন্তু দেয়ালের আস্তর ছিল না, এখন বুঝি দরজা-জানালায় রং ছিল না। যাকে হৌস বলতো লোকে সেগুলো পঞ্চাশ বাই পঞ্চাশ চৌবাচ্চা। নীলকুঠি ছিল একসময়ে বাড়িতে। একদিন তরোয়াল দেখেছিলাম নানা আকারের, বাঁকা, সোজা, দুফলা, দোধারী। একটা ছিল এত বড যে আমাব মনে হয় মানুষ যত লম্বাই হোক, মাটিতে দাঁড়িযে তা চালাতে পারে না, ঘোড়া চাই। তখন বুঝিনি, নীলকুঠিব মালিকেব কাছ থেকে যিনি এটা কেড়ে নিয়ে নীলেব হাউসের কোন কোনটিব উপর দালান তুলেছিলেন তিনি পরিকল্পনা শেষ করতে পাবার আগেই সরে গেছেন (একটা দালান শুধু ফ্রেঞ্চ উইন্ডো সমেত, লোহাব র‍্যাফটারের উপবে ছাদ তোলা, বোধহয় ইংবেজ কুঠিযালের পবিচয় হিসাবে ছিল) এবং এখন বুঝি আমাব জন্মের সময়েই কোয়াড্র্যাঙ্গলগুলোব দেয়ালেব চাবিদিকে জবা ধরেছে। অনেক শরিকের সেই বাড়ি।

এই পরিবাবে ১৯১৮'ব ২২শে মার্চ আমাব জন্ম হয়েছিল, কিন্তু তা মাতুলালয়ে কোচবিহার শহরে যেখানে আমার দাদামশাই উকিল ছিলেন।

বাড়িতে পৌঁছানোব দুতিন দিন পরে বাবা মার কাছ থেকে আমাকে নিজেব কাছে নিলেন। সকালে কাছারীতে গিয়ে বসতেন বাবা। একদিন সেখানে গিয়ে দেখলাম দুখানা বই। মনে আছে এক সঙ্গে 'ঈশ' আর 'ডু সো টু মি' অর্থাৎ বিদ্যোসাগব আর প্যারীচরণ শুরু হল। প্যারীচরণের চাপে বিদ্যেসাগর পালাই পালাই।

মনে আছে সে সময়ে কাছাবীর একটা ঘবের অবাক করা তবোযালগুলোব মতো আমাদের শোবার ঘরের দেয়াল আলমাবিতে নানা রকমের অবাক—লাগানো সুন্দর গেলাস স্তরে স্তরে সাজানো দেখেছিলাম, সব কাঁচের আর কত রকমেব চেহারা। আর একদিন গোলাবাড়ির ঘর থেকে নানা আকারেব চিমনি, ঝাড় ইত্যাদি বার হতে দেখলাম। রাক্ষুসে করবী ফুলের মতো, বড বড মাদলের মতো সব ডোম। সেদিন কি পুণ্যাহ ছিল! সব চাইতে প্রিয় ছিল 'হিঙ্কস্' লেখা একটা পেল্লায় লণ্ঠন যাতে অনুমান করি কে জি. দুয়েক কেরোসিন ধরতো। কিন্তু আমাদের শোবার ঘরে অত অস্ত্র কেন, তা বুঝতাম না। টাঙ্গি, রামদা, বন্দুক।

সেটা ছিল ১৯২৬। বোধহয় কলকাতার দাঙ্গাব গরমই আমাদের দিকে পৌঁছে ছিল। এখন জানি আমাদের গ্রামটায় কৈবর্ত ও মাহিষ্য দাস ছাড়া একজনও কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ ছিল না আমাদের বাড়ির বাইরে। চারিদিকে সব মুসলমান-প্রধান গ্রাম। সাহপুরে কিছু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও সাহা ছিল। কিন্তু সে তো অন্য গ্রাম। শোবার ঘরে অস্ত্রসম্ভারের কারণ কি তখন অনুমান করেছিলাম?

এই সময় বাবার সঙ্গে মাধপুর গিয়েছিলাম। ভারি কৌতূহলের ছিল এই মাধপুর। কোল বলতো। কোন দেশী ভাষা? বর্ষার পদ্মার সঙ্গে যোগাযোগ। অন্য সময় এই দুই এক মাইল বিস্তৃত উভয়

প্রান্তে শুকনো হ্রদের তীরে তীরে চাষ পড়তো। আর মাছ—এমন কি বর্ষায় আটকে পড়া পদ্মার মাছ; সেখানে আমাকে নজর দিয়েছিল অর্থাৎ আমি বসে আছি, আর আমার সামনে কারা সব টাকা রাখছে। এই মাধপুরের কোল কখনও আমার মন থেকে যাবে না। বাংলাদেশের জলযুদ্ধের যত কাহিনী আছে তা সবই, অন্তত আমার কল্পনায়, এই মাধপুরে ঘটে থাকে। আর ওই পুরোনো বাড়িটাও কোনদিনই মন থেকে বিদায় নিল না। বোধহয় দিনের কিছু সময় আমার মন সেই অস্ত্রসম্ভার, সেই কাচের গ্লাসের সমারোহ এবং ডোম ঝাড় চিমনির বাড়িটাতে নিয়মিত বাস করে। সেজন্যই বোধহয় অন্তত অংশত আমি যোড়শ শতকের বাঙালি, যে অনায়াসে আপ-আগারি করতে পাবে কিন্তু মোটেই meek ও humble নয়। এবং সাহিত্য সে বাজারে আনতে পারে না, নিজেকে entertainer মনে করতে লজ্জায় মরে যায়, পত্রিকার সম্পাদককে আত্মীয়জ্ঞান করে না।

কিন্তু গ্রাম অন্তত আমাদের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছিল। ১৯২৫।২৬ এর অনেকটা সময় আমাদের পাবনায় কাটাতে হল আমার এক ভাইয়ের অসুখের জন্য। সেখানকার একটা কথাই মনে আছে। এক মাইনর স্কুলে আমাকে ভর্তি করতে নিয়ে গিয়েছিলেন বাবা। বাংলা জ্ঞানের অভাবে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হওয়া হল না। ক্লাস টু ইংরেজী পরীক্ষার সময়ে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি করার কথা বলেছিলেন মাস্টার মশাই। সেই স্কুলে শিবপূজা শিখেছিলাম। আর এক বান্ধবী পেয়েছিলাম যে আমার গল্পে নানা পোষাকে দেখা দেয়।

কিন্তু পাবনাতে গিয়ে অসুখে পড়লাম আমি। পরে তা এমন হল যে কলকাতার ট্রপিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি হতে হল। একথা বলার একটাই যুক্তি থাকতে পারে। এখানে ইংরেজদের প্রথম সংস্পর্শ হয়েছিল আমার মনের সঙ্গে। কর্ণেল নেপিয়ার ডাক্তার। আর আমার সেই পাইকপাড়া ওয়ার্ডের দশ নম্বর বিছানার ধারে যিনি টুল নিয়ে বসতেন সেই বিশ বাইশ বছরের লাল চুলের ঝকঝকে দাঁতের গালে টোল খাওয়া এক নার্স। কর্ণেল নেপিয়ারকে, তখনই বুঝতাম, সবাই বাঘের মতো ভয় করতো। কিন্তু সেই নেপিয়ার কেন আমাকে একটু স্নেহ দিয়েছিলেন তা জানিনা। কিছু সফেদ রঙের ছসাত বছরের একটি ছেলে, যে প্রথম দিনেই তার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে চেষ্টা করেছিল এ জন্যে? আর, সেই নার্স-সিস্টার (দিদি, এখন তুমি কোথায়? তুমি আমার শ্রদ্ধা জেনো)। যেদিন spleen puncture-এর যন্ত্রণায় আমি মুমূর্ষু, জোরে কাঁদবারও উপায় নেই, কারণ সেদিনই আমার উল্টো দিকের বিছানায় একজন স্বর্গে চলে যাচ্ছে, সেই নার্স আমাকে চামচ করে খাইয়ে দিয়েছিলেন; নরম ক্র্যাম্বলড্ এগের সঙ্গে নরম পাঁউরুটির শাঁস। তারপরেও তো তিনি চলে যাননি। সকালে ঘুম ভাঙলে দেখেছিলাম তিনি বসে আছেন। বিকেল থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত কারো একটানা ডিউটি থাকে না। যাই হক, এই জন্যই আমার ধারণা হয়ে যায় ইংরেজরা আমাদের মতোই মানুষ, পাঞ্জাও লড়া যায় ভালোবাসাও যায়। রাক্ষসও নয় দেবতাও নয়। ফলত, আমি তাদের সামনে কোন কমপ্লেক্স দ্বারা পীড়িত নই। অনায়াসে তাদের ভাষার গঠনবিধি আমার ভাষাতে আনতে পারি, বীফ, মদ ও পোষাককে বাদ দিয়ে; তাদের কালচারে কতটুকু ফিলিস্টাইনজ্‌ম তা বুঝতে পারি, হঠাৎ কোন ম্যাজিকে সেকাল ফিরে এলে আমি বরং রাজবল্লভ, নন্দকুমার হতে চাইব, আর ম্যাজিক যখন কাল নিয়ে খেলবে ডিরোজিও না হয়ে রামমোহন হতে চাইবো। জোব-চার্ণকবণিতা লীলা যে কালচারের গার্ডিয়ান, সেন্ট ডিরোজিও যার প্রথম অবতার, তাকে অবজ্ঞা করাই আমার স্বভাব, যদিও ডিরোজিওর বংশধরেরা সমাজে প্রবল।

ট্রপিক্যাল থেকে ছাড়া পেয়ে ১৯২৬ এর শেষ দিকে বাড়ি ফিরলাম, তখন একটা ব্যাপার ঘটল। ১৯২৭-এর প্রথমেই আমার মামা যিনি কলকাতায় আইন পড়তেন, আমাদের বাড়িতে এলেন। মায়ের সঙ্গে কী কথা হল তাঁর। তারপর বাবার সঙ্গে। তারপর মামা একদিন বললেন—তোকে আমি কোচবিহার নিয়ে যাবো পড়াতে। এটা আমার ব্যর্থ জীবনের একটা মস্ত বড় পরিবর্তন। বিদায়ের

সময়ে বাবা বলেছিলেন (এখনো তা শুনতে পাই কানে) 'ভালো না হও যদি আমাকে দেখতে পাবে না।' বাবার চোখে জল ছিল।

কিন্তু কোচবিহার কেন? আপাতত মনে হয় জেঙ্কিন্স স্কুলের মতো আধুনিক স্কুল উত্তরবঙ্গে ছিল না এবং ভিক্টোরিয়া কলেজের মতো ভালো কলেজ। ১৯২৭-এ আমি চলে এলাম মামার সঙ্গে, জেঙ্কিন্স স্কুলের ছাত্র হলাম একেবারে ক্লাস ফোর-এ।

এখানে দুটো বিষয় ছিল লুকানো যা পরে আমার চোখে পড়েছিল। তখন কেশব সেন মশায়ের কন্যা মহারাণী সুনীতি জীবিতা। তাঁর সঙ্গে দিদিমায়ের সখ্য ছিল। ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনায় আমরা যোগ দিতাম। মহারাণী সুনীতির লেখা কবিতা গ্রন্থে দিদিমার collaboration ছিল বলে অনুমান করি, কিন্তু প্রমাণ করতে পারি না। কিন্তু তাই বলে রাজ্য সরকার থেকে সুবিধা নিতে দিদিমায়ের যথেষ্ট আপত্তি ছিল। তা তিনি নেননি। মামাবাড়িতে নিয়মিতভাবে ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরা বেড়াতে আসতেন। তাঁদের আচার্য অমুকবাবুর বাড়িতেও আমরা অনেকবার বেড়াতে গেছি। তাঁদের ভ্রাম্যমান আচার্য ভাই অমুক কোচবিহারে এলেই মামাবাড়িতে আসতেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমার মামার বাড়ি কিন্তু ব্রাহ্ম ছিল না। দিদিমা লক্ষ্মী সরস্বতী পূজা করতেন, কিন্তু প্রতিমা ছাড়া। একদিকে তার ফলে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের সঙ্গে পংক্তিভোজন ছিল না, অন্যদিকে আমার মামাবাড়ি হিন্দুই থেকে গিয়েছিলেন।

ব্রাহ্মদের সঙ্গে সম্পর্কটা কী রকমের ছিল তা বোঝাতে মনে পড়ে, দিদিমার কাকা রামতনু লাহিড়ীর জামাতা ছিলেন, মহারাণী সুনীতি মৃত্যুর কিছু আগে দিদিমাকে (দিদিমা এবং তাঁর জীবনের অবলম্বনীয় হিসাবে বা প্রতীক হিসাবে) বিলেত থেকে নির্দেশ দিয়ে একটি একতারা পৌঁছে দিয়েছেন।

১৯২৯-এ বাবা মা এবং আমার ভাইবোনদের নিয়ে কুচবিহারে এলেন চাকরি করতে। তখন মনে হয়েছিল এর চাইতে সুখের আর কী হতে পারে। কিন্তু এখন বুঝতে পারি চল্লিশ পার হয়ে গেলে নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে একটা সামান্য চাকরি নিয়ে বাবা কোচবিহার এসেছিলেন তা অবশ্যই চাকরির জন্য নয়। উদ্বাস্তু হওয়া? কিন্তু তা কেন? কোচবিহারে তিনি সুখী ছিলেন না। আমরা ছাড়া তাঁর আর কেউ বন্ধু ছিল না। দিনের পর দিন সকাল সন্ধ্যা আমাদের লেখা-পড়া নিয়ে ডুবে থাকতেন আর দুপুরে চাকরি করতেন। গম্ভীর মুখে রাস্তার এক পাশ দিয়ে ভিড় বাঁচিয়ে নিজের মতো চলতেন। ১৯৪৩-এ আমার ছোটভাই কলেজের পড়া শেষ করতেই তাঁর ক্লান্তি প্রকাশ পেলো। আর একদিনও নয়। বাড়ির দরজায় পেরেক ঠুকে বাড়ি বন্ধ করে তিনি নিজের গ্রামে ফিরে গিয়েছিলেন। এবং তখন তাঁকে দেখে বুঝতে পেরেছিলাম কী কষ্ট নির্বাসিত মানুষ ষোলো বছর ধরে পেয়েছেন। না, আমার পিতা অসাধারণ কেউ নন, বাংলা সাহিত্যের বা সমাজের ইতিহাসে তাঁকে কেউ উল্লেখ করবে না, কিন্তু আমার পক্ষে দারুণ শক্ত শেকড় যে জন্য আমিই কখনই বিবিক্ত নই। আমরা সকলেই বিরাট পৃথিবীর মানুষ ; একই সঙ্গে ক্ষুদ্রতর এক পৃথিবীর মানুষও বটে; পৃথিবী এক দুর্গরক্ষিত রাজ্য যে দুর্গ প্রত্যেকের গৃহ। সেই দুর্গাশ্রিত পৃথিবীর রাজা হয়ে রইলেন আমার পিতা।

এটা আমার জীবনের ব্যাকগ্রাউণ্ড। শুধু লেখাপড়া শেখার, শুধু ব্রাহ্ম সংস্কৃতিকে নিজের করে নেওয়ার জন্য বাবা-মার এই উদ্বাস্তু জীবন। এসবই অনেক দূরে সরে এসে এখন বুঝতে পারছি। এখানকার ব্রাহ্ম আচরণে গোঁড়ামি ছিল না কিন্তু সংস্কৃতি শুচিতা ছিল। ভালো স্কুল, ভালো কলেজ এবং এই সংস্কৃতির জন্য বাবা-মা কষ্ট এবং কিছু পরিমাণে হীনতাও সহ্য করেছিলেন। আমার বক্তব্য এই নয় যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে সর্বত্রই শুচিতা ছিল সংস্কৃতির। কিন্তু এখানে কেশব সেনের কন্যার দরুন এমন একটা আবহাওয়া ছিল যা সারা বাংলাদেশ থেকে পৃথক, অন্য দিকে জোড়াসাঁকোর সঙ্গে শিল্পগত অ্যাচিভমেন্টে তুলনীয় না হলেও শুচিতায় তুল্যমূল্য। ব্রাহ্মদের সঙ্গে এখন আমার প্রায়

কোনো সংযোগ নেই। বছর তিনেক আগে মাঘোৎসবে তাঁদের মন্দিরে আচার্যরূপে প্রার্থনা করেছিলাম। এই শেষ। কুচবিহারের পথঘাট, ঘরবাড়ি, আমার পরিচিত মানুষজন সব মিলে এক নতুন ধরনের শান্তিনিকেতনই ছিল। ফলত রবীন্দ্রনাথ বুঝতে তেমন কষ্ট হয় না। অন্যদিকে তিনি যা কিছু লিখেছেন সবই সাহিত্য এ রকম বলার প্রবণতা আমাকে চালায় না।

এরপরে সবই সহজ। ১৯২৭-এই বুঝতে পেরেছিলাম পরীক্ষায় ভালো করা কষ্টের ব্যাপারও নয়, অসম্ভবও কিছু নয়। সুতরাং এক ক্লাশ থেকে আরেক ক্লাশ। কিন্তু একটা ব্যাপার বলা দরকার। বাবা লেখাপড়ার ব্যাপারে সেকেলে ছিলেন। দিনের চার ঘণ্টা লেখাপড়ায় সময়ের তিন ঘণ্টা ইংরেজী আর অঙ্ক, আর তা বাবার সঙ্গে। বাকি এক ঘণ্টা বাংলা, ভূগোল, ইতিহাসও, ড্রয়িং। ফলতঃ বাংলায় আব ইতিহাস এবং ড্রয়িং-এ যাচ্ছেতাই নম্বর পেতাম। যদিও ধন্যবাদ, বেণীমাধব এবং ডি. এন. বোস এবং যাদব চক্রবর্তী ছুটকোছাটকা প্রাইজ পাওয়ার শেষ পর্যন্ত সাহায্যই কবতো।

১৯৩১ ইংরেজী বছরটা আমার জীবনে মূল্যবান। ক্লাশ এইট-এ ল্যাম্স্ টেল্স্ ফ্রম শেক্সপীয়র, ববীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড ও কথা ও কাহিনী আমাদের পাঠ্য হল। ল্যামেব সঙ্গে Children's Garland of Verses বলে একটা কবিতা সংকলন। মাস্টারমশাইদের ধন্যবাদ, রোমিও জুলিয়েট, টুয়েলফ্থ নাইট এবং ম্যাকবেথ পড়িয়েছিলেন—তখন যা মনে হয়েছিল এখন তা মনে পড়ে না। বোধহয় স্বপ্ন মনে ঢুকতে শুরু করেছিল। কিন্তু অন্য একটা বিষয় শুরু হল। ম্যালেরিয়া পূজোব পর থেকে মার্চ পর্যন্ত। প্রতি বছব, নিয়মিতভাবে। এমন কি ক্লাশ এইট-এ পরীক্ষা দেওয়া হল না। কেমন যেন হয়ে listless গেলাম এই রোগের অত্যাচারে। অমন যে ল্যাম্ আব গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথেব কবিতা, আর শেলী-কীটসের নাম--সব যেন এক কথায় শেষ—জ্বর আসবেই। একটা শুধু দেখে চলো, প্রাইজ একটা পেতে হবে, আর পবে first division-টা ঠিক বাখতে হবে। তখন যদি আমাকে বুঝিযে দিত কেউ first division-এব চাইতে ভালো না কবলে ভালো চাকরি হয না! তাতেও কী লাভ হতো? এখনও তো খুব কমই লিখি; যদিও লোকে বলে আব একটু হিসেব মতো লিখলে-টিখলে পযসা হতো। বোধহয mediocrity-র এই লক্ষণ যে সে ঘর্মাক্ত কলেবর হতে চায় না। আমিও পডার জন্য কি লেখাব জন্য ঘর্মাক্ত হতে পাবি না। অনেক দূব দূর বেডাতে রাজি আছি কিন্তু গাযে হাওয়া লাগিযে, কোন race-এ নামতে আমি অসমর্থ, তা সে ম্যারাথন, মাইল অথবা র‍্যাটরেস হোক।

১৯৩৫-এর বছরটাকে আমি মূল্যবান মনে কবি। টাইফয়েড হল। আই. এ পরীক্ষা দেওয়া হল না। মৃত্যু কী জানলাম। কুড়িগ্রামে দিদির কাছে তিস্তা নদীর ধারে (তাদের বাসা থেকে জল দেখা যেত, জলের উপরে বাতাসের শব্দ শোনা যেত) স্বাস্থ্য ফেবাতে গেলাম। দারুণ ফিবেছিল। যুবক হযে গেলাম। সেখানে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হল (তিনি এবং তাঁব স্বামী বেহালা বাজাতেন); দুজনেই রোগা রোগা, হলুদ হলুদ, ইংরেজী গান জানতেন, এবং বাঙালি। ভদ্রমহিলা আমাকে দুখানা বই পড়তে দিলেন (১) বাডেনব্রুকস, (২) ব্যাবিট। এজন্য টাইফয়েডটা মূল্যবান।

বই দুটোর নাম বলা হচ্ছে এজন্য যে আমার জীবনে প্রথম উপন্যাস হয়ে এল এ দুইখানা প্রকাণ্ড বই। তখন গুণগত পার্থক্য বুঝতে পারিনি। বিষয়বস্তুর পার্থক্য লক্ষ্য করেছিলাম। দেখলাম একটা একদিনের ঘটনা, অন্যটি যুগের পর যুগ ধরে ঘটেছে। ইতিপূর্বে হরিদাসের গুপ্তকথা জাতীয় বই দূরের কথা (শরৎবাবু যা পড়েছিলেন), বাংলা কোন উপন্যাসই পড়িনি। স্কুলে দশম শ্রেণীর টিফিন পিরিয়ডে খামচে খামচে পডা প্রভাত মুখুয্যের 'সিঁদুরের কৌটা' আব বাড়িতে দিদিমার অনুমতি নিয়ে পড়া 'আনন্দমঠ' ছাড়া, না শবৎচন্দ্র, না বঙ্কিমচন্দ্র, না ববীন্দ্রনাথ—কারো উপন্যাসই নয়। আনন্দমাঠ ও সিঁদুরের কৌটা রোমান্স। এবং এই জন্যই বোধহয় উপন্যাস বলতে boy meets a girl কখনও ভাবতেই পারি না। পিকারেস্ক পরে পড়েছি অনেক, কিন্তু মন শক্ত হয়ে গেলে।

এবং সেজন্যই পিকারেস্ক মনে ঢুকতে পাবে নি, আর তা না ঢুকলে রাজনীতির নামেই হক, কি আধুনিকতার নামেই হক পিকারেস্ক কলমে আসে না।

সময় মতো আই. এ. পরীক্ষা দেওয়া হল না। একবার ফুটবল আর একবার টাইফয়েড একটা বছর কেড়ে নিয়েছিল। সুতরাং কলেজে গেলেও first division যা না পড়েও পাওয়া যায়, তার বেশী চেষ্টা থেকে বিরত থেকে মোপাসা ও চেখফের ইংরেজী অনুবাদ পড়ে সময় কাটতে লাগলো। সেবার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় বড়ুয়ার 'দেবদাস' ছবি থেকে। হাতে লেখা পত্রিকা, কলেজ ম্যাগাজিনে গল্প এমন সব সময় কাটানোর হবিতে মাঝে মাঝে যোগ দিতাম।

আই. এ পরীক্ষা দিয়ে কলকাতায় পড়তে গেলাম। হঠাৎ একটা কিছু করাব ইচ্ছে হয়েছিল, তখন চাকরি আর পরীক্ষায় ফলেব সম্বন্ধ বিষয়ে বোধহয় কিছু ধারণা হয়ে থাকবে। আর তখন দারিদ্র সম্বন্ধে জ্ঞান হতে শুরু হয়েছে। এ কলেজ ও কলেজ খোঁজ খবর নিয়ে স্কটিশ চার্চে ইংরেজী অনার্স ক্লাশে ঢুকে গেলাম। থাকতাম ১৯-এ হ্যারিসন রোডের মেসে। হেঁটে যেতাম স্কটিশে। কী যে হল যেতে না যেতে, এখন মনে হয় সেটা বিশ্রি ইনফ্লুয়েঞ্জা, তখন শুনেছিলাম মেনিনজাইটিস। সুতরাং আবার ঘরের ছেলে ঘরে। আবাব কোচবিহারেব ভিক্টোরিয়া কলেজ, প্রিন্সিপ্যাল প্রথমে আপত্তি করে পরে ইংরেজী অনার্স পড়তে বলে দিলেন।

মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন : ভালোই হল। এই বলে তাঁর প্রিয় থিয়োরীটাও বলে ফেললেন, মাঝামাঝি ভালো, খুব ধনবান হলে সুনীতিকে পরোয়া করা হয় না, ধনহীন হলে সুনীতিকে শিকল মনে হয়। এর মধ্যে একটা পবাজয় লুকানোর ইচ্ছে ছিল? বলা কঠিন, বলা কঠিন। আমি দেখছি আমার এই নিতান্ত সাধারণ, নামযশে অগণনীয়া মা কী পরিমাণে শক্ত হতে পারেন, চোখের জলই কিন্তু পাহাড় গলাতে পারে। শুনেছি চোদ্দ বছরের মেয়ে শোবার ঘবের দরজা বন্ধ করে যে অনাহারব্রত নিয়েছিলেন, তার ফলে শাক্ত-ব্রাহ্মণ পরিবারের পশুবলি উঠে গিয়েছিল।

সে যাই হক, আমার কাছে ব্যাপারটা বোধহয় ততটা সাধাবণ হল না। অব্যক্ত একটা বেদনা, পরে যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে এরকম বাক্য তৈরী করেছিলাম : "সেই রাজনর্তকী দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলেম।" ১৯৩৭-এর কলকাতা আমাব চাইতে বয়সে অনেক বড়, বড্ড বেশি অভিজ্ঞতা, কিন্তু রূপের ঐতিহ্য ছিল এমন নর্তকী ছিল বটে।

এ দুবছর আমার জীবনে একটি কারণে বিশেষ মূল্যবান। আমাব ইংরেজি অধ্যাপকদের মধ্যে দুজন অন্তত স্পষ্টভাষী ও সৎ ছিলেন। তাঁরা জানালেন তাঁরা অনার্স অথবা এম. এ.'র পরীক্ষক বা পেপার সেটার নন, সুতরাং উঁচু অনার্স পেতে সাহায্য করতে পারবেন না। প্রিন্সিপ্যাল যিনি এই দুজনের মধ্যে অন্যতম তিনি এই পবিস্থিতিতে এক কাজ করে বসলেন, যা অসাধারণ এবং যার জন্য সেই অধ্যাপকের কাছে আমি আজন্ম কৃতজ্ঞ থেকে গেলাম। লাইব্রেরী সংলগ্ন একটা ছোট ঘর ছিল। এই ঘরে এক আলমারি স্থাপন করে এবং তাতে বই ভর্তি করে আলমারির চাবিটা আমাকে দিলেন। পাঠ্য পুস্তক এবং আনুষঙ্গিক পাঠ এবং তারও আনুষঙ্গিক পাঠ। মাস দু-এক যেতে না যেতে এক নেশা পেযে বসল। সকাল দশটা থেকে পাঁচটার দু-এক ঘণ্টা বাদে, নন কলেজিয়েট হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে এই ছোট ঘরটায় ভর্তি আলমারি উজার করতে কাটিয়ে দিতে লাগলাম। দু বছর ধরে চলেছিল। ইংরেজী নাট্যকার, কবি আরও কবি। এবং কদাচিৎ ইংবেজী উপন্যাস। এক কথায় সাহিত্যেব সঙ্গে একটা ক্ষীণ সংযোগ স্থাপিত হওয়ার দাখিল।

ইতিমধ্যে কাল অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। আমাদের এই ছোট শহরেও দারুণ রকমের রিসেশন এবং ডিফ্লেশন। পিতা যে ব্যাঙ্কে কাজ করতেন সে ব্যাঙ্ক শুধু তাঁকে অর্ধেক বেতনে রেখে ব্যাঙ্কটাকেই গুটিয়ে তোলার আয়োজন করল। শৈশবের জরাজীর্ণ বাড়িটা মনকে তৈরী করে দিয়ে বিদায় নিয়েছে, (বাড়িটা চিরকালের জন্য অবচেতন মানসে আশ্রয় নিলো কিনা কে জানে) চোখ মেলে দেখলুম

বর্তমানকে, যে বর্তমানে দারিদ্র্য মনকে বিপন্ন করবে, গুটিয়ে আনবে এমন ক্ষমতা নিয়ে দেখা দেবে। তখনও আমার ছোট ভাইদের কলেজে পড়া বাকি। হয় দেশে ফিরে যেতে হয় নতুবা আর একবার যুদ্ধ, এবং এবার সত্যিকারের যুদ্ধ। শেষেরটা স্থির হল। কলেজের পরীক্ষার ফল বেরোনোর এক মাসের মধ্যে চাকরিতে ঢুকে গেলাম।

আসলে লিখতে আরম্ভ করার ইচ্ছা এসেছিল নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে। চাকরি করতে গিয়েও ভুলতে পারলাম না কলেজের সেই আলমারিওয়ালা অ্যালকোভকে। আর চাকরির জায়গা তো আমাদের সেই শহরও নয়। শান্তিনিকেতন একটা আশ্রম, একটা শহরের তুলনা হয না। কিন্তু শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া যেমন অন্য সব জায়গা থেকে পৃথক, তেমন পৃথক ছিল এই শহরের আবহাওয়া, খারাপ কিছু কিছু অবশ্যই ছিল। যে কোন জলাশয়ের তলার পাঁক এবং উপরে শ্যাওলা থাকে, কিন্তু নিজের নিজের জাত অনুসারে মাছেরা জানে জলের কোন স্তরে তাদের সুখাবস্থান। লাইব্রেরী আর শহরের অভাব কিছুটা ভুলিয়ে দিতে পারতো টাকা এবং চাকরির নেশা। নেশাটা কোনদিনই লাগল না। এই শূন্যতাকে আরও পীড়িত করতো সেই রাজনর্তকীর প্রত্যাখ্যান। পড়া আরও পড়া; সাদা কাগজ পেলে টুকিটাকি লিখে ভাষাকে দোমড়ানো মোচড়ানো; তা ইস্পাত না ঢালাই লোহা তা পরখ করা—এই সব দিয়ে সময় কাটাতে শুরু করেছিলাম। কবিতা লিখতাম না, চাকরি পাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে বিয়ে হযে গিয়েছে, কবিতা লেখাব মতো মন হলেই সেই ভদ্রমহিলাকে চিঠি লিখি।

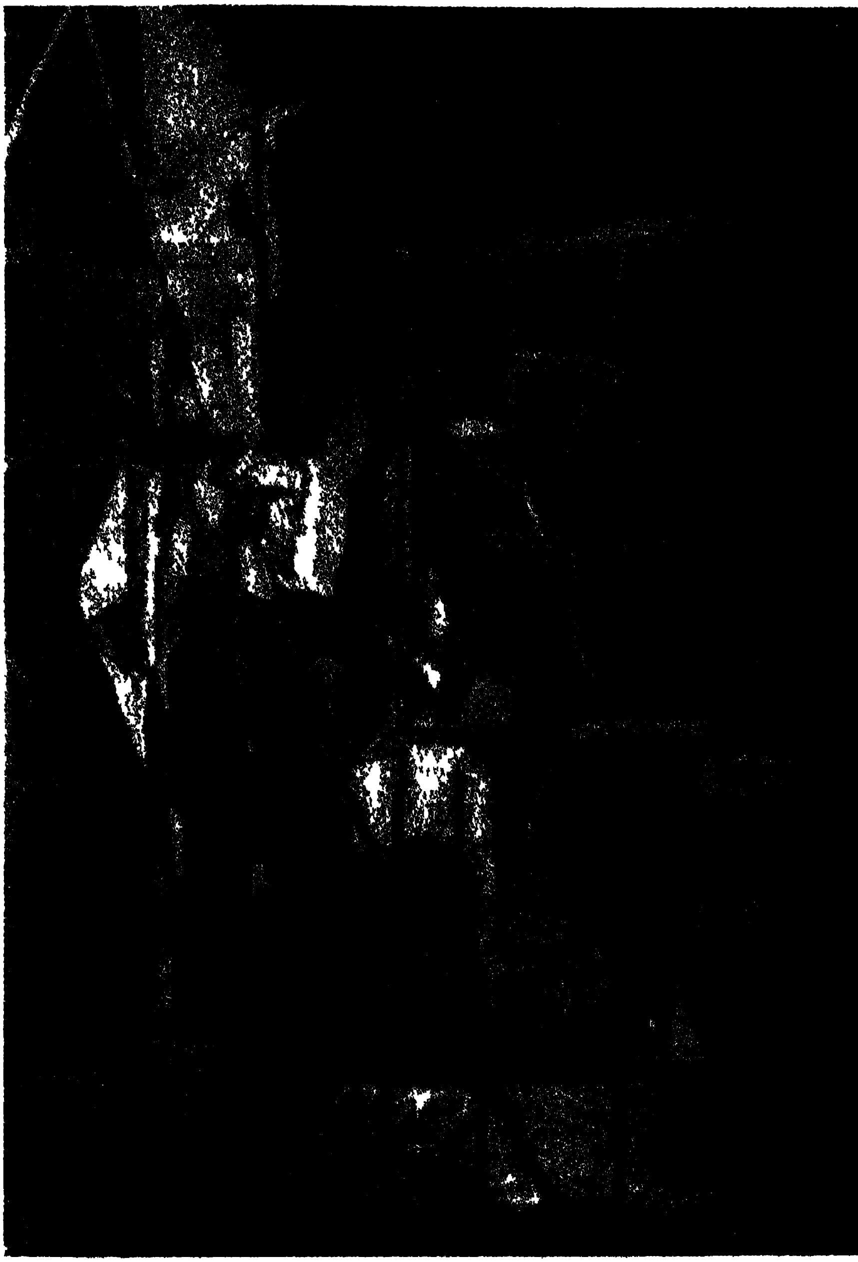
ইতিমধ্যে পিতা সপরিবারে দেশে ফিবে গিয়েছেন। সেই বাড়িই আছে বটে, তেমন কোয়াড্র্যাঙ্গলে ভাগ হয়েই। এবার সেখানে পৌঁছে দেখলুম তা যেন আরও বৃদ্ধা হয়েছে। না, তার উপরে নির্ভর কবা যায না। ছোটবেলায় যা ধবা পড়েনি, তখন তাও ধবা পড়ছে চোখে। ছোটবেলায় গোটা পৃথিবীকেই নিজের মনে হয়, ভাগীদাব চোখে পড়ে না। এখন ভাগীদারও চোখে পড়ল, এমন সন্দেহ হল তাহলে আমাদের কোচবিহাব প্রবাস কি দারিদ্র না হক, অস্বাচ্ছন্দ্যেব ফল? না, হযতো তা নয়। শিক্ষা আর সংস্কৃতির আকর্ষণ, যা বলশালী হয়েছিল এই জন্য যে পিছনের টানটান ধনাঢ্যতার নেশা মেশেনি।

একদিন স্ত্রী বললেন, টুকিটাকি কী লেখ, উনুন ধরাতে গিয়ে দেখি, একটা গল্প লেখো না। খেলার মতো মন নিয়ে ছুটির দিন পেয়ে গল্প লিখলাম। হঠাৎ কি করে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পত্রিকা পূর্বাশাব একটি কপি বাড়িতে এসেছিল। গল্পটা শেষ করে পরেব দিন সকালে গল্পটা সঞ্জয়বাবুর নামে পাঠিয়ে দিলাম। ঠিক পনেরোদিন পরে এক কপি পূর্বাশা এল। দেখি, আশ্চর্য, আমার সেই গল্প প্রায় দশ পনেরো পৃষ্ঠা জুড়ে। এই শুরু কিন্তু শুরুটা ভালো হল। সঞ্জয়বাবুকে লেখা হলেই পাঠাতাম, আর তিনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়েই ছাপাতেন। সঞ্জয় বাবুর সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতেন আতোয়ার। দেখাদেখি তিনি গল্প চেয়ে বসলেন, দিলাম। আতোয়ারও জ্ঞানশূন্য। কেউ যাকে সাহিত্যিক বলে না তার লেখা ছেপে পত্রিকাও ডোবালেন (সঞ্জয়দাও নেই, আতোযারও নেই কাজেই কতদূর ডুবিয়েছেন তা আর এখন প্রমাণ করা যাবে না)। আমাকে ডোবালেন তা আমি জানি। সাহিত্যিক হতে গেলে যা যা দরকার, তা সবের কিছুই শিখলাম না। এই ভুল ধারণা মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা যে, পত্রিকার সম্পাদককে কেয়ার না করে, পত্রিকায় চাকরি না করে, রাজনৈতিক দল তোমার ঢাক কাঁধে তুলে না নিলেও সাহিত্য জাতের কিছু করা যায়।

কিন্তু তখন নেশা ধবে গিয়েছে।

আর এখন লিখতেই ভালো লাগে। লিখি নিজের সুখের তাগিদে সে কী intensive delight কী করে বোঝাবো? কোথায় ছাপা হবে, ছাপা হবে কিনা তা ভাবার যুক্তি কোথায়? দেখো তো, আমি কি লোকের চোখে দাঁড় কবিয়ে প্রমাণ করবো ব্রাহ্মণীকে আমি ভালোবাসি।

আমার সাহিত্য-শিক্ষা সবদিক দিয়েই এক পেশে। শুরু ইংরেজী উপন্যাসে, ইংরেজী নাটক আর কবিতায়; অথচ রুচিতে, নীতিতে উপনিষদ ঘেঁষা; ফলতঃ যা হওয়ার তাই হয়েছে। বাংলায় স্কুলে ও কলেজে পঞ্চাশের বেশী নম্বর কদাচিৎ পেয়েছি, বুড়ো হওয়ার আগে বাংলা বই পড়িনি, (হে মাতঃ বঙ্গ, মা হয়ে যদি নিজগুণে মাপ না করলে, ইত্যাদি) এ অবস্থায়, বিশ্বাস করি, বাঙ্গালী পাঠক চাইবে এমন বই লেখা হয় না। এগুলো কিন্তু রসিকতা নয়। আমি যে উপন্যাস লিখতে চাই তা এখনও লেখা হয়নি। অর্থাৎ আমি যাকে উপন্যাস বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হব না তেমন উপন্যাস লেখার চেষ্টা করে থাকি। হয়তো তা কোনদিনই লেখা হবে না, লেখা হলেও ছাপা হবে না, কিন্তু সেগুলি আমবা জাগ্রত ও নিদ্রার আনন্দ। এই আনন্দ ছাড়া আমার চলে না, এমন নেশা ধরেছে। যখন লিখিনা তখন ছবি আঁকি। আমার ছবি কোন exhibition-এ পাঠাবো কিনা ভাবি না। কিন্তু তুলির টানে ফলকে রঙ ধরলে মনে হয় মস্তিষ্কের সহস্রদল পদ্ম থেকে মধুস্রাব হচ্ছে। আমার যে উপন্যাস ছাপা হবে না তা লিখতেও এমন হয়।



বাগ টৌবি

মধু সাধুখাঁ

মদু সা সাতিশয় হারামজাদা ছিল—সন্দেহ কি?

চিকন ঠাণ্ডা কালো বঙ, টিকলো নাক, টানা চোখ, বলে চক্ষু ; সে চোখের প্রান্তগুলি আবার লাল ; দাঁতগুলি সুগঠিত, কিন্তু কষ ঘণ্টায-ঘণ্টায পানরসে লাল ; চলেও যেন সাক্ষাৎ কালীমায়ের পুঁত। গাযে মোটা তসবেব মেবজাই, অর্থাৎ কুনুই পর্যন্ত হাতা, বোতামের বদলে বগলের নিচে ডোবে বাঁধা ছোট ঝুলেব পাঞ্জাবি, পরনে দু-আঙুল চওড়া পাড, খাটো কিন্তু সূক্ষ্ম ধুতি।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় টিকলো নাকের উপবে চুলেব মতো সূক্ষ্ম করে টানা রসকলি। পায়ে চামডার কট্‌কি। তাব নৌকাব মাঝি-মাল্লারা হিন্দু, কিন্তু বদর এবং বলা? তাব জন্য পাক করে তোপদার, জাতে সে ব্রাহ্মণ, কিন্তু সে বলার সঙ্গে একত্র পানাহার করে, বদরের ছোঁয়া খায। বদর সম্ভবত মুসলমান, আব বলা ফিরিঙ্গি। মদু সা-ই নাম দিযেছে, অর্থাৎ সে কানাই আর ফিরিঙ্গি বেটা বলাই। হারামজাদা সন্দেহ নেই।

মদু সা অন্যূন চাবটে ভাষায কথা বলে। নিজভাষা রাঢী ছাডাও, সংস্কৃত, গৌডের ভাঙা ফাবশি, হার্মাদি-মগাই। ইদানীং পঞ্চমের চর্চা চলছে। মদু সা বলেছে—ও বলা, ই গোট কহা উচিত হয় তোব দেশব নাম অঙ্গ আরু আমাব ভাষাব নাম বাংলিশ। তোব ভাষাব নাম আংলিশ আরু আমাব দেশব নাম বাংলা যদ্যপি হয, এমতে কেনে না হৈব। মদু সা তার ঐ আংলিশ ভাষাব যেদুটি শব্দ প্রথম মনে বাখতে পেবেছিল. তাবা স্কাব এবং লাউস্‌। মদু সা-ব নিজেব বাঁ পুরোবাহুব ভিতর দিকে এক বিঘৎ লম্বা তিন চাব আঙুল চওড়া ক্ষতচিহ্ন আছে। তবোযালেব চোপ। বলা আঙুল দিযে ইঙ্গিত কবে বললে মদু বুঝেছিল তাকেই স্কাব বলছে ফিবিঙ্গি। কিন্তু তাই কি? দৃশ্যটা মনে ফিবে এসেছিল মদুব , শত হলেও নিজেব কাকাব ছেলে। একত্র মানুষ হওযার, ভালোবাসার স্মৃতি ছিল। ঘাড়টাই দো ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। কী বক্ত, আর কী শূন্যতা। তাকে আর জোড়া দেয়া যায না। হাতে এঁকটা দাগ পডেছে বৈ তো নয, কী হতো যদি তুমি শিব না মাবতে? ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে মদুব। হ্যাঁ, বলা, তাকেই স্কাব বলে, হাতের দাগদাগালি নয় শুধু, মনেব এই দীর্ঘশ্বাসও। কিন্তু লাউস্‌? ধুশ্‌ শালা উকুন? হো-হো কবে হেসে উঠেছিল মদু সা। নাম জলে। গা ঘশো গঙ্গার মাটি তুলে। বলাকে জোর কবে গঙ্গায় নামিযেছিল দুই মাল্লা, সেই নবদ্বীপের গঙ্গায়। এখন বলা রোজই স্নান করে। তার সেই স্যাকসেকে ধবল চামড়া এখন খানিকটা তবু তামাটে হযে উঠেছে আর লাউসও নেই।

এটা অবশ্য গঙ্গা নয, ধল্লা নাম।

মদুর শবীর আজ ভাল নেই। রসাধিক্য মতে লাগছে। বিকেলের পশ্চিমা রোদটা গাযে আরাম দিচ্ছে। বজরার পাটাতনে বেঁটে কুরশিতে বসে সে নদীর দিকে চেয়েছিল। একাধিক ভাষা জানাব এই এক দোষ, কথা বলা ছাড়াও ভাষাব অন্য ব্যবহার চোখে পডে—এক রকম খেলাই। মদু ভাবল: এ তো ভারি কৌতুকের—কেউ কেউ যেমন অন্নকে অর্ন লেখে আর বর্ণকে বলে বন্ন তেমন এ নদীকেও কেউ-কেউ ধরলা বলে। আসলে সম্ভব ধবলাশ্বেতা থেকেই এই নাম।

নদীর স্রোত থেকেই তার মনে এল গত এক মাসে তারা ধুবড়িকে বাঁয়ে রেখে রাঙামাটি পর্যন্ত গিয়েছিল। বলা বলে রুনতি। তারপরে আবার ব্রহ্মপুত্র বেয়ে ধুবড়িকে (বলা বলে দুপুরি, হয়ত সে ঠিকই বলে), হ্যাঁ, ধুবড়িকে ডাইনে ফেলে দক্ষিণে এসেছিল তারা। এখন ধল্লা বেয়ে কামতাপুরের দিকে চলেছে তারা। ভাগীরথী, ভৈরব, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্রের পরে এখন ধল্লা। পূর্বস্থলী থেকে কামতা,

দক্ষিণ থেকে উত্তর।

পালে চলেছে তার বার্জা। এটাও আংলিশ। শব্দটা ব্যবহার করেছিল বলা। বোধ হয় কথাটা ছিল—তোমরার বার্জা কখন খুলবে? পড়তে পায়নি। গন্না মাঝি ইতিমধ্যে তাকে বাজরা বানিয়ে ফেলেছে। মদু মিটমিট ক'রে হাসল—বাতাসাকেও বাস্‌তা বলে বেটা। ওদিকে কিন্তু ফিরিঙ্গিটাই মনঃস্থির করতে পারছে না। দু-চার দিন আগেও এ-নৌকাটা সম্বন্ধেই বলছিল পিনাস্ বা সে-রকম কিছু।

নদীস্রোতের এক কৌতুক আছে—সর্বত্রই জল, জলই তো, আর একটানা গতিও, কিন্তু অবিরত বদলাচ্ছেও যেন ; ছোট-ছোট পাক, ছোট দু-চারটে ঢেউ, অন্য কোথাও সাপের পিঠের মতো নিঃশব্দে পিছলে যাওয়া বা। আর সেদিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে মনেও যেন তেমন এক স্রোত চলতে থাকে—এ কথা, সে কথা, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, পাক খেয়ে পিছলে গিয়ে।

মাথার উপরে হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল মদু। সেখানে সময়।

তাই বলে তার ভুল হবে এমত হয় না। স্রোতে কাঠি গাড়া যায় না বটে আজ কিন্তু রবিবার, তিসরা সপ্তাহ, মাস জ্যৈষ্ঠ, তা নদী দেখলেই বুঝবে, পন্দরশো আট শক। সময়ের স্রোতে কাঠি গাড়া যেন। এ নদী সে নদী করে সে উজিয়ে চলেছে বলে সময়ের দিক ভুল হবে কেন?

মদু মিটমিট করে হাসল। সাধুর বেটা সাহা, সাউকার, সাধুখাঁ, জাতে কায়েৎ, সাতপুরুষে বেনে; আঁক চিনতে তার ভুল হওয়ার কথা নয়। এক থেকে লয়, তারপরে শুন্যি, ফক্কিকার। এর উপরেই না যত সংখ্যা। বলা পাশে বসে লিখছিল আর বদর মদুর হাত-পা টিপছিল। তখন লক্ষ্য কবেছিল মদু, বলা তার লেখার মাথায় অঙ্ক বসিয়েছে। মদু বললে—ধুশ্ শালা, ফিরিঙ্গি, ই পন্দরশো আট শক, পন্দরশো ছিয়াশি লিখ কেনে? তখন বলা নিজের বুকের উপরে বার দুই ঢেড়া কেটে যা বলেছিল তা এই যে সেটা পনরোশো আট শক হতে পারে কিন্তু তাদের প্রভুর পনরোশো ছিয়াশি বটে।

বেশ। মিষ্টি লাগছে এই রোদ। আর তেমন ঢেড়া কাটা যেন বলার এক মুদ্রাদোষ। মদুর নৌকার গলুই-এ বেশ বড় করে সিঁদুরে আঁকা স্বস্তিকা-চিহ্ন। নৌকায় উঠতে-নামতে সেদিকে লক্ষ্য রাখে বলা।

মদু মৃদু-মৃদু কাশল। বলল—বদর, ও বদর, ট্যাবাকু আহ্ন।

বদর দিবানিদ্রার মধ্যে ডাক শুনে থাকবে। ঘুমন্ত চোখে সে উঠে এল। এখন তাকে আরো অদ্ভুত লাগছে। বেশ ফরসা গায়ের রং। মাথার মাঝখানে চেরা বাবরিচুল, কপালে খয়েরটিপ, দু-হাতে দু-গাছা সোনার বালা, হাতের নখ-তেলো মেহেদি রাঙানো। পরনে মালশাট করে পরা ধুতি, গায়ে ছাপা গরদের বেঁটে ঝাপলা, ফলে তার নাভি চোখে পড়ছে। বজরার এই বেটাছেলের রাজ্যে যেন স্ত্রীলোকের কমনীয়তা। বদর খোজা ক্রীতদাস। মদুর পণ্য কদাচিৎ পড়ে থাকে, কিন্তু এই একটা যা সে কাউকে গছাতে পারেনি ; চার বছর আগে মথুরায় কিনেছিল।

মদু বললে—ট্যাবাকু আহ্ন। ফিরিঙ্গিটা কী করে? যদি সেই উঠিছা মদ দিবা। বদর চলে গেলে মদু ভাবল : *ঠোট উলটোনো, ভুশকালো সেই খোজাদের থেকে বদরের অনেক তফাৎ।* সফেদার মতো গায়ের রঙ, টানা চোখ, হালকা ফুরফুরে ঠোট। কেবল নাকটা যা বদখৎ উঁচু আর তাতেই নাকি বোঝা যায় ওর রক্তে ইরানি ছোঁয়া রয়েছে। তখন পনেরো ছিল, এখন উনিশ। যৌবন? না, কোথায় যৌবন? কিন্তু কেউ কিনতে চায় না; আর এখন যেন সে নৌকার অংশ হয়ে যাচ্ছে। গন্না মাঝি, বড় পালগুলো, বদর, বড় তোপ দুটি যাত্রার আগের দিন সন্ধ্যায় একই সঙ্গে নৌকায় ওঠে পূর্বস্থলীর ঘাটে। বদর অভ্যাসে এসে যাচ্ছে না কি? যেমন ট্যাবাকু? মাস দু-এক আগে একরাতে সে বদরকে লাথি মেরেছিল। কী অদ্ভুত। বদর গা টিপছিল আর ঠিক তখন মদু অনুভব করেছিল।

কী আর? বিছানায় স্ত্রীলোক এলে যেমত অনুভব হয়। সমস্ত শরীরের চিন্তা আর রক্ত যেন তার দিকে ছুটতে থাকে। তখন টাঁশ-ধরা মনকে ঝাড়ার মতো লাথি ছুড়েছিল মদু। আহা!

নদীর দিকে চাইল মদু। স্রোত, স্রোত উজিয়ে চলেছে বজরা, এখানে-ওখানে চর। কোন চরে হোগলা, কোথাও সামান্য কাশ-কুশ দেখা দিচ্ছে।

অভ্যাসই অনেক কিছু, যেমন এই ট্যাবাকু। গাঁজা, এমনকী শুকনো ভাঙ-ভঙার ধোঁয়া তার অজানা নয়, যদিও তার নিজস্ব নেশা মদ এবং পান। কারণ সে সাধনমার্গের সাধু নয়, সাউকার। কিন্তু তাবাকু, ট্যাবাকু, মন্দ লাগছে না কড়া-ক্রান্তির হিসাবের মধ্যে।

বদর আর বদরের পিছনে বলা এল। বদরের এক হাতে মদের ভাঁড় অন্য হাতে বৃন্দাবনী ঝোলা এক। মদের ভাঁড়টা কাঁচা চামড়ার রঙের, কিন্তু ছোট কলসের মতো গড়ন হলেও কিছু চ্যাপটানো।

ফিরিঙ্গি বলা বলল—হাউ নাউ, বস্, ট্যাবাকু অর ওয়াইন্।

মদু বলল—ড্যামেট্, বোথ। নো উইমেন, ইউ সি।

ফিরিঙ্গি বসল মদুর পাশে। বদর কিছু দূরে বসল। আর কীই বা কাজ আছে তার? কোনো জোরের কাজই তাকে করতে হয় না। শির-দাবাই, গা হাত পা টেপা, কখনও খাবারের থালা এগিয়ে দেয়া। আর চন্দনকাঠ কুচনো। ধারাল ছুরি দিয়ে শ্বেতচন্দনের টুকরো থেকে আঁশের মতো পাৎলা চাঁছ তুলে রাখা।

এখনই তা কাজে লাগবে দেখো। ঠিক যেন ছোট চেহারার সানাই, কিংবা ধুতরা ফুল। পোড়া মাটির, শুধু শেষটা সোজা না থেকে উপরের দিকে বেঁকে উঠেছে। তার মধ্যে ট্যাবাকু পুরবে বদর। আর—এটা মদুর আবিষ্কার, ট্যাবাকু পাতার সঙ্গে মিশে যায় এমন চন্দনকুচি মিশিয়ে দেয়া।

ফিরিঙ্গি অবাক হয়ে গিয়েছিল অবাক করতে এসে। মদু সব শুনে বলেছিল, চরস নাকি? মন্দ নয়। কিন্তু মরা-পোড়া গন্ধ। সাধু সন্ন্যাসীর সয়। ফিরিঙ্গির পাইপে টেনে সে বুঝেছিল চরসের মতো তত চড়া নয়, তিন ভুবন দেখায় না, কিন্তু দুর্গন্ধ। তখন মদু সা মাথা খেলাল, অথবা তার মাথা তো সবসময়েই খেলেছে। মদু সা-র খুড়ো চরস টানতেন কিন্তু চুয়ায় ভিজিয়ে সুগন্ধি ক'রে। আর বিবিসাহেব ভাঙ খায়। ভাঙ আর মালাই। ক্ষীরে জ্বাল দেয়া ভাঙ, গুলআবের গন্ধে ভুর-ভুর। কিম্ অতঃপর। মদু বললে—চন্দনকুচি কিছু মিশাও, বদর।

আর এই যে মদ এগিয়ে দিল বদর, হাতের তেলো আর নখ দেখো মেহেদি রাঙানো।

প্রিয় পাঠিকা, এখানে একটা কথা বলা দরকার। বুঝতে পারছি ঘটনাটা ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের। এবং আমার দৃঢ় প্রত্যয় ফিরিঙ্গি বলাই সেই ইংরেজ পর্যটক রালফ্ ফিচ্ নিজেই। ইতিহাসের চরিত্রই বটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের নিয়ে উপন্যাস লেখা সম্ভবপর হচ্ছে না। যথেষ্ট উপাদান পাই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলা যায়। অসুবিধা এই যে তাদের সম্বন্ধে গল্প লিখলে সত্য গোপন করতে হবে কেননা সত্যই অবিশ্বাস্য। যা হোক, যেমত পারি বলি।

মদু সা এক বেনে। নিবাস পূর্বস্থলী, জাতে কায়েত। পিতার তিনপক্ষের দুই বর্তমান, ছোটমা পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে একা চিতায় সতী হয়েছিলেন। মধু সা পিতার একমাত্র পুত্রসন্তান। ভগ্নী আছে, তারা নবদ্বীপে বিবাহিতা। মদু সার খুড়োও বণিক ছিলেন। ভাদ্রের এক ভরাডুবিতে তিনি তলিয়ে যান সবসমেত। প্রচণ্ড ঝড়ই ছিল সেটা। মদু সা ডাঙাতে থাকা সত্ত্বেও সে-ঝড়ের বিশেষ স্মৃতি আছে তার। ডাঙাই আথালপাতাল, ডিঙা কী করবে অনুমানে বোঝো। (দু-দিন আগে গত গুরুবারে ব্রহ্মপুত্রে মাঝরাতে সে-রকমই এক ঝড় উঠেছিল বটে। তখন পাটাতনে দাঁড়িয়ে মধু নিজেই পালের রশি ধরেছিল। সেই সারারাত ভেজার ফলেই আজ তার শরীরে রসাধিক্য)। খুড়োর তখন কত আর বয়স হবে। খুড়োর একমাত্র বংশধর আর সে নিজে খাওয়া শোয়া খেলায় এক ছিল। (এই সময়ে মদু সা-র হাতের ক্ষত চিহ্নটার কথা মনে হয়। দীর্ঘনিঃশ্বাস আর খুড়তুতো ভাই যেন

একই বিষয়। উঠে পড়বেই একটা অন্তত।) খুড়োর থাকার মধ্যে—খুড়িমা এখন মদুর নিজের পরিবারের অন্তর্গত : মায়ের অধিক সম্মান করে থাকে তাঁকে সে, আর বোধ হয় বিবিসাহেব। (অবাক ব্যাপার এই বিবিসাহেব, হয়তো একটু বেশি ফুটে যাওয়া কিন্তু সফেদগুল)। কিন্তু বোধ হয়-ই বলতে হবে। কে এই বিবিসাহেব হয় খুড়োর? নাচওয়ালি? বাঈ? শখের ক্রীতদাসী? তা বলো। কিন্তু তাঁর রাঁড়ি, অন্তত রাঁড়িও যদি বলো তাহলে তো—আ ছি-ছি।

মদুর নিজের দুই পরিবার। প্রথমার এক ছেলে তিন মেয়ে। পাঠিকা, রাগ করবেন না , মদু বিরক্ত হয়ে দ্বিতীয়াকে ঘরে এনেছে। তিন বছর যায়—একেবারেই বাঁজা নাকি? আরেকটি পুত্র হলে ভালো ছিল। শাস্ত্রে বলে একপুত্রক অপুত্রকের সামিল। জীবনকো কোই ঠিকানা হ্যায়। অবশ্য সে তার সতেরো বছরের ছেলেকে ইতিমধ্যে বিবাহ দিয়েছে।

এই নাও মদু সা-র পৈতৃক। লম্বাই ত্রিশ হাতের আঙুল দু-চার কম, চওড়া ছ হাতের উপরে এক বিঘৎ। উদ্ভট গড়ন, খাড়াইও কম। এদিকে ছয় ওদিকে ছয়—বারো দাঁড় যখন একসঙ্গে পড়ে তখন টালমাটাল করে ; কিন্তু তখন স্রোত ছুঁয়ে উড়ে চলে যেন। এতেই বাণিজ্য করত মদুর পিতাও।

গন্না মাঝিকেও পৈতৃক বলতে পারো। বেটা ঘোষের পো গগন, চলে যেন সাতপুরুষে পাটনি। গায়ের রঙ কোনো কালে ফরসা ছিল, এখন রোদে জলে পুড়ে কিম্ভূত। মাথায় বাবরিতে কিছু সাদা চুল দেখা দিচ্ছে। সামনের দুটো দাঁত দাঁড় তুলে ঠেঙাঠেঙি করতে গিয়েছে। নাকের উপরে বেশ চওড়া তিলক , হরি-হরি বলা মুদ্রাদোষ। পবগুবাতের ঝড়ের কথা ভাবো। ভাত খেয়ে নিজেই হাল হাতে করল, কারণ তখন নৌকা ব্রহ্মপুত্র আড়াআড়ি পার হয়ে তিস্তার মুখে ঢুকতে চেষ্টা পাচ্ছে। দু-দেড় ক্রোশ পরিসর ; তীব্র স্রোতের জল। হঠাৎ যেন কেউ তার অন্তরে-অন্তরে বলল, পশ্চিম-দক্ষিণের আকাশ-কোণে চাও, চাওই না একটুক্। তারাভরা আকাশই তো। কিন্তু সেদিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে গন্না হরি-হরি বলল বার দু-তিন-চার। তারপর পনরো-বিশ মিনিট কী করল নড়ে-চড়ে। দেখা গেল, নৌকার পাটাতনে সে নিজে, মদু, আর জন দু-তিন মাল্লা ছাড়া কেউ নেই। সকলেই নৌকার ছই কোঠার ভিতরে, ছই-এর দরজা বাইরে থেকে শক্ত রশিতে বাঁধা। পাল উঠল নৌকার আর সেই পালে যেন উড়তে শুরু করবে নৌকা। দু-হাতে হাল ধরেছে গন্না। আকাশের দিকে চেয়ে আর-একবার বলল, হরি-হরি। কী দেখল আকাশে? যেন উড়ে-আসা তাড়কাই, তীরে-বাণে হাত-পা কাটা, তাই হাঁ করে আর গড়িয়ে গড়িয়ে ছুটছে।

হঠাৎ যেন গন্না বিষতীরের এক খোঁচায় আর্তনাদ করে উঠল—শাম্‌হালো। শুধু দু-হাতে নয়, যেন সারা শরীর দিয়ে হাল চেপে ধরেছে সে। পায়ের কাছে সেই আড়া কাঠখানায় পা বাঁধানো, বুকে চেপে-ধরা হাল, তবু ঠেলে-ঠেলে তুলছে যেন তাকে নিচের চাপ ; দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে তার শরীর যেন ধনুষ্টঙ্কারে। তারই মধ্যে একবার সাপ্‌টে উঠল—বাঁয়ে, শালা, বেনের পো। ঝড়ের তোড়ে পাল ঘুরে যাচ্ছিল, গাল খেয়ে লাফিয়ে পড়ে রশি ধরেছিল মদু সা। নৌকা তখন তলিয়ে গিয়েছে যেন পাটাতনে এছা স্রোত, শুধু শক্ত পাল তাকে আকাশে ঝুলিয়ে আটকে রাখছে। ঝড় তেড়ে-তেড়ে গজরে-গজরে মুখে ফেনার গাঁজ তুলে-তুলে ছুটে আসে। সারা শরীর ভয়ের ঘামে আর ছিট্-বৃষ্টির জলে শিটে মরছে। বুকে হালের কাঠ বাধিয়ে ধস্তাধস্তি করছে। দু-একবার সাপ্‌টে উঠছে হরি-হরি, যেন হরিও বেনের পো আর গালের ভয়ে গন্নার নামে জল ছেঁচবে।

ঝড় পড়ল। গন্না সোজা হয়ে বসল। হালে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে অন্য হাতে মদুর পা ছুঁয়ে সেই হাত জিভে ঠেকাল, বুকে লাগাল। তখন কাকে কী বলেছে ঠিক কী, শত হলেও মনিব তো, হরি-হরি!

ডিঙা আর ডাঙা এক নয়। ডিঙার মানুষের মন থির থাকে না, অভ্যাস রীতি-নীতি টলে, টাল-মাটাল করে! ঘোষের পো হরিভক্ত গগন মাঝে মাঝেই গন্না হয়। মাস ছোঁয় না, জলে মাছ ছাড়া

উপায় কী? প্রাণীহত্যা কি ভাল রে বাপু? কিন্তু তীরে বেঁধা যায় এমন-কিছু দেখলে সে অবুঝমান। ওড়া পাখিরও ছাড়ান নেই, এক তীরে না-হয়, তিনে তো হবেই, আর তিনে তার দুই বিঁধেই থাকে।

আর পণ্য? পণ্য এখন কিছু বদলেছে এই দশ বছরে, অর্থাৎ তার পিতার মৃত্যুর পর থেকে। দক্ষিণ থেকে সে আনে চুয়াচন্দন, এলাইচি-লবঙ্গ, শান্তিপুরী শাঁখের চুড়ি, উত্তর থেকে নিয়ে যায় কস্তুরী আর পোস্তদানা, যষ্টিমধু, এন্ডি আর ভোটকম্বল, কখনও সন্তরা আর আমলকী। কিন্তু কতটুকুই বা তার এ-নৌকা বইতে পারে। এ তো আর লাদাইকরার গাদা বোট নয়। কখনও-সখনও পিছে-পিছে তেমন-এক দ্বিতীয় না থাকে বটে। কিন্তু তাহলেই কি, মদুর গেঁজে সোনার চাকতিতে ভরে ওঠে?

তাব এই সরু লিকলিকে নৌকায়, তাকে কোষা কিংবা বাজরা বলো—বার্জ, দুই তোপ আছে। পিতলের, আর তিন হাত লম্বা, আর মুখের ফাঁদ চার আঙুল। বাপের কালেই সূত্রপাত। এক অলিখিত অপরিণামদর্শী ব্যবসা। লাভলোকসানের হিসাব করা যায় না, কাল-অকাল নেই, যদি প্রতিভা থাকে বুঝতে পারবে বেনেতি ব্যবসার মধ্যে কোথায় সে-ব্যবসা ঢুকে পড়ে। মদুর পিতা এই রকম জ্যৈষ্ঠমাসেই এরই কাছাকাছি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিল তীর-বেঁধা অবস্থায় দু-রাত আর দু-দিন কাটিয়ে। নৌকাটা এমন কবেই উজানে চলেছিল কামতাপুরের বৈদ্যর কাছে পৌঁছনোর জন্য। এ-বার অবশ্য মদু সা বরং বকুল আতব এনেছে। খুবই দামি। এক ফোঁটা ওড়নায় দিয়ে লও, সারাদিন গন্ধে ভুরভুর। ব্যবসা—তা ভালই বলো আর মন্দ। তোপের সঙ্গে লাগোয়া হলে কী করা যায়?

অবশ্য শরীরটা আজ ম্যাদা লাগছে। তার কারণ রসাধিক্য।

মদু সা বলল—বদর ট্যাবাকু দিহ।

ফিরিঙ্গি ফিচ্ বলল—কেমন, মদো, এই টোব্যাকু?

—ফাইন। নেশা ধরাই দিছ।

বদর পাইপ দুটোই ঠেসে দিল। চকমকি ঠুকে শোলা ধরাল। কানাই-বলাই বাঁশি মুখে ধরলে সেই শোলা ধবল পাইপের মুখে।

প্রিয় পাঠিকা, আর এই ইংরেজ পর্যটককে দেখুন, যেমন মদু দেখে থাকে। মাথায় সাদার আঁশ মেশানো বাদামি চুল। রোদে-জলে লালচে হয়ে-ওঠা সফেদ সাদা রঙ। চোখে কী করে দেখতে পায়? আশ্চর্য! আমার তোমার চোখের যেখানে মণিটা সে-রকম জায়গায় ওর চোখে খানিকটা সবজে-কটা রঙের ছোপ। মদুর পাল্লায় পড়ে ওকে এখন স্নান কবতে হচ্ছে। জামা-জোব্বা ছাড়তে হয়। এখন যেমন ধুশ মটকার পাজামা আর পিরহান পরে আছে।

সেই অগম ভুটান পর্যন্ত যেতে চায়। কী লাভ? বাণিজ্য করবে? আ মরি, সে তো চেকাখাতার আরঙেই পাওয়া যায়। যা চাও, যত নিতে পারো। ভোটকম্বল, কস্তুরী আর চমরীর লেজ, আর সময়কালে সন্তরা। নাকি দেশ দেখা?

সেদিক দিয়ে সাহস আছে বলতে হবে। সাতসমুদ্দুর পেরিয়ে এসেছে দেশ দেখতে। অন্যদিকে জ্ঞানগম্যি দ্যাখো—গোটা পৃথিবী নাকি দু-ভাগে ভাগ করা : একভাগে পর্তুগিজ, আরটি ইস্পেনি হার্মাদদের। এদের, অর্থাৎ আংলিশদের, ভাগে নবডংকা। মদু সা শুনে হো-হো করে হেসে উঠছিল। মাইরি, বলা, আমাদেরকে একদম ভাবল না তোমরার ফাদার পোপা।

কিন্তু আসলে কী ভিতু!

দু-তিন দিন থেকেই কথা হচ্ছিল দুটো তোপ নৌকার একপাশে রেখে দাগলে নৌকা সামলান যায় কিনা। গন্না বলেছিল পাল তুলে আমি সাঁই-সাঁই করে বেরিয়ে যাব আর তোপদার নৌকার ডানপাশে দুই তোপ দাগবে। ধুবড়ির কাছে হাজারমনীর এক খোল পড়ে থাকতে দেখে মদু সা বললে—ইখানেই হোক। কী যোগাড়যন্তর করে নৌকা পিছিয়ে এনে খোলটার পাশ দিয়ে ছুটবার

আগে দেখা গেল বাতাসে জোর নেই। কী হবে আর, মারো দাঁড়। বারো দাঁড়ের ধাক্কায় ভাটার স্রোতে, তা নৌকা ছুটেই চলল ; আর তখন তোপ দাগল, সামনেরটি তোপদার, পিছনেরটি ফিরিঙ্গি ফিচ্। তোপের ধাক্কায় নৌকা বেশ ভালো রকমেই টলে উঠেছিল ; কিন্তু গন্নার সুবিধা ছিল, সে জানত টলবে। বাঁ বগলের নিচে হালের হাতল চেপে সে একবার সাম্‌হালো বলেই সামলে নিল। ফিরিঙ্গি ভাবল . মন্দ নয়, যদি বড় জাহাজের থেকে এমন ব্রড্‌সাইড্ দাগা যায় দশ-বারো কামানের। প্রবন্ধে দোষ না-থাকায় বলি, জন হকিন্‌সের চেষ্টায় খাশ আংলিশ দেশে এরকম সময়েই ব্রড্‌সাইডের পরিকল্পনা গড়ে উঠছে, পরে ইস্পেনি হার্মাদার বিরুদ্ধে যা বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল।

কিন্তু রাল্‌ফ ফিরিঙ্গির ভয়ের কথা হচ্ছে। তোপের ফল কী, তা দেখবাব জন্য তারা ডাঙায় নামল, কারণ হাজারমনীর খোলটা ডাঙাঘেঁষা চরে আটকানো। কিন্তু দু-দশ পা গিয়ে মদু দলসমেত থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ যেন বেজে উঠল, জগঝম্প, রামশিঙা আর ঢাক। সতীকে এনেছে, এনে ফেলেছে, তেলে-সিঁদুরে-কান্নায়-ভয়ে আচ্ছন্ন ধনুষ্টঙ্কারগ্রস্ত রোগীর মতো বছর পঁচিশ-ছাব্বিশেব এক যুবতী। আর আত্মানম্ জুহোমি সো আ হা, হা হা হা আঁ আঁ আঁ। আঁ-আঁ করছে আগুন, আর আগুন আকাশ বাতাস একসঙ্গে ডুকরে-ফুকরে হাহাকার করে উঠল।

দু-হাতের মুঠ বন্ধ করে পায়ের আঙুলে মাটি আঁকড়ে মদু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই সময়ে ফিরিঙ্গি উলটো দৌড়ে পালাল নদীর দিকে।

নদীর জল শান্তিজলের মতো। নিজেদের গায়ে-মাথায় নৌকোর উপরে ছিটিয়ে, শেষে অবেলায় একবকম ডুব দিয়েই নৌকায় উঠল মদু সা-র দল।

গন্না বললে—গব্বোসাব, কী হতে কী হল।

মদু সা বললে—সে রাঁড়ার পো গেল কোথা?

ফিবিঙ্গিকে আবিষ্কার করা গেল নৌকাব ছইকোঠায। ফ্যাকাশে মুখ, মুখের সামনে বহি মেলা. বিড়বিড় করছে।

মদু দেখে বলল—কী হয়?

—ডিডিন্ট্ ইকস্‌পেক্ট।

—সি কী?

—উইচ্।

—উইচ কী?

কি করে বোঝাবে ফিরিঙ্গি যদি এদেশীয় প্রতিশব্দ জানা না-থাকে। অবশেষে ঝাঁটায় চড়ে দরকারে-অদরকারে আকাশে বেড়ায়, গাছগাছড়া আগুনে ফেলে, ফুঁক ফাঁকে, মোমের পুতুলে কাঁটা বিঁধিয়ে পুরুষের প্রাণ পর্যন্ত শুষে নিতে পারে এমন স্ত্রীলোকদেব কথা বলেছিল ফিরিঙ্গি।

তখন আন্দাজ করেছিল মদু—উচাটন, মারণ, ও হরি! ডানের কথা বলছ?

ফিরিঙ্গি বলেছিল তাদের দেশে ডাইনিদের পুড়িয়ে মারা হয়—তুমি কি বিশ্বাস করো, মদো?

—আদৌ না। তাছাড়া সতী আরু ডান পৃথক বিষয়। ভয় পেলে কেনে?

সে-রাতে টোব্যাকু-ট্যাবাকু ধরিয়ে বসে তারা গল্প-আলাপ করেছিল। এই আলাপ করা তাদের অভ্যাসে দাঁড়াচ্ছে। দুজনেই যেন এমন আলাপ ভালবাসে।

ডাইনির কথার *পিঠে-পিঠে* সতীদাহ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত, মদু সা-র কাছে এ রকম শুনে ফিরিঙ্গি গুম হয়ে রইল। সে শুধু একবার বলল, তার এক কাজনকে ডান বলে পুড়িয়ে মারা হয়। কাজন মানে মামার ঘরের বোন, অবশ্য দূরসম্পর্কের, তা বেশ দূরসম্পর্কেরই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইংরেজরা তখন থেকেই *ঠোঁট-টেপা*, দেশের কথা বাইরে বলে না। ফিরিঙ্গি বলল না, ভাবল : জেসুইট *মিশনারিদের বধের মাচায় তুলে চার টুকরো করা হয়, জীবিত থাকতেই নাড়িভুঁড়ি বার করে দেখিয়ে*

দেয়া হয়, ইউনিট্যারিয়ানদের খোঁটায় বেঁধে জীয়ন্ত ঝলসানো হয়, পিউরিট্যানদের দেয়া হয় ফাঁসি। দর্শকরা রানী বেজের জয়ধ্বনি করে। সেসবই ধর্মের জন্য।

ফিরিঙ্গি রাল্‌ফ মুখের থেকে পাইপ সরিয়ে তামাকের রস থু করে জিজ্ঞাসা করল—মদো, আচ্ছা তোমরার দেশেতে ধর্মে-ধর্মে তফাৎ আছে? না, নাই?

—আছে।

—কী করো?

—ধর্মেতে সেঁদিয়ো না, বাপা, ও বড়ি গাড্ডা। আমরা সমাজ থেকে ঝেঁটিয়ে দিই, মোর গে যা বলি।

কোনো-কোনো আলাপের জের মনে থেকে যায়। পরে সতীদাহ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেছিল মদু। তখন দুপুর। নৌকা পালে চলছে। উজানে বলেও বটে, বাতাস কমজোরি বলেও বটে গতিটা ঢিমে। ছই-কোঠায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মদু বলল—কোন কারণেতে তোমরার দেশে ঘোটকের সবিশেষ বৃদ্ধিতা পায়া আছে। তেঁই ঘোটকেতে জমি চাষ হয়। আমারদের হেথা যত তুরুক হয় ভালো, তত ঘোটক নাই। ঘোটকে জমি চষে তেঁই তোমরা পুঙ্গব আহার করো। অর্থাৎ পুঙ্গব চাষের অতিরিক্ত থাকার কারণ এমত বাধা হয়। আমারদের দেশেতে স্ত্রীজাতি অতিতর বৃদ্ধিতা পায়া আছে, কেননা ব্রাহ্মণপণ্ডিত, কলমধবা কায়েৎ, আরু মাটিমাখা চাষা ছাড়া কোন পুরুষই-বা দীর্ঘকাল জীয়ে? জল, তরবার, তীব দুর্মদবতি নারীব মত পুরুষের দেহের ও আয়ুব ভাগীদার হয়।

আব সন্ধ্যায় নৌকার কোঠার মধ্যে মদু সা ভেবেছিল। তখন ফিরিঙ্গি ওপাশে রেড়ির তেলের প্রদীপে বহি পড়ছে। বহি পড়ে থাকে ফিরিঙ্গি। চামড়াব মলাটে বাঁধাই দুই-দুখানা বহি আছে তাব। আর তা নাকি ছাপা। পুঁথি না হাতে লেখা। তা হয় ; হতেই পারে. মোহরের ছাপ তোলো না কাগজে, এও তেমন ছাপ তোলা। বহি দু-এর এক নাকি ধর্মগ্রন্থ। কোনো-কোনো সন্ধ্যায় এ-সময়ে তাবা আলাপ কবে। সেদিন মদু সা ভেবেছিল . মৃত্যুকালে তার পিতামহের বয়স চল্লিশ ছিল। তাব পিতা প্রায় দীর্ঘজীবী হতে গিয়ে সাতচল্লিশে গত হয়েছেন। পিতার এই অতিজীবনের ঝুল সামলাতে খুঁড়োমশায় পঁচিশে মৃত্যুলাভ করেন। তাব নিজের বয়স সাঁইত্রিশ হল। আর (সেই দীর্ঘশ্বাস, সেই দীর্ঘশ্বাসই আবার) খুড়তুতো ভাই জীবা র দুই দশকও দেখে যায়নি। (রসাধিক্য হলে হাতের শুকনো ক্ষত এখনও টনটন কবে। কী উপায় ছিল বলো, দুজনের একজনার জীবন শেষ সেদিন মাপাজোখা ছিল। বিশ বছর এই ক্ষত সে বয়ে বেড়াচ্ছে)।

ভাবনার পিছনে ভাবনা চলে. তারপরে তা ভাসান দেয়। যেমন, কোঠা থেকে বেরিয়ে এল মদু' আলোচ্য বিষয়ের কাছাকাছি ডাইনি-ডান ছিল বলেই যেন মনে পড়ল, আকাশ মেঘলা হলে জলে যেমন সূর্যের বিম্ব ফোটে, কাঁপা-কাঁপা ভাঙা-ভাঙা, কিন্তু চেনা ঠিক যায়, যেন তেমন করে তার ভাবনার জলে বিবিসাহেবের সফেদ রঙ ফুটে উঠল। তার খুড়িমার মুখেই কথাটা শুনেছিল মদু, দু-দুটো কথাই : রাঁড় আর ডান। মেয়েলি ঝগড়ার সুব। কিন্তু কথাটা—বাপের রাঁড় না? মায়ের চেয়ে ভালবাসো? ডান কোথাকার।

এখন বেলা ডুবে আসছে। আর শরীরের রসাধিক্য। গন্না ধার ঘেঁষে নৌকা নিচ্ছে। এদিক-ওদিক তাকাল মদু। ঠিকই পুরনো শিঙ্গিমারির খাড়ির কাছে এসেছে তারা। হঠাৎ নৌকা দিক বদলাতে শুরু করল। হালের দিকে তাকাল মদু। হালটাকে আর-একটু বাঁকাল গন্না। তার দৃষ্টি ওপারের কোনো বিন্দুতে। কিছু একটা মতলব করেছে সে।' কিছু কি দরকার হয়েছে তার? তা ধম্মার এ-অংশটায় বড়-বড় চর। অর্থাৎ গ্রামে যেতে হলে নৌকা রেখে বেশ খানিকটা বালির চর ভাঙতে হয়। কিন্তু পুবনো শিঙ্গিমারির দু-পারেও তো বন।

নৌকা ধল্লার উপরে আড়াআড়ি চলে শিঙ্গিমারির সোঁতায় ঢুকে পড়ল। মজার নদী এই শিঙ্গিমারি। কোথাও ধল্লার সঙ্গে যোগ ; কোথাও মানসাই-এর সঙ্গে, অন্য-কোথাও মজা দ। এঁকে-বেঁকে কামতাপুরের ভিতরে বাইরে-বাইরে বয়ে গিয়েছে। যেন ঘাসের জঙ্গলে প্রকাণ্ড ময়াল। শরীরের খানিকটা চোখে পড়ে কোথাও, কোথাও একেবারে গায়েব। দরকাবে সবটাই দেখবে ফুলবে, ফাঁপবে, ফুঁসবে। জলের মুখ খুলে দেবে, দেখবে ; দেখতে-দেখতে গড়ের প্রাকাবের নিচে-নিচে গহন জল থৈ-থৈ করছে।

তখন সূর্য ডোবার আগের অবস্থা। পুরনো শিঙ্গিমারিতে ঢুকে পড়ল নৌকা বাঁ পাড় ঘেঁযে। ছোট-ছোট গাছেব জঙ্গল। শাল, কদম, ছাতনা। জঙ্গলটা পুরনো নয়,. লতায-পাতায অগমও নয।

এ এক মন্দ বন্দোবস্ত নয়—গন্না কোথায় নৌকা ভিড়াবে লাকড়ি অথবা চালেব জন্য অথবা ঘি তেলের প্রয়োজন হলে—তা যেমন মদুর চিন্তার বিষয়ই নয়, তেমন মদু চেকাখাতায় যাওয়ার জন্য মানসাই-এ উজান না দিয়ে ধল্লায় কেন ঢুকল তাও গন্নার মাথা ঘামানোর ব্যাপাব নয়। উজিয়ে চলেছে তারা, আবার ভাটিয়ে মানসাই ধরে উত্তরে যাওয়া যায়। নৌকার লোকেবা কখন খাবে, কখন বিশ্রাম করবে, কখন কে দাঁড় ধরবে তা সব গন্নাব বিষয়। নৌকা লোকগুলিকে নিয়ে কেন কোনদিকে যাবে তা মদু সা নিজে জানে। কোনদিকে যাবে তা যদি জানা যায বা, কেন তা যাবে, তা জানা অসম্ভব। ভাবাই সার হবে। মদুব পাৎলা ঠোঁট খুবই চাপা।

যেমন এখন, গন্না তীবের দিক লক্ষ্য রাখতে-রাখতে ভাবল, তোমাব ধারণা হতে পাবে মদু সেই জায়গাটায় পৌঁছতে যায় যেখানে দশ সাল আগে তার পিতাকে দাহ করা হযেছিল। কিন্তু খুবই মুশকিল সেই জায়গাটাকে খুঁজে পাওযা। এমন জায়গা যেখানে নদী ফেঁপে উঠে শুধু চরই ডোবায় না, মূল খাতেরও রদবদল কবে। কিংবা দাহও ঠিক নয়, সেই চরে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় সেই দেহ আর অর্ধদগ্ধ দেহের মতো দেখতে কাঠ-কাঠবা ছিটিয়ে-ছড়িয়ে রেখেই চলে যেতে হয়েছিল। মদু কি জানে? হরি-হরি, যা একেবারে শেষ, ছাই আব বাষ্প হযে পঞ্চভূতে মিশে গিয়েছে তাকে কি আর খুঁজে পাওয়া যায়? অবাস্তব না? যদি বা তুমি ধুবড়িতে মালের না জমাট বেখে উজিয়েছিলে চেকাখাতায় যাবে বলে।

তা এ বংশের এমন সব ঝোঁক আছে। সন্ধ্যার পর মাঝে-মাঝে দেখবে অকায় নিয়ে, পরমাথ ঈশ্বর নিয়ে ফেরঙ্গটাব সঙ্গে আলাপ কবছে। এদিকে দেখো আবার, বদরবেটা টিপটাপ দিয়ে ক্রেমশই মেয়েছেলে হয়—এও শখ। একই শখেব দুই মুখ। হাল টানল কোলের দিকে গন্না।

লগি ঠেলে-ঠেলে নৌকা উজাচ্ছে। তীর থেকে বড় জোর বিশ হাত। সূর্য নেই, কিন্তু দৃষ্টি পরিষ্কার চলে। তিন-চারজন মাল্লা দা হাতে তৈবি হয়েছে।

লাকড়িই দরকার গন্নার। ভাবল মদু।

ঠিক এমন সময়ে দৃশ্যটা চোখে পড়ল। আগ নৌকার হাত ত্রিশেক আগে নদীর ধারে যেন ছবিতে আঁকা দুই হরিণ। কিংবা হরিণের ডাক শুনেই দৃশ্যটা তারা দেখতে পেল। মাল্লারা কলবল করে উঠতে চাচ্ছে, গন্না চাপা গলায় শাসাল—চপ্। হাত দিয়ে ইশারায় লগিগুলোকে নদীব মাটিতে গেঁথে নৌকাকে স্থির করে দিল। চোখ সব চকচক করছে। গন্না হাল ছেড়ে উঠল। ছই-এর ভিতর থেকে ধনুকতীর বার করে আনল। তেল মাখিয়ে কালো করা দু-আঙুল পুরু ধনুকের কাঠ ; আঁতের তারে বাঁধা বেতের ছিলা টেনে পরালো গন্না। তীরের ডগায় আঙুল চার-পাঁচ তীক্ষ্ণ লোহার টুপি, গোড়ায় হাঁসের পালক। মদুর দিকে এগিয়ে ধরল ধনুক। সঙ্গে-সঙ্গে ইশারা করল নৌকাকে আর-এক ঠেলা এগোতে। নিঃশব্দ কালো কুমিরের মত কালো নৌকার গলুই তিন-চার হাত এগিয়ে গেল আরো।

ওদিকে হরিণীটাই আবার ডেকে উঠল। কী-এক অব্যক্ত ব্যাকুলতা সে-ডাকে। মানুষের সে-

ডাক বোঝার কথা নয়, তবু তা যেন মানুষ-পুরুষের বুকেও কাঁপতে থাকে। ওদিকে তারা যেন মানুষের গন্ধও পাচ্ছে না বাতাসে ; অথবা পাটাতনে-দাঁড়িয়ে-থাকা এতগুলো মানুষকেও চোখে ধরতে পারছে না। কিংবা তেমন প্রেম-প্রমত্ত অবস্থায় কারোই কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হরিণটা গলা লম্বা করে হরিণীর মুখের কাছে চাটবার চেষ্টা করছে। হরিণীটাই বরং বড় আর উঁচু। হরিণটার মাত্র দু' শিং গজিয়েছে—অস্পষ্টভাবে এ রকমই মনে হল। গন্না মদুর হাতে ধনুক দেয়াব সময় পেল না। টং কবে এক শব্দ হল। ততক্ষণে গন্না দ্বিতীয় তীব চাপে বসিয়ে নিয়েছে, নিশানা করছে। ওদিকে প্রথম তীবের ঘায়ে হরিণটা লাফিযে উঠল মাটি ছেড়ে মাটিতে পড়তে-পড়তে দ্বিতীয়টা বিঁধল মেরুদণ্ড আর পেটের মাঝে। হরিণটা বনেব দিকে ছুটতে গেল, হবিণীটা আরেকবার ডেকে উঠল। মাল্লাদের কয়েকজন জলে ঝাঁপিযে পড়ল জল ছিটিয়ে। তারা দুটো তীরকেই বিঁধতে দেখেছে। গন্না বলল—ধু শালা। অন্য মাল্লারা তখন নৌকাটাকে তীরের দিকে নিল। হরিণীটা ধীর মন্থর গতিতে বনের ভিতব দিকে খানিকটা ঢুকে গেল। আবাব যেন ডাকল সেটা।

প্রায় এক মণ ওজনেব হরিণকে টেনে-হিঁচড়ে আনল মাল্লাবা। মানুষের হাতে-হাতে ধরে রাখা পা এখনও মাঝে-মাঝে আকাশে ছুড়ছে; কিন্তু আব বেশি নয়। গলা দিয়ে অঝোরে রক্ত ঝবছে। বেশি দূর যেতেও পাবেনি।

ফিবিঙ্গি বলল—মাদিটাকে ছাড়লে কেন?

গন্না বলল—ঘাই।

—কাউ তো বটেই।

—কাউ না কথা। ঘাই, ঘাই, ব্যাধেব বুড়ি হবিণী।

একজন বলল—হাঁ, মনে হল চুলে-পাকানো সুতোর ডোব ছিল গলায়।

কথাটা শুনে মদু বুঝিয়ে দিল ফিবিঙ্গিকে। সে বুঝে আবাব অবাক হল। সব দৃশ্যটাই তো অবাক-কবা, তাব মধ্যে ঘাই হবিণী যেন আবো আশ্চর্য। এখন বোঝা যাচ্ছে যে-হরিণ এত চঞ্চল সে কেন পালাল না।

হরিণটাকে নৌকায় তুলল মাল্লারা। তাবা ডাঙাতেই কেটে-কুটে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু গন্না বলল লাকড়ি কাটতে, হবিণ নৌকায় রেখে। ব্যাধ থাকবে না কাছাকাছি?

হরিণটাকে দেখে-দেখে ফিবিঙ্গি বলল অ-ার, সেজন্যই হবিণটা পালায়নি, আর হরিণীটাও অত ধীবে-সুস্থে গা ঢাকা দিল।

মদু হাসল। বলল—ঘাইবা পালাতে দেয না। তা দেবেই যদি, দল ভুলিয়ে আনা কেন? কিন্তু এমত দৃশ্য দেখিছ আরু? এমত প্রেম, এমত খেলা? অহো, এমন দৃশ্য দেখি মানুষে অমর হয়। আহা, অসুনীতে পুনবস্মাসু চক্ষুঃ পুনর্প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্। হে প্রাণনেতা, আবার প্রাণ দিহ, আবার চক্ষু দিহ, আবার দেখিবা দিহ, আনাব।

লাকড়ি নিয়ে মাল্লারা নৌকায উঠতেই নৌকা আবার দাঁড়ে চলতে শুরু করল। ভাটিয়ে চলেছে এবার। পাটাতনে রাখা দেহটা থেকে তখনও রক্ত চুঁইয়ে পাটাতন ভিজছে।

ক্রোশেক এগিযে গন্না নৌকা ভিড়াল ডাঙায। ঠিক ডাঙা নয়, তার কোলঘেঁষা এক চরে। কিছু গাছগাছড়া এখানে-ওখানে। মদুর অনুমতি পেযে বান্না করার জন্য মাল্লারা নেমে পড়ল। একেবারে অন্ধকার হওয়ার আগেই কেটে-কুটে নিতে হয়।

চরের উপবে তখন আগুন বেশ জোরদার। কাছের ঝোপঝাড়গুলোকে অলীক মনে হচ্ছে। জলের উপরে আগুনের গোলাপি আভা। নৌকার ধারে পা ঝুলিয়ে বসেছে ফিরিঙ্গি, তাব বাদামি চুলে যেন আগুন খেলা করছে। শরীরটা ম্যাদা-ম্যাদা বলেই মদু গায়ে নকশি কাঁথা জড়িয়ে নিল।

মদু বলল—তুমি একটু ভেব না, বলা। গন্না বুঝে। এক পিছনের পা তোমারকে দিবে।

গন্না মাস না খায় রাঁধে অমর্ত। এলা তুমি বল কী বহি এত পড়? ধর্মগ্রন্থ না। অন্যখান। পদ্য পয়ারে লিখা না। নাউবেলে বলিছিলে।

এর আগে একদিন ফিরিঙ্গি মদুর কাছে শুনে বলেছিল আশ্চর্য লাগে যে মদুর দেশে পয়ারে ছাড়া কিছু লেখা হয় না। সেদিন মধু ভাবিত হয়েছিল। আজ সে বলল—তা আংলিশ-পো এক দেশেতে যি হয় প্রথা অন্য দেশেতে সি কৌতুক। আবার একই ব্যাপার উভয়েতে ভিন্ন নামে ঘটে। আমার দেশে স্ত্রীলোক পুড়ে সতী, তোমরার দেশেতে ডান।

তার কি দেশপ্রেম ছিল? অথবা মধু সা কিছুতেই হার মানার লোক নয়? ভাবল, ফিরিঙ্গি বলে পয়ার ছাড়া লাচার। তা লাচারও তো ছন্দ। কিন্তু কানা শিবোমণির নব্য ল্যায়ের টিকাটিপ্পনী— সে কি বাপু পয়াব? না কি মনুর জয়মঙ্গলা? তখন তার হঠাৎ কাদম্বরীকে মনে পড়ে গেল। সে হেসে বলল—তা ভেয়ে, এক অপরূপ গল্প আছে, শুনিবা?

রাজা রাজসভায় বসেছে। পত্রলেখা সভায় এসেছে। পত্রলেখার রূপের বর্ণনা দিয়ে মদু গল্প শুরু করল। সন্ধ্যা পার হল, আকাশে তারা ফুটল। বদর মদ বেখে গেল। হুকুম পেয়ে শালপাতার থালায় ঝলসানো মাংস দিয়ে গেল তোপদার। গল্প চলল। এগিয়ে-পিছিয়ে গল্পের ধারাকে ধরছে মদু সা। ওদিকে চরের উপরে পুরোদমে রান্না চলছে। নুন মশলার অভাব কী বেনেব নায়ে? ঝলসানো মাংস থেকে চর্বি গড়িয়ে যাচ্ছে, ভাজা জিরা আর ছ্যাঁচা গোলমরিচের ঘ্রাণ ভাসছে। হাত-পা নাড়ছে মদু সা। মখমলের মতো নরম পালকের মতো হালকা আর ওমদার নকশি কাঁথায় এক টোপ চর্বি পড়ল।

মদু সা জিজ্ঞাসা করল পত্রলেখা কেমন লাগছে ফিরিঙ্গির।

গল্প কি শ্রোতার? ছাই, গল্প যে বলে তারই সুখ। শরীরে রসাধিক্য হলে বলতেও ইচ্ছা করে। গল্পের মধ্যেই মাংসে-ভাতে জড়ানো ঘি-জবজবে পলান্ন এল কাবাবি মাংসের পাশে। তাহলেও গল্প শেষ হয়।

অবশেষে আকণ্ঠ খাওয়া সত্ত্বেও হরিণেব শরীরেব অর্ধেকটাই নিবন্ত আগুনের এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে রেখে নৌকা আবার ভাটিয়ে চলল ধল্লার দিকে। কী হবে আর আধপোড়া ছিটানো-ছড়ানো হাড়মাসে?

নৌকার কোঠায় গরম। তাহলেও কোমর পর্যন্ত কাঁথাখানা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে মদু বলল— কাল তোমার ধর্মের কথা শুনব, বলা।

প্রিয় পাঠিকা, গল্প হলে এখানে একটা পরিচ্ছেদ শেষ করা যেত। কিন্তু নদীর উপরে পরিচ্ছেদ কোথায়? কেউ ঘুমোচ্ছে, কেউ দাঁড় ফেলছে। একবার ক্যাঁচ করে শব্দ হল। হালটা একটু বেশি ঘুরালো কেউ। উপরে আর নিচে সময় আর জলের নদী। থামা কোথায়? কারণ গন্নাই তখন হালে বসে ভাবছে কিছু-একটা থাকতে পারে সেজন্য কামতাপুরের কাছে এসে পড়েছে তারা, হয়ত পিতার দাহের থানটাকে খুঁজে দেখা, কিংবা গোসানিমারীর মন্দিরে মানত। তা মানত করলেই হল, মনেতে করার ব্যাপার। কিংবা ক্রেমে বোঝা যাবে। হয়তো বকুল আতরের অছিলায় রাজদরবারে যেতে চায়। ধুবড়ির কাছে মত বদলাল না? ধুবড়ির ঘাটে মালের নাও এড়ে কালজানি রায়ডাকে না-গিয়ে তোরসা মানসাই ধরে কিছু এগিয়ে এই ধল্লায় এসে পড়া। যেন নদীগুলোকে নতুন চিনতে চায়। সোজা যদি কামতাপুরেই ঢুকবে তো শিঙ্গিমারি থেকে আবার ভাটিয়ে আসা কেন?

তাছাড়া মদু সা-ই কি তখন থামতে পেরেছে? শরীরে জ্বর-জ্বরই বলা যায়। অতিতর মশলাযুক্ত পলান্ন ও প্রচুর কাবাব মাংস খেয়ে মাঝরাতে তার পিপাসা পেল। উঠে জল খেল সে। আর তখন তার ঠাহর হল ওটা স্বপ্নের ব্যাপারই, এতক্ষণ যা তার চোখের সামনে ঘটছিল। নতুবা কোন ডানের মন্ত্রেই কামতাপুরের ত্রিশহাত উঁচু প্রাচীর ঘাই-হরিণীর চিকন পরিপুষ্ট পিছনটা হতে পারে না। কিংবা

কামতাপুর কোনো অবস্থাতেই আপন মনে ধীরে-ধীরে বনের মধ্যে চলে যেতে থাকবে এমন হয় না। অবশ্য ধোঁয়াটে মাটির প্রাচীর গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত লতাকুলের অগম কাঁটাঝোপের মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে।

ঘুম হবে কি হবে না এক দুশ্চিন্তা ছিল না মদু সায়েদের। সে ভাবল বরং, আর হাসল ভাবতে গিয়ে ; এই কামতায় শুক্লধ্বজ, নীলধ্বজ, নীলাম্বর, বরবাক তুবরাক খাঁয়েরা, শেষে হুসেন শা আর এখন নরনারায়ণ। কিন্তু? বরবাক বা তুববাক মারের চোটে করতোয়া বেয়ে পালিয়েছিল, গৌড়ে না-পৌঁছে থামেনি। বারো বছরের চেষ্টায় হুসেন শা কামতাজয়ী, কিন্তু নিজ বেটা দানিয়েলকে দিল বেঘোরে। তারপর এখন নরনারায়ণ। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখো আর একে যৌবন পায়। এক না-বলে দুজনা বলা ভাল। মদু, তুমি ধুবড়ির কাছে সেনাপতির ছেলে রঘুকে দেখেছ, আর এখানে ঠাহর করো—রাজার ছেলে লক্ষ্মীকে দেখবে। দুই-ই যুবক। মনে হয় না তারাও ঘাই-এর ডাক শুনেছে? ওদিকে দক্ষিণে ঘোড়াঘাটের আশেপাশে শাবাজ খাঁ মুগোল।

মদুর যখন ঘুম ভাঙল তখন বদব ছইকোঠার দরজায় ঠকাঠক কড়া নাড়ছে। তখন বেলা উঠেছে কি না-উঠেছে। মদু একেবারে অবাক হয়ে গেল। দিনের প্রথম আলোয়—আলো তখন শেয়ালি রঙের—নদীর জলে লাল-কালোর ছোপছাপ। মদু দেখল গরমে যেন মাছেরা ভাসান দিয়েছে। ধল্লা জুড়ে নৌকা আর নৌকা। যেন ঝাঁকবাঁধা। আসল ঝাঁক সামনে। তার নিজের এপাশে-ওপাশে-পিছনে ঝাঁক-ছাড়া দু-পাঁচখানা নৌকাও আছে। আব তার নিজেব নৌকা এগোচ্ছে না, পিছিয়ে যাচ্ছে না। হালে গন্না নিজে , দাঁড়িরা ভাটাব স্রোতেব বিরুদ্ধে দু-চার বৈঠা মেরে নৌকাকে একই জায়গায় রাখতে চেষ্টা পাচ্ছে।

বুকের ভিতরে ধক্ করে উঠল, আব তারপবও ধুকপুক করছে। গলা শুকিয়ে উঠল যেন। এ যেন সেই দৃশ্যই। শুধু সেদিন জল যেন গলা সোনার মতো ফুটছিল আর তার উপরে এখানে-ওখানে যেন কুমিব ভাসছিল। ভাসান-দেয়া কুমিরের মতো নৌকার সার। কিন্তু এখন ভাবতে হবে।

গন্না হাসল।

কাবণ এখন তাকে হাসতে হবে। হয়তো এ অবস্থায় কেউ কোনোদিন অন্য-কোনো মাঝিকে দেখার সুযোগ পায় না, কিন্তু সব মাঝিরই ধারণা এ অবস্থায় মাঝিকে হাসতে হবে, যেমন মদুকে হবে ভাবতে।

পালানোর চেষ্টা বৃথা : উজিয়েও তা, ভাটাতেও তা। হাত দিয়ে সে ইশারা করল নৌকাকে ঝাঁকের দিকে নিতে। কোঠায় ঢুকল সে। তোপদারকে ডেকে বলল নতুন দশসেরি খুঁজিতে নিমক ভরতে। বিড়বিড় কবল : শালা, আজ মুখ-হাত ধোয়াও হল না। কোঠার তাক থেকে বকুল আতরের ভাঁড়া নিল। চন্দনের তৈরি এক বাক্স। তাড়াতাড়িতে জামাকাপড় পালটালো। মুখে-চোখে জল দিয়ে সিঁথি পাট করল। দামি এক ওড়না বাঁ কাঁধের উপরে ঝুলিয়ে ডান বগলের নিচে কোমরের কাছে ফাঁসে বাঁধল। বাঁ কোমরে বেঁটে এক তবোয়াল। তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে বদরকে ডাকল, সেজে আসতে বলল, ছোট এক ধামায় নিজেই মাল সাজাল।

ভাটার স্রোতে আর দাঁড়ের ঘায়ে নৌকা তখন ঝাঁকের দিকে শনশন করে এগোচ্ছে। কিংবা এও কি ঠিক ধুবড়ির মতো হতে চলেছে? সেখানে নৌকার ঝাঁকে না পড়ে ডাঙাতে পড়েছিল সে রঘুর রিসালদারের সামনেতে।

কাছে গিয়ে মদু দেখে শুধু কোষা নয়, ছোট ডিঙি আছে, বড় মাড় নৌকা আছে—দুখানা নৌকা পাশাপাশি উপরে বাঁশের মাচায় বাঁধা। তার উপরে গায়ে-গায়ে লাগা ঘোড়া। পাঁচশোমনী লম্বা নৌকা, দাড়িওলা উঁচু-উঁচু পাঠান তাতে। মাঝে-মাঝে তোপদার কোষা, টেঁটা ভাল্লা হাতে মাল্লার সারি তার উপরে।

গন্নার নৌকা থামল এক চরের কিনারায়, ঝাঁকের শেষ নৌকার গায়ে প্রায় ; আর এ-নৌকা থেকে ও-নৌকা করে নৌকা বদলে মদু সা ক্রমেই ঝাঁকের মধ্যে ঢুকে যেতে লাগল। সঙ্গে বদর। বদরের মাথায় বেতের ধামা : ধামায় সাউকাবি পণ্য।

সূর্য তখন ডুবুডুবু, মদু ফিরে এল একা এক নৌকায়। এসে বলল, নৌকা খুলে ভাটিয়ে চল। মানসাই-এর মোহনায়। ধল্লা আর মানসাই যেখানে মেশামেশি।

গন্না যেন প্রস্তুত ছিল ; চাড দিল হালে, ছপছপ দাঁড় পড়ল, প্রথমে দু-তিন, তাবপবে বারোটিই।

যে-নৌকায় মদু এসেছিল সে-ই যেন খবর দিয়ে আগে চলেছে : ঝাঁকের নৌকা পাশ দিচ্ছে, ফাঁক দিচ্ছে।

নৌকাব উপরে মদু ভাবল। সারাদিন স্নানাহার হয়নি। জ্বরভাবটা বেড়েছে বই কমেনি। বদরকে রেখে আসতে হল। যাকে দেখেছে সে বোধ হয় রাজকুমার। আর টেপু, বেঁটেখাট্টো ভুরু-পাকা মানুষটা পাঠানতুরুকদের সঙ্গে হামলে কথা বলছে। একটা কথা পরিষ্কার। বুড়ো রাজার জ্বরাতিসার। ব্যাধিটা প্রবল। নগরময় কী হয় কী হয় ভাব।

বদর তো নেই : তোপদার নিজেই শরবৎ আনল।

মাল্লারা অকম্মা থাকেনি। জাল ফেলে-ফেলে মাছ ধরেছে। মদুর অপেক্ষায় দেরি করেছিল খাওয়া-দাওয়া মিটাতে। ভাত গরম ছিল। মৌরলার ঝোলটা গরম করে আনল তোপদার। মদু বসলে বলল—ভাত না-রোচে, মাছগুলো আপনে খাও, টাটকা আব কী বড় দ্যাখো। ফিরিঙ্গি দু-হাতে না-হোক এক কুড়ি খেয়েছে। গায়ে জোর দেবে।

বেলা ডোবার আগেই আহার শেষ করে মদু শুয়ে পড়ল। ফিরিঙ্গিকে ডেকে বলল—আমি শুয়ে নিই, বলা। তুমি কিন্তুক কামতার প্রাচীর দেখে নিয়ো। চোখ সার্থক। আর হলও ভালো। বাতাস ভাল পাই কাল প্রথম রাতেই চিলাপোতের খাল ঘুরে কালজানি পড়ে তোমার চেকাখাতা।

শুলেই ঘুম আসে না।

ফিরিঙ্গিও কথা বলল।—বদর কোথা? তোমার পত্রলিখা কী হয?

মদুর মুখটা একটু গম্ভীর হল। তারপর সে একটু হাসল। বলল—বেটা বোধে মাসুম খাঁ কাবুলির সাক্ষাৎ পুতি। কহে জিম্মা রাখো। দশ কুড়িতে কিনিছিলোঁ—জিম্মা রাখো আর ভেট লহ। ঝাঁপ খুলো, বলা, প্রাচীর দেখি লও। ত্রিশ হাত উঁচু প্রাচীর। কী এমত গেল বল?

প্রথম রাতেই জলের ডাক শুনে বোঝা গেল মানসাই-ধল্লার মোহনায় এসেছে নৌকা। ছইকোঠার বাইরে এল মদু। চার-পাঁচ ঘণ্টা দাপিয়ে দাঁড় ফেলে মাল্লারা এখন হাঁপাচ্ছে। তাদের একটু বিশ্রাম দরকার। তাছাড়া দুই পাগলা নদীর মোহনায় এক নদীতে ভাটিয়ে অন্যে যদি উজান ধরতে হয় চোখেও স্পষ্টাস্পষ্টি দেখা দরকার। এতক্ষণ তবু অন্য দু-একখানা নৌকা ছিল, আলোর ইশারা ছিল। এই অন্ধকারে জল চিনতে কী আর অসুবিধা! ডাঙা আর জল পৃথক রকম। কিন্তু জলের গভীরতা বোঝা যায় না।

মদুকে বলে কিনারে নৌকা নিয়ে এল গন্না। চাঁদ উঠবে মাঝরাতে। যদি মহাজন বলে তখন আবার নৌকা খোলা যাবে। এখন বরং রান্না করুক মাল্লারা।

মদু বলল—তুমিও ঘুমিয়ে নিয়ো, গন্না। গতরাতেতে আর আজ সারাদিনেতে ও তোমার হয় নাই।

পানের কটোরা নিয়ে পান সাজতে বসল মদু। ঠিক এ সময়েই আর-একবার মনে হল তার বদর নেই। কেমন গুছিয়ে দিত বদর। তাই নয়?

মদুর সাড়া পেয়ে ফিরিঙ্গি এল ট্যাবাকুর সানাই হাতে।

মদু বলল—পড়ছিলে? তার চেয়ে বোসো। আরু কাল তোমার চেকাখাতা। আসো, গল্প করি।

ফিরিঙ্গি বলল—শহর কেমন দেখলে, মদো? এত কাছে এসেও আমার দেখা হল না।

মদু বলল—ভাগ্যে না-থাকলে হয়? গোসানিমারী দেবীর কৃপা লাগে।

মদু একটু ভাবল। বলল—এক গল্প করি, শোনো।

সানাই-এর মুখে ট্যাবাকু পুরতে-পুরতে চকমকি ঠুকে শোলা ধরাতে-ধরাতে মদু গল্প বলল।

এই বংশের আগেব বংশেব শেষ বাজা ছিল নীলাম্বর এই কামতায়। নীলাম্বরের এক রানী বনমালা। মন্ত্রীর যুবক পুত্র মনোহব তাকে কৃষ্ণকীর্তন পড়ে গেয়ে শোনায়। মন্ত্রী শশী পাত্রের পুত্র মনোহর। হাতে-নাতে ধরা পড়ল একদিন মনোহর। রানী হলেও ও গোপন কবা যায় না—যাকে বলে ব্যভিচার। ক্রমে সাহস বাড়ে আব তাতে অনর্থ। বিচারে মনোহরের প্রাণদণ্ড। আর প্রাণদণ্ডেব অপরাধীর বলি এর আগেও হয়েছে চণ্ডী-চামুণ্ডার সামনে। রোজ পূজা কামতায়। তিথিতে-তিথিতে নববলি। একরাতের পূজায় মনোহরকে বলি দেয়া হল, ছান করিযে এনে ভিজে কাপড়ে হাঁড়িকাঠে ফেলে। কেউ বলে পৈতাসমেতই ছিল। তা না-হলেও শশী পাত্র ব্রাহ্মণ, তার পুতও গোঁসাই হবে। সেই থেকে গোসানিমাবী নাম।

তোপদার যেতে-যেতে গল্পের গন্ধে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তার দিকে চেয়ে মদু বলল—কও, ভরদ্বাজ বামোন, পাঁটা কেটে প্রসাদ হয়। এব আগেতে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী নিশ্চয় সে-প্রসাদ খায় আছে। তাই না?

তোপদার বিস্ময়ে হাঁ কবে বলল—অ্যাঁ!

হাঁ, তাই। সে-বলির প্রসাদ বান্না কবে রাজার হুকুমে শশী পাত্রকে খাওয়ান হযেছিল। নিজপুতের মাস।

ফিরিঙ্গি শিউরে উঠল।—তারপর?

শশী পাত্র গৌড়ের বাদশাকে পথ দেখিয়ে এনেছিল, কামতার গড়ে ঢোকাব সুবঙ্গপথ দেখিয়ে দিযেছিল।

ফিবিঙ্গি বলল—অন্যায় কী? এমন বাজ্যের ধ্বংস হয় ভাল।

মদু হাসল, বলল—উচিত যা, সি হয় না। এদিক থেকে বরং চোট খেয়ে বহমৎ খাঁ কবতোয়ার জলপথে পালিয়েছিল।

গল্প শেষ করে ট্যাবাকু টানতে লাগল মদু।

তোপদার বলল—এজন্যই আগমবাগীশেব . ্তে প্রথমে শিবাব ভোগ। ওসব বলির প্রসাদে শিবার ভাগ।

গল্পেব উদ্দেশ্য কি অন্য-কিছুর পিছনে বাখা আসলকে?

শুতে গিয়ে যেমন গন্নাব মনে প্রশ্নটা উঠল—মতটা আবার বদলাল দেখো। রাঙামাটিতে কথা ছিল না চেকাখাতায় যাওয়া সোজা মানসাই বেয়ে। ধুবড়িতে নাও রেখে মত বদলাল, এল ধল্লা। এখন আবার চলেছে মানসাই-এর মোহনার দিক।

কাশের ঝোপের আড়ালে গর্ত খুঁড়ে পাক চাপিয়েছে মাল্লারা। হ্যাঁ, খেয়ে একটু ঘুমিয়েও নিক ওরা। ভাবল মদু।

আর মুশকিল। এমন অন্ধকার কিছু ঠাহর হয় না। দক্ষিণের আকাশেও দেখো, তারা চোখে পড়ছে? জ্যৈষ্ঠ শেষ, আষাঢ় আগু। কিছু নজরে পড়ে না, নজিরও নেই। কী বললে ভাল হয় তা যেমন বোঝা যায় না, যা বলা হবে তার কতটুকু-বা বলা উচিত তা আগে থেকে জানার পথ নেই। যেমন ধরো, ধুবড়ির কাছে তুমি তোপদার কোষা দেখেছ? দ্বিধায় পড়তে হয় না? দেখেছ কি? দেখলে কত? কার কোষা তা বলে দিতে হয়নি, যখন তুমি বললে, তা একশো হবে। টেপুও জিজ্ঞাসা করেনি তোমাকে। আর এদিকে এখানে ধল্লা-মানসাই যেখানে ব্রহ্মপুত্রের কাছাকাছি সেখানে বার না-দিয়ে উজিয়ে এসে ধল্লায় ঢুকে আছে যে-বহর তার সংখ্যা দেড়শো হবে কম করে। এখানে

কার কোষা থাকে? তা যদি রঘুর সেই রিসালদার উপরন্তু বাড়তি জিজ্ঞাসা করেও বলতে পারো জানি না। তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই : রঘু ঠিক আন্দাজ করে নেবে। এদিকে মজা দ্যাখো, রঘুর রিসালদার ভেবেছিল সে-ই আগে খবর পাবে : টেপুই পেয়ে গেল আগে। তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কে-ই বা তোমার রঘু, আর লক্ষ্মী বা তোমার কে? কিছু বোঝা যায় না কে কোনদিকে যাবে। মদু হাসল যেন অন্ধকারে। আর দক্ষিণের করতোয়া, ঘাঘট, মানস থেকে সরে এসে নৌকারা ঝাঁক বেঁধেছে কামতাপুরের কাছে। এসব খবর আরো দক্ষিণে শাবাজ খাঁর কাজেও লাগতে পারে।

খুব সহজ নয় ব্যাপার। ধুবড়ির কাছে কোষা শুনে টেপু রাগে যেন তোৎলা। রাজকুমার বলেছিল—যা রটে সি বটে দেখহ। টেপুর বয়স হয়েছে, কিন্তু তার দুই পাশে দুই ছেলে—ছেলে আব ভাইপো। হাতে লগির মত ভাল্লা, কোমরে বেঁটে তরোয়াল। নৌকার উপরে খেলানোর জায়গা থাকে না। ওই বেঁটে চওড়া তরোয়াল তখন কাজে লাগে। এ-নৌকা থেকে ওটায় লাফিয়ে পড়তে হাতে বেঁটে তরোয়ালই সুবিধা, কিংবা ও-নৌকা থেকে যে তোমার উপরে লাফিয়ে পড়েছে তাকে দু-টুকরো করে জলে ফেলো।

আর তখন হিসহিস ভাল্লা ছোটে, টেঁটা লকলক করে ছোবলায়, জলের উপর টালমাটাল করে নৌকা। যে পড়ে সে-ও আঁ-আঁ করে, যে পাড়ে সে-ও। নদী, জল, রক্ত, পাটাতন! নাড়ি বেরিয়ে আসে টেঁটার টানে, ভল্লা গলায়-বুকে, মানুষ ছিটকে পড়ে জলে। মধ্যে-মধ্যে শনাশন চলে তীর, পাখ্-বাঁধা, লোহার টুপিপরা, শ' গজী তীর, চার-ছ আঙুল বেঁধে। রাগ আর ভয়, ব্যথা আর যন্ত্রণা সমান আঁ-আঁ করে। না, পুরুষ সেখানে জীয়ে না।

ট্যাবাকু ভালোই। মদু কোঠা থেকে ট্যাবাকুর সাজ-সরঞ্জাম আনল। বদরের তৈরি চন্দনকুচি এখনো আছে কিছু থলিতে। মাটির সানাই ধোঁয়ায় এরই মধ্যে পেকে উঠেছে। সানাই-এর মুখে ট্যাবাকু আর চন্দন ভরে কোঠার গায়ে হেলান দিয়ে বসল মদু। বদর তাকে একটু আয়েসিই করেছে। অভ্যাস। কিন্তু এখনও সে ধল্লাতেই। এরপরে মানসাই, তোরসা, কালজানি হয়ে ব্রহ্মপুত্র, আবার সেখান থেকে ফিরে ধল্লায় আসা। তারপর বদর ফিরতে পারে, যদি ফেরা সম্ভব হয়।

নৌকার ছই-কোঠার কাঠের গায়ে হেলান দিয়ে বসে থাকতে-থাকতে মদু মাঝরাতের কাছে ঘুমিয়ে পড়েছিল। শেষরাতের চাঁদের আলোয় এখন নৌকা চলেছে। ডানদিকে পাড়। মদু চোখ চেয়ে দেখল। নৌকা তাহলে মানসাই ঢুকেছে দু-মোহনা আড়াআড়ি পার হয়ে। বাতাস পাচ্ছে পালে। কিন্তু জল সব জায়গায় সমান গভীর নয়। সামলে-সামলে চলছে নৌকা। এ এক কঠিন কাজ এই দু-মোহানি পার হওয়া। দিনের বেলাতেই চরে উঠে পড়ার ভয় থাকে। হালে গন্নাই।

মদু উঠে দাঁড়িয়ে বলল—তাহলে আমি ঘুমাই তুমি যখন নৌকা ছেড়েছ।

দুপুরের আগে-আগে যখন ঘুম ভাঙল মদুর, তখন নৌকার সবাই জেগেছে। বাইরে এসে সে দেখল নোঙর ফেলেছে গন্না। নদীর পাড়ে বন, মাঝখানে চর। চর আর পাড়ের মধ্যে যেন ঠাণ্ডা জলের দ। সেই দহের নীল জলের উপরে চর ঘেঁষে নৌকা। মদু দেখল মাল্লারা স্নানে নেমেছে। দু-তিন জনায় জাল হাতে জলের ধারে-ধারে খ্যাপলাচ্ছে। খেপলা জাল নাম। মাছরাঙারা আর একটা চিল এসে জুটেছে ভাগ বসাতে মাছের।

গন্না স্নানে নেমেছে। মদু জিজ্ঞাসা করল ভোররাতে চেকাখাতা পাবে কিনা।

গন্না বলল—আকাশের রং দ্যাখো। ইস্প্যতি না? ঢল নামলে মুশকিল।

দুপুরের পরে নৌকা খুলল। মনে হল দিনটা অন্য দিনের মত যাবে। উজানে চলবে নৌকা বৈঠা মেরে, লগি ঠেলে। এ-নদীতে বর্ষার পরে পালে চলা যায়। এখন মেপে-মেপে চলা ভালো। কিন্তু কোনোদিন অন্য দিনের মতো হয় না। তেমন ঝাঁক বেঁধে নয়, কিন্তু সারাদিন তার নৌকার আগে-পিছে কখনও পাশে অন্য নৌকা চলেছে—লগি ঠেলে, বৈঠা মেরে, সম্ভব হলে পাল তুলে

উজানে আর ভাটিতে। ব্যস্ততাই কথাটা—ছুটোছুটি। তাকেই লক্ষ্যে রাখছে নাকি?

তা হোক। কোঠায় গিয়ে বসল মদু।

ফিরিঙ্গিকে বলল—আজ শেষরাতে তোমায় চেকাখাতায় পৌছে দিব।

ফিরিঙ্গি শুয়ে ছিল, উঠে বসল।

—শেষরাতে?

একটু ভাবল ফিরিঙ্গি, বলল—তোমার সঙ্গে সাত-আট মাস হল, মদো।

—তা হল। তোমার কাছে জানলাম শুনলাম অনেক। তোমার ধর্মের কথা, তোমার এক বানীর দেশের কথা।

—আমার জেসাস্-এ তোমাব আপত্তি নাই, মদো?

—কিছু না। আমারদের এত অবতার। তোমরার এক মানতে কী আপত্তি হৈব? তবে আমারদেয় অবতার ভগবান যুদ্ধে জিতে—বাম বলো, কৃষ্ণ বলো। তোমারদের অবতার সি নিজে মবে, মাথাও যে ভাল হয় তা দেখালে।

—তুমি বড় ভালো, মদো।

—তাই বলে গোটা পৃথিমীকে দুই রাজার খাজ্যোতে ভাগ করা—তা মানি না। মদু হাসল।

—আমরাও না।

—তোমরা আংলিশরা?

ফিবিঙ্গি বলল—তোমার দেশেব কথা এমন যে কোনোদিন ভোলা যায় না। তোমাব ঘাই-হবিণীব কথাও না, গোসানিমাবীর গল্পও না। তোমাব ধাবণা, মদো, কামতাপুর শান্তি পায় না?

এ থেকেই পাপ-পুণ্যের কথা উঠল। গল্পটা মদু ইতিপূর্বে শুনেছে। সে ভাবল এটা কিন্তু ভাবতে ভারি আশ্চর্য লাগে পনেরোশো ছিয়াশি বছর আগে মানুষের পাপের জন্য সকলেব হয়ে ঈশ্বরেব এক অবতার কী কষ্টই সহ্য করেছিল! মৃত্যুর অধিক সে কী শারীবিক আর মানসিক কষ্ট! অবতাব হলেও দেহধারী আর সেজন্য কষ্টও হবে। লোহাব কালো-কালো খিল হাতে-পায়ে-বুকে আব মাথায় বিঁধছে, যেন পৃথিবীর অজস্র পাপ ঘন হয়ে-হয়ে সেই খিল হয়ে বিঁধছে। এর আগেও ভাবতে গিয়ে মদু যেন সেই বেদনার কিছু অনুভব করছে। তেমন কালো তীক্ষ্ণ কিছু যেন তার বুকেও বেঁধে। আর তা থেকে তেমন রক্ত ঝরে।

কিন্তু অত সহজ কি ব্যাপার?—ফিরিঙ্গি যেমন বলে। মূলে এক পাপ, আর সে-পাপের ফলেই মানুষকে খেটে খেতে হয়, কষ্ট পেতে হয়, পাপের খিল গায়ে বেঁধে। কী সে পাপ? না, শয়তানের চক্করে পড়ে লাল আপেল পাড়া। কী তার মানে? ফিবিঙ্গি যা বলেছে তার মানে ঠারেঠোরে এই বোঝো যে হবাকে আদম ছুঁয়েছিল কিন্তু—

কিন্তু সে থামল। ভাবল . এ রকম মত বলেই কি এ-লোকগুলো এমন সাদা-সাদা যেন ছায়া-ছায়া, যেন রক্তওলা নয়। একটু পবে বরং বলল—শোনো, বলা, তোমরার আংলিশের সঙ্গে আমারদের যেমত পার্থক্য হয়। আমারদের পঞ্চভূতের কায়ে মৃত্তিকা থাকে। তোমরার কায় মৃত্তিকা ছাড়া অন্য চারে হয়, যেমত জলজ শেহলা। দ্যাখো, তার রং সবুজ না হয়?

না, এখানেই সে নিজের অনুভূতিকে আংলিশের তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারে না। সে বলল—এখানে বাণ-শিব পূজা হয়। তার কাছে বলি হয় খাসি। খাসি চিনো? হাঁ, তাই। বলি এ-কারণ যে খাসি নিষ্ফলতার প্রমাণ। আর বলি হয় গলায় ফাঁস দিয়া, যেন খাসির রক্ত মাটি না-ছোঁয়, কেননা সে-রক্ত এমত নিষ্ফল।

ফিরিঙ্গি একটু ভাবল। কেমন যেন বলিষ্ঠ মনে হয় মদোকে যখন এমনসব কথা বলে সে।

কিন্তু ধর্ম? কে বোঝে বলো? একটু অন্যমনস্ক হয়ে যেতে হয় না? তা থেকে, সেই অন্যমনস্কতা থেকে উঠে আসতে যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল।

আর তারপরে মদু হাসতে পাবল। বলল—তোমরাব দেশ মন্দ নয়, বলা। একজন মাত্রই বাজা থাকা ভালো। যদি-বা তোমরার কপালে এখন রাঁড়ী। তা কিন্তু সে একা।

কিন্তু কী নদী কী সময় কারো উপবে পবিকল্পনা ঠিক রেখে চলা যায় না। সারাদিন নৌকার আনাগোনায় কি মত বদলাল? অথব গন্না যেমন বলল আকাশে তাবা দেখা যায় না। আব জলও অগভীর। বাতে বরং নোঙর কবা হোক।

ভোব বাতেই কিন্তু আবার নৌকা ছাড়ল সে। এখন খানিক উজিয়ে, নদীব খাত যদি খুব বদলে না থাকে, তোরসা থেকে খালে-খালে, বানিযা খাল যার নাম, চিলাপোতাব বাঁধানো খাল বেয়ে কালজানিতে পডতে হবে। আর তা পড়তে-না-পড়তে চেকাখাতা। এখনও উজানে চলেছে নৌকা। খালের স্রোত কিন্তু কালজানির দিকে ভাটিয়ে যায়।

নৌকা ছাডতে-না-ছাড়তে উঠেছে মদু। এ এক সংকট! সামনেব চিলাপোতার খাল। অনেক পাক, অনেক খালের হিজিবিজি। ঠিক না জানলে ঘুরপাক খাবে। আব ওদিকে সেসব পার হয়ে পাবে দরজা—অর্থাৎ গড়ের পুব দবজাব নিচে পাঁচ-ছশো গজ খালের দু-পাড়ই ইট-বাঁধানো। হাজারমনীও সেখানে ঢুকতে পাবে এত গভীর আব চওড়া। কিন্তু মাশুলঘাটা। অনেক সময়ে হয়রানি হতে হয়।

ফিরিঙ্গি অনেকদিন সঙ্গে ছিল। আজই কযেক দণ্ডেব মধ্যে ছাড়াছাড়ি হবে। আর কোন-দিনই দেখা হবে এমন নিশ্চয় নেই। তার অনেক কথাই মনে আসছে।

কথাটা মনে পড়ল মদুর। কি করে কী মনে আসে। অসুস্থ এক ফিরিঙ্গি। সেই ছেলেধরা, মেযে চুরি করা পর্টুগিজ হার্মাদদের কেউ নাকি? না তেমন তো নয় ভাষা। কী? না দেশ দেখতে বেরিয়েছে। আংলিশ নাকি, বলছে। বহোৎ খুব। নৌকায় যেতে চায় উত্তবে। কিন্তু কী দেবে দাম-পাবানি? তারপর মদুর নিজেরই পবিকল্পনা। কী কাণ্ড! তখন মাসখানেক হযেছে ফিবিঙ্গিব মদুব আশ্রয়ে। উত্তরে যাওয়ার আগে মদু দক্ষিণের কাজ সারছে আব বারেবারে ফিরছে নিজ গ্রামে। বেশ সেরে উঠেছে ফিরিঙ্গি। ভরার মেয়ে নিযে ভরা এসেছিল ঘাটে। সে ভেবেছিল রাত করে পালা করে করে দু-চার মেয়ে পাঠাবে ফিরিঙ্গির ঘবে। ফিবিঙ্গির রং আর মুখের চেহাবায় কী মনে হয়েছিল? হাঁ, হয় যদি কিছু দু-দশ বছর গেলে মথুরার হাটে ভাল দামেই বিকনো যাবে। মানুষ চুরি করে ফিরিঙ্গিরা, আর এটাও ফিরিঙ্গি—তা থেকেই কি মনে হয়েছিল?

মৌলিক পাপের প্রলোভনে ফেলা? কিন্তু তখন মদু উঠে দাঁড়িয়ে ভুরুর উপরে হাত রেখে পুবান সূর্যের জ্যোত আড়াল করে চেকাখাতা যাওয়ার খাল দেখছে। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ফিরিঙ্গি। এখন ফিরিঙ্গিকে ভদ্রলোক বলে মনে হয় না? প্রায় বন্ধু বলতে পারো। বলাই, বলাই-কানাই-এর একটি। পরিকল্পনাটি কাজে আসেনি, কারণ তার আগেই ফিরিঙ্গিকে বন্ধু মনে হয়েছিল মদুর। ভরার শস্তায় কেনা এক মেয়ে ফিরিঙ্গির সেবা করত বটে, কিন্তু বন্ধুবান্ধবের ওসব ব্যাপার নিয়ে দুই ভদ্রলোক আলাপ করে কি?

তখন চিলাপোতার বাঁধানো খালে নৌকা ঢোকে-ঢোকে, তরতর করে ভাটাচ্ছে। চার দাঁড় পড়ছে তার উপর। নৌকার বাকি লোকেরা দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক, গড়ের প্রাচীরের দিক দেখছে। হঠাৎ সামাল-সামাল করে উঠল নৌকা। বাঁধানো খালের বেরনোর মুখে দু খানা নৌকা, আড়াআড়ি কাঁচির দুফলার মত। এগিয়ে আসছে, উজিয়ে। সামাল-সামাল করে উঠল নৌকা। স্রোতের জলে নৌকা থামানো আর লাফিয়ে-ওঠা ঘোড়াকে শূন্যে রাশ-কশা সমান কথা, কার-বা ঘাড়ে ভাঙে। কিন্তু মাশুল আদায়ের নৌকা নয়। মাঝিমাল্লাদের হাতে লগি, বল্লম। নোঙরের ভারি লোহা ফেললে নৌকা ঝাঁকি

খেয়ে থামবে , কিন্তু অন্যরকম লাগল দৃশ্যটা মদুর চোখে।

আর ওরাই তার পরিচয় দিল। হাঁক পাড়ল—কার না এমত?

কথাটা যেন মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল মদুর—টেপুর নাও, আর কার?

কথাটা কি ভুল বলল সে? নৌকা দুটোর মাল্লারা শুনে যেন হামলে উঠল। চিলাপোতার এই জলদুর্গ কি তাহলে নরবাজার অধীনে নেই? চিলার অধীনে যারা যুদ্ধ করছিল তারা কি রাজাকে ছেড়ে চিলারায়ের ছেলের পক্ষ নিয়েছে তবে? কামতার বদলে ধুবড়ির প্রভাব?

এটাই বিপদ। আগে থেকে বলা যায় না বোঝা যায় না, কোন মন্তরে বাধা কাটে। আর দেখো, নদীতে-নদীতে ফাঁদ। আর তোমাকে ফাঁদ কাটিয়ে-কাটিয়ে চলতে হয়। এবার মন্তরে উলটো হল। দুশো গজও তফাৎ নেই আর। এখন এটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে টেপুর নৌকা নয় বলেও লাভ নেই। আর এদের পিছনে আর কত নৌকা আছে কে জানে? বাঁধানো খালের মুখ পার হলে খালটা অবশ্য চওড়া, ঘোরাফেরা যায়, সেখানেই আগে পৌঁছনো দরকার। কিন্তু ওদিকে দেখো, ওরা খেপে উঠল যেন। এবার মন্তরে ফাঁদ কাটে না।

এবারও যেন মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল মদুর। তোপ—বলল মদু। তখন কাছে থাকলে দেখা যেত তার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। দু দিন থেকে দেহে যে-রসাধিক্য তা যেন এখন জ্বর হয়ে ফুটবে। তোপদার কোষা। মাঝি জানে কী করতে হয়। তার ইশারায় ভাটার উলটো বৈঠা মেরে নৌকাকে প্রায় থিতু করে ফেলল মাল্লারা। তোপদার সামনেরটা গাদা শেষ করতে-না-করতে মদু পিছনেরটি গেদে ফেলল। ততক্ষণে বর্শিতে বাঁধা আগুন-ফিতে জ্বলে উঠেছে। স্রোতের বড় টান। আর পঞ্চাশ গজ এগিয়েছে নৌকা। প্রাণে মেরো না—বলল মদু। আর-একটু উপর নিশান করে তোপ দাগল তোপদার। কাঁচির বাঁয়ের ফলার মাল্লামাঝি তোপ ভারেনি। তারা হাউমাউ চিল্লাচিল্লি করে একপাশ হতে তাদের নৌকা জল খেল। আর তা দেখে নিজের থোরা চাপড়ে হোযা-হোয়া করে হেসে উঠল মদু। ততক্ষণে হাতে ইশারা করেছে গন্না। বাঁদিক ঘেঁষে হাল ধরেছে সে। বারো দাঁড় পড়ছে। শনাশন্ ছুটছে নৌকা, আর তখন কাঁচির ফলার ডাইনেরটির মাথার উপর দিয়ে পিছনের তোপ দাগল তোপদার। কিছু হল বৈকি। অন্তত কাচির ফলা দুটো খুলে খালের দুই কিনারের দিকে ভাসল। খালের চওড়া মুখ এসেছে এবার। মাঝ বরাবর হাল ধরেছে গন্না, পা ঠুকে-ঠুকে দাঁড়ের লয় বাড়াচ্ছে। দু-পাশের নৌকা থেকে শনশন ভল্লা এসে পড়ল খানকয়েক। একখানা বিঁধল মদু আর ঝিবিঙ্গির মাঝে নৌকার ছই-কোঠার গায়ে। কাঠের কোঠায় বিঁধে খাড়া হয়ে রইল। গড়ের প্রাচীর থেকে তোপ গজরালো বার কয়েক। সে কিন্তু না-বুঝে, ভয় দেখাতে, আমরাও আছি বলতে।

তখন ভাটার স্রোতে আর চৌদুন দাঁড়ের ঘায়ে শন্‌শন্ চলছে গন্নার নৌকা। গালাগালির তোড়ে তার কপালের শিরা ফুটছে, কষে গাঁজলা।

দু-তিন রশি এসে গন্না বলল—এলা?

পিছনে দেখল মদু। এখন অন্য পক্ষ নৌকা ছাড়েনি। কালজানিতে পড়ার আগে আর কে ধরে? আর সেখানে পড়লে, সেই চওড়া নদীতে, আর কে ধরবে? টান দিয়ে কোঠার কাঠে বেঁধা ভাল্লাটা তুলল মদু। চকচকে নয় কিন্তু , কালো ইস্পাতের আর সূচের মতো চোখা এক হাত লম্বা ফলা—বিঁধলে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়। শালা, ফাঁদের পাথর যেন পায়ে পড়েছিল—বলল মদু, ভল্লাটা জলে ভাসিয়ে দিয়ে। তবু ভালো, হাঁ, একদিক দিয়ে ভালো, যে রক্তারক্তি হয়নি। রক্তারক্তি হলে আর ফেরার পথ থাকে না।

—কিন্তু আমার প্রাণের বলাকে তো নামায়ে দিতে হয় চেকাখাতায়, গন্না। আর কালজানিতে বেরিয়ে গিয়ে রাতের অন্ধকারে উজোবে আবার?

—ধরবো। বলল গন্না। একটু ভাবলে সেও। কিছু পরে বলল—ওরা যদি ধাওয়া করে, ভাববে আমরা কালজানির স্রোতই ধরেছি, সাহস করে ওদের এক্তিয়ারে ঘাপটি মারব তা কিভাবে?

মদু একমত হল। তাছাড়া কালজানির খাতে নানা চর থাকতে পারে, যেমন গতবারে ছিল। এ চর ও চরের ফাঁকে আড়ালে আবডালে যা হয় কিছু করা যাবে।

একপ্রহর বেলা হওয়ার আগেই চেকাখাতায় পৌঁছুল নৌকা। অনেক নৌকার ভিড়। তার মধ্যে সেঁদিয়ে গিয়ে লগি পুঁতে নৌকা বাঁধল গন্না। এখানেই ফিরিঙ্গি নামবে।

হাটটা জমে দুপুরের পরে। কিন্তু এখনই দেখো ভিড়। যারা হাট ধরে সারা বছর পড়ে থাকে তাদের খানকয়েক পাকা পোক্ত খোড়ো চৌরী। ওপাশে দক্ষিণ থেকে নৌকায় আসা হাঁড়িপাতিল তিজেলের মঠ উঠেছে যেন কুমোরদের। এদিকে ছাতনাগাছের নিচে পাশাপাশি দাঁড়ানো অনেকগুলো বেঁটে বেঁটে ভূটিয়া ঘোড়া, লম্বা লেজ আর কপালে ঘাড়ে হাঁটুর গাঁটে লম্বা লম্বা চুল। প্রস্রাবের গন্ধে এগোবে কী? তার কাছেই ছোট একটা ধানের স্তূপ। কেনবার আগে চিটেতে ফুঁ দিয়ে পরখ করছে একজন। আর এর পাশ দিয়ে এগোলে আরেকটু ভিতর দিকে সেই দোকানগুলো, যেখানে এণ্ডি আর ভোটকম্বল সাজান আছে, চমরীর লেজ পাবে যাতে চামর হয়, আর মাঝে-মাঝে কস্তুরী—মৃগনাভি যার নাম।

দেখে-শুনে বেনের পো মদু সা-র মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল। চন্দন মাখানো ফুলের গন্ধে যেমন বামুনের, আর লাঙ্গলমই এ চৌরস ভুঁই দেখে চাষীর হতে পারে।

কিন্তু তা তো নয়। এখানে ফিরিঙ্গি নামবে।

সে আগেই জেনেছিল চেকাখাতায় নৌকা ভিড়েছে। আর এটা পর্যটকদের ধারাই বোধ হয় যে তারা বেশ সহজে অক্লেশে যে দলটার সঙ্গে দীর্ঘ সময় চলছিল তা থেকে নিজেকে পৃথক করে নিতে পারে, টুক করে খসে পড়তে পারে। ছোট একটা মোট তার। ঝোলাই বলো। নিজেই কোঠা থেকে বয়ে আনল। কিংবা আরো সঠিক বলতে হলে অন্য হাতে এক পুলিন্দা। মদুর সামনে এসে দাঁড়াল সে। ঝোলাটা পাটাতনে রেখে দু হাতে পুলিন্দাটা এগিয়ে ধরল।

বলল—এগুলো রাখো।

—কী এ?

—এক খুঁতি টোব্যাকুর বীজ।

হাতে নিয়ে মদু বলল—এটা, এ তোমার হাতে লেখা দেখি।

একটু থামল ফিরিঙ্গি। পরে বলল—আর যদি ফেরা না-হয় আমারদের দেশের কোনো মানুষ পাও দিও। তবে টোব্যাকুর বীজ তোমার। গডবাই-ই।

একজন মাল্লা তার ঝোলা নামিয়ে হাটের ডাঙায় নিয়ে গেল। সেখান থেকে নিজেই ঝোলাটা ঘাড়ে ঝুলিয়ে নিল সে, তারপর হাটের ভিড়ে মিশে গেল।

মদুর মাল্লাদের দু একজন হাট দেখতে নামল। গন্না বলল—এখানে বান্নার ঝকমারি নয়। তৈরি থাকা ভালো। একটুক দেরি করেই ছাড়ো, যদি ছিপ-কোষা খুলে থাকে এগিয়ে যাক। কাজেই নৌকা ছাড়তে কিছু দেরি হল। এর মধ্যে দূর থেকে ফিরিঙ্গিকে একবার দেখা গেল, কিন্তু সে নৌকার দিকে যেন মুখ তুলেও চাইল না।

কিন্তু একসময় নৌকা ছাড়তে হবে। আকাশের দিকে তাকাল গন্না। বোঝা যাচ্ছে কিছু দূরেই মাঝনদীতে চর পড়ে নদীটা কয়েক ভাগে ভাগ। এমনই আশা করা হয়েছিল। বুকে পাটা থাকলে নায়ে নায়ে ভোল বাজি খেলা যায় চরের ফাঁকে-ফাঁকে। কিন্তু আসল কথা কোন খাতটা ধরবে সে। যদিও সবসময়েই কপাল বলে এক কথা আছে।

মদু বলল—ছাড়ো।

এবাব ভাটিযে ব্রহ্মপুত্র, আব ব্রহ্মপুত্র উজিযে গুযাহাটি। দু-দিকে চব। গত বর্ষায নতুন খাত কাটাব আগে এটাই খাত ছিল। দু-চবেব মধ্যে এখানে স্রোতটা ঢিমে। জলটা নীলচে আব তাব তলায শেওলা কাঁপে। এ-নদীব জল আব ও-নদীব জল। জলেব বঙে বদল হয দেখো।

একটা দীর্ঘশ্বাস পডল মদুব। কেমন হালকা লাগছে না? ট্যাবাকু খেলে হয। তাবই যোগাড কবে নিল সে। না, এটাকে ফিবিঙ্গিব ব্যবসাব ব্যাপাব বলা যায না। কী তবে? দেশে দেশে অবাক হওযাব মতো যা-কিছু আছে তা দেখা? কিন্তু নেশায চলছে যেন? কী হয দু'চোখ ভবে দেখে? আশ্চর্য না কথাটা?

আজ দুপুবে বোধ হয বসটা শুকিয়েই শবীবটা হালকা লাগছে। কেমন যেন হালকা আব উদাস।

কিন্তু গন্না বললে চবটা পাব হতে-না হতে—কোষা দেখি।

দু-একখানা নয়। ছ-সাতখানা পবেব পব শনশন চলেছে। চবেব আডালে ও বঙেব মূল খাতে চলেছে বলে এতক্ষণ চোখে পডেনি।

মদুব মনে একবাব যেন উৎকণ্ঠা দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাব মনে হল গন্নাব কথাটায দেখাব কথাই আছে হযতো, সাবধান কবা নয। কাবণ ওগুলো তো আগে আগে চলেছে, অর্থাৎ ধবে নিয়েছে মদুব নাই আগে।

অনেকটা, অনেকটা পাশ বেখে চলো—বলল মদু।

ভাবল সে তবতব কবে স্রোত চলছে। কী যেন? ও, হাঁ, দেখাব কথাই। কিন্তু বিপদ আছে। ভোটদেশ, ভাষা জানো না, আব ওবা কখন কী কববে তাও জানো না। ভয আছে, প্রাণেব ভয যাকে বলে।

নদীব স্রোতেব দিকে তাকাল মদু। তবতব স্রোত, কিন্তু ধাক্কা নেই, স্পর্শেও বোধ হয ঠাণ্ডা হবে। আব জলটাব বংই যেন ফিবিঙ্গিব চক্ষু। আব কত কথাই না বলেছে ফিবিঙ্গি, দেশেব কথা, ব্যবসাব কথা, অন্য দেশেব কথা, পাপপুণ্যেব কথা। এক পাপেই নাকি এত দুর্দশা মানুষেব। মদুব নিজেবই কি এখন দুর্দশাব কাল? কপাল বলে কথা কে জানে বলো? আচ্ছা, কী সে পাপ? চোখে-ঠোবে বলা সেই কথা।

মদু হাসতে গিযে থামল। আহা, ও একা ঘুবছে ফিবছে। একেবাবে একা, এখন কি ওব সম্বন্ধে ঠাট্টা করতে আছে। অবশ্য এমন হতে পাবে সে আপেল তো খুব লাল। তাহলে তো তাব মানে সুন্দব জিনিস দেখাব হাতে নেযাব লোভ। না কি ভোগেব আকাঙ্ক্ষা? না, বলা, তুমি হযতো বোঝো নাই তোমাব দেশেব পণ্ডিতবা কী বলেছে।

কিন্তু তাহলেই ব্যাপাবটা কী বকম হয না? দেখা যদি পাপ, আমবা আবাব এদিকে বলছি সূর্যকে আবাব দেখতে দিযো।

আব মৃত্যুভযও আছে। নতুবা পাণ্ডুলিপি [illegible] কবা কেন? ট্যাবাকুব বীজ না হয বন্ধুত্ব। কিন্তু পাণ্ডুলিপি? যদি না-ফিবি, আর একজনেব হাতে দিযো। অকাবণ নয। ঠিকই বলেছ, কখন কী হয় বলা যায় না।

কী হয বোজ লিখে? [illegible], যা দেখো তা লিখ।

বেলা ডুবুডুবু। মদু বলল—গগনা, জলটা যেন ভাল ঠেকে না। খুবছে বাববাব। মূল খাতে লও। ঠোক্কব খেয়ে মরা কি ভাল? তোমাব ফন্দি খাটল? শালাবা আগে গিযে হাতড়ায। ঢিমে দাও না আর। যত শালাব পো পিছনে, সামনে যাক না।

নাচা-নাচা স্রোত কিন্তু যেন এ-কূল থেকে ও-কূল সাপটে চলেছে। মূল খাতে পড়তে হলে এই ঘুরে-ঘুবে যাওয়া স্রোত ধরে বড চবটাকে ঘুবে যেতে হবে।

আর ওদিকে মবার ভযও আছে। যা দেখেছ তা কাগজে লিখে বাখলে। কিন্তু একবাব বুজলে

তো আর চোখ হবে না। হ্যাঁ, তা নয়। মানে তোমার দেখা কাগজে লেখা থাকল আবছা অস্পষ্ট। তোমার পরেও তোমার চোখ থেকে গেল। মদু হাসল : এও ধরো, বলাই, তাই হল, পুনরস্মাসু চক্ষুই হল না? আবার চক্ষু দিহ।

নদীর পারে আবার বন শুরু হয়েছে। কূল ঘেঁষে খাত, কিন্তু বেশ গভীরই। লগিতে থাউ নাই। বনের ফাকে ফাকে দূরের সবুজ কালচে হচ্ছে। এক জায়গায় বনটা ঢালু হয়ে এসেছে নদীর দিকে। সেখানে যেন পায়ে চলা-পথ। কিংবা নালা হয়তো—বর্ষায় জল চুঁইয়ে তৈরি। আর একটাও তেমন। যেন জলের খাড়ি। দু-পারে গাছ, আর গাছের কোলে শুকনো হোগলা।

আরে আরে, ঘাই নাকি? আবার তেমন খাড়িতে তেমন ঘাই? ঘাই-ই নয়?

বুনো বুনো মোষ। শিং মেলা। মদু হাসল। উজ্জ্বল আলো পড়ে? না, অন্ধকার হলেই অমন হয় পেল্লায় জোনাকির মতো চোখ একবার জ্বলজ্বল করে উঠল।

মদু বলল—বেলা ডোবে। নৌকা ভিড়াও গন্না। খাওয়া-দাওয়া করো। ভোর রাতে ছাড়বা, আর একদমে ব্রহ্মপুত্রে পাওয়া চাই।

পশুদের জল খাওয়ার ঘাট পার হয়ে আরো কিছুদূরে গিয়ে নৌকা ভিড়ালো গন্না। তোপদার বলল—নৌকাতেই পাক।

—হোক তাই। মদু বলল—বসে-কয়ে করো, ভরদ্বাজ। সেদিনায় বেশ হয়েছিল পোলাউ।

দাঁড়ের মাল্লারা উঠল। সারাদিন তাদের তটস্থ কেটেছে।

মদুও উঠল। সেদিন বেশ হয়েছিল পোলাউ আর কাবাব।

কী শেখাল ফিরিঙ্গি, এই ট্যাবাকু। পাতাগুলো ফুরিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এক খুঁতি বীজও দিয়ে গিয়েছে। এক খুঁতি বীজ থেকে সারা পৃথিবী ভরে দেয়া যায়। আর কাদম্বরীর গল্প। আর কাবাব খাওয়া। সব মাংস তো খাওয়া যায় না, হাড়-মাস ছিটিয়ে পড়ে থাকবেই।

ট্যাবাকুর খোঁজে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পশ্চিম আকাশে চোখ পড়ে মদু চমকে উঠল। আকাশটা যেন লাল আর সোনায় মোড়া, ঝলমল করছে। আর কী যেন, কী যেন।

মনটা যেন অকারণে ভার হয়ে উঠল মদুর। কিন্তু কোনো কথা একবার ভাবলে কিংবা তৈরি হলে উচ্চারণ শেষ হলেই তা মরে যায় না।

তার এখন সাঁইত্রিশ। পিতা সাতচল্লিশে গত হয়েছেন। তার শ্মশান-থান খুঁজে পাওয়া যায় না। তার আগে পিতামহ চল্লিশে। পুরুষ কি জীয়ে?

হয়তো এ ব্যবসা ভালো নয়। সাউকারি নয়। পাপ বলবে? তা, মদু, লোকে একে পাপ বলে বোধ হয়। একবার এ পক্ষ, অন্যবার অন্যপক্ষ, আর দু-পক্ষের মধ্যে নিজের স্বার্থ দেখা। পাপ? মানুষ যেমন বাঁচে আর যেমন তার বাঁচা উচিত—দুয়ে অনেকখানি তফাৎ।

হঁ, কী হতে কী হয়, তা বলা যায় না। ভালোই ছিল উদ্দেশ্য। এ-কথায় ও-কথায় সরে-সরে বেড়ালে তা…দেখছ না অন্ধকারে জলের স্রোতও কেমন নৌকার গায়ে ঘা মারছে, পাক খাচ্ছে নৌকার তলায়।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল মদুর।

না, পুরুষ জীয়ে না। আলগোছে বাঁ হাতের ক্ষতের উপরে একবার হাত বুলাল সে। ভাল উদ্দেশ্য কী? না—ডাইন থেকে আলাদা করা। কী হল? মানুষ যেমন বাঁচে—আর যেমন বাঁচা উচিত তার।

মদুর বুকের মধ্যে যেন চাপ লাগছে, কালো-কালো কিছু বেঁধার মতো।

ছি-ছি-ছি, বলতে পারো। আর এখন সে নিজে বছরে দু-একদিনের বেশি দেখা করে না। গ্রামের লোকেরাও তাকে বিবিসাহেব বলে। সা-দের বিবিসাহেব। বছরে হয়তো দু-দিন, কিন্তু সেই দু-দিনই

যেন, কর্তব্যবোধ থেকেই, সেই বিছানাতেই ঘুমোতে হয়। কী উপায়? অবশ্য পাপের মানে একদেশ থেকে অন্যদেশে পৃথক। আর বেঁধাটা সত্য নয়, যা মনে হচ্ছিল। পাপ কি লোহার খিল? যা হয়ে ফিরিঙ্গির দেশের এক অবতারের বিঁধেছিল বটে। যেমন ধরো, ফিরিঙ্গি কাকে আদিপাপ বলে? তা হতে পারে দেশে-দেশে তফাৎ আছে, সেদিকে ডাইন-ডান পুড়িয়ে ফেলে। আর পুরুষ হয়তো দীর্ঘজীবী। কেননা একেবারে সে অন্যদেশ—সে-দেশেতে ঘাই-হরিণী নেই—হয়তো সে-দেশে, সে-দেশেতে , একই রাজা তো সে দেশে। এখানে যেমত রঘুদেব আর লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রহ্মপুত্রের এপারে ওপারে আর দক্ষিণে বেয়ে গেলে শাবাজ খাঁ। না, এমন নয় সে-দেশ। সে-দেশেতে পুরুষ হয়তো দীর্ঘজীবী হয়। গন্না এসেছিল কী নিতে। এক খাবা মুখে পুরলো। ভাঙের মোদকই হবে। তা দরকারও। আগে মদু ভাবত আফিন। এখন জানে, আর জানে ও-রকম ড্যালায় বাঘেরও মাথা ঘুরবে। দরকার শরীরের ব্যথা মারতে।

মদু বলল—খেয়ে শুয়ে নেবে, গন্না? আর তারপর ভোরে দাঁড় ধরে একদমে ধুবড়ি মেরে দেয়া চাই। তা ভোর থেকে সাঁঝ রাতে হয়ে যাবে। বারো দাঁড়ই আর বাতাস হলে পাল। আর এবার কপাল ঠুকে বলবে রঘুর দলের নৌকা। কে কার বলো? দুই-ই ভগবান তো রঘুদেব আর লক্ষ্মীনারাণ।

নিজের রসিকতায় মদু হাসল।

কিন্তু গন্না যেন কী দেখছে। তা লক্ষ করল মদু সা। মোদক-ড্যালা মুখে তুলতে গিয়ে আকাশে চোখ তুলেই চোখে পড়েছে, যেন সন্ধ্যায় সোনালি আর লালে মেশা আকাশই সে দেখছে অমন করে।

হাঁ। তা গল্পটা মনে পড়ল। নতুন তো নয়। মনে পড়বে, মনে পড়াই স্বাভাবিক। যতই কৌশল করুক মন। অন্য কথার স্রোতে যতই পাশ কাটিয়ে যেতে চাও না কেন? কিংবা আসলে মনের তলায় ওটা পাক খাচ্ছিল বলেই অন্য কথাগুলো ভেসে-ভেসে উঠছিল। আর পরও তো নয় সে। আর সেও হয়তো ভেবেছিল ভোর রাতে রওনা হয়ে আড়িয়াল খাঁর বিপদটুকু পার হবে, যেমন তুমি ভাবছ ভোর রাতে। আর সেই ভোরে আকাশ লাল আর জল গলানো সোনার মতো ঝলমল করছিল। এই আকাশের মতো লাল আর সোনালী, শুধু আরো যেন বেশি উজ্জ্বল আর গলানো সোনার আরো কাছাকাছি। আর সেই গলানো সোনায় কালো-কালো ছাই-এর দাগ যেমত, যেন গা ভাসানো কুমিরের সার এমত কোষার সারি। আর পরও নয় সে, সেদিন যে গিয়েছিল, শেষদিন হল যার ভাল করে দিনের আলো না ফুটতে ; সে তোমার পিতামহ। আর এমত আচমকাও হতে পারে, গতকাল পড়নি তুমি দিনের আলো ফুটতে-না-ফুটতে টেপুর বহরের মধ্যে?

হয়তো ফিরিঙ্গিদের দেশেতে এমত হয় না। একটুক মদ খাবে? ভাবল মদু। গন্নাও এক ড্যালা মোদক খেল। একা-একা অবশ্য সামান্য মদই খাওয়া যায়।

মদ নিয়ে বসল মদু, ছইকোঠার কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়ে। তখন বেশ অন্ধকার। ওদিকে রান্না হচ্ছে। রসুন জিরার কী ফোড়ন দিয়েছে তোপদার। ভাল রাঁধে। সেই পোলাউ বেশ খেয়েছিল ফিরিঙ্গি, খুশিই হয়েছিল। হরিণটা অবশ্য জানত না কিছুক্ষণের মধ্যে কী হবে।

হঠাৎ প্রশ্নটা মনে উঠে মদুকে অবাক করে দিল—পুরুষ হওয়ার ফল, তেমন করে চরের বালিতে দেহের দগ্ধাবশেষ ছড়িয়ে পড়ে-থাকা?

মদ এখন আর চোখে দেখা যায় না। নদীর জলই যেন অন্ধকারে লোপ পাবে। আর তা না হলে দুই-ই এখন কালো। না, এবার যাত্রাটা ভালো হয় নাই। ওদিকে ধুবড়িতে রঘু আর এদিকে কামতাপুরের লক্ষ্মী। কিন্তু উপায় কী? তিন টুকরো, কিন্তু একই দেশ তো, না-গিয়ে উপায়? আর তাছাড়া নদীগুলো মেশামেশি না? জলে-জলে একজল নয়? বলো? পূর্বস্থলী থেকে দেখো নৌকায়-নৌকায় গুয়াহাটি যায়।

দূর, এত ভাবছি কেন ফিরিঙ্গি যাওয়ার পর থেকে? এই ভাবল মদু।—আরে ও ভরদ্বাজ, মদের সঙ্গে খাবার কিছু দিলা হে?

মদু ভাবল এ কি আর আমার একার কথা। এখন এমত সময় সাউকারি নৌকা আর কোথায় তফাৎ রাখ দেখি কে পাবো? আসলে ফিরিঙ্গি আর বদর না-থাকায় জল আর আকাশ নিয়ে ভাবাভাবি। আসলে ভাত মেরেছে ফিরিঙ্গি, পাপ-পুণ্যের কথা তুলে। মানুষ যেমত বাঁচে আর যেমত বাঁচা উচিত এক না-হয়।

কথা বলার জন্য মদু বলল—মদটা জোলো দেখি। অন্ধকারে মদের বদলে জল দিছ নাকি, বামোন?

মদু নিজের রসিকতায় হাসল।

অবশ্য জলেরও নেশা আছে। মদ যেমন এ-ভাঁড় থেকে ও-ভাঁড়ে সমান নেশা। জলের তাই এ-নদীতে কিংবা অন্যে।

ভোর হয়, কি না হয়, গন্না নৌকা ছাড়ল।

দোলানি পেতেই উঠে এল মদু। বলল—ছাড়লা? তা, এবারে আর থামা নাই। একদমে ব্রহ্মপুত্র পাওয়া চাই।

আকাশে মেঘা-চাঁদ। তা এখন জ্যৈষ্ঠ শেষ, আষাঢ় আগু। আর কালজানির চরুয়া চরো খাত। দেখ-বেখ, যেন কুমির ভাসছে। নৌকার ধারে বসে অন্ধকার-অন্ধকার জল তুলে মুখ হাত ধুল মদু। হাতমুখ আরাম করে মুছে কাঁকই দিয়ে চুল আঁচড়াতে বসল, হাত দিয়ে ঠেসে চেপে ঢেউ তুলল চুলে ছুই কোঠার ছাতে উঠে ব'সে। হাওয়াটা জোলো-জোলো আর জোরে মারছে যেন।

অনেক রকমের আকাশ দেখা আছে মদুর সকালের। টুপ করে আলো নেবার পর যে-অন্ধকার; সংবৎসর নানা দিন নানা রঙের আকাশ হয়। লালে সোনালিতে মাখামাখি হয়, কখন যেন একবার লালে সবুজে মেশামেশি ছিল। গন্নার মতে তা ঝড়ের কারণ। এখন ঝড় ওঠা কিছু অসম্ভবও নয়। তাও ভয়ের। আবার এমন হয় শেষ রাতের চাঁদ ডুবতে-ডুবতে না অন্ধকার। মেঘের ছায়ায় জল কালো। আর তার মধ্যে খুব ধীরে-ধীরে বেরঙা আলো ফোটে, অবশেষে জলের মধ্যে স্রোতে পাকে ভাঙা-ভাঙা বিবিসাহেবের মুখের মতো সফেদ ঠাণ্ডা ঝিকিমিকি সূর্য দেখতে পাওয়া যায়।

ছাত থেকে নেমে গিয়ে ট্যাবাকু আনল মদু। ফাইন এই ট্যাবাকু। মদু বেশ ধীরে-ধীরে ধোঁয়া ছাড়ল। ফুরিয়ে গেলেও ভয় নেই। এক খুঁতি বীজ আছে। এক খুঁতি বীজে সারা দেশ ভরে সবুজ-পাতা-মেলা ট্যাবাকু গাছ জন্মাতে পারে। এখন, ট্যাবাকুর স্বাদ থেকে ফিরিঙ্গির কথা মনে হল। একটু অন্যমনস্ক হল মদু, আয়াস করে ট্যাবাকু টানতে পারলে যেমন হয়। নদী থেকে চোখ উঠে যেন চেকাখাতায় গেল যেখানে ফিরিঙ্গিকে শেষবারের মতো দেখছিল সে। কত দূর দেশ থেকে এসেছিল ব্যাটা ফিরিঙ্গি।

তা ফিরিঙ্গির দেশ হয়তো ভালো সাউকারির পক্ষে। রাঁড়ী হলেও রাজা একজনাই। কিন্তু কী করা যাবে এ দেশেই যদি সাউকারি করতে হয় তাকে। অন্য দেশ হয়তো অন্য রকম। কিন্তু কী করবে পুরুষে? কারণ কি ভালোই এদেশ, এই নদী? এ নদী আর সে নদীতে কেমন নেশা নয়? এই নৌকা আর গন্নাও।

দেখা নাই যদি হয় ফিরিঙ্গির সঙ্গে, তার ট্যাবাকু থেকে গেল।

ফিরিঙ্গির কথা থেকেই পাপের কথা, লোহার শলার মতো পাপ, আর জেসাস্ আর পরিত্রাণের ইঙ্গিত আর একবার মদু সা-র মনে জট পাকিয়ে উঠল। কারণ আকাশে যেন জোছনা ডোবার পর অন্ধকার হয়ে গেল। নদীর জলও যেন ছাই-ছাই কালো আর জটপাকানো। ঘা মারছে নৌকার তলায়।

ফিরিঙ্গি রোজনামচাখানা দিয়ে গেছে। মদু হাসবে যেন, এমন মনে হল। একি হয় যে তুমি

আবার চক্ষু দিহ বলবে না অথচ তোমার চোখের দৃষ্টি কাগজে লিখে রাখলে, চোখ বুজলেও যা থেকে যাবে। কিন্তু হঠাৎ যেন দীর্ঘনিঃশ্বাসই পড়ল তার।

এখন পাড়ের বন যেন অন্ধকারের সামনে এসে-এসে দাঁড়াচ্ছে। আরেকদিন আসছে, তার আভাস দিচ্ছে যেন, যদিও এখনও ছায়া-ছায়া আর সবুজও নয়।

আহা, আবার চক্ষু দিহ। কারণ, হে ঈশ্বর, তোমার এই পৃথিবীতে অতিতর রতিপ্রিয়া রমণীর স্বামী যেমত আমরা জীয়ী না।

দেখো একবার এ-নদী, দেখো একবার রঘুদেব আর লক্ষ্মীনারান। কী কাণ্ড, আকাশটা নীলচে সবুজ হবে কেন? লাল না, সোনালি না, কালো না। গন্নাই নাকি—হরি-হরি বলল? আকাশ দেখে নাকি? আর রঘু না, লক্ষ্মী না, এ-জলও পুরুষকে নিতে পারে। তা নেয়ও। ক্যাঁচ করে দাঁড়ের শব্দ হল ডুবোচর এড়ালে গন্না। ভাটার স্রোতে বারো দাঁড়ই পড়ছে। না, বদলে গেল আকাশ।

কী উপায়? অবশ্য তোমার এক পুতি আছে, মদু। আর এদেশে কাকে পাপ বলবে? আমরা সেই মাটি থেকেই উঠি না বাণ শিবের মত, যেখানে খাসি বধ্য।

সাউকারি চালটা এল মাথায়। যদি গুয়াহাটি যেতে পারে, সামনে আষাঢ় আর অম্বুবাচী। কামাখ্যা বিশেষ জাগ্রত। ঘটাপটা করেই সে পূজা দেবে। অম্বুবাচীর নির্মাল্য নেবে। আর যদি সে-সুযোগ নাই পায় সে—পুতির বিয়ে দিয়েছে, বেটারবউও সুলক্ষণা। ফুলের মতো মেয়ে, কিন্তু এখনই পাছা ভার হচ্ছে না কেমন। আর যদি না-ই ফেরে সে, তাদের মধ্যে কি বীজ বেঁচে থাকে না? বটের বীজ কত ছোট। নৌকার গলুই-এ গিয়ে দাঁড়াল মদু, এত আগে যেন নৌকা উলার হবে। যেন কুয়াশা, এমন হালকা মেঘ ছুটছে আকাশে। তাই আলো হচ্ছে না হয়েও।

ধোঁয়াটে জলে পাক ধরছে এখনও। আলো ফুটেও ফুটছে না। কী রকম আলো ফুটবে কে জানে! সে জানে (নিজের বংশের অভিজ্ঞতা থেকে জানে, আর এই সেদিনই সে নিজেও পড়েছিল টিপুর ঝাঁকে) অন্ধকার অবশ্যই কখনও-কখনও টেনে নিয়ে পাকে ফেলে আড়িয়াল খাঁর। পিতামহর সময় থেকেই হচ্ছে।

কিন্তু এখন, এই তো সময়, সূর্য কেমন দিনটাকে-বা আনো। আবার সূর্যকে দেখিবা দিহ। আর এখনই শেষ রাতের অন্ধকার কাটবে আর জলের মধ্যে সাদা সূর্যের মুখ দেখতে পাওয়া যাবে নাকি হাসি-হাসি আর সফেদ। মদু হেঁকে বলল—তোপ তৈরি রাখো, ভরদ্বাজ। তার ব্রডসাইড মারবা, বুঝলা, ব্রডসাইড।

মদু ভাবল, কী ভাষা, মরি দেখো। ব্রডসাইড কিনা চওড়া পাশ। কিন্তু তোপ মারবে যখন তখনও তো অব্যয় হল, কিন্তু না বিভক্তি, না আছে বদল। এমত হয় না আমারদের দেশেতে।

আর ভগবান, ভগবান, যদি মত হয়, ছেলের বেটা কিংবা তস্য বেটা হয়ে এদেশেতেই যেন জন্মাই যদি তেমন-কিছু ঘটে যায়।

কারণ যেমত অন্ধকার হয়

ফ্রাইডে আইল্যান্ড

অথবা

নরমাংস ভক্ষণ এবং তাহার পর

সে বিষয়ে নানা মত যে প্রচলিত আছে সে স্বীকার করি এবং যে যাহা খুশি প্রামাণ্য মনে করায় ক্ষতিবৃদ্ধি দেখি না। কেহ বলে দ্বীপের, যাহা দ্বীপ তাহা দেশ, ট্যুরিস্ট ব্যুরোর প্রচার, কেহ বলে বেনিদিকো ক্যাস্টিগলিনোর ক্যারিব-কাব্য আন্দোলন, বলে ইহা সবই জন জোযাকিম ফ্রেডা এবং সেই মাত্র।

ট্যুরিস্ট ব্যুরো সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যমেব যৌথ ব্যবস্থা কিন্তু গত এক প্রজন্ম যে প্রভাব সর্বস্বীকৃত সে বৃদ্ধ নারদ-দাড়িমণ্ডিত মুখ, হাস্যময়, মাংসল ঘাড় ও মন্যাকল্ পরিহিত অ্যাটকিন্সনের। এবং সেই সর্বাপেক্ষা লাভবান, কারণ জ্যামাইকা ফেবিঘাটায় অন্তত আট জাহাজের, দ্বীপের অন্যূন ।ার হোটেলের, একটি কোকাকোলা ফ্যাক্টরির সেই একক মালিক যদি বা সে কোম্পানির নাম অ্যাটকিন্সনস এবং অ্যাটকিন্সনস। ছাপা ইংলণ্ডে হয় কিন্তু ফেরি-জাহাজগুলিতে এবং দ্বীপের জেটিতে বড বইএর দোকানে ডানিয়েল ডিফোর লিখিত রবিন্সন ক্রুশোর অভিযান কাহিনী সেই উপন্যাসের, যা স্বভাবতই দারুণ বিক্রি হয়, বিক্রি কমিশনও অ্যাটকিন্সনের তাহা শোনা যায়। কিন্তু সে ছ.ড়াও অন্য অনেকে · জনসন, স্মিথসন, রবিন্সন, ক্যাস্টিগলিনো, এবং ফ্রেডা। জনসন ক্রআরিসের বিয়ারের খালি টিনগুলি জ্যামাইকা ছাড়ার পরই সমুদ্রে ইতস্তত ভাসমান থাকে। রবিন্সনের প্রকৃত এবং আদি গোটমিল্ক চিজ তো জ্যামাইকার দোকানেও পাইতে সম্ভব। ক্যাস্টিগলিনো পবিবার কিছু স্বতন্ত্র পথে চলে। এক পাহাড়ের উপরে, এক সমুদ্রের ধারে দুইটি হল। পাহাড়ের হলে যে সংগীত শোনা যায তাহা নিছক পপ-মিউজিক নয়। সংগীতের সুরে কিছু ক্যালিপ্সো কোনো বা জ্যাজের মিশাল সত্ত্বেও ব্যাগপাইপের যে আনুনাসিক টান সে এ দ্বীপের কালপূত বিশিষ্টতা এমন প্রচার আছে৷ এখানকার পাখা-নাচে যে ঘাসপাখার ব্যবহার মাত্র সেই প্রভেদ পার্থক্য নয়, যদিবা সে পাখায় হুলাহুলার ঘাস-ঘাগরা এবং ফ্যান-ড্যান্সিংএ অন্যত্র দৃষ্ট শ্বেত-পুষ্পবৎ অস্ট্রিচপাখার সমন্বয়, আহা, কেননা নর্তকীর নৃত্যভঙ্গে মুহুর্মুহু সে পাখা অপসৃত হয় আর গিরিচূড়া সানুদেশ উপত্যকা ইত্যাদি আবিষ্কৃত। সে রূপে এবং তাহার রোপণভঙ্গিল কটিদেশেও ক্যাস্টিগলিনো পরিবারের উদ্ভাবন নাকি দেখা যায়। অ্যাটকিন্সন বুড়ার আপত্তি থাকার কথা নয় কারণ এই নৃত্য এবং এই সংগীত তিনশত বৎসরের পুরাতন ঐতিহ্য না হয় না হউক, ভ্রমণকারী আকর্ষণে তাহাদের দান থাকেই, যে ভ্রমণকারীগণ অ্যাটকিন্সনের জাহাজগুলির ডেক ও ক্যাবিন পরিপূর্ণ করে, হোটেলে স্থানাভাব ঘটায়, ডিফোর উপন্যাস ক্রয় করে, কখনও কখনও নিজনিজ উপন্যাসের কাপিতে ভ্রমণের প্রমাণরূপে অ্যাটকিন্সনের সইও লয়—তাহারা পরে উপন্যাসের সঙ্গে মিলাইয়া কোথায় রবিন্সন ভেলা বাঁধে, কোথায় তাহার গুহাদুর্গ, বা তাহার সহিত ফ্রাইডের সাক্ষাৎ, অহো, সেই কাল্পনিক স্থানগুলিকে নির্ণয় করিয়া ভ্রমণ করে।

এবং সেও এক সুবিধা এই দ্বীপে যে স্মিথসন কম্পানির ডিপার্টমেন্ট স্টোরে বিনা শুল্কে পাচার করা, ট্যুরিস্ট ব্যুরোর ব্রশুরে যে ইঙ্গিত, নানা শৌখিন জিনিস কেনা যায়—যদিও তাহাদের সে প্রকার দাম অবশেষে নিতান্তই মহার্ঘ্য।

বেনিদিকো ক্যাস্টিগলিনো অবশ্য কবি ইতিমধ্যে। যে প্রকার হয়, কিছুদিন নানা পত্রিকায় কবিতা লেখা এবং যথাকালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ শেষে সে অসন্তুষ্ট বটে। একদিকে এই কিছু করিলাম

না, অন্যদিকে এমতো কিছু করিতে চাই যে কেহ পারে নাই এ দুই তরঙ্গে মর্মান্তিক দোলায়িত থাকাকালে কবি এট্‌স ও কেল্‌টিক কাব্য-আন্দোলনেব সহাবস্থানের হঠাৎ-আবিষ্কাবে একদা সে মথিত হয়। তারপর অসন্তুষ্ট ও মথিত সে নবনব প্রতীক সংগ্রহ ও দিশালাভের চেষ্টায় আত্মমুখী হয় যে তাহা তো খুবই স্বাভাবিক। কে না জানে বিলিয়াম বাটলার এট্‌স হয়তো বা এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিনাম অথচ সে সব পাহাড়, হ্রদ, প্রভৃতিতে বর্তমান রূপে প্রতিভাত সে অকায় বিষয়গুলি এট্‌সের কালে কিংবা তাহাব পূর্বে এমনকি কদাপি ছিল কি? সে এক কবি কল্পনাই এবং তাহাই মাত্র যাহা সেই নীবব, কিংবা হয়তো বা কদাচিৎ পক্ষীকূজন অথবা পক্ষ-বিধূননে ঈষৎ আন্দোলিত স্পন্দিত, হ্রদ তড়াগ পাহাড়কে অদৃশ্য থাকিয়াও জনাকীর্ণ কবে এবং যাহাদের পারস্পরিক অবস্থান, আকর্ষণ ও প্রতিহনন সে কবি এট্‌সের কাব্য আন্দোলনের মৃগমদ। ইহাও কি আর বলা দরকার করে যে সে কেলটিক কাব্য আন্দোলন সবই মিথ্যামূলক এবং সে মারফৎ কিছু কিছু সিম্বল আদায়ই একমাত্র সত্য। কেহ বলিবেন তৎকালে আইরিশ দেশপ্রেমের বন্যায় কেলটিক কাব্য আন্দোলন জলবিম্ব সকল ছিল।

উপরন্তু অস্কার ওয়াইল্ডের মতও প্রণিধান করার মতো। শিল্প যে অনুকরণ মাত্র নয় যে যাহা আছে তাহা লিখিবে, পবন্তু শিল্পী লিখিতে গিয়া যাহা কল্পনা করে তাহাই বর্ণনীয় বিষয়ের স্বরূপ হয়, এবং তাহাই আছে জানিবে। এদিকেও দেখ, ইতিহাসের অমোঘ বিধানেই যদি সেই মহাপরিবর্তন আসে তবে তো এত সংগ্রাম, এত রক্তপাত, এত বিপ্লবের কোনো প্রযোজনই থাকে না, ইতিহাসেব গতিতে ভাসিলে চলে। তুমি যাহা ঘটাইবে তাহারই তো মূল্য আছে।

বেনিদিকো এখনও এই নতুন পর্যায়ে অনেক কবিতা কাগজে বসায় নাই। রোমান্টিক আন্দোলনে যেমতো কবিরা গদ্যে অনেক মুখবন্ধে নিজ নিজ বিশেষ ধরন-ধারণের কথা বলিযা থাকেন, বেনিদিকো সেরূপ গদ্যে কিছু কিছু লিখিযাছে। নমুনা দিই সেই গদ্যেব।

ইহা ১৬৯৪ আমাদের প্রভুর বৎসর যাহাতে এরূপ ঘটে। সেই সমুদ্রযাত্রায় আমি আমার দ্বীপের নতুন কলোনিকে দর্শন দিলাম, আমার উত্তরাধিকারী ইস্প্যানিয়ার্ডদেরকে দেখি, তাহাদের জীবনের সমস্ত গল্প এবং তাহাদের ও যে বদমাইশদের রাখিয়া গিয়াছিলাম তাহা শুনি, কিমতে তাহারা বেচারা ইস্প্যানিয়ার্ডদিগে অপমান করে, কিমতে বা তাহারা ঐক্যমত, দ্বিমত, একত্র ও বিচ্ছিন্ন হয়, এবং কিমতে ইস্প্যানিয়ার্ডগণ তাহাদের সহিত বল ব্যবহারে বাধ্য, কিমতে তাহারা ইস্প্যানিয়ার্ডদিগেব অধীনত্ব পায়, কত না সততায় তাহাদের সহিত ইস্প্যানিয়ার্ডগণ আচরণ করে, সে সকল এক ইতিহাসই, যদি লেখা হয়, যাহা আমার অংশের মতোই বিচিত্র আশ্চর্য ঘটনায় পূর্ণ, বিশেষ তাহাদের যুদ্ধ সকল ক্যারিবগণের সঙ্গে যাহারা কয়েকবারই এ দ্বীপে অবতরণ করে, এবং কি মতে তাহাদের পাঁচজনায় মূল ভূভাগে এক অভিযান করে, আরও এগার পুরুষ ও পাঁচ স্ত্রী বন্দী আনে যাহাদের দ্বারায়, আমার আসার কালে, দ্বীপে বিশটি শিশু দেখিলাম।

এথায় এ যাত্রায় আমি প্রায় বিশ দিন যাপন করি, এবং তাহাদের নিমিত্ত সব রকম প্রয়োজনীয় বস্তুর এক চালান ছাড়িয়া আসি, বিশেষ বন্দুক ইত্যাদি, বারুদ, গুলি, পোশাক, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এবং দুই যান্ত্রিক যাহাদের আমি ইংলন্ড হইতে সঙ্গে আনি, যথা এক ছুতার ও এক লোহার। ইহা ছাড়াও, আমি তাহাদের সহিত দ্বীপটি অংশভাগ করিয়া লইলাম · গোটা দ্বীপের মালিকানা আমারই রহিল কিন্তু তাহাদিগকে সেইসব অংশ দিলাম যাহাতে তাহারা রাজী, এবং তাহাদিগকে দ্বীপে থাকিতে নিযুক্ত করিলাম।

অতঃপর আমি ব্রাজিল স্পর্শ করি, যেথা হইতে আমি পাঠাই এক নৌকা, যাহা সেখানে কিনি, আরও অধিক মানুষসহ দ্বীপে, এবং তাহাতে নানা দ্রব্য-সামগ্রীর উপরন্তু সাত স্ত্রীলোক পাঠাই যাহারা

যেমতো যে কাজকর্মের উপযুক্ত অথবা তাহাদের স্ত্রীরূপে গ্রহণেরও উপযুক্ত যাহাদের সে মতি হয়। ইংরেজগণের সম্বন্ধে এই যে তাহাদের ইংলন্ড হইতে কিছু স্ত্রীলোক পাঠাইব এমতো প্রতিজ্ঞা করি এবং প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য-সামগ্রীও যদি তাহারা আবাদে মন দেয়, যেমন পরে আমি করি বটে, এবং এই মানুষগুলি অধীনতায় আসিবার পর, বিশেষ সৎ এবং বিশেষ পরিশ্রমী হয এবং নিজের সম্পত্তি সামবন্টন করিয়া লয়। ব্রাজিল হইতেই পাঁচটি গাই, যাহারা ভরন্ত ছিল, কিছু ভেড়া, কয়েকটি শূকর পাঠাই যাহাবা, আমি যখন আবার ফিরিযা আসি, তখন বিশেষ বৃদ্ধি পাইযাছিল।

পাঠক লক্ষ্য করিবে ইহা এই মতে ডিফো সাহেবেব সেই পুস্তকের শেষ চাবি অনুচ্ছেদে বলা হয় এবং এ সমস্তই বড়সাহেব ববিন্সন ক্রুশো সাহেবের জবানিতে লেখা ; কিন্তু ইহাও লক্ষ্য কব এই আমি ফ্রাইডে আমাকে যাহারা সম্বন্ধে সাহেবের এত নাকি প্রীতি এত সস্নেহ বিশ্বাস তাহার জন্য তিনি কিছুই কি করিলেন? একটি ছত্রেও কি, হায়, ইঙ্গিত পাও আমি জন মাইকেল ফ্রাইডে এক ছটাক জমি, কি একটি ছাগল কিংবা তাহাব আনা একটি স্ত্রীলোকও পাইলাম? হায়, ইংরেজ সেই থাকে। অপর কেহই ইংবেজ হয না।

পাইয়াছিলাম বটে। যেদিন তিনি তাঁহাব নামে নাম রবিন্সন ক্রিকে লংবোটে চডিলেন, ইস্প্যানিযার্ডগণ মুহুর্মুহু কামান দাগিল এবং তাহাব সেই স্বজাতীয় শয়তানদের কয়েকজন কিছু দূরে থাকিযা গোরার বাদ্য বাজাইল আমি তখন অত্যন্ত পেট কামডেব ভান কবিযা তাঁহাব গুহা-দুর্গে শুইযা উঁ আঁ প্রভৃতি কবিতে থাকি। আমার জন্যই বড়সাহেব জাহাজে চডিয়াও কিছু দেবি করিয়া থাকিবেন। অবশেষে জাহাজী কামানও দুইবার দাগে।

সে যাহা হউক, জাহাজ তো দিঙ্‌মণ্ডলে বিলীন, আমি কিন্তু তথাপি পডিয়া রহি কেন না আমি আপন প্রভুব সহিত যে শাঠ্য করি তাহা অনুশোচনাব দ্বাবাই শাঠ্য না করা অপেক্ষা ভালো কিছু হয় এরূপ দৃঢ়বিশ্বাসই আমার কৌশলেব মূলে ছিল। একদিন একরাত্রি তো পডিয়া রহিলাম এবং বারংবার বলিতে থাকিলাম আমি শাঠ্য করিয়াছি এবং অনুতাপ এখন কবি, কেননা তুমি, হে প্রভু, মুহূর্তমাত্রে যে আলোক হও বল এবং আলোক হয়, যে শয়তানকে থাকিতে দেও এবং এককালে বধ কব না, যেহেতু অনুতাপ অনুশোচনা দেখিতে চাও সুতরাং এখন তুমি আমা-হেন অপরাধীকে অবশ্যই ক্ষমা কব, পথ দেখাও এবং আহার্য দিতে থাক।

এমতো প্রকারে অনেক কান্নাকাটি ও হাত মোচড়াইবার পর আমি শয্যা ত্যাগ করিলাম। দেখিলাম ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা মঞ্জুর করিয়াছেন, কাবণ কিছুরই তো অভাব নাই : যথেষ্ট কিশমিশ, বার্লি, চাপাটি এবং শুষ্ক ছাগমাংস এবং ছাগদুগ্ধ পনির ইতস্তত লক্ষ্যে আসিল।

কী করিব, কীরূপেই বা উদ্ঘাটিত হই। আমি কি যেন বড়সাহেবের আমমোক্তাব? এক দীর্ঘ রৌদ্র-উদ্ভাসিত কাল চিন্তায় কাটে। অথবা কি আমি এঃ দ্বীপের গবর্নর যেরূপ বড়সাহেব বিদ্রোহী জাহাজীদের নিকট উপস্থিত হইয়া কার্য করেন। এক দীর্ঘ রৌদ্র-উদ্ভাসিত কাল চিন্তায় কাটিয়া গেল।

তার পবদিন আর প্রভাত হইল না। মেঘগুলি হয়তো বা রাত্রির অন্ধকারে যাত্রা শুরু করিয়াছে. সূর্য শত চেষ্টাতেও তাহাদের ছাড়াইয়া আসিতে পারে না। সারাদিন এরূপে গেল। মই দুইটি রহিয়াছে তো, কিন্তু প্রথমে একটি রাখিয়া পাহাড়ের জিহ্বায় উঠিয়া দ্বিতীয়টির সাহায্যে পাহাড়ের চূড়ায় উঠিব যে সবকিছু যে দেখি এরূপ উপায় ছিল না।

সুতরাং শয্যায় শয়ন করিলাম। কিন্তু হঠাৎ মনে হইল একটি বা একাধিক দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। গুহা বড়সাহেবের কল্যাণে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার শেষপ্রান্তে মদের ভাঁড়ার। সেখানে একটা কি ছাগল কোনো প্রকারে স্থান লয়? চমৎকৃত হইলাম কেননা বড়সাহেবেব নিকট শুনিয়াছি অন্য এক অন্ধকার গুহায় এব বৃদ্ধ ছাগলকে এরূপ শ্বাস ছাড়িতে শুনিয়া প্রথমে ভয় পরে বিস্মিত, শেষে

অলৌকিক এক অনুভূতিতে তিনি আচ্ছন্ন হইয়া থাকেন।

তদ্বৎ হয়। দেখি কি যে মদের সেই কিম্ভূতকিমাকাব জালাগুলির মধ্যে আত্ম-নিবিষ্টা একে নবযুবতী অপরে অধিক প্রস্ফুটিতা স্ত্রীলোক। তৎকালে সত্যরূপে প্রত্যয় হয় যে নবযুবতীগণকে সেরূপই মনে হওয়া উচিত যেহেতু যৌবন নামক যাহায় তাহাদের সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন তাহা ভেদ করা যায় না, অথচ সদ্য অপগত সেই আচ্ছন্নতা যাহাতে তাহাকে অভিজ্ঞা, স্থিতিশীলা, হার্দ্যা, গভীরা এবং যে দুঃখ দূর করে এমতো মনে হয়।

কিন্তু কে ইহারা, কোথা হইতে আসিলই বা? এমন অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে থাকি আমি জন মাইকেল ফ্রাইডে। অবশেষে বুঝিতে পারি তাহারা সে সাত জনেরই একজন যাহাদের ব্রাজিল হইতে বড়সাহেব পাঠান যাহারা এরূপ ছিল যে বড়সাহেব যাহাকে যে কাজের উপযুক্ত বিবেচনা করেন, অথবা যে স্ত্রীরূপে লইতে পারে যে কেহ সে প্রয়োজন বোধ করে। এবং তাহার পর বড়সাহেব সবগুলিকে বণ্টন করেন এমন সময় পান নাই অথবা হাতের পাঁচ হিসাবে রাখিয়াছিলেন ; ইহাও সত্য যে অতিশয় হিসাব করিয়া ভবিষ্যৎ দেখিতে অভ্রান্ত ছিলেন, যে অবশেষে তাড়াহুড়া করিয়া জাহাজে চাপিতে সময়ে ইহাদিগকে একেবারেই বিস্মৃত বা হন। হাঁ, বড়সাহেব ক্রুশোব ইহা এক পরিচয়-চিহ্নই যে জাহাজ দেখিবামাত্র স্বদেশ ফিরিতে ব্যস্ত যেন এতদিন যে দ্বীপে বাস করা হয় সে সবই স্বদেশ যাত্রার জন্য নৌকা প্রস্তুত করিতে কিংবা কবে কোন্ জাহাজ কাছে আসিল তাহা লক্ষ্য রাখিতে, এবং এত ব্যস্ত যে তখন কী কোথায় পড়িয়া রহিল তাহাও দেখেন না।

কে ইহাবা কোথা ইহাতে আসিলই বা? তাহাতে এরূপ কিছু নিশ্চিন্ত হইয়া জন মাইকেল আমি চিন্তা করিতে থাকি ইহারা কী কী কাজের উপযুক্ত এবং কোন্‌টিই বা কোন্ কাজের। এরূপে ক্ষণে ক্ষণে চিন্তা করিতে থাকে। হয়তো দৌত্যের কাজে লাগে, হয়তো কাহাকে উপহার দেওয়া সম্ভব এবং পণ্যও হইতে পারে।

কিন্তু যে বর্ষা ছাড়িয়াও ছাড়ে না। সূর্য উঠিয়াও উঠে না। এক প্রকার আলস্য বোধ হইতেছিল শয্যায়। এবং আরামদায়ক সে সেই প্রকার আলস্য যখন পুরুষ অন্য এক প্রকারের মানুষ-জাতীয়কে রক্তে অনুভব করে। সুতরাং জন সে দুইকে তাহার শয্যাপ্রান্তে ডাকিল এবং অনেকক্ষণ এক হইতে অপরকে লক্ষ্য করা শেষে নবযৌবনবতীকে মদের ভাঁড়ারের অস্থায়ী আবাসে ফিরিতে বলে এবং অপরকে শয্যাপার্শ্বে বসিতে আহ্বান করে। তৎক্ষণাৎ জন আবিষ্কার করে অপরা, সে সুন্দরীও বটে যদিবা কিছু ক্লান্ত, দুগ্ধবতী। সুতরাং ব্রাজিলে নৌকায় তুলিতে তাহার বাচ্চা যে কোনো কারণেই হউক স্তনভ্রষ্ট হইয়াছে। অথচ সে আকারে-প্রকারে ইস্প্যাগনিয়ার, হয়তো বা ক্রিওল, কিন্তু কিছুতে ক্যারিব হয় না। পরন্তু জন মাইকেল ফ্রাইডের নিকট সেই অপরা খুবই প্রীতিপ্রদা হয়।

কিন্তু বেনিদিকো ক্যাস্টিগলিনো যেন একই সঙ্গে সবটুকু জানে কিন্তু কিছু মাত্রই বলিব এই কৌশলে লিখে। যেন পাঠককে ভাবিত রাখিয়া কৌশল। কিছু ফুটকি দিয়া, যেন ছাপাখানার সেই ফুটকি বিন্দুগুলি প্রকৃতই কালবিন্দু এবং সেই তাহাতে চোখ বুলাইয়া কালকে অতিক্রম করা হয়, অতঃপর বেনিদিকো কি করিয়া দুর্গ হয়, কী রূপেই বা দুর্গের তিন হাজার ফুট উচ্চ পর্বতবেষ্টনীর এখানে-ওখানে সেই কয়েক হাজার পাউন্ড ওজনের কামানগুলি স্থাপিত হয়, ফ্রাইডেই স্থাপনা করে কেননা সেই তো তখন ক্রমে দ্বীপের প্রেসিডেন্ট, তাহা বর্ণনা করে। কিন্তু যখনই মনে হয় এইবার দুর্গ কী হইল, কীইবা সে প্রথম প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি বলিতে থাকিবে তখনই ক্যাস্টিগলিনোদের সে ফুটকি-বিশারদ বেশ তিন-চার লাইন ফুটকি বসাইয়া য়ুরোপীয় শ্বেতকায়গণের নরমাংস ভক্ষণের কথা বলিতে শুরু করে। পাঠক চমকিত হও কেন? বেনিদিকো এইরূপ বলে :

কেননা একদা যখন ফ্রাইডে দিগন্তে দূরবীন প্রক্ষেপ করে, (এরূপ বড়সাহেব ক্রুশো করিত), তখন সহসা সে দেখিতে থাকে, (এবং তাহার মতো অভিজ্ঞই বা কে?) যেন সেই দৃশ্যই বা যে সেই সমুদ্রসৈকতে অগ্নি, বন্দী মানুষ, অপরাপর উৎসবকারী মানুষ সহযোগে অঙ্কিত। এতদিনে কি দুষ্ট ক্যারিব আবাব আসে অথবা আবারও কি অ্যাটকিন্‌গণ বিদ্রোহ করে যেহেতু, দেখ, নৌকাটি তো ইতিমধ্যেই সৈকতে টানিয়া তোলা। অথবা পৃথিবীতে বিস্ময়ের অনেক কিছু থাকিলেও সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কী তাহা কেহ অদ্যাবধি জানে নাই। সূর্যের নিচে নতুন কিছু ঘটে না।

জন মাইকেল ফ্রাইডের কোমরে পিস্তল ও খাপ ছাড়াই তরবারি, দুই কাঁধে দুই বন্দুক এবং সে বাচ্চা জন মাইকেল ফ্রাইডেকে এক মাস্কেট এক বন্দুক সঙ্গে সঙ্গে আসিতে বলিয়া বিশেষ দ্রুতগতিতে অগ্রসব করে এবং সেদিকেই যেখানে বন্দীসহ নৌকাটিকে টানিযা তুলিতে দেখিল।

খানিকটা পথ যাইতে হইবে এবং জনচক্ষের আড়ালে থাকিবার নিমিত্ত সে পথ সমুদ্রসৈকতের বালুর উপরে সুতবাং তাহাদেব তাদৃশ গতি অচিবে কিছু ঢিমেও বটে। এ সুযোগে দুই বিষয় যাহা বেনিদিকো-সংগৃহীত ফ্রাইডে নোটসে দেখা দেয় না সে সম্বন্ধে চিন্তা করিব কি? জন ফ্রাইডে কি পুলিশ ডাকিল না, না ডাকিলে কেনবা সেরূপ ডাকিল না, এবং কেইবা এই বাচ্চা জন মাইকেল ফ্রাইডে? পূর্ববর্ণিত দুগ্ধবতী অপরাকে নির্বাচনেব সূত্রে বাচ্চা জনকে স্থাপন কবা যায়, কারণ সে প্রজাবতী যে হইবে সে বিষয়ে নিশ্চয়তা তো ছিলই, এই মাত্র শুধু বলা প্রযোজনেব যে ফ্রাইডে পেট-কামড় অজুহাতে গিরিগুহায স্থান পাইবাব পব অন্তত বিশ বৎসবই বা ফুটকিগুলি সূচনা করিযা থাকিবে। কিন্তু পুলিশের কী হইল, অথবা প্রথম প্রেসিডেন্ট ফ্রাইডেব এক্তিযাব কি তাহাব গিবিগুহাদুর্গে আবদ্ধ ছিল?

মাত্র দুই শত গজ দূবে এক লতাগুল্মেব ঝোপের পিছনে থাকিয়া ফ্রাইডে দেখিতে থাকিল। তাহার চক্ষে পলক নাই, যেনবা নিশ্বাসও পড়ে না। এক বন্দুক মাটিতে অপর তাগ করিয়া তাহার হাতে। বাচ্চা ফ্রাইডে কস্মিংশ্চিৎ কালে মানুষ পুড়াইয়া খাওযা দেখে নাই। সে বুঝিতে পারে না কেনই বা খোঁটা, কেনই বা তাহার কাছে এত শুকনা লাকড়ি এবং কী উদ্দেশ্যে বা এ দুই সাহেবকে পিছমোড়া বাঁধিয়া অদূরে বালুর উপবে উবুড় করিয়া রাখা যেন যাহাতে প্রতি নিশ্বাসে নাকে বালু যায়। কিন্তু আসল জন ফ্রাইডে চিন্তা করিতে থাকে যেমন নাকি সেই বড়সাহেব ববিন্সন করিয়াছিল বলিয়া ডিফোতে লিখে। (সরকারি সংস্কবণ ১৭১ পৃষ্ঠা দেখিবে)।

আমার কী অধিকার বা প্রয়োজন ইহারা অপরাধী মতে ইহাদিগের বিচারক ও ঘাতুক হই যে যাহাদের ঈশ্বর অনুমতি করেন এত যুগ ধবিয়া অশাসিত থাকিতে, চলিতে, এবং একে অন্যেব ঘাতুক হইতে। আর আমি কী ভাবেই বা জানি ঈশ্বব নিজে বা এবিষয়ে কী বিচার করেন? ইহাই নিশ্চিত হয় যে এই মানুষেরা এইগুলিকে অপরাধ করে ঘটায় না, অথবা আপন আপন বিবেকদষ্ট হইয়াও নহে এবং তখন আপনার আলোতে তাহাবা তিরস্কৃতও হয় না। তাহারা এই অপরাধ হয় যে সে জানে না যাহাতে ঈশ্বরের বিচার লঙ্ঘন করে অথচ আমরা যেমতো বহু বহু করি। অপর, এই মানুষ সকল, আমি যেমতো চিন্তা করি, সেই ক্রিশ্চিয়ানদিগের অপেক্ষায় যাহারা নাকি যুদ্ধ-ধৃত তাবৎ বন্দীকে বধ করে, তুলনাতে এমন কিছু অধিকতর খুনী হয় না, অথবা তাহাদের তুলনাতেও যাহারা পরাজয় স্বীকার করে এমন পুরা সৈন্যদলকে তরবারির মুখে ফেলে যদিও তাহারা তৎকালে আপন আপন অস্ত্র ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে থাকে।

পরন্তু ইহারা কদাপি দুষ্ট ক্যারিব নহে, ক্রিশ্চিয়ানই হয় বা। এদিকে তো বন্দীদ্বয়কে উঠাইয়া খোঁটায় বাঁধা হইল, শুকনা লাকড়িতে তাহাদের কোমর পর্যন্ত ভালোভাবে ঘিরিয়া দেয়াও হয়। তাহারা

কাঁদে, হাহাকার করে এবং অন্য কোনোরূপে নিষ্কৃতির উপায় নাই, যেহেতু হাত-পা মোটা শক্ত যে দড়িতে বাঁধা তাহারই দু-তিন ডোরে বুক পেঁচাইয়া খোঁটায় জড়ানো, সেহেতু অবিরত এদিক-ওদিক মাথা চালে যেন ধোঁয়ায় যে নিশ্বাস বন্ধ হয়, চোখ জ্বালা করে যে তাহা এড়ানোই তাহাদের কাছে সর্বাপেক্ষা জরুরি, কেননা ইতোমধ্যেই আগুন লাগানো হইয়া যায়।

হাঁ, ইহাই তাহাদের রীতি। ফ্রাইডেব পৈতৃক ক্যারিব জাতিতে, তাহাদের সেই সব শত্রুদিগের অন্য ক্যারিব জাতিতেও কাঠের তরোয়ালে শিবশ্ছেদ করে, পরে পুড়ানো হয়। হয়তো এই প্রকারে রক্তপাত না হওয়াতে দগ্ধ মাংসের স্বাদও অন্যপ্রকার অথবা হয়তো ইহাই সভ্য মানুষের রীতি।

কিন্তু এই যে উহারা কী করে অন্তত বিশজন উলঙ্গ নয় এমত সাহেব যাহারা নাচে, গায়, লাকড়ি ঠিকমতো জ্বলে কিনা দেখে? অকস্মাৎ এ কী যে টি ডিউম লডেনুস শোনা যায় যে! এবং আভে মারিয়াও গায়িতেছে বা।

বাচ্চা জনের দুই হাতই নিশপিশ করে। নিদারুণ এক বিবমিষা ও এক মূত্রবেগ তাহাকে একই কালে মথিত করিতে থাকে। সে সেই প্রথম বাপের অবাধ্য হইল। সে তাহার মাস্কেট যাহাতে প্রচুর পরিমাণ সোয়ান শট পুরা থাকে দাগিয়া দিল, এবং তখন কার্যকারণবাধ্য ধাড়ী জন, আহে তোমরা কী কর, একেবারে পুড়িয়া গেলে খাওয়া যায় না, অথবা শ্বেতকায়েরাও পরস্পরের মাংস খায় ইহাই বুঝিলাম ইত্যাদি নানাপ্রকার চেঁচামিচিতে এবং দুই দুই বন্দুকের চিল্লাচিল্লিতে শব্দায়মান হইয়া বেগে সংগীতকারীদের মধ্যে নিপতিত হয়। এবং দু-চার মিনিটে এরূপ হিসাব পাওয়া গেল : বাচ্চা জনের প্রথম গুলিতে মৃত এক, আহত এক ; ঐ দ্বিতীয়ে আহত দুই ; ধাড়ী জনের দুই দুই বন্দুকে আহত ছয় ; ধাড়ী জনের পিস্তলে মৃত এক ; ঐ চওড়া তরোয়ালে আহত দুই। খুবই গোলমাল শুরু হইল। যাহারা মৃত তাহারা তো বাঁচিয়াই গেল। আহতদের জল দাও, হে ঈশ্বর রক্ষা কর, হে প্রভু তোমার কাছে আরও কাছে এবং বন্ধু, তোমার প্রয়োজন আমাপেক্ষা অধিক ইত্যাদি মহৎ চিৎকার চেঁচামিচিতে আদত জন মাইকেল ফ্রাইডে কিংকর্তব্যবিমূঢ় যখন তখন হঠাৎ সে লক্ষ্য করে বাচ্চা জনকে চোখে পড়ে না।

নানারূপ চিন্তায় মিস্টার ফ্রাইডে শনৈঃ নৌকার দিকে অগ্রসর হয় যাহা প্রায় দুই শত গজ দূরে এবং হয়তো বা বাচ্চা জন সেদিকেই যায়। তৎকালে সে এ চিন্তাও করে ছত্রভঙ্গ যাহারা তাহারা কি দ্বীপেই দলবৃদ্ধি করিবে অথবা ইহারা সিবাস্টিয়ান ক্যাস্টিগলিনো পরিবারের পুরুষেরা? তবে কি আবার তাহার ইস্প্যানিয়ার্ডদিগের সহিত জাতিশত্রুতা রোপিত হয়। অথবা যেরূপ যখন হয় সেরূপ তখন করি, আপাতত নৌকাটিকে অধিকার দরকার...

কিন্তু ক্যাস্টিগলিনোদের সেই বেনিদিকোর গদ্যরীতির বিশিষ্টতা ফুটকিমাত্রে সীমিত থাকে না। তাহা যখন যেন পাতা-হারানো বইএর মতো তারপর কী এই প্রশ্নে খণ্ডিত নয় তখন ইতিহাসের সন তারিখ সমেত ঘটনাবলিতে এমন প্রবিষ্ট যে যেন কোন্‌টি অতীত, কোন্‌টি বর্তমান, কোন্‌টি অথবা ভবিষ্যৎ তাহা জানিতে উপায় থাকে কই? এক্ষেত্রে সে দেখায় পশ্চিম গোলার্ধে যে শেষ জীবন্ত দগ্ধানো হইয়া থাকে তাহাতে জ্যামাইকা, সেনডমিনগো কিংবা কিউবার দাবি অপেক্ষায় আমাদের এই দ্বীপের তাহা কিছুতে কম নয়। সে বিষয়ে সে কয়েকজন ডক্টরের ধার্মিক-দগ্ধানোর ইতিহাস পাশাপাশি স্থাপিত করে তাহার বিবৃতিতে এবং নির্বিশেষে প্রমাণ করে সেই যে ধার্মিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শেষ মানুষ পুড়ানো তাহার গৌরব এই দ্বীপের এবং মাত্র তাহারই। এখন এই বেনিদিকো-স্টাইল যাহা তাহারই চরিত্র সে কতখানি তাহার সত্যের অনুসন্ধিৎসা কতখানিই বা অ্যাটকিন্‌সনের ট্যুরিস্ট ব্যুরোর প্যামফ্লেট ও ব্রশুর বিভাগের শ্রম তাহা জানা কঠিন হয় এজন্য যে, যেটুকু যাহা আছে সে ট্যুরিস্ট ব্যুরোর প্যামফ্লেটে যা যেন ভাসমান বরফ-চাঁইয়ের তিন অংশে

যাহাকে দেখিতে উপায় নাই।.উপরন্তু বেনিদিকোর ম্যানস্ক্রিপ্টের জন্য ট্যুরিস্ট ব্যুবো আমেরিকার মুদ্রায সাড়ে সতেরোশো ডলার গণিয়া দিয়া থাকে। অন্যদিকে যদি ফ্রাইডে নোটস নামে পৃথক পুস্তক থাকিত তাহা কি তবে সান্ত সীমাবদ্ধ হয় না সে কি তাহার পরও দূরস্থিত, অনির্দেশ্য, ক্রমশ বর্ধমান সুতরাং জীবন্ত কিছু থাকে? একমাত্র ব্যতিক্রম একবারই দেখা দেয়। সে পরে বলি।

সে যাহা হয়, নোটস প্রকাশের পর এক স্থান নির্বাচন করিয়া চার-পাঁচ হাত সমুদ্র-বালু সরাইতেই অগ্নিদগ্ধ লাকড়ি ও পোড়া বালু ও মানুষেব হাড় পাওয়া গেল। প্রথমে তিন তিন বিরাট কাচের বুদ্বুদ্বৎ গ্লাস ডোম বসাইয়া তাহাতে এ সকল দগ্ধাবশেষ রাখার প্রস্তাব আসে। কিন্তু পরে অনেক সাত-পাঁচ ভাবিয়া এক প্রস্তর প্লাস্টিক-স্বচ্ছ সমাধিতে অস্থি লাকড়ি সকল রাখিয়া পার্শ্বেই ফেরো কংক্রিটে উনিশ ফুট উচ্চ ক্রস যে তোলা হয় সেও সুদৃশ্য। এবং দেখিবে ভ্রমণকারীরা লাইনবদ্ধভাবে হংসচলায় চলিয়া সেই স্বচ্ছ সমাধি দেখে।

কিন্তু যে বলা হয় জন জোয়াকিম ফ্রেডা এবং সেইমাত্র সে বা কী?

বেনিদিকো ক্যাস্টিগলিনো যদি ক্যারাকাস বিশ্ববিদ্যালয়েব ছাত্র জন জোয়াকিম তবে কর্নেলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সফোমোর। ইতোমধ্যে সে আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় খেলাধূলায় জ্যাভেলিন ছোঁড়াব বিভাগে প্রতিনিধি ও উজ্জ্বলতম আশা।

তাহা এক কবোষ্ণ সমুদ্রবেলা। নানা প্যানেলে নানা রংএব সিল্কযুক্ত যে বিরাটাকার ছাতা তাহাদেব দিনমানের খরতাপ নিবারণ করে, দুজনের এক সুন্দর নানা কৌটায় আধাবস্থ লাঞ্চের পক্ষে যথেষ্ট তাম্বুও হয় যে এখন দিন শেষ হয় হয় এমতে ঈষৎ হেলানো। তাহারা ততক্ষণই সাঁতরাইযাছে যতক্ষণ না গায়ের তাবৎ গ্রিজ সেই অবিবত ধাবমান মৃদু গর্জনশীল সৈকতে ক্রীড়াবত ঢেউ-সকলে ধুইয়া যায়। পরে সে তাহাব কাঁধে কবিয়া ছাতায আসিযাছে। নিশ্চিতে কিছুমাত্র যে দৃষ্টিকটু নয়, কারণ এখানে-ওখানে এমন অনেক ছাতা তো দেখিবেই, উপরন্তু অনেকে বিকিনি-আবৃতা শায়িতা এবং অন্য অনেকে কাঁধে উঠা অবস্থায় সস্নেহে নীত হয দেখ। সে পুরুষ ছাতার পার্শ্বে শুভ্র বালুতে এখন এরূপে কাত যে যাহাতে যে হাতের কুনুই বালুতে ঈষৎ প্রোথিত তাহাব করতলেই তাহাব মাথা এবং সে স্ত্রী তাহার নাভির নিকট এরূপ ঘনিষ্ঠ যাহাতে তাহার ভিজা বিকিনি পুরুষেব নাভিতে ও উন্মুক্ত উদরে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করে। আধো আধো স্বরে ললনা বলিয়া চলে দুজনের খরচা একের খরচের তুলনায় অনেক কম তাহা কি সে বিশ্বাস করে না? সে তো অন্য কেহ নয়, তাহার অ্যাপোলো।

হায়, তাহার স্পর্শ নিশ্চিতেই তাহার নাভিমূলে ওলোটপালোট খায় যেন-বা তাহা লটকান জাতীয় এক পায়রার স্বপ্ন অথচ সে কী করে, কেননা সে ললনা শ্বেতকায় ইয়াংকিনী আর সে নিগ্রো— জাতীয়দেরই একজন মাত্র যে লিঞ্চিংকে ভুলিলে আব কিছু বা মনে রাখিল? খোঁটায় বাঁধিয়া না পোড়াক, গায়ে সবুজ, কালো নানা আঠালো তেল রং লাগাইয়া তাহাতে তুলা দেয় না কি যখনই সেরূপ একের খরচায় দুইজনের চলার সংবাদ প্রকাশ পায়? হায ম্যাকব্রাইড কেন বা তোমার এমন মতি! আর সেই যে তাহার ফ্রেডা কাস্‌ল সেমতো নিঃসঙ্গ, ধূসর, নির্বীজ, সাঁতা জায়গাই বা কোথায় যেখানে সে তাহার নিজ পদধ্বনির প্রতিশব্দ মাত্রই শোনে এবং এক মাসিক বৃত্তি মাসের কোনো এক দিনে যাহা অ্যাটকিন্‌সনের দপ্তরে সংগৃহীত হয় এবং যাহা কেন ও কোথা হইতে তাহাও সে জানে না যাহাতে দুই পুরুষ পরিচারক নির্ভর সে একের পর এক দিবসগুলিকে নৈঃশব্দের তড়াগে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলে।

কিন্তু তখন সে মিসেস ম্যাকব্রাইড এরূপ বলিতে থাকে যে ওগো আমাব অ্যাপোলো আমার সুন্দর এঞ্জেল তোমাকে দেখিয়া আমার আঁখি ফিরে না। দেখ তুমি এক সুন্দব মানুষ, পরিপূর্ণভাবে

সুগঠিত, ঋজু যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, খুব প্রকাণ্ডও নয়, উচ্চ এবং একহারা এবং মনে করি বয়স হয়তো বা ছাব্বিশ। তোমার মুখমণ্ডল অতিসুন্দর, রুক্ষ নয়, কঠোরও নয়, অথচ কীবা পৌরুষ নিছনি। বিশেষ যখন হাসো তখন য়ুরোপীয় মুখের মাধুর্য ও কোমলতাই ফুটিয়া উঠে। দেখ তোমার চুলগুলি কালো লম্বা যাহা মেষ-পশমের মতো কুঞ্চিত নয়। ওগো, দেখ তোমার কপাল উঁচু ও প্রশস্ত, নাক ছোট কিন্তু চ্যাপ্টানো নয়। আর তোমার গায়ের রং ঠিক কালো নয় অথচ গাঢ় হলুদও নয়, বরং এক উজ্জ্বল অলিভ তেলের রং। আর তোমার এই মুখ, এই মুখ, এই ঠোঁট দুটি যা পাতলা আর আঃ কি মধুর, এই দাঁতগুলি যা প্রত্যেকে সুস্থিত সুগঠিত গজদন্ত শুভ্র। অতঃপর সাদা টোয়ালিয়া গায়ে ম্যাকব্রাইড রমণী সাঁতাত বিকিনি মুক্ত হয় আর তাহা পড়ন্ত রোদে ছড়ায়। জন জোয়াকিম ফ্রেডা শর্টস গেঞ্জি পরা শেষে জুতা পরিতে থাকে আর তখনই অকস্মাৎ আচম্বিতে সে হঠাৎ স্তম্ভিত যে যেন এ কি অন্য কেহ অপর কাহাকে বলে। অথবা যেন স্মৃতিই তাহাকে কাড়ে। আর তা হয়ই না বা কেন? সে কি দ্বৈপায়ন নয় এবং ডিফো সাহেবের সেই মহা-গ্রন্থের সরকারী সংস্করণ কি তার একের অধিক বার পড়া নাই? দিবস সন্ধ্যায়, তাহার পরে সন্ধ্যা মোম-আলোকিত পোশাকী আরশির সম্মুখে ডরমিটরি-আবদ্ধ রাত্রিতে পরিণত হয়। তখন জন জোয়াকিম ফ্রেডা যেন আত্মমগ্ন হইল আর আরশিতে নিজেকে দেখিতে হঠাৎ এক প্রচণ্ড বিস্ময়ে আপ্লুত সে এমন স্বগতোক্তি করিল যে তা কি অভিশ্রুতি এবং তাহাই মাত্র যে সে জন জোয়াকিম ফ্রেডা, যে ফ্রাইডে, ফ্রেডে পরে ফ্রেডা হয়। কারণ এ রূপেই তো, ডিফো সাহেব যেমন বলে, বড়সাহেব ক্রুশো প্রথম তাহার ফ্রাইডেকে দেখিয়া থাকে কিংবা তখন নামকরণও মাত্র হয় নাই এবং সে পলাতক ছাড়া কিছু নয়, এবং যেমন সে আরশিতে নিজেকে আর ম্যাকব্রাইড নিজে তাহাকে দেখে। তখন হর্ষ, আনন্দ, বিষাদ এবং আশঙ্কায় পরিপূর্ণ সে চিন্তা করিতে থাকে, হায় এ কী হইল, কীই বা এ সকলের তাৎপর্য এবং শেষই বা কোথায়।

কিন্তু যা বলা হয় না, যা ডিফোর উপন্যাসে কোনো সংস্করণে নাই, ফ্রাইডে নোটস যার উল্লেখ বাঁচাইয়া চলে তাহা এক টিউলিপ রাত্রির কথা যার একমাত্র উল্লেখ নিক কার্টারের 'সেই ভয়ঙ্কর তাহারা' নামের উপন্যাসে পাওয়া যায় যদিও এই সাহেব তাঁহার উপন্যাসে নামধাম সব অদলবদল করেন এবং পরিণতিকেও পৃথক করেন আর তাহা এমনভাবে যেন সে সবই আলাদা এক ব্যাপার যার সঙ্গে ফ্রাইডে দ্বীপের তিলেক যোগও নাই। তথাপি এই উপন্যাসই একমাত্র ডকুমেন্ট যা ভিন্ন নামে হইলেও সেই তাকে আভাসে বলে। অতএব নিক কার্টার ক্ষমা করুন, তাহার কিছু অংশের অনুবাদ দেওয়া উচিত মনে করি। নিক কার্টারের মূল বই মে ফ্লাওয়ার পেপার-ব্যাক হিসাবে কিনিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু কালো টিউলিপ রাত্রিই বা বলি কেন? রাত্রিকে তো অনেকেই অনেক রকমে বর্ণনা করেন এবং রাত্রিও অনেক রকমই হয়। এক রাত্রি নিশ্চিতই এমন হইতে পারে যাহা যেন এক কালো টিউলিপ ফুল যাহার গর্ভকেশর ভেলভেট কালো, এবং অন্যত্র প্রান্তে প্রান্তে অ্যাম্বারের বর্ণ অনুকরণ করে। সে রাত্রি এমনই ছিল। আর সে অভিযানকে পরে অপারেশন ব্ল্যাক টিউলিপ বলা হয়। (নিক কার্টার বলেন অপারেশন ব্ল্যাস্ট)।

নিক কার্টার এ রকম বলেন : প্রগাঢ় সবুজ পাহাড়ে, এখন চন্দ্রহীন আকাশের নিচে যা ঝুল কালো, নীরব পাহারাওয়ালারা অপেক্ষা করে। তারা সমুদ্রের থেকে উঠে আসা নিস্তব্ধতায় বিস্মিত। ঢেউগুলি পাথরে লপ্ লপ্ করে, এক মৃদু বাতাস হিস্ হিস্ করে কিন্তু তাই মাত্র। হয়তো তা ভালোই কিন্তু তা অশান্তি বাড়াতে থাকে।

নিচে এক নৌকায় দুই মানুষ। উজ্জ্বল আলোর ফলক আকাশকে আর এক চাকা কেটে সমুদ্রের

কালো ফোঁপানিব উপবে ঝুঁকে পডতেই তাবা হংসবৎ মাথা নোযায। তাবা দুজনেই জানে সার্চ লাইটেব ফলা তাদেব পাব হযে চলে যাবে কেননা এই ভূস্পর্শন অতি যত্নে সংযোজনা কবা হযেছে। আলোকেব সেই প্রকাণ্ড তবোযাল দুলতে দুলতে সমুদ্রেব থেকে মাটিব দিকে গেল। যাবা সেই আলোককে চালায, অথবা পাহাডেব উপবে যাবা পাহাবা দেয তাবাও না, তাবা দেখতে পেল না সেই লিকলিকে কনিং টাওযাব যা বাযু-উৎক্ষিপ্ত সমুদ্রে তখন নাক জাগায, অথবা তাকে যা মধ্যবাত্রিব বঙেব কালো ক্ষুদ্র এক আকৃতি যা ঢেউগুলিব উপবে চডতে থাকে। এমন কি সেই মানুষ দুটিও কালো।

জাঁ পিয়েব টুর্নে (পাঠক, নিক কার্টাব এই নাম ব্যবহাব কবেন বটে) বিশ্বাসঘাতক কম জলেব দিকে নৌকাকে চালিযে আনে। নৌকাখানি নিস্তব্ধ, এক এঞ্জিনিযাবিং বিস্ময, তাবাই তৈবি কবেছে যাদেব জন্য এই দুইএ কাজ কবে। যে সূত্রে তা কাজ কবে তা সাধাবণ মানুষ তো বটেই জা পিযেবও এমনকি কি কবে জানবে?

সে পাহাডেব যা এখন চোখেব সামনে উন্নতশিব, দিকে তাকায। দুই শত ফিটেব এক অলঙ্ঘ্য বাধা। মাছি, সে আপন মনে চিন্তা কবে, এ বকম শোনা গেছে যে মাথা ঘুবে পডে। সে অন্য মানুষটিকে লক্ষ্য কবল এবং বিস্মিত হয যে সেও কি তা পাবে? হাঁ, জাঁ পিযেব সন্দিহান হয। কদাপি কেউ এই পিছল বিশ্বাসঘাতকতাব স্তূপ আবোহণে সক্ষম হয নাই। জলদস্যুব বন্দীবা এই পথে পলাযন ও মুক্তিব চেষ্টা কবে থাকবে এবং ইতিহাস অনুসাবে তাদেব একাধিক বিশ নিচেব পাথবেব উপবে মৃত্যুতে আছাড খেযেছে।

অনেক চিন্তাভাবনা, সংযোজনা, উদ্যোগ ইত্যাদি তো কবা হযেছে। ভালো হতে পাবে, সে চিন্তা কবে। হতে পাবে। যদি কেউই পাবে সেই তবে সেই কেউ একজন। কিন্তু মঁ দিউ, কী না মর্মান্তিক সেই পতন হবে যদি তা পতন হয।

হ্যা সোজা বাচ-সমতল দুইশত ফুট পাহাড আব অন্ধকাব বাত্রি যখন কিছু দেখ না, এবং হাতডেই ব কী ধবতে পাব?

সেই, অপব, নিঃশব্দে জলে ডোবা প্রস্তবখণ্ডে উঠে দাঁডায। হাতড়ে সেই স্ট্র্যাপগুলোকে পবখ কবল যাবা বুটেব সঙ্গে বাঁকা চোখা চোখ শলাগুলিকে সংবদ্ধ বাখে। কব্জিব স্ট্র্যাপগুলিকেও সে পবখ কবে, আঙুল জডানো সেই কৌশলগুলি যথাস্থানে বটে, এবং সেই তীব্রধাব বাঘ-নখগুলিও ঠিক আছে যা যেন তাব দৃঢ পেশিসবল বাহু থেকেই জন্মায।

জাঁ পিযেবকে সে অভিবাদন জানায, সে অভিবাদনে থাবাযুক্ত এক হাত উঠায। সেই দুশত ফুট আলম্ব পাহাডকে একবাব দেখে এবং পবক্ষণেই উঠতে শুরু কবে। হাতেব সেই তীব্র বাঘ-নখগুলি, পাযেব আঙুলেব সেই তীক্ষ্ণ শলাগুলি পাহাডেব বুকে ইতস্তত কবে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধবতে কিছু পায এবং অতিসতর্ক কাঁকডাব মতো চলতে থাকে।

তা প্রাণঘাতী বকমে ধীব। জাঁ পিযেব লক্ষ্য কবতে থাকে। তাব উদবে অসুস্থতাব অনুভূতি বাডতে থাকে যখন বালুব ছোট ছোট ঝবনা পাহাড গডিযে নিচে পডে, এবং তখনই মাত্র পডা বন্ধ হয যখন পডাব আব কিছু থাকে না। শুধু পাথব, শুধু ন্যাডা শক্ত পাথব, তাব আবোহণকাবী থাবায় লাগে। দশ পনেবো বিশ, ভগবান, তা কী ভযঙ্কব ধীবগতি। পঁচিশ এক হৃদয বন্ধকাবী মুহূর্ত বুটপবা পা দুখানা শূন্যে হাতডায। কিছুই ছোঁয না। জাঁ পিযেব নিশ্বাস চুষে নেয এবং অনৈচ্ছিকভাবে নিচেব পাথবগুলোকে লক্ষ্য কবে। এক নুডি গডায গডায মৃদু কবকব কবে, শেষে মৃদু ঝপাং ক'বে জলে পডে। যখন সে আবাব চোখ তুলে তাকাল সেই থাবা মাবা পা দুখানা আবাব কিছু আঁকডে ধরে এবং ধীবে উপব দিকে তাকে টেনে উঠানো হয। ত্রিশ ফুট .আব কযেক ইঞ্চি আব দুই ফুট., কী, ধীবে কি অসম্ভব বকম ধীবে।

এবং জাঁ পিয়ের আবার নিঃশব্দে কালো অন্ধকারে ছায়ার মতো তার সেই নৌকাকে মিলিয়ে দেয়। আর ধাবালো ইস্পাত নখগুলো পাথর কুঁড়ে কুঁড়ে কিছু ধরতে চায়, সেই নখের এক ইঞ্চিব এক ক্ষীণ ভগ্নাংশ দিয়ে তা ধবে। ইতিমধ্যে কত ক্লান্ত সে। হায় ক্লান্তি যে পেশিকে শিথিল করে আনে আর তখন ধবা, না ধরা, ওঠা কিংবা খসে পডা একই হয়, একই হয়। একটু দম নেয়। একটু জোবে বুটের শলা পাথরে বসাতে চেষ্টা পায়। হা ভগবান, হা মহা বিপ্লাবন এই ভাবে সে। আব কযেক ইঞ্চি...তাব বুকের মধ্যে কিছু একটা ছিঁডে দু টুকরো হয়ে যায আর তারের মতো মুখোমুখি হয়েও ছুঁতে পারে না। কেননা আর একবার ফস্‌কায় আর সে ধারালো ইস্পাতের নখে ঝুলতে থাকে, হা ঈশ্বর।. .কনিং টাওয়ার মাত্র জাগে। জাঁ পিয়ের তার ক্ষুদ্র রেডিও রিসিভাব কানে লাগিযে অপেক্ষা করে। কোনো শব্দই নাই, কোনো শব্দই নাই। অথচ সেই যে পাহাডে চড়ে তাব বগলেব নিচে পকেটে সেলাই করা, বলা যায় শোনাও যায়, এমন ক্ষুদ্র রেডিও আছে।

বলা হয এই এক কারণও ছিল। কিন্তু তাহা গোপন রাখা হয়, এবং বলা হয তাহা এক টিউলিপ কালো রাত্রি কেননা, কেউ যেন হঠাৎ এক সময়ে অন্য কাহাকে নিতান্তই হাসিয়া বলে অপারেশন টিউলিপ। চোখে ইশাবা কবে হয়তো মুখে আর কিছু বলে না।

আব তখন সেই দ্বীপ জানেও না এই কে আসিল। পাঠক মশায় তুমিও বাহুলগ্নাকে সহ তখন সমুদ্রসৈকতে জলের লপ লপ শব্দ মাত্র শুনিতে পাও এবং বাতাসের হিস হিস তাহার নিশ্বাসে সুবাসিত সুতরাং স্বপ্নসংগীত হয়। তুমি সম্মুখেই সে রাত্রিকে অবতীর্ণা হইতে দেখ, যে তাহার কৃষ্ণ দুকূল অবহেলায় লুটায়, যে তাহার কেশরাশিতে তারকাসকল জ্বলে। অথবা, দেখ, মুহূর্তেই সে লোলবক্ষা গাঢ়বর্ণের পলিনেশিয়ান এক রমণী যা যেন পল গগাঁর এক ফলক এবং যে তাহার কৃষ্ণ দুকূল খসাইয়া সুগভীর নীলে মোটাসোটা পা দুটি ডুবাইয়া বসে, যাহার অলকরাশিতে তারাফুল এবং কণ্ঠেও।

উচ্চাবচ ভূমি

আজি এ বসন্তে কত ফুল ফুটে কত পাখি গায়। বস্তুত এমন ফুল আর কোনো দিনই দেখি কিনা সন্দেহ। ওই যে নীলকান্ত পাহাড় যাহার স্কন্ধদেশেই ফ্রেডা কাস্‌ল এদিকের তাহার বেশ খানিকটা যে ধ্বস্‌নামা যেন দেখায় সমুদ্র হইতে, ফলত প্যাকেটশিপের ভ্রমণকারীরা এদিকে দেখ, উহা ধ্বস্ নহে, উহা ফুলই মাত্র এই সব বলে, সে সেরূপ দেখায় ফুলের জন্যই। ডাঁটে ডাঁটে সেখানে সহস্র কোটি সানফ্লাউআর, তৎসংখ্যকই সোনা টিউলিপ এবং মাঝে মাঝে অজস্র অজস্র ডেইজি ড্যাফোডিল। ধাপে ধাপে নামিতে থাক, সেখানে সে উদ্দেশ্যেই তো ধাপকাটা ঘোরানো ঘোরানো পায়ে হাঁটা পথ, ধাপে ধাপেই এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জ সকলের ইতস্তত আরও ফুল, আরও টিউলিপ এবং আরও ক্রোকাস। একেবারে সমতলে আসিয়াও ফুল হইতে নিষ্কৃতি নাই কিন্তু। পথের ধারে যেখানেই সুবিধা গুচ্ছখানেক অন্তত সাদা কিংবা লাল অথবা অন্য কোনো রঙের ক্রিসান্থিমাম। এমন কি পথে যত না কেন মোড় পড়িতে থাকে সেই বসন্ত, সেই ফুল এবং পথের ধারের ছোট বড় বাড়িগুলির কাচের সার্সিতে দেখা যায় উজ্জ্বল রঙের ছাপা ছিটের পর্দাগুলি নাতিশীতোষ্ণ আলোকের সঙ্গে তাল দিয়া তোমার সঙ্গে চলে। তারপর যদি জনসন ক্রআরিসের দিকে না গিয়া যদিবা রবিন্সন ক্রিক পার হও, এখন সেথায় নৌকা লাগে না, উঁচু ক্যান্টিলিভর ব্রিজটি একই কালে তোমার নয়নকেও তৃপ্ত করে খাড়িটিকেও তরায়, এবং পরে যদি ট্যুরিস্ট ব্যুরোর অফিস, ক্যাস্টিগলিনো ম্যুজিক হল কিংবা অ্যাটকিন্‌সন হোটেলের দিকেও চল দেখিবে সমস্ত পথই যেন সে ডাউনটাউন

দিয়া যায় যে! এবং দেখিবে এরূপও যে সেখানে প্রতি বাড়ির প্রথম তলাই স্টোর, দোকান, বিপণি ও অনুরূপ অন্য তলাগুলিতে লজ, গ্রিল, টু লেট প্রভৃতি লেখা থাকে।

কিন্তু ফুলের কথাই তো বলিতেছি। সেই ডাউনটাউনের পথগুলি লোকের ভিড়ে সংকীর্ণ, কেননা সেখানে ভ্রমণকারীগণ মাত্র সুভেনির নয়, বিনা কাস্টম্‌সের পণ্যও সংগ্রহ করে এবং কিছুই সংগ্রহ না করিয়া জোড়ে জোড়ে দলবদ্ধভাবেও বা বেড়ায়, হাসে, ঢলাঢলির উপক্রম করে। কাজে কাজেই ফুলের বেডসকলও থাকে না। কিন্তু হয়তো যেথায় কোনো একতলার বারান্দাকে টানিয়া তেরচা খোঁটায় রাখা অস্থায়ী ছাতের তলে রবিন্সনের আদি গোটমিল্ক পনিরের কৌটা-সকল, সৈকতের নিমিত্ত রঙিন কাঠের বাস্কেট প্রভৃতি থবে থরে রাস্তা পর্যন্ত নামিয়া আসে, তুমি হয়তো আচম্বিতে এক কাঠের টাবে এক কালো টিউলিপ দেখ, অথবা ট্যুরিস্ট ব্যুরোর চালিত কোনো এক ফার্স্ট এইড কেন্দ্রে ফায়'র লিখিত টিনের জংধরা বাকেটে এক ঝাড় লালালক্তক গোলাপ দেখিয়া অবাক হওয়া যাও। প্রকৃতপক্ষে সে টিউলিপ হয়তো বা কালো নয়, হয়তো বা তাহা ভেলভেট আভাযুক্ত, গর্ভকোষে কালো এবং অন্যত্র জমাট রক্ত রং, আর হয়তো বা সে গোলাপ বস্তুত ব্ল্যাকপ্রিন্স নামক বহুপ্রচলিত সে ফুলেরই রকমফের। কিন্তু অবাক তুমি সন্দেহ করিতে থাক ফুলের রাজ্য শেষ হয় নাই।

এবং পাখিও যে গায় সে শুধু ছোট দোকানের খাঁচায় রাখা কক্যাটু ক্যানারি নয় যাহাদের সুভেনির-রূপে ক্রীত হওয়া উদ্দেশ্যে কিংবা দোকানে গাহাক টানিতে, ও ববিন ইউ'র লকি, ফ্রেডে'ল কাম্, পিসেজ'ও এইট ইত্যাদি শিখানো হয়। ফ্রেডা প্ল্যান্টেশনে, ক্যাস্টিগলিনোদের বড় শরিকের রাঞ্চে, জনসনদের পল্লীভবনের ধারে অনর্গল চিক চিক চাক চাক, টুইটটুউ, নানা ধরনের গান তো শোনা যায়ই, আচম্বিতে কদাচিৎ ডাউনটাউনের পথের উপরে এক অজ্ঞাত মধুরতা যাহাকে ট্রিল বলে সে যে ভাসিয়া আসে সে মিথ্যা নয়।

কিন্তু রাজ্য তো ফুলের নয় এবং পাখিদেরও নয়, সে যদি কাহারও তবে সে বসন্তেরই তাহা যে কিন্তু কোথায় অবস্থিতি করে কেউ কি তা জানে? শুধুই এক প্রভাব তাহার ছড়ায় যাহা কবোষ্ণ আলোকরূপে আকাশে উলসে, ফুলগুলিতে উছলায়, সার্সিতে ঝক্‌ঝকে, সমুদ্রে ঝলসায় যাহাতে যেমন চিত্রীর ম্যাজিকে প্যাকেটশিপের কয়লা এবং ধোঁয়ার নোংরামিও অপরূপ, এবং যে কবোষ্ণ আলোক সসম্ভ্রম সুগন্ধ বক্ষে বক্ষপীড়নের অনুভব আনে এবং যে নির্দয় পুরুষ রমণীগণের রক্তকে মথিত করে। এপ্রিল অবশ্যই নির্দয়তম মাস।

পরন্তু এই আলোকে সকলি যেন উজল এবং স্বচ্ছ। এখন বেলা দশ বাজে যাহাতে যাহারা অনেক রাত জাগিয়াছে অন্তত বিছানায়, তাহারাও ট্রেতে ব্রেকফাস্ট শেষ করে এমন সময়। সেনোরিনো ডোনা মিইআ ফ্রেডাকে দেখা যায়, দেখ, যাহার নতুন লম্বাপানা টুসিটারটিও যেন অ্যাম্বারের। অনুমান হয় সে মেয়েমানুষ অনেকখানি সোনার তৈরি হয় বা। তাহার যুবকদের মতো যে খাটো চুল যাহা শিঙ্গল কাট সে গিনিরঙের, তাহার শরীরে সমুদয়ই সোনালী অলিভ তেলের মতো, ভিতর দিয়া আলো গেলে যাহা স্বচ্ছতার বিভ্রম আনে, যে স্বচ্ছতার বিভ্রম এমন কি তার নিদারুণ লাল করা ঠোঁট দুটিতেও। সে দুই চোখ যারপর-নাই ঘোর রঙের সানগ্লাসে ঢাকা, এবং সে সোনালি বাহুদ্বয় কাঁধ হইতে লাল প্রবাল নখগুলি পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকে। তাহার উন্মুক্ত গলায় সোনার লেসে আবদ্ধ ইবনি কালো অঙ্গুষ্ঠমাত্র ক্রুশ। তাহার এক বুড়া আঙুলে কি আঘাতের চিহ্ন দেখায়? সেনোরিনার বর্তমান মাপগুলি হয়তো বা আটত্রিশ বত্রিশ চৌত্রিশ। তাহার মুখে কি কানের পাশে এক ছোট অপারেশন-চিহ্ন যাহা সোনালি মুখে রক্তাভ দেখায়? বয়সের কি প্রভাব আছে? সে তো এখন চল্লিশ। কিন্তু যৌবন কি বয়সে যায়? তাহাকে এই বসন্তে যেন শুষ্ক ও মথিত এমন দেখায়। নিশ্চিতই সেই সেনোরিনা টেনিসে ও গল্‌ফে আকৃষ্টা, বিশেষ গল্‌ফে এবং সোজা অভ্রূক্ষেপকারী ভঙ্গিতে হাঁটে দেখিবে এবং যদিবা সে নিতম্ব গুরুতাহেতু মৃদু কম্পমান তখন, সে

ভঙ্গি, কেন জানি না, এমন এক আভাস দিতে থাকে যে কেহ যেন তাহাকে সচ্ছলতা, অভিজ্ঞতা ও স্বাতন্ত্র্য উইল করিয়া বিগত হয়। বস্তুত যেন সে এক নিঃসঙ্গ বাঘিনী যে পরিতৃপ্তিতে উদরে লাঙ্গুল আঘাতিয়া ভ্রমণ করে।

এখন বেলা দশ বাজে যাহাতে সবই স্পষ্টই উজ্জ্বল আলোকে আবর্তিত , সুতরাং সে হয়তো এক তাৎক্ষণিক ইতিকর্তব্যতা যে তাহার সঙ্গী হয় বাচ্চা উইল অ্যাটকিনসন। এবং যেনবা যেহেতু শেষোক্তেই দুহাতে স্টিয়ারিং ধরিয়া টুসিটার চালায় যে ডোনা মিইআ নিজের সিগারেট ধরায় এবং পরে বাচ্চা উইলের ঠোঁটে তাহাই এক গুঁজিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগও দেয়। এবং সে ইতিকর্তব্যতাই হয়তো যে স্নেহবশে তাহার ঘাড়ের চুলগুলি উল্টাদিকে ঠেলিতে, পরে তাহার কলার ও ঘাড়ের মধ্যে আঙুলগুলি ঢুকাইতে সেনোরিনা এক হাতের সিগারেট অন্য হাতে লয়। ইতিকর্তব্য তাই, কেননা দৃশ্যত বাচ্চা উইলের ঠোঁট দুটি এখনও রং ছাড়াও লাল, এবং তাহার গণ্ডও আপেল হোন।

এবং তখন সেনোরিনা আরামপ্রদ বালিশগুলির এককে পিঠের নিচে রাখিয়া ভাবে সে তাৎক্ষণিকতার কথাই যাহাতে সেই কবোষ্ণ উজ্জ্বল আলো, সেই ফুলগুলি, উইল অ্যাটকিনসন জ্ঞানযর এবং মধ্যস্থলে সে থাকে কিন্তু কাহারও কোনো অতীত থাকে না। ইহা হয়তো তাহার ভাবনাও নয় বা বরং কোনো শিরাগুলির আন্তর অনুভূতি যেন যাহা বাহিরের আকৃতিতে বাহুতে ও অন্যত্র ও ত্বকে কবোষ্ণ সেই আলোক যে উইন্ডশিল্ড ওয়াইপারের ছায়ার সঙ্গে এদিকে ওদিকে করিলেও নড়ে না, দূরেও যায় না। কেননা ভাবিলে তো ভবিষ্যৎও আসে এবং কালই সে একচল্লিশ হয়। অথচ এই কী পাগল জুনিয়ার যে কুড়িও নয় তথাপি ভীর আর্কৃতির মতোই অনুভাব সকল দেখায়। উপরন্তু সেই কি তাহা জানে যে সেই তাহার আকৃতিতে ইতোমধ্যে অনেক প্রথমে বেদনার্ত অবশেষে বন্ধ্যা রূসরতা প্রত্যাবর্তন করে? এবং সে, সে সত্ত্বেও, অপরের শিরায় ধীর অনুপ্রবেশ যেন। ইহা হয়তো তাৎক্ষণিকতাই যাহার অতীত এবং ভবিষ্যৎও নাই নতুবা বলিতে হয় নিদয় সেই ঋতু রমণীয় সে ললনার রক্তে অবিরত আপন সুরা মিশাইতেছে বা।

এ এক আশ্চয তাৎক্ষণিকতাই যে কোনো অতীত নাই সুতরাং ভবিষ্যৎও থাকে না, অথচ ফুলগুলি, আলোক ও অ্যাটকিনসনদের এই বাচ্চাটির মধ্যে যেন তাহাকে রাখে। সুতরাং সেনোরিনার মুখে হাসি হাসিই হয়। এবং তাহার যেন বা জানিতে ইচ্ছাও হয় যে এই কি এমন কথা বলিলেও থাকে যে, কিংবা পাশাপাশি ডাউনটাউন ভিড়ে হাঁটিলে না কমিয়া বরং যে বাড়ে , অথবা কোনো এক খোলা আকাশের চাতালে সমুদ্রের হাওয়া গায়ে লাগে তখন মাদিএরা কিংবা হুইস্কি পান করিতে থাকিলেও চারিভিতের এই কমনীয় কবোষ্ণতাহেন থাকিযাই যায়, যদিবা এই এক অনভিজ্ঞতাই তাহার নিমিত্ত।

সুতরাং সেনোরিনা তাহার স্কার্ট আর একবার টানিয়া দেয় এবং উরুর উপর উরু তুলিয়া কিছু আড় হইয়া বসিল যে যাহাতে নিজেই যেন সে আবার অবাক। তৎকালে কথা বলিয়া দেখিতে সে কহে। এই সকালটা ভালো দেখ, বিলি। চল কোনো পছন্দমতো বার দেখি। দেখিবে হয়তো ক্লাবটা ভালো লাগে। কিন্তু এত অল্পবয়স্ক তুমি যে বোধ হয় ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চের মধ্যে তোমার সঙ্গে পান করা আমার ভালো হয় না।

তবে বিল বলিল, তবে থাক। চল আমরা স্কোয়াশ খেলি। অথবা তোমার হয়তো কাজ থাকে ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে। আমি কি মান-অব-ওয়ার জেটিতে অপেক্ষা করি।

সেনোরিনা। না, বিল, না। বরং লাঞ্চের পরে গল্‌ফ খেলা যায়। তখন আসিবে কি?

তখন টুসিটার ররিন্সন ক্রিকের ক্যান্টিলিভার লোহাপোলে উঠে এবং অচিরে পার হয়। এ হয় সেই পোল যেখানে ভ্রমণকারীরা সেই জায়গাটিকে লক্ষ্য করে যে স্থলে ররিন্সন ক্রুশোর প্রথম ভেলাটি ঠেকিয়াছিল এবং উল্টাইয়াও যায়, এবং তাহাতে অসুবিধাও এখন নাই কারণ জায়গাটি সিমেন্ট

বাঁধানো এবং তাহার উপরে বাত্রিতে লাল ফ্লুরোসেন্ট এক চক্র ঘুবিয়া ঘুরিয়া জ্বলে।

সেনোরিনা কহিল, তুমি কি এখানে নামিবে বিল? কিংবা ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে চল।

যদি সেরূপ বল। বিলি এরূপ বলে এবং সেনোরিনার মুখপানে চায় এবং আবার বলে, না। ববং এখানে নামিয়া যাই। ট্যুরিস্ট ব্যুবোতে তোমরা যে অনেক হিসাব অঙ্ক অনেক টাকাপয়সার কথা বল তাহা আমাব ভালো লাগে না।

সেনোরিনা। তবে তাহাই ভালো। তুমি কি গল্‌ফেব জন্য লাঞ্চের পবে আসিবে? আমি হয়তো লাঞ্চ পর্যন্ত এখানেই থাকিব। যদি ফ্রেডা ভিলার গল্‌ফ কোর্সে দেখা না হয দেখা হইল না জানিবে।

অতঃপর টুসিটার থামাইয়া বিল অ্যাটকিন্‌সন জুনিয়ার যেন লম্ফ দিয়া নামে যাহাতে তাহাব পেশিগুলি কোনো বৃক্ষের সতেজ তরুণ শাখার মতো নমনীয় ও কোমল এবং বুঝি বা ছাগলছানা-হেন চপলও সে, অথচ সে পেশিসকল ব্যায়াম বীরদের মতো দৃশ্যমান না হওয়াতে যেন পুরাতন সৌন্দর্যের গ্রীসীয় মার্বেলগুলিকে অনুকরণ করে। আর তখনই সেনোরিনা ফ্রেডার বিদায়েব হাতছানি দিবাব হাত সে ভঙ্গিতেই জুনিয়ার উইলের মাথাব চুলগুলিকে আউলাইযা দিতে থাকে।

কিন্তু পাঠক, আইস, আমরা এখন পাশাপাশি বহিযা সকল দেখিতে থাকি যাহাতে তোমাব যাহা ইচ্ছা হয় সেরূপ দেখ, আমি যাহা বলিতে চাই তাহা বলি।

পাঠক মহাশয়, টু-সিটারখানিকে আব একবাব লক্ষ্য কর যদি দেখিবে, তাহাব এঞ্জিন ববং যেন আকাশে উড়িবে এমন শক্ত, যদি বা সাবমেবিন-অনুগামী তার লম্বা গডন কত না ভঙ্গুব বোধ কব। তুমি দেখিবে তাহাকে সমুদ্রসৈকত ববাবব সিন্ডার ট্র্যাকে কত না দ্রুত গতিতে চালানো হয় এবং অন্যদিকেও তাহা দক্ষ এরূপ যে অন্য গাড়িগুলি যাহাদেব কাজই পাহাড়ে চড়া তাহাবাও যেখানে পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রেডে গোঁ গোঁ করে ইহা সেথা নিঃশব্দ আলোকের মতো অবলীলায় যেন গড়াইয়া পিছলাইয়া উঠে। একই কালে দক্ষতা, দৃঢ়তা, ও বৈশিষ্ট্য হয নাকি এবং তাহা হইতে লক্ষ্য কবিবে সোনোবিনা ফ্রেডাতেই অনুরূপ গুণগুলি সন্নিবিষ্ট হয়। সে যে মাত্র এক গাড়ি-পছন্দের ব্যাপার বা তাহাব শিঙ্গলকাট চুল অথবা তাহাব দুঃসাহসিক মিনি-স্কার্ট প্রভৃতি তাহা নয কিন্তু সেগুলিও বটে, পবন্তু তাহাই যে সে এখনই দেখিবে। তাব টু-সিটাব তো সে নিজেই চালায় এবং এক্ষণে ববং তাহার ডাঁন কাঁধ ববাবর জানালায় বেশি আলোক আসে যাহা যেন বর্তমানে আরও সমুজ্জ্বল কেন না ডাউনটাউনের পথে পথে ভ্রমণকারীদের ভিড়ে তাহা যেন ছলকাইযা পড়ে। সেনোরিনা নিশ্চিত, যেমন দ্বীপেব অন্যেবাও বলিতে পাবে তাহারা কযটি জাহাজের যাত্রী ছিল যেহেতু এক জাহাজের যাত্রী, দুই জাহাজের তাহারা, এবং কোনো যোগাযোগেব ফলে একই সময়ে একই দিনে সিটি ভোঁ বাজাইয়া তিন চারখানি জাহাজ যাহাদের যেন প্রায় ঢালিযা দেয় তাহাদের সংখ্যার পার্থক্য দেখা মাত্র চেনা যায়।

কিন্তু সেনোরিনা, দেখ, পাশের ঘোরা রাস্তায চলিঃ. কেন না আলোক, ফুল ও পাখির গানে এবং ভ্রমণকারীদের চকচকে মুখ দেখিয়া যে মনে হয পৃথিবী বুঝি ছুটি লইতেছে সে কদাপি সত্য হয় না যদি বা ভ্রমণকারীদিগের নিশ্চিতই সেরূপ মনে হয়, এবং সে ভালোই, কেন না তাহাদের তো আনন্দেরই তাহা শর্ত। কিন্তু কি প্যাকেটশিপেব ক্রু, কি হোটেলের বাবুর্চি ইত্যাদি, কি ট্যুরিস্ট ব্যুরোর তাহারা এবং সূর্য যদি কাজ না করিত? এবং সেনোরিনাও তো আর কোনো যুবতীর আবেগ-সীমিত তন্ময়তা মাত্র নয়, হয়তো বা যাহা ফুলের মতো প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু সে তাহা হয় না।

সেনোরিনা এরূপ চিন্তা করে ইহা কি কয়েক দিবসের নয় ইতোমধ্যে এবং আরও কয়েক দিবস থাকে না কি? তৎকালে তাহার চোখ যেন উইন্ড শিল্ডের উপরে কিছু দেখিবে কিন্তু সে আপন কব্জির ঘড়িও দেখিল তাহার ঘোর রঙের সানগ্লাসের ফলে যাহার ডায়াল নীলাভ। ইহা তাহার

মুদ্রাদোষ নয়, এবং সে এমনও নয় যে ঘড়ির কাঁটার উপরে শায়িত থাকে অথবা সে অবশ্যই তাহার সময়ের মালিক। অন্যদিকে সে কি বুড়া অ্যাটকিন্সন যে তাহার এনগেজমেন্ট ক্যালেন্ডাবে ছ-মাস পর্যন্ত আগাইয়া প্রতিঘণ্টার হিসাব লিখিয়া রাখে? যদি বা আজ ব্রেকফাস্টের পবের তাহার কোনো এক তিন কোয়ার্টার সময় বুড়া অ্যাটকিন্সনের তেমন এক কোয়ার্টাবে একান্ত ও পরস্পব সংলগ্ন হয় এমন সম্ভাবনা।

সেনোরিনা ডাউনটাউনেব সার্কুলার পথ ধবে এবং তাহাতে পাক খায় এবং যেন বা সে ভাবে তবে তাহা কি সেই তাৎক্ষণিকতা যাহা ইতোমধ্যে কয়েক দিবসের এবং কয়েক দিবস থাকেও বা। কিন্তু তখনই অ্যাকসিলেটর স্যান্ডেলে চাপে, সে আব যেন ভাবেও কেমই বা এই বিরাট ব্লকটি এখানে স্থাপিত হয় যাহা ফাইবার গ্লাস, সাদা সিমেন্ট ও পোর্সেলেনে এমন পবিপূর্ণভাবে নির্বীজ স্বাস্থ্যসম্মত এবং দৃঢ় হইয়াও যেন ফুলের মতো কোমল যাহা। অথচ তাহা দ্বীপের মাতৃসদন ছাড়া আর কিছু নয়। সেনোবিনা এক কুণ্ঠা যেন তাহার উদরে সামান্য অনুভব করে যেন এ জন্যই যে সে নারী এবং ইহা হয় মাতৃসদন, যেন তাহা সত্যই সম্ভব যে নারী মাত্রেই তাহা হইয়া থাকে দ্রুত অথবা ধীরে যখনই তুমি তাহার কাছে। কিন্তু সে যে ক্ষণস্থায়ী সেও সত্য, সুতরাং সে বরং তাহাব গাড়ির গতি কমায়। সিগাবেট ধরায় এবং সিন্ডার-ট্র্যাকে নামিতে অবসর খোঁজে যেহেতু সিন্ডারের সেই ট্র্যাক এরূপ দ্রুতগতিশীল গাড়িগুলির জন্যই যাহা তখন সেখানে সারি বাঁধিয়া সৈকত বরাবব বাখা হয় এবং মুহূর্তে সেনোরিনা সিন্ডার-ট্র্যাকে সিদ্ধহস্তে স্টিয়ারিং করিতে থাকে। তৎকালে তাহার মুখে এক হাসি দেখা দিল যাহা যেন সখ্যের। আর তাহা হইবে বা না কেন? সে ট্যুরিস্ট ব্যুবোর ডাইরেক্টরদের একজন নয় বটে কিন্তু সে যে সে কম্পানির দুই আনা অংশেব শরিক তাহা প্রায় সকলেই জানে এবং সে সেরূপ ডাইরেক্টর নয় এজন্যই যে বুড়া অ্যাটকিন্সনই তাহাব স্বার্থের সহায়ক। ইহাও তাহার অস্তিত্বের দৈর্ঘ সূচনা করে যে নিতান্ত হাসিহাসি মুখে ট্যুরিস্ট ব্যুরোর গম্ভীরমুখ নানা করণিক কর্মচারিগণের মধ্যে চলিয়া সে সোজা অ্যাটকিন্সনের কামবায় নিজের কার্ড পাঠায় এবং পরক্ষণেই ঢুকিয়া হাসিয়া হাসিয়া কথাবার্তা বলিতে থাকে। তখন বরং এরূপ চিন্তা করা হয় এ স্ত্রীলোকটিতে কোথায় বা শক্তির উৎস থাকে তাহা তুমি জান নাই। তবে তাহাই বা কি এরূপ ভাবিয়া শিল্ড-ওয়াইপার লক্ষ্য করে সেনোরিনা। না তাহা প্রেম হয় না, কেন না প্রেম কি অতীত রাখে না? আর তাহার একচল্লিশ তো অনতিদূরেই। যদিও সেই এক কী যাহা জুনিয়ার অ্যাটকিন্সনের পায়ে পায়ে হাঁটে এবং চমকিয়া মনে হয় সে তাহা তাহাব পব তাহাকেও যেন অনুসরণ কবে।

সেনোরিনা কিন্তু ইতোমধ্যে গাড়ি থামায় দেখ এবং সবুজ কালো চৌখুপি উলের স্কার্ফ এক তুলিয়া মাথায় জড়ায়, একদিকে যাহা রঙে ছকে তাহার স্কার্টের রঙে ও ছকে মেলে বলিয়া অনুমান যে তাহা যত্নে সংগৃহীত, অন্যদিকে যেন বা নিতান্ত অবহেলায় জড়ানো কিছু হইবে। ফ্যাশন তুমি কত রকমেই না হইয়া থাক, অথবা সুন্দরীদের, এমন কি চল্লিশেও, এমন কী না মানায়?

কিন্তু ফ্যাশন তোমায় আমি কি বর্ণিব! কিংবা সে উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র আশমানীর রূপবর্ণনার উদ্যোগে বিদ্যাদায়িনী বাণীকে যে স্মরণ করেন আমিও কি সেমতো করি? ফ্যাশন তুমি কোথায় আছ, কোথায় বা তুমি নাই? এই যে যাহাকে লইয়া এত করি সেই সেনোরিনা ডোনা মিইআ ফ্রেডা তাহাতেই কি তুমি অবস্থান কর? তাহার পদযুগল আবৃত করিয়া এই যে সবুজ গ্রীকো-রোমান সান্ডাল তাহাতে ফ্যাশন, এই সান্ডাল হইতে শুরু আজঘন জঙ্ঘা ও রম্ভোরু প্রদর্শন তাহা ফ্যাশন, আবার জঘনমাত্র আবৃত করিয়া যে প্লিটেড স্কার্ট তাহাও সেরূপ। চোখেব ঘোর রঙের সানগ্লাস যেমন, তাহার উপরে প্রকৃত ভ্রূ কামাইয়া আবার যে কাল্পনিক ভ্রূ আঁকা তাহাও তেমন ফ্যাশন। তাহার মাথার চুলে শিঙ্গলকাট এবং তাহা প্যাঁচাইয়া এই যে স্কার্ফ তাহাও সমান ফ্যাশন। উপরন্তু যদি বল পোশাকের টুকরাগুলিকে অঙ্গসজ্জার এই উপাদনগুলিকে শুধুমাত্র ফ্যাশন বল কেন, সব মিলিয়াই

তো এক ফ্যাশন তবে তাহাও মিথ্যা হয় না।

সত্য বটে ফ্যাশন-নিন্দুক সর্বত্রই আছে, আমি তাহাদের সহ্য করি না, এবং তুমি জানিবে নিন্দাকারী যদি স্ত্রী হয় তবে নিশ্চিতই সে কুরূপা আর যদি বা সে পুরুষ অবশ্যই সে অসূয়াদগ্ধ। এই যে ফ্রিজ, টেলিভিশন, এসবে কাহার অসুবিধা হইল? এই হাল্কা লম্বা নিচু গাড়িগুলি তুমি কি তাহা নিন্দা কর, পাঠক? বুঝি বলিতে চাও দার্শনিক যুক্তি এই আছে যে তা প্রয়োজনের নয়। ভালো বলিয়াছ, কিন্তু কীই বা তোমার প্রয়োজন সাধন করে? ভ্রমণের সুবিধা, দ্রুতভ্রমণ? ভ্রমণে কি হয়, জীবন কী এমনি ফুরায় না? তবে দৌড়াও কেন? মৃত্যু পশ্চাদ্ধাবন করে না কি? অন্যদিকে দেখ আমাদের সেই আদরের ধন সংস্কৃতি কী যদি তা মাত্র তৎকালীন ফ্যাশনকে আত্মস্থ করা নয়? লম্বা গাড়িটি না পেলে, নিত্য নতুন সিনেমা না দেখে, নতুন ওষুধ সেবন না করে, পিলযুক্ত স্ত্রী এবং মাত্র স্ত্রীই সেই মাত্র থাকিবে এমন ফ্ল্যাটের স্বপ্ন না দেখেও কি তুমি আমি নিজেকে নিজের কাছে সংস্কৃতিযুক্ত বলিতে পারি? অথবা তুমি কি সেই জঙ্গলে রামনাথ যে পাছে সাহিত্য-আক্রান্ত হয় তাই সিনেমাও দেখে না এবং আধুনিক গান বাজার সময়ে ঘড়ি দেখিয়া রেডিও বন্ধ করে। পাঠক, যারা ফ্যাশনে বিশ্বাস করে তাদের বলি ফ্যাশনই সে গজলক্ষ্মী যাহা সওদাগর সিংহলের পথে আবিষ্কার করে, যে একই কালে শতদল পদ্মে উপবিষ্টা এবং দুহাতে হাতি ধরে গেলে, এবং তাহা আমাদের সভ্যতাও তো। অবিশ্বাসী নিশ্চয়ই হাসিবে কিন্তু সে তো কামিনীর আস্ত হাতি গেলাতেও হাসে।

ফ্যাশন আছেই এবং তাহাকে স্বীকার করাই ভালো, নইলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে, আর এই মুহূর্তে, নতুবা দ্বীপের সকল আলোক কি নিবিয়া যায় না? কেন না ট্যুরিজমকে ফ্যাশন বলিলে অকাজের মনে কর যদি এ দ্বীপের কীই বা থাকে?

কিন্তু ইতোমধ্যে সেনোরিনা ট্যুরিস্ট ব্যুরোর সম্মুখে তার টু-সিটার ত্যাগ করে আর কী আশ্চর্য দেখ একে একে দুইয়ে দুইয়ে দেখ ভ্রমণকারীরা তাহাকেই দেখে, কাছে চায় যেন, কিছু জিজ্ঞাসার আছে যে, তাহা বলিতেও পারে না। না, সে কিছুই আশ্চর্য নয়। মেবিলিন, সোফিয়া, ক্যাসিয়াসকে যদি কিছু পরিবর্তিত পোশাকে দেখ তাহলে এমনই হয় না কি এই যেন চিনিয়াও চিনি না, চিনিলে সে কী সুখ। বছর তিনেক আগেকার প্রকাশিত ট্যুরিস্ট ব্যুরোর সে বছরের দু নম্বর প্যামফ্লেটটিকে স্মরণ কর যদি, যাহাতে সেই ছবিটি ছিল যে এক স্ত্রীলোক যার মোটা উলের সক্‌স্, পুরুষ জুতা এবং শর্টস্ আছে এবং হাতে ব্রায়ার পাইপও বটে, সে ছবি এখনও অনেক এই দ্বীপের ছোট ছোট গ্রিলে দেখিবে, এবং যদি সে গ্রিলের রান্নাঘরে তবে যার উরুদেশ পেনসিল অথবা কলমের খোঁচায় বিদীর্ণ, সে ছবি কার বুঝিতে এখন। তবে একবার সেনোরিনাকে দেখ। এখনও তেমন শিঙ্গলকাট চুল, টোল খাওয়া হাসি এবং শর্টস্ না হইলেও মিনি-স্কার্টের সৌজন্যে সে উরুদেশই। ট্যুরিস্ট ব্যুরোর কোনো কোনো মেয়ে কর্মী সে সময়ে বলে বটে আত্মহত্যা করি ইচ্ছা হয়, যা হয়ত রসিকতার সুরে বলা কিন্তু আমাদের রসিকতায় কি আমাদের কামনার ফসিলগুলি থাকে না?

কিন্তু সে তাদের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করে না যাহারা ভ্রমণকারী হিসাবে হাঁ করিয়া দেখে অথবা ব্যুরোর কর্মচারী হিসাবে গোপনে লক্ষ্য করে এবং ভাবে হাঁ তা ঠিকই যে শ্বেতসভ্যতার নজিরের খোঁজে প্যারি যাওয়া দরকার করে না। কেহ মন্তব্য করে দ্বীপের অন্তত দু-আনি মানুষের কাছে সে ফ্যাশন-প্রবর্তিনী, হাঁ মাত্র দু-আনি, সেই ভালো, তার বেশি নয় কিন্তু কমও নয়।

অথবা তাহা সেই বসন্তই যেন, সেই প্রবাল অধর, সেই সোনা-হেন রং এবং যেরূপে সে হাসিল যেন বলে ইউ নেভার ক্যান টেল। সে আঙুলের ডগাগুলিতে ভর দিয়া হাঁটে যাহাতে পুরুষের চিত্তে রক্তধারা উছলায়।

তখন সে অ্যাটকিন্‌সনের খাসকামরার দিকে চলে। সেই খাসকামরা প্রস্থে দীঘে বিশ হাত বাই বিশ হাতই হয় যাহাতে ভারি বড় নানা শেল্ফদেরাজ যুক্ত টেবিল ও বিশেষ গদিদার কুর্শিসকল।

এদিকে এই শেল্প ওদিকে চার্টব্যাক। জানলা, স্কাইলাইট, পর্দাগুলি এমন যে এখানে আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল কিন্তু যেন তাহা স্ফটিকে আবদ্ধ তাই ঝলকায়। ইহা ব্যতীত টেবিলেও কালচেপানা দণ্ডে প্রস্ফুটিত কহ্লাব হেন আলো জ্বলে।

অ্যাটকিন্‌সন বুড়া যে এই প্রবাদে সত্য আছে। মাথার চুলগুলি সাদা পাটকিলে, একমুখ নারদ-দাড়ি সবই যেন চামর, কিন্তু তার নখগুলি বিশেষ যত্নে ম্যানিকিওর করা এবং তাহার পোশাকে বিশেষ পরিপাটি। বাঁ চোখে সে মন্যাকল ব্যবহাব কবে। তাহার সম্মুখে খোলা বই, যাহাতে এক কারুকার্যময় রুপার পেপাব-কাটার ইদানীং পেজ-মার্কার। পাঠক মহাশয়, ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে তাহা ডিফো সাহেবের ররিন্সন ক্রুশোব অভিযান-বিষয়ক উপন্যাসেরই এক বাজসংস্করণ। কিন্তু তাহা বিশেষ সংস্করণই বটে যাহা নক্সা চিত্র ইত্যাদিতে এনসাইক্লোপিডিয়ার দুই ভল্যুমকে অতিক্রম কবে। পুস্তক, তুমি শ্রদ্ধায় প্রার্থনা করিলে কী না দিতে পাব? একই তো বহি কিন্তু সূর্যও তো একই। অ্যাটকিন্‌সনেব টেবিলে ভাসে কিছু ফুল আছে। এক নীল মাছি সেই ভাসের গায়ে। সে দুই একবার ভোঁও শব্দে উড়ে কিন্তু বেশির ভাগ সময় বসিয়া কাটায়। এক গ্লাসে কিছু রঙিন পানীয়, অ্যাটকিন্‌সন যাহাতে দুই রঙেব দুই বড়ি রাখিয়া পান করিতে থাকাকালে পুস্তকেব দিকে মুখ নামায, কিন্তু দবজাব কাচের কব্জাদার পাল্লার নিচে তাহাব উরু এবং উপবে সেনোবিনাব মুখ দেখিয়া আইস বলিল। সেনোরিনার সেই ভঙ্গিটি দৃঢ় কিন্তু কিরূপে হয জানি না সে তাহাব মিনিস্কার্ট-সীমিত নিম্নাঙ্গ যেন বা এক মৃদু হলাদিনী, যেন তাহাতে আলোক কিছু কাঁপে বা। অথবা সে সবই পুরুষের মনে এবং সে সবই, হায়, একাধিক বাব প্রত্যক্ষ কবিলে নিতান্ত বাসি এমন মনে হয়।

কিন্তু জানালা, স্কাইলাইট কাচ-পর্দাগুলি এমন যে এখানে আলো উজ্জ্বল যথেষ্ট ববং তাহা যেন স্ফটিক-নির্মিত তাহাতে ঝলকায় এবং কালো পল-তোলা দণ্ডে কহ্লাব ফুটে। এবং সে তাহাব বাজাও শেষ হয় না। অথবা এ কি তাহার এক ব্যাকুলতর বেদনা যাহা বাতাসে মৃদু নিশ্বাস ফেলে, যাহার মৃদু সুঘ্রাণ আলোকে কাঁপে এবং টাইপবাইটাব আব অ্যাডিং-মেশিনেব মৃদু গুঞ্জনের আডালে এক ট্রিল কাঁপে।

অথ অ্যাটকিন্‌সন কথা॥

সেনোরিনা নিজ হাতেই এক চেযাবে ঈষৎ নাড়া দিয়া টেবলের আরও নিকটে পৌছে এবং করমর্দনে হাত বাড়ায়। তখন তাহার ভঙ্গিতে এক মৃদু বিস্ময়ের ভাব কিন্তু আদতে যাহা করমর্দনভঙ্গি। শেষে সেনোরিনা স্কার্টের প্রান্ত টানিয়া নামায় উরু দুইটি পরস্পরকে চাপে এবং হাঁটুর উপরে হাঁটু তুলিয়া চেয়ারে বসে এবং তাহার লালালক্তকমণ্ডিত ঠোঁট দুটিতে কী এক আলো। তখন অ্যাটকিন্‌সন হাতের গ্লাসটিকে লক্ষ্য কবিল। একটি অর্থাৎ নীল বড়িটি ভালো গোলে নাই। সে নিমিত্ত সে গ্লাস চালাইয়া তরলটিতে আবর্তগতি দিল যাহাতে তলায় সে নীল বড়িটি আরও তাড়াতাড়ি তির তির করিয়া উঠে। অ্যাটকিন্‌সন এক চুমুক লইয়া জিজ্ঞাসা করে কী সে সেমতো তাহার সৌভাগ্য যে সেনোরিনা ফ্রেডা উপস্থিত এবং সে হাসেও। যদিও তাহার এনগেজমেন্ট-ক্যালেন্ডারে এই তারিখের নিশ্চিত এই সময়টিতে বিবিধ এই পর্যায়ে সেনোরিনা ফ্রেডার নাম লেখা আছে খুলিলে দেখা যায়।

সেনোরিনা ফ্রেডা ভাবিল ইহা হার্ট, কিংবা শিরায় রক্তচাপ, কিংবা কিডনি, এমন কি স্নায়ুরও হইতে পারে, কিন্তু ততক্ষণে অ্যাটকিন্‌সন হাসিয়া মুখ তুলিয়াছে যাহাতে সেনোরিনা অস্পষ্টভাবে অনুভব করিল যে তাহার প্রতিপত্তি ইত্যাদিকে ঈসূয়া কর বটে কিন্তু কী ভীষণ চাপও যে লোকটির উপরে তাহাও দেখ এবং ইহা খুব ভালোই যে সাধারণভাবে এবং যে কোনো জেনারেল মিটিঙে সে এই লোকটির পক্ষেই থাকে। তাহা প্রায় সখ্যের মতো কিছু হয়।

সেনোরিনার বিশেষ কিছু কর্তব্য আছে কি? থাকিলেও তাহা হয়তো বা তেমন যাহাকে বলিতেও হয কিন্তু তাহা বলিতেই আসিযাছি এমন কেহ দেখায় না। সুতরাং দিনটি ভালো এবং এবার এপ্রিল যাইয়াও যায় না, রৌদ্র বেশ উজ্জ্বল দেখ এমন সব আলাপে শুরু হইল। অ্যাটকিন্‌সন একবার বাঁ কাঁধটি নোয়ায় যাহাতে যেন টেবলের উপরে আলো কিছু নড়াচড়া করে। তখন ফ্লাওয়ার-ভাসের নীল মাছিটি কি ভাবিয়া একবার সেনোরিনাব ডান মণিবন্ধের কিছু উপবে হাতের পিঠে বসিল। কিন্তু সেনোবিনা তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া এপ্রিলের ক্লান্তি দেখাইতে মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল ফ্রেডা-ভিলার জানালা এখনই খুলিয়া রাখিতে হয়। আব এত ক্রোকাস। অ্যাটকিন্‌সন মাছিটিকে লক্ষ্য কবিল। তখন সে তাহাব গ্লাসটিকে নিঃশেষ করিয়া নামাইযা মাছি বসা হাতের পিঠে তাহার অলিভ সোনালি বঙে মৃদু নীল শিবায আভাস দেখিতে পায, যেন তাহা সুন্দব এবং অভিজ্ঞ এবং অন্য কোনো কোনো এমন নীলাভ শিরাকে মনে করায। এবং সে সেনোবিনাব প্রথম বোতামের উপব ব্লো অঙ্গুষ্ঠসমান ক্রসটিকে দেখিতে পায।

এবং সে বলে গত এপ্রিলেব তুলনায় এ এপ্রিলে ভ্রমণকাবীদেব সংখ্যায তারতম্য হাজার ছাড়ায় কিনা সন্দেহ।

ইহাতে কি কিছু চিন্তার কাবণ দেখেন? সেনোরিনা জিজ্ঞাসা কবিল। না তেমন কিছু নয়। কিন্তু ফ্রেডা তুমি কি সেই গুজবগুলিতে বিশ্বাস কব যে ডলাব ডিভ্যালু করা হয়? তৎকালে অ্যাটকিন্‌সন সিগাবেট-কেসে সিগাবেট বাছাই কবে।

সেনোবিনা হাসিল। নীল মাছিটা চোখে পডায় সে অন্যহাতে মাছি বসা হাতটিতে মৃদু চাপড় দিলে মাছিটাও উড়িয়া তাহার বাহুতে বসে। সেনোরিনা হাসিয়া বলিল তাহাতে কি আমাদের বপ্তানি কিছু কমে?

আমাদের যে বপ্তানি ভ্রমণকাবীদের পকেটে যেন আমদানি এমন? অ্যাটকিন্‌সন এই বলিয়া হাসিল। না তাহা কমে না এবং বোধ হয অসুবিধাও হয না যদি না জ্যামাইকা সবকাব ডলারেব পোঁ ধবে।

আমি সেরূপই মনে কবি। সেনোরিনা এরূপ বলিযা মাথা দোলায।

নীল মাছিটি উড়িয়া গিয়া ফ্লাওযাব-ভাসে বসিল। যেন তাহাব ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ফুলগুলিব গোমেধ বঙে হয়তো বা ঢাকা ছাড়া গোমেধেব এবং সেনোবিনাব ত্বকে আঠালো কিন্তু অনাবৃত মধুর ঘ্রাণ পায়।

সেনোরিনা কহিল, কিন্তু সকলেব মত একরূপ নয়। কয়েকদিন আগে জনসনের সঙ্গে দেখা হয। সে অন্যরূপ চিন্তা করে কিন্তু। অ্যাটকিন্‌সন সিগারেটটি ঠোঁটে রাখিয়া অগ্নিসংযোগ করিল এবং পরে জিজ্ঞাসা করিল, সে কী বলে?

সে বলে আমাদের রপ্তানি অর্থাৎ ভ্রমণকারীব সংখ্যা হয়তো কমে না এবং হয়তো বা শেষ ব্যালান্সিংএ আমাদের লাভই থাকে, কিন্তু সে অশান্তির আশঙ্কা করে।

অ্যাটকিন্‌সন বলিল, জনসন বড়ই শান্তিপ্রিয়।

সে হাসিল। কে না জানে অ্যাটকিন্‌সন এক সময়ে চেয়ার শূন্য করিলে জনসন সেই শূন্যতা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা রাখে। কিন্তু ইহাও সত্য কেহ চিরদিনের জন্য কোনো চেয়ার পূর্ণ রাখিতে পায় না।

এই মতো প্রায় পনেরো মিনিট কাল তাহারা সম্ভাব্য সেই ডিভ্যালুয়েশন লইয়া আলাপ করে। তখন কিন্তু সেনোরিনাকে যেন প্রায়-প্রৌঢ়া একজিকিউটিভের মতোই দেখায় যাহার সুরে এমন এক আত্মনিষ্ঠ গাম্ভীর্য যে যেন বা সে দ্বীপের হায়ার সেকেন্ডারির অর্থনীতি কিংবা বাণিজ্যিক ভূগোলের অধ্যাপিকাদের একজন। অবশেষে অ্যাটকিন্‌সন বলে, তোমার কি মনে হয় ফ্রেডা তখন কি জেনারেল মিটিং ডাকা উচিত হয় না।

সেনোরিনা কিছু চিন্তা করে। নীল মাছিটি এখন যে নিচেব দিকে মুখ করিয়া ফ্লাওয়ার-ভাসটির গা বাহিয়া নামিতেছে তাহা সে লক্ষ্য করিল। ইহা এপ্রিল মাস।

অবশেষে সে স্বীকার করে হয়তো তাহা যুক্তিসম্মত হইবে। কিন্তু সমুদ্রের বাতাস এখানেও আসে এবং থাকিয়া থাকিয়া আসিতেছেও। বরং তাহা অ্যাটকিন্‌সনের পিছন দিকের দুই জানলার পর্দাই দোলায় যাহাতে আলোকও বাড়ে।

সেনোরিনা এক মৃদু হাই তুলিল।

অ্যাটকিন্‌সন যেন আচম্বিতে লক্ষ্য করে খানিকটা আলোক যাহা কাচ ভেদ করিয়া আসার দরুণই যেন বেশি উজ্জ্বল তাহা যেন দেখ সেনোবিনার ডান কাঁধেব কাছে ব্লাউজের উপরে। সেখানে কলার-বোনের আভাস।

সেনোরিনা বলিল, কিংবা এখনই চিন্তা করিলে আমরা জনসনের মতো শান্তিপ্রিয় হই।

অ্যাটকিন্‌সনের সিগাবেটের কিছু ছাই সে উজ্জ্বল আলোকের টেবিলে পড়ে। এবং মাছিটা একবার অকারণে ওড়ে যেন তাহা কোনো শস্তা হোটেলেব টেবল।

অ্যাটকিন্‌সন তখন বলে, তোমার কি তেমন কাজ আছে? নতুবা লাঞ্চের জন্য থাক না কেন।

সেনোরিনা হাসিল যাহাতে তার প্রবাল ঠোঁট দুটি একত্রে চূড়াকৃত হয় এবং সে মাথা নাড়িল। পরে সে হাসিল আবার এবং তখন তাহার ঠোঁট দুটি খুলিল, এবং তাহাতে সুপঙ্‌ক্তি দাঁত সকলের অগ্রভাগ কিছু দেখা যায়। সে বলিল, সে আসিয়াছে জানেন কি, জন ফ্রেডা? এবার দেখি সে নিজেকে মিস্টার ফ্রেডা বলে, অন্তত তাহার জেড ও জেফ নামা কাফ্রী দুজন বলে। এবং যথারীতি জাভেলিন আছে। এবার যেন তাহাতে আধিক্যই। পাকা কঞ্চি বাঁশের ডাঁট সমেত সে তো আছেই, জেড ও জেফ বলে এমন একটি আছে যাহার ডাঁট প্ল্যাস্টিকেব, শাম রুপার এবং অগ্রভাগ এভাব্রাইট স্টিলের। সে আসিয়াছে।

অ্যাটকিন্‌সন দেখা যায় না অথচ যেন অনুমান হয, এমতো মাথা ঝাঁকাইল। এবং তাহার নারদ-দাড়িমধ্যে হাসিতে থাকাকালে সে বলিল, ফ্রেডা, আচ্ছা, তোমার কি আশা হয় ছোকরা সত্যই অলিম্পিকে কিছু করিতে পারে।

হয়তো পারে কিংবা তাহা নাও পারে, কিন্তু তাহাতে আমাদের কিছু হয় কি? হইলে তো কর্নেলি বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সে দেশেরই নাম হয়।

অ্যাটকিন্‌সন বলিল, আজ বেশ উত্তাপ যেন। না? তাহা ছাড়া, সেনোরিনা, সে তো এই নভেম্বরেই সাবালক হয়। যখন আমি বা তুমি কেহই আব তাহার জন্য দায়ী থাকি না। লাঞ্চে না থাকিলে আমরা হয়তো পান করিতে পারি, মাদিএরা, ক্লারাট কিংবা হুইস্কি কিংবা তুমি যাহা বল।

অ্যাটকিন্‌সন লক্ষ্য করে ফ্রেডার কলার-বোনের ত্বক যেন স্বচ্ছ, যেন বা সে তাহার ব্লাউজের বৃত্তাভাসের মতো কিছুর আভাস দেয়।

অ্যাটকিন্‌সন উঠিয়া দাঁড়ায় মৃদু মৃদু হাসে এবং বলে চল আমরা পান করি। হাঁ, সে সত্যই। কিন্তু নভেম্বরেই তাহাকে তাহাব টাকার হিসাব এবং যেসব কাগজপত্র আছে তাহা দিব এবং আমরা তাহার একজিকিউটারও আর থাকি না। এবং সেই বসন্তের আলোকই আবার প্রকাশ পায় যা এখন বা কবোষ্ণতার তুলনায় কিছু বা উষ্ণ।

পাশের ঘরেই চিফ একজিকিউটিভ অথবা ডাইরেক্টর বোর্ডের প্রেসিডেন্ট অ্যাটকিন্‌সনের বিশ্রামঘর। সেখানে সোফা আছে, বেশ চওড়া সোফা এবং প্রভিশানের আলমারি, এবং বাহিরে যাইতে ইচ্ছা না থাকিলে সেখানেই লাঞ্চ করা যায় এমন টেবল এবং পানীয়ও থাকে।

ইহা নিশ্চিতই কতক ব্যাপারে আমাদের একস্বার্থ এমন ভাব এবং ইহাও যে ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চের মধ্যেও বরফ দেওয়া হুইস্কি ইত্যাদির এক বয়স আছে যাহা তাহারা অনুভব করে না, যাহারা

ব্যুবোর নানা রেজিস্টারে এবং লেজাবে নানা অঙ্ক বসাইয়া চলে এখনই, অথবা তাহারাও অনুভব কবে না যাহারা এখনও সিম্ভাব ট্র্যাকেব কোনো অংশে দৌড়ায় অথবা অন্য কোথায় সবুজ স্ক্রিনের আড়ালে টেনিস পেটায়, এমন কি সৈকতে ইতিমধ্যে স্নান শেষ কবিয়া ছাতার কলোনি-সকলে যাহাবা উচ্চহাস্য কবে। যে বয়সের যা। ফ্রেডা বলিল, হুইস্কিই ভালো। বিশ্রামের ঘবে সেপায়া টানিয়া আলমারি হইতে হুইস্কির পুবা বোতল, গ্লাস, আইস-বক্স ইত্যাদি সংগ্রহ করে অ্যাটকিন্‌সন। তাহাব মুখেব স্থিবতা, মাথার সাদা পাটকিলে চুল ও আইস-তুল্য সাদা দাড়ি দেখিযা, তাহাব পোশাক যেমন, আন্দাজ করাই যায না যে এসবে এমন চটপটত্ব থাকে এবং হাতও কাঁপে না।

তখন সেনোবিনা সোফায বসিল। নিতান্ত আবামপ্রদ ও নিচু সোফা এবং নিতান্ত বিশ্রামঘর। সে সিগাবেট ধরাইল। এবং মুখ হইতে সিগাবেট সবাইযা ছোট একটি হাইও তুলে। স্কার্ট টানিয়া দেয না ববং পা টান করে।

অ্যাটকিন্‌সন হুইস্কি ঢালিয়া গ্লাসে গ্লাসে ববফ ভাসাইল। হুইস্কিটি ভালো। দুবাব ঠোঁটে লাগাইয়া সেপাযায গ্লাস নামায় অ্যাটকিন্‌সন, সিগাবেট ধবায কিনা ভাবে কিন্তু কুশ্যান তুলিযা নিজেব পিঠেব তলায দেয। সে আরাম করিযা বসে।

সেনোবিনা ডোনা মিআ ফ্রেডা প্রথম চুমুকেই গ্লাসেব চতুর্থাংশেব এক চুষিয়া নেয। নিজেব পাযেব দিকে চায এবং নিজেব স্যান্ডেলেব মধ্যে নিজেব বুড়া আঙুলেব ক্রীডা দেখে যেন সে কিছু বলিবে। ববং সোফায একটু বেশি হেলান দেয।

সে বলিল, সে কি সত্য যে কোনো অভ্যস্ত ব্যাপাব ত্যাগ কবিলে আমাদেব যেন বিষণ্ণতা হয়?

সে চিন্তা কবিল অথচ কী হয যদি সে এবং এই অ্যাটকিন্‌সন যাহাব নাম জন ফ্রেডা সেই তাহাব সংসারিক ব্যাপাবে আব একজিকিউটব না থাকে।

অ্যাটকিন্‌স হুইস্কিতে ভাসমান আইস-কিউবটি ঘুবায যেন কোনো বড়ি সেই মদেব তলায় একেবাবে না গলিযা এখনও তিব তিব কবে।

এঘবে এখন কিছুটা তাপ লাগে বা কেন না কেহই বসন্তেব সীমাব বাহিবে যাইতে পারে না।

অ্যাটকিন্‌সন আবার সেপায়াতে তাব গ্লাসটি বাখে এবং পোড়া সিগারেট ফেলিযা নতুন সিগারেট ধবায়।

তৎকালে সে হাসিয়া বলিল, তোমাব সেই ছবিটির কথা মনে পড়ে ফ্রেডা যা সেইবার সেই প্যাম্‌ফ্লেটে ছাপা হয়।

সেনোরিনা অ্যাটকিন্‌সনকে লক্ষ্য কবিল যেন বা সে তাহার জানুর উপবে তাহাব হাত রাখিয়াছে এবং তখন তাহার গালে ঈষৎ রক্তাভা দেখা গেল যাহা যেন বা সে হুইস্কিরই তাপ। কথাটা কি কিছু নিচু স্বরে বলিয়াছে অ্যাটকিন্‌সন?

সেনোরিনা উঠিয়া বসিল যেন, সে তো বসিয়াই ছিল, এবং ধীবে ধীরে হুইস্কি শেষ করিল।

অ্যাটকিন্‌সনও তাহা লক্ষ্য করিল। যেন বা সে কিছু বলে। কিন্তু মন্যাকল ঠিক করিয়া লাগায় সে। সেনোরিনা শূন্য গ্লাস টেবিলে বাখিলে বলে, আর দিব কি? এবং ফ্রেডা যখন বলিল আর দরকার নাই তখন সে বলে অনেক ধন্যবাদ ডোনা। এই বলিয়া সে হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইলে এবং তাহারা সেই একান্ত বিশ্রাম-ঘরের বাহিরে আসিলে অ্যাটকিন্‌সনে তাহার সেই আসনে বসে যাহা শূন্য হইবে একদিন এমন স্বপ্ন আশা কারো বা থাকে। তখন সেনোরিনা ফ্রেডাও করমর্দন করিয়া তাহার টু-সিটারটির দিকে চলিতে থাকে। এবং সে আরও একবার ভাবে ইহা কি বিষণ্ণতা বলা যায় যে একটি কাজ এতদিন তাহাদের ছিল একজিকিউটর হিসাবে এবং এখন যাহা আর থাকে না। কিন্তু লক্ষ্য কর এখন দরজার এই আর্দালিটি তাহাকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন জানায় কেন না সে হয়তো জানে সেও এই ব্যুরোর একজন ফাইনানসিয়ার।

সেনোরিনা ফ্রেডা হাসি হাসি গাম্ভীর্যে সে অভিবাদন নেয় এবং টু-সিটারটির দিকে চলে। ইহা কি তার একটা ভুল পদক্ষেপ সে হাসিতে যে ভাব তাহাও যেন বলে ইউ নেভার ক্যান টেল।

কিন্তু এখন তাহাকে লাঞ্চের জন্য ফ্রেডা-ভিলায় যাইতে হয়, এবং এই গাড়ির এইতো সুবিধা সে সিন্ডার ট্র্যাকে প্রায় নিজের দৈর্ঘ্যের মতো জায়গাটুকুতেই একেবারে উল্টাদিকে মুখ করিয়া দাঁড়ায়, যেন বা পিছনের দু-চাকার উপরে খাড়া হইয়া ঘুরিয়া গেল।

এবং তাহাব পর গল্ফ তাহার নেশাও বটে। সে কি সেই পোশাকটি আবার পরিবে কারণ প্যাম্‌ফ্লেটে তাহার যে চিত্র ছাপা হয় তাহা কিন্তু গল্ফ খেলিবার পোশাকে তাহাকে দেখিয়াই চিত্রকরের মনে ধরিয়া যায়।

কিন্তু ইহা বা কী? উইন্ড-শিল্‌ডের মধ্যে সমুদ্রসৈকতের কয়েকটি ছাতা ও বিকিনি ও তাম্রাভ দেহকাণ্ড যেন। ইহা কি এমন হয় যে সে হয় শেষ বসন্ত। তাহার ঘোর রঙের সানগ্লাসেব নিচে কিছু কুঞ্চন হয় এবং তাহার কামানো পবে আঁকা ভ্রূ কিছুটা বা উঠে এবং তাহা যেন হাসি। অথবা সে কি তাহার যাহাকে বিপজ্জনক বয়স বলে সেই চল্লিশ। যেন বা সে গম্ভীব হয কাবণ এখন টু-সিটারটিব অ্যাক্‌সিলেটবে কিছু বেশি চাপ লাগে হয়তো। ইহাকে নিশ্চিতই প্রেম বলা হয না। এবং এখনও কত আলো দেখ। ডান হাতের দিকে কাছেব সমুদ্রে যেন প্রতিটি ঢেউএ অজস্র শ্বেত ক্রিসান্থিমাম এবং সেই বালু উড়ানো বাতাসও আছে এবং দূরেব সমুদ্র নীল যেন। পাখিও গাহে না কি?

কোন দেব তুমি আনিলে দিবা

অথবা ফুল ও পাখির বসন্তের দিন কি প্রভাত হইতেই বর্ণনার যোগ্য হয়।

যে হয় আলোব শাফ্‌ট যেন তাহাই পড়িয়াছে যাহাতে মাথার চুলগুলি কোঁকড়ানো নয়, উজ্জ্বল এবং কালচে, পিঠ বেশ চওড়া ও সোনালি ত্বকের এবং সেই আলোকের শাফ্‌টের মধ্যে তাহা ক্রমে উঠিতেছে। তাহার পর সে যেন মুখ ও বুক দেখায় এবং হাতে ধরা আয়না ও সাবানমাখা দাড়ি-ব্রাশ। এমতো দেখার কারণ ইহা এক স্পাইর‍্যাল সিঁড়ি যাহা কামানটির জন্যই তৈরি এবং কামানটির কাছে যায়। ঢালাই লোহার বেশ বড় কামান সেই। কামানটির পিছন দিকে, মোটা পিছন দিক এবং আগুনের ফুটায় কযেকটি ঘাস, পাশেই পাথরেব চাতালে কযেকটি টেনিস বলের চেহারা বা গোলা এখনও যা পিরামিড করিয়া রাখা। সে হাত বাড়াইয়া আয়না, ব্রাশ ও ক্ষুরটি রাখে সেই পাথরের চাতালে। কিন্তু সিঁড়ি যাহা এতক্ষণ দুই দেয়ালের মধ্যে অথবা ধোঁয়া বাহির হইবার পাথরের চৌকোণা চিমনিব মধ্যে স্ক্রুপের প্যাঁচ যেন, অথবা খনিতে বাতাস নামিবার শাফ্‌ট্ যেন, তাহা এখন এমন শেষ হয়, কে ইহার কারণ জানে, যে প্যারালাল-বারের কায়দায় দু-হাতে প্যারাপেটের মাথা ধরিয়া ঝুলিয়া ও নিজেকে দোলাইয়া সে উপরে উঠে। তাহাব কাঁধে বাথ-টাউএল। সে হাতে হাত নাড়ে কেন না প্যারাপেট হইতে কিছু আলগা ময়লা লাগে।

সে ক্ষৌরে বসে এবং এমতো অবাক হয় যে তার ক্ষৌর আর যেন হয় না। সূর্য তাহার পিছনে কিয়ৎ-দূর উঠিয়াছে কিন্তু তাহার সম্মুখে এমন নীল সমুদ্র ও শুভ্র সৈকত কিছু যে কোনো স্ত্রীলোকই ... র হয় না, নিতম্বগুরুতা ব্যতীত এবং বক্ষের বর্তুলাভাস ছাড়াই, যেন যেহেতু একটা ... মোহিত করিবার মতো মাধুর্য-টলমল। যেন বা সে এথা হইতে ... সীমায় ভাসিয়া উঠে আবার সেই নীলে ... আলোকের বন্দোবস্ত আছে। ...। ক্ষৌর পরে হইতে পারে। সে

নিশ্চিতে জন জোয়াকিম ফ্রেডা যে নাকি কর্নেলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং অবসর সময়ে এ বাড়িটিতে ফিরিয়া আসে বাস করিতে যাহার নাম ফ্রেডাকাস্‌ল। কিন্তু আচম্বিতে কেন বা তাহা বিশ্বাসে আসে না এমন এক অনুভূতি হয়।

এবং সেরূপ পা বাড়াইতে যেন খানিকটা আলোক হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া তাহার চারিদিকে ছড়ায় এবং খানিকটা বাতাসও গায়ে লাগে তা এমন যুগপৎ যেন কোন্‌টি আগে তা বোঝা যায় না।

খানিকটা অপ্রতিভ সে একেবারে কাছে চায় এবং তখন মরিচা রং ধরা বড় ফাঁদলের সেই কামানটির পিছন দিকই দেখিতে পায় যাহার আগুনের গর্তে কিছু ঘাস। তাহাব নিচে পাথরের চৌকা চাতালটিতে গুলি-পিরামিডের পাশে সাবান মাখানো দাড়ি-ব্রাশ এবং আরশি। পাথরের প্যারাপেট, যাহার বড় বড় পাথরের টুকরাগুলিতে নতুন সিমেন্টের পয়েন্টিং যাহার উপরে গত বর্ষার শ্যাওলা, একটি সাপের মতো যেন উঁচুনিচু হইয়া ক্রমশ পাহাড়ের ঢাল মতো নিচে নামিয়া গিয়াছে। সবগুলি কামান সমান মাপেরই হয়তো কিন্তু সবগুলিব এক অবস্থা নিশ্চিতই নয় এবং সবগুলির পাশে পাথবের চাতালে এমন গোলার পিরামিডও নয়। এমতো আছে যে প্যাবাপেট ধ্বসিয়া কামানটিকে গ্রাস কবিয়াছে, অন্যত্র প্যারাপেটের উপরে কামানটি ফুটিফাটা যদিও তার গোলার পিরামিড যথাযথ। এবং ঝোপঝাড়ে ঢাকা অন্তত এমন একটি আছে যেখানে কোনো ভ্রমণকারী পাঁচ বছরে হয়ত একবাবও যায় না কারণ তাহা যেন পাহাড়ের জিহ্বার উপরে যেখানে সবদিক হইতেই এখন খাড়া পাহাড়ে না বাহিলে উঠা চলে না।

তাহার পিছন দিক পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট পাইন বন। কিন্তু যথেচ্ছ বর্ধিত লতাগুল্ম এবং পাহাড়ী লম্বা ঘাসে এবং ক্যাক্‌টাস জাতীয় কাঁটাগাছের ফলে বনটি দুর্গমতাব আভাস আনে, কিন্তু দেখ এখন সেই বনের উপরে সূর্যেব আলো পড়িতেছে। এবং সেই বনেব ডাহিনে ধাপগুলি স্পষ্ট যাহাতে চাষ করা ফুলের গাছ।

সে অবশ্যই জন জোয়াকিম ফ্রেডা কিন্তু তাহাতে যেন তার মৃদু অবিশ্বাস। এবং তাহাতে শুধু ওই নীল সমুদ্রেব বাঁক নয়, সে আবাব সেদিকেই চাহিল, এই অবণ্যের উপবে রৌদ্রও, যাহা চক চক করে এবং বা যেন নড়ে, যেন এক ষড়যন্ত্র করিয়াছে। অবিশ্বাস কিংবা তাহা কৌতুকেবই এই এরূপ বোধ হয়। সে আরশিতে আপন মুখ দেখিল এবং দেখিল একফালি রৌদ্র যেন ইটালিয়ান বাগের মতো তাহার জঙ্ঘার উপরে।

জন ফ্রেডা অপ্রতিভের মতো হাসিল যদিও সে সেখানে একা। আরশিটিকে কামানাটাব গায়ে রাখিল সে। এবং সাবানের ব্রাশও ঘষিতে শুরু করিল। সে সময়ে মুখ ওঠানামা করে এবং আবার সেই নীল বাঁকটায় তাহার দৃষ্টি পড়ে। এখন, ইতিমধ্যে দেখ, কিছু যেন পরিবর্তন হয় সেখানে। নীল কি কিছু হাল্কা হয় সেখানে? আলো একটু বা বেশি এবং সেজন্য কোনো কোনো অংশ অত ঝকঝকে যে চোখ চাওয়া যায় না, অথচ সেজন্যই যেন তাহাতে প্রাণের চাঞ্চল্য আসে এবং আরও অধিক সুন্দর হয় কি।

অথচ এমন নয় যে সে এই প্রথম এখানে আসিল। বাহিরের সব ভ্রমণকারী দেখিয়া গেল আর সেই যেন তাহা দেখে নাই! হয়তো যেমতে আজ সে আসিল তাহা এই প্রথম কিন্তু পূর্বে যে আসে তাহার প্রমাণ তাহার সেই ছবিটায় যাহাতে একটি নিকারবোকার পরা মেক্সিকান সমব্রেরোর নিচে এবং তাহার ছায়ায় কপালটা সম্পূর্ণ কালো এক হাস্যমুখ বালক এক কামানের উপরে বসিয়া থাকে। সে ফটোগ্রাফ এই আর এক প্রমাণ যে সে একা আসে নাই এবং হয়ত সে সময়ে তাহার সঙ্গে তাহার নার্স থাকে। সে নার্স যে তাহার সঙ্গে পাহাড়ে বেড়ায় অথবা সৈকতে বেড়ায় এবং সে তাহাব ছোট হাতখানি তাহার হাতের মধ্যে রাখে তাহা তখন স্বাভাবিকই ছিল।

এ শাফ্‌ট যে একেবারে তাহার অজানা ছিল তাহাও হয় না কেন না তাহার এমন স্মৃতি আছে যেন সে একা একা ইহার উঁচু উঁচু সংকীর্ণ ধাপে ধাপে উঠিবার পর হঠাৎ নার্স অত্যন্ত চিৎকার চেঁচামিচি শুরু করে এবং হয়তো সে জেফ যে কয়েক লাফে সিঁড়িতে উঠিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া নামায়। তাহার পর সে নিশ্চিতই বড় হইয়াছে যখন এই ধাপগুলিকে অতিক্রম করিলে কোনো নার্সই তেমন হল্লা করিত না। কিন্তু কী আশ্চর্য মানুষের মন যে সে সময়ে আর একবারও তাহার এই সিঁড়িগুলি বাহিতে ইচ্ছা হয় না কেন? উপরন্তু আগাছা ও পাহাড়ী ঘাসে সম্ভবত উপরের ধাপগুলি একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল যেন সে তাহার অনিচ্ছার প্রতীক রূপেই। তাহার পর এই তিন দিন হয় আগাছা ক্যাক্টাস এবং পাহাড়ী ঘাস একেবারে কাটা হয়। কিছু মেবামৎ দরকার কিছু ফাটল আবিষ্কার করা যেন বা তাহার উদ্দেশ্য।

সে মাথার উপরে দুই করতল যোগ কবে, তাহারা পরস্পরকে টানে যেন তাহার অজ্ঞাতে যে রাত্রির আলস্য ছিল তাহার শরীরে তাহা মোচন করে। সে হাসিল মৃদু মৃদু এবং আরশির দিকে ঝুঁকিয়া ক্ষৌর আরম্ভ করিল। তাহার পিঠে, যাহার পেশিগুলি ভেলভেটের তরঙ্গের মতো, খানিকটা উজ্জ্বল আরামদায়ক বসন্তের রৌদ্র পড়ে।

সে চিন্তা করে, এবং তখনও যুগপৎ আবাব অবাক হয় এবং অনুভব করে তাহার সমাধান নাই, কে বা কেন এই যে ফ্রেডা-কাস্‌ল নির্মাণ করে কতদিন আগে। নিচে তো একটি সাধারণ কলোনিয়াল ম্যানসনের মতো সাজানো বাড়ি যাহাতে আসবাবপত্রগুলি হয়তো বা দুইশত বৎসরেরও পূর্বেকার রুচিমতো, শুধু যেন বা বাড়িটির অর্ধেকেরও বেশি একটি গুহার মধ্যে যাহার উপবে পাহাড়ের এই উচ্চাবচ ঢাল এবং কামানযুক্ত প্যারাপেট সাপের মতো বিস্তৃত। দু-একটি স্তম্ভ দৃষ্টে মনে হয় যেন বা তাহা বাড়ির ছাদ ও গুহার ছাদকে একই সঙ্গে ঠেলিয়া রাখে। গৃহের সম্মুখদিকে একটি গাড়িবাবান্দা মতোও আছে, তাহার কলোনিয়াল পদ্ধতির থামগুলি বাহিয়া আইভি উঠে এবং সেখানে উজ্জ্বল পোশাকের ভ্রমণকারীগণ আসে। তখন দেখ তোমার মনে হয় ইহা একটি আনন্দদায়ক বাড়ি, কিন্তু তাহাই শেষ নয় কেন না প্যারাপেট সাপের কুণ্ডলীটি একই ভূমিসমান্তরাল তলে নয় বটে কিন্তু যেমন এই কামান হইতে নামিয়া যায় তেমনই পাহাড়টির কাঁধে উঁচু-নিচু দূরে-নিকটে হইয়া আবার অন্য নানা অবস্থা প্রাপ্ত ছোটবড় কামান সকল পিঠে ক্রমশ এদিকে উঠিয়া আসে। হাঁ, সেই ভদ্রলোকের, হয়তো তাহার নাম ফ্রেডা ছিল কিংবা তাহার মতো অলীক কিই বা? রুচি কিছু অদ্ভুত ছিল কারণ হয় সে নিচে পাহাড় খোঁদলে বাড়ি এবং উপরে কামান-সজ্জিত বাড়ি ক্রয় করে কিংবা কামান-সজ্জিত এই প্যারাপেট যে কাস্‌লের তাহা নেহাৎ জলের দামে কিনিয়া পরে তাহার নিচে এই গৃহ করে যেন তাহাতে বাস করা সম্ভব। সে ক্ষৌরি শেষ করে, বাথ-টাওয়েলে মুখের সাবান সকল মুছে, পিছনের পকেট হইতে সিগারেট ও লাইটার আদায় করে, মুখে সিগারেট বসানর আগে হাঁ করিয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে। পরে সিগারেট ধরায়, নিজের গায়ের উপরে পড়া রৌদ্র লক্ষ্য করে, অনুভব করে হঠাৎ বাতাস বহিল, কামানের আগুনের খোঁদলে ঘাসগুলি নড়াতে তাহার যে প্রমাণ তাহা টাওয়েলে খানিকটা ঢাকা শরীরেও সমর্থিত হইল। ইহা বড় সুখের দিবসের এই সময় এই রৌদ্র এবং বাতাস।

সে আবার, যেন সে তাহার নিজস্ব এক নীল বাঁক ইতিমধ্যে, সেই নীল রংটিকে লক্ষ্য করিতে চেষ্টা পায়। এবং সে গণে এক দুই তিন, কেননা এখন সেই নীল নীলই আছে বৈ নয়, কিন্তু রৌদ্র যেন তাহাকে আদরে আদরে মাথা খাইতে চায় এবং একই স্কার্ট-প্রান্ত লইয়া দুপক্ষ দুই মত পোষণ করে। তাহার উপর চিংড়ির নৌকাগুলি চলে। ইহা কি পূর্বের অপেক্ষা সুন্দর? যেন বা কবোষ্ণ জলের আতপ্ততা তুমি চোখ দিয়া সর্বাঙ্গে অনুভব কর।

কিন্তু যে বাড়িটিকে ফ্রেডা কাস্‌ল নাম দেয়, সে ক্রেতা কিংবা ইহার নির্মাতা হউক, তাহার

কথা ভাবো। যে দিকেই দেখ তাহার রুচি কিন্তু অসাধারণ ছিল। কেহ বলিতে পারে না এই কামানটি তাহার সেই দ্বিতল গুহা-ভবনের ঠিক কোন অংশে আছে। এই শাফ্ট বাহিয়া নামিলে, তাহা প্রায় খাড়া এক দেয়ালের গায়ে গায়ে, তুমি যেখানে যাও তাহা ভিতরের দিকে এক বসিবার ঘরের বারান্দা। কেমন, বিস্ময় লাগে না?

আচম্বিতে সে যেন শব্দ শুনিতে পায়। উৎস অনুসন্ধানে সে এদিক-ওদিক চাহিল এবং তখন অনুভব করে ইহা যেন প্রায় প্রথম হইতে শুনিতেছে। যেন ধাতুতে ধাতু আঘাত করিলে যে মৃদু ঘণ্টাধ্বনি হয়, যেন বা কাহারা কথা বলে গমগম শব্দে। সিগারেটের ধোঁয়া কিছু উড়াইয়া দেয় সে এবং সিদ্ধান্ত করে কৌতুক বোধ করিতে করিতে যে শব্দতরঙ্গ সম্বন্ধীয় কোনো সূত্র অনুসারে তাহার গৃহের শব্দ প্রতিধ্বনিত ও বর্ধিত হইয়া এখানে এরূপ শোনায়। হয়তো রোজই এরূপ শোনাইয়াই থাকে, কেহ আসে না তাই কেহ শুনে না।

জন জোয়াকিম ফ্রেডা মাথা সম্মুখ-পিছন করিয়া যেন বা ঘাড়ের স্থিতিস্থাপকতা যাচাই করে এবং পরে পা বিছাইয়া বসে। সে মনে মনে বলে ও, আচ্ছা, এরূপ দেখাই স্বাভাবিকই কেন না ইহাই হয়তো এ দ্বীপের পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া। এবং ইহা তাহার অপরিচিতও নয় যেহেতু এই কংক্রিট বাড়িগুলির মধ্যে এখানে ওখানে নিমগ্ন লাল টালির ছাদে যে ছবি তাহা আকাশ হইতে ধরা যায় এবং অনেক প্যাম্ফ্লেটে রঙিন করিয়াই প্রকাশিত থাকে। ওই ডাউনটাউন, ওই পাওয়ার-হাউস, ওই জনসন ব্রুআরিসের বাড়ি এবং উহাই ট্যুরিস্ট ব্যুরোর দপ্তর।

পাঠক শব্দের যেমন প্রসাবশক্তি তেমন আকর্ষণশক্তিও আছে। ডন ফ্রেডা কান পাতিল, কারণ সে যেন তাহার সেই বসার ভঙ্গিতে, সৈকত যেমতো, বসন্তের এক মৃদু উত্তাপ পোহায়, সে হাসে কেন না এই কণ্ঠস্বর যাহা জেড ও জেফের, তাহারা ছাড়া কে বা আছে এই কাস্‌লে, কিন্তু প্রতিধ্বনিত হইয়া কী অদ্ভুত রকমের মোটা শোনায় যেন বা তাহারা হাঁড়িতে মুখ রাখিয়া কথা বলে। এবং তাহার জন্য তাহারা ব্রেকফাস্ট তৈরি করে বা কেন না সে সকল টুংটাং শব্দ পাত্রের সঙ্গে হাতা ইত্যাদির এবং অন্য পাত্রের লাগিয়া যাওয়ার শব্দই হইতে পারে। কিন্তু কী জোর আওয়াজ, যেন সে রাক্ষসদের রাজা এবং তদ্রূপ ব্রেকফাস্ট হয়।

জন জোয়াকিম ফ্রেডা না হাসিয়া পারে না। এবং স্থির করে নিশ্চয়ই কোনো ফাটল আছে অথবা সেই চৌকোণ ঢাকা চিম্‌নিগুলির কোনো একটি কাছেই হইবে।

কৌতূহল ও কৌতুকবোধ লইয়া খুঁজিতেই যা সে আশঙ্কা করিয়াছিল তাহাই পাইল। সে যেখানে তাহার দু-এক ফুটের মধ্যেই কিন্তু তাহা ধোঁয়ার চিম্‌নি নহে পরন্তু যেন বাতাস যাইবার পিরামিড-আকৃতি ঢাকনা পরানো এক শাফটই এবং তাহা দিয়া শব্দগুলি আসে এবং জন তাহাতে চোখ রাখিতে কিছু যেন দেখিতে পায়। সে তখন কৌতূহলের তাড়নায় ঢাকনি পিরামিড ঠেলাঠেলি করে এবং তাহা কিছু সরিয়া যায়। তখন সে আবার তাহাতে চোখ রাখে এবং প্রায় হাসিয়া ফেলে। জেড ও জেফ, এবং তাহারা ছাড়া আর কেউই নয়। জেডের শরীরের লম্বালম্বি অর্ধাংশ দেখা যায়, তাহার সে হাতে একটি সস্‌প্যানের হাতল ধরা, জেফের হাঁটু, কোমর, কোট, দু হাতে ধরা খবরের কাগজ দেখা যায়। আর তাহারা যেন লাইবেরিয়া সম্বন্ধে কি আলাপ করিতেছে। কিন্তু উহাদের তো একতলার কিচেনে থাকার কথা কিন্তু এত উপরেও যেন তাহাদের কয়েক হাত মাত্র দূরে দেখায়। এই কাস্‌ল লইয়া জন ফ্রেডা কী করে? যেন এক রহস্যই। হয়তো বা এমন গঠন যে একাংশের দ্বিতল অন্য অংশের একতলেরও নিম্নতলে অবস্থিতি করিতে পারে।

জন ফ্রেডা মুহূর্তে ইতিকর্তব্যতা স্থির করে। সে শাফ্‌টের মুখে মুখ রাখিয়া সিংহের মতো গর্জন করে। এবং সে বুঝিতে পারে তাহা অত্যন্ত গুরুগম্ভীরই হইল। কারণ তাহার কানেই তাহা ভীষণ রকমে প্রতিধ্বনিত হয়। সে চোখেও দেখে জেফ ও জেড কিছুটা অবাক যেন। জেড এদিক-ওদিক

তাকায় এবং জেফ খবরের কাগজ হাতে তাহার কাছে উঠিয়া আসে। কিন্তু সেই শাফ্‌টে উপর হইতে নিচে দৃষ্টি চলে পরন্তু উল্টাটি হইতে যে নাই।

জেড আবার কাজে মন দেয় জেফ আবার কাগজ লইয়া টুলে বসে জন ফ্রেডাও শাফ্‌টের মুখের কাছে মুখ রাখিতে উপুড় হইয়া শয়ন করে।

জেফ খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলে, ওয়াল্‌ডো সিবাস্টিয়েন আর এ দ্বীপে ফিরে না, সে হয়তো লাইবেরিয়াতে যায় এবং ফ্রিটাউনে বাস করে। আর তাহার মতো যুক্তিযুক্ত কি? কেন না আমি তুমি, ওয়াল্‌ডো এবং আমাদের মতো অন্য অনেকে কি আফ্রিকারই নহি।

ছাই। জেড বলিল। ইহা তোমার কল্পনা। তুমি হশিস খাও তা কে না জানে।

কিন্তু আশ্চর্য, জেড, তুমি এ সব কিছুই অনুসন্ধান কর না।

জন ফ্রেডার বিষম হাসি পাইল। কথাগুলি কী পরিষ্কার না শোনা যায় যদিও মনে হয় যেন ইহারা ইচ্ছা করিয়া কথাগুলিকে মূল্যবান করিতে মোটা গলায় বলে। এবং এমতো শোনা যায় যে তা হয়তো সেই আদি ফ্রেডাও জানিত না যে অতীতে এই প্রাসাদ কাহারা বানায় বা ক্রয় করে। কিংবা তাহার উপাধি যে ফ্রেডাই ছিল তাহাও হয়তো ঠিক নয়।

অতঃপর সে শাফ্‌টের ফাটলে মুখ রাখিয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন বিকট যে জেডেব মুখে দুশ্চিন্তা দেখা দেয় এবং সে উর্ধ্বে তাকায়। জেফও উঠিয়া আসে। কিন্তু তাহাদের মাথাব উপরে তো নিশ্চয়ই ছাদ।

জেড বলে, কে? কেহ কি কিছু বলিতেছেন?

জন বলিল, হাঁ, আমি তোমাদের আফ্রিকার দেবতা রা।

জেড নিজের বুকে ক্রস চিহ্ন আঁকিল। ইহা তাহার অভ্যাস।

জেফ জেডকে কি বলিল, তুমি কি প্রকৃতই মনে কর ইহা রা বা অন্য কোনো দেবতার কণ্ঠস্বর। তুমি কুসংস্কারে ডুবিয়া আছ। এই দেখ আমি কথা কহি।

অতঃপর জেফ ছাতের দিকে মুখ তুলিয়া বলে, আপনি কী চান?

জন পুনরপি বলিল, আমি রা দেবতা। তোমরা কি আমার বন্ধু জন জোয়াকিম ফ্রেডার ব্রেকফাস্ট প্রস্তুত করিয়াছ?

জেফ হাসিল এবং জেডকে বলিল, দেখ জেড ইহা আমাদের মনিবের কণ্ঠ। সে তাহার পর ছাতের দিকে মুখ করিয়া বলে, আপনি খুব জোরে কথা বলেন যেন। আপনি কি বাথরুম হইতে বলেন যেদিকে ক্ষৌরি করিতে যাইতে আমি শেষ দেখি। হাঁ মিস্টার আপনার বন্ধুর ব্রেকফাস্ট আর বিশ মিনিটে প্রস্তুত হয়।

জন ফাটল হইতে চোখ সরায় এবং আপন মনে খিল খিল করিয়া হাসে।

আর যাহা হউক ব্রেকফাস্টের আরও বিশ মিনিট দেরি আছে। এবং তাহার মতো আর কে জানে জেফ এসব বিষয়ে মিনিটের ভগ্নাংশে কথা রাখে। সুতরাং নয় বাজিতে সেই রকমই দেরি। সে বাথ-টাওয়েল বিছাইল এবং শুইয়া পড়িল যেন সে ইতিমধ্যে এক নীল সমুদ্রে সৈকতে পৌঁছিয়াছে। তাহার মাথা সেই ফাটলের দিকে এবং এক পা গোলার পিরামিডের উপরেরটিকে স্থানচ্যুত করিল। পরে সে যুক্তি দিল সে বরং লাঞ্চের আগে স্নান করিবে ব্যায়াম শেষে। যেহেতু এই বসন্ত সকালে এ রৌদ্রের তুলনায় স্বাস্থ্যপ্রদ কিছু নাই। সে বরং মুখ একদিকে ফেরায় যাহাতে সূর্য মুখে না পড়ে, কারণ এপ্রিলের সূর্য মুখে ফোস্কা দিতেও পারে। সে ভ্রূতে হাতের বারেন্দা রাখে কেন না সেদিকে সে দ্বীপের ডাউন টাউনের পরিচিত ছবিটিই স্পষ্ট হইল। কিছুক্ষণ সে যেন এ বাড়ি হইতে ও বাড়িটির গঠনকে পৃথক করিয়া দেখিতে চেষ্টা করে। হাঁ, এ সপ্তাহের একদিন তাহাকে ট্যুরিস্ট ব্যুরোর দপ্তরে যাইতে হইবে কেন না কিছু টাকার প্রয়োজন। আগামী বরাদ্দের

এক অগ্রিম অংশ হয় হউক। উহা দেখিতে সুন্দর বটে। আব ইদানীং এপ্রিলের চড়া আলোয় যেন তাহার রূপ খুলিয়াছে। এমন কি বাড়িগুলির পাশে পাশে নিক্ষিপ্ত তাহাদের আপন ছায়াগুলিকে কি দেখা যায়। হাঁ, কিছু প্রভেদ আছে। হেলিকপ্টার হইতে তোলা ছবিতে যেমন এবাড়ি ওবাড়ি মিলিয়া এক রঙের এক কম্পোজিশন মনে হয় এখন সেমতো নয়। যেন পৃথক পৃথক সেগুলি। এবং তাহাতেও রূপসী।

এখন কি সিগারেট ধরায় আবাব। না, তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়, ইহা তাহাব বিশ্ববিদ্যালয়েব কোচ পৈ পৈ করিয়া বলিয়াছে। তাহা ছাড়া যেন তাহা এই আবেশে কিছু যতি বসায়। ওদিকে দেখ জেড ও জেফ কথা বলে। হয়তো রোজই এরূপ বলে, সে ইতোমধ্যে আতপ্ত বাথ-টাওযেলে নিজের শরীর গড়ায়, কিন্তু এ কী এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখ প্রয়োজনে ওরা আমার কথা শুনে আমি উহাদের কথা-শব্দ শুনিতে থাকি, কিছু বুঝি কিছু অবুঝ থাকে, কিন্তু উহারা আমাকে আদৌ দেখে না এবং অন্তত এখন উহাদের দেখি না। কীই বা ইহা অপেক্ষা বেশি কৌতুকের। অথচ এই জেড ও জেফের সঙ্গে তাহার জীবন বাঁধা। বুড়া জেড, এখন তাহার মাথাব চুলগুলিতে মরিচা রং ধরিয়াছে, কিছু দাঁতও নাই, হয়তো তাহার শৈশবে নার্সের সঙ্গেই বহাল হয়। নার্স চলিয়া গেল কিন্তু সে তদবধি ব্রেকফাস্ট প্রস্তুতই কবে। সে জেড। কেহ রসিকতায় তাহাকে জেড বলিয়া থাকিবে সেই প্রকারই রং তাহার কাল্‌চে জেড। জেফের নাম নিশ্চিতই বাড়ানো যায়, এবং তখন সে জেফারসন অথবা জিওফ্রে, সম্ভব পরেরটি আগে জিওফ্রে জেফারসন হইবে। টুপিতে মাথা ঢাকে যদি, তখন সেই গাঁট্টাগোট্টা লোকটিকে তুমি বড় জোর দক্ষিণী ইউরোপ খণ্ডের একজনই বলিবে যতক্ষণ না তুমি তাহার শ্বেতবর্ণের মুখে সে দুই চওড়া নাসারন্ধ্র এবং বিশেষ পুরু ঠোঁট লক্ষ্যে আনো। ইহা সেই আফ্রিকারই যাহাকে লইয়া স্যাডিস্ট ভালোবাসার তৃপ্তি হয়, খোঁচান, পুড়ানো, চাবুকে চামড়া ফাটানো এবং তাহাকে ধর্ষণ করিলাম ভাবিযা নিজের অজ্ঞাতেই তাহাতে আধুনিক মানুষের বীজ রাখিয়া আসিতে হয়। কিন্তু সেই বিস্তৃত নাসারন্ধ্র কি মাটির এবং পশুব পৃথক পৃথক ঘ্রাণ সুষ্ঠুভাবে পাইতে এবং সেই পুরু ঠোঁট কি ধ্যানের ফল কেন না তেমন নিবিষ্ট ধ্যানে কি ঠোঁট সম্মুখে অগ্রসর হয় না?

কৌতুকেরও যেন শেষ নাই। সে যেন এমতো এক পরিস্থিতিই বটে যাহাতে যখন উহাদিগকে দেখ তখন শুনিতে পাও না, কিংবা অন্য সময়ে শুনিতে পাও কিন্তু যেন ব্যবধান থাকে। জন মিট মিট করিয়া হাসে।

জেড সম্ভবত প্যানে কিছু চাঁছিল। সে বলিল, তোমার ডন ওয়াল্ডো অথবা ওয়াল্ডো সিবাস্টিয়ান কি সেই ছোকরা যে দ্বীপের কোনো কালে সর্বাপেক্ষা ভালো লক্ষ্যভেদীর পুরস্কার পায়? আমি শুনিয়াছি ওয়াল্ডো এখানে জনসন ক্রুআরির আখের ক্ষেতে কাজ করিত। যেবার সে সেই পুরস্কাব পায় তাহার পরের শীতেই সে ফ্লোরিডায পলায়ন করে।

জেফ। তোমার দেখি, বুড়া, ফ্লোবিডার কথা মনে আছে ; কিন্তু পুরস্কার যে একটি রূপার অত্যন্ত সুন্দব কারুকার্য বসানো পিস্তল তাহা মনে রাখ না।

জেড। তাহা জানি।

জেফ। সেই পিস্তলটির ডাঁটে নলে ফল ত্রিপত্র সমেত পুরু এবং উজ্জ্বল রূপার কারুকার্য এমন যে তাহাকে রূপার পিস্তল বলে। তাহাকে কী অপূর্ব যে।

জেড। এবং তাহার গুলিও হয়তো রূপার।

জেফ। তুমি রূপার গুলির কথাও জানো? তুমি দেখি, আচ্ছা র বুড়া।

জন ভাবিল, দেখ ডাউনটাউনেব মানুষগুলি, উহারা কি জানে আমি কপালের উপর হাতের বারান্দা লাগাই উহাদের লক্ষ্য করিতে এবং আমিও জানি না উহারা কী কী করে এবং কেনই বা

সে সকল করে, এবং কীই বা ভাবে এবং উহারাও জানে না এখানে আমি কিছু করি বা ভাবি। এবং এমতোও হয় যে যখন ডাউনটাউনে পাশাপাশি তখনও কি জানিতে সম্ভব কে কী করে এবং কেন করে এবং ভাবেই বা কী? দেখ উহারা নিচে কী এক রূপার গুলির কথা বলে। আর অভ্যাসের ফলে কথাগুলি গম গম শব্দ হইতে পৃথক করিতেছে সে।

জেফ। প্রত্যেক মানুষের কি শিকড় থাকে না?

জেড। হো, হো, মানুষের শিকড়!

শিকড়, মানুষের শিকড় বা কি? জন ফ্রেডা পাশ ফিরিয়া ফাটলে চোখ রাখে। কৌতুকের প্রত্যাশায় তার ঠোঁট দুটিতে হাসির মুদ্রা গড়ে। জন ভাবিল, ইহা হয়তো এইসব কাগজ পড়িবার ফল যাহার নাম 'আইল্যান্ড ব্লিৎস' বা সেরূপ যাহা জেড-জেফ সম্প্রদায়ে সবিশেষ জনপ্রিয়, যাহাতে কোনো রাজনীতির কেউকেটার শ্যালকের অথবা পুত্রের হঠাৎ বড়মানুষীর গল্প এবং বিন্দু জেড-জেফ সম্প্রদায়ের দরদ অর্থাৎ পাঠকদের চাটুকারিতা, সিনেমা স্টারের স্ট্রিপটিজ ছবি শেষ পাতায় এবং খেলার অপেক্ষা খেলুড়েদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা থাকে। দেখ অন্তত একখানি কাগজই তো পড়ে জেফ, যেন বা ইহা ছাড়া তাহার সকালে কোনো কাজ নাই। এই সময়ে জেড এক কাপ চা করিয়াও দেয় যে এবং জেফের পাশে কোথাও রাখে তাহা দেখা যায় না। কিন্তু কৌতুকের দেখ শাফ্‌টটি তেরচা হওয়ার ফলেই যেন মনে করি জেড জেফ এবং সে জন নিজে একই ঘরে ইতস্তত অবস্থান করে। সে কি এখন আবার ফাটলে মুখ রাখিয়া সিংহের মতো হুঁম্‌হো করিবে! জন আবার উপুড় হয় এবং এবার সেই সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরায় যা যেন নীলত্বে তাহার নিজস্ব। এবং জেফ ও জেড তাহাদের আলাপ চালাইতে থাকে।

জেফ। আচ্ছা, বুড়া, তোমার উপাধি কি?

জেড। আমার যাহা উপাধি তাহাই নাম।

জেফ। তুমি সে পুরানো গল্পই বলিবে বুঝিতেছি। বলিবে দশ বৎসর যেই তোমাকে ডাকিয়াছে সেই জেড বলিয়া থাকে এবং তোমার সেই স্ত্রীলোকটিও প্রথমে মিস্তা ডেজ পরে জেডই বলিত। কিন্তু উপাধি না থাকে পিতা তো থাকে। এবং তাহাব এক পিতা এবং তাহারও এক পিতা এবং তাহারও এক পিতা এবং তাহারও...

জেড। জেফ তুমি থামো। অবশ্যই থামিবে নতুবা এই প্যান তোমার মাথায় মারিব। এবং দেখিবে তিনকুড়িতেও জেডের প্যান তোমার মুষ্টিযোদ্ধার পাগুলিকে মোমের তৈরি এমতো করিবে।

জন দেখিল না যে কেমন জেডের ভঙ্গি শুনিয়া জেফের মুখ কি ছবি হয় কিন্তু সে হাসিল যে তাহার পিঠ বাথ-টাওয়েল হইতে প্রায় ইঞ্চিখানেক উঠিয়া উঠিয়া পড়ে। কিন্তু শিকড় কী? উহা কি তাহার পিতা এবং তাহার পিতা এবং আরও তাহার পিতার সারি। আশ্চর্য তো!

জেফ। তোমার কি পিতা ছিল না? আমি তোমার পুরানো গল্প জানি যাহা তুমি নিজেই বল। দ্বীপে জামাইকা এমন কি ডাউনটাউন ডেনভারে আসিবার পূর্বে সে এক পুরুষ যে তোমাকে রোগে দেখে, প্রহার করে, বৃষ্টির জন্য জুতা ব্রুশ করিয়া এবং পরে কাগজ হকারি করিয়া এক পয়সা না পাইলেও কোনোদিন সে তবু খাইতে দেয়।

জেড হয়তো প্যানের কানায় অথবা চাটুতে ঠক ঠক করিয়া ঠুকে। সে বলে, আজ খুব ভালো লাগিতেছে যে স্টেকটি ভিতরে বিশেষ নরম থাকিল। তুমি কি জানো জেফ আমাদের মিস্তা জন ফ্রেডাও হয়তো অলিম্পিকে স্বর্ণই পায়। এবং তুমি বলিবে তাহাও তো কর্নেলি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইয়াংকি রূপেও হয় যেমন ডন্ ওয়াল্ডো আমেরিকান রূপে স্বর্ণ পায়।

জেফ। কিন্তু তৎক্ষণের বেশি কিছু দেখ না। এখন এই স্টেকই।

জেড। তাহা কি দরকার নয়? দেখ বড়জোর পাঁচ মিনিট পরে নয় বাজে। আমাদের মনিবের

আর কাজও নাই, কিন্তু নিশ্চিতই ব্রেকফাস্টের জন্য তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়। কিন্তু জেফ তুমি হয়তো ভাবিয়া থাক আমি সে পুরুষটিকে যাহাকে আমার অন্তত মনে মনে বাপ ডাকিতে সাধ হইত, তাহাকে প্যানের বাড়ির ভয়ে এবং তাহা এমন যে মাথায় দু-তিনটি সেলাই এবং উভয়ই কব্জি স্প্লিন্টারে বাঁধা থাকে, তাহাকে ত্যাগ করিয়াছি এমন এখন মনে হয় না। তখন হয়তো সেই ভয়েই জায়গায় হইতে জায়গায় পালাইতে থাকি। তুমি কি শুনিবে?

জন ভাবিল ইহা কী আশ্চর্য কথা যে মানুষ শিকড় খুঁজে: অর্থাৎ যেন এই পিতাদের শোভাযাত্রা সে কি আফ্রিকার কোনো কালো মাটিতে পোঁতা থাকে।

জেফ। নিজেই বর্ণনা করিতে গিয়ে তাহাকে বাপ বলিয়া বা মনে কব।

জেড। এখন তাহা বিশেষ শক্ত। তখন হোটেলে ব্রেকফাস্টের পালা শেষে লাঞ্চের পালা আসিবার আগে ওয়েটার বয় ইত্যাদি টেবল-চেয়ার কাঁচ-অ্যালুমিনিয়াম ঘসা-মাজা শেষ করিয়া এ-চেয়ারে ও-চেয়ারে বসিয়া বিশ্রাম নেয়। তখন আমি নিতান্ত ক্ষুধার্ত বোধ করি কারণ আগের রাত্রিতে বাঁদরামির জন্য, তা সত্যই বাঁদরামি ছিল, হেড-ওয়েটার আমাকে বন্ধ করিয়া রাখে। ভাবিলাম তখন চুপিসারে রান্না ঘরে গেলে হয়তো দুই-এক থাপ্পড় দিবে বাপবা যেমন দেয় তবে রুটি জেলি মাংসের ভাঙা টুকরা-টাকবায় প্লেটে না হোক হাতে হাতে খাইতে দেয়।

জেফ। সে ঘরে অন্য লোক ছিল যেমন ইতিপূর্বে বলিয়াছ। না জেড আজ তোমার রসুন কাঁচালঙ্কা ও মাখনের সম্বারে আমারও ক্ষুধা পায়। সে যাই হোক লোকের সামনে খাইতে চাওয়ায় সে পুরুষ তোমাকে মারে।

জেড উত্তর না দিয়া চাটুতে কিছু গরম করে, মৃদু ছোঁক ছোঁক শব্দ হয়।

এবং তাহা জনকে আকর্ষণ করে। হাঁ, তৃপ্তিকর সুস্বাদ কিছু অবশ্যই জেডের এই রসুন কাঁচালঙ্কা ও মাখনের সম্বাবা। সে তাহার আকর্ষণে এখন আবার উপুড় হইয়া ফাটলে চোখ রাখে।

জেড তখন নিজের বুকে কপালে একের অধিক ক্রস্ কাটে এবং কহে তুমি তো বাইবেল শুনিয়াছ তাহাতে কি সডম দেশ নাই? তাহাবা, সেই পুরুষ এবং অন্যে যে বালক বোধে পুরুষ নয় এরূপ বলা যায় না, সে গায়কের না আসা ঢিলা সময়ে ক্রীড়াদি করে। এবং না এমতো হয় না, ও জেফ, হয় কি? তুমি খুবই ভুল করিবে যদ্যপি তাহা বন্ধ্যা হয় না।

জেফ। আমেন, আমেন।

জেড। কিন্তু আমাদের মিস্তা ফ্রেডা কি সমুদ্রে সাঁতরাইতে গেল?

তৎকালে ফ্রেডা নিজ মনে আ ছি বলে এবং পাশ ফিরিয়া শয়ন করে অথবা আর কতক্ষণই বা বসন্ত-প্রভাতের আবেশজনক বোদ পোহায় সে। নয় তো বাজেই। সে এক ছোট্ট হাই তুলে এবং সম্মুখদিকে বাহু দুইকে, তাহাদের সুবলিত বলিতে হয়, প্রসারিত করে ও তাহাদের তালু দুইকে উত্থান অবস্থানে এক করে। ইহা সম্ভব হয় না যে তাহা ভাইব দিবাব ভঙ্গি হয়, যদিও সে প্রসারিত হাতের দিকেই সে অবিস্মরণীয় এবং ইদানীং যেন বীজপ্রাপ্ত যৌবন হেন ঝিকি-মিকি এক সানন্দ নীল বা যেন রমণীগণ হইতে অধিক, কেন না তাহা তো ঝাড়া দুই মাইল দূরে এবং এ প্যারাপেট কমেও তিন হাজার ফিট উচ্চ অথবা এটিকে পাঠকের উপরে ছাড়াই ভালো যেন যে যাহার মতো বোঝে।

জন জোয়াকিম ফ্রেডা মনে মনে চিন্তা করে অথবা শিকড় বলিতে ইহারা কী বা বুঝায়?

অতঃপর সে ব্রেকফাস্টের জন্য উঠে এবং বসা অবস্থায় যাহাতে পা দুটি তখনও ছড়ান, নীল উল্লাসটি আবার তাহার চোখে পড়ে যাহার প্রেমে সে পড়িয়াছে। পরন্তু সে বা কি করিয়া ফ্রেডা এ প্রকার চিন্তায় যেন মগ্ন হয় কিংবা তাহা যেন সেই নীলকেই যেন করমোর‍্যান্টের মতো লম্বা গলায় প্রবেশ করে, ফুঁড়িয়া উঠে আবার প্রবেশ করে, অথচ কি আশ্চর্য তৎকালেই নিজের বাহুতে

যে রোমসকল বসন্তরৌদ্রে স্বর্ণকণিকা তাহাও প্রত্যক্ষ করিতে থাকে এবং যে গোলাটি পিরামিডভ্রষ্ট তাহাও তুলিয়া দেয় এবং প্রত্যক্ষ করে অগ্নিছিদ্রে সবুজ পাহাড়ি ঘাসগুচ্ছি সমেত কামানের সেই গুরুভার পশ্চাদ্‌ভাগ। এই ফ্রেডা কাস্‌লে কে বা তাহাকে স্থাপন করে কিংবা তাহাকে ফ্রেডা উপাধিতে নির্দিষ্ট করে! এরূপ কাহিনী খুব সহজেই বলা যায় এবং বিশ্বাস করা হয় যে তাহার পিতা বা মাতা কেহ ফ্রেডা , অথচ তাহাবাই বা কী ভাবে তাহা? এবং ডাইভোর্স বলিবে যে, যাহার উপরে তাহার ন্যাস সে হয়তো বা মৃত যে এবং অনাপক্ষ এমতো অপবাধে অপরাধী যেমন পুনর্ন্যাস হয় না যে এরূপ এক প্রকল্প হয় বটে।

সেও কি পিতাকে অবিশ্বাস করে জেড যেমতো। পকেট হইতে ছুরি বাহির করে সে, প্রথমে নখে পরে কামানের সেই ঘাসগুলিতে প্রয়োগ করিতে থাকে। তখন সে আপনাআপনি হাসে যে তাহাব পর সেই পুরুষ যে তাহার জন্য দায়ী বা সে হয়তো এমন এক অপরাধ করে যে তাহার কার সমেত তাহাকে দ্বিতীয় হার্বারের জল হইতে দুদিন বাদে তোলা হয়, সে অন্য কাহারো গল্প এমন সে শুনিযাছে।

এবং তাহার জননীও কেহ নয়। কেন না নিশ্চিতেই সে জানে তাহার ধাত্রী প্রকৃতপক্ষে তাহার জননী নয়। তৎকালে সে একই সময়ে যেন বা অতীত এবং বর্তমানে অবস্থান করে এবং যেমতো সে এবং ধাত্রী ফ্রেডা কাস্‌লের নিভৃতে বড় জাঁকজমকপূর্ণ খাটটিতে ঘুমেব আগের পরস্পরের নিশ্বাস শুনিতে পাইতে থাকে, এবং যেমতো সৈকতে শায়িতা কাহাকে এবং/অথবা মুহ্যমান বারি তরঙ্গের টানে ক্ষুদ্র নিজেকে কাহার সুঠাম ক্রিম রঙের উরুদ্বয়ে লগ্ন দেখে সেমতো লাল টালিতে আইভি, ছোট কফি কাপ ও ক্ষুদ্রাকাব হনিস্কোন এরূপ একগৃহে অতিথিও দেখে। অথচ কিন্তু সে তৎকালেই আয়নাকে তোলে, নিজেকে বিশেষ ক্ষৌরি পর্যবেক্ষণ করে। সে দেখে নাইলন ব্যায়ামেব গেঞ্জিব উপর তাহাব বুকের পেশি যাহা গর্বের এবং স্বর্ণাভ বোমরেখা যাহা নগণ্য। সে ঘর হয়তো ছোট ছোট কফি কাপ ক্ষুদ্রাকার হনিস্কোনে সান্ত এবং সে ইটালিয়ান পুরুষ হাসেও প্রচুর কিন্তু তাহার, সেই ছয় বাই চার, আয়তক্ষেত্র পুরুষের, বক্ষে এত বোম ঘন কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত যে যে কেহ আশ্চর্য হয় এবং সেও ভ্রূদ্বয় যুক্ত করিল। কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ হাসিয়া এ যুক্তি প্রয়োগ করে সে. তাহাব ধাত্রী, প্রকৃতই হয়তো সে নিমিত্ত কোণঠাসা বা শয্যাভীত নয় যে তাহাতে ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই ; যেহেতু ফ্রেডাভিলার অত্যধিক রূপসী সেই সেনোরিনা ফ্রেডা (কী আশ্চর্য অথচ তাহার যেন কী দায়িত্ব) যেমতো সে ধাত্রী যাহার সাদামাঠা দূরে দূরে বসানো চোখ বিবর্ণপ্রায় প্রায় চৌকা মুখে সেই তাহা হয়তো সুখই বা বাল্যে তাহাকে মাম, মামি ইত্যাদি বলা সত্ত্বেও সে তাহার জননী হয় না, তাহার ইটালিয়ান আয়তক্ষেত্রকে ঝুটা বলিবে যে।

জন ফ্রেডা উঠিয়া পড়ে এবং শাফ্‌টের মুখে যায়। এখন তো তাহাকে শাফ্‌টের দুই দিকের প্রাচীরে হাত রাখিয়া প্যারালাল-বারে দোল খাইয়া নিচের সিঁড়িতে নামিতে হয়। সে তখন ভাবে এই কী আশ্চর্য হয় দেখ যে সে প্যারাপেটে ক্ষৌর করিতে আসে কেন। অথচ সবকিছু যেন কত না পরিচিত। অহো, বুঝি এই কোনো পুস্তকে আছে। হাঁ, তাহাই। ইহা ইউলিসিস। পুস্তকের কী প্রভাব। সেনর অথবা মিস্টার জন জোয়াকিম ফ্রেডা আপনাআপনি হাসিল।

তাহার পর নিচের সিঁড়িতে সে দাঁড়ায় এবং হাত বাড়াইয়া ক্ষৌরের সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে থাকা কালে সে মনে মনে কহে, আহা, আর একবার ফাটলে মুখ রাখিয়া বলিলে হইত যে আমি আসিতেছি, জেড ও জেফ, তোমাদের দেবতারা।

সুকেশিনী সে কৃষ্ণাই সূর্যসকলকে প্রসব করে

এই দেবতা রা যে সকাল আনে তাহা তো রাত্রিরই সন্তান। এই দ্বীপে, যেমন অন্যত্র, সে রাত্রিও যেন এক মৃত ষণ্ডের ধূমল রক্ত হইতে সন্তানবতী। আকাশ কপিশ আহত সেই ষাঁড় যাহার রক্ত ক্রমশ ছড়ায় এবং নিজ কপিশ দেহকে রাঙায় এবং কেহ ভাবিতে থাকে এখনও বা সেই লাল ধূলা উড়ে। হতাশ অন্তহীন ক্রোধে সে ক্ষুরে ক্ষুরে এই লাল ধূলা উড়াইয়াছিল।

লাকিওয়াল্টার।। দেখ রবিন্সনের, সে সপ্তদশ ববিন্সন বলে, পিওর গোটমিল্ক চীজের এই কারখানাকে রাঞ্চ বিশেষ বলা যায়। লাকি ওয়াল্টার বাহিরে আসে এবং তাহার নিজের কাঠের বাক্সটিতে বসে। তখন সে পাইপ বাহির করে এবং মশলা অথবা আগুন না দিয়া চুষিতে থাকে। এই যে নিকোটিন-টার আছে। প্রেডিগ্রি পাঁঠাগুলিকে দেখিয়া তাহারা যাইতেছে এবং উহাদের একজন অন্য কাহাকেও পেগি বলে আজ যাহা এই দিনের মতো শেষবার।

হাঁ ইহা আধুনিক রাঞ্চই। ছাগগুলি আছে, তাহাদের দুগ্ধ হইতে পনির তৈরি এবং তাহাকে পাত্রস্থ করিতে কারখানা ও ভ্রমণকারীদের দেখাইতে সুদৃশ্য খাঁচায় পাঁঠার কয়েকটি রাখা আছে। এ সকল হইতে দূবে বাদাম গাছের সারিতে আড়াল রবিন্সন পরিবারের আধুনিক বাড়ি এবং তাহারই একাংশে রাঞ্চের দপ্তর যেখানে ভ্রমণকারিগণেব বসিতে বিশ্রাম করিতে সুদৃশ্য লবি ও তৎসংলগ্ন মিল্কশেক-বারও আছে। অতি অল্প মূল্যেই কাগজের সুদৃশ্য গ্লাস-সকলে পবিমাণমতো এলকোহল-মিশ্র বরফে শীতল ছাগদুগ্ধ পান করিতে থাকাকালে ভ্রমণকারিগণ দেয়ালে বিজলীতে ফুটিয়া ওঠা ছাগদুগ্ধের, বিশেষ যাহা এই রাঞ্চের, গুণাগুণ পড়িতে সুযোগ পায়। হাঁ, হয়তো এই শেষবার যে তাহাকে উঠিতে হইল এবং পেডিগ্রি পাঁঠাগুলিকেও ভ্রমণকারীদেরকে বুঝাইতে। এখানে গাছ, ওখানে লতাগুল্ম অথবা টেরেস। ছায়াগুলি এখন তাহাদের মধ্যে লম্বা হইয়া মাটিতে পড়ে।

দুগ্ধ দোহনের চাগচাগ, পনির আধারস্থ করিতে গোন্ গোন্ শব্দ কখনও কানে আসে। তাহাতে প্রমাণ কখনও সে চিন্তায় নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবিষ্ট, কখনও বা তাহার দৃষ্টি ও শ্রবণকে অবলম্বন করে, যাহাতে যেন তাহার মন বাতাসের মতো ইতস্তত ভাসে।

ওয়াল্টার এক সময়ে দুধ দুহিত তখন তো এই চাগচাগ যন্ত্র হয় নাই, তাহার পর এক সময়ে ডেলিভারি-ভ্যানের ড্রাইভার ছিল তখন তো কনভেয়র-বেল্টে ক্রেটগুলি পাহাড় ডিঙাইত না। এখন সে পেডিগ্রি পাঁঠা কয়েকটি দেখিয়া রাখে।

লাকি ওয়াল্টার বাম পার্শ্বে পায়ের কাছে থুতু ফেলিল।

হাঁ, এইগুলিকে পেডিগ্রি পাঁঠা বলে যাহা দেখিতে ভ্রমণকারীদের ভিড় হয় এবং যাহারা নাকি সেগুলিরই উত্তরপুরুষ রবিন্সন স্বয়ং যে সকলকে বন্য হইতে গৃহপালিত করে। গায়ে প্রচুর রোম, শিংগুলি বেশ বড়ই এবং পাকানো, কয়েকটি বেশ বয়স্ক এমনও আছে যে ছাগীতে ভ্রূক্ষেপ নাই। দেখিবে শূন্যে শিংসমেত মাথা ভাসাইয়া রাখে যে যেন নাসারন্ধ্রে কিছু কাঁপে।

আর এখন বৈকাল, তাহা বসন্তেরই. যে ছায়াগুলি লম্বা লইয়া পড়ে, এবং দূরের লতাগুল্মগুলি অস্পষ্ট এবং বসন্তের দরুণ মাটি লুকানো ফুলগুলিকেও গোপন রাখিতে পারে না যে তাহার গন্ধ আসে। ওয়াল্টার তাহার ঈষৎ চওড়া নাকযুক্ত লাল মুখটি তুলিল যেন বা তাহার শাদা ঝাঁকড়া চুল-সমেত মাথাটিকে ভাসাইয়া দিবে।

সেইক্ষণে ছাগীদের ডাকাডাকি তাহার কানে গেল। নিঃসন্দেহে একটি করিয়া বিজলীর দোহনযন্ত্র তাহাদের মুক্তি দেয়। মুক্তির আনন্দে তাহারা যেন স্বজ্ঞাবশে সম্মুখে লাফায় এবং তৎক্ষণাৎ নিজের অজ্ঞাতে স্প্রিংএর কৌশলযুক্ত রাত্রির খাঁচায় প্রবিষ্ট হয়।

ওয়াল্টার এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। কোথায় বা সে যায়?

নিশ্চিতই তাহা ইট-লাল মিসেস ডগলাক যে স্থূলবক্ষ কামিজ আজ পরিয়াছে। এবং যখন ওয়াল্টার স্বয়ং ক্যানটিন-লাঞ্চে বসিবার জায়গা পায় না সে মিসেস ডগলাক আপন স্থূল উরুতে চটাপট চাপড় দিয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর সে সময়ে সে একটি কলা খাইতে থাকে এবং ওয়াল্টার কোনো গতিকে চিৎকার করিয়া অন্য বেঞ্চের সোগ্রামকে ডাকিয়া উৎকট রসিকতা করে। তাহার পর দুই বেঞ্চে বাদপ্রতিবাদের স্কোয়াশ চলিতে থাকে যেন বা এবং তখন ওয়াল্টার শুষ্ক আঙুলগুলিকে দেখে যাহার সাহায্যে সে কপি-সিদ্ধে ফর্ক বিঁধাইতে চেষ্টা করে।

কোথায় বা যায় সে, রবিন্সন সপ্তদশের এই রাঞ্চের বাহিরে আপন বস্তিতে কীই বা আছে। সে আপন মনে হাসিল কেন না তখন সে এক ক্রমশ সংকীর্ণ এক গলির শেষে এক চার বৎসরের শিশুকে দেখে। সে তো সে নিজেই এবং গলিটি তাহার পরিচিত রবিন্সন-রাঞ্চই।

না, সে সোগ্রামকে হিংসা করে না। কেন না হিংসা করিতে উত্তাপই বা কোথায় তাহার হৃদয়ে, এবং প্রকৃতপক্ষে মিসেস ডগলাকই বা কে তাহার? জীবন এই প্রকারই বটে। পরন্তু নিজেও সে কিছু বুনো ওট্‌স রোপণ করিয়া থাকিবে। আর এই রাঞ্চের শেষ সীমায় যে উঁচুনিচু জমি তাহাতেই তাহাকে রাখা হইবে যখন ওয়াল্টার কেহ থাকিবে না। আর মাঝখানে কত দীর্ঘ দিনই না সে দুগ্ধদোহন করে এবং ডেলিভারি-ভ্যান সকল চালায়।

পেডিগ্রি পাঁঠার একটি-দুটির চৌদ্দ বৎসর পার হয়। এখন সে উঠেও না এবং পশু-চিকিৎসক বলে হইয়া আসিতেছে। তখন তাহার পর তাহার খাঁচায় পরেরটি আসিবে।

আর কয়েকদিন পূর্বে এরূপ কথোপকথন হইল।

মিসেস ডগলাক। আচ্ছা, ওয়াল্টার তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করিব? কেন না তুমি তোমার নিজের মনকে চিনিতে পার।

ওয়াল্টার। তাহা জানি না। কিছু বলিবে কি?

মিসেস ডগলাক। তোমার পেডিগ্রি পাঁঠাগুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। সোগ্রাম বলে তাহা বড়সাহেবের সঙ্গে যুক্ত নাও হইতে পারে। তোমার কী মত?

ওয়াল্টার। ইহা কি মতের প্রশ্ন? তুমি বিশ্বাস কব কিংবা তাহা না কর। পেগি, ইহাকে যন্ত্রণা করিও না।

মিসেস ডগলাক। তুমি যন্ত্রণা হইতে দূরে থাক কারণ যন্ত্রণা উত্তপ্ত এবং তুমি উত্তপ্ত হও না।

ওয়াল্টার। ভালো পেগি, তুমি কি বিশ্বাস কর অন্য পুস্তকে যেমন বলে? যে এই সমস্তই হয় ছয় দিনের সৃষ্টি হয় এবং তাহার পর তিনি এক দিবস বিশ্রাম করেন। দেখ, এই রবিন্সনও কি আমাদের বিশ্বাসের আকাশ নয়? আমরা সকলেই কি তাঁহাকে প্রমাণ করিতে থাকি না।

কী যে হয়। হঠাৎ বৈকাল কেমন দূরে দূরে অন্ধকার হয়। আর মাঝখানে কত দীর্ঘদিনই না দুগ্ধদোহন করি এবং ডেলিভারি-ভ্যান সকল চালাই। লাকি ওয়াল্টার মুখ তোলে এবং যেন তাহার নাসারন্ধ্রে কিছু কাঁপে।

মাতাদোর সন্ধ্যা

ওয়াল্টারকে উঠিতে হইল কেন না তখন তাহার এপাশ-ওপাশে অনেক স্ত্রী পুরুষ কারখানা হইতে বাহির হয় এবং জোড়ায়-জোড়ায়, বা দলবদ্ধভাবে অথবা একাকী যে যাহার বাসার দিকে চলে। তখন ওয়াল্টারও যেন কৃতনিশ্চয় হয় যে আর একটি দিন এইভাবে শেষ হইতে চলে, কেন না দেখ ইতিমধ্যে আকাশ যেন মাতাদোর ক্রীড়াশেষে কপিশ এক বৃষ বা তাহার ককুদ ও জগুলার শিরা হইতে অজস্র রক্তস্রাব ঝরে।

আর দেখ তাহা হয়তো তেমন অসার্থকও নয় যেহেতু মিসেস ডগলাক এই যে মুহূর্তের জন্য থামিয়া বলিল, বাড়ি যাইবে না ওয়াল্টার? আর সেও মিসেস ডগলাকের স্থূল পেটিকোট ও মাংস রঙের নাইলন-স্টকিং-এ চোখ রাখিয়া হাঁটিয়া চলে। সে তৎকালে আপন মনে হাসিলও বটে ইহা সত্য কি?

সোগ্রাম প্রতি সন্ধ্যাতেই তো ক্রিবেজ খেলিতে আসে। কখনও বা নৈশভোজনের কাল পর্যন্ত পাশের ঘরে হাসিগল্প করে। ওয়াল্টাব তখন ঘুমাইতে থাকে। কোনো কোনো রাত্রিতে সোগ্রাম যেন বা তাহার পর থাকিয়া যায়।

আর সেও স্বপ্নবৎ যাহা সে এই ক্লান্ত ধূসর আকাশে দেখিতে থাকে। হাঁ সে আকাশ ধূসর যাহার প্রান্তগুলি করুণায় ক্রমশ নীলাক্রান্ত কালো হয়। সে তখন আপন মনে হাসে, লাকি ওয়াল্টাব, আর সম্মুখেও চায় যেন তাহা মধ্যরাত্রিতে এক মাতাদোর সন্ধ্যা হয়। এমন কি দেখিতে দেখিতে আবার এখনই সেরূপ হয় যে গোধূলির আকাশই যেন এক ষণ্ড যাহার রক্ত ক্ষরিত হইতে থাকে, এবং তাহার পা দুখানি আর শরীর টানে না। অথচ তাহা সত্যও নয বরং তাহা এক গল্প যাহা মিসেস ডগলাক রাত্রিতে বলিতে থাকে এবং যাহা বলিতে থাকাকালে ধোঁয়া-লাল মোম আলোতে এরূপ এক আকাশ তৈরি করিয়া চলে যেমন স্মৃতিতে আসিলে মাত্র এমনই হয়।

এবং তাহাব নিচে নিচে কাহারা বা ফ্রেডা-প্ল্যান্টেশনের টাইল-গেট পার হয় দেখ।

আর তাহার হাসে, কথা বলে, কোথায় বা আচম্বিতে গানে মৃদু বিস্ফোরণ ঘটে, কেন না এরূপই সে শুনিয়াছিল এবং ডগলাক বলে এবং বলিতে থাকাকালে যারপরনাই উত্তেজিত থাকে।

এবং তাহারাও আসলে তখন তো নিদারুণ উত্তেজিত, কারণ তাহাবা হয়তো ক্রিকেট মনে কবিয়াছিল যা ক্যাস্টিগলিনো-খামারে সেরূপে খেলা হইবে। কিন্তু তাহা তো ছিল লাল কাপড়ে ক্ষিপ্ত পাটকিলে ষাঁড়। তাহার ক্ষুরে লাল ধূলা উড়ে এবং যেন ফেন সকল মুখ হইতে ঝাবিয়া ফেলে সেই ষণ্ড। যাহার ককুদেই প্রথম দুই দুই চার, কাঁধে এক এক দুই, শেষে জগুলার শিরায়, সেই শেষ এবং মারাত্মক, একমাত্র ক্ষুরধার অল্প চওড়া ক্রোমিয়াম হেন গোল কালো হাতলের তববারিগুলি পর পর বসে এবং খাড়া হইয়াও থাকে এবং স্ফুরিতনাসা তাহার তেমন ক্ষিপ্রতা যে ধূলা উড়ে আর কত যে প্রচুর টাটকা রক্ত ঝরে সে কি তাহারা কিছুই জানিত?

এবং সেও বিস্মিত যারপরনাই যেহেতু এইতো সোগ্রাম ক্রিবেজ শেষ করিয়া গেল এবং মিসেস ডগলাকও ওয়াল্টারের বিছানায় আসে, বসে, রাত্রির পোশাক সকলই খুলিয়া ফেলিল। এবং কী না উত্তেজিত সে। তৎকালে তাহার স্থূল আঁটশাট তামা রং শবীর ওয়াল্টারের বিছানায় লোটায়, এমন দেখায় যেন সে সেই ষণ্ড যে উত্তেজিত, উরু টানিয়া তোলে, বাহু ভাঁজ করিয়া বিছায়, যে নিজের প্রচুর রক্তস্রাবে ক্রোধে সকল ক্রমে ভুলিতে থাকে। তৎকালে ডগলাক চোখ বড় বড় করে, অদ্ভুত রকমে হাসে, এবং তাহার গোটা শরীব, যাহা তামা রং, তেমন লুটায়।

পরে তাহারা টাইল-গেট পার হয়, পরের পর চলে, এবং বা মৃদু ঘণ্টাধ্বনি হইতে থাকে যেন বা তাহারা কোনো তীর্থ হইতে গ্রাম্য পথে ফিরে যাহাতে তাহারা উত্তেজনাক্রান্ত ও সানন্দ। আর তাহারা তখন হঠাৎ গানে বিস্ফোরিত এবং মৃদুমৃদু হাতে তালি দেয়। তৎকালে মিসেস ডগলাক বলে আমাকে ঘুমাইতে দাও ওয়াল্টাব।

লাকি ওয়াল্টার ধীবে ধীরে ম্লান বৈকালে চলিতে থাকে। আর ডগলাক পিছন ফিরিয়া তাহাকে সেরূপ দেখে, বলেও তুমি এত ধীরে চলো ওয়াল্টার, কিংবা তুমি সেরূপ আইস। আমি চায়ের জল চাপাই, পরে ক্যান্টিনে যাইব সব্জি কিনিতে।

যেন তাহার সুকেশে তারাগুলি জ্বলে॥

তদ্বৎ হয়। ডগলাক তিন কাপে চা ঢালে। সে নিজে ডিল-টেবিলের পাশে, সোগ্রাম হাঁটিয়া গিয়া জানালার কাছে, ওয়াল্টার টুল টানিয়া বসে। এইরূপ কথোপকথন হয়।

ডগলাক। সোগ্রাম, আমাকে মাশরুম কিনিতে হইবে।

সোগ্রাম। মাশরুম উ, কিনো।

ওয়াল্টার কিছু বলে না।

ডগলাক। আজও কি বুলফাইট হয়?

সোগ্রাম। রোজ বৈকালে হইবে শুনি। উহা বেনিদিকো ক্যাস্টিগলিনো তাহা কি জানো।

ওয়াল্টার কিছু বলিল না।

ডগলাক। বুলফাইট কি ভ্রমণকারীদেরও টানে? তুমি ধীরে ধীরে চা খাও ওয়াল্টার।

সোগ্রাম। মাশরুম ভালো। হাঁ ভ্রমণকারীদের টানে।

ওয়াল্টার। একটু চিনি দিবে ডগলাক।

ওয়াল্টার চামচে চিনি গুলায় এবং স্থির করে বেড়াইতে গেলে হয় না কি। অনেক দিন যায় না। আর তাহার পর ফিরিয়া আসিবে।

সোগ্রাম ক্রিবেজের তাস বাঁটে এবং ডগলাক নৈশ আহার তৈরি করিতে থাকে তখন সে ফিরিযা আসিবে।

সোগ্রাম। ফোবম্যান বলিতেছিল তাহার স্ত্রী ভালো থাকে না।

ডগলাক। ও ভগবান, ক্যানসার নয় তো?

ওয়াল্টার কিছু বলিল না। এবং আর কেহই কিছু বলিল না।

ডগলাক ইতোমধ্যে স্কার্ফ আনিয়া মাথায় জড়ায়। সোগ্রাম কাপ টেবলে রাখে। তাহার পব তাহারা সব্জি কিনিতে ক্যান্টিনে যায়। ওয়াল্টার ধীরে ধীরে চা খাইতে থাকে। এবং তখন রাত্রি হইতে থাকিল যে রূপে হয়। আর ওয়াল্টারও তাহার সে বিস্বাদ চা খাইতে থাকে। এবং কিছুই ঘটে না, কিছুই ঘটে না।

দেখ, পাঠক মহাশয়, তথাপি যেন বা সে তোমার সম্মুখে অবতীর্ণা হয় যে তার কৃষ্ণ দুকূল অবহেলায় লুটে তাহার সুকেশে তারাগুলি জ্বলে। এখন গৃহে গৃহে অজস্র আলোকরাশি জ্বলিয়া উঠিল যে নৈশশোভা দেখিতে এই কাহারা হেলিকপ্টারে উঠে, ভাসে, নামে, আবার আর কাহারা উঠে।

দেখ, সার্চলাইট জ্বলিল এবং তাহার এক ফলক ভূমি স্পর্শ করে মুহূর্তে, উঠে, আকাশ চাকা করিয়া কাটে, এই ক্যাস্টিগলিনো মিউজিক হল, এই অ্যাটকিন্সন হোটেল, এই জনসন ক্রুআরিস এই রকম দেখায়, ডাউনটাউন, ফ্রেডা-প্ল্যান্টেশন, দ্রাক্ষাকুঞ্জ সকল ক্ষণে ক্ষণে অনাবৃত করে, নুইয়া সমুদ্রের কালো বুক স্পর্শ করে। এবং হেলিকপ্টারগুলি সে আলোকে ভাঙিয়া অনেক হয়।

লাকি ওয়াল্টারের সমুদ্রযাত্রা

সে রাত্রি, পাঠক, যেখানে টেরেসে লতাগুল্ম, এবং প্রায় অন্ধকার-আচ্ছন্ন গাছ, যেন বা মুহূর্তেই গাঢ়বর্ণা পলিনেশিয়ান এক রমণী যেন যে পল গগাঁর এক ফলক, যেন যে তার কৃষ্ণ দুকূল খসাইয়া সুগভীর নীলে মোটাসোটা পা দুটি ডুবাইয়া বসে যাহার অলকরাশিতে তারা-ফুল এবং কণ্ঠেও।

টেরেসে অবস্থিত লাকি ওয়াল্টার তখন এক ধূসর সমুদ্রে যাত্রা করিল এবং তখন সে এরূপে চলে যে যেন সে স্বপ্নাটক। এবং যে আলো বিত বিত করে ক্ষণে ক্ষণে তাহাকে টুকরা করে যাহা

যেন সিনেমা-কৌশল, তাহাও দেখে না। কিংবা এমন হয় সে সেরূপ দেখে না বলিয়াই তো তাহা তাহার ধূসর তরঙ্গ সকল।

তখন সে, তাহার ধূসর তরঙ্গগুলি পথ দেখাইয়া চলে এবং সে হাঁটিতে থাকে। আর কী এক পরম কৌতুক যেন যাহাতে পথের ছাযা সকল ধূমল ছায়া-হেন পথের উপরে ভাসে এবং তাহাকে সম্মুখে চলিতে মৃদু অনুরোধ করে যখন তাহারা মৃত মাছগুলিকে শোকও জানায়। আর সেই মাছটি এই এক শত্রুতা করে যে তাহার শ্বেতপ্রায় উদর দেখাইয়া অনুযোগ কবে কেন বা তাহাকে বিদ্ধ করিলে।

না, তাহার কোনো উত্তাপ নাই। অথচ এসব ঘটে যে যাহাতে সে দাঁড় বাহিতে চায়, যে মৃত মাছটি একবার কাঁদে অন্যবার ফিসফিস করিয়া বলে ঠিকই হয় ওয়াল্টার এভাবে, যে তাহাতে সে ভয়ও পায় এবং ভাবে এগুলি সবই কি স্বপ্ন হয় না।

লাকি ওয়াল্টার তখন পাহাড় হইতে নামিতে থাকে। আর দেখ সেখানে ক্যাস্টিগলিনো মিউজিক্হলে এখন হুলাহুলা নাচ হয় যে সে ঘাসেব ঘাগরাগুলি আন্দোলিত যাহাতে কত না আলোকসম্পাত আর উরুগুলিও ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশমান, আর পাখা-নৃত্যপবাব পাখাগুলি সরিতে থাকাকালে এই গিরিচূড়া এই সানুদেশ এই সুগভীর এইরূপ আলোকসম্পাত, আব ভ্রমণকারীবা ভাবে এই বুঝি এক উদ্‌গ্রীব আগ্রহ স্নিগ্ধ হয় যাহা আদৌ হয় না।

আর তখন লাকি ওয়াল্টার ভাবিত থাকে যে এই কী এই এক চিহ্ন যাহা তাহাব ধূসব টানা স্রোতে প্রোথিত থাকে যেন যাহাতে সে স্রোত কিছু এককে বেষ্টন করে।

লাকি ওয়াল্টার তখন দ্রাক্ষার কুঞ্জগুলিকে বাঁয়ে রাখিয়া চলে এবং সার্চ লাইটের ফলকও আকাশ কাটে যাহাতে এই ক্যাস্টিগলিনো হল এবং পাহাড় ডিঙাইয়া এই অ্যাটকিন্‌সন হোটেল এবং এই জনসন ক্রুয়াবিসের বক্রশীর্ষ মিনার যেন যাহাতে হেলিকপ্টার না ঠেকে এরূপে দেখায়।

এবং আলোকগুলি অ্যাটকিন্‌সন হোটেলের হয় বা।

জেসি জেনকিন ও মৃত মাছ সকল

আহা এই কী ধূসর হয়! এবং মৃত মাছগুলিও স্রোতে সমাকীর্ণ। খুবই ভয় করে তখন লাকি ওয়াল্টারেব এবং তীবে আছড়াইয়া পড়ে যে যেন চিৎকার করিয়া বলিবে, না কিছু হত্যা করি নাই।

তখন লাকি ওয়াল্টার সেখানে অনুভব করে সেই বসন্তের তীরও ধূসর, হায়। কেন না দেখ, টেবলে গজানো মাইমোসার ধূসর বসন্ত হইতে এক ঘড়ি গলিতে থাকে, এবং টেবলের ধাব উপচাইয়া আর এক ঘড়ি গলিয়া গলিয়া ছড়ায় যাহাতে তাহা এক ধূসর চটি যদি বা দরজার কাছে এবং কাঠের ব্যালকনিতে আইভি বহিয়া চলে। আর দিগন্তে তীব্র পোড়া আকাশ যাহা যেন ধূসরতাকে হলুদ করিতে থাকে। এবং ক্যাক্টাসগুলির ত্রিশূল সকলও। এবং এত পাখি গায়। পথের ধূলাও আর ধূসর নয় তো যাহা যেন জেসি জেনকিনের চটির পাশে চলে বরং কী যেন এক নিদারুণ হলুদ আর পিপাসার্ত।

তখন দেখ যেমন অ্যাটকিন্‌সনের হোটেলের এই এক ঘরে আলোকিত শার্সিতে পর্দা টানিয়া ক্ষুদ্র সংকীর্ণ পুরাতন ব্যভিচার সকল পুনরনুষ্ঠিত হয়। হায়, ইহারা যে গত ছয় মাস তাহার উদ্যোগ করে, যেন বা সেজন্যই ভ্রমণেও আসে, এবং এই সন্ধ্যায় মধুরাতে বাহির হয় না, হুলাহুলাতেও যায় না, অথচ ইতোমধ্যে উভয় উভয়কে কী এক দুর্বল ঘৃণা করে, কেন না তাহাতে সাহস দেখি না, এবং এই এক বীতরাগ যে এখন আর তো ফেরার পথ নাই, সে লেডাও নয় তো। কিন্তু তাহারা হাসেও কেন না এই তো সন্ধ্যা হয় এবং তাহারা ভ্রমণকারীও বটে। যেন কেহ বলে দেখ, দেখ আলোটি কেমন আকাশকে কাটিয়া চলে এবং তোমার মুখে পড়িল।

লাকি ওয়াল্টার তৎকালে এরূপে ভাবিত থাকে যে আমার চোখে তো সকলই ধূসর, সকলই হলুদ, সকলই ধূসর। এবং এই কী যাহা যেন তাহার বুকের মধ্যে ভাঙিতে থাকে এবং তাহা হলুদ অপেক্ষাও করুণ।

অ্যান্ড মিউজিক ফ্ল্যাশ্‌ড ইন দা হল

পাঠক মহাশয়, এখন তো ডিনার-টাইম হয়। এবং রীতির কথা কে না জানে? সে তাহাই যাহা আমাদের হৃদয়কে উৎসাহ দেয়, চিত্তকে নির্দ্বিধ করে। এবং সেই গগাঁব পলিনেশিয়ানই যেন স্নান সারিয়া তীরে উঠে এবং স্বচ্ছ ভয়েলাবৃতা সে, সুগন্ধিতা সে, হাস্যমণ্ডিতা সে, যাহাব চোখ-দুইএ হাসিতে থাকে, যাহার কণ্ঠ দীপোজ্জ্বল যেন, যাহার অলকরাশিতে তারকাখচিত, অ্যাটকিন্‌সনের হোটেল হলগুলিতে পদস্পর্শ করে। এবং তৎকালে উঁচু করিয়া রাখা কালো বেডটি যেন নামে এবং সিম্‌ফনির প্রথম বারে সংগীতযন্ত্রগুলি শূন্যে শূন্যে ধাক্কা খাইয়া অপরূপ এক ঝন্‌ঝনায় বিদীর্ণ হয়। এবং তরলেক্ষণারা হাসে সঙ্গী পুরুষকে মথিত করিয়া, টেবলের ধাবে যায় এবং টেবলগুলিও যে হাসে যেমত কাচে, পোর্সেলেনে শোফিল্ড কাটলারিতে ঝক্ ঝক্ ঝকে! এ টেবলে ও টেবলে কথা ছুঁড়িয়া দেয় কেহ বা, কেন না তাহারা হয়তো বা সমুদ্রসৈকতে আলাপিত হয় এবং হাসির গররা ছুটে। ওয়েটারগণ, প্রত্যেকেই তো রুরিটানিয়ার ফিল্ড মার্শাল, টেবলের পাশে তাহাদের মাথা নোয়ায়, মদ্য আসে, কাচের গ্লাসগুলি পাখি, হেন কাকলি করে, সংগীত ভাসিয়া চলে, দুলিতে থাকে।

কিন্তু এমতো হয় কাহারো পোশাকে দেরি হয় বা, অথবা যে তাহারা সমুদ্রসৈকতে আত্মমগ্ন ছিল। মুহূর্তে মুহূর্তে তাহাদের গাড়িগুলি দরজায় আসে, সুদৃশ্য ভ্রমণকারীদের উগরায়, সরিয়া যায়, কেন না পরের গাড়িও আসে যে এবং তাহাতে ফুটপাতও আলোকাকীর্ণ, সুবাসিত এবং হাস্যমুখর। ফলত তথায় সবকিছু আলোকিত যেন বা জ্যোৎস্না রাত্রি। অথবা এরূপ জ্যোৎস্না হয় না কারণ ছায়াগুলি যে পড়ে যে সে কোডাক স্ন্যাপশটের ন্যায় তীক্ষ্ণ, আলোক যে পরিব্যাপ্ত সে যেন বা নিয়ন্ত্রিত সূর্যের।

অপর সেই ফুটপাতে, দেখ, ফল সকল আসে যে হয় থলো থলো দ্রাক্ষা, সোনালি পিয়র, সুরভিত মাস্কমেলন যেন বা অ্যাটকিন্‌সন হোটেলে যথেষ্ট বরফে শীতল ফলগুলি থাকে না। অপিচ তাহা পড়িয়াও থাকে না এবং কিউরিও বিক্রয় হয় যাহা ডাকিয়া বলে, সদ্য-আহৃত ফুলগুলিকে তাহারা ছোট কাঁচিতে ডাঁট কাটিয়া নিমেষে বোতাম-ফুটায় রাখিতে তোড়া করে। কালো অ্যাটকিন্‌স, তাদৃশ জন স্মিথ, জেসি এবং বেটি যাহারা বিক্রয় করে এবং কারখানায় সন্ধ্যার ডিউটি শেষে ক্ষণেক থামিয়া এই এক গোছা ফুল, এই এক থলো দ্রাক্ষা ক্রয় করে এবং হোটেলের হাসি উপচায় তৎকালে সংগীতও ভাসিতে থাকে যে।

কিন্তু সে রাত্রি কি এক বিশেষ রাত্রি, অথবা তাহা কি ক্যাবারে-পরিচালকের এক সুচিন্তিত সযত্ন অবদান, অথবা এই কী যে অকস্মাৎ আচম্বিতে ঘটে দেখ যাহা যেন আলোকিত বিস্ফোরণ, এবং তখন ফুটপাতের হকাররা ভিড় করিয়া আসে যেন যা যে বোম সে আনিতে থাকে তাহা অকস্মাৎ ফাটিয়া যায় এবং তাহার জ্যাকেটের তলা হইতে সোনালি রিবযুক্ত মিনি পুস্তকগুলি ছড়াইয়া পড়ে এবং তৎকালে যেন দৈবী সংগীত হয় যে ফ্রাইডে দ্বীপ ও ফ্রাইডে দ্বীপ, আমার হৃদয় উন্মুক্ত কর এবং দেখিবে তথায় লিখা ফ্রাইডে দ্বীপ।

অথবা সেই ভ্রমণকারিগণ কি প্রতি ডিনারের রাত্রিতেই আপনাকে এমন প্রস্তুত রাখে যে এই বা কী ঘটে যাহা আলোক সকলকে বর্ধিত করে, সুঘ্রাণগুলিকে সুবাসিত করে, যেন বা যাহা স্ফটিকদেহ এক পুলক হইয়া আপনার পদক্ষেপে হল-সংগীতের লয় নির্ধারণ করিবে।

লাকি ওয়াল্টার যেন বা স্বপ্নে আবিষ্ট হয় এবং কেহ যেন অশ্রুতবৎ কারুণ্য করে ও জেসি ও জেসি কেন বা সে জেসি এবং এত ধূসর এমতো হলুদে দগ্ধ ও জেসি ও জেসি। এরূপ সে শ্বাসে শ্বাসে বলে।

নরমাংস ভক্ষণ ও তাহার পর

প্রতীয়মান হয় যে, সে বসন্তের সেই প্রভাতের পূর্বেও কৃষ্ণকায়া রাত্রি থাকে কিন্তু এখন আবার পুস্তকের কথা বলি কেন না অনুমান এই যে হায় পাঠক, তোমার আমাব অপেক্ষা তাহারাই কী প্রত্যক্ষতর নয়? এবং তাহা ক্যাস্টিগলিনোদের ফুট্‌কি-দক্ষ কবি বেনিদিকোর উদ্যমও বটে। তাহার নমুনা দিই।

তৎকালে নরমাংসভক্ষণকারী উলঙ্গ নয় এমতো সাহেব সকল সেই দণ্ডায়মান মানুষ দুইএর চারিদিকে নাচে গায় অকস্মাৎ টি ডিউম লডেনুস স্তোত্রে মুখর হয় এবং মাইকেল জন ফ্রাইডে ও বাচ্চা ফ্রাইডের মাস্কেট, বন্দুক ও পুনরপি মাস্কেটে আহত মৃত ও আহত হইতে থাকাকালে যাহারা মরে তাহারা তো বাঁচিয়াই গেল. এবং অপবেরা হা ঈশ্বর আরও নিকটে আরও নিকটে এবং বন্ধু তোমার প্রয়োজন আমাপেক্ষা অধিক ইত্যাদি ইত্যাকার সাতিশয় মহৎ ও হৃদয়-আনন্দকারী শ্লোক সকল কহিতে থাকে যে যাহাতে বাচ্চা ফ্রাইডে যে অদ্যাপি নরমাংস ভক্ষণে অপরিপক্ক যুগপৎ বিবমিষা ও এক মূত্রবেগে আক্রান্ত হয় সে সকলই ফ্রাইডে নোটসে উদ্ধৃত হয় দেখি।

অতঃপর মাইকেল ফ্রাইডে, যে দেখি বড়সাহেবের ছাগচর্মেব টুপিটিও পরে, বাচ্চা ফ্রাইডের খোঁজ করিতে থাকাকালে, কারণ তাহাকে দেখা যায় কই, হয়তো সমুদ্রের জলে মাথা ভিজায় এরূপ স্থির করে এবং তীরে টানিয়া রাখা নৌকার দিকে শনৈঃ অগ্রসর হয়, কেন না নৌকা হইতে উলঙ্গ নয় এমতো সাহেবদের ছিন্ন করাও প্রযোজনের ছিল।

এই এক মহৎ সত্য তৎকালে জন মাইকেল ফ্রাইডে উদ্ভাবিত করে যে যাহা ঘটিয়াছে তাহাই ঘটিবে এবং সূর্যের নিচে নূতন কিছু ঘটিতে পায় না, এবং দেখ, তাকাও, লক্ষ্য কর ওই কে হস্তপদগলে আবদ্ধ এক শ্বেতকায় দগ্ধানোর নিমিত্ত শায়িত রাখা থাকে, এরূপ দেখা যায় যে বাচ্চা জন মাইকেল দুই তাহার হাত সেই শায়িতের উভয় পার্শ্বে রাখে যেন বা তাহাকে আবরিতে চায় এবং কী বা করে এমন ভাবিত থাকাকালে হর্ষোৎফুল্ল ও বিমর্ষ হইতে থাকে। সেইক্ষণে ফ্রাইডে আপন পুত্রকে এরূপ বলিল হা হরি তুমি অনভিজ্ঞতা হেতু যাহা বুঝ না তাহা এই যে ইহা হয় স্ত্রীলোক এবং দেখ কিমতে তাহারা স্ত্রীজাতীয় মাংস দগ্ধাইয়া খায় যাহা আমরা ক্যারিবগণে খাই না এবং আমাদিগের শত্রু ক্যারিবরাও খায় না কেন না ঘটবতী কুম্ভবতী এই নারী সকল কদাপি কি এক বল্লম উঠায়? এবং কী এই তাহাদের বড়সাহেবের স্বজাতীয়গণের ধর্ম, আহা ইহার বাঁধনগুলি খুলিতে থাক জন, যে এই ইহাকে পুড়ায় বর্ষা-অতিক্রান্ত অভিলাষী মৃত্তিকা যেন এইকে। অহো ইহারা নির্বংশ হইবেক। তাহা তুমি বা কী কর জন যে তাহার কি নিশ্বাস চলে না অথবা সে কি নিমজ্জিত যে সেরূপ ফুৎকার দিতে সচেষ্ট হও।

তৎকালে সেরূপ হইল যে সে ঘটবতী সন্ন্যাসিনী যাহার চোখ দুই অ্যাম্বর রং সে উঠিয়া বসে এবং জিজ্ঞাসে আমি এই কোথা আসিলাম। অথবা তোমরা উভয়ে কি নরমাংস ভক্ষণকারী যাহাদের কথা শুনিয়া থাকি অথচ উভয়কেই নিদারুণ সুপুরুষ দেখি। অহো তাহার কি বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর যেন বা ক্যাথিড্রাল চার্চে আর্গিন যন্ত্র ট্রেমোলোতে বাজে।

সেইক্ষণে জন ফ্রাইডে এমতো বলে যে বাচ্চা জন যাহা ঘটে তাহাই ঘটিবে দেখ। এমতো নৌকায় আমি আমার পিতাকে আবিষ্কার করি এবং তাঁহাকে দ্রাক্ষা কিশমিশ রুটি ও জল আনিয়া

দিই। তুমিও সেরূপ কর। এবং কহিবা মাত্র বায়ুবেগে উৎপতিত জন বাচ্চা উল্লম্ফনশীল হরিণ যেন এরূপে অন্তর্হিত হইলে জন ফ্রাইডে এই মতে অপর কহিল।

আমি এবং এই আমার পুত্র জন উভয়ে আমরা ক্যারিব হই এবং অসভ্যও বটে কেন না বড়সাহেব তাহা বলেন কিন্তু এক্ষণে বনমাউকি পূজি না, ও বলি না, পাহাড়ে যাই না যেখানে বনমাউকির ধূম সকল উঠে। বিশেষ ইহাও জানি যে ঈশ্বর, তিনি আলোক হও বলিলে আলোক হয়, শয়তান সকল সৃষ্টি করেন এবং বধ হও বলিলেই যে বধ হয় তাহাকে এককালে বধ করেন না কেন না শযতান অনুতাপ হয়তো বা করে। পরন্তু এই দ্বীপে তোমার স্বজাতীয়গণ আছে কেন না বড়সাহেব তাহাদের রাখিয়া গিয়াছেন জাহাজী বদমাইশ বিল অ্যাটকিন্‌স জন স্মিথ এবং অন্য এক রবিন্সন এবং তাহারাও আছে যাহারা ইস্প্যানিয়ার্ড যথা সিবাস্টিয়ানো, কস্টেলো, ক্যাস্টিগলিনো। আর কাহারা যে তোমাকে জীবন্ত দগ্ধায় তাহা তো জানি না।

তৎকালে সেরূপ দ্রুত উলম্ফনশীল বাচ্চা মাইকেল এরূপ চিন্তাপর হয় যে আমার তো দুই দুই জননী থাকে এবং ইহাকেই বা পিতার আর কী প্রয়োজন? হায় তাহার অধরবান্ধুলি যাবপর ন্যায় সুবাসিত।

জন মাইকেল ফ্রাইডেও বলিতে থাকে যে হায় তাহা নিদারুণ সত্য যে ধরিলে তাহারা তোমাকে পুনরপি খোঁটায় বাঁধে যেমতে শাস্তিতে দগ্ধ হও এবং তাহারা স্তোত্রসকলও গাহিবে। দেখ যে ইস্প্যানিয়ার্ডগণ যাহারা রহিয়াছে তাহারা ইতিপূর্বেই মূল ভূখণ্ডে অভিযান করে যেমতে তাহারা স্ত্রীলোক আনে এবং তাহাদের লয় যাহাদেব বড়সাহেব নৌকায় ব্রাজিল হইতে প্রেরণ করে যাহাতে দ্বীপে বহুতর শিশু সকল দেখিবে। বড়সাহেব বিশেষ হিসাবী বিধায়, এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্বজাতিপ্রিয় বিধায় বিল অ্যাটকিন্‌সদিগের নিমিত্ত ইংলন্ড হইতে স্ত্রীলোক সংগ্রহ করেন এবং আনিয়া দেন এবং তাহারা আছে, আর তাহারাও আছে যাহাদের ইস্প্যানিয়ার্ডগণ সংগ্রহ করে কিন্তু পুরা ব্যবহার করে না।

এইরূপে জন মাইকেল ফ্রাইডে বহুতর বহুমতে কহিতে থাকিলে সেই সন্ন্যাসিনী, যিনি আমাদের গার্ডিয়ান সেন্ট, বীণানিক্কণে কহিল সুপুরুষ অসভ্য আমাকে লালিত কর। এবং তখন তাহার অ্যাম্বার দুই চোখে কী যেন এক ভবিতব্যতাও দেখা দেয়।

এবং তিনিই হন সেন্ট ইজাবেলা। কেন না সেই মহতো মহীয়সীকে সদ্য কর্ষিতা বর্ষাশেষ ইক্ষু-ক্ষেত্রগুলিতে দেখ যাহাতে জনসন ক্রুআরিস চলে, অথবা দেখ দ্রাক্ষাগুচ্ছগুলি রসভারে আনত হইলে স্তনভারাক্রান্তা তাহাকে স্মরণ হয়।

কেন না সেই তিনিই তো ফ্রাইডেকে প্রেসিডেন্ট করেন যাহাতে কী এক অমানুষিক বলে ফ্রেডা কাস্‌ল উঠে, যাহাতে ফ্রাইডে গত হইলেও ডাওয়েজর মিসেস প্রেসিডেন্ট রূপে আর দুই কুড়ি বৎসর দ্বীপকে সর্বতোভাবে পরিচালিত করেন, যাহাতে ক্রমে সর্বশুক্লা, শুক্লাম্বরার সেই পাণ্ডুর ঠোঁট দুটির হাসি করুণা হয়।

এবং তিনি কাহাকেও দূরে রাখেন না কেন না বিল অ্যাটকিন্‌স এবং তাহার পুত্রগণ যুদ্ধে মৃত হইলে তিনি অ্যাটকিন্‌সন বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। বৃদ্ধ জন স্মিথ পারিবারিক সংঘর্ষ বিষণ্ণ হইলে একই বংশ ভাঙিয়া জনসন ও স্মিথসন বংশ স্থাপিত হয় যে, বিবাদও যে থাকে না, সেও তাঁহার স্মিত হাস্য। এবং তিনি কালো অ্যাটকিন্‌স, কালো জন স্মিথ, কালো জেনকিন প্রভৃতি হইতে শ্বেতকায় অ্যাটকিন্‌স, তাদৃশ জনসন স্মিথসন ইত্যাদিকে পৃথক করেন।

পরন্তু এরূপ বলা হয় যে আদি জননীর ন্যায় তাঁহার প্রথম জাত, যাহাতে জন মাইকেল ফ্রাইডে বিস্মিত, কে কোথা হইতে বা তাহা কেহ জানে না এবং সে জনকে, জন ম্যাথুকে, ম্যাথু জোসামকে, জোসাম মাইকেলকে, মাইকেল গ্রাহামকে, গ্রাহাম জনকে, জন ম্যাথুকে এরূপে জন্মিতে থাকিলে

ফ্রাইডে বংশও চলিতে থাকে।

তিনিই সভ্যতা এবং নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে জলধারা সতত ঝরিতে থাকিলে সেই শ্বেতাম্বরা অশীতিপরাকে দেখ না কি?.. ...

তৎক্ষণাৎ আলোকের ঝাড়সকল বিদীর্ণ হয়, আমাকে এক কাপি দাও, জন দোহাই আমার কাপি সংগ্রহ কর, পেগি তোমার ফ্রকে মদ্য লাগে দেখ, ইহা যেমন সেকসি সেরূপ ভায়োলেট ইত্যাদি নানাবিধ বহুতর হাসি, হররা, চপলতা, আলাপন, ছুটাছুটি হইতে থাকে, ওয়েটার সকল স্তম্ভিত যেন বা ঝাঁটাইয়া একত্রীকৃত, যেন বা বিপ্লব উপস্থিত এমতো হইতে থাকে।

এবং তৎকালে আলোকগুলি ঝক ঝক ঝকে, কোমলগাত্রী সেই কৃষ্ণা রাত্রির চোখ দুই মদ্যপানে যেন বা অধিক ত্বরল হয়। এবং সার্চলাইটের ফলক বুড়া অ্যাটকিন্‌সনের হাসির মতো উঠে আকাশকে চাকা চাকা কাটে, যেন দ্বিধা এমন মুহূর্তেক আলম্ব থাকে, নুইয়া সমুদ্র স্পর্শ করে।

তৎকালে লাকি ওয়াল্টাব প্রত্যাবর্তন করিতে থাকে।

সে প্রত্যাবর্তন কবিল॥

লাকি ওয়াল্টার, ও। লাকি ওয়াল্টার..

এখন আবাব যেন সে এক সাতিশয় ধূসব অপরাহ্নই। এবং এখনও সেই বাত্রির সৌগন্ধ কাটিয়া সার্চলাইট ফলক এই টেরেস এই লতাগুল্মেব ঝোপ এরূপে সরিয়া যায় চোখে বিৎ বিৎ করে যেন আকাশে দ্বিধা করে পরে আপন পথে চলে।

লাকি ওয়াল্টাব চোখ তুলে এবং কমলা বং চতুষ্কোণ দুইকে দেখিতে পায়। কোথায় বা সে যায়? এবং এরূপও হয় যে সে ফিরিয়া আসিবে, আর কতই না দূরে দূরে সে ভ্রমণ করে যাহাতে সে আবাব ভ্রমণ চাহে না।

তখন ওয়াল্টার চৌকাঠ পার হয়, ঘাড নোয়ায় এবং হাত দুইকে একত্র করে যাহাতে তাহারা কারুণ্য করিতে থাকে। আর কত যে ক্রিবেজ খেলে সোগ্রাম যে এখনও দেখ তাস বাঁটে এবং আপনাআপনি দুই খেলোয়াড় হয় যেহেতু এখন ডগলাক ছুরি করিয়া মাশরুম কাটে যাহাব বগল-কাটা ঢোল্লা শেমিজ ঘোব রং এবং রসুন ভাজা গন্ধ উঠে।

তৎকালে এইরূপ কথোপকথন হয়।

সোগ্রাম। ফোরম্যানের স্ত্রী প্রকৃতই শয্যাশায়ী এবং ডগলাক, তাহার সন্তান হয় না।

ডগলাক। হয়তো তাহা ক্যানসার হইবে।

ওয়াল্টার তদ্বৎ চুল্লির ধারে গিয়া বসে যেন বা বাহিরে কত না শৈত্য।

ডগলাক। তুমি আসিলে ওয়াল্টার। আজ কীই বা মাতাদোর ক্রীড়া হয়।

সোগ্রাম। হাঁ, তাহা নিশ্চিতই ক্যানসাব। এবং ফোরম্যান প্রোমোশন পাইতেছে।

ওয়াল্টার তৎকালে ভাবিত থাকে যে সে তাহা মোমের আলো হয়। এবং তাহা কোমল ধূসরও।

সোগ্রাম। এখন কি ক্রিবেজ খেলো? হাঁ ক্যানসারই।

ডগলাক। হাঁ, ওয়াল্টার সেই তো প্রথম এরূপ বলে।

ওয়াল্টার কিছু বলে না কিন্তু তদ্বৎ চুল্লিব দিকে হাত বাড়ায় যেন তাহাতে আগুন থাকে অথচ তাহা শুধু পটে আঁকাই তো এবং মোমের আলো বা যাহা দেয়ালে কাঁপে।

ডগলাক। হাঁ, পেগি, তুমি শোনো কি? ফোরম্যানের স্ত্রীর তাহা ক্যানসারই।

সোগ্রাম তাহার পাইপ ধরায় এবং শব্দ করিয়া তাস বাঁটে এবং মেঝেতে জুতা ঠুকিয়া মৃদু শব্দ করে। রসুন ভাজা গন্ধ উঠে।

ওয়াল্টার তদ্বৎ ভাবিত থাকে এবং আচম্বিতে অকস্মাৎ মুখ তুলে, হায় তাহা কি হয় না এরূপ বলে যাহাতে যেন তাহাব নাসারন্ধ্র কাঁপে এবং তৎকালে সে সধূম মোমআলোই দেখে যা নিতান্তই ধূসরতা যদি বা এই মোমআলো শুধু এ নিমিত্তই যে কাবখানার পাওয়ার-হাউসে কী এক চাকা ভাঙে যাহাতে ঘরে ঘবে বিজলী দেয় না। হায়. তাহা কী থাকে না?

কেহ বা কোথায় এক অপরিসীম কারুণ্য করে। এবং তখন লাকি ওয়াল্টার আপন ধূসরতায় এরূপ ভাবিল। বড সাহেব ক্রুশো যদি তাহা সত্য হয়, একদা গুহায় দীর্ঘনিশ্বাস শুনে, চমকিত হয়, পবে ভয় পায অবশেষে তাহা এক অলৌকিক অনুভূতি এই যে বৃদ্ধ পুরুষছাগ শেষনিশ্বাস টানিতে সেখানে যায যে যাহাতে সে অন্ধকারে গুহা তাহাব ক্লান্ত হৃদ্‌যন্ত্রকে শেষ কয়েকবার চলিতে শান্তি দেয়।

লাকি ওযাল্টার আবাব মুখ তুলিল এবং যেন বা তাহার নাসারন্ধ্র মাত্র কাঁপে। হায়, সে শ্বাসে শ্বাসে স্বগতোক্তি করে, হায়, তাহা কী থাকে না তেমন কোনো গুহা যাহা যেন নিদ্রাও বটে। তৎকালে লাকি ওযাল্টাব কী এক অপরিসীম কারুণ্যও করে, কী এক অপবিসীম কারুণ্য।

বনে এত ফুল ফুটেছে

অথবা যেন বনবীণা বাজে। ওই পর্বতশীর্ষ, বৃক্ষসকল, এই লতাবিতান সকলই যেন সেই বীণাকে গড়িয়াছে কারণ পক্ষীসকল ও পতঙ্গগুলি যে গায়, পত্রান্তরালেব যে রত্নপ্রভ আলোক সে সকল কবি বেনিদিকো ক্যাস্টিগলিনোর হৃদয়ে ঝংকারিতে থাকে।

সে কবি তাহাব বনের হ্যামকে পা ঝুলাইয়া বসে। বৃক্ষটি সম্ভবত, পাঠক, তোমার বহু পরিচিত ব্রেডফ্রুট গাছ, পাতা ছাপাইয়া ফলগুলি যাহায় ইতোমধ্যেই বৃক্ষকে শোভমান করে দেখ। মূলে যে লতাটি দৃষ্ট হয় তাহা কিছু উপবে উঠিয়া ভূমি-সমান্তরাল শাখাটিকে ধরে এবং তৎক্ষণাৎ চারাটি হইয়া নামিয়া আসে যাহার সব কযেকটি সমান হয় না কিন্তু একই রকমের বড় বড পাতা ও পুষ্পোদ্গমের সূচনা। সেজন্য সেগুলিতে ই.বি. স্টিলের শিকলিগুলিকে সমানভাবে ঢাকে না যাহার অন্তঃস্থিত স্টিলের উজ্জ্বল বৃত্তসংলগ্ন হ্যামক ঝুলিয়া রহে। হ্যামকে প্রসারিত সুদৃশ্য স্লিপিং-ব্যাগ। এখন আলোক দেখিতে বেনিদিকো এদিক ওদিক দেখে।

তাহার মাথায় টুপি নাই সেজন্য বুঝি তাহার চুলের কৌশল কুলিকাট্। সাইডবার্ন ঘন কুঞ্চিত কৃষ্ণ যাহা অক্লেশে থুতনির নিচে প্রায় চতুষ্কোণ ইম্পিরিয়ালে মিশে, লতানে গোঁফ কোণদ্বয়ে মোম-মার্জিত। তাহার ঊর্ধ্বাঙ্গ ইদানীং আনাভিমুক্ত। নিম্নাঙ্গে নরম কাপড়ের ঢোল্লা রাত্রিবাস, কিন্তু কোমরবন্ধটি দেখিবার মতো যাহাতে হস্তপ্রমাণ উজ্জ্বল স্টাইলো ছোরা থাকে। অবশ্যই এইটি ছ-ইঞ্চি চওড়া বহু বহু স্টিলের দর্পণবৎ চোখ বসানো সেই নয় যাহা সে পুরা পোশাকের সঙ্গে ব্যবহার করে।

তাহা যেন বৃত্তাকাব এক প্রেক্ষাগৃহ যাহার একদিকে এইতো রুটিগাছ এবং পরিধিতে অন্যত্র কাঁটা ক্যাক্টাস এবং তৃণগুল্মাদির ঝোপ কয়েক। এই মতো কাঁটা ক্যাক্টাস ও তৃণগুল্মাদির ঝোপঝাড় দূরে দূরে আরও দেখা যায় কেন না এ হয় দ্বীপের সে অঞ্চল যাহা ট্যুরিস্ট ব্যুরো প্যামফ্লেটে ব্যাকইয়ার্ড-ফরেস্ট নামে উল্লিখিত। ফরেস্ট কিছুটা দর্শনীয় বটে। সোজা সমতল নহে, পাহাড়ের ঢাল বাহিয়া উঠে বরং। কোথাও বড় ছোট রুটিগাছ কয়েকটি, কোথাও কাঁটা-ক্যাকটাস দল, কোথাও বা এক জাতীয় কঠিন পাহাড়ী ঘাস ; অন্যত্র কোথাও নিবিড় গুল্মাতৃণাকীর্ণ জলা যাহাতে জল সহসা দেখিতে পাও না। এ সকলের মধ্যে খণ্ড খণ্ড ঢালু কোথাও, কোথাও বা ভূমি-সমান্তরাল অথবা ধাপে ধাপে নামে এমতো তৃণাচ্ছন্ন ভূমি। একটি নিঃশব্দ প্রবাহিত নির্ঝর আছে যাহা কোনো এক

স্থানে এক তড়াগ রচনা করে। এবং তাহার পর আবার যখন সে বাহিরায় এবং নদীর রূপ লইতে বাসনা করে তখন জলাভূমি সকলই তাহার পরিণতি। ফরেস্ট তাহার ক্যাক্টাস তৃণগুল্মাদি নির্ঝর তড়াগ ও জলভূমিসহ এমন যে তুমি বা তাহারা পুরা একটি দিন আত্মগোপন করিতে পার, নিজেকে হারাইতে পার, এবং ভ্রমণকারীরা অনেক সময়েই জোড়ায় জোড়ায় তাহা হারায়ও।

বেনিদিকো ক্যাস্টিগলিনো এই অরণ্যকে আশ্রয় করিয়াছে।

এখন সে স্থির করিল সূর্যোদয় দেখা শেষ অতঃপর সে গতরাত্রির কবিতাটা পাঠ করিবে। কবিতার কাগজ লইয়া সেনর বেনিদিকো তাহার হ্যামকে চিৎপাত হয় এবং তাহা করিতে সে মাটিতে পায়ের দ্বারায় এক ধাক্কাও দেয় যাহাতে তাহাকে সহ হ্যামক বিছানা দুলিতে থাকে। এরূপে কটিগাছের পত্রান্তরালে সূর্য চন্দ্র ও তারকাগণকে দেখিতে এবং কবিতা পড়িতে সে ভালোবাসে, এমন কি ক্বচিৎ বুকের উপরে প্যাড উঁচা করিয়া বলশীর্ষ কলমে কবিতা লিখেও, এবং সব সময়ে সে হ্যামকে ঝুলিতে থাকে।

বেনিদিকোর সে আধুনিক কবিতা যেরূপ থাকে ·

কপিশ, কালো, এবং বক্তালক্তক রঙে রঞ্জিত ককুদে দুই দুই চার এবং জগুলার শিরায় আবদ্ধ এক এক তীক্ষ্ণ ছয়খানি ক্ষুরনিশিত সূর্যালোক প্রতিফলিত ফলা কয়েকটিতে ক্ষুব, শৃঙ্গে, মুষ্কে সুন্দর তাহাকে তুমি বসন্ত এবং প্রথম. এবং বা আমাদের ষাঁড় একান্তই আমাদের বল এবং তোমার সুচারু আঙুলগুলির সব কয়েকটিকে গভীর লালে রঙাও এবং কপোলে চিহ্ন আঁক. দিন দেখ ইতোমধ্যে কপিশ কালো এবং এই আলোকও রক্তনির্ঝর—

কবিতাটি নিশ্চিতই তাহাদের শততম ষাঁড়টি সম্বন্ধে কোনো এক মাতাদোর কবি তাব প্রচুরবক্ষা বমণীকে বলে। কিন্তু আহা কী সুন্দর এরূপ অনুভব করিতে বেনিদিকো যেন পথে পাথর, হ্যামকও দুলে না। ও, কী ও? দুই ওই জ্বলন্ত চক্ষু! সেই তাহাব মুখ এক নিঃশব্দ ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনায় খুলে এবং চার তীব্রধার দীর্ঘ শুভ্র খড়্গদন্ত আত্মপ্রকাশ করে যাহাতে বাদামী এবং শাদা রেখাগুলির সে মুখ কী বর্বর! তৎকালে সে হলুদ চক্ষুদ্বয় সংকীর্ণ হইতে হইতে ক্রমে তাবকা দুই রেখা মাত্র। আর তাহা দশ হাত দূরে দূরে কটিগাছের ডালে। এবং হ্যামকে বেনিদিকো। তাহাব পর ম্যাজিক ঘটে কেন না যে মুহূর্তে সে মুখখানি বেনিদিকোর মনের পবতে ছাপা হইয়াছে সে মুহূর্তে তখন আর কোথায় সে!

ব্রেকফাস্টের সন্ধানে বেনিদিকো উঠিয়া বসে। সে এই প্রথম দেখিয়া অবাক, কেন না ইতিপূর্বে প্যামফ্লেটে পড়িলেও বিশ্বাস আনে নাই। এগুলিকে রবিন্সন টাব্বি বলা হয়। অর্থাৎ রবিন্সন ক্রুশোর সেই বিড়ালের বংশধর যাহা তাহার নিঃসঙ্গ দ্বীপবাসের শেষ দিকে সে ডুবন্ত জাহাজ হইতে সংগ্রহ করে। যেটিকে দেখিলে সে হয় তো বা আকারে ছোট কিন্তু ইতোমধ্যে বাড়ির বিড়ালের দ্বিগুণ এবং সেই রূপেই পিঠে গাঢ় বাদামী গুল, শাদা পেটের ;পাশে ডোরা যেরূপ প্যাম্ফ্লেটে বলে। হাঁ ইহা তাহার বনবাস সার্তক করে।

এই বনে বেনিদিকো ব্রেকফাস্টের সন্ধানে কিন্তু কোথায় যায়? সুগন্ধ আসিতেছে বটে যাহা জিহ্বার রসগ্রন্থিগুলিকে কিছু আলগা করে। বনেতে ব্রেকফাস্ট থাকে কি? অনুমান করি তাহা যথা কালে দেখা যাইবে কেন না গন্তব্য না জানিলে বেনিদিকো কোনো ক্যাকটাস ঝোপকে পাশ দিয়া কোনো তৃণগুল্মাদিকে বেষ্টন করিয়া চলে কেন?

কবি নিশ্চিতই তাহার কাব্যকে চিন্তা করে কিন্তু ব্রেকফাস্টও এমন যে তাহা মনকে যেন নতুন স্বাস্থ্যের সৌগন্ধে পূর্ণ করে। বিশেষ এ সূর্য এতাবৎ পাতায় পাতায় লাল রঙের অপচয় করিতে থাকে সে সহসা জনসনের মল্টজিনের ন্যায় স্বর্ণবৎ এবং উপচাইয়া ছড়াইয়া যায় যে জিন স্বাস্থ্যকে স্বর্ণমণ্ডিত করে এরূপ প্রচার।

সহসা এ কী ফুলেব বাজ্য শুরু হয আবাব। এত ফুল কি ফুটে। ডেইজি ডেইজি এবং ইতস্তত লার্কস্পাব এবং তাহা যেন বাছিয়া বাছিয়া কেহ বোপণ কবে এমন তুষাব বর্ণেব এবং তাহাকে পথ দেখায, বেনিদিকো আপন মনে হাসে এবং যেন বা ভাবে কোথায সে পা বাখে।

অদূবে অকস্মাৎ একটি অগ্নি জ্বলে খোলা আকাশেব নিচে। বলা বলা কাঠ সকল জ্বলিতেছে, মৃদুমন্থব ধূম উঠে। এবং তাহাব উপবে একটি ব্রেডফ্রুট শাখা হইতে এক ষাঁড শূন্য হইতে ঝুলিযা দোলে, মৃদু পাক খায। সে আস্ত ষাঁডই বটে যাহাব পেট কিছু চেবা, চামডা ছাডানো, সুবাসিত ধোঁযা উঠে বস গলিযা পডে। কিন্তু চামডা সমেত মাথাটি বহিযাছে যাহাতে মৃত্যুস্থিব কাচবৎ চোখ আলোকে পদ্মবাগ যেন শৃঙ্গ দুই ভূমিকে বিদ্ধ কবে বা।

পাঠক লেখক সর্বত্র সবজ্ঞ হয না। দেখ এই অগ্নিব ব্যাপাবে সেও তোমাব ন্যায সচকিত থাকিতে চাহে। কেন না ইহা যেন লুক্কাযিত অন্তত একপে স্থাপিত যে এক নাতিবৃহৎ ঝোপ ঝাপটা বাতাস হইতে তাহাকে বক্ষা কবে, সহসা যেন বা ভ্রমণকাবিগণেব দৃষ্টিতেও না পডে। কিন্তু ক্যাস্টিগলিনো পবিবাবেব এই যুবকেবও কি সেরূপ হয অথবা ব্রেকফাস্টেব আশ্বাসে সে কি কোনো বোস্টেব সুগন্ধকে অনুসবণ কবে? এবং ফুলগুলিকে দেখ অগ্নিকুণ্ডেব চাবিদিকে ডেইজিব যে সমাবোহ যা যেন দোলাযমান বৃষকেও আবৃত কবে

অগ্নিকুণ্ডেব পাশে তাহাবা ছিল। যেন তাহাবা উত্তমাঙ্গেব বস্ত্রাদি খুলিযা বাখে। একমাত্র যে ব্যতিক্রম তাহাব জার্সিতে ৭২৭ সংখ্যা ছাপা ছিল যাহা এখন কিছুটা ধোপাব ধোযায অস্পষ্ট।

তাহাব ত্বক ঘোববর্ণেব নাসিকা চওডা ও অগ্রে পিষ্ট, ঠোঁট পুরু যেন বিবক্তি অথবা অভিমানে, কদাচিৎ তন্ময়তায় ফুলানো বড বড দুই চোখ বক্তাভ, চুল সকল ঘোব কৃষ্ণ, ঘোব কুঞ্চিত যেন বা লোহাব তাব। কিন্তু তাহা এবং তাহাব সূক্ষ্মাগ্র গোঁফজোডা বিশেষ যত্নে ছাঁটা, তাহাব কোমববন্ধটি স্বর্ণবর্ণ চামডাব, এবং সে কোমববন্ধ হইতে এক শোভাময পিস্তল ঝুলে। কালো সে ইস্পাতেব পিস্তলেব নলেব মুখে এক দুই ইঞ্চি ছাডিযা সূক্ষ্ম কাবকার্যময বৌপ্যস্তবকে সর্বত্র আবৃত। এই ব্রেকফাস্টার্থী যে বিশেষ শৌখিন হয তাহাতে সন্দেহ কী? অন্য যাহাবা আছে তাহাদেব আকৃতি তেমন বিশেষ নহে। ত্বকেব কৃষ্ণতাব তাবতম্য আছে, নাসাবন্ধ্রেব গঠনেও পার্থক্য থাকে, কিন্তু ঠোঁট এবং চুল সহজেই প্রমাণ কবিতে থাকে যে কিছু ক্যাবিব, টিউটনিক এবং স্প্যানিশ বক্ত যেন বা প্রবহমান নেগ্রোযেড বক্তধাবায বাবংবাব, নানা পবিমাণে নানা কালে মিশ্রিত হয। ইহাবা যে নির্বিশেষে শ্রমিক তাহা যেন আকৃতিতে সুপ্রকাশিত।

কিন্তু তাহা কী প্রকাব ব্রেকফাস্ট? তিন-চাব মন ওজনেব সেই ষাঁড যতই উত্তম শূল্যীকৃত হউক তাহাকে কি সেই কযেকজনে কাযদা কবে? অথবা যে হয সে লক্ষ্য কবি।

কযেকটি আধাব দেখা যায এবং তাহাতে জনসন জিন লিখা , কটিগাছেব টাটকা পাতা বেশ কযেকটি একস্থানে বিছানো যাহাব উপবে তীব্রধাব ছোবা ইত্যাদি বক্ষিত, এক প্ল্যাস্টিকেব বাকেটে কিছু ফল দেখি।

কবি বেনিদিকো ক্যাস্টিগলিনো তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতলে তাহাদেব মতো আসন লয এবং বলে কেহ একজন আগুন কমাইযা দিতে থাক। তখন দুই জন উঠিযা আগুন হইতে বলা কাঠ টানিযা ফেলে যাহাতে ধূম ও আগুন কমিযা যায এবং অগ্নিস্পৃষ্ট ষাঁডটি আবও স্পষ্ট হয। বেনিদিকো ষাঁডটিকে লক্ষ্য কবে এবং তাহাতেই যেন তন্ময হয। সে কিছুকাল সেরূপই অবস্থান কবে এবং কুণ্ডব চাবিভিতে তাহাবাও তাহাকে অনুসবণ কবে।

বেনিদিকো তখন সেই পিস্তলধাবী সজ্জিত জার্সিতে নম্বব দাগানো ব্যক্তিকে বলে আমবা কি কিছু কবিব ডন ওযাল্ডো সিবাস্টিযান?

এমতো উদ্দিষ্ট হইযা সে ব্যক্তি বলে তাহাই হউক।

তখন বেনিদিকো সেই শাণিত অস্ত্রগুলির দুই দুইখানি হাতে লয়। পাঠক লক্ষ করা সে-দুটি মাতাদোরের ব্যবহৃত তীক্ষ্ণ সরু হ্রস্ব তরবারি। সে ধীরে ঝুলন্ত অর্ধদগ্ধ ষাড়টির দিকে অগ্রসর হয়। সেই পশ্চাদ্দেশে তরবারি হানিয়া টানিয়া খোঁচাখুঁচি করিয়া আধ সের পরিমাণ মাংস কাটিয়া তৃণে বিছানো রুটি গাছের পাতায় রাখে। সে মাংস হইতে তখনও ধূম উঠে, বসা গড়ায়। বেনিদিকো পুনরপি ষাঁড়ের দিকে অগ্রসর হয় পরন্তু সেখানে গিয়া কী যেন ভাবে এবং ষাড়কে প্রদক্ষিণ করে। তখন ডন ওয়াল্ডো সিবাস্টিয়ান সেইরূপ মাংস কাটিয়া রুটিগাছের পাতায় রাখে এবং পরে গিয়া বেনিদিকোকে ষাঁড় প্রদক্ষিণে অনুসরণ করে। তাহারা পরস্পরকে সে অবস্থায় দেখিয়া যেন বা লজ্জিত হয় এবং বা লজ্জা জয় করিতে সচেষ্ট থাকাকালে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। তখন সে চোয়াড় আকৃতি, যাহারা উলঙ্গপ্রায়ও বটে, অস্ত্রাদি লইয়া উঠে মাংস কাটে এবং ষাঁড় প্রদক্ষিণ করে। তাহাদের কেহ সহসা হুপ্ হুপ্ হুররা করে, তখন সকলেই তাহাও করিতে থাকে এবং শব্দের আকর্ষণেই বা তাহাদের গতি দ্রুততর, পরন্তু ঘাতযন্ত্রের লয় তাহাদের রক্তে স্থিতই এমতো এক প্রসিদ্ধি যেন প্রমাণিত হয়

পরে তাহারা রুটিগাছের পাতায় রাখা সধূম রক্তবর্ণ বসা গড়ানো মাংসখণ্ডের স্তূপটিকে ঘিরিয়া বসে এবং ফল ও জিন সহযোগে ব্রেকফাস্ট করিতে থাকে।

সে সময়ে বেনিদিকো ক্যাস্টিগলিনো জিজ্ঞাসা করে সেনর সিবাস্টিয়ান আপনার ইহা কিরূপ বোধ হয়।

ডন ওয়াল্ডো সিবাস্টিয়ান এক হান্টিং নাইফের অগ্রভাগে মাঝারি বড় এক চাকা মাংস মুখে পুরিয়াছিল। সে সংক্ষেপে কহে, মন্দ কী? বিশেষ আমাকে সম্মান জানাইতে এই ব্যাপার। নিঃসন্দেহে আমি কৃতার্থ।

বেনিদিকো। এবং এই ষাঁড়টি বীরও বটে।

ওয়াল্ডো। আহো, আপনি কি ষাঁড়কে বীর বলিতেন এবং সেজন্যই কি তাহারা মাংসকে এরূপ নাচিয়া নাচিয়া সম্বর্ধনা করি। তথবা দশকের পর দশক যে ক্যাস্টিগলিনোগণ এ দ্বীপে নৃত্য ও সংগীতের পৃষ্ঠপোষক তাহাদের শরিকের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক।

বেনিদিকো। তাহা পূর্বচিন্তিত নহে কিন্তু এখন দেখিতেছি ভালোই হইল। কাল সায়াহ্নে অন্যূন পাঁচশতটি ষাঁড় এ দ্বীপে বিফ স্টেইক ইত্যাদিতে পরিণত হয় কিন্তু পাঁচশত একতম এটি তাহাদের মতো নয়।

জনৈক ক্ষেতমজুর। সেনর আপনি কোথায় পার্থক্য ধরেন?

বেনিদিকো। তুমি হয়তো ষাঁড়ের বীরত্ব মুগ্ধ সার্থকতায় দেখ টম কস্টেলো।

এবং সম্ভবত কাল সায়াহ্নে পাঁচশতের দু-একটি বা সরকারী কসাইখানার পথে শেষবারের মতো ধেন্বারোহণ করে। না, এ সেরূপে বীর নহে। ইহার কবুদ লক্ষ্য কর। মাতাদোরের চার চার ক্ষুরধার তরবারির ক্ষত কি দেখ না?

ওয়াল্ডো। হাঁ, শেষ আঘাতে ইহা পেড্রো নামক মাতাদোর-শিক্ষার্থীকে অন্যূন দু-মাসের জন্য হসপিট্যালে পাঠায়।

এইরূপে আলাপ চলাকালে প্রচুর জিন ও মাংসের ব্রেকফাস্ট অতিথিগণকে আকণ্ঠ তৃপ্ত করিয়া তুলিল। বসন্তের রৌদ্র এখন তাহার স্বর্ণোজ্জ্বলতা ত্যাগ করিয়া রৌপ্য-পক্ষ এক বিহঙ্গের মতো ঝোপে ঝোপে কখনও নাচে কখনও খুঁটিয়া খায়।

প্রাতরাশ শেষে ওয়াল্ডো সিবাস্টিয়ান তাহার কোমরবন্ধে লুক্কায়িত পকেট হইতে সিগারেট বাহির করে। কিন্তু শ্রমিকেরা উঠে কারণ সেক্ষণে বাঁশির শব্দে ইক্ষুক্ষেত্র এবং ক্রুআরি তাহাদের ডাকিতেছে।

ভাবে অনুমান সেই বসন্ত প্রাতে প্রাতরাশান্তিক গল্পগুজবে তাহারা বা সময়ক্ষেপ করে কিন্তু দেখি কি যে সে সিগারেট সিকি অংশ পুড়িতে ওয়াল্ডো উঠে এবং বলে আপনি এক্ষণে ওই যে

ফ্রেডা কাস্‌লের প্যারাপেট, নীলবৎ দৃশ্য সেদিকে লক্ষ্য করুন কেন না এখন আমি অন্তর্ধান করিব, পরন্তু আমি কোনদিকে যাই তাহা কেহ লক্ষ্য করে তাহাও আমি চাই না।

বেনিদিকো। রাখুন রাখুন অন্তত এই সিগারেট শেষ হউক।

ওয়াল্ডো। আমি সবিশেষ দুঃখিত যে তত সময় আমার নাই। কই, আপনি শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া দাঁড়ান এবং প্যারাপেটকে লক্ষ্য করিতে থাকুন। কল্পনা করিতে দোষ নাই ওই প্যারাপেটে কেহ যদি থাকে সেই আমাদের উপাস্য। হাঁ তন্ময় হউন। ফিরিয়া দাঁড়ান। এক দো তিন।

বেনিদিকো (সহাস্যে)। তাহাই করি। কিন্তু কিছু আগে আমি এক রবিন্সন টাব্বিকে অন্তর্ধান করিতে দেখি সে আমার চোখে চোখ রাখিয়াই অন্তর্হিত হয়।

ওয়াল্ডো। যাহা বলি তাহা করুন। হাঁ এইরূপে দাঁড়ান এবং পাঁচ মিনিট অবস্থান করুন। হাতের ঘড়ির ডায়ালে চোখ রাখুন। এবং শুনিয়া থাকিবেন গত অলিম্পিকে পিস্তল শুটিং-এ আপনার ভৃত্য এই ওয়াল্ডো সিবাস্টিয়ান স্বর্ণ পায়।

বেনিদিকো ওয়াল্ডোর কথায় পিছন ফিরিয়া দাঁড়ায় এবং সত্য সত্যই ওয়াল্ডো নিকটবর্তী ঝোপের আশ্রয়ে অন্তর্ধান করিল। কিছু পরে যেন বা দূর হইতে জলের শব্দ তাহার কানে আসিতে থাকে যেন বা কেহ জলের মধ্যে হাঁটে। পাঠক ইহা যেন তাজা জলের শব্দ নহে পরন্তু যেন যাহাকে ছাযাছবি বলে তাহাতে শ্রুত পা দিযা জল ঠেলিয়া চলার শব্দ। বেনিদিকো-ডায়াল-নিবদ্ধ-দৃষ্টি চিন্তিত অহো, কেহ নির্ঝর পার হয। কিন্তু কোথায় যায়। জলাভূমিতে কি? তাহার পক্ষে হয়তো ভালো কারণ তথায দু-একটি ক্ষুদ্রাকার তৃণভূমিও আছে যথায যে কেহ দু-চারি দিন আত্মগোপন করিতে পারে।

অতঃপর বেনিদিকো নিজেও তাহার নিজের মতো লুক্কায়িত হ্যামকের দিকে চলিতে থাকে। কিন্তু কোথায় সে? তাহাদের হারাইয়া ফেলিলাম। একি দেখিতেছি, বরং ইহারা কি ভ্রমণকারী? চার-পাঁচ জনার একটি দলে ইহারা কি ইতিমধ্যে এই বনভূমিতে ক্বচিৎ দৃশ্য রবিন্সন টাব্বির অথবা প্যাঁচানো শৃঙ্গের সেই রবিন্সন ছাগের সন্ধানে আসিযাছে। ইহারা ভ্রমণব্যপদেশে চলিতে অগ্নিকুণ্ড ঝুলানো এখন প্রায় তাম্রবর্ণ সে বীরের উত্তম শূল্যীকৃত দেহাবশেষ দেখে কি? সেই দেহাবশেষ যাহা হইতে এখনও সুঘ্রাণ ধূম উঠে।

কিন্তু হ্যামকটি দুলিয়া উঠিল এবং বেনিদিকো ক্যাস্টিগলিনো ইতোমধ্যে তাহাতে অর্ধশায়িত। তাহার এক পা ঝুলিতেছে যাহা সে দোলায় এবং তাহাতে হ্যামকটি দুলিতে থাকে। হ্যামকে এখন যে বাসন্তী রৌদ্র তাহা কী না অপরূপ বিশেষ যাহা পত্রান্তরালে নির্গত হইয়া জালি-কাটা পত্রলেখা রচনা করে। হ্যামকে ইতস্তত বিশেষ বেনিদিকোর আবরণহীন উত্তমাঙ্গে তাহার শ্মশ্রু-আকীর্ণ মুখে সেই জালি-কাটা ডিজাইন নড়িয়া চরিয়া অকল্প-লোকের আভাস যেন বা আনে। তাহার দৃষ্টি যেন বা গভীরতর হয়। এখন কি কবিতা লিখি এ প্রকার মনে মনে কহে। ক্রমে তাহার ওষ্ঠদ্বয়ে এক স্মিতহাস্য দেখা দিল কেন না তৎকালে সে এরূপ অনুভব করে এই এ পৃথ্বীর কোথাও কি এমন হ্যামকে অন্য কোনো কবির প্রত্যুষ আসে যাহার প্রমাণ দেখ প্রাতরাশ মাত্র তাহা রহিল না বরং যেন কিসের এক ব্রত আচরণ হয়। অথচ তখনও উহারা ভাবে নাই সে প্রকারে আহার্যকে বেষ্টন করিয়া নাচা হয় এবং ইহা টেবলের গ্রেস উচ্চারণের অপেক্ষা হীন নয় বরং যেন সে আহার্য অকায় এক শক্তিকে আপন আত্মায় সংযোজন।

তৎকালে কবি বেনিদিকোর এরূপ এক আবেশ হইল যে সে মনে মনে বলে: হে ষণ্ড, হে পুষ্পাবৃত, তুমি যখন সুনীল আকাশে শায়িত তখনও তারকাখচিত ; হে ষণ্ড তুমিই বসন্তের প্রতীক , হে আমার অজস্র কবিতার অনির্ণীত প্রতীক, তুমি যখন ইউরোপাকে শৃঙ্গে লইয়া ধাবিত এবং সাগর জলে ঝাঁপাইয়া পড় তখন দ্রাক্ষাসহ সেই লতাগুলিও তোমার শৃঙ্গে জড়াইয়া থাকে ; আবার যখন

পদ্মরাগবৎ চোখে অগ্নিকুণ্ডকে দেখ তখন স্বপ্ন দেখ কি অনেক সবুজ পৃথিবীর ; অথবা সে কি মৃত্যুই যাহা আমরা মানুষেরাও সেরূপ কাচবৎ চোখে দেখিতে থাকি।

সে তাহার সিগারেট শেষ করে এবং পুনরপি এক সিগারেট জ্বালায় এবং তাহাকেও নিঃশেষে দগ্ধ করে। সে আশা করিল এতক্ষণে অন্য অন্য মানুষেরাও অবশ্যই সেই বনভূমিতে ঝুলিয়া থাকা বীরের সৌগন্ধে আকৃষ্ট হয় না কি?

কিন্তু বেনিদিকোর হ্যামক পত্রলেখা-ক্রীড়ায় নিমগ্ন থাকে বটে সে কবিতা লিখে না বরং পোশাক পরে। প্যান্ট ও কামিজ পরে, কোমরে দর্পণযুক্ত কোমর-বন্ধ আঁটে, কাঁধে নানারঙে উজ্জ্বল স্কার্ফ ঝুলায় এবং অতি বৃহৎ ব্যাসের বৃত্তাকার এবং দর্শনীয় উচ্চ শঙ্কুযুক্ত সম্ব্রেরো টুপি পরে। এখন সে বরং ডাউনটাউন যায়।

এস্থলে এক অসুবিধা: আয়তন সম্বন্ধে ডিফো যাহা বলেন অবশ্যই সে সকল অনুমান-ভিত্তিক এবং নিশ্চিতই তাহা রবিন্সন পাহাড়ের উপর হইতে যেরূপ দেখে তেমন অনুমান করে। ইহা তো এক সাধারণ সত্য যে পাহাড়ের চূড়া হইতে দূরত্বের আন্দাজ প্রায়শই ভুল হয়।

জেসি জেনকিনের চটি॥

কিন্তু দ্বীপ যদি বা ডিফো অথবা রবিন্সন ক্রুশোর আন্দাজ ছাপাইয়া না-ও যায় সেনর বেনিদিকোর হ্যামক ও ডাউনটাউনে এক উপন্যাসের ব্যবধান থাকে কারণ তাহাকে এখন মনেপ্রাণে এক মেক্সিকো-আগত ভ্রমণকারীই দেখি, নতুবা সে যেন বা গ্রামাঞ্চলে অনুপ্রবিষ্ট সেরূপ হকার হইবে।

পথটি পাথরে বাঁধানো কিন্তু তাহাতে শাদা ধূলায় কালো বং ঢাকা। পথপার্শ্বে কোথাও অ্যাকেসিয়া কোথায় ব্রেডফ্রুট গাছ যাহাদের পাতায় হরিৎবর্ণ ধূলায় শাদা এবং ক্যাক্টাস ত্রিশূল সকলও, দূরে দূরে ছোট ছোট বাড়ি, কোথাও বা সেগুলি থোপ ধরিয়া বসে। তাহা শ্রমিক ও ক্ষেত-মজুরদের বাসস্থল হইবে-গৃহসকলের কোনো কোনোটির এক ঘর কিছু বড় রাখা হয় যাহার জানালায় কাচ এবং দরজার উপরে ছবিযুক্ত সাইনবোর্ডও থাকে যাহাতে বোঝা যায় সেগুলি যদি চটি না-ও হয় বিয়ার-সেলার বটে এবং সস্তায় জুয়াখেলাও চলে। সেই দৃশ্যকে কোথাও জীবন্ত করিয়া যাহারা নড়ে চরে, দরজার পাশে বেঞ্চে বসিয়া একে দুইএ পাইপ টানে অথবা প্রায় রাস্তায় টানিয়া আনা টেবলে ময়লা বিয়ার-মাগ রাখিয়া হাসি গল্প এবং রাগ করে তাহারা কাফ্রি, ক্যারিব, ক্রিওল যদিও ত্বকে বর্ণে ঘন কৃষ্ণ হইতে হলুদ পর্যন্ত। সেনর বেনিদিকো ক্যাস্টিগলিনো এই পথে চলিতে, কিন্তু তাহার চলা যেন ফুরায় না, ইতিমধ্যে এক বিয়ার-চটিতে ভিড়িয়াছিল এবং তথায় ময়লা দেয়ালের গায়ে এক গিটারও দেখিতে পায়। ফলত এই যে বেলা দশটা পার হইয়া যায় এখনও সে ডাউনটাউন হইতে অনেকটা দূরে। অন্য দিকে সে চটিতে এমন এক পরিস্থিতি দেখা দিয়াছিল যে সেই সকল লম্বা লম্বা পাশে সরু টেবল ও বেঞ্চ কয়েকটি সরাইয়া এক দফা নাচ শুরু হইতে চায়। গিটর যথাস্থানে রাখিয়া বেনিদিকো পুনরায় চলিতে শুরু করিল। এখন বসন্তের রৌদ্র উজ্জ্বল। পথে মাঝে মাঝে দুই-এক করিয়া ভ্রমণকারীর বাস যায় এবং এখন বিয়ার-চটিগুলিতে যথেষ্ট মাছি উড়িতেছে।

বিশ মিনিটও যায় না পথপার্শ্বে আবার এক চটিতে সে ভিড়িয়া গেল। পাঠক, ইহা কি অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো বল? তাহা ব্যতীত আর কিইবা হয়। অন্যদিকে ইহা নিশ্চিত যে কি সে দ্বীপের সভ্যতায় কি অন্য সর্বত্র কেহ নিজের খোলার বাহিরে ব্যঙ্গও বাহির করে না। শোনা যায় গ্রীক সভ্যতা ভাস্কর্য এবং নাটক ও কাব্য দিয়াছে, জর্মনগণ ডিসিপ্লিন ও যুদ্ধকৌশল। টিউটনিক সভ্যতা কি সেরূপ, আমাদের এই পৃথিবীকে ঠোঁট-টেপা দেখিয়াও দেখি না এই দ্বৈপায়নত্ব দেয় যাহাতে যেন প্রতি ব্যক্তি এক-এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ? অথবা তাহা কি বসন্ত এবং সেই মাত্র যে ফুল ফুটায় পাখিগুলিকে কী এক মাত্রা-ছাড়া মাতাল করে।

চটিতে তাহারা তিন জন উপবিষ্ট ছিল। ইতোমধ্যে তাহারা এক সংবাদপত্র যোগাড় করিয়াছে। কেহ তাহা জোরে জোরে পড়ে অপর দুজনে তাহা শুনে। বেনিদিকো সেখানে বসিয়া পড়ে এবং সিগারেট ধরায়। কয়েকটি মাছি উড়িয়া আবার বসে। পরে পথ দিয়া এক ভ্রমণকারী বাস যায় এবং একপাক ধূলা দরজা দিয়া পাক খাইতে খাইতে ঘরে ঢুকে। তখন অতি প্রৌঢ়া চটিওয়ালী আসিয়া জিজ্ঞাসা করে কফি দিতে হইবে কি না এবং মাডামের কফি অতীব সুন্দর হইয়া থাকে বেনিদিকো এরূপ বলিলে আমার কফি যাহাদের ভালো না লাগে তাহারা যে দুশ্চরিত্রার সন্তান হইতে সন্দেহ নাই এরূপ বলিয়া চটিওয়ালীও ময়লা কাপে বাদামী ও শাদার মধ্যে কোথাও এমন রঙের পানীয় আনিয়া দেয়। এবং বেনিদিকো হাসিতে থাকে। তখন সে বিয়ার চটিতে এরূপ এরূপ কথাবার্তা হয়।

বেনিদিকো। আচ্ছা আন্টি জেসি, আমি শুনিয়া থাকি তোমার এই চটি কোনো না কোনো কারণে বিখ্যাত।

জেসি জেনকিন। না বাপু ভালো মানুষের ছেলে আমি সে সবে মাথা ঘামাই না।

বেনিদিকো। আহা, আন্টি জেসি, একদিন বা ভ্রমণকারিগণ তোমার কফির জন্য না হউক তোমার ওই বৃহৎ মাইমোসাকে দেখিতে আসে।

জেসি জেনকিন। ওই বৃক্ষ আমার জমিতে হয় না।

বেনিদিকো। সে যাহা হইতে পারে। শুনি এই রকমের কোনো এক বৃক্ষের নিকট তাহা ঘটে।

জেসি জেনকিন। থাম, থাম। এরূপ হয় না।

বেনিদিকো চটিওয়ালী জেনকিনকে লক্ষ করে। ছাপা ছিটের গাউন যাহাতে বক্ষ প্রচুর এবং উদর স্ফীত সেই বাদামী ক্রিওল স্ত্রীর কোঁকড়ানো ছোট ঝুঁটিতে ঘাড়ের উপরে জড়ানো চুল কপালে সিঁথিতে চেরা, যাহার ঠোঁট দুই পাতলা হইতে মাঝ পথে পুরু।

বেনিদিকো। হয় যে তাহার প্রমাণ কি প্যাম্‌ফ্লেটে উঠিলে বিশ্বাস কর?

চটিওয়ালী জেসি জেনকিন তখন উঠিয়া আসিল এবং যাহারা খবর কাগজ লইয়া ব্যস্ত তাহারাও উৎকর্ণ হয়।

জেসি জেনকিন। নূতন প্যাম্‌ফ্লেট কি প্রকাশ হয়, সেনর, আমি আপনাকে ভাঁড়াইতেছি। ওই গাছটি আমারই বটে। আমি আপনাকে গোপনে বলিতে চাই। সেই তাহা যাহা এখানে ঘটে--

এই বলিতে তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হয় যে সে নিচুস্বরে কহে সেনর বেনিদিকোকে সে যে চিরদিনই ইতাস্তই আপন ভাবিয়া আসিতেছে এখন যেন তাহার হেতু দেখে। তাহার আপন ভগ্নির যে পুত্র সমুদ্রে মাছ ধরিতে গিয়া সে বৎসর হারাইয়া যায় বেনিদিকো যে একেবারেই তাহার মতো তাহাতে এখন আর সন্দেহ নাই। সে, চটিওয়ালী, এক বিন্দু অশ্রুপাত করিল।

তখন কবি ক্যাস্টিগলিনো আপন মনে হাসে যে রও বেটি বুড়ি, তুমি কফির বড় জাঁক কর। অতঃপর যদি প্রকৃত কফি কিনিয়া পথের ধারে আমার অপেক্ষা না কর কী বলি। এবং হয়তো বা তখন আমাতে মৃত পুত্রকে খুঁজিয়া পাও।

পাঠক দেখিবে বেনিদিকো বৃক্ষের নিচে তাহা এরূপ বলে মাত্র এবং তাহাতে কী ঘটে। অবশ্যই জেসি জেনকিন আশা করিতে থাকে তাহার চটির নিকটবর্তী মাইমোসা বৃক্ষে ভ্রমণকারিগণকে আকর্ষণ করে, এবং নিশ্চিতেই চটির মালিক হিসাবে এবং কদাচিৎ গাইডরূপেও তাহার সৌভাগ্য উদয় হয়।

অথবা তাহা হয়তো বসন্তেরই প্রভাব যে ঠিক তখনই কোথা হইতে এক মৌমাছি আসিয়া ভনভন শুরু করে। কোথায় সে আসন পাইবে তাহা যেন স্থির হয় না যাহাতে সে টেবল এবং সিলিংএ নানা উড্ডয়ন কৌশল সকল দেখায় এবং একবার বেনিদিকোর সমব্রেরো টুপির চূড়ায় অন্য একবার এক বিয়ার-বোতলে এরূপ করিতে থাকে যতক্ষণ না আর এক ওমনিবাসের ধূলাকুণ্ডলী তাহাকে উড়াইয়া লয়।

জেসি জেনকিন। বাছা, তুমি ববং ভিতবে আইস। আমবা এক পাত্র বিযাব লইযা বসি।

বিনিদিকো। আচ্ছা আন্টি সে অন্য সময়ে। তুমি কি নিশ্চিতই বলিতে পাবো যে তোমাব মাইমোসায কাহাকেও ফাঁসি দেওযা হয না।

তৎক্ষণাৎ কী বলিলে কী বলিলে এরূপ বলিতে থাকাকালে চটিওযালী জেসি জেনকিন পুনবায অগ্রসব হয কিন্তু বেনিদিকোও সেরূপ হাসিতে হাসিতে নিষ্ক্রান্ত হয। এবং জেসি জেনকিন ইতস্তত উচ্ছিষ্ট কাপগুলিকে সংগ্রহ কবিতে থাকে।

তাহাবা কিছু বলিল না।

পবে কোনো একজন মুখেব সম্মুখেব কাগজে সবায এবং কপাল-ঢাকা টুপি খুলে। যাহাতে এইরূপে কথোপকথন হইতে থাকে।

জেফ জেফাবসন। মম্ এই বেনিদিকো কি ক্যাস্টিগলিনো পবিবাবেব একজন? শ্বেতকায বেনিদিকো ক্যাস্টিগলিনো হয বা?

তাহাদেব একজন কাগজ উঠাইযা লয, কেহ কিছু বলে না এবং তখন এক হলুদ মৌমাছি আসিযা বিযাব-বোতলে উঠে।

জেফ জেফাবসন। অথবা তোমাকে আন্টি কহে যাহাতে সন্দেহ কবি যে তাহাই হইবে, তোমাব পুবানো মনিব পবিবাবেব কেহ।

জেসি জেনকিন। পুবানো মনিব পবিবাব গোল্লায যাক। তোমাব তাহাতে কী বাছা?

জেফ। তবে কি ইনি ববি বেনিদিকো?

জেসি। তোমাব মিস্টাব ফ্রেডা আসিযাছে শুনি। জেড তাহাব জন্য যে স্টেইক কবে তাহা আনিযাছ কি?

জেফ। তুমি মাত্র এরূপই বলো। মামি, আমি কি তোমাব একমাত্র পুত্র নহি?

জেসি। তুমি তোমাব ববি লইযা বিদায হও। আমাব কাজ আছে। বক বক কবিও না।

তখন চটিওযালী জেসি জেনকিন যেন বা তাহাব কাজ বুঝাইতে তাহাব উঁচু টেবলে এক বাটি পিঁযাজ কুচাইতে বসে। তাহাবা জেফেব বাখা খববেব কাগজ উল্টায এবং কফি পান কবে।

জেফ তাহাব ভিতব পকেট হইতে একটি পাঁচ ডলাব বিল বাহিব কবে এবং বাতাসে মৃদু আছাড দিযা খুলিযা ফেলে।

জেফ। মম, ইহা কী তাহা জান কি?

চটিওযালী তাহাব বসুন কুচানো ফেলিযা উঠিযা আসে। সাগ্রহে হাত বাডাইযা বলে, তাইতো বলি, আমাব পুত্র জেফ সেরূপ নয।

জেফ। বাখো, বাখো, ইহা তোমাব হইতে পাবে যদি আমাকে জিম সম্বন্ধে সত্য কথা বলো।

জেসি জেনকিন। জিম? কে সে?

জেফ। তবে বিল আবাব আমাব পকেটেই চলিল।

জেসি। তুমি এরূপ হৃদযহীন কেন বাছা? তুমি কোন জিমেব কথা বা বলো তাহা কী প্রকাবে বুঝি?

জেফ। জিম, জিম, আমি তাহাকে আব কী বলিব? জিম যে আমাকে উৎপাদন কবিযা থাকিবে।

তৎকালে জেসি ফোঁৎ ফোঁৎ কবে যেন বা সে কাঁদিবে। বলিল সে, ও আমাব পুত্র, ও আমাব পুত্র। এরূপ বলিও না। বিলটি আমাকে দাও।

জেফ। এরূপে পাইবে না।

জেসি। আমি কি তোমাকে স্তনাপান কবাই নাই? আমাব জন্য কি তোমার দয়া হইতে নাই? বিলটি আমাকে দাও। জিম নিজেব নৌকায মাছ ধরিত।

জেফ। এরূপ তুমি বলো। কিন্তু আমি তোমার সেই ক্রমবর্ধমান টুনা মাছের গল্প শুনিতে চাই না। সে কি এখন জীবিত অথবা মিমোসা গাছে তাহারই ফাঁসি হয় যেমন বেনিদিকো বলে?

জেসি। ছি-ছি জেফ। বিলটি আমাকে দাও। তোমার ত্বক কি সুন্দর নয়? আর তাহাকে তোমাব হিংসাও কবিতে নাই। তুমি যত বড হইয়াছ, জেফ, সে বেচারা তত বড় হইবারও সময় পায় নাই। সে ত্রিশে পৌঁছায় নাই যাহা তুমি পৌঁছিয়াছ।

জেফ। বিলটি লও। এবারও আমাকে ঠকাইলে বুঝিতেছি। এরূপে হয় না।

কেন যেন জেফের দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল।

জেসি। জেফ, তোমার জন্য কি লাঞ্চ প্রস্তুত কবিব?

জেফ পুরানো কাগজটিকেই আবার পডিতে শুরু করে। কাগজটি এক ফ্যাশন পত্রিকা যাহাতে অনেক ছবি আছে। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে সে নানাবিধ ভঙ্গিতে আঁকা সেই সকল স্ত্রীলোকগুলিকে দেখিতে থাকে। ছবিগুলিতে, তাহারা নিশ্চিতই অক্ষত থাকিতে পারে না, পেনসিল ও কালিব কত না আঁচড পড়িয়াছে! আচম্বিতে সে যেন বা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া থামিল। চিত্রটি রঙিন, হাঁ. সে সুন্দবীও বটে, ববং তাহার শর্টস ও গলফসুই তাহাকে আবও আকর্ষণীয় করে কিংবা অধিক পরিমাণে পেনসিল ও কালির তীরচিহ্নগুলি আকর্ষণ করিয়া থাকে। হাঁ, সে ফ্রেডা-ভিলার সেনোরিনা না হইযা যায় না।

তখন সেখানে জেফকে উঠিয়া পড়িতে হয় যেহেতু সে বাজার করিতে আসিযা ববং কী এক তাড়নায ডাউনটাউনেব বাজাব ছাড়াইযা এখানে আসে। কিন্তু তাহাকে জেড বারবার সমযমতো যাইতে বলিয়াছে এবং জেড রান্নাব সময়ের বহু আগে হাতের কাছে সব কিছু না পাইলে বিশ্রী বকমে রাগারাগি করে।

জেফ জেফারসন শবযাত্রার সঙ্গী হয়॥

জেফ জেফাবসন অবশ্যই ডাউনটাউন বাজারে যায় কেন না সেও মুরগি এবং মাশরুম কিনিবে কিন্তু তৎকালে এই বিষম গোলযোগ হইল যে চটির দরজায় তাহাকে আইভি-লতায় বসা এক মৌমাছি উড়িতে গিয়া ধাক্কা দিল এবং নিজেই উল্টাইয়া গিয়া পাকে পডা নৌকার মতো চলিতে লাগিল।

জেফ, আহো জেফ, এরূপে হয় না। এই মতো সে ভাবিল এবং মনে মনে কহিতে থাকে আবার মাগী পাঁচ ডলার খসাইল কিংবা জেড যাহা বলিযাছে তাহাই সত্য থাকে।

আর দিবস এখন যেন প্রস্ফুটিত, পরাগ ঝরিতে থাকে যাহাতে বাতাসে বৌদ্রে দলগুলি টলমল করে, আর ভ্রমর বল, মৌমাছি বল এমন কি ডানা থাকে না এমন পিঁপড়াও কী যে করে খুঁজিয়া পায় না।

অথবা দিবস যেন এক অতিকায় লায়ার যাহার অদৃশ্য তন্ত্রীগুলি সূর্য নিজে বাজায় এবং ছিঁড়িয়া তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। মানুষগুলি চলিতে থাকে।

কিন্তু ইতোমধ্যে সে ডাউনটাউনের প্রান্ত স্পর্শ কবে। এক ঝক্‌ঝকে অমনিবাস আসে সে হাত তুলে এবং কনডাক্‌টর তাহাকে তুলিয়া লয়। সেও ভাবে এরূপে হয় না।

তৎকালে সেই অমনিবাসেব ভ্রমণকারী যাত্রীদের এরূপ আলোচনা হয়।

প্রথম সিটে পেগি। দেখো গি কি সুন্দর দেখাচ্ছে, কি সুন্দর পাহাড়টা ও মাই...

তৃতীয় সিটে গিয়োভানি। হয়তো তোমার চাইতে নয় বেবি। কিন্তু কী আশ্চর্য ওই আধভাঙা কাস্‌ল।

তৃতীয় সিটে হার্বে। হাঁ, তা বটে। এমন একটা আশ্চর্য সুন্দর পাহাড়ী দুর্গের ধ্বংসাবশেষ কল্পনাই করা যায় না। না, তুমি এমনটি কার্পেথিয়ান পাহাড়েও পাবে না ডার্লিং পেগি।

দ্বিতীয় সিটে এমা। তোমার আশ্চর্য লাগছে না ইজাবেলাকে? একটা মানুষ কি করে সেন্ট হয় দেখছো। গশ্‌। ভাবি সুন্দর। ভারি সুন্দর। আমি ভাবতেই পারি নি।

দ্বিতীয় সিটে নিনা। আর যেমনটি হলে ঠিক হয় তাই নয়। না, এমা না, আমি জানিনে তার চাইতে সুন্দর আব কী হয়। আব সেই নরমাংসভক্ষণ কি সাংঘাতিক। তোমার কফিটা কিন্তু ড্রেসিং-টেবলে ছিল।

চতুর্থ সিটে মোল্টকে। আব সে কি না ছিল নান' ডার্লিং এমা, হয়তো তোমার চাইতে সুন্দর নয়। কিন্তু, আচ্ছা বাচ্চা ফ্রেডা কি বাপকে ঠকিয়েছিল ইজাবেলার ব্যাপারে? .

পঞ্চম সিটের মাঝামাঝি বসিয়া জেফ স্বগতোক্তি করিল যে তাহাই হয়তো হয় যে জেড যেমন বলে নতুবা বলিতে হয এক অতিকায সারস তেমনই এক রুমাল ঠোঁটে ধবিযা ফ্রেডা-কাস্‌লে নামে এবং তুমি ভূমিষ্ঠ হও জেফ।

তৃতীয় সিটে হার্বে। আর আশ্চর্য বটে কামানগুলো। এখন তার ইস্পাত এমন হযেছে যে তা যেন পাথর। আর ওজনেই বা প্রত্যেকটা দু-হাজাব পাউন্ডেব কম কি?

প্রথম সিটে পেগি। অবাক না? আব পাহাড়ও দু হাজার ফুট হবে। দাঁড়ালেও পা শির শির করে। কী করে তুলল? তখন তো ক্রেন ছিল না।

তৃতীয় সিটে গিয়োভানি। অবাক, তখন ক্রেনের কথা ভাবাই হয় নি। আব একফুট চওড়া পা-হড়কানো ঢালু পথে মানুষ এগুলোকে টেনে তুলেছে। তুলেছে যে তা দেখছই, আর অবাকই বা কী? চিযফসেব পিরামিডের পাথরগুলোকে কি ক্রেন তেমন সাজাল?

দ্বিতীয় সিটে নিনা। হয়তো লজ্জা করে কিন্তু মনে হয না সন্ন্যাস্নিনী হলেও তার প্রথমটির জন্য না ধাড়ি না বাচ্চা ফ্রাইডে দাবি করতে পারে।

দ্বিতীয় সিটে এমা। আব তাতেই মনে হয না, আমরা যেমন ভাবতে ভালোবাসি, তার প্রথমটির জন্য পুরুষ দাযী নয়।

চতুর্থ সিটে মোল্টকে। আব ডার্লিং আগুনের পোড়ানোর ব্যাপারটা দেখো। তুমি কি সেটা ইনকুইজিস্যন বলো না' টি ডিউম...

বাসটা ঝাঁকি খায় না পরন্তু যেন তেলে ভাসে ইতোমধ্যে দেখ, জেফ ভাবিতে থাকে, যেন বা স্ফটিকের কিউবগুলি সূর্য সাজাইতেছে। কিউবের জোড়ে কিছু শেড, কিছু কালো, নতুবা সবই তো অ্যাম্বার এবং উজ্জ্বল। চোখ চাওয়া যায না, যেন যে রাত্রিতে ঘুম হয় না। সে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

প্রথম সিটে পেগি। আর রূপোর বুলেটের কথাও ভাবো। পিস্তলের রূপোর বুলেট।

তৃতীয় সিটে গিয়োভানি। আচ্ছা, পেগি, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি নি। সে কি তবে ডিক্টেটরদের মতো নিজের মৃত্যু রুপোর বুলেটে ছাড়া হয় না বলেছিলো। তাই হয়তো হবে নতুবা কে চাবুক মেরে কামানগুলো পাহাড়ে তোলাতে পারে।

তৃতীয় সিটে হার্বে। কিংবা এমন হতে পারে, গি, সে বুঝতে পেরেছিল একদিন মৃত্যু আসবে আর তার মতো পুরুষ শিসের বুলেটে মরলে বদনাম হয়। কিন্তু তবু দেখো ধ্বংসস্তূপটা, এমন আর হয় না।

দ্বিতীয় সিটে এমা। এখন ধ্বংসাবশেষ দেখে তুমি বুঝতেই পারো না মোল্টকে, তাই নয়? আগুনে পোড়ার ব্যাপারটা না থাকলেও যেন মানায় না; তাই নয়?

চতুর্থ সিটে মোল্টকে। যেন স্বর্গীয় কিছু নয়? যেন নিশ্চয়ই মানুষের হিসাবে চলে না। তুমি কি বলবে সেই ডাউএজর প্রেসিডেন্ট ইজাবেলা বিল অ্যাটকিন্‌সকে কয়েক দিনের কৃপা করে থাকবে।

দ্বিতীয় সিটে নিনা। আগুনে পোড়ার ব্যাপারটা ঠিকই কিন্তু। সে কথাটাই হয়তো প্রতীকে বলেছে

যে আখের খেত পুড়িয়ে দেয়াব পর এক সময়ে নতুন অঙ্কুব বার হয়। কিন্তু ডার্লিং, এখন আব এসব হতে পারে না। ভাবো আমাদেব এমা যদি.

সেই সময়ে জেফ একটি সিগাবেট ধরায় এবং স্বগতোক্তি কবে যে সে তো মাশরুম কিনিতে আসিয়াছে এবং যদি এক জোড়েব ছায়া দীর্ঘায়ত ত্রিভুজ হয যেহেতু দিবসের স্ফটিক কিউবগুলি তো একের পর অন্যটি বাখা এবং তাহা হইতেও পাবে একে অন্যকে পাশে ছাড়াইযা গেলে ছায়া হয়। জেসন বিগ্যাট যেহু, যেহু বিগ্যাট জন, জন বিগ্যাট আইজ্যাক। কেন না এই সময়ে মাশরুম ভালো এবং তাহাতে নতুন বক্ত হয। জেডও না নিলে ছাড়ে না।

সেই ক্ষণে বাসটি থামিল এবং ফুলেব বাশিতে বিশৃঙ্খলার মতো তাহাবাও নামে, হাসে, ও গড্, মাই ফুট, প্রভৃতি বলিতে থাকাকালে খিল খিল করিযা হাসে এবং কোকাকোলা অবশ্যই শীতল।

তাহাব পব জেফ উহাদের হাসিতে আকৃষ্ট হইয়া হাসে। পিছনে ধীবে ধীরে সেও নামে। এরূপ ভাবিত থাকিল সে উহাবা নামিল দেখ। আমিও নামিয়া যাই। উহারা লাইন করিতেছে দেখ। হাঁ, তাহা সবই অতীত. দেবতা রা কিংবা অন্য কেহ. সে মোবগও কিনিবে, কেন না সে সবই এক বিগত পবিত্রতা। উহারা জোড়ে জোড়ে চলে।

তৎকালে জেফ হাসিল এবং গোপন তাৎপর্য বুঝিল অথচ কী আশ্চর্য, এমন পবিষ্কাব পবিচ্ছন্ন বসন্তেব দিবস এবং সবই চতুষ্কোণ। জেফ অবনত মস্তকে সঙ্গে লয়।

স্ফটিক কফিন ও অনেক মোমের মিছিল

তাহাবা বাস হইতে নামে এবং লাইন দেয়, হাতেব কাগজ এবং হ্যাইডে নোট্স হাতে উঁচুতে রাখিয়া নাড়ে, হাসে, এবং বলে কোকাকোলা কেন না তাহা স্বাস্থ্যপ্রদ, কোকাকোলা কেন না তাহা মিষ্ট ও স্নিগ্ধ। তাহাবা এরূপ বলে এবং চলিতে থাকে এবং অধিকতব হাসে যেন যাহাতে আলোক উছলায়।

তখন জেফ অনুভব করে সে মোবগ কিনিবে এবং সে তাহাদের অনুসরণ কবে। তাহারা হয়তো এখন লাঞ্চের অভাবও বোধ করে। জেফও নিশ্চিত ফ্রেডা-কাস্‌লে তৎপূর্বে ফিরিবে। সে বরং কিছু তিক্ততা বোধ করে যে মোরগ কিনিয়া তাহাকে আবার মাশরুমেব বাজারেও আসিতে হয় এবং সেরূপ করিতে তাহাকে এক পুরা চক্কর লাগাইতে না হউক এক আর্ক ঘুরিতে হইবে।

জেডকে সে বলিবে কি তুমি হয়তো ঠিকই বলো জেড। অথচ ইহা কী না এক পবিচ্ছন্ন দিন। কল্পনা-ভিত্তিক, চতুষ্কোণ এবং কিউবে কিউব রাখিয়া চলে যাহা অ্যাম্বর স্ফটিক যেন। তাহাদেরও সেরূপ করিতে হইবে কেন না যে কেহ এ পথে চলে তাহাকেই করিতে হয় এবং ইহা একটি শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য এরূপ বলা হয়।

কিন্তু জেফ কি আবার হাসিবে কেন না সে যেন পুনরায় আবার গোপন তাৎপর্য বুঝে যে উহারা এখন সেই শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের দিকে অগ্রসর হয় এবং তুমি দূর হইতেই বুঝিতে পার যে তাহা মেটারনিটি-ওয়ার্ড।

জেফ হাসিয়া ফেলে কেন না সে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারে যে সে সবই তাহার চোখের ভুল যে সে দেখে উহারা কোকাকোলা নামে এক স্ফটিক কফিন বহন করে এবং অদৃশ্যপ্রায়, তীব্র রৌদ্রে তাহা হইলে হইতে পারে, মোমবাতিগুলি লইয়া চলে।

সে মাটিতে বসা দোকানীর নিকট হইতে পেট পিঠ টিপিয়া দুই মোরগ কিনিল। এবং তৎকালে একটি একবার তাহার হাতে ঠোকর দিল। অন্যটি শাদা এবং মাথায় লাল ঝুঁটি-যুক্ত। মোরগ দুটিকে সে ঝটপট করিতে দেখে এবং ঝোলায় পুরিয়া ফেলে।

পাঠক, আইস আমরা জেফের চোখে না দেখিয়া নিজের চোখে এই অত্যদ্ভুত সুন্দর স্থাপত্য দেখি যাহাকে তাহারা মেটার্নিটি-ওয়ার্ড বলিত এবং ডাউনটাউনেব কেন্দ্রে এরূপে স্থাপিত করে যে যে কেহই ডাউনটাউনে আধ ঘণ্টাব বেশি চলে, তাহাকে একবার ইহাব সন্নিকটে আসিতে হয়। ফাইবার গ্লাস, কংক্রিট, অ্যালুমিনিয়ামে সে এক অতি মনোহর আধুনিক প্রাসাদ যাহাকে বেষ্টন করিয়া শাদা সিমেন্টের ফুটপাত বহিয়া চলে। তোমার কি মনে পড়ে পাঠক মহাশয় এই হর্ম্যের সন্নিকটে সেনোবিনা ডোনা মিইআ ক্রেডা এক কুণ্ঠা অনুভব কবে এবং কত না স্নেহে এই সৌধ তখন লালিত। জেফ খুব একচোট হাসিয়া লইল। না, এরূপে হয় না। ইহা তো নতুন মানুষেব উৎসারও নয় এবং তাহাবা এখানে স্ফটিক কফিনও বহন করে না যাহা শুধু কল্পনাতেই হয়।

সে শাদা সিমেন্টের ফুটপাতে উঠিল এবং নিকটতম পার্কটি অতিক্রম কবিতে থাকে কেন না সে মাশরুম কিনিবে। তখন এরূপ হইল যে সে সম্মুখে ঝুঁকিযাছে যাহাতে যেন তাহার মুঠি দুইটি জানু স্পর্শ কবিবে, তাহার মেরুদণ্ড নিম্নতম উপাস্থি হইতে ঘাড পর্যন্ত এক সবল রেখা যাহা ভূমিতলে যাট ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন কবে। তাহাব পায়েব সুদৃশ্য উজ্জ্বল জুতা ক্লিক্ ক্লিক শব্দে চলিতেছে। সে মুখ তুলিয়া রাখিযাছে, যাহাব গাজব সদৃশ বং, এখন সেরূপই দেখায, থ্যাবড়ানো নাক, কোঁকড়ানো চুল সমেত যেন বা দুঃখেব স্বপ্নে প্রবেশ কবে। তৎকালে জেফ চিন্তা করে এক্ষণে মাশরুম কিনিতে হয়।

মধ্যদিনের গান

বেলা এক বাজিতে চলে এবং কবি বেনির্দিকো ক্যাস্টিগলিনো এরূপ চিন্তা কবে আমাতে কি তাহা সম্ভব কবি এট্‌স তাহাব আইরিশ কাব্য-আন্দোলনে যেরূপ কবে। সেই সব পাহাড উপত্যকা ও হ্রদ, ফেনিয়ান অয়সিন ও নিয়াম, সেই যৌবনদেশ সেই জীবিতেব, সেই বিজয়েব এবং পরে সেই ভুলে যাওযার দ্বীপ। আমিও বা আর কী করিতে পাবি পুরানো বিষযগুলিকে বলা ছাড়া।

তৎকালে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ট্যুরিস্ট ব্যুরোর উদ্দেশ্যে ডাউনটাউন পার হয সে এবং এমতো অনুভব কবে সে যাহা সেই মধুঋতুব প্রভাব। এবং যেন বা সে আপন মনে বলে সমীরণ সবেদন ধীরে বও। এবং হাল্কা কিছু ধুলা উড়ে। এবং ক্ষণকাল পরেই সে তাহার কার্ডটিকে ট্যুরিস্ট ব্যুরোর কর্তা অ্যাটকিন্সনের খাস-আর্দালির নিকট পেশ করে যাহাতে কিছু পরেই তাহাকেও বিল অ্যাটকিন্সনের সম্মুখে উপস্থিত দেখি।

অ্যাটকিন্সন তাহার শাদা নারদ-দাড়ি মুঠা করিয়া ধরে, অনুমান কবি যেন বা সে হাসে, মুঠ ছাড়িয়া দেয়, সম্মুখের হাফটোন ব্লকের প্রুফগুলি, যাহাতে সে নিবদ্ধদৃষ্টি ছিল, একপাশে সবায়, মন্যাক্‌ল খুলিল। মেটিল্ডা নামকা আসিয়া সে সকল লইয়া গেলে চেয়ারে হেলান দিয়া বেনিদিকোর মুখে চাহিল। শেষোক্ত কবিও ইতোমধ্যে তাহার সম্ব্রেরো টুপি খোলে, কাঁধে স্কার্ফ কিছু গুটাইয়া গোছায়।

অ্যাটকিন্সনের এই আফিস-ঘর যাহা আমাদের পূর্বপরিচিত খাস-কামরা হইতে পৃথক, এখন যেন বা আরও উজ্জ্বল। এক জানালা দিয়া যেন কম্পমান সফেন ভঙ্গিল জলরাশিতে গোমেদ পাল-তোলা এক নৌকা চলে দেখ। প্রকৃত পক্ষে তা নিশ্চিতই জানালা নয় বরং ছাদে রাখা পেরিস্কোপ যে দৃশ্য দেখে তাহা কৌশলে প্রতিফলিত হয় মাত্র। কিন্তু সেই জলরাশিতে প্রত্যাহত আলোক ঝলমল করে এবং বসন্তবায় আসে।

বুড়া অ্যাটকিন্সন কিছুকাল বেনিদিকোকে বলিতে সুযোগ দিলেও অপরে কিন্তু নির্বাক থাকে এবং দেখা যায় তাহার ধনে ঝোলানো হ্যামক সত্ত্বেও সে কবিও কিছু মুখচোরা। অবশেষে সে

কিছু আনে কি না বুড়া এইরূপ উৎসাহবাক্য জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার কামিজের অন্দরে হাত চালাইয়া এক টুকরা কাগজ লয় এবং বলে সে যাহা আনিয়াছে তাহা কবিতা। সেরূপ শুনিয়া অ্যাটকিন্‌সন বলে তাহা খুব ভালোই হইবে বিশেষ এই বাসন্তী দ্বিপ্রহরে অন্তত তাহা যে লাঞ্চের ক্ষুধা বাড়াইবে সন্দেহ নাই। এবং তৎক্ষণাৎ সে ইন্টারকমে দুই গ্লাস হাল্কা বিয়ার আনিতে বলে যাহা আনীত হয়। তাহাতে ক্যাস্টিগলিনো আনন্দবোধই করে, কারণ কবি মাত্রেরই কি আপন কবিতায় মমত্ব থাকে না।

অর্ধপীত বিয়ার-গ্লাসের উপবে সেনব ক্যাস্টিগলিনোর কবিতা পাঠ শুরু হয়। এবং সে নানাবিধ বহুতব কবিতা পাঠ করে। অতঃপব কবিতা পাঠ শেষ হয় এবং যেমতো স্বাভাবিক তৎক্ষণাৎ সেগুলির কীরূপ দাম হওয়া উচিত তাহা লইয়া তাহাদের মতপার্থক্য দেখা দিল। অ্যাটকিন্‌সন স্বীকার পায আধুনিক কালে কবিতা যেরূপ হয় সেরূপ তাহার কবিতাগুলি ভালোই হইয়াছে বটে কিন্তু সে যে কবিতার বিশ আমেবিকান ডলার দাম ধার্য করে তাহাতে ক্যাস্টিগলিনো কবি যৎপরোনাস্তি এবং তৎক্ষণাৎ বিরক্ত বোধ করে। কিন্তু কীইবা সে করে সে করে কেন না কয়েকটি তাদৃশ ডলারে তাহার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিযাছে।

তাহাকে সেরূপ চিন্তান্বিত দেখিয়া অ্যাটকিন্‌সন হাসিয়া কহিল যে অধিক-সংখ্যক আমেরিকান ডলারে কাহার না উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু ট্যুরিস্ট ব্যুবোকে দোষ দিতে মানুষ ইহা লক্ষ্য কবে না তাহাবও লাভ-অলাভ বলিয়া কিছু থাকে।

সেনর বেনিদিকো ক্যাস্টিগলিনো যেন বা ধাক্কা খায়। তৎক্ষণাৎ সে বলিল অথচ আমি নাকি ভাবি সে বাবদ আজই অন্যূন সহস্র ডলাব আদায় পাইব। ইহাকে দুর্ভাগ্য ছাড়া কী বলা যায়?

অ্যাটকিন্‌সন। হাঁ দুর্ভাগ্য যদি তাহা বল ; কিন্তু সেনব তাহা তোমাব কবিত্ব শক্তিব ন্যূনতা যে নয় তাহা প্রমাণ করি দেখ।

এই প্রকারে বলিয়া অ্যাটকিন্‌সন হাত বাড়াইয়া কবিতা লেখা চিবকুট লয়, ড্রয়ার খুলিয়া তাহাতে রাখে এবং অন্যত্র হইতে পাঁচশোটি আমেরিকান ডলারের তিনখানি বিল বাহির করিয়া একেবারে বেনিদিকোর হাতে ধরাইয়া দেয়।

কিন্তু তথাপি তাহাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া অ্যাটকিন্‌সন সহাস্যে কহিতে থাকে, ক্যাস্টিগলিনো, আমার পুত্র, তোমার কবিতাটি যে মাতাদোর-ক্রীড়া সম্বন্ধেই এবং ষাঁড়ের রক্তে অঙ্কিত সেই সর্বশ্রেষ্ঠ। আইস আমরা সে ক্রীড়া সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি। তাহার পূর্বে তোমাকে এ সংবাদ দিতে হয যে ট্যুরিস্ট ব্যুরোর সে ব্যাপারে আগ্রহ আসিয়াছে অথবা তুমি হয়তো বা লক্ষ কর সরকারী পাক্ষিক পত্রিকায় পর পর মাতাদোর-ক্রীড়া সম্বন্ধে তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ পায়।

বেনিদিকো। তাহা কি ক্যাস্টিগলিনো মিউজিক হল কিংবা রবিন্সনের আদি ছাগদুগ্ধ পনিরের তুলনায় কিছু বেশি? অথবা জনসন ক্রুয়ারিসের বিয়ার কিংবা মল্টজিনের বিজ্ঞাপনেরও তুলনাতে?

অ্যাটকিন্‌সন। না, তাহার অধিক নয়। তুমি ঠিকই বল। কিন্তু ইহাও অবশ্য লক্ষ্য করিবে দ্বীপবাসী যে কেহই অভিনব কিছু করে ট্যুরিস্ট ব্যুরো তাহাতে আগ্রহ দেখাইতে থাকে যাহাকে পৃষ্ঠপোষকতা না বলিয়া পারা যায় না। কিন্তু তাহার অধিকও বটে যেহেতু এই মাতাদোর-ক্রীড়াতে এই দ্বীপের সংস্কৃতির নমুনা বা থাকে। তুমি কি এইরূপে চিন্তা কর? এ-বিষয়ে আমার এক থিসিস আছে তাহা বলি।

অতঃপর সে এ প্রকার বলিল, এক তুলনা মনে পড়িতেছে, অথবা তোমার ইহা সেরূপও হইতে পারে। খাস ইস্‌প্যানিওলায় ক্যাস্টিলের অনতিদূরে পাহাড়ের এবড়ো-খেবড়ো গুহাগুলিতে জিপসিগণ যে বাস করে তাহাদের চালচলন ইত্যাদিতে মনে হয় তাহারা সভ্যতা কর্তৃক কোণঠাসা হইয়া কোনোরূপে সেই গুহাগুলিকে আশ্রয় করিয়া বাঁচে। সেখানে আধুনিক পথঘাট নাই, সরু সরু পথ

হয়তো বা আঁকাবাঁকা পথে এ-গুহা ও-গুহাকে স্পর্শ করিয়া ছোট টু-সিটার চলে। সেই জিপসিগণ মৃদু আলোকে এবং সেকালেব ড্রাম ইত্যাদি বাজাইয়া এক প্রকার নাচে। তুমি কোনো নামকরা পত্রিকায় ইহাব বিজ্ঞাপন পাও না। কিন্তু হঠাৎ-আবিষ্কারের সুখে জড়িত হইয়া তুমি অন্য কোনো অভিজ্ঞ লোকের সাহায্যে এক রাত্রিতে সেই নাচ দেখ, মোহিত হও, এবং তাহাপেক্ষা ভালো কিছু হয় না এরূপ বল। পরে তোমার কাছে তোমার বন্ধু শুনে। অনেকেই জানে কিন্তু সকলেই নিজের পৃথক গোপন আবিষ্কার রূপে সে সৌন্দর্যকে রাখিতে চায়। অথচ তুমি পবে ভাবিয়া দেখিলে বুঝবে সেই গুহাগুলিকে হয়তো এখানে-ওখানে মোম জ্বলে কিন্তু গুহার যে অংশ নাচ হয় সেখানে গুহার ছাদে ইলেক্‌ট্রিকের আলোও জ্বলিতে থাকে।

পরন্তু জিপসি-কন্যাদেব নাচে তাহা সহজলভ্য নয়, তাহাতে কিছু সলজ্জতা, কিছু বা নেহাৎ দারিদ্র্যপ্রযুক্ত অর্থোপার্জনের চেষ্টা এরূপ ভাব থাকাতে তা আদব পায়। এক্ষণে সেই গুহানৃত্য ভ্রমণকারীদের এক বড় আকর্ষণ।

বেনিদিকো অ্যাটকিন্‌সনের এমতো অনুপ্রেবিত চিন্তা জানিতে পাবিযা একই কালে আনন্দিত এবং কৌতূহলী হইল। সে প্রকাশ্যে বলিল, এইরূপই হয়। মনে মনে কহিতে থাকে, বও বুড়া তুমি যখন মাতাদোরে-ক্রীড়ায় কিছু দেখিয়াছ তখন তুমি আমাব সঙ্গে অন্তত কয়েক পা যে চলিবে তাহাতে সন্দেহ করি না।

সে পুনবায় প্রকাশ্যে কহিল, কিন্তু মিস্টাব অ্যাটকিন্‌সন, মাতাদোব-ক্রীডার সূচনা কি আপনি অন্যত্র দেখেন নাই। কে বা আমাদের দ্বীপে মাতাদোব-ক্রীড়া প্রচলন কবিল? ইহা কি বর্তমানের উদ্ভাবন অথবা পুরাতন প্রাচীন সংস্কৃতি যাহা অনাদবে গ্রাম্য হইয়া ষাঁড উৎপাদনেব বাঞ্চে কোনো প্রকাবে টিকিয়া থাকে তাহার অনুবর্তন? কী প্রকারে হইলে আপনার ভ্রমণকাবীকে অধিক আকর্ষণ কবে?

অ্যাটকিন্‌সন। পুরাতনের অনুবর্তন হইলে বা কত পুবাতন হয়?

বেনিদিকো। মহাশয়, ডিফোর সম্মানিত গ্রন্থব প্রথম প্রকাশকাল ১৭১৯ খ্রীস্টাব্দ বটে কি না? গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাগুলি ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে সুনির্দিষ্ট নহে কি? ডিফো নিজে ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে ভূমিষ্ঠ সুতরাং তিনি এই ইতিহাস রবিন্সনের নিকটেই শুনিয়া থাকিবেন। সুতরাং ববিন্সন ক্রুশোর এই দ্বীপের সভ্যতার ইতিহাস ন্যূনতম তিনশত বৎসরের পুরাতন। আমাদের এই মাতাদোর-ক্রীড়াও সেরূপ হয় যদি।

অ্যাটকিন্‌সন (সহাস্যে)। কেহ ইহা প্রবর্তন কবিয়াছিল, ক্রুশো সাহেব নিজেই কি।

বেনিদিকো। তাহা সম্ভব নয় মিস্টাব অ্যাটকিন্‌সন। আপনাব প্রকাশিত ফ্রাইডে নোট্‌সগুলিতেই উল্লেখ থাকে যে এই দ্বীপে প্রথম তিন বাসিন্দার মধ্যে একজন ইস্প্যানিআর্ডও ছিল।

অ্যাটকিন্‌সন। সেই ইস্প্যানিআর্ডই কি যাহাকে ফ্রাইডের পিতার সহিতে একত্র এই দ্বীপে ক্যারিবরা খাইতে আনে?

বেনিদিকো। হাঁ তিনিই বটেন এবং তাঁহাকেই তো ফ্রাইডে নোট্‌সে ডন ওয়াল্ডো সিবাস্টিয়ান বলা হয়।

অ্যাটকিন্‌সন। হাঁ, এরূপই স্মরণ হয় বটে। কিন্তু তাঁহাকে কি ইতিপূর্বে মাতাদের-ক্রীড়ার প্রবর্তক বলা হইয়াছে? আ, ক্যাস্টিগলিনো তুমি আমাকে উৎসাহিত করিতেছ।

তৎকালে বেনিদিকো তখন অ্যাটকিন্‌সনকে এক কপি পৃথক ছাপা ফ্রাইডে নোট্‌স আনিতে অনুরোধ করে। এখন কি তাহা সম্ভব হইবে, আচ্ছা দেখি এই মতো বলিয়া ইন্টারকমে অ্যাটকিনসন তাহার সেক্রেটারিকে ডাকিয়া ফ্রাইডে নোট্‌স আনিতে বলে।

পাঠক মহাশয়, তুমি কি লক্ষ্য কর আমাদের এই পৃথিবীতে সকল সময়েই এমন কিছু ঘটে

যাহা প্রথমে আকস্মিকভাবে ঘটে পরে যখন সেই আকস্মিকতা হইতে যুক্তিসম্মত কিছু উত্থিত হয় তখন তাহাকে আমরা যোগাযোগ বলিয়া গ্রহণ করি। সেরূপ ঘটিল।

সেই উজ্জ্বল আলোর ঘরে তখন যেন বা ত্বকেও সমুদ্র-বাতাসকে অনুভব কর। দেয়ালের গায়ে সেই যে চলমান লাল পালের নৌকা ছিল তাহা কোথায় গিয়াছে, তাহার পর বা কত দৃশ্যের পরিবর্তনের পর এখন সেখানে সার্ফ-স্কীইং হয়। সফেন জলরাশির মধ্যে যেন বা প্রমত্ত যৌবন অথবা হাস্যময়ী প্রমত্তাকে কাঁধে বহন ক'রে যেন যে তাহাদের হাস্যময় সর্বাঙ্গে ঘর্মবিন্দুগুলি, অথবা তাহা শীকরই তো, সে সহস্র হীরকখণ্ড এবং সেই তাহার ও সেই বীচিভঙ্গের প্রতিফলিত আলোক টেবিলে মেঝেতে অন্য দেওয়ালগুলিকে উজ্জ্বল করে।

এমন যে অ্যাটকিন্‌সনও তাহা লক্ষ্যে আনে এবং সহাস্যে বলে দেখ, বাছা বেনিদিকো ইহারা আমাদের ভ্রমণকারী এবং কত না সুখী হয। পরন্তু আমরা যখন থাকি না এরূপ হয তোমরা ইহাদিগকে এমন সুখী রাখিবে না কি?

ফ্রাইডে নোট্‌স আসিল। তাহা নিশ্চিত প্যাম্‌ফ্লেট হইতে সংগৃহীত লাল চামড়ায় বাঁধা সোনার জলে লিখা এক ফাইল কেন না তাহা গত রাত্রিতে প্রকাশিত সেই মিনি কিতাব নহে।

তখন বেনিদিকো ফাইল লয, পৃষ্ঠা উল্টাইয়া স্থলবিশেষে আঙুল রাখে এবং বলে, এই দেখুন মিস্টার অ্যাটকিন্‌সন ইতোমধ্যে প্রকাশিত নোট্‌সে এরূপ আছে যে সেদিন ডন ওয়াল্ডো সিবাস্টিয়ান তাহার ক্ষুদ্রাকার বাঞ্চে দাঁড়াইয়া এমতো চিন্তা করে যে বড়সাহেব রবিন্সন কি পুনরায় আসিবে, হায়। এই জাহাজী গোরাগুলির অত্যাচার সহে না যে। এই যে রাঞ্চ মিস্টার অ্যাটকিন্‌সন যাহাতে অবশ্যই যণ্ড থাকিবে। তাহাদের উন্নত ককুদ চোখ-চোখ শৃঙ্গ দেখিয়া ইস্প্যানিয়ার্ড ডন ওয়াল্ডো সিবাস্টিয়ানের মনে কী মাতাদোর-ক্রীড়া কথাই একের অধিক বার হয় না?

অ্যাটকিন্‌সন। হয়তো বা তাহা হয কিন্তু প্রকাশ পায নাই। পরন্তু আসল কথা এই যে এই সকল মাতাদোর-ক্রীড়াকে সেই জিপসি-কন্যাদের নাচের মতো কিছু কাঁচা রাখা যায় কি? সেনর বেনিদিকো ক্যাস্টিগলিনো কিছু বলিতে সঙ্কল্প করে কিন্তু সেই ক্ষণে সেই যোগাযোগ ঘটে যেমন পূর্বেই বলি।

যেন বা কিছু গোলযোগ হয়, যেন বা দরজার বাহিরে আর্দালি নিচয়, সমস্বরে কিছু বলিতে থাকে, কেহ বা অগ্রাহ্যভবে হাসিয়া উঠে, যাহা মধুর, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটকিন্‌সনীয় কামরায় কাচযুক্ত হাফ-ডোর খুলিয়া বন্ধ হয়। তাহার পর যেন বা তাহা আবির্ভাবই। যেন বা দেয়ালের গায়ে পেরিস্কোপ প্রজেকশনে একদল যে কাহারা মাথায় টুপি আঁটিয়া সফেন সমুদ্রে সাঁতরায়, যাহারা স্বাস্থ্যবান, আনন্দোজ্জ্বল, এবং লাঞ্চের ঘণ্টাকেও আমল দেয না সেই তাদের একজনই যেন সহসা অকস্মাৎ অ্যাটকিন্‌সনের টেবলের সম্মুখে নামিয়া আসে। আর আগন্তুকও সেরূপেও দাঁড়ায যাহাতে দেয়ালের ছবি পিছনে থাকে।

তখন একই কালে সেই কামরার ভদ্র নীতি বিমর্দনে এবং সেই এক স্বভাবত বিনীত ব্যক্তির সাহসিক প্রকাশে এমন কী অ্যাটকিন্‌সনও বিপর্যস্ত হয়। আলগা রকমে পরিচিত একজনের সেরূপ অভাবিত উত্থানে বেনিদিকো তো তদ্গত তন্ময়ই। তৎকালে সে ভাবিত থাকে ইহাকে কোথাও দেখিয়াছি কি, অথবা এই কী প্রথম দেখি। সম্ভবত ইনি নেপচুনই যে জল হইতে উঠে।

কিন্তু আগন্তুক যেন বা সঙ্কুচিত থাকে, কিংবা সে যেন অ্যাটকিন্‌সনীয় রীতিভঙ্গে রীতিমতো দ্বিধাগ্রস্ত যাহাতে সে তৎক্ষণাৎ বলিল মিস্টার অ্যাটকিন্‌সন আমি এখন ফিরিয়া যাই, এরূপ আসিয়া ভালো করি নাই বা।

অ্যাটকিন্‌সনের ঘোর কাটে না যেন তথাপি সে বলিল, তুমি আসন লও। এই ভদ্র ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ শেষ করি, পরে তোমার কথা শুনি। যখন আসিয়াছ, আসন লও। তৎপর তোমাদের পরিচয় করাইয়া দিতেছি। শোনো বেনিদিকো ক্যাস্টিগলিনো, ইনি মিস্টার জন জোয়াকিম ফ্রেডা

কেহ কেহ যাহাতে মিস্টা ফ্রেডা বলেন, আব সেনব ফ্রেডা, ইনি আমাদেব দ্বীপেব এবং ট্যাবিস্ট ব্যুবোবও বটে, কবি সেনব বেনিদিকো ক্যাস্টিগলিনো ডি লা হ্যামক।

এই প্রকাব বলিতে পাবিযা অ্যাটকিন্‌সন হাসিতে পাবিল। পাঠক, তোমাদেব কি বিস্ময বোধ হয? আব তাহা হযই বা না কেন? তাহাব পবনে হ্রস্বতব শর্টসগুলিব এক, গাযে চডানো এক ঢাউস টোযালিযা, পাযে সুদৃশ্য দৃঢ় স্পোর্টস শ্যু, হাতে জ্যাভলিন যাহাব প্লাস্টিক দাঁডা স্ফটিকেব মতো আলো ধবে। তাহাব উদব, বক্ষ, হাতেব দৃশ্যমান অংশ ও পাযেব পেশিগুলি যেন ঢেউ তুলে। এবং তাহাব বিশ বৎসবে সে পনবো বৎসবেব মতো হাসে। পাঠক, জানিবে ৰূপ, স্বাস্থ্য ও যৌবন ও বীতিভঙ্গ কবিবাব সবল সাহসে কিযৎ পবিমাণে দেবত্ব থাকে।

এক বিতর্কিত লাঞ্চ অথবা মধ্যদিনেব গান—২

কিন্তু যে বলা হইযা থাকে সে দিবস তাহাবা একত্র লাঞ্চ কবে সে কিৰূপ হয? তাহা বিতর্কিত এবং পবে ডকুমেন্টাবি ছবি তুলিতে এই অংশ সহজে চিত্র পবিচালকগণেব বিশ্বাসযোগ্য হয নাই, তাহাবা ববং ইহাকে মধ্যদিনেব গান—২ এৰূপ বলিতে চান, কাবণ সেনব ফ্রেডাব যেৰূপ পোশাক তাহা বীতিমতো চিত্রেব পক্ষে যতই শোভাযুক্ত হউক ডকুমেন্টাবিব পক্ষে তাহাই নাকি বীতিসম্মত হয না। আদুব গাযে শর্টস মাত্র পবিযা কাঁধে টোযালিযা এৰূপ কে কবে লাঞ্চে বসে। তাহাবা নিম্নলিখিত সংলাপগুলি লইযাছেন বটে, পবে চিন্তাভাবনা কবিযা যথাযথ চিত্রে বসাইবেন।

আলাপন—১

অ্যাটকিন্‌সন। ভালো, বেনিদিকো পুত্র আমাব এক কথা বলি শোনো তোমাব পুস্তিকা আমি আজ সকালেই পডিযাছি।

বেনিদিকো। কি আশ্চর্য, তাহা ইতিমধ্যে আপনাব হস্তগত হয। ভালো লাগিল কি?

অ্যাটকিন্‌সন। ভালো বটে। কিন্তু তোমাকে সে বিষযে কিছু বলিতে চাই।

অ্যাটকিন্‌সন এই অবস্থায বেল পুশ কবে এবং পুনবায সুন্দবী মেটিল্ডা আসিলে নবমাংস ভক্ষণ ও তাহাব পব' পুস্তিকা আনিতে বলে, এবং তাহা আনীত হয। দেখা যায নানাবঙেব বহুতব ফ্ল্যাগে সে পুস্তিকা ইতোমধ্যে যেন বা শোভা পায।

বেনিদিকো। কি আশ্চর্য, ইতোমধ্যে ইহাতে এত ফ্ল্যাগ কেন। ওইসব অংশ কি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ কবে।

অ্যাটকিন্‌সন। তুমি কি তোমাব পুস্তক আমাদেব কিছুটা পডিযা শোনাও।

বেনিদিকো। (সহাস্যে) ক্ষতি কি যদি তাহা আপনাব পীডাদাযক না হয।

অ্যাটকিন্‌সন। বৎস বেনিদিকো তাহাই কব। নীল ফ্ল্যাগটিব নিচে কিছুটা পডিযা শোনাও। সেনব ফ্রেডা আশা কবি তোমাবও ভালো লাগিবে। তুমি কি এক কপি ধবিযাছ?

ফ্রেডা। না। কিন্তু লেখক নিজে পডিলে তাহা সবিশেষ হয।

বেনিদিকো তৎকালে ফ্ল্যাগ-চিহ্নিত পাতা খোলে। এইৰূপ পডা শুরু হইল।

বেনিদিকো। দ্বীপেব গভর্নব শ্রী ববিন্সন ক্রুশো কযেকটি ইংলন্ডীয স্ত্রীলোক দ্বীপে আনযন কবেন। তৎপবে ব্রাজিলে তাঁহাব নিজস্ব কলোনিতে গমন কবত' দ্বীপবাসিগণেব নিমিত্ত গোরু ছাগল, শূকব পাঠান। সে সকল দ্বীপে বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু একদা অকস্মাৎ আবাব দ্বীপে তিনি প্রত্যাগমন কবেন এবং তখনই তাঁহাকে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইতে হয কেন না তিনি লক্ষ্য কবেন কেহই

আর তাঁহাকে মানে না, যেন বা তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং একটি নামমাত্র যাহার সাহায্যে শপথ করা হয়। তিনি বিদ্রোহী জাহাজী নাবিকদের নেতা বিল অ্যাটকিন্সনকে ডাকিয়া পাঠান এবং সে আসিলে তাহাকে বলেন দ্বীপের কেহ গবর্নর আছে কি? সে বলিল, আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের সেরূপ কেহ নাই। ক্রুদ্ধ ক্রুশো তখন কাঁপিতে কাঁপিতে কহেন, হা ধিক ধর্ম, হা ধিক মানুষের কৃতজ্ঞতা বিল। তোমার ফাঁসি হইতে পারিত তাহার পরিবর্তে তোমাকে কি অন্নজল কৃষিক্ষেত্র এবং খাস ইংলন্ডীয় রমণী দিই নাই এবং যেমতো শুনিলাম তাহাকে লইয়া পরম শান্তিতে আছে। শুনিয়াছি জেনকিন কিছু অধিক বয়স্কা কিন্তু জানিয়া রাখিবে তাহার ইংলন্ডীয় পূর্বস্বামী জেনকিন টাইবার্নে ফাঁসি যাইবার পূর্বে রাজকীয় রক্ষী বাহিনীর লেপটেন্যান্ট ছিল। কিন্তু ইহাতে সেই বিল অ্যাটকিন্স কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।...কিন্তু এখানে লাল পেনসিলের দাগ দেখি। এখানে কি আপত্তি আছে আপনার?

অ্যাটকিন্সন। না, সেনর কবি তুমি পড়িতে থাক। প্রকৃতপক্ষে দ্বীপের গভর্নর কেহ ছিল না। তাহা যে ক্রুশোর ভান জাহাজী গোরাদের ভয় দেখাইতে ডিফোই তাহার সাক্ষ্য দেয়।

বেনিদিকো। আচ্ছা পড়ি। ...এমতে রবিন্সন তাহার স্বদেশীয় জন স্মিথ ইত্যাদিকেও ক্রোধ অনুনয় বিনয় করিয়া ব্যর্থ হইয়া অবশেষে কিছু ধর্মভাবে আক্রান্ত হইল এবং তৎকালে তাহার কপাল উদ্ভাসিত করিয়া এরূপ এক চিন্তা দেখা দিল যে সে অপক্ষপাতী হইবে যে সে অতঃপর ডন সিবাস্টিয়ানো, ডন ক্যাস্টিগলিনো প্রভৃতি ইস্প্যানিয়ার্ডদেরও, যাহারা শান্ত স্বভাবের জন্য প্রিয়, তাহাদের ও ফ্রাইডে প্রভৃতি ক্যারিবগণকে যাহারা নরমাংস একেবারেই ত্যাগ করে তাহাদেরও আর দূরে রাখিবে না বরং স্বজাতীয় অ্যাটকিন্স প্রভৃতির অপেক্ষা মূল্য দিবে। ...এখানেও কিন্তু এক দাগ দেখি এবং তাহা লাল পেনসিলের।

অ্যাটকিন্সনস। পড়িয়া যাও। পরে বলিব।

বেনিদিকো। আচ্ছা পড়ি। ...তাহার পর ক্রুশো ফ্রাইডেকে ডাকিয়া পাঠাইল এবং জিজ্ঞাসা করিল আমার মনে পড়ে আমি তাড়াতাড়িতে যাইবার কালে আমার দুর্গে দুই স্ত্রীলোক রাখিয়া যাই এবং বণ্টন করি না—সেই তাহারা কোথায়, কিভাবে আছে? ফ্রাইডে যাহা সত্য তাহাই কহিল কিন্তু তৎকালে তাহার ভাষাজ্ঞানের অল্পতা প্রযুক্ত এরূপ মনে হইল যে সে দুটিকেই উদরে স্থান দিয়াছে। কিন্তু তাহাও যে নয় তাহা বুঝা যায় কারণ ফ্রাইডে বলে সে দুটিকেই সে উপস্থিত করিবে এবং বড়সাহেব যেটিকে ইচ্ছা কিংবা দুইকেই লইতে পারেন।

অ্যাটকিন্সন। (উচ্চহাস্যে) চমৎকার।

বেনিদিকো। তবে কি ইজাবেলাতে আপনার কিছু আপত্তি আছে?

অ্যাটকিন্সন। না বাছা, তাহাকে তুমি উত্তম লিখিয়াছ। যেন বা সে দ্বীপের গার্জিয়ান সেন্ট, যাহার প্রভাব এরূপ বর্ধিত হয় যে যুদ্ধ ও শান্তি তাহার দৃষ্টিপাতে নির্ভর করে। কিন্তু তুমি যে বল নিঃসঙ্গ একক বৃদ্ধ রবিন্সন ক্রুশো পরিণত বয়সে সব ত্যাগ করিয়া ছাগলের খামারে মন দেয় এবং মাত্র পনির উৎপাদন করে তাহা ঠিক কি?

বেনিদিকো। তাহাতে কি অন্যায় আছে?

অ্যাটকিন্সন। ক্যাস্টিগলিনো ডি লা হ্যামক তুমি অবশ্যই চিন্তাশীল, পরন্তু বৃদ্ধ নিঃসঙ্গ ক্রুশোকে তদ্বৎ প্রকাশ করিয়া তাহাকে দ্বীপের ফাদার-ফিগার হিসাবে যথোপযুক্ত শাস্তিও দিয়াছ। ভাবিয়া দেখ তাহাকে ফাঁসিও দেওয়া হয় কি না। কিন্তু যে তুমি তাহাকে নিঃসঙ্গ কর তাহাতে দ্বীপে রবিন্সন বংশ লোপ পায় না কি? হাঁ সপ্তদশ রবিন্সন যে নাকি রবিন্সন রিয়্যাল গোট মিল্ক চীজ কম্পানির মালিক, তোমাকে বলি, ইতোমধ্যে ডিফামেশন সুটের কথা চিন্তা করে কেন না সে নিজেকে রবিন্সন ক্রুশোর বংশধর বলে তুমি যাহা বল না।

বেনিদিকো। এই মাত্র। (সহাস্যে) কিন্তু আপনার নিশ্চয় স্মরণে হয় যে সেই বিদ্রোহী নাবিকগণের মধ্যে বিল অ্যাটকিন্সের সঙ্গীও এমন একজন ছিল যে যাহার নাম রবিন্সন।

অ্যাটকিন্সন। এবং শুধু তাহাই নহে তুমি কি তাহা স্বেচ্ছায় কর যে ক্রমশ ইস্প্যানিয়ার্ডগণকে খাস ইংলন্ডীয় হইতে রবিন্সনের প্রিয় কবিতে থাকে এবং যেন বা আদি বংশীয়গণ অপেক্ষা আহেলী দ্বীপবাসিগণকে পৃথক কর।

বেনিদিকো। (চিন্তাযুক্ত) আপনার পেনসিলের দাগগুলি কি আপনার এরূপ চিন্তার চিহ্ন?

অ্যাটকিন্সন। আমরা লক্ষ্য রাখিতেছি। বেনিদিকো হয়তো বা আমার কথা রূঢ় শোনায়, কিন্তু তোমাব নোট্সে এক প্যাটার্ন ক্রমশ প্রকাশ পাইযাছে যাহা কালো জন স্মিথ ও শ্বেতকায় জনসনকে পৃথক করে এবং কালো জেনকিন প্রভৃতি শ্বেতকায় অ্যাটকিন্স হইতে প্রাধান্য পায়। হাঁ ট্যুরিস্ট ব্যুরো তোমাব নোট্স সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করে।

তখন অ্যাটকিন্সন হাসিল কারণ নারদ-দাড়িমণ্ডিত সে সদাহাস্যময় এরূপই প্রসিদ্ধি। তৎকালে বেনিদিকো নিতান্ত চিন্তাগ্রস্ত থাকে কেন না সে অনুভব করে এই বুড়া অ্যাটকিন্সন অবশ্যই ধুরন্ধর বাজনীতিজ্ঞ যেহেতু দেখ কিরূপে সে এতাবৎ তাহার মনেব ভাব গোপন রাখে। কিন্তু ইহা কি মাত্র মতামত বিনিময় অথবা ইতোমধ্যে তাহার গত বাত্রিতে প্রকাশিত নোট্স আই. জি. অফিসে পরীক্ষাব অধীন হইয়াছে। হাঁ, ইহা চিন্তাব বিষয় বটে।

আলাপন—২

অ্যাটকিন্সন। সেনর জন জোয়াকিম ফ্রেডা তোমাকে ধন্যবাদ দিই। আজই, এইতো কিছুক্ষণ হয, সেনোবিনা ডোনা মিইআ আসিয়াছিল। জানিলাম যে তুমি আসিযাছ। ইহা নিশ্চিত সুখেব কথা। কেন না তুমি জান অবশ্যই যে এই বৃদ্ধ তোমাব একজিকিউটর।

জন জোয়াকিম ফ্রেডা। এরূপ শুনিযাছি।

অ্যাটকিন্সন। তোমার একুশ বৎসর হইতে চলে। এখন তোমাদেব স্থির-নিশ্চয হইতে হয় যে নিজেব সকল ভার নিজে লও কি না লও, অথবা তোমায় পূর্বে পূর্বে সেনব ফ্রেডাদের ন্যায় একজিকিউটরগণেব তত্ত্বাবধানে চল।

জন ফ্রেডা। আমাকে ভাবিতে হয়। এই স্বাধীনতার স্বাদই বা কী, হয়তো তাহা তীব্র হইবে এবং এই একজিকিউটরগণও সুখের হানি করে না।

অ্যাটকিন্সন। যেরূপ অভিরুচি। তুমি কি শুনিয়াছ এক আমেরিকান ফ্রেডা কাস্ল কামানগুলি-সমেত কিনিতে চায় যাহাতে সে তাহা নিজেব অন্টোরিও হ্রদেব দ্বীপে স্থানান্তরিত করিতে পাবে।

জন ফ্রেডা। হয়তো আমার একজিকিউটরগণও যথাকর্তব্য সে ব্যাপারেও করিয়াছে।

অ্যাটকিন্সন। বড়ই চাপ আসিতেছে। সে যাহা হউক এখন আমার এই সৌভাগ্য কেন বা উদয় হয় তাহা বল।

জন ফ্রেডা। আমার কিছু দরকার পড়িয়াছে। আগামী মাসের মাসোয়ারা হইতে কিছু আগাম চাই।

তাহাতে অ্যাটকিন্সনের আপত্তি ছিল না এবং সে তৎক্ষণাৎ এক চেক বহি বাহির করিয়া পাঁচ শত ডলারের এক চেক লিখিয়া দিল।

জন ফ্রেডা। অশেষ ধন্যবাদ, মিস্টার অ্যাটকিন্সন।

অ্যাটকিন্সন। আদৌ নয়। (সস্নেহে) আচ্ছা জন এই কি তোমার জ্যাভেলিন এবং সত্যই কি তুমি তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু? ক্রমশ আমেরিকার পক্ষে অলিম্পিকে লড়িতে পার? এখন বা প্রাকটিস করিতেছিলে?

সেনর ফ্রেডা প্রতিটি প্রশ্নে সলজ্জভাবে হাঁ বলিয়া গেল।

আলাপন—৩

সহসা যেন তাহার গতি রুদ্ধ হয় একরূপে দাঁড়ায় জন জোয়াকিম ফ্রেডা। তখন সে এক গুঞ্জনও শুনিতে পায় যেন ট্যুবিস্ট ব্যুরোর আর্দালিরাও তাহাকে আলোচনা করে যেন যে এই সাধারণ হয় না কেন না অ্যাটকিনসন সাহেবও এরূপে তাহার সঙ্গে আলাপ করে এবং জ্যাভলিনও দেখ হয়তো বা যাহা অলিম্পিকেব।

বেনির্দিকো। (মৃদুস্বরে) মিস্টার ফ্রাইডে।

জন ফ্রেডা। (চমকিত) আপনি কি আমাকে বলেন?

বেনির্দিকো। (সহাস্যে) আর কাহাকে বা এরূপ বলি। আপনার সহিত এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। আসুন ইহাকে স্মরণীয় করি। অন্তত কিছুকাল একত্র চলি।

জন ফ্রেডা। আমাকে আপনি মিস্টার ফ্রাইডে বলেন কিন্তু আমি তো জন জোয়াকিম ফ্রেডা এবং সেই নামেই বিশ্ববিদ্যালয়ে লিখিত থাকে।

তখন বেনির্দিকো সিগারেট বাহির করে এবং তাহারা সিগারেটও ধরায় এবং ডাউনটাউনের পথে একত্র চলিতে থাকে।

সেখানে তৎকালে সেরূপ চলিতে থাকাকালে জন জোয়াকিম ফ্রেডা যেন নিতান্তই বিস্মিত হয় যে এই কী হইতে চলে এবং একের অধিক বারও হয়। ইহা কি পূর্ববৎ সে সামঞ্জস্যই যে তাহাব এবং মাইকেল ফ্রাইডের আকৃতিতে দেখা যায়, অথবা তখনও তাহার সেরূপ নামকরণও হয় নাই। ডিফো লিখে রবিন্সন ক্রুশো সেই ক্যারিব মানুষকে যেমন দেখে এবং ডিফো যাহা লিখে তাহা কি মাত্র এক উপন্যাস নয়?

তখন সে বিচিত্র সকল ভাবিতে থাকে যে তাহার একজিকিউটরগণ কি তাহাকে পারিবারিক কাগজপত্র ফেবৎ দিবে এবং তাহাতে কি সেই গোপন হৃদয়বিদারক তথ্যগুলি থাকে যাহাতে তাহার পূর্ব পূর্ব ফ্রেডাগণেব ধ্বংসের হেতু সকলও জানা যায়, যে সে কী প্রকৃতই এক ফ্রাইডে এবং এই দ্বীপও তাহার স্বজাতীয়গণের। হায়, কি রূপেই বা ফ্রেডা-কাস্‌ল কাহারা ধ্বংস করে এবং দ্বীপে সাহেবগণও বাস করিতে থাকে।

সহসা অকস্মাৎ কী যেন তাহাকে স্পর্শ কবে যাহাতে যেন তার পা দুই ধীরগামী হয়, যেন বা সে বহু ভার বহন করে। ইহাতে সে ক্লান্ত কিন্তু যেন এক তৃপ্তিও বোধ করিতে থাকে।

বেনির্দিকো বলিল : এবং ইহাও এক আশ্চর্য রকমে সত্য যে এখনও আপনি আপনার কাস্‌লেই বাস করেন। মিস্টার ফ্রাইডে অন্য আমি কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

সমীরণ সবেদন ধীরে বও॥

কিন্তু যে বলে তাহা মধ্যদিনের গান সেই বা কিরূপ? বসন্তের দ্বিপ্রহরে কি সংগীত আছে? তাহা কি ক্লান্ত কূজন? তাহা কি নিঃসন্দেহই রোদনভরা? যাহা দেখি তাহা তো এক সমীরণ যাহা যেন আপনার হাতে ধূলা তুলিয়া মাথায় দিতে থাকে।

জন ফ্রেডা ডাউনটাউনের পথে অগ্রসর হইল এবং চিন্তা করিতে থাকে যে সেদিকের কোনো স্ন্যাক-বারে অথবা এমন কি ড্রাগ-স্টোরে লাঞ্চ সারিয়া লয়। তখন সেখানে জন ফ্রেডা যেন এক উজ্জ্বল অ্যাম্বর আলোকও দেখে যাহা বুঝি বা সেই চতুষ্কোণগুলিকে গড়ে এবং তাহার হৃদয় সুগন্ধে ভার হয়।

জন জোয়াকিম ফ্রেডা সেই দ্বিপ্রহরে কিছুকাল এক হাল্কা স্বেচ্ছাগামী বাতাসের মতো ডাউনটাউন পণ্যশালায় রহিয়া গেল। এ দোকান হইতে লাল আপেল তুলিয়া লইয়া কামড়ায়, সে দোকানের কাউন্টারে কিছু রাম্বা রাম্বা নাচে, এ দোকানের পণ্য উঠাইয়া দৌড়ায় পরে অন্য দোকানে রাখিয়া হাঁটে। কোনো দোকানদার রাগ করিল, কেহ হাসে, অপরে তাহার হাত হইতে জিনিস কাড়িয়া যথাস্থানে রাখে যাহাতে সেও হাসিয়া উঠে। ভ্রমণকারীরা কিছু অবাক, কেহ বা শঙ্কিত। অপরে এরূপ ভাবে এ সকলও কি ট্যুরিস্ট ব্যুরোর আয়োজন। কিন্তু তাহারা তো রাগ করে না সে যাহাদের উপদ্রব করিতেছে। তাহারা যেন শান্তিভঙ্গের আশঙ্কাও করে না, যেন বা পণ্য লোকসানেও আপত্তি থাকে না। সে যে এ দোকানের পণ্য দুই দোকান বাদে অন্যটিতে রাখে সে আবার হাতে হাতে ফিরিয়া আসে। এমন যে যেন সে শহরের এক পরিচিত পাগলা যাহাকে ইহারা স্নেহ করে। কেহ বলে তোমার জননী সেই অভিজাতা সেনোরিনা ডোনা মিইআ এরূপ পছন্দ করে না। পরন্তু সে যেন বা পরিচিত অভিজাত পরিবারের এক একসেন্ট্রিক যুবক যে যত কিছু ক্ষতি করুক বিল পাঠাইলে তাহা সহজেই চুকানো হয়। আর ক্ষতিই বা সে করে কোথায়?

পাঠক, তুমি কি বসন্তের বাতাসকে চিন্তান্বিত দেখিয়াছ? অথবা তাহা হয়তো আপনাকে ভুলিয়া যাওয়া। সেদিন সে খেলা ভালো লাগিল না কিংবা হয়তো তাহা ভুলিয়া গেল যেন বা তাহার মনখানিকে সে বিছাইয়া দিবে।

সে দিবস তখন শেষ হইয়া আসে। কবি বেনিদিকো ক্যাস্টিগলিনো ডি লা হ্যামক তাহার বনভবনে প্রত্যাবর্তন করিতে থাকে। জেসি জেনকিনের চটিতে আইভিলতায় দুই-চার মৌমাছি এমন তাড়াতাড়ি করে যে ঝঙ্কার উঠে।

জেসি জেনকিন বলিল, বাছা বেনিদিকো আমি সত্যই উৎকৃষ্ট কফি আনিয়াছি। মাইমোসা গাছটি কিন্তু—

বেনিদিকোর মুখে যেন বা ছায়া, সকল মৃদুভাবে ভয়াল হয়। সে কহিল, আন্টি ওই মাইমোসা বৃক্ষে বিল অ্যাটকিন্স্ তাহার স্ত্রী জেসি জেনকিনকে ঝুলাইয়া দিয়াছিল।

জেসি জেনকিন ভাবিল এই দেখ আবার রসিকতা করে কিন্তু কী এক অনির্বচনীয় ভয়ে সে দিশেহারাও হইল।

শীর্ষাভিসারী বাহু

শ্যামল ছায়া নাই বা গেলে॥

পাঠক, ডকুমেন্টারি চিত্র যে তোলা হয় তাহার প্রযোজকগণের এই মত যে তাহা এক শীর্ষাভিসারী বাহু যাহা উচ্চাবচ ভূমি হইতে তখন এক সুতীব্র গতিতে উত্থিত হয়। যেন বা তাহা অভ্রংলিহ ছিল এবং তাহাতেও তার উচ্চাভিলাষ ক্ষান্ত হয় না। কিন্তু শ্যামল ছায়াও যে রহিল না তাহাও তো সত্য কেন না সেদিন দ্বিপ্রহরে থাকিয়া থাকিয়া যে উদাস বসন্ত বায় বহিতেছিল যাহা পুষ্পরেণু লইয়া ক্রীড়ায় মাতে, মৌমাছির গুঞ্জন বহন করে তাহাই শাখে শাখে অজস্র অগ্নিশিখাগুলিকে প্রমত্ত করে। ব্রেডফ্রুট গাছগুলি, লতাগুলি, সুদৃশ্য ক্যাক্টাস ঝোপগুলি যাহার তলদেশে ক্ষুদ্রাকৃতি পাহাড়ের মতো নুড়ি সকল সাজানো, সেই তৃণাস্তরণ যাহা সুগন্ধ বিস্তার করিত সকলই জ্বলিয়া উঠিল। রবিন্সন টাব্বি নামক ধেড়ে বনবিড়াল, এবং বন্য ছাগগুলি নিষ্কৃতির পথ পাইল না। আহা, সেই ভ্রমণকারিগণ এবং বনরক্ষকগণও যাহারা যথাক্রমে প্রমোদে ও কর্তব্যে রত তাহারাও কি রক্ষা পায়? যেহেতু

নির্ঝর তো সামান্য বিস্তৃত তাহার উভয় তীরে প্রসারিত সেই অগ্নিতে ক্রমশ ডন ওয়াল্ডো সিবাস্টিয়ান তাহার জলাভূমির আশ্রয় জ্বলিতে দেখিল সুতরাং সূর্যের আলোক দূরে দূরে যে ঝিলিমিলি সৃষ্টি করে কিংবা চন্দ্রকিরণ যে ছায়া নিক্ষেপে অভ্যস্ত তাহা ছাড়া কি কবি বেনিদিকো ক্যাস্টিগলিনো ডি লা হ্যামক কি অলিম্পিক স্মল-বোর শুটিং চ্যাম্পিয়ান ডন ওয়াল্ডো সিবাস্টিয়ানের আশ্রয়স্থল রহিল না। দমকলের বাহিনী অগ্নি নির্বাপণে প্রাণপণ কতই না করিল, এবং সাধারণ পুলিশ বাহিনী ও ফরেস্ট প্রিজার্ভেশন ফোর্স এই উভয়কে পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিতেও থাকে। তাহারাও ধরা না দিতে কৃতসংকল্প হয় কেন না ডন ওয়াল্ডো তো ইতিপূর্বেই নরহত্যার প্রচেষ্টার অভিযোগে ফেরার, ইদানীং কবি ক্যাস্টিগলিনো ডি লা হ্যামকও সংরক্ষিত বনভূমিতে আগুন জ্বালাইয়া এবং অনবধানতায় মৃত্যু ঘটাইয়া ৩০৪ ধারায় সোপর্দ হইতে অব্যাহতি পায় না। কারণ সেই পুষ্পখচিত বীর যে বনে ঝুলিয়া উত্তম রোস্ট হইতেছিল তাহার সংবাদ তো ইতিমধ্যে বোস্ট-সংগ্রাহকদের আলাপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। হায়, সেই বীর ষণ্ড হেঁটমুণ্ডে তার কাচবৎ চোখ দুটিতে যে অগ্নি দেখে তাহা কি মৃত্যুই!

তখন সেরূপ হইল যে কিছু এক যেন ঘটে যাহা আকাশের মেঘকে দীর্ঘ করে এবং তাহার ছিন্ন অংশের ধারগুলিকে যেমন রাঙায় বাতাসেও সেরূপ থরথর কাঁপে। ডাউনটাউনের দোকানীরা অস্বস্তিতে ইতিউতি করে। তাহারা দোকানপাট সাজায়, তাহা বন্ধ করে, হাসেও কিন্তু সে অবস্থায় সহসা যেন ভিতরে কোথাও কিছু সহসা ফাঁকা হইয়া যায়।

ভ্রমণকারীরা কিছু বুঝে না। তাহাদের কেহ কিছু কি বলিবে? সুতরাং এক রহস্যময় আশঙ্কাকে যেন তাহারা কফি-পটের ছায়ায়, একটু সরিয়া ওয়েটারগণ পরস্পরে যে আলাপ করে তাহাতে, এমন কি সুঘ্রাণ মাস্কোভি ডাক্-রোস্টের পাশেই তাহা শায়িত বা এমন অনুভব করে, এবং তাহারা চিন্তা করিতে থাকে ইহা কী সাংঘাতিকই বা হয় কেন না কিছুই তো প্রত্যক্ষ হয় না।

অ্যাটাকিন্‌সনকে দেখিলে কি বোঝা যায়? সে কিছু শীর্ণ। যেন বা সে তাহার নানারঙের সেই সব বড়িগুলিকে হুইস্কি-গ্লাসের তলদেশে ঘুলাইয়া পান করিতে ভুলিতেছে।

কাহারা যেন নিঃশব্দে স্থান পরিবর্তন করে এবং অন্য কাহারা যেন সে অনুসারে অগ্রসর হয় কিংবা পিছাইয়া আসে। শেষোক্তগণ যে পুলিশ, ফরেস্ট প্রিজার্ভেশন ফোর্স, এবং আইল্যান্ড মিলিশিয়া তাহাতে সন্দেহ নাই।

দূরে দূরে রাজধানী শহরগুলিতে তাহারা হিসাব করে, পরস্পরে আলাপ করে, সহসা আচম্বিতে তাহাদের কোনো কোনো সংবাদপত্রে দ্বীপ সম্বন্ধে, তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে, তাহার আবহ এবং সেই তাহার নানা তামাশা সম্বন্ধে কেহ প্রবন্ধ লিখে। কেহ জানে না কেন অথচ চিন্তায় দ্বীপটি প্রাধান্য পায়।

চতুর্থ দিবস এবং কনসালগণ

তখন প্রভাত হয়-হয় এক নম্বর কনসাল যাহার সাইডবার্ন প্রায় তুষার-শুভ্র, তাহাকে এখনও ডয়েন বলা হয় না কেন না তিন নম্বর কনসাল ক্ষুদ্র এক রাজ্যের হইলেও এমন বৃদ্ধ যে সে হাঁটিতে লাঠি ব্যবহার করে, এক রেডিওগ্রাম পাইল এবং তাহা এরূপ যে ব্রেকফাস্টের মধুচর্চিত টোস্ট মুখভ্রষ্টই হয় বা। রেডিওগ্রাম অবশ্যই স্বদেশ হইতে। সে তৎক্ষণাৎ সেক্রেটারিকে ডাকিয়া অতিশয় কড়া এক প্রতিবাদ-পত্র লিখিয়া পাঠাইল যাহার শেষে সে লিখে ব্যক্তিগতভাবে সে সন্ধ্যার মধ্যেই যে প্রতিবাদ জানাইবে তাহাও নিশ্চিত। দুই নম্বর কনসাল এরূপ জানিতে পারিয়া স্বদেশে কোড টেলিগ্রাম পাঠাইল যে তাহার অনুমান যে ইহাই অপারেশন ব্ল্যাক টিউলিপ, এবং বুড়া অ্যাটকিন্‌সন

তলে তলে ইউরেনিয়াম তুলিবার রাইট দিতে দরদস্তুর করে। দুই নম্বর কনসালের তাহাব দেশ হইতে তারাবার্তা পাইতে দেরি হইল না এবং ফলত সেই দিবসের বেলা অবসান হইবার কিছু পূর্বে সে বরং এরূপ এক অভাবনীয় সুবিধা বোধ করিল যাহাতে অন্যান্য কনসালগণ নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া যায়। কারণ তাহার স্বদেশ হইতে এইরূপ গবেষণা করা হয় যে রবিন্সন ক্রুশো প্রকৃতপক্ষে এক ধর্মগ্রন্থ যাহা কৌশলে ক্রিশ্চিয়ান সহ্যশক্তিকে এবং সূক্ষ্মভাবে স্থানীয় ক্যাবিব অধিবাসীগণকে বর্বব প্রতিপন্ন করে যাহাতে তাহারা যে ফ্রাইডে বংশের অধিকৃত এই দ্বীপ বলপূর্বক অধিকার কবিয়া তাহাদের কাস্‌ল ইত্যাদি ধ্বংস করিয়া এক শোষণের রাজত্ব সৃষ্ট করে। উপবন্তু বিল অ্যাটকিন্‌স প্রভৃতি কলোনিয়াল শোষণের ব্যাপারে ক্রুশোর সাগরেদ।

পঞ্চম দিবস যাহা এক জাতীয় শোকদিবস

জুম্ জুম্ শব্দে তাহা সব আকাশে উঠিয়া পড়িল হ্যাবিকেন, ডর্নিয়ার, মেসার-মিটৎস্ ও মিগ সকল। এবং বেলা দ্বিপ্রহরের ডাউনটাউনে যখন দ্বীপ-মিররের বিশেষ সংখ্যা লইযা হকারগণ দ্রুত ছুটিতে থাকে সহসা এক দারুণ শব্দ হয় এবং প্রজ্বলিত অবস্থায একখানি ডর্নিয়ার ভাঙিয়া পড়িল। বিস্ময়. ত্রাস প্রভৃতির পর ঔৎসুক্য একে একে দ্বীপবাসিগণকে মথিত করিতে থাকিল। তখন তাহারা দেখিল ডর্নিয়ার কি গভীর না এক গর্ত সৃষ্টি কবিয়াছে।

ধীরে ধীরে এক চাপা দীর্ঘ নিশ্বাসের মতো পরে এক চাপা কান্নার মতো এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল ভগ্নস্তূপে সে দেহ যাহা দগ্ধাবশেষ ও অনেক মেডেলযুক্ত তাহা অবশ্যই উইং-কম্যান্ডার ওয়াল্টার স্মিথসনের। তখন সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ এরূপ চিন্তা করিল ইহা নিতান্তই ট্যুরিস্ট ব্যুবোর অব্যবস্থা যে এই সময়ে ইহা ঘটিল এখন তো আর নতুন এডিশান বাহির করিতে সময় নাই। সন্ধ্যায় বিশেষ ক্রোড়পত্র বাহির করা যায় বটে এবং তাহাতে ছাপিতে উক্ত উইং-কম্যান্ডারের জীবনী এবং ফটোগ্রাফ সংগ্রহও হইয়াছে কিন্তু তাহার পূর্বে ভ্রমণকারীদেব নিকট এই গর্ত যাহাকে ক্রেটার বলে তাহা কি নিতান্ত পুরাতন হইয়া যায় না।

অন্যদিকে দেখ ট্যুবিস্ট ব্যুরোই সমস্ত কৃতিত্ব আত্মসাৎ করিতে থাকে। বুড়া অ্যাটকিন্‌সন অবশ্যই কৌশলী।

অ্যাটকিন্‌সন হোটেলের হলে, কারণ তাহাই দ্বীপের সুদৃশ্যতম হলও বটে, উইং-কম্যান্ডার ওয়াল্টার স্মিথসনের দেহাবশেষ সুদৃশ্য কাচ-কফিনে বৈকাল হইতে শায়িত বহিল। আর সে বসন্তে ফুলের অভাব ছিল না। দ্বীপের অধিবাসিগণ, ভ্রমণকাবিগণ, কনসালগণ ধীরে ধীবে কালো পোশাক পরিয়া এই অমুকেব পক্ষ হইতে পুষ্পস্তবক রাখিলাম এইরূপ বলিয়া নিঃশব্দ, মহৎ, গম্ভীর মিছিল করিয়া অগ্রসর হইল। তখন সরকারি এবং বেসরকারি ভবনসমূহে যে পতাকা ছিল এবং যেখানে পতাকা ছিল না সেখানে তাড়াহুড়া করিয়া যে পতাকা তোলা হইল, সে সকলই অর্ধনমিত করা হইল।

এবং সন্ধ্যায় আলোক জ্বলিতে না জ্বলিতে প্রভু আরও নিকটে, প্রভু আরও এবং ঘিরিয়া আসা অন্ধকারে আলোক জ্বালো এরূপ গানের সুরে রেডিওতে বিশেষ সংগীত বিতরণ শুরু হইল যাহার শিল্পিগণের নাম, ঘোষকের নাম ও পরিচালকের নামও ঘোষণা করা হয়। কারণ ইহা প্রকৃতই শোকদিবস রূপে প্রতিপালিত হইতেছিল।

সংবাদপত্রগুলির সন্ধ্যার ক্রোড়পত্র অবশ্যই বাহির হইল এবং তাহাতে উইংকম্যান্ডারের ছবি ছাপাও হইল কেন না তাহা তো জাতীয় কর্তব্য কিন্তু সেগুলি তেমন বিক্রি হইল না কারণ তাহা তো ইতোমধ্যে বাসি হইয়াছে। ফলে তাহাতে এরূপ এক কথা শোকবাণীর মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া

বলা হইল যে ট্যুরিস্ট ব্যুরো যেন এরূপ সব ঘটনা সম্বন্ধে সংবাদপত্রকে জানিতে সুযোগ দেন কেন না গণতন্ত্রের এই অধিকার বাদ দিলে তাহা আর গণতন্ত্র থাকে না।

সপ্তম দিবস এবং হলুদ ক্যাকটাস

পরে এরূপ বলা হয় যে সে স্থানটি ছিল পাহাড়ের ঢালু উপত্যকা। অল্প তৃণাস্তরণ, আলগা গোল নুড়ি, একটি-দুটি আকেসিয়া এবং কয়েকটি ক্যাকটাস। সেদিন দ্বিপ্রহরে সবই যেন হলুদ। যেখানে সে হলুদ ফাটে সে জোড়গুলি যেন বা লাল। কোনো এক মাকড়শা গবাক্ষ পাথরে যেন বা লাগিয়া থাকে। বসন্তের আলোকই তো কিন্তু তাহা যেন এখানে এক শঙ্কু অন্য কোথাও বা কতকগুলি ভাঙা স্প্রিং-এর কয়েল প্রস্তুত করে যাহা বিশেষভাবে চোখে বিঁধে।

ধূলা উড়ে কারণ ইহা গ্রস্ত উপত্যকাই বা হয়।

তৎকালে সংবাদপত্রসমূহের 'ওয়র-করস্পনডেন্ট'দের দুইখানি জিপ্ ধূলা উড়াইয়া টাল-মাটাল করিয়া সেই পাহাড়ের উপত্যকায় উঠিতেছে। হায়, তাহারা ডাউনটাউনের সুখ সমুদয় ছাড়িয়া আসে এবং এখন তাদের ধূলিমলিনও দেখায়। তাহাদের মনে ভয় পতঙ্গের মতো কখনও বা ভাঙা পা কখনও বা ছেঁড়া শুঙ্গ নাড়ে কিন্তু তাহারা এমন যে সকলেই যেন পেপসোডেন্টের হাসি হাসে যেন বা তাহা এক বুলেট-প্রুফ চাদর যাহা তাহাদের রক্ষা করিতে পারে।

অবশেষে তাহাদের জিপ এমন এক স্থানে পৌঁছায় যাহা কিছু সমতল এবং তৃণ নাই, ধূলা উড়ে, জুনিপার এক্‌সেলসাও নাই, এবং অধিকাংশ ফণীমনসাও মৃত। তাহারা দলবদ্ধভাবে চলিতে থাকে, যেন তাহারা মৃত মানুষ তাহাদের ওষ্ঠাধর এরূপ ঈষৎ দাঁত দেখাইয়া স্থির। তাহারা ভীত সুতরাং দলবদ্ধ এবং সেরূপ স্থির মুখভঙ্গিতে চলে কেন না তাহারা যে শত্রুভাব পোষণ করে না তাহা জানাইতে চায়। কেহ ভাবিল হায়, গণতন্ত্রের সুবিধার জন্য, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিমিত্ত প্রাণপাত করা কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয়? অথচ এই কী হইল যে পিছাইতেও পারি না।

দিবস ক্রমে উত্তপ্ত হয়, অধিকতর ধূলা উড়ে, তাহারা ঘর্মাক্ত হয় ও তাহাদের জুতায় নুড়ি সকল ভাঙ্গিয়া আরও ধূলার সৃষ্টি হইতে থাকে। এবং তাহারা চারিদিকে বিশীর্ণ ক্যাক্টাসের ঝোপ সকল দেখে, বায়নোকুলার ঘুরায়।

অবশেষে তাহার এক ক্যাক্টাস দেখে যাহার এক ত্রিশূলের অগ্রভাগে অপূর্ব এক হলুদ ফুল ফুটে। আর কী বিষম সেই হলুদ! মাটি ও আকাশ যেন কে কাহাকে হলুদ করিল বুঝে না। এবং হলুদ ইস্পাতের ইলেক্‌ট্রিক করাতের কয়েক ফুট এক তীক্ষ্ণ ঢেউ যাহা রক্তাভ, এবং খাড়া করিয়া বসানো স্প্রিং-কয়েল যাহার অগ্রভাগ ভাঙিয়া সুতীক্ষ্ণ। দেখ সেই ক্যাক্টাসের পাশে ঈষৎ দৃশ্য দুই বুটের তলদেশে পিতলের তারাসকল যাহা কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত।

তৎকালে যে কথোপকথন হইল তাহা বলি।

১ নম্বর সাংবাদিক। (সহাস্যে) সেনর বেনিদিকো ক্যাস্টিগলিনো আমরা অবশেষে আসিয়াছি।

তৎকালে সেনর বেনিদিকো ক্যাস্টিগলিনো উঠিয়া বসে। আহা, তাহার চুলগুলি রুক্ষ, সাইডবার্ন এমন বাড়িয়াছে যে ইম্পিরিয়াল ও তাহাতে মিলিয়া ধূলি-মলিন চাপা দাড়ি, জামা কাঁধের কাছে বেশ খানিকটা ছেঁড়া, শুধু তাহার কোমরবন্ধের উজ্জ্বল চোখগুলি এখনও কয়েকটি দেখা যায়। নিশ্চিতই তাহাকে হলুদের মধ্যে স্থাপিত এক সিপিয়ায় অঙ্কিত চিত্রবৎ দেখায়। এবং তখন সাংবাদিকগণেরও কাহারো মুখ ত্রিভুজ-সদৃশ এবং রক্তবর্ণ, কাহারো চোখ দুটি নাকের একই পাশে থাকে এবং সে যেন স্টীল-ব্লু রঙের, কাহারো অধরোষ্ঠ উল্টাদিকে এবং ত্রাসে দাঁতগুলি গালে দেখা যায়।

সেনর বেনিদিকো। আপনারা কে, কেনই বা আসেন? আপনারা কি ট্যুরিস্ট ব্যুরো প্রেরিত ম্যাবাইন কিংবা কম্যান্ডো বাহিনী?

২ নম্বর সাংবাদিক। সেনর ক্যাস্টিগলিনো আমরা সেরূপ নাহি। আমরা ওয়ব-করেস্পনডেন্ট'। আপনি যাহাদেব কথা বলেন তাহারা আমাদের পিছনে আসিবে না কেন না বুড়া অ্যাটকিন্‌সন এরূপ মানিযাছে। আপনি কি আমাদের নিকট বিবৃতি দিবেন?

সেনর বেনিদিকো। (আহা তাহাকে কতই পিপাসার্ত ও ক্ষুধাখিন্ন দেখায়) আমি কিছু ক্লান্ত।

৩ নম্বর সাংবাদিক। আপনাব শেষ লিখিত কবিতা কি পাইতে পারি?

সেনর বেনিদিকো। (সহাস্যে) আমার কাগজ নাই। হাতের তেলোয ডট্ পেনে কিছু লিখিয়াছিলাম বটে। আচ্ছা লিখুন সেই গাছটিকে আমি বললেম / ও হৃদয ওগো বনস্পতি / এবং তাবপর নতজানু আমার আত্মা / কান্নায় কাতর হয়ে প্রার্থনা করল বারবার / কি কবে বা প্রার্থনা কবি / আব দুহাতে সে প্রার্থনা সবটুকু তুলে / লহ বলে শেয অঞ্জলি দিল // একটি হলুদ পদ্ম আমাকে দাও / যে পদ্মকে কোনো গ্রন্থের সম্মুখে / বলি দেওয়া হয় নি / কেন না আমি একটি মন্ত্র চাই // আর তখন সেই গাছটি / হঠাৎ যেন ঝড়ের ঝাঁকিতে আর্তনাদ করে / তার ডালে ডালে যেন ড'ইনিবা / যেন সেই বনস্পতি বাহু / শব্দাতিগ এক নাচের ঘূর্ণিতে / শত লক্ষ শাখা / সবুজ পাতা আর শ্যামল কিশলয। সে ঘূর্ণিতে ঝড়াপাতাব মতো / উড়ে উড়ে গেল // তাবপব আবাব শান্ত হল সে / কেন না সে বনস্পতি // আর তার একটি বীজ বিঁধে গেল পৃথিবীতে // আমি একটি ফুল কুড়িযে নিলাম // এই পৃথিবী নিরতিশয় হলুদ। (বেনিদিকো হাস্য কবিল) নয় কি?

১, ২, ও ৩ নম্বব সংবাদিক সমস্বরে। এই কবিতাব বয়্যালটি আমবা কোথায় জমা দিব? আপনি জানিবেন সব সংবাদপত্রেই ইহা প্রকাশ পাইবে।

২ নম্বব সাংবাদিক। সেনর, আপনি কি ইহাকে বিপ্লাবন বলেন, কেন না দেখুন অল্পসংখ্যক লোক অধিকসংখ্যক লোককে সার্থকভাবে ভয় দেখায়, এবং নতুন মন্ত্র রচিত হয, এবং সকলেই ভাবে প্রতিবেশীকে হত্যা কবা হয় বটে, আমি কিন্তু কোনো বকমে বাঁচিযা যাই।

বেনিদিকো। হাঁ তাহাই। অথবা দেখ ইদানীং সেরূপই হয়। সা ইরা।

তখন বিশেষ সাংবাদিকও কিছু বলিল, কিন্তু, পাঠক মহাশয তাহা যথাস্থানে। এবং কাগজেও প্রকাশিত দেখিবেন। বরং কিছুক্ষণেই সাংবাদিক সকল অন্তর্হিত হইল যেন সময় উত্তীর্ণ হয়। কেন না ইতোমধ্যে পদশব্দ শোনা যায়। দুম করিয়া এক ট্রেসার-বুলেটও শূন্যে ফাটিল। এবং অতঃপব একেব পব এক তাহা ফাটিতে থাকে যাহাতে যেন সেই দগ্ধ হলুদের ইতস্তত এক ধূসরতা নামিতে থাকে। আর ক্রমশ তাহা যেন এক অপরিসীম ধূসবতা।

ক্যাক্টাসের পাশে সেইক্ষণে এক গাঢ়তব হলুদ-মিশ্রিত ধূসব মানুষকে দেখি যে যেন বা কতই ক্লান্ত। সে তাহার সাব-মেশিনগান হাতে লয়। এবং চারিদিক হইতে সেই ধূসরতাকে রক্তবর্ণ বুলেট সকল ভেদ করিতে থাকে। বেনিদিকোব সাব-মেশিনগানের কল হুইর্ শব্দে ঘুরিতে শুরু করিল। কিন্তু সহসা আচম্বিতে কট্ করিয়া এক শব্দে কল থামিয়া গেল।

ডন ওয়াল্ডো সিবাস্টিয়ানো তাহাকে ঠকাইয়াছে।

তাহারা আসিতেছে এবং পলায়নের পথও নাই। এক গভীব ধূসরতা নামিতে থাকে। ক্যাকটাসটি দুলে, বুলেটগুলি তাহাকে কাঁপায়। সেনর বেনিদিকো ক্যাস্টিগলিনো ডি লা হ্যামক পিপাসা বোধ করে। আহা সে চার দিবস কিছু খায় না। সেই ধূসরতা এমতো গাঢ় ক্রমে যে ক্যাকটাস কালো দেখায়।

সেনর বেনিদিকো সম্মুখে হেলিল, একবার বাম হইতে দক্ষিণে দুলিল। তাহাকে অনেক বিঁধিয়াছে। সে ক্যাকটাসের গোড়ায় মুখ থুবড়াইয়া পড়িল। আহা সে দুই দিবস জলও পায় নাই। সেনর

বেনিদিকো তৎকালে এই শেষ চিন্তা কবিল। হে পুষ্পখচিত বীব অথবা আমবাও কাচবৎ চোখে হেঁটমুণ্ডে পৃথিবী দেখি এবং মস্তিষ্কে তখন কিছু ধবে না।

বলা হইতেছে ডকুমেন্টাবিব কোনো কোনো অংশে বং ব্যবহাব কবা হইবে, বিশেষ এ অংশ তো বটেই লেখক সর্বজ্ঞ না হওযায, পাঠক মহাশয আমবা এই বিশেষ গোপন অংশেব জন্য ডকুমেন্টাবিব স্ক্রিপ্ট অনুসবণ কবিলাম।

নানা বঙের হাউই, এস আমবা পুবনো খববেব ফানুস উড়াই

সাংবাদিকগণ পূর্বেই ডাউনটাউনে আসিযাছিল, সুতবাং এরূপ হয যে বুড়া অ্যাটকিন্‌সন যখন টেলিফোনেব খবব পাইযা স্মিথসন স্কোযাবে হাউই বাজি ইত্যাদি কবিতে বলে, সে নিশ্চিতই দপ্তবকে হুকুম দিযা সাংবাদপত্রগুলিকে এক দ্রুত-আহূত প্রেস-কনফাবেন্সে ডাকে, তৎকালে সহসম্পাদকগণও কবি ক্যাস্টিগলিনো ডি লা হ্যামকেব শেষেব কবিতা এবং একটি পুষ্পসহ এক ক্যাকটাসেব কাহিনী সবিস্তাবে ইতোমধ্যে ছাপাব ব্যবস্থা কবিযাছে, এবং বক্স কবিযা স্পট-প্রেস সংবাদ রূপে ক্যাস্টিগলিনোব মৃত্যুসংবাদও প্রস্তুত বাখে, কেন না তাহা তো হইবেই। পবন্তু তাহাদেব বিভিন্ন সংবাদসেবী প্রতিষ্ঠান সকল হইতে নানা জাতেব ক্যামেবা ফ্ল্যাশ-বাল্ব, গান, ফিল্টাব ইত্যাদিসহ ইতোমধ্যে তাহাবা ফটো আনিতেই গিযাছে—সেই গ্রস্ত উপত্যকা, মৃতপ্রায সেই ক্যাকটাস এবং যেমন সে তাহাব গোড়ায শায়িত থাকে।

পাঠক মহাশয, তুমি অবশ্যই জানিবে যে হাউস সকল জুম্‌জুম্ কবিযা আকাশে উঠে, বুম্ কবিযা ফাটে, আবাব তাহা হইতে নানাবিধ বহুতব তাবকাগুলি প্রসূত হয যে উল্কাব মতো খসে, যাহা নিচেব ইলেক্ট্রিকেব আলোব একবঙা, তুলনায বা লালচে আস্তবণে, যাহা যেন আলোকিত ফগ্ কেন না ধূলিকণাও উড়ে, বাড়িগুলিব উপবে আকাশে এবং তাহাদেব খযেবি বঙেব সিলুযেটে এই লাল এই সোনালি এই পিম্পাবনেলবৎ ঝবিতে থাকে। এবং তাহাবা হাততালি দেয, নাচে, গায, বেল বাজে, সাইবেন আঁ আঁ এবং ল্যাজ-মাড়ানো কুকুব ক্যাঁ ক্যাঁ কবে এবং সে ইয শৌভনিক যাহা মেলিসাণ্ডা, এবং বঙ্গম কেন না ইহাই জীবনবেদ এবং বাতবিতান হযতো তাবলিমা বা অবদান যেন পবিবেশনা প্রভৃতি অনেক অনেক বলিতে থাকাকালে তাহাবা হর্ষোৎফুল্ল হয এবং তাহাদেব মুখেও অজস্র নানাবিধ, বহুতব আলোক পড়িতে থাকে।

তৎকালে এরূপও হইল যে দেযালে সাঁটা, ফুটপাতে বসানো এবং ভ্রমণকাবিগণেব হাতে হাতে যে সকল খববেবকাগজ তাহাতেও নানা আলোকগুলি পড়িতে থাকে যাহাতে এই হেডলাইন, এই বক্সে স্টপ-প্রেস, এই এখানে কবিতাব পঙ্‌ক্তি এরূপ দেখায এবং একই বিষয নানাবঙে উদ্ভাসিত হয যেমন মানুষগুলি ক্ষণে ক্ষণে আত্মপ্রকাশ কবে।

এবং তাহাবা নানা প্রকাবে আলাপনও কবিতে থাকে সে তাহাব কিছু নমুনা এরূপ হয়।

জেসি জেনকিন। (যাহাবা অতিবিক্ত স্টার্চযুক্ত শাদা বনেট এবং তিমিহাড়েব স্টে-যুক্ত বড ঘেবেব ফ্রক। তাহাব চতুর্দিকে নানা আলো বিৎ বিৎ কবে। মৃদু স্ববে সে বলিতে থাকে) জিম, জিম, ও জিম। (প্রকাশ্যে) অথবা এই আলোকগুলি দেখি এখন।

পেগি। (খিল খিল হাসিযা লোহাব বেঞ্চের দিকে ধাবমান হইল কাবণ তাহার মুখে ও বুকে আলোক পড়ে) ট্রালালা, ট্রালালা, টাট্টা টাবাবা। জোনাকি ঝিকিমিকি জ্বালো আলো। (স্বগত) হায় পিল খেতে ভুলেছি।

এক নম্বব কনসাল (যাহাব কালো ডিনাব-পোশাক, সাদা স্টার্চ কবা শার্ট, সাদা বো-টাই, হাতে

মালাক্কা কেন, যাহারা মুখে একপাশে মাত্র পিঙ্ক আলো পড়িল) গররর্...

সোগ্রাম। (যেন বা সে মাশরুম ফিরি করে এবং তাহার মুখে অ্যাম্বর আলো গড়াইতে থাকে) মাশরুম, মাশরুম, মাশরুম .

গিয়োভান্নি। (যাহার মুখে জামার বুকে হাউইএর রক্তিম আলোক খানিকটা ছলকাইয়া পড়ে যাহা যেন সেরূপ পানীয়) কোকাকোলা যাহা মিষ্ট, কোকা-কোলা যাহা শীতল, কো...কা...কা...লা।

এমা। (দেয়ালের গায়ে খাঁচা করিয়া বসানো সুদৃশ্য এক লোহার বেঞ্চে সে বসে। তাহার হাতের খবরকাগজে সিঁদূরে আলো বিৎ বিৎ করে যাহা সে পড়ে) আর এই দেখ, হি, হি, হি, তৎকালে এক রূপার পিস্তল ও রূপার বুলেটই থাকে যাহা ছাড়া মাইকেল ফ্রাইডের মৃত্যু হইতে পারে না, এবং সে তাহাই করিল। হি, হি, হি।

দুই নম্বর কনসাল। (যাহার কালো ডিনার-পোশাক, শাদা বো-টাই, হাতে মালাক্কা কেন এবং পায়ে পায়ে হাঁটে এমন পুডল যাহার চোখ দুই বিষম লাল পুঁতিবৎ) গররর্!

নিনা। (যাহার চুলে খানিকটা ম্যাগনেসিয়াম ফ্লেয়ার পড়িয়া রূপার আঁশের মতো দেখাইতে থাকে যেন বা কেহ তাহাকে হোলির দরুণ জিঙ্ক অক্সাইড মাখায়) কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য, কী...হি হি হি।

লাকি ওয়াল্টার। (যে যেন এক কমলা রঙের স্তম্ভের পাশে দাঁড়ায় এবং সোনালি ফ্রেমের চশমা বাহির করিয়া বুকের জামায় ঘষিয়া চোখে দেয় এবং অপর দুই হাতে প্রকাণ্ড এক বই খুলে যাহা যেন সচিত্রিত এক ফ্লোরেন্টাইন বাইবেল এবং যেন সে গির্জাতে কিছু পড়িবে এমন উঁচা জায়গায় দাঁড়ায়) এক দিবস আমি ভ্রমণে বাহির হই। এই সে উপত্যকা যাহা পূর্বে যে উপত্যকার কথা বলি তাহা হইতে পৃথক এক এবং যেখানে অজস্র দ্রাক্ষা সকল থরে থরে ফলিত থাকে দেখি। (সে যেন বুঝাইতে এক তর্জনী উঠায়)

জেসি জেনকিন। (যাহার মুখের এক পাশ মাত্র দেখা যায় কেন না তাহাতে সবুজ একরূপ আলোক কাঁপে) জিম, হাঁ জিম, হাঁ, তাহা হয়তো বড় এক টুনাই হয়। এবং সমুদ্র তখন প্রত্যুষের নতুন স্বাদ। কী লজ্জা যে জেফ জিজ্ঞাসা করে আর নূতন হইতে চায়। (ফিস্ ফিস্ করিয়া) কেন না বর্তমানে জেফ যত বয়স্ক তুমি তাহাও ছিলে না। আহা জিম। (প্রকাশ্যে) এই আলোকগুলি কী বা মনোহর!

পেগি ডগলাক। (যেন সে কোনো খামারের টাইলগেট পার হয় এবং উজ্জ্বল ধূসর আলোক হইতে চোখ আড়াল করে) আর তৎকালে ঘণ্টাধ্বনি হয়। এবং হে পুষ্পখচিত বৃষ, তুমি আমাদেরই একান্ত এবং বসন্তও বটে কেন না তুমি আপনার বক্ষে কপিশ আকাশের মতো হ, হ, হ-হ।

এক বাড়ির কালো-খয়েরি সিলুয়েট যাহা যেন মুখোশ · জাঁ পিয়ের, জাঁ পিয়ের, ওহে মন্ আমি...।

জেফ। (যাহার সঙ্গে বুড়া জেডকেও দেখা যায় যেন বা তাহারা তামাশা দেখিতে এবং বাজার করিতেও বটে আসিয়াছে কেন না জেফের পিঠের বাস্কেটে বসানো ড্রাই মার্টিনির এক ঢাউস বোতল দেখা যায়। এবং তাদের ঘিরিয়া তখন এক ম্যাগনেসিয়াম ফ্লেয়ার বিৎ বিৎ করে) ড্রাই মার্টিনি, ড্রাই মার্টিনি, যদি তাহা বল।

জেড। আমি জানি না আমার প্রভু মিস্টা ফ্রেডা তাহা পান করেন কি না।

জেফ। আ, বুড়া, আ বুড়া জেড। ড্রাই মার্টিনি অবশ্যই। ড্রাই...ইয়ো হো হো ইয়ো হো হো।

দেয়াল-সাঁটা খবরকাগজে তখন বেশ খানিকটা প্রিমরোজ-রং আলোক পড়িল যাহাতে কালো ব্যানার হেডলাইন প্রায় খয়েরি দেখায় এবং তৎক্ষণাৎ তাহাতে দেখা যায় : একটি হলুদ পদ্ম আমাকে

দাও. হঠাৎ যেন ঝড়ের ঝাঁকিতে আর্তনাদ করে / তার ডালে ডালে যেন ডাইনিরা...আর তার একটি বীজ বিঁধে গেল পৃথিবীতে...

জেসি জেনকিন। (পূর্ববৎ তাহাব মুখে আলোক পড়ে কিন্তু তাহা এমন ধূসর) অথবা এই আলোগুলি কী না আশ্চর্য সুন্দর। (মৃদুস্বরে) তাহাকে তুমি ক্ষমা কব জেফ। হয়তো সে জিম এবং মাছও ধরিত।

মোল্টকে। (বুম্ কবিয়া শূন্যে এক হাউই ফাটে এবং একবাশ ফুল যেন সোনালি হইয়া ঝবে। সে তাড়াতাড়ি মাথায় রুমাল বাঁধে) ওটা কী এক কাগজী গল্প হয না? হঃ হঃ হঃ..

এমা। (পূর্ববৎ কাগজ পড়ে এবং তাহার কাগজে সিঁদুরে ঝিব ঝির করিয়া কাঁপে) কেন না সে জন মাইকেল ফ্রাইডে যে নেপোলিওব মঁসিয়ে লা জেনারেলকে চপেটাঘাত করে এবং তাহার মৃত্যু রূপার বুলেটেই যথার্থ যাহা সে নিজেই নিক্ষেপ করে।

নিনা। (সে এক সোনালি আলোক মাখিয়া উঠিয়া দাঁড়ায এবং মৃদু হাতে তালি দেয) আমরা দুজনে চলতি হাওয়ার সঙ্গী।

দুই নম্বর কনসাল। (অত্যন্ত ক্রোধভরে মালাক্কা কেন নাড়ে। পুডলটি ভয়ে পিছায, ক্যাঁ ক্যাঁ করে) গববর ..হাঁ ইউবেনিযাম...কেন না সেরূপই হয . এবং ইউবেনিয়ামই বটে গবববর্।

জেড ও জেফ। (যাহারা উভয়ে যেন পাশাপাশি চলে এবং কমলা বঙের আলোকগুলি যাহাদের এরূপে ঘিরে যেন যাহাতে একের হস্তপদ অন্যেব এরূপ দেখায) তুমি কি অত্যন্ত বেশি পান কবিতেছ না, জেফ; বুহু বুহু বু...উ...এবং তাহা কি এক গজদন্তনির্মিত খিলান নয়। এবং লজ্জাও থাকে না জেড। জেফ, অথবা প্রভু মিস্টা ফ্রেডা কী বলেন? জেড আ জেড আমি কাঁদিতেছি দেখ। আহা আমরা কি অদ্য টার্কি কিনিব? (তৎকালে এক শাদা গ্লেয়ারে তাহাবা যেন সিলুয়েটে পরিণত হয়)।

জন ফ্রেডা। (যে এক লোহার বেঞ্চে বসে এবং মুখেব সম্মুখে খবরকাগজ বিছায়। কাগজের উপবে নানা রঙের আলোকগুলি ক্ষণে ক্ষণে পড়ে কিন্তু তাহার মুখে কিছু বা কোমলতা যাহা খববকাগজের ছায়াই হয় বা) এবং আমাদেব শপথ সকল....

কোনো বাড়ির খযেরি সিলুয়েট যাহা যেন হাত তুলে এবং সেরূপে এরিয়েল হয় এবং তখন বগলীতে মুখ নামায় যাহা তৎক্ষণাৎ মৃদু শব্দে ড ড কবে · হাঁ পাইতেছি, হাঁ মন অ্যামি ড ড ড ডট্টা ড ড ডট্টা ড ড ড ড ডট্টা ড ড...।

সোগ্রাম। (পূর্ববৎ) এবং তাহা মাশরুমই, তাহা ছত্রাক এবং কিছু হয় না। অথবা এস আমরা ক্রিবেজ খেলি, এস আমরা ক্রিবেজ.. এবং হয় না।

লাকি ওয়াল্টার। (সে পুস্তক পাঠরত থাকাকালে পাদ্রীদেব মতো ঊর্ধ্বে চায় এবং তৎক্ষণাৎ যেন বা কমলা রঙের আলো তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে এবং সে সুখে হাসিতে থাকে) এবং অতঃপর সেরূপ চলিতে থাকাকালে পাহাড়ে এক ফাটল দেখি এবং তাহাতে নিতান্ত কৌতূহলবশে প্রবেশ করিলাম এবং ইহা অতীব বিস্ময়ের যে তাহা এক অন্ধকার গুহা এবং চোখে কিছু দেখি না। এবং সহসা আচম্বিতে তৎক্ষণাৎ এক দীর্ঘশ্বাস শুনি এবং আমি, ক্রুশো ভয়ে পিছাইয়া যাই কেন না তৎকালে এরূপে চিন্তা করিতে থাকি তাহা অবশ্যই শয়তান হইবে...

পেগি। (যে এক সুদৃশ্য অলঙ্কৃত লোহার বেঞ্চে বসে যেন বা তাহা পার্ক) ট্রালালা, টুইট, টুউ...(উদাস এবং স্বগত) হায় পিল খাইতে ভুলিয়াছি।

হার্বে। (তাহার মুখে গোলাপি আলো খেলা করে যেন তাহাতে তাহার দুই চোখ নাকের একই পাশে থাকে এক এক ছড়া কলার মতো আঙুলগুলি শূন্যে ভাসে। পাখি আমার পাখি আমার নীড়ের পাখি...

মোল্টকে। (পূর্ববৎ) হঃ হঃ হঃ

এক নম্বর কনসাল। (পূর্ববৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে) গররবর...অবশ্যই...তা হয়...কেন না ইউরেনিয়াম...গররর

লাকি ওয়াল্টার। (যে চশমা খুলে চারিদিকের অজস্র আলোকগুলি দেখিতে থাকে। কিছু দুবে যায় এবং এক লোহাব বেঞ্চে বসে। সে বই খুলে এবং বই পড়ার কালে সে যেন বা হাঁপায়) অথবা তাহা অবশ্যই সেরূপ হয় না। পরন্তু তাহাই ছিল যাহা অনেক বলিয়া থাকেন সেরূপ ঘটে যে বৃদ্ধ পশু সকল এরূপ স্থানগুলিকে খুঁজিয়া লয় এবং মৃত্যুকে অপেক্ষা করিতে থাকে কেন না সে এক বৃদ্ধ ছাগই যে সেরূপে হাঁপায় এবং মৃত্যুকে অপেক্ষা করেও। সেই বৃদ্ধ ছাগেব হৃৎপিণ্ড ও ফুল্‌কা সকলই, আহা, অতিরিক্ত মেদভারে মৃদু হয় এবং সে ধীবে ধীবে নিশ্বাস লয় এবং একাকী থাকে এবং কেহ তাহাকে বিঘ্ন করে না..(সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিল)।

গিয়োভ্যান্নি। (পূর্ববৎ কিন্তু এক্ষণে সে ক্যাবারে সংগীত শিসে বাজায়) কো ..কা. লা. .

রাস্তায় সাঁটা খববকাগজে বিশেষ সংবাদদাতাব পত্র আরও প্রকাশ যে সেই বোম্বেটে ক্রুশো যে মরক্কো প্রভৃতি দেশের কথা বলে যাহা দ্বীপের পূর্বাংশ মাত্র যেরূপ তাহার বহির প্রথম অংশে দেখ। ইহাকেই ডিফো আফ্রিকা বলিয়া চালায়। এক্ষণে ডন সিবাস্টিয়ানো যে হয় অলিম্পিকে চাম্পিয়ান সেই প্রোথিত মহাধন সকল খুঁজে যাহা বোম্বেটেগণ দ্বীপে গোপনে রাখে। তাহা অবশ্যই মৃত্তিকাব তলদেশেই হইবে। সেই বোম্বেটে অ্যাটকিন্‌স ক্রুশো প্রভৃতি যাহা মাইকেল ফ্রাইডের কাস্‌ল দখল করে।

তৎকালে বাস্তায় সাঁটা কাগজখানির উপরে সিঁদুরে আলোক যেন বা উছলাইতে থাকে যাহাতে অক্ষবগুলি কালো এবং যেন বা সজীব হয়।

সোগ্রাম। (পূর্ববৎ) কেন না তাহা ছত্রাক। এবং কিছুই হয় না যদিও তাহা অত রক্ত কেন না তাহা ক্যানসার হ, হ, হ, হ।

পেগি। জ্বালো আলো জ্বালো আলো। টুই টুউ, টুই টুউ. ইহা কি সুন্দর। ইহা কী সুন্দর (স্বগত) হায়, পিলগুলিকে ভুলিয়াছি।

হার্বে। (পূর্ববৎ) পেগি, পেগি, এক ডেট দাও পাখি এক ডেট পাখি এক ডেট...

এমা ও নিনা। (একত্র হয় এবং ফিস ফিস করে, পরে প্রকাশ্যে সমস্বরে) হিঃ হিঃ হিঃ এই সকল কী আশ্চর্য সুন্দর! এবং এই আলোক...

গিয়োভান্নি / মোল্টকে। (যাহাদের এক হলুদ ফ্লেয়ারের নিচে দেখা যায় এবং যাহারা পরস্পরের হাত ঝাঁকায় এবং একে অপরের সম্মানার্থে মাথা নোয়ায়) তাহা কি এক কাগজী গল্প নয়? হঃ হঃ হঃ

দুই নম্বর কনসাল। (যেন সে রাগতস্বরে ফোন করে) গররবর...

জন ফ্রেডা। (পূর্ববৎ কাগজ পড়িতে থাকাকালে অতিশয় ধীরে ধীবে) অথবা আমাদের শপথ সকল আমাদের পূর্ব পূর্ব ধার্মিকতার ধ্বংসখণ্ড সকল হয় যাহা কিছু মৃত্তিকায় প্রোথিত থাকে, কিছু বা দেখা যায়, এবং যা এই ফ্রিজ এই বা ব্রাট্রেস্‌ এইরূপ হয়।

কিন্তু পাঠক মহাশয়, দেখিতে দেখিতে দৃশ্যান্তর হয় বা এবং তাহা তো নিশ্চিতই যুক্তিসংগত কেন না ডিনার টাইম আসিতেছে, এবং যেন বা কোথাও সার্বিস হয় যাহার ডিং ডং শোনা যাইতে থাকে। হাউইগুলি বুঝিবা সংখ্যায় কমে যাহাতে দুই হাউইএ ব্যবধান থাকে এবং তাহাদের নিক্ষিপ্ত আলোকের উজ্জ্বলতার মধ্যে ছায়ার দাগ সকল পড়ে এবং তাহাতে এক কান্ত কোমল অপরূপ শোভা হয়। তৎকালে এইরূপ হইতে থাকে।

অস্পষ্ট পেগিব কণ্ঠস্বব। টুইট, টুউ টুইট টুউ

অস্পষ্ট হার্বেব কণ্ঠস্বব। পেগি, পেগি (এক লাল আলো তাদেব কাছে বিৎ বিৎ কবে)।

জেড ও জেফ। (তাহাবা কিছু অস্পষ্ট। এক ফিকা নীল আলোতে তাহাদেব দেখা যায় যেন। তাহাবা উভয়ে উভযকে জডাইযা ধবিযা হাঁটে। জেফেব হাতে একটি মুখ-খোলা বোতল এমন থাকে যে কিছু কিছু মার্টিনি বাস্তায পডিতে থাকে) আ জেফ, সে সকল স্ত্রীলোকগণেব। বুহ, বুহ, জেড্ বুউ। আ জেফ আ। ইযো হো হো। ড্রাই মার্টিনি শেষ কবিলে, জেফ, আমাদেব প্রভু মিস্টাব ফ্রেডা বা কি পান কবেন।

একটি হাউই উঠে, ফাটেও, তাবকা হইযা ঝবে। ডিং ডং ঘণ্টাধ্বনি উঠে। সার্বিসেব সংগীতবৎ আলোকগুলি কাঁপে। লাকি ওযাল্টাবেব কণ্ঠস্বব এক অপবিসীম কাৰুণ্য কবে হায, তাহা কি সেই গুহা যাহা প্রোথিত থাকে।

বাডিব সিলুযেট (যাহা এখন গাঢতব হয এবং আবও উর্ধ্বে বাহুব এবিযাল তুলে কেন না উপরে আকাশে কদাচিৎ থাকিযা থাকিযা হাউই ফাটে) হঃ হঃ হঃ ভালো, খুবই ভালো, মন অ্যামি, জাঁ পিযেব, হাঁ প্রচুব, ডবে ডট্টা ডবে ডট্টা ডবে ডবে ডবে ড ড ড ডবে ডট্টা ড ড ।

এক দূবস্থিত কণ্ঠস্বর। কোকা কোলা তাহা মিষ্ট কোলা কোলা

জেড ও জেফ। (তাহাদেব এক মৃদু ধূসব অস্পষ্ট আলোকে দেখা যায এবং তাহাবা পূর্ববৎ চলিতে থাকে) জন বিগ্যাট যেহু, যেহু বিগ্যাট শ্লোকাম বিগ্যাট থার্মিগ্যান, না জেড, বুউ, এরূপে হয না। নতুন মানুষ সকল এরূপে হয না। তুমি কি অত্যন্ত বেশি পান কবিলে জেফ। নতুন মানুষ সকল বুউ । হায মিস্টা ফ্রেডাব ডিনাবে দেবি হয জেফ।

অপব দূবস্থিত কণ্ঠস্বব। মাশকম যাহা স্বাস্থ্যেব পক্ষে ভালো

পূর্ববৎ জেড ও জেফেব কণ্ঠস্বব। এরূপে হয না জেড হয তো তুমি ঠিক বল। জন বিগ্যাট যেহু বিগ্যাট শ্লোকাম কেন না তুমি বল কেহ পিতা নয এবং তাহা সডমি যাহা বাইবেলে লিখে আমেন এবং নূতন মানুষও হয না আমেন।

হাঁ, পাঠক মহাশয, তখন যেন বা পুনবায সেই ডিনাব টাইমেব বাত্রি আসে এবং নানা হোটেলেব চতুষ্কোণগুলি এখন যেন বা উজ্জ্বল হইতেও থাকে। এবং ভ্রমণকাবিগণ ইহা এক অভিজ্ঞতাই হইল এরূপ ভাবিত থাকাকালে আপনাদিগকে ক্ষুধার্ত বোধ কবে। চার্চেব সার্বিস ডিং ডং কবে।

এবং সহসা আকাশে আবাব সার্চলাইট দেখ যাহা পুনবায উঠে, দ্বিধা কবে, নামে এবং আকাশকেও ঢাকা ঢাকা কবে। এবং যেন বা সেই কৃষ্ণা রূপসী পলিনেশিযানী স্নান হইতে ফিবে যাহাতে সুঘ্রাণ পাই।

ভূমি চুম্বনকাবী বাহু।

এবং তাহাই ব্ল্যাক টিউলিপ বাত্রি॥

কেন না সার্চলাইটেব ফলক তো যথাবীতি ঘুবিতেছিল এবং সে যে উজ্জ্বল তাহাতে সন্দেহ কবি না কিন্তু সহসা আচম্বিতে এ কী হয় সে হঠাৎ যেন তাহা উর্ধ্বমুখে স্থিব যেন বা বহু এক বিলম্বিত ক্ষণ দ্বিধা কবে এবং অবশেষে ক্রমশই সে ক্রোমিযাম সদৃশ আলোক হলুদ লাল এরূপ হইতে থাকে এবং নিবিযা গেল।

কেহ বলে তৎকালে নানা হোটেল পানশালা নৃত্যমঞ্চগুলিতে এবং মিউজিক হলেও সেই উজ্জ্বল আলোক সকল জ্বলে, কমে, ক্রমশ লাল হইযা কাঁপে, এরূপ হয় যাহাতে ভ্রমণকাবিগণ চাপা

সমুদ্র-শব্দের মতো আ আ ঐ প্রভৃতি করে, এবং সহসা এককালে নিবিয়াও যায়। এবং তাহারা মশাল মোম প্রভৃতি সহ এই খানার টেবল, এই বা রাওলেট মেশিন, এই রন্ধনশালার প্রায় হইয়া আসা স্টেইক সকলে আলোক দিতে কতই না চেষ্টা করিল এবং পারিল না। কেহ বলিল তাহা অবশ্যই ক্যু যেহেতু কেহ বা দ্বীপের থার্ম্যাল পাওয়ার স্টেশনটি দখল করিয়াছে। পরন্তু, পাঠক, হয়তো বা এরূপও হয় যে একারণেই আমরা সেই অনেক হাউই সকল জ্বলা কালেই আলোক সকলকে ক্রমশ নিষ্প্রভ দেখি এবং অবশেষে তাহাদের দূরস্থিত কণ্ঠস্বর মাত্রই শুনি, এবং সার্চলাইট যে জ্বলে তাহা এ জন্য যে কাহারা যেন তাহার সুকৌশলী যন্ত্রপাতিসমূহে মূল স্ক্রুটিকে তখনও খুঁজিয়া পায় না। দেখি যে হায়, রোটারি মেশিনগুলিও অকস্মাৎ স্তব্ধ হইতে থাকে এবং তখন এই এক বিষম সমস্যা দেখা দিল কিরূপে বা সেই অর্ধসমাপ্ত সংবাদগুলি প্রত্যুষে বিক্রয় হয়। অথবা এই সকলও কি ঘোরতর অব্যবস্থা হয় না? তৎকালে তাহা স্বভাবতই স্বাভাবিক ছিল যে তাহারা টেলিফোন-যন্ত্রে স্বীয় স্বীয় সম্পাদকগণকে যোগাযোগ করিতে চেষ্টা পায় কিন্তু দুর্দৈব কদাচিৎ একক আসে যে তাহাও প্রমাণিত হইল কেন না সেই সকল নানা ক্রুদ্ধস্বরের কোনোই জবাব আসিল না।

তখন সেই সহ-সম্পাদকগণ এরূপ কৃতনিশ্চয় হইতে থাকে যে তাহা ক্যু এবং তাহা ছাড়া আর কিছুই হয় না, এবং কী আশ্চর্য দেখ চোখের সম্মুখে তাহা ঘটিতেছে যে যাহাতে তাহারা এতদিনে একবার এই এক পরম মূল্যবান সংবাদ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আহরণ করিতে পারিল। সেই সহ-সম্পাদকগণ তৎকালে চেয়ারের পিঠে হেলিয়া বসে, সিগারেট ধরায় এবং কম্পোজিটরগণ ছুটাছুটি করিতে থাকাকালে মৃদুহাস্য সহকারে বলে যে তাহা নিশ্চিতে ক্যু দে তা এবং এক্ষণে টেলিফোন-ভবনও কেহ দখল করিয়াছে।

ফলত এমন হইল যেন বা সেই দ্বীপের রাত্রিসকল তদবধি এক শতক পিছাইয়া গেল। পথের ধাবে শত শত লাইট-পোস্টগুলিতে সেই নিওন লাঠিগুলি যাহা ম্যাগনেসিয়াম দ্যুতিকে ছড়াইতে অভ্যস্ত ছিল তাহা আর জ্বলে না। হোটেলে, মিউজিক-হলে, ক্যাবারেতে যে নানাবিধ বহুতর সুদৃশ্য নয়নাভিরাম আলোকের বক্স, ফলক, ত্রিকোণ ইত্যাদি তাহা আর জ্বলে না। ক্রমে পথে কাচে ঢাকা গ্যাস-বার্নার জ্বলে, হোটেল ক্যাবারে প্রভৃতিতে শামদান, ডোম, ঝাড় ক্যান্ডেলাব্রা প্রভৃতি ক্রমে আত্মপ্রকাশ করে। সেগুলি জ্বলিতে থাকে, মৃদু আলোক বিকিরণ করে। কেহ বলে ইহা অপরূপ হইল, কেহ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলে এরূপ কহিতে নাই। পরন্তু চন্দ্রকিরণে পথগুলির উভয় পার্শ্বে ইতস্তত স্থিত গাছগুলি কী এক অপরূপ শোভা ধারণ করিতে থাকে। যেন বা তাহারাও আসে যাহারা একে দুইয়ে সেই সব গলিপথে আসিয়া একে অন্যকে সলজ্জিত ভীরু প্রেম নিবেদন করে, পরে চার্চের ঘণ্টাও কল্পনায় শুনে।

অকস্মাৎ আচম্বিতে দেখি রেডিও নাই যে কানের পিঠে, বুকের পাশে ক্রমশ অন্তরের অন্তঃস্থলে গিয়া কেহ কিছু অবিরত বলিতে থাকে, ভাঁড়ামি করে, শীৎকার করে, এক রকমের চেঁচায় যাহা সংগীত, এক প্রকারে মুখ ভ্যাংচায় যাহা রাজনীতি ; ফলত এক অগাধ স্তব্ধতা যেন ক্রমশ অগ্রসর হয় এবং দ্বীপবাসিগণও সহসা আতঙ্কিত হয় যে হায় আমরা হারাইয়া গেলাম বা, হায় এই অকূল সমুদ্র কিরূপে বা পাড়ি দিই, কেন না ইহা অগাধ এবং এই নীরবতায় একই কালে নিঃসঙ্গ বোধ হয়, হৃদয়ও নানা দুঃখের কথা বলিতে থাকে।

শুধু মাত্র দূরে দূরে যে রাইফেলগুলি থাকিয়া থাকিয়া পরস্পরকে আহ্বান করে, অথবা দুম্ করিয়া যে ট্রেসার-বুলেট আকাশে আলোকের ফিতা পাতে, এবং দুই দিবস অতিক্রান্ত হইলে যাহারা আসিয়াছিল অ্যাটকিন্সনের সেই প্যাকেটশিপগুলি যাহা দ্বীপের এদিকে-ওদিকে ক্ষণে ক্ষণে সার্চ লাইট নিক্ষেপ করে, এবং কদাচিৎ বা যে সাব-মেশিনগানের শব্দ হয় তাহা রহিয়া গেল।

এবং ক্রমে এরূপ অনুভব হইল যে এখানে এদিকে এবং অন্যত্র নানা কাঁটা তারের বেড়া বসিয়াছে

বা, শুকনা ঘাসের গন্ধ উঠে এবং বারুদের গন্ধও পাওয়া যায়, দূরে দূরে যে রৌদ্রের ঝিলিমিলি তাহা যেন বা অগ্রসরমান যন্ত্রের ঔজ্জ্বল্য এমন আশঙ্কা হয়, তাহারই মধ্যে দুই-এক পাখি ডাকে, ফুলের সমারোহ কমে কিন্তু দুই এ-একে ক্রোকাস ফুটে কোনো তৃণাস্তরণে, এবং এমন এক কাহিনী আছে যে সেরূপ এক ফুলের দিকে একখানি হাত অগ্রসর হইতে না হইতে পিং করিয়া এক শব্দ হয়, এবং তৎক্ষণাৎ বেদনায় তুলিয়া ধরা কম্পমান সেই হাত হইতে অজস্র রক্তও ঝরিতে থাকে।

জেফ এবং তাহার গর্দভ

পাঠক মহাশয়, তুমি যদি গাধা অর্থাৎ গর্দভকে নিতান্ত সহিষ্ণু এবং বা কম হিংস্র প্রাণী মনে করিয়া থাক তবে সম্ভবত এরূপ ধারণা করা ভালো যে অনেক গাধা আমরা দেখি নাই। না, আমি তাহাকে সেই গাধা মনে করি না যাহা গুহায় পূজিত হয় এবং সেই তাহার দেবত্ব যে সে বলে পুজকগণ তোমাদিগের কাছে অনেক উপদেশ কবি কিন্তু এখন যাও আমাকে অবিশ্বাস কর, কারণ সে হয়তো বা তাদৃশ দেবতা ছিল না যে মানুষ সকলকে নিজের অপেক্ষায় নির্বোধ মনে করে অথবা যে আমি শেষ এবং পরে কিছু নাই এরূপ বুঝে।

পরন্তু তাহা গাধাই ছিল এবং ইহাই বিস্ময়ের যে দ্বীপে তাহাকে কে বা আনিল। সে কপিশ বর্ণের এবং অতি দীর্ঘ কর্ণের যেন বা যাহার চোয়াল দেখা মাত্র অতি নির্বোধ বোধ হয়। নিশ্চিতই সে দ্বীপে রজকগণ গাধার ব্যবহার জানিত এমন হয় না। বিশেষত সোহো অঞ্চল বর্তমানে যেখানে ডন ওয়াল্ডো আশ্রয় করে দ্বীপের সেই গ্রাম্য অঞ্চলে কয়েক ঘর পুরাতন ধরনের ধোবা থাকিলেও তাহারা সেই গাধাকে ব্যবহার করিতে না। অন্যত্র তো মেশিনে ধোয়া কাচা শুকানো সকলই করা হয়। ধারণা করি দ্বীপের কসাইখানাগুলির নিমিত্ত গোবৎস সমূহ আসিবার কালে এইটি বা কি করিয়া তাহাদের দলভুক্ত হয়।

সে যে প্রকার হউক, জেসি জেনকিনের চটির কিছু দূরে জেরাল্ড বাম্‌কিনের গোহালে তাহা ক্রমে স্থান পায় এবং তাহার গরু ভেড়া কয়েকটির সঙ্গে একত্রে চলিতে থাকে।

পূর্বে যেরূপ বলা হয়, এই সন্ধ্যাও সেরূপ ছিল যে তাহাকে ঊনবিংশ শতকের এক সন্ধ্যা বলিয়াই ভ্রম হইতে থাকে, বিশেষ জেসি জেনকিনের চটির কাছে। ধূলার সে পথ যাহাতে বহু দূরে ল্যাম্পপোস্ট এবং এমন যে তাহা জ্বলে কিনা সন্দেহ, যেন পূর্বের এক শতকের গ্রাম্যপথ যাহা ডোভার-বিচে যাইতে ডিকেন্স অথবা ক্যাস্টারব্রিজের হাট ফেরৎ হেনচার্ড লক্ষ্য করে। গাছের ছায়াগুলি পথে লম্বা হইয়া পড়ে, আকাশ ক্রমশ ছাই রং হইতে ধীরে ধীরে রক্তিম হইতে থাকে, এখনও সে সময় আসে নাই যখন গ্যাসগুলি জ্বলিবে এবং ডাউনটাউন প্রভৃতিকে এক ধীরগামী এবং প্রচুর মদের লগুন বলিয়া বোধ হয়, এবং অ্যাটকিন্‌সনের প্যাকেটশিপগুলি যাহা যেন আশঙ্কা-মন্থর গতিতে দ্বীপের দিকে অগ্রসর হয় এবং এখানে সেখানে এক একবার সার্চ লাইট ফেলিয়া দেখে সেগুলিও আসে নাই।

তখন জেফ জেফারসন ডাউনটাউনে বাজার করিতে আসিয়াছিল। সে পেট পিঠ টিপিয়া দুই মোরগ কিনে যাহার একটি শাদা এবং মাথায় লাল ঝুঁটি এবং অপরটি ঝটিতি তাহার হাতে এক ঠোকর মারে। সুতরাং সে সে দুটিকে আপনার পিঠে ঝোলানো বাস্কেটে পুরিয়া ফেলে। অতঃপর সে মাশরুম কিনিতে মনস্থ করে কেন না মাশরুম, যদিও তাহা ছত্রাক, স্বাস্থ্যের পক্ষে অতীব মঙ্গলকারী।

তৎকালে এরূপ হইল যে সে জেফ জেফারসন ডাউনটাউন পার হইয়া আরও কিছু অগ্রসর হইল যেহেতু যেন গোধূলিতে ধূসর সেই গ্রাম্য পথ তাহার নিকট প্রীতিপ্রদ হয়।

সহসা আচম্বিতে কোথাও এক রাইফেল একাই দু-তিনবার রট্‌টট্‌ করে যাহাতে সে চকিতে

এদিক-সেদিক চায় কিন্তু কিছুই দেখে না এবং দ্রুত হাঁটিয়া জেসি জেনকিনের চটিতে প্রবেশ করে। সেরূপ করিতে সে এক মৌমাছিকে উল্টাইয়া দেয় যাহা সে লক্ষ্য করে না।

জেসি যেন বা নিবিষ্ট মনে হিসাব দেখে। কিন্তু কিছুই যে তাহার দৃষ্টি এড়ায় না তাহাও বিলক্ষণ প্রমাণিত হইল কারণ জেফ সেরূপ প্রবেশ করিতে না করিতেই জেসি যেন বা আপন মনে, এবং যাহা প্রসাধনের নিমিত্ত, এক হলুদ ক্যাক্টাস ফুল লয় এবং তাহার খোঁপায় গুঁজে।

তৎকালে জেসি বলিল · তোমাকে কী দিব, জেফ?

জেফ এক গ্লাস বিয়ারের তৃষ্ণা জানাইলে জেসি এক গ্লাস তাহা ভরিয়া দিয়া পুনরায় কহিল ইহা লও এবং কোণেব বেঞ্চে গিয়া পান কব। জেফ সেরূপই করে।

জেফ তো সে প্রকার বসে এবং যেন কিছু দেখে না এরূপ ভানও করে কিন্তু সে যে বিস্মিত হয় তাহাও সত্য। সে লক্ষ্য করিতে থাকে যেন বা জেসি জেনকিনের বিয়ার-চটির অকস্মাৎ বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। পরন্তু এই সবই বা কাহারা যাহারা উঠে বসে বিয়ার লয় এবং এখানে ওখানে বসিয়া দাঁড়াইয়া মাথায় মাথা ঠেকাইয়া গল্প করে। তাহাবা যেন সবই গাঢ় খয়েরি রঙে অঙ্কিত এবং অতিশয় উদ্বিগ্ন চিত্তে চাপা স্বরে দ্রুত আলাপন কবিতেও থাকে।

জেফ বিয়ার শেষ করে, উঠে, পুনরায বিয়ার লইয়া কোণে বসে এবং তৎকালে এরূপ শুনিল ·

এক নম্বর বিয়ারপায়ী। মানুষকে চাপিযা বিকলাঙ্গ ও পিশাচবৎ করিলে তাহারা পিশাচবৎ আত্মপ্রকাশ করিবে।

দুই ও তিন নম্বর বিয়াবপায়ী। তাহাই হউক। তাহাই হউক।

এক নম্বব জ্যাক। তোমার হিসাবের খাতায় সব নাম ঠিকঠাক উঠে তো?

দুই ও তিন নম্বর জ্যাক। তাহাই হউক, তাহাই হউক।

জেফ তাহার বিয়ারের দিকে চোখ রাখে। তখন রট্‌টট্‌ করিয়া একক এক বাইফেল শব্দ করিল। কিন্তু গাধাব কথা বলিতেছিলাম।

জেফ বাহির হইল এবং দেখা যায় তাহাব সহিত যেন মৌমাছিগণের কোনো বিবাদ আছে কারণ সে পুনরায় উড়িয়া আসা আর একটিব সঙ্গে ঠোক্কর খায়।

জেফ বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায় এবং তৎকালে সে সেই গ্রাম্য ঊনবিংশ শতকের পথ লক্ষ্য করিতে থাকে। তাহা তাহার কাছে অপূর্ব কৌতূহলের বলিয়া বোধ হয়। ল্যাম্পপোস্টে গ্যাস জ্বলে নাই, অথচ দেখ ইতোমধ্যে চাঁদ উঠিয়াছে যাহাতে দুপাশের বৃক্ষ সকলে চাপিয়া আসা ধূলার পথ কিছু যেন আলোকিত।

জেফ, যেন বা সে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে নিরত, ধীরে ধীরে চলে। তাহার পিঠেব বাস্কেটে একটি মোরগ কিছুতে বিরক্ত বোধ করিয়া একবাব ডাকিল। জেফ মনে মনে বলিল ডাকাডাকি ইহা অপেক্ষাও জোরে হইতে পারে এবং তাহা যে ইহা অপেক্ষাও অধিক সুরযুক্ত হইবে না তাহাতে সন্দেহ কি।

এরূপে সে আরও কিছু দূর অগ্রসর হয় এবং কিছু দূর হইতে বাদাম তলায় কংক্রিটের গোল টাবটিকে দেখিতে পায়। বাদাম গাছেব পাতার মধ্যে চাঁদের আলোক কিছু আটকায় কিন্তু বাকি কিছু নিচে নামে। এবং তৎক্ষণাৎ জেফ গাধাটিকে দেখিতে পায় যাহার কপিশ রং সন্ধ্যার রঙে প্রায় মিশিয়া থাকে, কান দুটি যেন ক্রমশ লম্বা হয়, বৃত্তাকার নাসারন্ধ্র দুই বিস্ফারিত এবং যাহার চোয়াল বিশেষভাবে প্রকট যেন।

কিছুকাল, তাহা কয়েক মুহূর্তে হইবে, ইতস্তত দেখিয়া জেফ ঝটিতি সেই গর্দভের এক কান সজোরে চাপিয়া ধরিল এবং চু চুঃ প্রভৃতি নানা শব্দ দ্রুত অনুচ্চস্বরে কহিতে থাকাকালে তাহাকে সম্মুখে টানিতে থাকিল। তৎকালে সেই গর্দভ তাহার চোয়াল দুই পৃথক করিয়া এবং নাসারন্ধ্র প্রকটতর

করিয়া এক ব্রহ্মাণ্ড-ত্রাস শব্দ সৃষ্টি কবিল যাহাতে বামকিন স্বয়ং এক জানালা খুলে, মোম লইয়া অগ্রসর হয় কিনা বিবেচনা কবে কিন্তু তাহাতেই তাহার সমুদয় সাহস ব্যয়িতও হইয়া যায়। কেন না সে ডাক ক্রমে কিছুমাত্র বিচ্ছিন্ন না হইয়া মুদারা ও তাবায় এরূপ উঠানামা করিতে থাকে যে বামকিন তৎকালে তাহার স্ত্রী-কন্যাদেব বলিল আর কী দেখিতেছ, উহারা নিশ্চিতই আসিয়াছে, হায় আমরা একেবারেই গেলাম, এবং ফুৎকারে সে মোম নিবাইয়া দিল।

জেফ বলিল, চ্চুঃ, এবং গর্দভকেও সম্মুখে টানিতে কসুর করিল না। কোথা হইতে যেন এক ট্রেসার-বুলেট দুম্ করিয়া ফাটিল এবং তাহার ম্যাগ্নেসিয়াম আলোক এক সীমিত দিবালোকেব সৃষ্টি করিল। তখন সেই গর্দভ যেন সেরূপ আলোক দেখিয়া একেবারেই বিমোহিত হয় এবং উর্ধ্বে মুখ তুলিযা পুনরায় সংগীতেব ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু জেফের সেরূপ ইচ্ছা না থাকায় সে কান ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ তাহার চোয়ালদ্বয় সজোরে একত্র করিযা রাখিল এবং মৃদুস্বরে বলিল এখন নয়, এখন নয়।

তখন দূব দূর স্থিত পথের ধারের বাড়িগুলিতে একে-দুইএ মোম সকল জ্বলিতেছে। জেসি জেনকিনের চটির নিকট পৌঁছাইতে সেই গ্রাম্য পথেব উপরে দূর দূর স্থিত ল্যাম্প-পোস্টগুলিতে একে-দুইএ গ্যাস জ্বলিতে শুরু করিল। এবং জেফ স্থিব করে এখন বা গাজরের সময় হইল। সে এক পাতাপল্লবসহ সুদৃশ্য সুস্বাদু গাজব বাহির কবে এবং গর্দভের বৃত্তাকাব নাসারন্ধ্রের সম্মুখে নাড়িয়া পথপার্শ্বেব ছায়াময অঞ্চলে দাঁড়াইল। হাঁ ঠিকই হইয়াছে, গর্দভ তাহাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করিল।

জেফ বলিল চ্চুঃ হুঃ হুঃ এবং সে আপনাব পশ্চাতে সেই পাতাপল্লবসহ সুদৃশ্য গাজর, যা অবশ্যই সুঘ্রাণ ছিল বা, নাড়িতে থাকাকালে শনৈঃ অগ্রসর হয এবং গর্দভও তাহাকে অনুসরণ করে ; এইরূপে জেসি জেনকিনের বিয়ার-চটিও এক গর্দভ ও এক মানুষ পথপার্শ্বের গাছেব ছায়ায় পার হইয়া যায়। তৎকালে একই কালে কযেকটি রাইফেল কোথা হইতে রট্‌টট্‌ প্রভৃতি করিতে থাকে।

কিন্তু অকস্মাৎ যখন তাহাবা গর্দভ ও মানুষ, ডাউনটাউনের কাছে পৌঁছায়, সেখানে আলোকবিন্দু প্রবল, মানুষেব অন্তঃকবণ সহসা অতিদ্রুত চলিতে থাকে এবং গর্দভের কী হয় বোঝা গেল না, কেন না কোটেব কলার উঁচু করিয়া তাহাতে মুখ ঢাকিয়া দুইজন অকস্মাৎ আবির্ভূত হয় যাহারা সম্মুখে চলে এবং গর্দভ ও মানুষের ছায়া আলোকিত পথেও পড়ে।

তাহারা তৎকালে এইরূপ আলোচনা করে এবং তাহাদেব নিতান্ত ক্রুদ্ধ শোনায়।

১। পাওয়ার হাউস চলে না এবং টেলিফোনও বন্ধ, জ্যাক।

২। হাঁ জ্যাক তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

১। ইহাকে কি তুমি গৃহযুদ্ধ বল না জ্যাক?

২। জ্যাক, জ্যাক, ইহা তাহাই হইবে।

১। জ্যাক তোমার পিস্তলে কয়টি বুলেট আছে বা?

২। কি আশ্চর্য, জ্যাক, মাশরুম ও মোরগ বড় মাহাঙ্গা হয়।

জেফ কি করিবে তাহা ভাবিয়া পায় না কেন না ইহাদিগকে নিতান্ত চোয়াড় এবং ক্রুদ্ধ দেখায়। কিন্তু তৎকালে একখণ্ড মেঘ আকাশে দেখা দিল যে যাহাতে চন্দ্র আবৃত হয় এবং সহসা এক অশ্ববাহিত গিগ্‌ও আসিয়া পড়ে। এই সুবিধা হইল বা ভাবিয়া জেফ ও তাহার গর্দভ এমতে ডাউনটাউন পার হইতে চেষ্টা করে, কিন্তু দুম্ করিয়া কিছু এক ফাটে, কেহ যেন বা তীব্র তারস্বরে ঘোড়াগুলিকে ধমকায় এবং গর্দভও একবার ডাকিয়া উঠিল।

তৎকালে জেফ এরূপ চিন্তা করিল যে হায় এই হয় শেষ, অথবা কি আবার বামকিনের বাড়িতে তাহার গর্দভ পৌঁছাই। অথবা ততক্ষণই ভয় করা উচিত যতক্ষণ ভয় আসে না, অধুনা এই সন্নিধানে যথাকর্তব্যই করা উচিত হইবে এবং এক্ষণে গর্দভের সহিত কথা বলিতে থাকি যাহাতে অবশ্যই ভয কিছুদূরে থাকে।

জেফ বলিল শোন তোমাকে এই বলি যে তোমার হয়তো মন বিশেষ ভালো নয কারণ তুমি তোমার পিতামাতা ভ্রাতা বন্ধুগণের কথা ভাব। এবং হয়তো বা একপ মনে হইতে থাকে এই তো তৃণক্ষেত্র যাহা সর্বাংশে তোমার বাল্যের তাহার মতো হইযাও যেন তাহা নহে। সেই তৃণ সেই স্বাদ হয়তো সেই পরিধিও কিন্তু তাহা হয না। কেন না তুমি যেন কেন বা একক এবং নিঃসঙ্গ বোধ কর, হে আমার গর্দভ, যেন বা এ মাটিতে যে তৃণ তাহা তোমার সঙ্গে মৃত্তিকার সংযোগ করে না, যেন বা মৃত্তিকা হইতে তৃণগুলি এবং তাহাই তোমার বক্তে শ্যামল এবং সূর্যের আলোকও ধরে একপ বোধ কর না।

শেষে সে এক অস্বস্তি বোধ করে এবং পিছন ফিরে এবং দেখিল গর্দভ বেশ খানিকটা পিছনে পড়িযাছে। সে মৃদুভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিযা পুনরায় গাধার নিকট গেল এবং বলিল, আমাকে ক্ষমা কর একপ বলিযা ভালো করি নাই। আইস আমরা অন্য প্রকারে গল্প করি

জেফ বলিল এবং তৎকালে সে গাজরটিকে একপে রাখে যে তাহা সেই গদভের সাতিশয প্রলোভনের কারণ হইযা চলে।

জেফ। তুমি কি, হে আমার গর্দভ যাহা এখন একান্তই আমার, সেই ইক্ষুক্ষেত্রের কথা জানো? (জেফ এস্থলে মিটমিট করিযা হাসিল।) তাহা ইজাবেলার কাহিনী যা যেমতো শুনিযাছি, বলি, শোন। তাহার পর তাহারা নরমাংস ভক্ষণ করিল এবং সবিশেষ গম্ভীর এবং শুনিতে বিশেষ আনন্দ হয এমন মন্ত্র সকল উচ্চারণও করে। এবং সকলই দগ্ধ হইল, ইক্ষু ক্ষেত্রগুলিতে পোড়ামাটি ছাড়া আর কিছু দেখ না। অতঃপর তুমি সেন্ট ইজাবেলাকে অনুভব করিলে, যে হয পূর্বজীবনে এক সন্ন্যাসিনী এবং যাহার প্রথমজাত কে বা কোথা হইতে তাহা জানো না। এবং সে পোড়ামাটি, যাহাকে আমরা তাহাই দেখি, সেখানে যেন আচম্বিতে এক সাড়া জাগে এবং ছাইভস্মের স্তর ভেদ করিযা নবাঙ্কুর ইক্ষুবন প্রকাশ পায। তাহা যে কী মধুর এবং কত সুস্বাদ তাহা বা তোমাকে কী বলিব। গর্দভটি ঘো কোঁ কোঁ করিযা উঠিল।

জেফ তৎকালে চিন্তা করে ইহা হয়তো বা ঠিকই হইতেছে। সে হাত দিযা কপালের ঘাম মুছিল এবং মিটমিট করিযা হাসিল। কিন্তু সম্মুখে অ্যাটকিনসন-হোটেলের আলোকগুলি দেখা যায এখন বা সে কী করে? অথবা ঠিকই হইযাছে তাহাই করিব এই ভাবিযা সে মনস্থির এই করিল যে সে এক গর্দভ চালক যাহার শহরের প্রকাশ্য পথে যাইতে বা হয কেন?

তৎক্ষণাৎ সে এক অল্প আলোকিত গলিপথে প্রবেশ করে এবং রবিন্সন ক্রিকের ক্যান্টিলিভার ব্রিজের দিকে অগ্রসর হয। জেফ তো এই রূপে চলে এবং থাকিযা থাকিযা গাজরটিকে নাড়ে। এখানে পথটি আবার উভয পার্শ্বের বৃক্ষে চাপিযা আসে এবং যেন বা আলোকগুলি মিট মিট করে এবং চন্দ্রের এক স্তিমিত আলোকও মাঝে মাঝে দেখা দেয যাহাতে পথের কোনো কোনো অংশে কিছু জল জমিযাছে বোধ হয।

পরন্তু মাত্র সে ব্রিজের ঢালু জমিতে পা দিযাছে সেই মুহূর্তে যেন বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিযে অনুভব করিল যেন সে এক কাঁটাতারের বেড়ার নিকটে আসিযা পড়িল, হায। সে ভাবিল জেফ ইহাই শেষ এবং জগতের সমাপ্তিও বটে। কিন্তু ইতোমধ্যে যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে তাহার কিছু জ্ঞান হইযা থাকিবে, দ্বীপে কাহারই বা তা না হয, সে তৎক্ষণাৎ একটি মাত্র ধাক্কায গর্দভকে মাটিতে ফেলিযা তাহার উপরে বুক দিযা একপে শয়ন করিল যে যাহাই হউক গর্দভ নিরাপদে থাকে এবং সে মুহূর্তেই রাইফেল সকলও চলিতে শুরু করিযা থাকিবে কেন না সেই অবস্থাতে জেফ রটটট্ রট্টট্ একপ ক্রমাগত শুনিতে পায এবং তীক্ষ্ণ আলোক রেখাগুলিকেও ধাবিত দেখে।

অবশেষে যুদ্ধ ক্ষান্ত হইল। জেফ আশেপাশে হাতড়াইযা দেখে এবং তাহার হাতে তরল আঠালো কিছু উত্তপ্ত লাগিল, কিন্তু ইহাও অনুভব করিল সে আস্তই আছে। দেখিল দূরে এক ল্যাম্প-পোস্টে

আলোক জ্বলে, দেখিল গাছের ছায়া কথা কহিতেছে, দেখিল চাঁদ মেঘে ডুব দিয়া আবার ভাসিল। সে উঠিয়া দাঁড়ায় এবং সে তাহা করিতেই গর্দভও এক ঝটকায় উঠিয়া দাঁড়ায় এবং কান ঝাড়ে। তৎকালে সে গাছের ছায়াকে এরূপ বলিতে শুনিল—এ একটা গাধা আর তার চালক। হে-হে-হে। গর্দভ পুনবায় ঘোঁ কোঁ কোঁ কঁরিয়া যেন তাহা তদ্দণ্ডে সমর্থন করে।

জেফ গায়ের ধূলা ঝাড়ে এবং কপালেব ঘাম মুছে এবং গর্দভের কান ধরিয়া ক্যাম্টিলিভার ব্রিজ পাব হয়। তৎকালে কখনও গাজব নাড়িযা, কখনও গর্দভকে আদর করিয়া তাহারা দ্রুত পথ চলিতে থাকে। সম্মুখে ফ্রেডা-কাস্‌লও দেখা যায়।

সে ঘড়িতে দেখে বাত্রি আট বাজে। ইহাতে সে তাহাব গতি দ্রুততর করিল কেন না মিস্টাব ফ্রেডার ডিনাব টাইম নিকটে আসে। সে গর্দভকে বলিল, ওহে বন্ধু এবার কিছু তাড়াতাড়ি চল। আমবা অনেক বিপদ কাটাইয়াছি এবং বাকি-টুকুতে আব ভয় নাই।

চার্লস টিয়ারগাট এবং তাহার গ্রাফ

পাঠক মহাশয, লক্ষ্য কর অ্যাটকিন্‌সেনর খাস-কাসবায সকলেই সমবেত হইয়াছে—স্মিথসন, জনসন, জেবাল্ড, রবিন্সন, টিযারগাট এবং অ্যাটকিন্‌সন তো বটে এবং তাহাকে ওয়র কাউন্সিলই বলা যায যদিও তাহাবা ইহাকে কমিটি ফব প্রিসার্ভেশন অব ফরেস্ট অ্যান্ড উডল্যান্ড বলে।

কনিয়াক আসিলে কমিটির সেক্রেটারি ইনসপেক্টর জেনাবেল অব ফরেস্টস্ চার্লস টিয়ারগাট বলিল · এখন আপনাদের গ্রাফ দেখাইব কি?

উপস্থিত সকলেই বাজি হইলে টিযাবগাট তাহাব চার্ট খুলিয়া দেখায যাহাতে লাল নীল ও হলুদ রঙে অনেক বক্র বেখার ঢেউ সকল আঁকা থাকে এবং নিম্নে দ্বীপের এক কনট্যুর মানচিত্র। তৎকালে উপস্থিত সকলেব মুখ দেখিযা এরূপ অনুমান হইল যে ওই গ্রাফ তাহারা তেমন বুঝিতেছে না। পরন্তু অ্যাটকিন্‌সনকে গ্লাসে কনিয়াক ঢালিতে দেখিযা তাহাবাও নিজের নিজের গ্লাস ভরিয়া লইতে থাকে।

তখন টিযারগাট বলে রেখাগুলি প্রভাবেব সূচক এবং এই কিছুকালের মধ্যে দ্বীপের কোনো কোনো অঞ্চলে কাহাব সম্বন্ধে অধিক চিন্তা করা হয় এবং সে চিন্তা শত্রুতামূলক অথবা অন্যপ্রকার রেখার কম্পনেব রীতি ও সংখ্যা তাহাই বুঝাইতেছে।

তখন অ্যাটকিন্‌সন তাহার চোখে মন্যাকল্ দিয়া গ্রাফে ঝুঁকিল এবং বিস্মিত হয় সে সত্যই ট্যুরিস্ট ব্যুরো অপেক্ষা এক্ষণে দ্বীপে অন্য চিন্তাগুলি প্রবল হইতেছে এমন কি তাহার নিজের নামাঙ্কিত হোটেলগুলি তাহাতে যে ভিন্‌দেশীয় ট্যুরিস্টগণ থাকে তাহাদের মধ্যে নীল অথবা হলুদ চিন্তার ধারা গ্র্যাফে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঊর্ধ্বে উঠে।

স্মিথসন সাধারণ কম কথা বলে। সে চিন্তা করিতে থাকিল। কিন্তু জেরাল্ড যাহার সংবাদপত্র থাকায় সে কিছু বা অ্যাটকিন্‌সন-বিরোধী সে বলিল, এসবই কি ট্যুরিস্ট ব্যুরোর পক্ষ হইতে ফ্রাইডে নোট্‌স প্রকাশ করিবার ফল হয় না। ফ্রেডা-কাস্‌ল তো পূর্বেও ছিল কিন্তু এখন এই গ্রাফে দেখুন তাহার প্রভাব হলুদ রেখায় কিরূপ ঊর্ধ্বগ হয়। জনসন বিপদে অ্যাটকিন্‌সনকে সমর্থন করাই যুক্তিযুক্ত বোধ কবে। সে অন্য মত দেয় এই যে ফ্রাইডে নোট্‌সের ফলে তো ট্যুরিস্ট ট্র্যাফিক বৃদ্ধিই পাইতেছিল, কালে ভ্রমণকারিগণের নিকট ক্রুশোর পুস্তকের মতোই তাহা আকর্ষণীয় হইত, ট্যুরিস্ট ব্যুরো কী প্রকারেই বা জানিবে হিতে বিপরীত হয়।

সপ্তদশ রবিন্সন ক্রোধভরে এরূপ মন্তব্য করিল যত নষ্টের মূল সেই ক্যাস্টিগলিনো ছোকরা। জীবিত থাকিলে অবশ্যই ডিফামেশন স্যুটের আসামী হইত। সে তাহার পুস্তকে বর্তমান বক্তাকে

ক্রুশোর উত্তরপুরুষ বলিতে তাহার অসম্মতি জানায়।

টিয়ারগাট বলিল, আমার কিন্তু এরূপ ধারণা হয় যে ক্যাস্টিগলিনো 'নরমাংস ভক্ষণ ও তাহার পর' নিজে প্রকাশ না করিলে এরূপ কেহ সন্দেহ করিত না ফ্রেডা-কাস্‌লের সহিত মাইকেল ফ্রাইডের যোগ থাকিতে পারে। এখন তো দেখি ট্যুরিস্টরা জন জোয়াকিম ফ্রেডাকেই ফ্রাইডের উত্তরপুরুষ ভাবিতেছে এবং সে যে একজিকিউটরদের অধীন ইহাই তাহার দুঃখময় গ্ল্যামার বাড়ায়।

অ্যাটকিন্‌সন তাহার কনিয়াক-গ্লাসে দুইটি বড়ি ফেলিল।

জেরাল্ড বলিল, সে সবই বুঝিলাম, হয়তো সেন্ট ইজাবেলা নামই ট্যুরিস্টদের ভালো লাগিয়া থাকিবে এবং যাহারা ইক্ষুচাষ করে তাহারাও ইক্ষুক্ষেত্রে তাহাকে কল্পনা করে, কিন্তু আমাদের পাওয়ার-হাউস চলিবে কি, রোটারি প্রেস ঘুরিবে কি, রেডিও নীরবই থাকে কি? এবং সেই অপারেশন ব্ল্যাক টিউলিপ তাহাই বা কি?

সেদিন তাহারা দীর্ঘক্ষণ আলাপ করিল। ডিনার শেষে তাহারা বসিয়াছিল সুতরাং কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু সমস্যাটি লইয়া চিন্তা করিতে তাহারা সময় লইল এবং স্থির হইল আপাতত ব্ল্যাক টিউলিপ অপারেশন ও ফ্রেডা-কাস্‌ল উভয়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখা হইবে এবং আগামী সপ্তাহে কমিটি বসিবে।

পথে বাহির হইয়া চার্লস টিয়ারগাট ধীরে ধীরে অ্যাটকিন্‌সনকে বলিল এরূপ প্রচার করা উচিত হইবে ফ্রেডা-কাস্‌ল এক মধ্যযুগীয় ফিউড্যাল প্রতীক এবং সেনর ক্যাস্টিগলিনো নিতান্তই অ্যাডভেঞ্চারিস্ট ছিল।

শেষ দুই শত গজ এবং যেরূপে গর্দভ প্যান্ট্রিজাত হয়

ফ্রেডা-কাস্‌লের পাহাড়ী ঢালু পথে জেফ জেফারসন তাহার গর্দভসহ উঠিতে থাকে। জেফ জেফারসন সেই পাহাড়ের পথে ঘর্মাক্ত, ইতোমধ্যেই তাহার হাত পা কয়েক জায়গায় ছড়িয়া গিয়াছে, ফুসফুস ফুলকা ভারি বোধ করিতে থাকে এবং গর্দভটিও নানা রাজ্যের নষ্টামি জুড়িয়া দেয়। এই তো পাকর্দাগুর এক পা তাহাকে কোলেও লইতে হইয়াছিল যাহা জেফের মতো ষণ্ডামার্কের পক্ষেই সম্ভব। অবশেষে সে আবার তাহার গাজর, যাহার কয়েকটি পল্লব ঝরিয়া গিয়া ন্যাড়া দেখায়, নাড়িতে থাকে, কিন্তু গর্দভ স্থির হইয়া দাঁড়ায়, পা ঠুকে, যেন বা এতক্ষণে সে বুঝিতেছে এই বা কোথায় আসিলাম, ইহা বাম্‌কিনের মাঠ নয় এবং সেই আধো আলো-অন্ধকারে তাহার অদ্ভুত লাগিতে থাকে।

জেফ নিজের কপালের ঘাম মুছিল এবং হাতড়াইয়া দেখিল যাহাতে সে গর্দভকেও ঘর্মাক্ত বোধ করে। তখন সে আপন রুমালে তাহার সে ভীষণদর্শন চোয়ালও মুছাইয়া দেয় এবং এরূপ বলে বন্ধু আমরা তো আসিয়াই গিয়াছি, তুমি কি আর একটু কষ্ট করিতে পার না, এস আমরা বরং ধীরে ধীরে যাই। ভাই আমাকে আর কষ্ট দাও কেন? ওই দেখ কাস্‌লের আলো দেখা যায় এবং ওই যে লম্বা চেরা দাগ মতো আলোক দেখা যায় তাহা অবশ্যই আমাদের অপর বন্ধু বুড়া জেডের প্যান্ট্রি যেখানে বেশ কয়েকটি গাজর তোমাকে পাওয়াইয়া দিব। ভাই, ভাই একটু চল। ভাই, একটু চল।

এদিকে জেড এখন হাত চালাইয়া জন ফ্রেডার নিমিত্ত পাতা ডিনার টেবল গুটাইয়া তুলে। তাহা নিশ্চিতই ডিনার-হল নয়। হায়, সে ভাবে, কবে বা এই ফ্রেডা-কাস্‌লে আবার বড় টেবল পড়ে। সে একবার প্যান্ট্রিতে, একবার কিচেনে, একবার বা টেবলের নিকট এরূপে দ্রুত চলিয়া কাজ শেষ করে। হাঁ, টেবলটি ছোটই এবং মিস্টার ফ্রেডা এখানেই আহার করেন। হায়, সে ভাবে, কবে বা মিস্টার ফ্রেডা সঙ্গী পান। হাঁ টেবলটা প্রকৃতপক্ষে তাহার এবং জেফের জন্যই। এমন কি ইহা

উজ্জ্বলভাবে আলোকিতও নয়। বর্তমানে ইলেকট্রিকও নাই। পুরাতন এক ক্যান্ডেলাব্রা মাথার উপরে ঝুলিতে দেখা যায় যাহাতে, যেমন টেবিলে শামদানে, মৃদু মোম জ্বলে। তৎকালে লক্ষ্য করে এক মৌমাছি শামদানের আলোর ডোম ও ক্যান্ডেলাব্রার ঝাড়ের মধ্যে বিপরীত ভঙ্গিতে উড়িতে থাকে।

সে যেমতো হউক, আজ মিস্টা ফ্রেডাকে কিছু বিমর্ষ দেখায়। না, আহারে কিছু অরুচির লক্ষণ ছিল এমন নহে, পরন্তু কিছু যেন ভাবিত থাকেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলেন না, পরন্তু যেন বা কোমল দেখাইয়াছে।

এই সময়ে সে ক্ষুধা বোধ করে, কেন না এরূপই হয় যে টেবল হইতে ঢাকনা ইত্যাদি সরাইবার পর সে এবং জেড এই টেবলেই আহার করিয়া থাকে, এবং বর্তমানে টেবলে সেরূপ ঢাকনা সরানই দেখা যায়। তখন সে চিন্তা করে জেফ আজও তাহার কর্তব্যে দেখ ফাঁকি দেয় এবং তাহাতে ক্রমশ এক বিদ্রোহের ভাবই বা দেখা দেয়। ইহা হয়তো বা মিস্টা ফ্রেডাও লক্ষ করেন।

এইরূপ ভাবিত জেড শামদানের নিকট অবস্থিতি করে এবং চিন্তা করিতে থাকে যেমতো মিস্টা ফ্রেডা আজ ডিনারে পুস্তক পাঠ করিতেছিল। হায় তাহার সঙ্গে কথা বলিবে এমন অন্য কেহ টেবলে বসে না। মিস্টা ফ্রেডা, অদ্য বোস্টের সহিত সেই 'নরমাংস ভক্ষণ ও তাহার পর' পড়ে যাহা বর্তমানে নিরতিশয় নাকি বিক্রি হয়। হাঁ, সে জেড, সেও গোপনে একবার বইখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়াছে, এবং তাহার ভালো লাগিয়াছে বটে।

মিস্টা ফ্রেডা সেই পুস্তক পড়িতে থাকাকালে যেন এক বিষম চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকেন। এবং একবার প্রশ্ন করিলেন যে আচ্ছা, জেড, সেই যে শুক্রাম্বরা, যাহার প্রথমজাত কে এবং কোথা হইতে তাহা কেহ জানে না, এবং যে অ্যাটকিনস হইতে অ্যাটকিনসন প্রভৃতি করিতে থাকে যাহাকে ইক্ষুচাষিগণ দগ্ধাবশেষ ইক্ষুক্ষেত্রে নবাঙ্কুর ইক্ষুগণকে আশীর্বাদ করিতে অনুভব করে, আচ্ছা, জেড, সে কি ইউরোপীয় সভ্যতা।

পরন্তু জেড এ প্রকার আলাপ চলিতে থাকাকালে মাত্র হুঁ হাঁ করে কারণ এগুলি তাহার নিকট নিতান্ত গভীর ঠেকিতে থাকে এবং বর্তমানেও তাহার সেইরূপ বোধ হয়।

কিন্তু জেফই তাহাকে রসাতলে পাঠাইবে। সহসা তাহার আশঙ্কা হইল, হায়, রাত্রি নয় বাজিতে চলে তবে কি জেফ কোনো কাঁটাতারে পড়ে। এইরূপ আশঙ্কায় সে নিতান্ত মথিত-চিত্ত হইল।

তৎকালে জেড দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে এবং জেফের জন্য অপেক্ষা করিতে শামদানের নিকট পুস্তক লইয়া বসে যাহা অবশ্যই অনেক পাঠে কুকুর-কানযুক্ত, মলাট ছেঁড়া, এবং বড় অক্ষরে অল্পপাঠ-অভিজ্ঞ ভ্রমণকারিগণের নিমিত্ত সেরূপ প্রকাশিত অবশ্যই ডিফোর লিখিত রবিন্সন ক্রুশোর বিপজ্জনক ভ্রমণকাহিনী হয়। ইহাতে তাহার উপকারই হইবে পরন্তু। সে পুস্তক খুলে এবং এই সলজ্জ চিন্তা করে যে ভ্রমণকারিগণ গতবারে তাহাকে বিপাকে ফেলিয়াছিল কেন না এই কাস্‌লের হলে গ্লাস-কেসে সজ্জিত অস্ত্রগুলির সে ঠিক ঠিক পরিচয় দিতে পারে না।

মৌমাছিটি যাহা শামদানের নিকটে ছিল সে তাহার মস্তকের চারিদিকে এক চক্কর মারিয়া উড়িল। সে পুস্তকে এরূপ পড়ে (পৃ ৮৬/৮৭)

আমি চিন্তা করিলাম যে আমি মাটিতে বসিয়া থাকি, আমার দেয়ালের বাহিরে, যেখানে আমি বসিয়াছিলাম যখন ভূকম্পনের ন্যায় ঝড় বহিয়া গেল, এবং যে দেখিলাম এক মানুষ এক বিশাল কাল মেঘ হইতে অবতরণ করিতে থাকে এক অত্যুজ্জ্বল অগ্নিশিখার মধ্যে, এবং সে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইল। সে সর্বাঙ্গে অগ্নিশিখার মতো এমতো উজ্জ্বল যে অতি কষ্টে তাহাকে মাত্র দেখিতেছিলাম। তাহার মুখাবয়ব অবর্ণনীয় ভয়ঙ্কর ছিল যাহা ভাষায় বর্ণনা হয় না। সে ভূমিতলে পা রাখিতে তাহা কাঁপিয়া উঠিল যেমন পূর্বে ভূকম্পনের কালে হয়।..

সে তৎকালে হাতে এক দীর্ঘ বর্শা বা অস্ত্র লইয়া আমাকে বধের নিমিত্ত অগ্রসর হয়, এবং

কিছু উর্ধ্বে থাকিয়া সে এরূপ বলিল—'যেহেতু এত সবও তোমাকে অনুশোচনার নিকটে আনে না এক্ষণে তুমি মরিবে।' এত বলিয়া সে তাহার ভীম বর্ষা উত্তোলন করে।...

তখন জেড একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল এবং এই এতদিন পরে সে আবার অনুভব করে এই দ্বীপে আসিয়া সে সম্ভবত ভালো করে নাই। সে এদিক ওদিক চাহিল এবং মনে মনে বলে, হে ঈশ্বর আমাকে মাপ মঞ্জুর করিও এবং কোথাও কোনোরূপে বর্ষা নাই দেখিয়া নিশ্চিত হইতে চেষ্টা করে। অতঃপর সে আবার জেফের কথা ভাবে এবং বিষণ্ণ হয়। হায় সে বা কী বিপদে পড়ে। কিন্তু ক্ষুধার উদ্রেক হয় যে তাহাও সত্য। সুতরাং সে উঠে এবং তৎকালে এক ধার্মিক ধূসরতার মধ্যে ধীরে প্যান্ট্রির দিকে চলে যেন যাহাতে সে নিজের চতুর্দিকে এই জেরিকো এই গেবিওনের প্রাচীর এরূপ দেখে যে দৃশ্য ক্ষণে ক্ষণে সরিয়াও যায়। সে স্থির করিল অদ্য সে নিরামিষ খাইবে, কেন না, আহা, জেফ তো এখনও ফিরে নাই, এবং তাহার কী বা হয়।

সে সুতরাং একখানি বড় রেকাবি হাতে লয় এবং যথারীতি জামা টানিয়া তাহা মুছে যেমতে তাহা পরিষ্কার হয়, এবং পুনরায় আপন মনে ধূসর ধার্মিক পথঘাট সকল দেখে যেমন সে বাইবেলে পড়ে।

তৎকালে এরূপ ঘটিল।

হয়তো প্যান্ট্রির আলমারিতে সবেমাত্র হাত দিয়াছে। কী যেন এক শব্দ তাহার কানে আসিল। সে অন্যমনস্কভাবে পার্শ্বে লক্ষ্য করে এবং সহসা অকস্মাৎ এ কী হয় যে বাইবেলের সেই উষ্ট্র ধীরে ধীরে স্ফুরিতরন্ধ্র তাহার নাসা প্যান্ট্রির দরজার ফাঁকে গুঁজিতে থাকে। সে আঁ আঁ করিয়া উঠে, হা ঈশ্বর, হা যেশু প্রভৃতি বলিতে চেষ্টা পায, কাঁপিতে থাকে যে তাহার হাতের রেকাবি ঝন ঝন শব্দে পড়িয়া খানখানও হইল। সে ত্রাসবিহ্বল হয় এবং সম্মুখে সেই প্রবিশ্যমান যাহা এখন ক্রমশ এক ভীষণ চোয়াল তাহা দেখে।

কিন্তু এরূপ ঘটিতে থাকিলে জেফ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় এবং বলে জেড, অ জেড ইহা আমি এবং এক গর্দভ।

জেড। যেন তাহাতে আমি কৃতার্থ হইব। (নিশ্চিতই সে ক্রোধ প্রকাশ করে)।

জেফ। ইঁহা এক অমূল্য সম্পদ, জেড, পড়ে শুনিও।

জেড। তুমি তোমাতে নাই জেফ, তুমি তোমাতে নাই। এই ময়লা ভীষণ দর্শন জীবনটিকে বাহিরে রাখ। পত্রপাঠ সেরূপ কর।

তৎকালে জেড সেই কপিশ, লম্বিতকর্ণ, ভীষণ চোয়ালের জীবটিকে লক্ষ্য করে এবং বারংবার নিজের বুকে ক্রস চিহ্ন আঁকিতে থাকে।

কিন্তু জেফ বলিল, জেড, আ, জেড তুমি বোঝ না কেন ইহা কত অমূল্য সম্পদ।

জেড চিন্তা করিতে থাকে এবং ফ্রেডা-কাস্‌লের বাটলার জেফ জেফারসনের মুখের দিকে বারংবার লক্ষ্যও করে। সহসা যেন সে অনুভব করে জেফ মনে মনে হাসিতেছে এবং যদিও সে ঘর্মাক্ত তথাপি যেন প্রফুল্ল হইয়াও উঠে। ইহা অবশ্যই কোনো রহস্য এরূপ বোধ করিতে থাকাকালে জেড বারংবার গর্দভকে দেখে এবং অবশেষে সেও মনে মনে হাসে, হায় উহার পেট উভয় দিকে স্ফীত দেখি যে। ইহা কি বিস্ময়েরই না হয়। তাহাও যেন এই আকস্মিক বিদ্যুৎ-উদ্ভাস যে একই কালে সে আনন্দিত ও সতর্ক হয়। সে মাথা দুলায় এবং এরূপ সাবধান চিন্তা করে যে হয়তো বা এমন হয় যে জেফ ইহাকে লুণ্ঠিত স্বর্ণে বোঝাই করিয়া আনে। তখন সে আহারের প্রস্তাব করিল।

গর্দভ এবং তাহার চালক

আহারের যত কিছু এমন কি পানীয়ও তাহার একবারেই লয় এবং টেবলের উভয় পার্শ্বে মুখামুখী বসে। তাহারা পরস্পরকে হাসিমুখে লক্ষ্য করে পরন্তু কেহই কিছু বলে না। জেড তো ভাবিতে থাকেই যে তাহা কি সত্য হয় যে জেফ তাহারে সেই সমুদয় স্বর্ণের অংশ দিবে। জেফ কী ভাবে তাহা প্রকাশ পায় না। দেখি যে জেড দু-একবার কথা বলিতে হে হেম করিয়া গলা খাঁকড়ায়। শামদানে মোমবাতি কমে। মৌমাছিটার কী হইল একবার সে জেডকে ঠোক্কর দেয় এবং উল্টাইয়া টেবলে পড়িয়া নাচে।

জেড। তোমাকে এক রহস্যের কথা বলি।

জেফ। রহস্য। ও হাঁ রহস্য।

জেড। আচ্ছা জেফ

তাহারা আর অধিক অগ্রসর হয় না। জেফ এক বোতল টানিয়া লয় এবং তাহার ছিপি লইয়া নানা ফাঁপরে পড়ে। অবশেষে সে ছিপি খোলে, উভয়ের গ্লাস ভরিয়া লয়।

জেফ। আচ্ছা জেড

জেড। বল আমি শুনিতেছি।

জেফ। আচ্ছা জেড ছুতার মিস্ত্রিরা কি প্রকারে কাজ করে তাহা জান?

জেড। তাহাতে বিশেষ কি। আমার এক পরিচিত ছুতার আছে যে সুন্দর আসবাব প্রস্তুত করে। তুমি যদি বিবাহ কর, জেফ, আমি তাহাকে বলিয়া দিব সে সস্তায় এমন কি চিপেনডেল আসবাবও তৈরি করিয়া দিবে।

জেফ। (তাহার চোখ দুই জ্বল জ্বল করে। সে আনন্দে উভয় হাত ঘষিতে থাকে) চিপেনডেল তাহা ভালো জেড এবং পুরাতনও। আচ্ছা জেড তুমি কি প্রায় দু হাজার বৎসরের পুরাতন আসবাব দেখিয়াছ?

জেড। না। তুমি?

জেফ। না। আচ্ছা জেড

জেড। কিছু বলিবে?

জেফ। তাহারা হাতুড়ি, বাটাল, ঘিসকাপ ইত্যাদি অবশ্যই ব্যবহার করিত। দেখ এই মদটি বিশেষ মিষ্ট।

জেড। তাহা বটে। কিন্তু সে ছিল চোখ বাঁধা এক চামার।

জেফ। (চমকিত) কে?

জেড। (মিটি মিটি হাসিয়া) যে কাশেমের দেহ সেলাই করে।

জেফ। ও হাঁ। সেইরূপই বটে। কিন্তু আমি কী বলিতেছি জান। প্রায় দু হাজার বৎসর আগে ছুতার এক গাধায় চাপে না। (সে যেন এক রহস্য করে)।

জেড। কাশেম অবশ্য অনেক ধনরত্ন আনে।

জেফ। আচ্ছা জেড তুমি কি এক ধাঁধার উত্তর দিতে পার?

জেড। (মনে মনে) বোধ হয় আমার বন্ধু ওপ্‌ন-সিসেমের কথা বলিবে। (তৎকালে এরূপ হইল যে কংক্রিটের দেয়ালের যাহা কিচেনের এই অংশকে পৃথক করে সেখানে সেই ভীষণদর্শন চোয়ালের কিছু অংশ প্রকাশ পাইতে থাকে এবং জেডের মুখ শুকাইয়া যায়)।

জেফ। বলো দেখি বুড়া জেড কে গাধায় তাহার স্ত্রীকে তুলিয়া আনে এবং সেই তাহার স্ত্রী কী বহন করে।

জেড। আলিবাবা ও তাহার স্ত্রী বলিবে? এমন শুনি নাই।

জেফ। (হাসে, তাহার চোখ চক চক করে, সে পুনরায় মদ ঢালিয়া নেয়, সে গ্লাসটি সম্পূর্ণ একবারে গলায় ঢালে, চেয়ার ছাড়িয়া উঠে, সম্মুখে হাত বাড়াইয়া যেন হাতড়াইয়া হাঁটে) আ, জেড, আ।

জেড। কিন্তু, জেফ, ইহা কি চামার দ্বারা সেলাই কর কিংবা এই কি মশক যাহা পথের ধারে ছিল।

জেফ। (নিরাপদে পান করে, গ্লাসে বোতল হইতে যাহা ছিল তাহা ঢালে, পুনরায় তাহা নিঃশেষ করে) আ, জেড, আ।

জেড। (ফিস ফিস স্বরে ভীষণ আগ্রহ গোপন করিয়া) জেফ, বল, জেফ বল।

জেফ। তা হয় না? না?

জেড। (হতাশ হয়) কী হয় না?

জেফ। যে...। না এরূপ হয় না। যোসেফ নামে এক ছুতার ছিল।

জেড। আহা জেফ তুমি নেশার ঘোরে কী যে বল।

জেফ। না, জেড, হয় না। যোসেফ যে তাহার স্ত্রী মারিকে গাধার পিঠে আনিয়াছিল এবং সে যে নতুন মানুষ আনে তাহা এরূপে হয় না। বুহু...

জেড। আ, জেফ, তুমি কী বল? ইহা যে অমূল্য সম্পদ বল।

হঠাৎ তৎকালে জেড যেন বুঝিতে পারে যে তাহা আবার হইল। কাহারো বা মদে বুদ্ধি খুলে এবং জেফ সেরূপই একজন। সে কি তবে গাধার পেটে স্বর্ণপিণ্ড আশা করে না এখন, কেন না এখন মদে তাহার চোখ লাল হয়।

জেফ। না, এরূপে বুউ নূতন মানুষ হয় না জেড বুহু বুউ। (সে হেঁচকি তুলে, গর্দভটি হঠাৎ পোঁ কোঁ কোঁ করিয়া উঠিল)।

জেফ অকস্মাৎ যেন ভীষণ ভয় পাইল। দ্রুতহস্তে আপনার কপালে ও বুকে কয়েকবার ঢেরা কাটিল। ভাবিল দেখ কী ভাগ্য।

জেফ। না, জেড, গর্দভ আনিলে নূতন মানুষ আসে না।

জেড। আমেন।

জেফ। এরূপে হয় না জেড।

জেড। আমেন।

জেফ টেবলে মাথা রাখিয়া নাক ডাকায়। গর্দভটি একবার পা ঠুকে এবং চোয়াল ফাঁক করে যাহাতে তৎক্ষণাৎ পুনরায় জেড বুকে ক্রস আঁকে।

এপিলোগ

তাহার পর এক ডকুমেন্টারি ছবি তোলা হয়।

এ বিষয়ে যারপরনাই ক্ষিপ্রতা ও শশব্যস্ততা দেখানো হয় যেমন যেহেতু বর্ষা আগতপ্রায় এবং এই দ্বীপের যে বর্ষায় উদ্ভিদাদি বৃদ্ধি পাওয়া হেতু এবং ধ্বংসস্তূপ সকলের উপরে উপরে কালের কালিমা যেমন বা প্রকৃতির শ্যামলিমা এবং সেই আগে আগে, তীক্ষ্ণতাগুলিকে এবং তীব্রতাগুলিকেও ঢাকিয়া কোমল করে বা ; তেমন অবশ্যই যেহেতু সেদিকেও দৃষ্টি থাকে যে যাহাতে ছবিখানি ধ্বংসস্তূপ সকলের অবলম্বনে সে বিষয়ের আবেগকেও হিল্লোলিত করে কেন না ইতোমধ্যে রয়টারে রয়টারে, তাহাকে তো চাপিয়া এবং ছাপিয়া রাখা যায় না, সংবাদ বিকীর্ণ হওয়া মাত্র প্রতি দেশে এ দ্বীপ সম্বন্ধে

এক এমন আগ্রহ উপস্থিত যাহা ট্যুরিস্ট ব্যুরোর ত্রিশ বৎসরের প্রচার-দক্ষতা সত্ত্বেও জাগিল না। ফলত একই কালে হলিউডে এবং ব্রেখেট্‌গাডেনসে সে বিষয়কে অবলম্বনে কাল্পনিক ডকুমেন্টারির চেষ্টা চলে এবং এ দ্বীপের এরা অনুভব করিতে থাকে আমরা করি মারামারি নেপোয় মারে দই।

এবং ট্যুরিস্ট ব্যুরো যাহা সরকারি ও বেসরকারি উদ্যমের সার্থক সম্মেলনভূমি তাহাকে স্ট্যাটুউটরি ক্ষমতা সকল দেওয়া হয় যাহাতে দ্বীপবাসিগণ নিজ নিজ গৃহ, ভবন, হোটেলাদি মেরামৎ না করে। ইহা অবশ্যই সত্য যে সাধারণ মানুষে বুঝিবে না সে বিষয়ের প্রামাণ্য একজিবিট রূপে কোনো ফাটল-ধরা থাম, কোনো দগ্ধ পোর্টিকো, কোনো গোলার আঘাতে চৌচির দেয়ালকে ঠিক তেমন রক্ষা করা প্রয়োজনের হয়। ইহা নির্ণয়ে একই কালে যে শিল্পকলা জ্ঞান এবং যে ঐতিহাসিক নজির সংগ্রহবোধ থাকা চাই সে সকল সে সে বিষয়ের এক্‌সপার্টেই থাকিতে পারে মাত্র।

কিন্তু, অন্যদিকে এমন নয় যে পুরানো আবাস স্থলগুলিকে পরিত্যাগ করা যায় যেমন নাকি পম্পিয়াইর ধ্বংসাবশেষ। বরং এই এখানে বাস করিতে থাকা লাভজনক ও রুচিবোধের পরিচায়ক যেহেতু গোটা দ্বীপটাই কি প্রায় একটি ম্যুজিআমে সংগৃহীত সে বিষয়ের নজিরশ্রেণী নয়? অথবা প্রতি মহল্লাই হয় একটি নজির। সে বিষয় যাহা ঘটিয়া গেল তাহার কোনদিনে কোনস্তরে কোথায় কে দাঁড়ায়, গোলা দাগে, বোমা ফাটায়, মরে এবং / অথবা বিপ্লব সাধন করে, এবং মহল্লার লোকেরা যাহারা প্রত্যক্ষদর্শী তাহারাই সেই আগত এবং অনাগত বহু সংখ্যক ট্যুরিস্টদের গাইড হইতে পারিবে। ইহাও অবশ্য রুচিবোধের তাড়না যে দিকে দিকে দেশ ছাপিয়া মানুষ সকল আসে এই ধ্বংসস্তূপের সান্নিধ্য লাভ নিমিত্ত। সুতরাং বুড়া অ্যাটকিন্‌সন তাহার খাস-কামরায় সুশীতল বিয়ারে লাল ও নীল রঙের দুই বড়ি ছাড়িয়া দিলে তাহা তৎক্ষণাৎ বিড়বিড় করিয়া উঠিয়া তরলে মিশিতে থাকে।

সে মন্যাকল্, ইহা নতুন দেখি এবং রিমলেস যা কালো কারে ঝুলে এবং হয়তো বা সেই ডামাডোলে কি করিয়া বা তাহার সেই আগেরটি খোয়া যায়, চোখে ছিল। সে কিছু চিন্তা করিল এবং নিজের নাবদ-দাড়িতেও রুমাল ঘষে। তাহাতে কি কিছু বিষণ্ণ দেখি! চোখের চারিদিকে বিশেষ ফোলা ফোলা নিচের পাতায় যে অজস্র ফাটল—হেন দাগ তাহা অনেক রসিকতা এবং চোখ কোঁচকানো গূঢ় চিন্তার ফল হইবে বা।

অতঃপর সে চেয়ার টানিয়া বসিল এবং টেবলের ড্রয়ার হইতে এক অত্যন্ত পাওয়ারফুল দূরবীন বাহির করে যাহা এক ত্রিপদে বসানো, এবং সে পদগুলিকে খাড়া করিয়া সে তাহাকে টেবলেও বসাইল।

হাঁ, দেখা যায় বটে। সে দূরবীনের চক্ষুতে চোখ রাখিল। ফ্রেডা-কাস্‌লেই অথবা তাহার সুন্দর ধ্বংসাবশেষে তাহারা বর্তমানে ডকুমেন্টারি তুলিতেছে। যাহাতে মিস্টার ভক্স ক্যারুসো সেনর জন জোয়াকিম ফ্রেডা এবং বুড়া অ্যাটকিন্‌সনের নিজস্ব সেক্রেটারি মেটিল্ডা সেনোরিনা ডোনা মিইআ ফ্রেডার পার্ট করে। কেহ কি জানিত মেটিল্ডার পক্ষে তাহা সম্ভব হইবে? কিন্তু ইটালিয়ান স্ক্রিপ্ট-লেখক গুইলিয়েলমো কুয়েপেচ্চি এবং ফরাসি প্রযোজক রেনে মোরো উভয়েই এ বিষয়ে একমত যে তাহা অপূর্ব হইবে। কেহ কি জানিত ইটালিয়ান সেই স্ক্রিপ্ট-লেখক তাহার মতো হুইস্কিতে বড়ি ঘুলাইয়া পান করে।

বস্তুত লোকটির এক সহজ ভাব এই আছে যে স্ক্রিপ্ট লইয়া অ্যাটকিন্‌সনের সঙ্গে আলোচনা করে, মতামত যাচাই করে এবং দম্ভ প্রকাশ করে না। সেই তো বলে ডকুমেন্টারির প্রথম দিকে যেমতো ডোনা মিইআ এবং জন জোয়াকিম ফ্রেডা শেষ দিকেও সেরূপ থাকিবে যাহাতে ডকুমেন্টারি ছবি হওয়া সত্ত্বেও উপন্যাসের ন্যায় গোলাকার হয়।

অ্যাটকিন্‌সন দূরবীনে চোখ রাখিল। হাঁ, সে স্পষ্টই দেখিতেছে ফ্রেডা-কাস্‌লের চূড়ায় জন ফ্রেডা শাফ্‌টের উভয় দিকের দেয়ালে হাত রাখিয়া প্যারালাল-বারের ভঙ্গিতে ঝুল খাইয়া উঠিয়া পড়িল।

সুতরাং বোধ হয় যে ক্ষৌরের সরঞ্জাম সে পূর্বেই সে স্থানে রাখিয়াছে। এই অভিনেতাও দেবদূতের ন্যায় যেন বা জনি উইসমুলারই বা এতদিন পরে আবার আসিল। নিশ্চিতই জন ফ্রেডাও নিতান্ত সুপুরুষ ছিল।

একমাত্র এই সামান্য অসুবিধা দেখা দেয় যে ফ্রেডা-কাস্‌লের স্টালেকটাইট চেম্বারে এখন এরূপ নাম দেওয়া হইতেছে এবং প্রকৃতপক্ষে ইহাব অস্তিত্ব কে বা জানিত, যে অপর দেহটি পাওয়া যায় যাহা দ্বীপেব রেজিস্টার জেনাবেল বুডা লাকি ওয়াল্টারেব বলিয়া সনাক্ত করে তাহা সে স্থলে কিরূপে আসে? অ্যাটকিন্‌সন ও স্ক্রিপ্ট-লেখক কুয়েপেচ্চিতে এস্থলে সামান্য মতভেদ আছে যে অ্যাটকিন্‌সন অনুমান কবে লাকি ওয়াল্টার, যেমন নাকি নিক কার্টাবের সেই উপন্যাসে থাকে, ফ্রেডা-কাস্‌লের প্রবেশপথ ৭২৭ ডন ওয়াল্ডোর জন্য খুলিয়া দিতে পুরাতন ইঁদাবাব পথে প্রবেশ কবে। অন্যপক্ষে কুয়েপেচ্চি সাহেবে বলে হয়তো বা কোনো গোপন পথ আছে যাহার ফলে কোনো গুহায় প্রবেশ করিয়া চলিতে থাকিলে শেষে স্টালেকটাইট চেম্বাবে পৌঁছিতে হয়। সে যাহা হউক, পবে বলি।

জন জোয়াকিম ফ্রেডা পাহাড়ের চাতালে উঠিতেছে। যে হয় আলোর শাফ্‌ট যেন তাহাই পড়িয়াছে যাহাতে মাথার চুলগুলি কোঁকডানো নয়, উজ্জ্বল এবং কালচে, পিঠ বেশ চওড়া ও সোনালি, ত্বকের এবং আলোর শাফ্‌টের মধ্যে তাহা ক্রমে উঠিতেছে। এমতো দেখাব কাবণ ইহা এক স্পাইর‍্যাল সিঁড়ি যাহা কামানটিব জন্য তৈবি এবং কামানটির কাছে যায়। ঢালাই লোহাব সেই বেশ বড কামানটি যাহার মোটা পিছন দিকেব আগুনের ফুটায কযেকটি ঘাস এবং পাশেই পাথরের চাতালে কযেকটি টেনিস বলের চেহারাব গোলা এখনও যা পিরামিড করিয়া বাখা।

সে প্যারালাল-বাবের কায়দায় দুহাতে প্যাবাপেটের মাথা ধবিযা ঝুলিয়া ও নিজেকে দোলাইয়া সে উপবে উঠে। তাহার কাঁধে বাথ-টাউএল। সে হাতে হাত ঝাড়ে কেন না প্যারাপেট হইতে কিছু আলগা মযলা লাগে।

সে ক্ষৌরে বসে এবং এমতো অবাক হয় যে তাব ক্ষৌব আর যেন হয় না। সূর্য তাহার পিছনে কিযৎদূরে উঠিয়াছে কিন্তু তাহাব সম্মুখে এমন নীল সমুদ্র ও কিছু শুভ্র সৈকত যে কোনো স্ত্রীলোকই যেন বা তত সুন্দর হয না, নিতম্বগুরুতা ব্যতীত এবং বক্ষেব বর্তুলাভাস ছাডাই, যেন যেহেতু একটা বাঁক আছে মাত্র, আর তাহা কী এক মোহিত করিবার মতো মাধুর্য টলমল যেন বা সে এথা হইতে ঝাঁপ খাইয়া পডে এবং সেই নীলে ডুবিয়া তাহাব সীমায সীমায় ভাসিযা উঠে আবার সেই নীলে ডুবিতেই। এবং সেই নীল উজ্জ্বলও যেন তাহার ভিতরেই মৃদু আলোকের বন্দোবস্ত আছে।

পিঠের পিছনে দুই হাত খাড়া বাখিয়া সে পা ছড়াইয়া বসিল। ক্ষৌর পবে হইতে পাবে। সে নিশ্চিত জন জোয়াকিম ফ্রেডা যে নাকি কার্নেলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কিন্তু আচম্বিতে যেন বা তাহা বিশ্বাসে আসে না এমন এক অনুভূতি হয় এবং সে সেরূপ পা বাডাইতে যেন খানিকটা আলোক হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া তাহাব চারিদিকে ছড়ায় এবং খানিকটা বাতাসও গায়ে লাগে তা এমন যুগপৎ যেন কোনটি আগে তা বোঝা যায় না। এখনও বসন্তই তো।

তৎকালে জন জোয়াকিম ফ্রেডা এ প্রকার চিন্তা কবে যে আমাদের শপথ সকল আমাদের পূর্ব পূর্ব ধার্মিকতার ধ্বংসখণ্ড সকল হয় যাহা যেন বালুকায় প্রোথিত এবং কিছু দেখাও যায়। সে মৃদু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে।

খানিকটা অপ্রতিভবৎ সে কাছে চায় এবং তখন মরিচা রং ধরা কামানের পিছনে গুলির পিরামিডের পাশে সাবান মাখানো দাড়িব্রাশ ও আরশি দেখে।

তাহার পিছন দিকে পাহাড়ের গায়ে এক ছোট পাইন বন। কিন্তু যথেচ্ছ বর্ধিত লতাগুল্মে এবং পাহাড়ী লম্বা ঘাসে এবং কালচার করা ক্যাক্‌টাস জাতীয় কাঁটা গাছের ফলে বনটি দুর্গমতার আভাস আনে। কিন্তু দেখ এখন সেই বনের উপরে সূর্যের আলো পড়িতেছে। এবং সেই বনের ডাহিনে

ধাপগুলি স্পষ্ট যাহাতে চাষ করা ফুলের গাছ। কেন না উহা ফ্রেডা-ভিলা যাহাতে সেনোরিনা ডোনা মিইআ ফ্রেডা থাকে।

সে অবশ্যই জন জোযাকিম ফ্রেডা কিন্তু তাহাতে যেন তার মৃদু অবিশ্বাস যাহাতে ওই নীল সমুদ্রের বাঁকই নয়, সে আবাব সে দিকেই চাহিল, এই অরণ্যের উপরে রৌদ্রও যাহা চক চক করে এবং বা যেন নড়ে, যেন এক ষড়যন্ত্র করিয়াছে। সে তখন একবার আপন মুখ দেখিল আরশিতে। সে তখন একবার নিতান্ত বোকাব মতো হাসিতে সাহস পায় কেন না সে তো এখানে একা।

এই অবসরে দুম করিয়া এক ট্রেসার-বুলেট ফাটে এবং সে অবাক হয় এই প্রাতঃকালে তাহাতে বা কি উদ্দেশ্য থাকে! সে আলোকটিকে দেখে এবং সাবানেব ব্রাশও ঘষিতে শুরু করে। তৎকালে যেমন পূর্বে হয়, সেই অনিন্দ্যসুন্দর নীল বাঁকটি আবার চোখে পড়ে। আহা, ইহা কি তাহার নিজস্ব নীল বাঁক?

সে তৎকালে চারিদিকে লক্ষ্য করে এবং চিন্তা করে কে বা এই বাড়িটিকে ফ্রেডা-কাস্‌ল নাম দেয়, সে ক্রেতা বা ইহাব নির্মাতা হউক...কেহ বলিতে পারে না এই কামানটি তাহার দ্বিতল গুহা-ভবনের ঠিক কোন্ অংশে আছে। এই শাফ্‌ট বাহিয়া নামিলে যাহা প্রায় খাড়া এক দেয়ালেব গায়ে গায়ে, তুমি যেখানে যাও তাহা ভিতরের দিকে এক বসিবার ঘরের বাবান্দা। কেমন বিস্ময় লাগে না...

ওই নীল এবং ওই শুভ্র বালুবেলা যেন যাহাতে মিসেস ম্যাক্‌ব্রাইড কি বসিয়া থাকিতে পারে এবং সে যেন বা বসন্তবায়ে সেই সকল পুরাতন শব্দের সৌবভ পায যে যেন কেহ তাহাকেই বলে ওগো আমার অ্যাপোলো আমার এঞ্জেল এবং তাহাতে তাহার চোখের কোলে পক্ষ্মের ছায়া পড়ে বা এবং সে সিগারেটের ধোঁয়া কিছু উড়াইয়া দিল। তাহার গাযে তো বসন্তেব কবোষ্ণ আলোকই পড়িতেছে। হাঁ মিসেস ম্যাক্‌ব্রাইডই যে ছাতায় আসিয়া বসিলে যাহার ভিজা বিকিনি তাহার উদরে স্পর্শ করে এবং কী যেন কে তাহার শরীরে লোটন পায়রা হেন লুটায়..। হায়।

আচম্বিতে সে শব্দ শুনিতে পায়, যেন ধাতুতে ধাতু আঘাত করিলে যে মৃদু ঘণ্টাধ্বনি হয়, যেন বা তাহারা কথাও বলে যে গম গম শব্দও উঠে। হাঁ, ইহা হয় জেড ও জেফ যাহাবা তাহার ব্রেকফাস্ট প্রস্তুত করিতে থাকে। সেই দুঃখিত মুখে সে হাসিল এবং তখন তাহার মনে এই জরুরি প্রশ্ন হয় যে সে কি ফাটলে মুখ রাখিযা পুনরায় বলে আমি আসিতেছি তোমাদের দেবতা 'রা'।

বরং সে মুখ তুলে এবং মনে মনে বলে, ও আচ্ছা এরূপ দেখাই স্বাভাবিক কেন না ইহাই তো দ্বীপের সর্বোচ্চ চূড়া। কেন না এ চিত্রও সে চিনে যাহা তাহার সম্মুখে প্রাতঃ আলোকে বিছানো দ্বীপের ডাউনটাউনের দৃশ্য যদিও বা এক্ষণে যুদ্ধের পরবর্তী অ্যান্টোয়ার্প যেন। কিন্তু মানুষ সকল চলিতেছে এবং এই চূড়াকেও লক্ষ করে পরন্তু তাহাকে দেখে না। এরূপ হয়, হইয়াও থাকে যে কেহ কাহারও উদ্দেশ্য জানি না এবং চিনিও না, যে কেহ কাহাকেও চিনি না। যেন এক ধোঁয়া উড়ে যাহাতে আড়াল হয়।

সে ক্ষৌর শেষ করে এবং ভাবে অদ্য জাভেলিন প্র্যাকটিশে যাইবে না বরং ওই নীল সাঁতরাইবে। টোয়ালিয়ার মুখ মুছিয়া সে পুনরপি সিগারেট ধরায় এবং তখন তাহাকে কি বসন্ত বাতাস, কি কবোষ্ণ সেই আলোক এবং দূরের সেই অনিন্দ্য নীলের গভীরতা বেদনার্ত করে। সে টোয়ালিয়া বিছাইয়া শয়ন করে এবং স্মরণ করে পূর্বে একদিন জেফ ও জেডকে যেরূপ আলাপ করিতে শোনে যেন বা মানুষের শিকড় নাই। তখন সে ভাবিতে থাকে ইহা কী এক বিস্ময়ের সে জানে না কে বা তাহার মাতা এবং সেই মিস্টার অথবা সেনর ফ্রেডাই বা কে যাহার উপাধি সে বহন করে। এই চিন্তা যেন বা তাহাকে শান্তিতে থাকিতে দিবে না এবং সদ্য ক্ষৌর সত্ত্বেও তাহার মুখকে ক্লান্ত করে।

সহসা শব্দগুলি কানে যায় এবং সেও ভাবে ফাটলে মুখ দিয়া সে এক গম্ভীর গভীর সিংহনাদ

করিবে যাহাতে জেড ও জেফ পুনরায় বিস্মিত হয়। কিন্তু সে শোনে জেড এক অলৌকিক গল্প বলে।

জেড। অথবা কি তোমাকে বলি, জেড, যাহা আমাকে চিন্তিত রাখে।

জেফ। আ, জেড, তোমার কথা শুনিতে হাসি পায় যে তুমি ভাব সেই গর্দভে আমি স্বর্ণ পুরিতে তাহাকে চামার দ্বারা একত্র কাটি।

জেড। (সস্‌প্যানে হাত দিয়া ঘুঁটিতে শব্দ) না, জেফ, আমার বোঝা উচিত ছিল যে তুমি যেরূপ প্র্যাকটিক্যাল বক্‌সিং-বিশারদ তোমার পক্ষে ওরূপ সম্ভব নয়। তবে, জেফ, তোমাকে সতর্ক করি আমার সেই ভুলের কথা যদি আবার বল তবে বলিতে কি সস্‌প্যানেব এক বাড়িতেই তোমার বক্‌সারেব পা দুইটি মোমের কবিয়া ছাড়িব।

জেফ। না জেড বল।

জেড। তোমাকে এক রহস্য বলি। বলিব কি?

জেফ। বল জেড।

জেড। বড় সাহেব ক্রুশো কি কদাপি এক ভীমকায় পুরুষকে মেঘ সকল হইতে নামিতে দেখে?

জেফ। ইহা জেড পৃষ্ঠা ৮৭ রাজসংস্করণ ডিফো সাহেব।

জেড। সে কি এক ভীষণদর্শন বর্শা উঠায় এবং ক্রুশোর বুক লক্ষ্য করে?

জেফ। হাঁ জেড, করে। পূর্ব্ববৎ পৃষ্ঠা ৮৭। যেন বা ঈশ্বরই নামে। উহা ভূমিকম্পের পরে হয়।

জেড। আচ্ছা, জেফ, তুমি কি আমাদেব মিস্টাব ফ্রেডাকে কদাপি জ্যাভেলিন হাতে পাহাড় হইতে নামিতে দেখ?

জেফ। হাঁ জেড। কিন্তু ইহা কেন বল?

জেড। সাধারণ জ্যাভেলিন নয়, সেই প্লাস্টিকের ডাণ্ডা যাহার সেইটি। যাহা অলিম্পিকে ব্যবহার হয বা।

জেফ। (স্বর নিচু করে সে) এরূপ কেন বল জেড। আমাকে ভয দেখাইতে চেষ্টা পাও বুঝি? হুঃ হুঃ।

জেড। না, জেফ, না। আচ্ছা, জেফ, তুমি কি কিছু সাদৃশ্য দেখ?

জেফ। (স্বর নিচুই থাকে? আগেই কেন বল নাই। আ জেড!

জেড। সে ভীমকায় পুরুষ হয়তো বা ফ্রাইডে ছিল। যাহাকে বিদ্বেষবশত ফ্রাইডে না বলিয়া ডিফো সাহেব ঈশ্বব বলেন।

জেফ। ইহা কি হয?

জেড। আমেন।

ইহারা স্বর নিচু করিয়া আনে কিন্তু এরূপ শোনায় যেন তাহারা কথাগুলিকে মূল্যবান করিতে মোটা গলায় বলে, অথবা সেরূপে প্রতিধ্বনিত হয়।

জন জোয়াকিম ফ্রেডা আতপ্ত তোয়ালিয়ায় পাশ ফিরে এবং হাসিবে কি না ভাবে। অথবা সে কি ফাটলে মুখ দিয়া সিংহগর্জনবৎ বলিবে হাঁ তাহাই সত্য হয়। কিন্তু তৎকালে এরূপ হয় যে সহসা আচম্বিতে এক বিকট এবং ফাটলে প্রতিধ্বনিত—হেতু ভয়াল ঘোঁ কোঁ কোঁ শব্দ উঠে যাহা এমন যে ফ্রেডা লাফাইয়া উঠিয়া বসে।

ডকুমেন্টারিতে ইহার পরে এক কাট্‌ হইবে।

এবং তাহার পর আমরা পুনরায় জন জোয়াকিম ফ্রেডাকে তাহার সেই নীলের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া থাকিতে দেখিব। যেন সে এক অপূর্ব আর্তি যে সে সেই নীলের অংশ হইতে চায়। যেন

বা শিশুরূপে এই তাহার চৌকা মুখ নার্সের এই বা সেনোরিনা ফ্রেডার জানু ধরিয়া দাঁড়াইতে চায়। যেন বা সূর্য আলোক বিদ্ধ ওই মহৎ নীলে সে এই প্রশ্নের উত্তর চাহিবে বল আমি কে কোথা হইতে আসিলাম বা, অথবা এই কী আমার আর্তি যাহা জেড ও জেফ বিস্মৃত হয়, অন্য কেহ কদাচিৎ করে পরন্তু আমাকে ত্যাগ পায় না। অথচ দেখ তাহারা তো একর্জিকিউটর এবং বলে আমাকে ইচ্ছামাত্র আমার পুরানো কাগজগুলি ফেরৎ দেয়। কিন্তু তাহাতে কী বা থাকে যে পূর্ব ফ্রেডাগণ, যেমন শুনি, কেহ সেরূপ ফেরৎ লইতে ইচ্ছা করে না। তখন যেন তাহার চোখে তাহার নিজস্ব সেই নীলের ছায়া ঘনায় এবং সে যেন পিতাকে অবিশ্বাস করে জেড যেমতো।

অকস্মাৎ আচম্বিতে সে, তাহার মুখও কিছু বিবর্ণ হয়, যেন সেই করোষ্ণ উজ্জ্বলতায় সে ঘর্মাক্ত এবং মনে মনে বলে হায় আমি কি এক মমি যাহা ইহারা রক্ষা করে যাহাতে ভ্রমণকারিগণ ইহা ফ্রেডা কিংবা ফ্রাইডে হয় এইরূপ সন্দেহ দোলায় দুলিতে আনন্দ পাইতে থাকে? হায় আমি কি শো পিস। হায় কী আমি শো-পিস্ এবং সেরূপ আমরা সকলেই।

এখানে যে এক কাট হয় মঁসিয়ো মোরো এবং সেনর কুয়েপেচ্চি দুজনেই সে বিষয়ে তাহারা একমত কেন না তাহারা সেই মন্ত্র-দগ্ধানোর স্থল পূর্বে রাখিতে চাহে যাহাতে ফ্রেডা ভিলার সৌন্দর্য কিছু দেখানো সম্ভব হয় এবং বা তাহাও সেই যে টেবলের উপরে দাঁড়াইয়া উঠে, কী এক মন্ত্রোচ্চারণ করে যাহাতে চারিদিকের তাহারা নানা আনন্দের শব্দ সকল করিতে থাকাকালে চটাপট হাতে হাতে তালি দেয় এবং ক্রমশ এত উত্তপ্ত যেন নিজের হাত পা ছিঁড়িয়া খায় এবং সেই যে সে পাশাপাশি খোঁটায় বাঁধা দুই মানুষকেও দেখায় যাহাদের চোখ রুমালে জড়ানো এবং এমতো দেখায় যে সহসা ভিলার হে-স্ট্যাক জ্বলিয়া উঠে। আগুনের মতো বিশেষ তাহা সশিখ যদি হয়, সুন্দরই বা কী।

তখন জেফ ও জেড সমভিব্যাহারে জন জোয়াকিম ফ্রাইডে যাহার কোমরে এক তরোয়াল কাঁধে এক ব্লান্ডারবাস এবং হস্তে এক রৌপ্য পিস্তল, এবং সেগুলি তাদৃশ মরিচাধরাও নয় যদিবা পুরাতন কেন না তাহা কাসল-হলের শো কেসে শায়িত থাকে যাহা ভ্রমণকারিগণ দেখে, এবং জেফ ও জেড দুই দুই মাস্কেট লয়, বেগে উৎপাতিত হয় এবং সবিশেষ চিল্লামিল্লি চেঁচামিচিতে এই নতুনতর নব-মাংসভক্ষণকারিগণকে তিষ্ঠ, স্তব্ধ হও, খামোশ প্রভৃতি নির্দেশ দেয়। পরন্তু তাহারা থামে না এবং খোঁটায় বাঁধা মানুষ দুইএর সম্মুখে টানাখাল খুঁড়িতে থাকে তৎকালে যাহা জেড, জেফ ও তাহাদের মনিবকে নিতান্ত বিস্মিত করে। সেহেতু তখন জেড বলিল আফ্রিকাতে আমাদের সেই অসভ্য স্বদেশে এরূপ দগ্ধায় কি জেফ? জেফ বলিল, না জেড, না। ইহা এক নতুন দগ্ধানো দেখি। জন ফ্রেডাও বলে, এ কীরূপ হয় দেখ। পিছনে হে-স্ট্যাক জ্বলে এবং কী মন্ত্র বা পড়ে। আমাদিগের ক্যারিবগণও করে না।

তৎকালে জন ফ্রেডা ফ্রাইডে চিৎকার করিয়া বলিতে থাকে, আহে ইহা কী প্রকারে নবমাংস ভক্ষণ? এরূপে হয় না, ক্যারিবগণে অথবা আফ্রিকার বর্বরগণেও। এমন কি সেই তাহারাও এরূপ করে না যাহারা টি ডিউম লডেনুস বলে, নাচে গায় মানুষ পুড়ায়। কেন না তৎকালে তাহারা চোখ-চোখ শিকে বন্দী দুইকে খোঁচায় যাহাতে প্রচুর রক্ত ঝরিয়া নষ্ট হয় এবং খোঁটায় বদ্ধ তাহারা আঁ আঁ প্রভৃতি করে ও কতই না কাঁদে।

অকস্মাৎ আচম্বিতে জেফ নিজের মুখে কিছু বিস্বাদ অনুভব করে এবং ফলত সে তাহার মাস্কেট দাগিয়া দেয় এবং তৎকালে জেড তাহাকে অনুরণ করে এবং উপায়ন্তরহীন জনও তাহার ব্লাণ্ডারবাসের ঘোড়া টিপে। হায়, এক মহা সোর-গোল উপস্থিত হয়। কারণ কি মাস্কেট কি ব্লান্ডারবাস এমন পুরাতন বিকট শব্দ করে এবং আগুনের ফুলকি সকল ছুটায় এবং এমনকি তাহার একটির মাথা ফাটিয়া তপ্ত লৌহখণ্ড এককে আঘাত করে। সে তখন চিল্লায় হায় এই কি আমার রক্ত পড়ে এবং ব্যথাও লাগে যে। সেরূপে যাহারা টেবলের চারিদিকে তাহারাও বলে যে ইহা ভালো নয় কেন

না তাহাদের ব্যথা লাগে এবং তাহারা তৎকালে অন্তর্হিত হইতেও থাকে এবং বলে ইহারা এই কি অস্ত্র সকল আনে যাহা পুরাতন এবং চিনি না। এইরূপে উইল অ্যাটকিন্সন জুনিয়ার দগ্ধ হইল।

তখন সহসা বুড়া জেড দেখে এ কী হয় তাহার প্রভু মিস্টার ফ্রেডাকে সে কোথাও দেখে না!

অথবা এরূপ শুনিয়া থাকি যে যাহা হইয়াছিল তাহাই চিরকাল হইবে কেন না সূর্যের তলে নতুন কিছু ঘটে না। এবং এক্ষণে জেড দেখে সেই জ্বলন্ত হে-স্ট্যাকের নিচে হস্তপদ-বদ্ধাবস্থায় কে এক শায়িত থাকে এবং জন ফ্রেডা তাহার বন্ধন সকল খুলে, এবং যেন বা শ্বাসপ্রশ্বাস পুনরানয়নে কতই না চেষ্টা করে যে এই বাহু তুলে, এই বুকে হাত ঘষে, উবুড় হইয়া অধরে অধর চাপিয়া ফুৎকার দেয়।

অবশেষে কমল-উন্মীলন যেন বা সেই অ্যাম্বর চোখ দুই খুলে এবং সে সেই অনবদ্যাঙ্গী বীণানিক্কনে, এবং তাহা যেন থাকিয়া থাকিয়া মীড় দেয়, অথবা তাহা কি মধ্য অক্‌টেভের ট্রেমোলো, কহিল, হে, সুন্দর অসভ্য এই আমি কোথায়?

তৎকালে, জেডের মুখ বিশেষভাবে আলোকিত হয় যেন এবং সে বুকে ক্রস আঁকিতে ভুলিযাও যায় পরন্তু শুধু বলে আমেন, কেন না সে যেরূপ বুঝে এই কি পুনরায় সেই পূর্ববৎ সেন্ট ইজাবেলা আসিল।

তাহাতে সন্দেহ নাই যে এস্থলে কাট্‌, ফেড আউট, মন্তাজ, প্রভৃতি নানাবিধ বহুতর শিল্পশৈলী ব্যবহৃত হয় যে যাহাতে দেখি যে ফ্রেডা-কাস্‌লে সেনোরিনা ডোনা মিইআ ফ্রেডা ও জন জোযাকিম চলিতে থাকে, সে সেনোরিনার সেই অ্যাম্বরবৎ দেহে এক দুই স্টিকিং প্লাস্টারের পটি থাকে যাহাতে বুঝি সেই হে-স্ট্যাকের পাশে কম ধকল যায় নাই, দেখি কি যে সেই দিবসের সন্ধ্যা আসে এবং দূরে দূরে রাইফেল রাট্টাটারারা করে, লালাভ অগ্নিশিখা ইতস্তত ধাবিত থাকে এবং কে বা কাহারা ট্রেসার-বুলেট সকল ফ্রেডা-কাস্‌লের আকাশে পাঠায় যাহাতে এই প্যারাপেট, এই জঙ্গল, এই পুরাতন কামান ও গোলার পিরামিড এরূপ দেখাইতে থাকে এবং কদাচিৎ জানালার কাচেও আলোকিত হয় যে যাহাতে দেখি জন ও ডোনা মিইআ মুখামুখী বসিয়া ভীত কিন্তু সহাস্য বিয়ার পান করে।

দেখি যে দুম করিয়া এক বন্দুক ফোটে এবং সিলিং-এর এক চাংড়া খসিয়া পড়ে।

তৎকালে সে পরিবেশ জন জোয়াকিমের নিকট অভূতপূর্ব, অপূর্ব বোধ হইতে থাকে। সে ডোনা মিইআ ফ্রেডার সুবর্ণ-অলিভ ত্বক, তাহার অ্যাম্বর চোখ দুই যেন বা ক্ষণে ক্ষণে তাহাকে স্বপ্নে আবিষ্ট করে। এবং এরূপ হইল পঠিত গ্রন্থের বাক্য সকল তাহার মনে ফিরিতে থাকে। যেন বা শুনে এক ক্যাথিড্রাল চার্চে আর্গিন ট্রেমোলোতে বাজে, যেন বা সেই সে সন্ন্যাসিনী যিনি তাহার একজিকিউট্রিক্স বীণানিক্কনে কহে সুপুরুষ অসভ্য আমাকে লালিত কর। যেন বা তাহার অ্যাম্বর চোখে কী এক ভবিতব্যতা দেখা দেয়।

তখন জন পাশে লক্ষ্য করে এবং দেখে এই সে ডোনা যে হয় তাহার একজিকিউট্রিক্স যাহার পাণ্ডুর ঠোঁট দুইটি ক্ষণে ক্ষণে কাঁপে যাহাতে হাসি করুণা হয়।

পরন্তু এরূপ হয় যে সেনোরিনা ফ্রেডাও যেন বা আত্মবিস্মৃতা, হাত পা বাঁধা অবস্থায় দু হাত দূরের সেই নরমাংস ভক্ষণ সকল প্রত্যক্ষ করিলে যেরূপ থাকিয়া থাকিয়া ঘর্মাক্ত শিহরণ হয় তাহা তো আছেই, পরন্তু যেন সে কী এক সন্ন্যাসিনী যাহাকে এই অসভ্য উদ্ধার করে, এবং লালিতও করে বা। এরূপই হয় কেন না সেনর বেনিদিকো ক্যাস্টিগলিনোর সেই নরমাংস ভক্ষণকারী আশার কাব্য সেও তো পড়িয়াছে।

তৎকালে সে জন জোয়াকিমকে দেখে যেন বা যাহাতে এক অনিবার্য রক্তস্রোত তাহাকে আঘাত করে এবং সে ঠোঁট দুই ঈষৎ উন্মুক্ত করে এবং মৃদুভাবে হাঁপায়। অথবা কী এক নূতন তাৎক্ষণিকতা যাহা তাহাকে সলজ্জ এবং ইতোমধ্যে সানুশোচনা আকর্ষণ করে, যাহাতে সে হাত তুলিয়া নিজের

ঠোঁটে এক আর্তিকে চাপিতে চায়।

তখন জন ফ্রেডা বলিতে থাকে অথবা ডোনা মিইআ তুমি কি আবার বাহিবে ফিরিতে চাও? কিংবা নরমাংস ভক্ষণ এক্ষণে সমাপ্ত নয়।

পবন্তু সেনোরিনা শিহরিত হইতে থাকে কেন না ইহা তো তাহাই যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে এবং সহসা এক অত্যদ্ভুত ভবিতব্যতাই যেন তাহাকে এই কী অনিবার্যতাই টানিযা লয়। হায়, সে কি নিজেকে লুকায়, অথবা আর কি তাহা সম্ভব।

জন জোযাকিম যেন বা এক স্বপ্ন দেখে এবং কী এক পরম গভীব বিস্ময ডোনা মিইআর অ্যাম্বর চোখে ডুবিতে চাহে।

এবং তিনিই হন সেন্ট ইজাবেলা। কেন না অগ্নি সকল নির্বাপিত হইলে সেই মহতো মহিয়সীকে সদ্য কর্ষিতা বর্ষণশেষে ইক্ষু ক্ষেত্রগুলিতে দেখ যাহাতে জনসন ব্রুআরিস চলে, অথবা দেখ দ্রাক্ষা গুচ্ছগুলি রসভারে আনত হইলে স্তনভারাক্রান্তা তাহাকে স্মরণ হয়।...

পরন্তু এরূপ বলা হয় আদি জননীর ন্যায় তাহার প্রথম জাত কে কোথা হইতে বা তাহা কেহ জানে না এবং সে জনকে, জন ম্যাথুকে, ম্যাথু...এরূপে চলিতে থাকিলে ফ্রাইডে বংশও চলিতে থাকে..

তিনি সভ্যতা এবং নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে জলধারা সতত ঝরিতে থাকিলে সেই শ্বেতাম্বরা অশীতিপরাকে দেখ না কি?...

দিবসের বযস বাড়িতে থাকে তাহারা লাঞ্চে বসে, ঘবে ঘবে ঘোবে, ক্ষুদ্র মেটে স্নিগ্ধ আলোর লাইব্রেরিতে যায, বিষণ্ণ বৈকাল আসে, এবং তাহা সবই যেন এক দ্বীপে। কেন না চারিদিকে সেদিন অবিরত দুড়ুম দুড়ুম, বাট্টাটা টারারা প্রভৃতি চলিতে থাকে। এবং যেন বা দিবসে রাত্রি হয়, কাকগুলি ভয়ে ডাকাডাকি কবে এবং জানালায বারুদেব গন্ধ আসে, ধোঁয়াও ঘরে পাক খায।

ডকুমেন্টাবি নানাবিধ বহুতব সঙ্কেত সকল এই গৃহকোণ, এই যুক্ত শয্যার পালঙ্ক, এই দ্রাক্ষাস্তবকগুলি, এই বা খাঁচায় রাখা পক্ষীমিথুনের গ্রীবা কণ্ডুয়ন প্রভৃতিকে যে দেখাইবে তা সত্য, কেন না, হায়, তাহাদের সেই জটিল, আর্ত, হর্ষশিহবিত এবং প্রায পবিত্র পাপচিন্তাগুলিকে অন্য কিভাবেই বা ছবিতে দেখানো যায়। কারণ তাহাদেব মন এরূপ বলিতে থাকে।

ডোনা মিইআ ফ্রেডার মন। সেরূপই হয় নাকি পূর্বে যেরূপ হয়। না, না গো। আমি ভয় পাই। দেখ আমার গায়ে কাঁটা দেয়।...

জন জোয়াকিম ফ্রেডার মন। তোমাব চুলগুলিতে কী বাশি রাশি সোনা। হায়! সে স্ত্রীলোক আর সোনা আর স্ত্রীলোক...

ডোনা মিইআ ফ্রেডার মন। (সলজ্জ হাস্যে) তুমি একেবাবে অনভিজ্ঞ যে—জান না। অথবা তাহা কি হয় নতুন মানুষ? না, না, না গো...

জন জোয়াকিম ফ্রেডার মন। আশ্চর্য, আশ্চর্য। আমি অবাক আমি অবাক আর নতুন মানুষ সকল...আশ্চর্য কতই না...

ডোনা মিইআ ফ্রেডার মন। হায়, কী এ জোকস্টাবৎ, হায় কী এ জোকস্টাবৎ আর তখন কি স্মৃতি থাকে আর আমার গর্ব বোধ হইতে থাকে দেখ যে কী আমার গ্রীবা...

জন জোয়াকিম ফ্রেডার মন। তাহাকে চাই আর নতুন মানুষ আর তাহাকে আর নতুন কেন না তাহাকে চাই আর নতুনও...

ডোনা মিইআ ফ্রেডার মন। আর তাহা তখন তাৎক্ষণিকতা থাকে না আর হায় তাহা জোকস্টাবৎ আর একেবারে নতুন...

জন জোয়াকিম ফ্রেডার মন। বৃষ্টি হয় বৃষ্টি হয়...

ডোনা মিইআ ফ্রেডার মন। কীই বা করি শয্যা সে হয় অনভিজ্ঞ শয্যা অথবা তখন শয্যা অথবা মনকে পৃথক করি শয্যা. .

জন জোয়াকিম ফ্রেডার মন। আর নীল কী সুগভীর নীল তাহা আমার নীল আমার নিজস্ব সূর্যবিদ্ধ নীল. .

ডোনা মিইআ ফ্রেডাব মন। আর সে সুখী হয়...

জন জোয়াকিম ফ্রেডার মন। আর তাবপর এক মাছকে আমার জ্যাভেলিনে বিদ্ধ করি...আর মমি থাকি না।

ডোনা মিইআ ফ্রেডার মন। আর আমার স্মৃতি থাকে না অথচ আমি কিছু বুঝি না অথচ অনুভব করি আর সে আমাকে মোনাভান্না বলে...

জেফের কণ্ঠস্বর। হায এরূপে হয না, ইয়ো হো হো.

জেডের্ কণ্ঠস্বর। আমেন, জেফ, আমেন।

জেফের কণ্ঠস্বর। কী সাংঘাতিক দেখ উহারা বুঝি বা প্যারেপেটেও উঠে।

জেডেব কণ্ঠস্বব। আব আমাদের মিস্টা ফ্রেডাই কোথায় বা?

জেফের কণ্ঠস্বব। উহাবা প্যাবাপেটে, উহাবা প্যারাপেটে হায।

তৎকালে ডকুমেন্টাবি নানাবিধ বহুতর ফেড আউট মন্তাজ ইত্যাদি প্রভৃতির সাহায্যে যেন বা ফল অব বার্লিনই দেখাইবে যাহাতে সেই ঘনাযমান সান্ধ্য অন্ধকাবে চার্বিদিকে অজস্র মুহুর্মুহু বোম ফাটে, ট্রেসার বুলেট উঠে এবং আকাশে আলোর ফিতা পাতে, রাইফেল টটট তোৎলায়, শেলগুলিও প্রেত-কান্নায গোঙায়। আর তাহারা ঘবে ঘরে ঘোরে যেন যাহাতে এই কালো, এই কোমল ধূসব, এই বা শঙ্খ-উদরের প্যাঁচ হেন লোভানি লালবৎ সিঁডি যাহাতে তাহারা উঠে নামে এবং এমন যে জানেও না কোথায় যায়। তাহারা তো একবার এই প্যারাপেটে উঠিয়াই আসিল যেন বা এ নিমিত্ত যে কোন সিঁড়ি কোথায লয় তাহারা জানে না। যেন বা বাতাসেব জন্য হাঁপায় তাহারা এবং পুনরায় অন্য সিঁড়িতে দ্রুত নামিতে থাকে। .

জন ফ্রেডার আর্ত মন। হায, এইগুলি কি আমাকে দগ্ধ করে, আমাকে নিঃশেষে দগ্ধ করে?

এবং পুনরায় তাহারা দ্রুত সিঁড়ি সকলে নামিতে থাকে যাহাতে তাহারা জানেও না কোথায় যায় আর তখন যেন বা দেয়ালগুলি কাঁপিতে থাকে, যেন পৃথিবীর বুকে গুরু গুরু করে, যেন বা একই কালে কৌতূহলী এবং ভীতাও সে. .

জন ফ্রেডার আর্ত মন। আর কোথায় লুকাই এই আমার নিজস্ব নীল, এই সুঘ্রাণ নী[illegible] হায় আমি আমার সুঘ্রাণ নীল..

ডোনা মিইআ ফ্রেডা। এই তুমি আমাকে কোথাও লও, আমার ভয় করে, যেন বা বাতা[illegible]. .

ডোনা মিইআ ফ্রেডার মন। আর যেন বা এই আমাকে পাতালে লয় দেখ আমাকে পাতালে লয় যে আমার...

জন ফ্রেডার মন। আর সুঘ্রাণ আসে এই যেন মৃত্যুর রাজ্যে [illegible] আর সুঘ্রাণ আসে...

আর তখন তাহারা সেই নামার পথে যেন বা পাতালের পথে যেথায় তাহ[illegible] তাহারা কত না অজ্ঞাত সিঁড়ি সকল ভাঙিতে থাকে...

জন ফ্রেডার সাহসিক মন। আর আমি মমি থাকি না আর আমরাও সেরূপ থাকি না। এই আমার নিজস্ব নীল...আর আমরা নিজস্বে আসি।

আর তাহারা কত না পিচ্ছিল অলিন্দ সকল পার হইতে থাকে এবং যেন বা কাস্‌লের সেই পাতালে দেখে যে এক হয় স্ট্যালাকটাইট খিলান যাহা যেন মার্বেলে সোনার লিখন, দেখে তৃণ-লাইকেন মস, দেখে যে চুনের পাতাল নদী যাহা যেন মৃদু আলোকে ঝিকিমিকি করে।

জন ফ্রেডা। (স্বগত) আর আমি হয়ে ছাই তোমাবে লুকাই, আমি হয়ে ছাই আর বসন্ত আসে তাহার পর

ডোনা মিইআ ফ্রেডা। (স্বগত) আর তুমি সুখী হও, হয়তো দগ্ধাবশেষে ইক্ষুঅঙ্কুরগুলিও সুখী হয, ওগো আমার এঞ্জেল তুমি পাতালে লও

ডোনা মিইআ ফ্রেডাব সাহসিক মন (যাহা যেন বা গোপনে হাসে)। আব স্মৃতি কি মুছে না? না হউক, হে প্রথমজাত, তখন না হয বহু বহু এল এস ডি ব্যবহারে আমার মন আমাতে রহে না, না হয় মন বহে না

এবং সেক্ষেত্রে কাস্‌লের সেই পাতালে তাহারা যে সোপান সানুদেশে এক স্ট্যালাকটাইট নির্মিত এক অপরূপ উত্থিত খিলান দেখে, দেখো যে যেন বা কোথা হইতে সেই পাতালে কিছু সূর্যকর আসে যাহাতে খিলানের গাযে লাইকেন-মস ভেলভেট সদৃশ কোমল হইয়া রহে, দেখে খিলান বাহিযা মৃদু ধারা বহে যাহা যেন চূনা নদী—সে সকলই অবশ্য ডকুমেন্টারিতে স্থান পায় কেন না সে সকলই তো সেরূপ আবিষ্কৃত হয় এবং কি সেনর কুয়েপেচ্চি কি মঁসিয়ে রেনে মোবো বহু যত্নে কৌশলে ধৈর্যে যথাযথ একপ নিপুণতায ছবিতে তোলে যে যাহাতে সবই তাহাদের প্রযোজনীয় সঙ্কেত সকল হয়।

এবং সেরূপে সে অপূর্ব অদ্ভুত স্ট্যালাকটাইট চেম্বারেও যাহা যেন সে এক ঈশ্বরের পাদপীঠ, যেন বা স্বর্ণে বর্ণে লোভন শোভন সেই রত্নে রত্নে খচিত, যেন বা এক অলৌকিক ক্যাথিড্রাল চার্চের অভ্যন্তর যাহা আলোয আলোয ঝলসে তাবায় তাবায় উলসে, যেন যাহাতে সেই বিষাক্ত গ্যাসগুলি ফ্র্যাঙ্কিন্‌সেন্সেব ন্যায় উত্থিত হয়, তাহাও যথোপযুক্ত সঙ্কেত সকলই যে, সে বিষয়ে কি সেনর কুয়েপেচ্চি কি মঁসিয়ে মোরো ঐক্যমত থাকে। কেন না এই পবিত্র পাপে অগ্রজের আশীর্বাদ কি বর্ষণ হয় না, এবং তাহারা তখন ইক্ষুক্ষেত্রে প্রথম ধারা বর্ষণের দৃশ্য দেখাইবে।

তৎকালে কিন্তু জন জোয়াকিম ফ্রেডা আচম্বিতে অকস্মাৎ এক অজ্ঞাত ভয়ে শিহরিত হয় যেন, যেন বা এক বাতাস আসে এবং তাহাকে শীতার্ত করে যেন কেহ বা কাস্‌লের গোপন খিড়কি উন্মুক্ত রাখে এবং এক কাচের হলুদ চতুষ্কোণে জেড সে রূপেই অপর কাচেব চতুষ্কোণে জেফকে দেখে, যেন বা তাহারা বলে এরূপে হয় না।

পাঠক মহাশয়, জেফ যেন গুঁড়ি মারিয়া অগ্রসর হয়, এবং ভীত আর্ত জন হতাশ ব্যথিত সে সেই রৌপ্য পিস্তলের রৌপ্য বুটেল নিজের রগে মারে। শব্দ হয়। কিন্তু তাহাও তো নিরতিশয় পুরাতন এবং হয়তো তাহাতে বুলেট থাকেও না। গ্যাস পাক খায় যেন ফ্র্যাঙ্কিন্‌সেন্স।

ডোনা মিইআ ফ্রেডা। হায়, হায় হায়।

তাহার রোদনসিক্ত মন। হা জিউস, হা প্রথমজাত আব দগ্ধ হইতে থাকি এবং শৃঙ্গে বাহিত হই না।

তৎকালে এক প্রচণ্ড শব্দের প্রতিধ্বনিতে যেন বা স্ট্যালাকটাইট চেম্বারের দেয়ালগুলি নামিয়া আসিতে থাকে যাহাতে গুঁড়িমারা জেফও চাপা পড়ে কেন না এরূপে ডকুমেন্টারি প্রয়োজন মতো ভায়োলেন্ট ও সেক্সি হয়।

বিল অ্যাটকিন্‌সন এদিকে দূরবীনের অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু ঘুরায়। সে দেখে প্যারাপেটের উপরে কামানেব ভারি পশ্চাদ্ভাগে মঁসিয়ে রেনে মোরো এবং তাহার সম্মুখে পাথরের চাতালে এক কাঠের বাক্সে সেনর গুইল্‌এলমো কুয়েপেচ্চি। তাহারা আপন আপন ব্র্যান্ডের সিগারেট ধরায় এবং ধোঁয়া

উড়াইয়া দেয়। আকাশে যাহা সুগভীর এবং বিষুবালয়েব যথোপযুক্ত নীলই তাহাতে কয়েক খণ্ড শ্বেতশুভ্র সাইরাস মেঘ ভাসে বা। তাহাদের ঘিরিয়া যে শেষ বসন্তের আলোক তাহা আজ কিছু উত্তপ্ত এমন বোধ হয়, কেন না বোধ হয় কোথাও মেঘ জমিতেছে। হাঁ, বর্ষার পূর্বেই ডকুমেন্টারির কাজ শেষ হওয়া আবশ্যিক। উহাদের পাশে ক্যামেরা ইত্যাদির দাঁড়া প্রভৃতি দেখা যায়। তাহাদের টেরিলিনের অতি সুদৃশ্য কামিজে মৃদু হাওয়া লাগায় তাহারা কাঁপিতে থাকে।

উহারা যাহা জানে না তাহা এই যে ফ্রেডা-কাস্‌লের সর্বত্র এরূপ সংবাদগ্রাহক যন্ত্র সকল বসানো থাকে যাহা অদৃশ্য পবন্তু অতি সতর্কভাবে বুড়া অ্যাটকিন্‌সনের এই খাস-কামরায় এক রেডিও যন্ত্রে লুক্কায়িত মাইক্রোফোনে তাহারা যে কিছু কথা বলে আলোচনা কবে রসিকতায় হাসে সে সকলই নিখুঁতভাবে উচ্চারিত হইতে থাকে। তাহা প্রয়োজনেরও বটে কেন না তাহারা তো বিদেশী এবং ডকুমেন্টারি বিদেশে সর্বত্র দেখাইবার যে অধিকাব ট্যুরিস্ট ব্যুরো এবং একমাত্র তাহাবই থাকে তাহাতে কোনো প্রকাবে হানি না ঘটায় তাহারা, তাহা দেখাও ইতিকর্তব্যতাই তো। পরন্তু আমাদের এই পৃথিবীর অর্ধাংশ এই এখানে কি ঘটিল তা জানিতে দেখিতে উত্তাল উদ্দাম।

তৎকালে তাহারা সেই পরিচালক ও স্ক্রিপ্ট-রাইটাব আলাপন করে।

কুয়েপেচ্চি। মঁসিয়ে মোবো।

রেনে মোরো। (সে যেন বা এক ভারি বড় চেহারাব পুস্তক পাঠ করে) আজ্ঞা করুন মন আমি সেনর কুয়েপেচ্চি।

কুয়েপেচ্চি। আ জ্বালালো! (সে হাত দিয়া মুখের সম্মুখে কিছু তাড়ায়)।

বেনে মোবো। (সে মুখের সম্মুখ হইতে বই সবায় এবং সিগাবেটেব ধোঁযা ছাড়ে) মৌমাছি বুঝি পুনরায়। এই মৌমাছিগুলি..

(কুয়েপেচ্চি পুনবপি সেরূপ হাত চালায় যাহাতে ঠোক্কর খাইযা এক মৌমাছি চিৎ হইয়া পড়ে, পা-গুলি নাচায়, উদর দেখায় যেন বা হুলাহুলা জানে, উড়িযাও যায়।)

কুয়েপেচ্চি। হাঁ ইহা ইক্ষুপ্রধান ও দ্রাক্ষাপ্রধান দ্বীপ। সেজন্য মৌমাছির কিছু প্রাদুর্ভাব। (সে হাতেব সিগারেটের গোড়া দুই আঙুলের মধ্যে ঘুরায যাহাতে তাহার কিছু অংশ গুঁড়া হইয়া ঝবে কিন্তু সে মৌমাছি লক্ষ কবে না) মঁসিয়ে আপনি কি কাল স্মিথসন ডিপার্টমেন্ট স্টোরে দাগি সিল্ক থানগুলি দেখিয়াছেন যাহাকে নাকি তাসউর বলে।

রেনে মোরো। হাঁ সেগুলিব সুতো অসমান, বুনোট মসৃণ নয়।

কুয়েপেচ্চি। সেগুলি শুনি দুষ্প্রাপ্য ভারতীয় সিল্ক যাহা স্মিথসন কাস্টম্‌সকে বলা দেখাইযা সংগ্রহ করে।

রেনে মোবো। তাহা হয় শুনি। এবং ফ্যাশনেব্‌লও কিন্তু তাহা কি পিছাইযা যাওয়া নয় সেই মোটা বুনটের তাসউর।

কুয়েপেচ্চি। হো, মন আমি, ওয়ান্ট বিগ্যাট গুডস্‌ বিগ্যাট ফ্যাশন বিগ্যাট সিবিলাইজেসন...

রেনে মোরো। হঃ

কুয়েপেচ্চি। (কিছু চিন্তা করিয়া সহাস্যে) এবং তাহাও ফ্যাশনই নহে কি? সেই নান্‌ ইজাবেলা যাহাকে দগ্ধানো ইক্ষুক্ষেত্রের নবাঙ্কুরকে লালিত করিতে দেখা যায় এরূপ শুনি এবং বা এই ডোনা মিইআ যে নরমাংস ভক্ষণের পর সেন্ট মোনাভান্না ইদানীং হইতে চলে ইহারা কি উভয়ে তৎকালীন ফ্যাশনের ললামভূতা নন?

(সে সিগারেটে টান দেয় এবং নিজের আবিষ্কারে খুশি যে এমন হাসে। রৌদ্রে হাত মেলে যাহাতে আঙুলগুলি রূপালিবৎ চক্‌ চক্‌ করে।)

রেনে মোরো। (বই হইতে মুখ না তুলিয়াই) But all I could make use of was all that

was valuable I had enough to eat and to supply my wants, and what was all the rest to me? If I killed more flesh than I could eat, the dog must eat it, or the vermin If I sowed more corn than I could eat, it must be spoiled The trees that I cut down were lying to rot on the ground I could make no more use of them than for fewel, and that I had no occasion for but to dress my food

কুয়েপেচ্চি। হাঃ হাঃ এক্লিজিয়াস্টেস?

রেনে মোরো। হোঃ হোঃ তাহা নয়।

কুয়েপেচ্চি। অ হো, বুড়া সেই ওয়ালডেন? হেঃ হেঃ

রেনে মোরো। আ সেনর গুইল্এলমো কুয়েপেচ্চি, ইহা হয় রবিন্সন ক্রুশো বাজসংস্করণ, পৃষ্ঠা ১২৮।

কুয়েপেচ্চি। (হঠাৎ তাহার মুখ কিছু বিবর্ণ হয় পরে সে নিদারুণ হাসে) ওঃ মঁসিয়ে মন আমি আপনি একেবারেই দ্বীপের লোকগুলিকে সার্থক অনুকরণ করেন দেখি। হাঃ হাঃ

কিন্তু তৎকালে তাহারা যে বিশেষ কিছু এককে অপেক্ষা করে তাহা বোঝা যায় কেন না শুটিংও শুরু হয় না—তাহারাও একরূপে সময়ে গড়াইয়া চলে।

কুয়োপেচ্চি। (হাসিতে হাসিতে পাথরের চাতালে গা ঢালে) আচ্ছা মঁসিয়ে মোরো, আপনি কি রুপার পিস্তল ও রুপার গুলি সম্বন্ধে কিছু কি সিদ্ধান্তে পৌছান? তাহা যেন এক প্রতীক কিন্তু কী বা তা বুঝি না। কেনই বা ৭২৭ ডন সিবাস্টিনো রুপার পিস্তল লইয়া চলে কেনই বা জন জোযাকিম শেষে রুপার বুলেট চিন্তা করে?

রেনে মোরো। সেনর কুয়েপেচ্চি বন্দুক মাত্রই কি এক অবর্ণনীয় শক্তির উৎস হয় না।

কুয়েপেচ্চি। হাঁ। তাহা বহু জাতির ভাগ্য নির্ণয়েও শেষ কথা।

রেনে মোরো। পরন্তু বন্দুক মাত্রই কি ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত শক্তি ও প্রভাবের সীমা অসম্ভব রকমে বাড়ায় না?

কুয়েপেচ্চি। হাঁ, হয়। কিন্তু তাহাতে বা কী?

রেনে মোরো। যেন বা তাহার পুরুষত্ব বৃদ্ধি পায়। যেন বা তাহার বাহু দৈর্ঘে শত শত গজ হয়।

কুয়েপেচ্চি। কিন্তু প্রেমের সাহায্যে তো নিজের পুরুষত্ব জাহির করা সম্ভব, মনে করি লর্ড রাসেল। তিনি তো লন্ডনে বসিয়া অস্ট্রেলিয়ার কাহারো হৃদয় আক্লেশে চাপিয়া ধরেন।

রেনো মোরো। হয়তো বা অ্যাডোলেসেন্স পার হওয়ারও এক প্রশ্ন থাকিয়া যায়। মন সেরূপ পার হইলে হযতো বা প্রেমের কথা ভাবে।

কুয়েপেচ্চি। (চিন্তা করিয়া) অবশেষে মঁসিয়ে মন আমি ইহাকে ফ্রয়েডীয় থিসিসে কী ভাঙা যায়? এই বাহুর সবলতা ও দৈর্ঘ বৃদ্ধির স্বপ্নকে যাহা পিস্তল ইত্যাদি পূর্ণ করে?

রেনে মোরো। (বিস্মিত হইয়া) সেনর আপনার এই মত আমাকে চমকিত করিল। ইহাই কি হইবে যে ডোনা মিইভার সম্মুখে জন ফ্রেডা যে রূপার বুলেট চিন্তা করে তাহাও ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে বিশ্লেষণ করা যায়?

রেনে মোরো বই ভাঁজ করিয়া রাখে এবং সিগারেট ধরায়, ভ্রূকুটিও করে এবং হাই তুলে। এই শেষ বসন্তের উষ্ণতা তাকে যেন আরাম দিতে থাকে।

কুয়েপেচ্চি। (সেও আগের সিগারেট হইতে নতুন সিগারেট ধরাইল) দেখুন, দেখুন মন আমি এবং কী সুগভীর নীল ওই সমুদ্রের বাঁক।

রেনে মোরো। (সে জন ফ্রেডার সেই নিজস্ব নীল দেখে যাহা জানিতে তার সুযোগ নাই এবং অবাক হয়) অহো, ইহা অনবদ্য। অহো, ইহা তুলনাহীন।

কিন্তু কিছু পরেই তাহারা পুনবায আলাপ করে কেন না তাহারা যৎপরোনাস্তি নাগব সংস্কৃতিতে অভিষিক্তও বটে তো এবং হয়তো বা এরূপ নীল অন্যত্র দেখে।

কুয়েপেচ্চি। আচ্ছা মঁসিযে, সে বিষযেও কিন্তু আমাদেব শেষ চিন্তা হয় নাই।

রেনে মোবো। কোন্‌টির কথা বা বলেন।

কুয়েপেচ্চি। লাকি ওয়াল্টাব।

রেনে মোবো। বলুন। শুনিতেছি।

কুয়েপেচ্চি। আমাদের স্ক্রিপ্টে আছে সে জলনিকাশেব পুবানো প্রণালী দিয়া কাস্‌লে প্রবেশ করে।

রেনে মোবো। আমরা এক বিষয নিশ্চিত যে তাহাব সেই বৃদ্ধ দেহকে বুড়া লাকি ওয়াল্টাবেব বলিযা সনাক্ত করা হয়। এবং তাহা স্ট্যালাকটাইট চেম্বাবে পাওযা যায।

কুয়েপেচ্চি। যেন বা শেষ অঙ্কে তাহাবা সকলে একত্র হয়। কিন্তু .

রেনে মোরো চিন্তা কবিতে থাকে। কুযেপেচ্চিও সেরূপ কবে পরন্তু দুই আঙুলে কিছু খড়কুটা তুলিযা উড়াইয়া দেয। কিন্তু তৎকালে এক অভূতপূর্ব ব্যাপারে তাহাবা উভয়েই চমকিয়া উঠিল। কারণ সেই ফাটলে, যাহাতে মুখ বাখিয়া জন ক্রেডা সিংহবৎ গর্জন করে এবং যাহা যে সেখানে আছে সে তাহাবা জানি ঃ ·', তৎকালে তাহাতে এক ভীষণ বিকট ঘোকোঁকোঁ শব্দ উঠে। এরূপ হইল যে উভয়ে উভযের বিবর্ণ মুখ দেখে এবং যেন কাঁপিয়া উঠে।

অল্প পবে অবশ্যই কুযেপেচ্চি হাসিযা ফেলে এবং বলে গর্দভ! কিন্তু এই ধ্বংসে সে বা কোথায আসে? হাঃ হাঃ হাঃ।

বেনে মোবো। গর্দভ যে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঠিক আশা কবা যায না তো। সেনব, আমাব পিত্তপ্লীহা নড়িয়া গেল।

কুযেপেচ্চি। কাস্‌লটির গঠন বিশেষ কৌতুকের। কোথাও বা দ্বিতল এক তলেবও নিচে। হযতো কোনো এক ঘবে বেচারা আটকাইযা গিযাছে।

বেনে মোবো। হয়তো সেখানে গাজব প্রচুব এমন যে কখন দেযাল ধ্বসিযা পথ বন্ধ হয তাহা বুঝে নাই। আহা বেচাবা। হেঃ হেঃ।

কুয়েপেচ্চি। (সহাস্যে) অথবা গাজর খায় যে যে-দবজায় ঢুকে, বাহিব হইতে এখন তাহাতে পেট আটকায়। আহা বেচাবা! হাঃ হাঃ।

তৎকালে কুয়েপেচ্চি কোটেব পকেট হইতে এক চ্যাপ্টা ফ্লাস্ক বাহিব কবে এবং তাহাবা বিযাব পানের ব্যবস্থা করে।

রেনে মোরো। (বিযাব পান করিতে থাকাকালে) আমবা কিন্তু লাকি ওয়াল্টারেব কথা বলিতেছিলাম।

কুয়েপেচ্চি। হাঁ। এমন মনে হয স্ট্যালাকটাইট চেম্বাবের কথা জন ক্রেডাও জানিত না। ভীত তাহারা আশ্রয় খুঁজিতে ইতস্তত চলিতে থাকাকালে হঠাৎ সেখানে পৌঁছে। এখনও কত গ্যাস সেখানে!

রেনে মোরে। হয়তো সেরূপ অসম্ভব নয়।

কুয়োপচ্চি। হযতো লাকি ওয়াল্টারেব সেরূপ হয়। হয়তো এখন ধ্বসিয়া গিযাছে এমন কোনো পথে সে অন্য কোনো গুহায় চলিতে এই স্ট্যালাকটাইট চেম্বারে ঢুকিয়া পড়ে। ক্রুশোব উপন্যাসে এক স্ট্যালাকটাইট গুহার কথা আছে যেখানে বৃদ্ধ ছাগেবা শেষ নিশ্বাসের শান্তি খোঁজে।

রেনে মোরো। সেনর কুয়াপেচ্চি, পেগি ডগলাককে জিজ্ঞাসা কবা হইবে কি? (সহাস্যে) দেখা যাক। কিন্তু গর্দভটি আমার বুকে কাঁপন ধরাইয়া দিয়াছে।

কুয়োপেচ্চি। (হঠাৎ যেন চিন্তায় কিছু আবিষ্কার করে) উহাকে কি প্রতীক রূপে ব্যবহার করা যায়? এই গর্দভ!

রেনে মোরো। হঃ হঃ হঃ

কুযেপেচ্চি। ঠিক মনে আসে না। কিন্তু কী এক অপূর্ব জীব, হাঃ হাঃ হাঃ

রেনে মোবো। কিরূপ প্রতীক মনে কবিতেছেন, সেনব? হেঃ হেঃ হেঃ

কুযেপেচ্চি। কেহ যেন গাধায চড়ে। হাঃ হাঃ

রেনে মোরো। অনেকেই চড়িয়া থাকিতে পারে। হেঃ হেঃ

কুযোপেচ্চি। (আপন মাথায় তর্জনী দিযা মৃদু টোকা মাবে) না, মনে পড়িল না। না, বিযাব কিন্তু ভালোই। আর একটু নিন।

সহসা তাহারা সমস্বরে হাহা হিহি কবিয়া হাসিতে থাকে। হাসি থামিলে বেনে মোরো বলিল, না সেনব গুইলএলমো কুয়েপেচ্চি, এরূপ নিদারুণ প্রতীক ব্যবহারেব চেষ্টাও কবিবেন না।

হাঁ, এখন আবাব এইরূপে ডকুমেন্টারি তোলা হয় যে তাহাতে সন্দেহ করি না। এবং আমাদেব এই পৃথিবীর সর্বত্র তাহা দেখাইতে কনট্র্যাক্ট ইত্যাদিও লিখিত হইতে থাকে।

এখন তো বেলা দশ বাজে, এবং শেয বসন্তের উজ্জ্বল আলো বুড়া অ্যাটকিন্সনেব খাস-কামরাব টেবলে পড়ে। সে তাহার নারদ-দাড়িতে হাত বুলায়, এবং মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলিল যেন বা সে কিছু ক্লান্ত। তাহাব কি উইল অ্যাটকিন্সন জুনিয়াবেব কথা মনে পড়ে।

তদবস্থায় তাহাব খাস-কামরায় সপ্তদশ রবিন্সন প্রবেশ করে। অ্যাটকিন্সন ঝটিতি দূরবীন হইতে চোখ সবায়, এবং তাহাব টেবলেব উপবে রাখা যন্ত্রটি যাহাতে ফ্রেডা-কাসলের আলাপগুলি তেমন নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে তাহাকে পাশেব ঘবে বাখা নিঃশব্দ ডিক্টাফোনে পুরিযা দেয। ফলত কী যে আলাপ হয় তাহা নির্ভুলভাবে সেথায় গৃহীত থাকিবে কিন্তু সপ্তদশ ববিন্সনের বা অন্য কাহারো জানিতে উপায় থাকে না।

অ্যাটকিন্সন। (সহাস্যে) আসুন আসুন সপ্তদশ রবিন্সন।

রবিন্সন। (সহাস্যে) আ মিস্টাব অ্যাটকিন্সন, আর কেন? এই সকল পুরাতন জীর্ণ বাজকীয়তায় আর কী বা প্রয়োজন। হেঃ হেঃ। এক্ষণে এই নতুন দিনে আমি প্লেন মিস্টার ববিন্সন।

অ্যাটকিন্সন। হোঃ হোঃ হোঃ প্লেন মিস্টাব ববিন্সন। প্লেন মিস্টাব হোঃ হোঃ।.. কিন্তু আপনাব পিওর গোট মিল্ক চিজের বা কি হয়?

ববিন্সন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

হাঁ, এখন তো কিছু ঘটিয়াছেই এবং ডকুমেন্টারিও হয় এবং তাহা আমাদের পৃথিবীর সব দেশেই দেখান হইবে এবং অবশ্যই ভ্রমণকারিগণ আরও ভ্রমণকারিগণ, এবং অধ্যাপক ও গবেষকগণ— তাহারাও আসিতে থাকিবে। কী বিপুল সেই অত্যাশ্চর্য জনস্রোত যাহা কি অ্যাটকিন্সনের প্যাকেট জাহাজগুলিতে এবং তাহার হোটেল কয়েকটিতে কিনারা করিতে পারে?

অ্যাটকিন্সন। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ

রবিন্সন। হাঃ হাঃ হেঃ হেঃ হাঃ হাঃ

বলিল : হে প্রভু ঈশ্বর যে তুমি আলোক হও বল এবং আলোক হয় এবং তুমি শয়তান সকলও সৃষ্টি কর এবং বধ হও বলিলে বধ হয় পরন্তু তাহা বল না কেন না তুমি শয়তানকে অনুতপ্ত দেখিতে চাও।

গল্প

প্রাচীন

বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করে কোন কোন নগর পত্তনের মুহূর্তটা নিষ্ফল হয়। সে যেন চোরাবালির উপরে ঘর তোলা। কিন্তু যারা নগর পত্তন হচ্ছে বলেই সেই নগরে গিয়ে ঘরদোর তুলে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করতে চায় তারা অনেক সময়ে বিশ্বাস করে না সমাজের চাহিদার যে জোয়ার এই নতুন সীমা ছুঁয়ে যাচ্ছে সেটায় ক্ষণপরেই ভাঁটার টান লাগবে।

বুরহানাবাদ এমনি একটি নগর। আর একটি শহরের উপান্তে দেখ দেখ করে এই নগর স্থাপিত হয়েছিল জঙ্গল কেটে জাঙ্গাল বুজিয়ে। বর্তমানে ইট আর সুরকির ধ্বংসস্তূপগুলি দেখলে মনে হয় সৌধ ইত্যাদি স্থাপিত হয়েছিল এই অপয়া শহরে, যার ফলে বুরহানাবাদের জঙ্গলে যে ধুলো ওড়ে বাতাসে জোর লাগলে সেটা লালচে রঙের।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে কাঠের কনট্রাক্ট নিয়ে এই নগরে গিয়েছিলাম। শালগাছের আদিম জঙ্গল ভেবে কাজে নেমে ধুলোর রং দেখেই প্রথম আমার মনে হয়েছিল, জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে যে সব রাস্তার ভগ্নাবশেষ চোখে পড়ে সেগুলি ধরে হাঁটতে সুরু করলে জঙ্গলের মধ্যেই কোথাও লোকালয় পাব। এবং সেই লোকালয়ে বাঁশ পাওয়া যেতে পারে এই আশায় শালের জঙ্গলের ওপারে বুরহানাবাদে গিয়েছিলাম। আর এখানে আমি রামময়ের দেখা পেয়েছিলাম।

রামময় বৃদ্ধ। তার মাথায় চুল নেই, গোঁফদাড়ি নেই, দাঁতগুলি কোন কালে ছিল এমন কল্পনা করা যায় না। দেহের ত্বক মোমের মতো মসৃণ। স্রোতে ধোয়া পললশিলার মতো একটি গোলালো কোমলতার কথা মনে পড়ে তাকে দেখলে। বয়স আশির উপরে যে কোন জায়গায় ধরা যায়।

রামময়ের বাড়ি ধ্বংসস্তূপগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তার বাড়িটিতে আমার আপনার মাথা গলাতে ভয় করবে। কিন্তু একটা তুলনার উপাদান পেয়ে মনটা খুশি হয়ে উঠল। রামময়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তার বৈঠকখানাটি আশ্চর্যরূপে কালের স্পর্শ প্রতিহত করেছে। তার অর্থ এই নয়, সেটি নবীনত্ব ঘোষণা করছে। সেই ঘরখানিতে একটি শ্বেত পাথরের টেবিলের পাশে দুখানা হাতির দাঁতের কিংবা হাড়ের তৈরি চেয়ার আছে। চেয়ার ও টেবিলে কিছু ফাটল অবশ্য চোখে পড়ে। দেয়ালের গায়ে একটি ঘড়ি আছে যার দুপাশে আদম ও ইভের বড়সড মূর্তি দুটি আছে। হাঁপানির হাসির মতো একটি শব্দ করে ঘড়িটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মনে হল দশটা বাজবার চেষ্টায় আছে সেটা। বৈঠকখানার চার দেয়ালের অন্তত একটি তখনও মার্বেল পাথরের মতো চকচক করছে। যদিও অন্যগুলি বৃষ্টির চোঁয়ানিতে বিবর্ণ এবং কোথাও কোথাও আস্তরও খসে পড়েছে। চারিদিকের তুলনায় রামময়কে এমনি কতকটা চকচকে দেখায়। এমন কি রামময়ের দেহের সর্বত্র বিরাজিত স্থবিরতার মধ্যে তার প্রায় ঋজু দৈর্ঘ্য, এবং তার সংস্কৃতবহুল রসিকতার মধ্যে হঠাৎ বিক্ষিপ্ত দুএকটি ইংরেজি শব্দের বিশুদ্ধ আঘাতযুক্ত উচ্চারণ।

আমি থাকতে থাকতে ঘুন্টি বাজাতে বাজাতে একজন লোক এল সাইকেলে। পোস্ট অফিস এখানে? দেখলাম রামময়ের বৈঠকখানাই পোস্ট অফিস। যে ডাক নিয়ে এল তাকে রানারই বলতে হয়। সে একটা কিছু দিয়ে ডাকের থলেটা কাটল। একটা হলদে কাগজে জড়ানো চার পাঁচখানি চিঠি, একখানা ইংরেজি খবরের কাগজ, একখানা মনি অর্ডার। রামময় চিঠিগুলির ঠিকানা পড়ে দুখানা চিঠি ও খবরের কাগজটা সরিয়ে রাখল, বাকি চিঠিগুলির ঠিকানা বুঝিয়ে দিল রানারকে,

মনি অর্ডারটি কোন এক লুৎফা বেওযাব, তাকে খবব দিতে বলে দিল রানারকে।

আমার একটু কৌতূহল হল। চিঠির বাক্স দেখিনি, ডাকঘরের অন্য কোন সরঞ্জামও নয়। এখন দেখলাম রামময় তাব টেবিলের উপর থেকে খানকয়েক চিঠি নিয়ে সিল দিয়ে একটা বড় হলদে কাগজে জড়িযে বানারকে দিল, সেও অভ্যস্ত হাতে ডাকেব থলিটা বেঁধে নিযে সাইকেলের ঘুন্টি বাজাতে বাজাতে চলে গেল।

ডাক আসবাব আগেই রামমযেব সাথে খানিকটা আলাপ হযেছিল। রানার চলে যেতেই রামময় খবরের কাগজটা আমার হাতে দিয়ে বললে,—আপনি কাগজটা নিযে একটু বসুন, আমি আসছি।

কাগজটি একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের। আজকাল অফিসার মহলে ছাড়া এটার সমাদর নেই, কারণ ভারতীয়দের নিন্দা করেই এরা প্রতিপন্ন করতে চায় এরা ভারতবন্ধু। আমি দেশসেবক নই কিন্তু এসব কাগজকে এবং যারা কাগজ পড়ে তাদের ভালো চোখে দেখি না। ভেবেছিলাম রামময় ফিরে এলে তাকে এসব কাগজের বিরুদ্ধে কিছু বলব, কিন্তু উদ্‌ভ্রান্তের মতো মুখ করে রামময় যা বললে তা শুনে কাগজ প্রসঙ্গ উত্থাপন করা গেল না। (রামময়কে প্রশ্ন করলে সে হয়তো কাগজের কথায় বলত—ত্রিশ বছরের অভ্যাস, কী করি বলুন। অভ্যাসের দোহাই দেয়া অনেক বৃদ্ধেরই অভ্যাস, আর এইসব টুকিটাকি ব্যাপারে টুকলে তারা বাস্তবিকই কষ্ট পায়।)

রামময় বললে—কাল একটু আসবেন, আমি আজ বড়ই বিপন্ন, একটু চা খাওয়াতে পাবি এমন ব্যবস্থা নেই।

এরপর না-না-সে-কিছু-নয় বলে আমি উঠলাম। কিন্তু তার অনুরোধের আতিশয্যে আবার তাব বৈঠকখানায় যাবার প্রতিশ্রুতি দিতে হল। অবশ্য সেটায় নিছক ভদ্রতাই ছিল না। রামময়ের গ্রামে কাঠেব প্রাচুর্য আছে, বাঁশও যথেষ্ট। সস্তায় যদি সেগুলি কাটার সুযোগ পাওযা যায় তবে এই সৌজন্য বিলক্ষণ লাভজনকও হবে।

নিজের তাঁবুব দিকে ফিরতে ফিরতে আমার একটা কথা মনে হল : এই দক্ষিণবায় ও বনবিবির দেশে ইংরেজি খবরের কাগজ থেকে যার সংবাদ সংগ্রহ করতে সাধ যায় সে লোকটিকে একেবারে সেকেলে মনোবৃত্তিসম্পন্ন বলাটা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হবে না। কিছুদিন পরে আলাপের এক ফাঁকে বামময়কে বলতে শুনেছিলাম—দিশি কাগজ ভালো নয়, তা নয়। কিন্তু তাতে শুধু ভারতবর্ষেব খবরই থাকে, ওদিকের খবব বড় একটা দেখিনে।

কথার কথা নয় শুধু, বনবিবির দরগায় পূজাও আমি এ গ্রামে দেখেছি, সাধারণ নয়, বার্ষিক। একটা প্রাচীন শিমুল গাছের তলায় কারো একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত কবর। সেই কবরে ঘেঁটু ফুল, কখনো বা বুনো টগর এনে রেখেছে গ্রামবাসীরা, কলাপাতায় করে দুটি একটি বাতাসা। কিছু দূরে একটা মেলাও বসেছে। ত্রিশ চল্লিশ জন হবে, আবালবৃদ্ধ নরনারী মিলে, ক্রেতা বিক্রেতার সংখ্যা জুড়লে। পণ্যগুলি লক্ষ্য করলাম। মাটির হাঁড়ি, সানকি প্রভতি মেলার মুখ্য পণ্য ; একজন মাটিতে চট বিছিয়ে কিছু বাতাসা নিয়ে বসেছে, আর একজন বিক্রেতা একটি গরুর গাড়ী করে ডাব নিয়ে এসেছে। দেখলাম রামময় শুল্ক আদায় করে লাল নীল কাগজের টুকরোয় রসিদ দিচ্ছে বিক্রেতাদের। আর সেদিনের সেই রানার বিবির পূজার মন্ত্র পড়ছে, পূজার্থীরা এলে।

যাক সে কথা, গল্পের পূর্বাপর হিসাবে রামময়ের বাড়িতে আমার চায়ের নিমন্ত্রণের কথাই বলতে হয় আগে।

আমি ঔদরিক নয়, কিন্তু নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে আমার মতামত আছে। আমার ধারণা, কাউকে যদি চায়ের নিমন্ত্রণ করতে হয় তবে নিমন্ত্রণকারীর জানা উচিত ভালো চা কাকে বলে এবং কীভাবে তার থেকে পানীয় প্রস্তুত করা যায়। এ যার জানা নেই তার পক্ষে চায়ের নিমন্ত্রণ জানানো এক ধরনের পীড়ন, কিন্তু যেহেতু সমাজে বাস করি মাঝে মাঝে তাও সহ্য করতে হয় বৈকি, যেমন

সাহিত্যের মলাটের ভেতরে পাওয়া মনঃসমীক্ষণের নামে পূতিগন্ধি কিছু। রামময়েব বৈদেশিক সংবাদ প্রীতি আমাকে বিস্মিত কবতে পারেনি, কারণ আমার মন স্বাজাত্যবাধের বর্ম পড়েছিল, কিন্তু তাব চা আমাকে বিস্মিত করল। অবশ্য চা আমাকে নিজেই তৈরি করে নিতে হল, কারণ রামময়েব বাড়িতে হোস্টেস কেউ ছিল না। সেই ঝকঝকে চায়ের বাসনগুলি যে রামময়ের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে থাকে তাতে সন্দেহ নেই। কাপগুলিতে সূক্ষ্ম ফাটলের দাগ দেখে আমার মনে হয়েছিল প্রাচীনেব ধ্বংসাবশেষেব কথা, কিন্তু পবে নিজের তাঁবুতে ব'সে মনে হল চায়নার' (চীনেমাটির বাসনেব) আভিজাত্যের নিদর্শনের একটি যেমন সিঁদুর রঙের আভাসে আঁকা ছবি, তেমনি ওই সূক্ষ্ম ফাটলেব দাগ, একথা যেন কোথায় পড়েছি ঊনবিংশ শতকের কোন এক গ্রন্থে। রামময়ের বাড়িতে সেদিন চা খেয়ে আমি তৃপ্তি পেয়েছিলাম। কিন্তু অনেক বেশি চা খেল রামময় নিজে। আমি বলতে যাচ্ছিলাম আমার তৃপ্তির কথা, রামময় তার আগেই বলল—বড় তৃপ্তি পেলাম, এমন চা অনেকদিন খাইনি। নিজের আতিথ্যেব এটা নির্লজ্জ প্রশংসা হতে পারত, যদি না তার চা খাওয়াটা আমি নিজেব চোখে দেখতাম। আমার এক পার্টনার একবার এক বন্যায় তৈরী দ্বীপে আটকে পড়েছিল, তাকে উদ্ধাব কবে যখন তাকে একটি চুরুট দিলাম তখন সেই চুরুটবিরহীর মুখে এমন তৃপ্তি দেখেছিলাম বটে। চায়েব আর্টে ঊনবিংশ শতকের কোন ভিকটোরিয়ান কুমাবীর মতো রামময় খুঁতখুঁতে।

অবশ্য রামময় সম্বন্ধে আমাব ধাবণা বদলাচ্ছে, এমনকি এই যে তাব কথা বলছি, এখনও। তাব সম্বন্ধে শেষ কথা কী হবে তা ভাববাব আগে তার সম্বন্ধে যে গল্পটি শুনেছিলাম তাব কথা বলে নেই। গল্পটি তার বিগত বৈভব সম্বন্ধে। রামময়ের দিন ভালো ছিল বললে—যথেষ্ট বলা হয় না। বামময় অর্থশালী ছিল, ক্ষমতাশালী ছিল। যখন এই শহরের লোকবা ক্রমশ অন্যত্র চলে যেতে লাগল তখন বামময় তাদের অনেকের যাওয়া ত্বরান্বিত কবেছিল। তাদের অনেকেই রামময়েব কাছে ঋণ নিয়েছিল, সেই ঋণের নালিশে রামময় তাদেব স্থাবর অস্থাবরের উপব নিজের অধিকার বিস্তার কবতে লাগল। যাবা ঋণী নয় তাবাও বামময়কে ক্রেতা হিসাবে পেল। এমনি কবে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বুরহানাবাদের এক-তৃতীয়াংশেব মালিক হয়েছিল বামময়, সেই ম্যালেরিয়ার মড়ক লাগবার আগে।

বামময়ের নিজের বাড়িতে তখন অনেক লোক—দাসদাসী, আত্মীয় পরিজন, অতিথি। তার স্ত্রী এবং একমাত্র ছেলে। রামময়েব সন্তানভাগ্য ভালো। গ্রামের অতিবৃদ্ধ কৃষকরা বলতে পারে এখনও, রামময়ের বড়ছেলে নাকি রাজপুত্রের মতো ছিল রূপেগুণে ; অর্থাৎ সে রূপবান ছিল, তাব পোষাকে ধনাঢ্যতা ছিল এবং রুচিও ছিল।

কিন্তু এই কথাগুলি যার কাছে আমি শুনেছিলাম তার কথাও একটু বলা দরকার। লোকটিকে আমি গোঁসাই বলে ডাকছি। গ্রামের আর দশজনও তাই বলে। রামময়ের বাড়িব পোয়াটেক পথ দূরে একটা পোড়ো বাড়িতে একা থাকে। নিজেরই সম্ভবত কিছু জায়গা জমি আছে, চাষবাস কবে। পরে একদিন ঠেকে শিখলাম লোকটা চিকিৎসা জানে কিছু কিছু। আর একে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম এই ডাক নিয়ে আসে যখন স্থায়ী রানার অসুস্থ হয়ে পড়ে, কিংবা তার মেয়ের বাড়িতে যায়। তা ভালোই করে। রামময় পোস্টমাস্টারি ছেড়ে দিলে যেমন, গোঁসাই রানারি করতে অস্বীকার করলেও তেমনি—ডাকঘরই এ অঞ্চলে থাকবে না।

একদিন রানারকে কথাটা বলে আমি প্রশ্নটাও করলাম : কথা ও প্রশ্ন রামময় ও রানারের সম্পর্কের ; ইতস্তত শুনে আন্দাজ করেছিলাম। রানার বললে—তা আমি জানি না, বাবু, আর এখন খোঁজ করেও ফল নেই।

—ফল আছে বৈকি। তোমার অন্তত আর্থিক অসুবিধা থাকবে না। রামময়ের সম্বন্ধে যা শুনেছি

তা যদি সত্যি হয়, এবং সত্যি বলেই আমার ধারণা, তোমার তো টাকার অভাব থাকবার নয়। তুমি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেই পাব।

(রানার) গোঁসাই উত্তর দিল না, পাশের গাঁয়ে যাবার বনপথ ধরল এবং দুতিন মিনিটের মধ্যে জঙ্গলে হারিয়ে গেল। টুপি খুলে রুমালে ঘাম মুছে নিজের পথে পা বাড়াতে যাচ্ছি পেছন থেকে মৃদু স্পর্শ পেয়ে দাঁড়ালাম। স্পর্শ পেয়ে যতো বিস্মিত হয়েছিলাম, রামময়কে দেখে তার চাইতেও বেশী হলাম।

রামময় হেসে বললে—আপনি আমার রাজ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টির চেষ্টায় আছেন।

কথাটা সে যতই পরিহাসের সুরে বলে থাকুক আমি সহসা উত্তর দিতে পারলাম না। একটু সময় নিয়ে আমাকে বলতে হল,—আপনি তা হলে আমাদের সব কথাই শুনেছেন?

—না শুনে উপায় কী? যত দূরেই যাবার চেষ্টা করি কথাগুলি কানে যেতে লাগল। বয়স হয়েছে ছুটে পালাই এমন শক্তি নেই। আমিই লজ্জা পেয়েছি।

বৃদ্ধ যখন শুনেই ফেলেছে তখন গোপনের প্রবৃত্তি আর রইল না। আমি বললাম—গোঁসাই রানারের সাথে আপনার আত্মীয়তা আছে?

—এখন আর তার সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না।

—যদি পাওয়া যায়?

—অস্বীকার করব।

রামময়ের কথায় বা তার গলার স্বরে এতটুকু তাপ ছিল না, আমরা যেন অন্য কারো বিষয়ে আলাপ করছি। কয়েক পা পাশাপাশি যাবার পর সে বলল, কাজ আছে?

কাজের তাগিদ ছিল না তা বললাম। রামময় তখন আমাকে অনুরোধ করল গ্রামের হস্‌পিট্যালটি পর্যন্ত তার সাথে যেতে।

বলা বাহুল্য, হস্‌পিট্যালটি রামময়ের টাকাতেই চলেছে। একটি ছোট কোঠাঘর। নতুন চুনকাম করা, টিনের ছাদ। বারান্দায় একটি লম্বা বেঞ্চ, বোধ হয় রোগীদের জন্য। রামময় ঘরের দরজা খুলল। ঘরের ভেতর খান দু'তিন চেয়ার, একটি বড় টেবিল, দুখানি শেল্প, একটি আলমারি। শেল্পের উপরে রাখা কাঁচের বড় বড় শিশিগুলিতে ওষুধপত্র চোখে পড়ল। রামময় আসবাবপত্রের ধুলো কোঁচার খুঁট দিয়ে মুছে পরিষ্কার করল। একটা সাদা বিড়াল, কোথা থেকে এসে শেল্ফটার উপরে উঠে বসল।

রামময় বলল, এই আমার পাহারাদার। ডাক্তার আসবার দেরী আছে। চলুন আমরা যাই। ফিরতি পথে রামময় বলল—সপ্তাহে দুদিন করে একটি ডাক্তার আসেন। সাধারণত রোগী দেখতে এই গ্রামে আসতে তাঁর যা প্রাপ্য তার দ্বিগুণ দেয়া হয় হাসপাতালে ঘণ্টাখানেক বসার জন্যে। আপনি যেন মনে করবেন না, হাসপাতালটি ভালো চলেছে। যেমন ডাক্তার তেমন রোগী, ডাক্তার যদি বা আসে, রোগী ভেড়ে না। আর আপনার গোঁসাই হচ্ছে কম্পাউন্ডার।

রামময় না বললেও বুঝতে পারলাম হাসপাতালটির পরিকল্পনা ও পরিচালনা রামময়ের। বাঁশের কথা উত্থাপন করার ইচ্ছা ছিল, সেটা আজও হল না, তার বদলে রামময়ের কাছে একটি গ্রাম্য মেয়ের গল্প শুনলাম। ছোটবেলায় ছেলেদের দলেও সর্দারি করে, বিবাহের পর অত্যন্ত ভালো গৃহলক্ষ্মী হয়, তেমনি একটি দুরন্ত চপল প্রকৃতির মেয়ে। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়েছিল। এ রকম ধরনের মেয়েদের রূপের কথা প্রায়ই গৌণ। এটিও রূপবতী ছিল তা নয়, কিন্তু দেখা গেল সে সময়ের ছেলেরা সবাই এর ভালোবাসার কাঙাল হয়ে উঠেছে। কারণ বোধ হয় তার স্বাস্থ্য এবং হাসি। কিংবা ব্যাঘ্রীর রূপ বা আকর্ষণ যেমন মানুষের চোখে ধরা পড়েও পড়ে না, এ-রূপ যারা রূপের গ্রাসে পড়েছিল তাদের চোখে ছাড়া আর কারো চোখে পড়ত না। গ্রামে সে সময়ে এমন

কোন ছেলে ছিল না যে তার হাতের একটি ঘুষি, দুটি-একটি রদ্দা খায় নি। বিবাহের কথা উঠতেই সে চব্বিশ থেকে ত্রিশ বৎসরের যত ছেলে গ্রামে ছিল সকলের কাছেই গিয়ে বলল—তোমরাই কেউ আমাকে নিয়ে আমার অন্য গ্রামে যাওয়া বন্ধ কব। তার হাতের ঘুষি-রদ্দা খেয়েও যাদের সাহস অবশিষ্ট ছিল তাদের মধ্যে ছিল ভুঁইমালীদের একটি ছেলে, আর এদিকের এক ব্রাহ্মণের ছেলে। গোঁসাই এই মেয়েটির সন্তান।

সেদিন এই গল্প আব এগোল না, কিন্তু ঘটনার আব একটু আমি জানি। গোঁসাইকে রামময তার ভূসম্পত্তি সব কিছু দলিল করে লিখে দিতে চায়, আর বানার গোঁসাইও তেমনি দৃঢ়তাব সাথে তা প্রত্যাখ্যান করে। পক্ষান্তবে রানাব যে স্বীকৃতির প্রস্তাব করে রামময প্রত্যাখ্যান করাব মূল্যও তাতে দেয় নি। রানারকে যদি রামময তার পৌত্র বলে স্বীকার করে তা হলেই গোল চুকে যায়, কিন্তু রামময় গত চল্লিশ বছরে যা করেনি তা আমাব কথায় করবে না, এটা প্রস্তাব না তুলেও বলা যায়। বাঁশ কাটবাব হুকুম পেলে রামময়ের কাছে আব এক মাসটাক বড় জোর এই গ্রামে আমি থার্কব। চল্লিশ বছরের তুলনায় সে সময়টা অকিঞ্চিৎকর। বানাব ও রামময়ের অনেক সম্বন্ধেব এই বিশেয একটি দিক যেমন অকাবণে আমাব কানে এসেছে, তের্মান সহজে ভুলবার চেষ্টা কবতে হবে এই স্থির করলাম। রামমযেব কাঠিন্য তবু বুঝতে পাবা যায়, একান্ত দবিদ্র গোঁসাই-এব প্রত্যাখ্যানটাতেই বরং কৌতূহল আছে। এদেব দুজন পরস্পবের সাহায্যে এমন অভ্যস্ত যে একজনকে বাদ দিয়ে অপব জন জীবন কল্পনা করতে পারে না। স্থির কবলাম ভুলতে না পারি অন্তত এ সম্বন্ধে আব কোন কথা বলব না।

কিন্তু না বললেও শুনতে আমাকে হল। রানারই একদিন আমাকে বলল। গেবিলা সৈন্যের কথায় কথা উঠে পড়েছিল। সে প্রশ্ন কবেছিল গেবিলা কাকে বলে, শুনে সে বলেছিল—এই গ্রামেই একটা গেবিলা যুদ্ধ হয়েছিল এক সময়ে—পুলিশের সাথে গ্রামেব ছেলেদের।

—এদিকে কি বিশে ডাকাতেব দল ছিল?

—কেউ কেউ বলে রঘোর দল।

—তারপব কী হল?

গোঁসাই বাঁনার বললে, তাব জন্মের পর ঘটলেও ঘটনাটা সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞানই প্রত্যক্ষ নয়। এর-তার কাছে শুনেছে। সে অতীতেব দিকে চেয়ে দেখতে পায় একদিন ভোর রাতে কাবা সব ডাকাডাকি করল, তার মা উঠে গেলেন দরজা খুলে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দ করতে করতে আগুন জ্বলতে লাগল, তার মাযের সর্বাঙ্গ যেন ভিজে ভিজে আলোয় ভিজে গেল, তাবপর তিনি আর কথা বললেন না।

বানারের কথা ঠিক ঠাহর করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বললে—আলো বা ভিজে আলো বলার কারণ অভিজ্ঞতাটা যদিও তার হয়েছিল প্রায় চল্লিশ বছর আগে এখনও সেটা যেন প্রত্যক্ষগোচর, অল্পবয়সের অনুভূতিটাও।

আবার রানার বলল,—ভিজে আলো রক্ত। সারাদিন ধরে সেই পুলিশের সাথে ডাকাত দলের যুদ্ধ হল, এ ভাঙাবাড়ির দোরগোড়ায়, বা সে ভাঙাবাড়ির জানালার তলে। আর ব্যাপারটায় মা কী করে জড়িয়ে পড়ল কে জানে।

সে তারপর গলা নিচু করে বললে, গ্রামের লোকরা প্রথমে রামময়ের ভয়ে পুলিশকে সাহায্য করেছিল। পরে কিন্তু পুলিশ তাদের অনেককে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল শহরে, তারা নাকি অনেকগুলি ডাকাতের মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেছিল এই অজুহাতে। তাবা যখন ছাড়া পেয়ে ফিরে এল প্রায় সবাই গ্রাম থেকে অন্য জায়গায় চলে গেল। যতদিন যায়নি রামময়ের সাথে মামলা মোকদ্দমা করেছে, লোক বলে রামময়ই পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিল।

গোঁসাই-এর কোমরে গামছা বাঁধা, সে নাইতে এসেছিল। আমাব তাঁবুর নিচে হাজা পুকুরটায় নাইতে আসত বলেই এত আলাপ করার সুবিধা হয়েছিল। অন্য অনেক দিনেব মতো সেদিনও বললাম—এখানেই এস, দুজনে গল্প করতে কবতে খাওয়া যাবে, রানারও অসম্মতিসূচক হাসতে হাসতে জলে নামল। ঘটনাটার কথা চিন্তা করলাম, এখনও করছি। কতগুলি যুবক এবং অন্তত একটি যুবতীর সাথে এই গ্রামে পুলিশের একটি খণ্ডযুদ্ধ হযেছিল, আব রামময় দিয়েছিল পুলিশকে খবব।

এব-তার মুখে শুনে বামময় ও তার তৎকালীন পারিপার্শ্বিক কল্পনা করা ঠিক নয়, আমি এই রকম মনে করেছিলাম।

বামময় ধনী ছিল, বিলাসী ছিল। তার বাড়িটা তখন আকর্ষণীয় ছিল। বাড়িব হাতায় এখন জঙ্গলে আগাছা, তখন নিশ্চয় ফুলের কেয়ারি ছিল। ফটকে দারোয়ান থাকত, জুড়িগাড়িব সহিসদেব ঘর এবং গাড়িটার কঙ্কাল এখনও চোখে পড়ে। রামময গ্রামের অন্য সকলের তুলনায় ধনী, এই নির্ধন গ্রামে একথার খুব মূল্য নেই। তখন গ্রামের অবস্থা এব চাইতে ভালো ছিল, রামময়েব অবস্থা তখনও তাদের ঈর্ষাব বিষয় ছিল। এখন তার ধনসম্পত্তিব কিছু জমিতে, অধিকাংশ জঙ্গলে ছড়ানো। তখন ছিল কারবার ও তেজারতিতে। রামময়ের দোতলার একখানি ঘর এখনও বাসযোগ্য আছে। সেটা বিশিষ্টও ঘটে। মুঘল-ভাবতীয় কায়দায় একটি ঝোলাবারান্দা ছিল সেটির দক্ষিণ দেয়ালের গায়ে। ঝুল-বারান্দা এখন ভেঙে পড়ছে, কিন্তু বারান্দার ছাতের কারুকার্য এখনও ঘবের দেযালে মন্দিরের চূড়াব মতো লেগে আছে। বারান্দাটার নিচে এবং বারান্দা ছাড়িয়ে একটি প্রাচীন বকুল এবং একটি চাঁপা গলাগলি করে উঠেছে। এখনও কল্পনা কবা যায় রাত্রিতে চবাচর নিস্তব্ধ হয়ে গেলে যে দম্পতী ওই বারান্দায় এসে দাঁড়াত তারা চাঁপা ও বকুলেব সুঘ্রাণ পেত। কিন্তু রানার বলেছে, ওই ঘরটিতে এখন আর কেউ বাস করে না যদিও ঘবখানি দোতলার অন্য সব ঘব থেকে ভালো আছে। ওই ঘরে বামময়ের একমাত্র পুত্র ঘুমিয়েছিল এবং তাব ঘুম ভাঙবার আগেই ডাকাতবা দুটি গুলিতে তাকে নিহত করে। পরের দিন বেলা প্রায় দুপুব হবাব আগে রামময় জানতে পারেনি। রামময়ের স্ত্রী ছেলের খোঁজে দরজা ধাক্কা দিয়ে ব্যর্থ হয়ে লোকজনের সাহায্যে দরজা ভাঙিয়ে মৃত্যুর ঘটনাটা জানতে পেরেছিল।

আশ্চর্য কি রামময় যদি ডাকাতদের পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে থাকে?

গোঁসাইকে বললাম—তাহলে হত্যাকারীদের কেউ কি ঘরের ভেতরে লুকিয়েছিল?

বিষয়টি নিয়ে প্রায় ত্রিশ বছর চিন্তা করেছে কাজেই সপ্রতিভ ভাবেই সে উত্তর দিতে পারল।

—না। বোধ করি তাদের কেউ ঝুলবারান্দার সাথে দড়ি জাতীয় কিছু ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছিল।

—তা হলে বলতে হয় ডাকাতদের কারো অন্তত রামময়ের বাড়িতে যাওয়া-আসা ছিল।

—তা ছিল, ছিল বৈকি। (রানার অন্যমনস্ক হয়ে গেল কথাটা বলে। যদি ঘটনার সময়ে তার বয়স দুতিন বৎসর মাত্র না হত, তার এই হঠাৎ থেমে যাওয়া দেখে মনে করতে পারতাম, হয়তো সেই দড়ি ঝুলিয়ে রেখেছিল।)

—কিন্তু দড়িটা ধরা পড়ায় ভয় ছিল।

—সহজে নয়। বকুল গাছটার সরু সরু ডালপালাগুলি তখন বারান্দাটা ছুঁয়ে থাকত বলে শুনেছি। পাতায় দড়ি লুকিয়ে রাখলে দু'চার ঘণ্টা মানুষের চোখে নাও পড়তে পারে।

—তাই হবে।

আমরা শুনি মানুষের মন ভেঙে যায়, বাঁচার প্রবৃত্তি থাকে না ; শোকে মানুষের এমন অবস্থা হয়। এর পর থেকে রামময়কে দেখলে আমার মনে হত বাজে-পোড়া গাছের কথা। লোকটি দৃঢ়চেতা

সন্দেহ কি, নতুবা সেই ঘটনার পরও এত দীর্ঘদিন বাঁচতে পারত না। আর বোধ হয় আত্মপরায়ণ।

বাঁশের কনট্রাক্টে রামময় রাজি হয়েছে পাকা কথা হয়েছে, বায়নার টাকা গছিয়ে দিয়েছি। কাজের সুবিধার জন্য একটা ঘোড়া আনিয়ে নিয়েছি। আমার শহরের এজেন্ট ঘোড়াটি ভালো কিনেছে বলতে হবে। গভীর কালো বঙের একটি গেল্‌ডিং। একদিন রামময়ের বাড়িতে ঘোড়ায় চেপে গিয়েছিলাম। রামময় ধীর স্থির, এতটা ধীর ও গম্ভীর যে তার সামনে বেশী কথা বলতে সঙ্কোচ হয়। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি কোন খববেই সে বিচলিত হয় না, তাব আগ্রহটা কোন বিষয়েই কারো চোখে পড়ে না। ঘোড়া যখন রামময়ের বাড়িতে ঢুকছে রামময় সহসা তার বয়সের তুলনায় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল, কিন্তু আমাকে দেখেই তেমনি তাড়াতাড়ি ফিরে গেল। বসবার ঘরটায় প্রায় আধ ঘণ্টা বসে রইলাম, তারপর সে আবাব এল, অত্যন্ত ধীর এবং অত্যন্ত সহজ। তার বয়সে এই ধীরতাটা স্বাভাবিক, ওই বিচলিত হওযাটা যেন অভিনয়। কিন্তু তাকে অভিনয় বলাও যুক্তিসঙ্গত নয়, অভিনয়ে জড়ীভূত মাংসপেশীগুলিকে অমন সজীব করা যায় না। কথার শেষে রামময় বললে—অনেকদিন এমন ঘোড়ায় চেপে কেউ আসেনি।

গোঁসাইকে আমি অবশেষে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণে রাজি করতে পেবেছি। আমার এক এজেন্ট এসেছে আলাপ-আলোচনার জন্য, এই সুযোগে গোঁসাইকে নিমন্ত্রণ করলাম। টেবিলে একটি আলোকে ঘিরে আমরা বসলাম, গোঁসাই-রানার, আমি এবং এজেন্ট।

ঘোড়ার কথা হচ্ছিল। আমি বললাম—এমন কালো রং কিন্তু সহসা চোখে পড়ে না। গোঁসাই বললে—লোকের কথায় যদি বিশ্বাস করা যায়, এই গ্রামে আর একটি কালো ঘোড়া ছিল। রামময়ের ছেলের।

এজেন্ট বললে—কিন্তু এত বড় কি ছিল?

গোঁসাই হাব মানাব লোক নয়, সে হেসে বলল—দিদিমার কথায় সে ঘোড়াটা আপনার তাঁবুর সমান ছিল।

আমি ভাবিলাম, খুব সম্ভব তাই, তখন রামময়ের সকালের ব্যস্ততা মনে পড়ল।

খেতে খেতে এটা-ওটা গল্প চলছিল, এক সময়ে আমি বললাম—তার এই বিপদ ঘটতে পারে একি রামময় জানত না?

—জানত বৈকি। তার সহিসদের ঘরে সে সময়ে একটি পুলিশ ফাঁড়ি বসেছিল। ডাকাতদের সাথে তার শত্রুতার ব্যাপারটা গোপন ছিল না। পুলিশ ফাঁড়ি তৈরি করে আশপাশের দশখানা গ্রামে ডাকাত ধরার চেষ্টায় জিজ্ঞাসাবাদ করে বেড়াচ্ছিল।

—এসব কথা তো আগে শুনিনি।

—শুধু তাই নয়। দিদিমারা বলত রামময়কে নাকি ডাকাতরা তারিখ স্থির করে চিঠিও দিয়েছিল।

—ডাকাতেরা তা হলে বাহাদুবি দেখাতে চেয়েছিল।

—দেখাল তো। তা ছাড়া পুলিশরা রামময়ের কাছে যে সাহায্য পাচ্ছিল বোধ হয় সেটা বন্ধ করার জন্যই শাসিয়েছিল ডাকাতরা। শেষ পর্যন্ত পুলিশদের চোখের সামনে দিয়ে ডাকাতি করে গেল তারা।

—তা হলেও তোমার কথা ঠিক হয় না। তারা যদি রামময়কেই শাসাবে তবে রামময়ের ছেলেকে তারা হত্যা করবে কেন?

—ওটাই ভুল তাদের। একককে অন্য ভেবে হত্যা করেছিল।

আর যাই হোক এসব আলাপ করতে করতে আহার করা চলে না। কথাটা ঘুরিয়ে নিলাম।

কিন্তু বাঁশ কাটি কিম্বা কাঠ চেরার ব্যবস্থা করি রামময়ের পারিবারিক কাহিনী আবার এসে পড়ে। দুচার দিন পরে দেখলাম নিজের অজ্ঞাতে রামময়ের সাথে কথা বলতে বলতে কখন কথাটা উত্থাপন করে বসেছি।

রামময় বললে--কেন শত্রুতা, তার অবশ্য কারণ ছিল।

—তা তো নিশ্চয়ই ছিল, তারা কি পলিটিক্যাল ডাকাত?

রামময় হেসে বলল—না। যাদের নিয়ে রোমান্স লেখা যায়, লেখা হয়েছে তেমনি।

—অর্থাৎ?

—বাংলা দেশে বেজা খাঁর আমল থেকে এটা চালু হয়। তার আগেও বারো ভূঁইয়ারা লুটপাট করত—সেটা অবশ্যই শত্রুর রাজ্যে। হেস্টিংসের আমল থেকে সব দেশ যখন এক রাজার দেশ হল তখন যুদ্ধের বদলে ডাকাতি করে রাজা-জমিদার হওয়ার প্রথা চালু হয়েছিল, নুন বেচে রাজা হওয়ার সাথে সাথে। আরও প্রাচীনে যেতে চান তো বলতে হবে গোপালদেবের হাতে যে মাৎস্যন্যায় মুমূর্ষু হয়েছিল, তারই ক্ষয়িতাবশিষ্ট বংশধর এই সব ডাকাত। বাংলাদেশ জঙ্গলে আইনের হাত থেকে বেঁচে বর্তমান দিনের উপযোগী হবে, এপথে বাধা ছিল এই ডাকাতরা।

সেদিন সন্ধ্যায় তাঁবুতে বসে অনেকক্ষণ কথাটা ভেবেছিলাম। কথাটা মিথ্যা নয়। এক কালে ডাকাতি করা জমিদারদের পেশা ছিল বলে শুনেছি এর আগেও। এবং রাষ্ট্রের মধ্যে এমন সব ক্ষমতাবান ডাকাত থাকলে রাষ্ট্রব্যবস্থা টেঁকে না। তা হলে রামময়ের শত্রুতা কোন ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে নয়, একটি প্রচলিত অব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আমার মনে হল এ খবর বোধ হয় গোঁসাই জানে না। পরদিন তার সাথে পথে দেখা হল। কোথায় যাচ্ছিল সে। তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললাম—ডাক কোথায়? বেলা হল।

সে বললে—স্থায়ী রানার এসেছে ছুটির পর।

—কোথায় যাচ্ছ?

—রামময়ের জমিদারির খাজনা আদায় করতে।

আর কয়েক পা গিয়ে রামময়ের মুখে শোনা কথাগুলি বললাম। সে অবাক হল না, বললে—হতে পারে। পারলে যে ডাকাতরা তাঁকে ছিঁড়ে খেত এ তিনি জানতেন। ডাকাতরা দিনক্ষণ স্থির করে ওঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল, আর সেই দণ্ড লাগল তাঁর ছেলেকে।

—ছেলের সাথে কি তাদের রাগারাগি ছিল না?

—সম্ভবত না। ওঁর বাড়ির আর কারো অঙ্গস্পর্শ করেনি তারা।

—এ-ও তো হতে পারে, নিজের মৃত্যুর চাইতে বড় শাস্তি হবে ছেলের মৃত্যুতে এই ভেবেছিল ডাকাতরা।

গোঁসাই একটু ভেবে বলল,—না, তা নয়।

বুঝলাম এবিষয়ে রানারের একটি নিজস্ব সিদ্ধান্ত আছে, এবং সেটা গোপন করার আগ্রহ তার বেশী নয়।

—আচ্ছা আমাদের তো এখনও একপোয়া পথ এক সঙ্গে যেতে হবে, তুমি সেই ঘটনার দিনের কথা যা শুনেছ বলো শুনি: কী বলো?

সে বললে—আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি। সেদিন ওঁর ছেলের জন্মদিন ছিল।

শুনে কষ্ট হল। এতদিন কাহিনীর মতো শুনেছি, আজ যেন সেই নিহত লোকটির জীবনের উষ্ণতা অনুভব করলাম। জন্মদিনের উৎসবের মধ্যে একটা জীবন মৃত্যুর পথে গেছে।

রানারকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি বলেছিলে এক জনকে অন্য জন ভুল করেছিল তারা। তা কী করে হয় আমি বুঝছিনে। ওদিকে তুমি বলেছ সেই দোতলার ঘরে দড়ির মই। বেছে বেছে

এ ঘরটিতে ঝোলাবে কেন? আর যারা দড়ির মই ঝোলানোর ব্যবস্থা করেছিল তারা নিশ্চয়ই রামময়ের বাড়িতে নিঃসন্দেহে এবং সহজে যাতায়াত করত। তা যদি পারত তবে তারা নিশ্চয়ই রামময়ের ঘরে গিয়ে তাকেই হত্যা করতে পারত।

রানার বললে—সে উদ্দেশ্যই ছিল। দোতলার ওই ঘরখানি তৈরি হবার পর থেকে রামময়ই ওই ঘরে থাকত। অন্য কারো প্রবেশ অধিকারও ছিল না ওই ঘরে। ডাকাতরা জানত রামময় কখন ওই ঘরে যান, কতক্ষণ ধরে সিন্দুক খুলে বসে টাকা পয়সা গোনেন, তেজারতির সুদ করেন। তারা জানত কতক্ষণ ধরে রামময় চিঠিপত্র লেখেন, তারপর কখন আলো নিভিয়ে শুতে যান। এমন কি যে দড়ি বেঁধে এসেছিল সন্ধ্যাবেলা সেও জানতে পারে নি ঘটনার দিন রাত্রিতে রামময়ের বদলে রামময়ের ছেলে শোবে ওই ঘরে, তেমনি করে বালাপোশ গায়ে দিয়ে।

—তুমি এসব কি তোমার দিদিমার কাছে শুনেছ।

—গল্পমাত্রেই তো তাই, রানার হাসল।

রানার যে রামময়ের পৌত্র তাতে আর সন্দেহ কি। আমার মনে হল রামময় বোধ হয় যত্ন করে লেখাপড়াও শিখিয়েছিল রানারকে।

—কিন্তু, আমি বললাম, না হয় তারা ভুলই করল, ভুলটা শোধরাতেও তো পারল, তবে তারা রামময়কে রেহাই দিল কেন? সময় পায়নি ভুল শোধরানোর?

—না। সম্ভবত তারা মর্মাহত হয়েছিল। এবং তারা যে মর্মাহত হবে এ জানত রামময়। কারণ এরপর থেকে রামময় নিজের বাড়ি থেকে পুলিশদের অন্যত্র উঠিয়ে দেয়। নির্ভয় হয়ে সে একা একা পথঘাটে চলত। এর আগের মতো সঙ্গে দারোয়ানও থাকত না।

খানিকক্ষণ পরে আমি প্রশ্ন করলাম,—তাও যদি হয়, তোমার গল্পে অসঙ্গতি থাকছে। রামময় কেন আচমকা বিশ বছরের প্রথা বদলাল? কেন রামময় তার ছেলেকে ও ঘরে শুতে দিল, যে ঘরে সে কাউকে ঢুকতেই দিতনা।

—তার কারণ আছে। সেদিন সন্ধ্যায় স্ত্রীর সাথে কথা বলতে বলতে রামময় নিজের সেই ঘরখানির দিকে এগোচ্ছিলেন। সারাদিন রামময় ছেলের জন্মদিনের আনন্দে উচ্ছল হয়ে দৌড়চ্ছেন কিন্তু তাঁর স্ত্রীও ডাকাতদের চিঠিটার কথা জানতেন। তারা পরপর তিনটি দিনের উল্লেখ করেছিল রামময়কে সতর্ক করে। আজকের দিনটি সেই তিনটি দিনের প্রথম দিন। বাইরে পুলিশ থাক, বাড়িতে আত্মীয়-অভ্যাগতের ভিড় থাক, (এবং এই ভিড়টা অন্যান্য জন্মদিনে এ রকম কখনো হয়নি), রামময়ের স্ত্রী একটি মুহূর্তও স্বামীকে চোখের আড়াল করেন নি। ঠিক এমন সময়ে রামময় এবং তাঁর স্ত্রী দেখতে পেলেন একটি মেয়ে ধীরপদে সেই নিষিদ্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। কী সাহস মেয়েটির, রামময় অবাক হলেন। কিন্তু মেয়েটি কাছে আসলে তার কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিল। রামময়ের স্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে, ওকে না আমাকে খুঁজছিস? মেয়েটি ম্লান হেসে বলল—গরম লাগছিল। তাতো লাগবেই, সারাদিন খুব খেটেছিস, এবার একটু গা হাত পা ধুয়ে বসগে, আমি যাচ্ছি—বলেছিল রামময়ের স্ত্রী। মেয়েটি চলে গেলে রামময় স্ত্রীকে ঘরে বসিয়ে ঘরটার খুঁজে দেখলেন। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ পড়ে গেল দড়ির মইটি। স্ত্রীকে ডেকে দেখালেন। রামময়ের স্ত্রী বললেন—কেন, কে রাখল? তুমি বলতে চাও ওই মেয়েটি, তুমি কি বলতে চাও গোপনে দেখা করার জন্য? রামময় বললেন,—আজ তুমি বলো, এই কী তোমার পুত্রবধূ হবার উপযুক্ত? রামময়ের স্ত্রী লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন, মনে হল তিনি তিরস্কার করবেন, কিন্তু সহসা বললেন—আহা, এমন পাগলপরানি। হোক ছোট বংশ, ওর সাথেই আমি বিয়ে দেব। তুমি চলে এস, তুমি দেখে ফেলেছ এ যেন না ওরা জানতে পারে। আমি বরং ওকে ডেকে আজই বিয়ের

কথা পাড়ব, তা হলে ও লজ্জায় দড়ি বাইবে না। কী সাংঘাতিক কথা বলোতো। দড়ি বেয়ে এ ঘরে উঠলেও, লাফিযে যেতে হবে খোকার ঘবে। পড়ে টড়ে গেলে—। আমি ওকে বলব বিয়ে দেব, তোমার লাফালাফি করতে হবে না। বামময় বলেছিলেন, না থাক। আমি বরং আর এ ঘরে শোব না। খোকা শোবে। রামময়ের স্ত্রী প্রশ্ন করলেন—তা হলে বিয়েতে তোমার অমত নেই বলো। রামময় উত্তর করলেন না। এটা-ওটা কথা বলার পর রামময়ের স্ত্রী বললেন, অপেক্ষাকৃত লঘুস্বরে—কিন্তু তোমার লক্ষ্মী পেঁচারা, তোমার তমসুকি কাগজপত্র এ সবতো এ ঘরে নতুন লোক দেখলে ভয় পাবে। অবশ্য খোকার চেহারা আব তোমার চেহারা ম্লান আলোয় ঠাহর হয় না।

বানাব থেমে থেমে অনেকটা সময় নিয়ে যা বলল তা সাজিয়ে দিলে এমনি দাঁড়ায়।

—এসব কি তোমার দিদিমার কাছে শোনা? নিছক কল্পনা বলে মনে হচ্ছে।

—নাও হতে পারে। কারণ সেই ক্লান্ত মেয়েটি আমার মা।

আহা এমন একটি রাত্রির এমন পবিণতি। রানারকে আর প্রশ্ন করার মতো ইচ্ছা ছিল না। দুজনে পাশাপাশি চলতে লাগলাম।

এদিকে আমার বাঁশের কাজের লোক এসে গেছে, যতদিন থাকব ভেবেছিলাম তার দরকার হল না। এ দিকের সব কাজ লোকটিকে বুঝিয়ে দিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। কয়েকটি মাস এই সখের রানারের সঙ্গে কাটালাম। ভেবেছিলাম যাবার আগে ওর সাথে কথা বলে যাব। মানুষের উপদেশ দেয়ার প্রবৃত্তিটা ভয়ঙ্কর। তার সাথে দেখা হতে বললাম—রামময় তোমাকে স্বীকার করুক আর নাই করুক, এত টাকা পয়সা এসব কেন অবহেলা করছ। তার জীবনেও কত বড় শোকটা লেগেছে।

রানার হেসে বলল—বাবু সাহেব, আপনি যেন একটি বিষয় ঠাহর করেন নি।

—কী এমন?

—আপনি কি ভেবেছেন, বামময় আমার মাকে এত ছ্যাবলা মনে করতেন যে তিনি বিশ্বাস করবেন যে তাঁর ছেলের সাথে রাত্রিতে গোপনে দেখা করার জন্যে দড়ির মই টাঙিয়েছিল সেই ক্লান্ত মেয়েটি? আমার মায়ের সম্বন্ধে তাঁর কী প্রত্যয় ছিল সেটা ঘটনার আগেও পুলিশ জানত, তারা শুধু জাল গুটিয়ে আনার অপেক্ষায় ছিল। আর রামময়ের স্ত্রী রামময়ের প্রত্যয়ের কথা বুঝতে পেরেছিলেন ঘটনার পরই। আমরণ রামময়ের থেকে দূরে ছিলেন।

একটি শিকার-কাহিনী

আমি জীবনের এই পর্যন্ত এসে একবারই মাত্র শিকারে যোগ দিয়েছি বলতে পারি। এবং এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে এই একমাত্র অভিজ্ঞতাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে। সেই গল্পটা বলছি।

এক সময়ে বড় অস্থির হয়ে উঠেছিলাম—কোন কাজ ছিল না, কোন উপজীবিকা ছিল না। বেপরোয়া হওয়াব চেষ্টায় ছিলাম। এমন সময়ে কলেজের সহপাঠী নন্দর সঙ্গে দেখা হল। পৃথিবীতে বাস করলে একবার যার সঙ্গে দেখা হয়েছে দ্বিতীয়বারও তার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে এমন একটা কথা চলতি আছে। এই সূত্র অনুসারে দেখা হওয়াটা উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু নন্দদুলালের এ শহরে আসা একটু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অল্পদিনের জন্য সে বাংলার বাইরে থেকে এসে ফিরে যাওয়ার আগে আমাদের মতোদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টায় তার যাওয়া আসার পথ ছেড়ে এই শহরে এসেছিল। এর পরে নন্দ বলেছিল—সে তখন কোহিমার দিকে কিংবা তাও ছাড়িয়ে এক নাগা পাহাড়ে এক তামার খনির ছোটো বা মেজো কোন রকমের এঞ্জিনীয়ার। আমি তার কাছে গিয়ে দুএকমাস থেকে এলেও পাবি। শোনো কথা।

কিন্তু প্রায় বৎসবকাল পরে একদিন কাগজপত্রের মধ্যে নন্দর ঠিকানাটা পেয়ে তার কাছে যাওয়ার ইচ্ছা হল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হলাম। পথের খবরাখবর সংগ্রহ করা, কিংবা নন্দকে চিঠি দিয়ে সে তখনও নংপুতে আছে কিনা এ সংবাদ নেয়ারও কোন প্রয়োজন বোধ করলাম না। তখন নিজের কাজটিকে স্বাভাবিক অথবা পুরুষোচিত বলে মনে হয়েছিল। এখন অনুভব করি আমার মনের তৎকালীন উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থাটা এতেই সূচিত হয়েছে।

সাতদিনের পথ প্রায় একমাসে পার হয়ে নংপুতে পৌঁছলাম। ততদিনে পথের দিকে মনস্থির করার অভ্যাস থেকে উদ্‌ভ্রান্ততা চলে গেছে মনের। এর প্রমাণ হচ্ছে সেখানে পৌঁছেই সঙ্গে সঙ্গে নন্দর খোঁজ করলাম না। বাজারে এক নাপিতের দোকানে বসে পরিব্রাজকের চিহ্নগুলি দেহ থেকে দূর করলাম। মাথায় উকুন ছিল না বলেই চুলগুলির কিছুটা অবশিষ্ট রইল। আমার সৌভাগ্যক্রমে নাপিতটি উত্তরভারতীয়। আমার ভাষা সে বুঝতে পারল এবং একটি ঝবনা নির্দেশ করে দিল। স্নান শেষ করে, বলা বাহুল্য নয় এক্ষেত্রে একটা কড়া পাকের সাবান বাজারে পেয়েছিলাম, যখন নাক মুখ চোখ জ্বলতে সুরু করেছে তখন ঝরনা থেকে উঠলাম। এরপর নির্মোক বিমোচন। কম্বলের পুঁটুলিটির মধ্যে যত কিছু ছিল সব বর্জনীয় বলে বোধ হল। একজোড়া মিল-খদ্দরের ধুতি, একটি মাত্র খদ্দরের পাঞ্জাবি, ও পুরানো সান্ডেল জোড়া রইল। পুরানো কম্বলটা ত্যাগ করতে কষ্ট হল, সেটাও থেকে গেল।

বাজারে গিয়ে হোটেল খোঁজা আমার ভুল হয়েছিল। কারণ হোটেল থাকবার মতো বাজার সেটা নয়। গুটি সাত আট ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দোকান। বাঁশের নোংবা শ্যাওলা ধরা বেড়া সেগুলোর। তার মধ্যে একটি নাপিতের অপরটি এক মারোয়াড়ীর। নাপিতের দোকানের গায়ে দুটি দরজা—এক দরজায় মানুষ সুন্দর হতে ঢুকবে, অন্যটিতে চা খেতে পারে। মারোয়াড়ীর দোকানটিতে পাট এবং নাইলনের কিছু রং-বাহার ছিট কাপড় চোখে পড়ল। পরে অবশ্য শুনেছি মারোয়াড়ীটার অন্য ব্যবসায়ও আছে। সে টাকা ধার দেয়, তার একখানা ঝরঝরে মোটরগাড়ি আছে, সেটা ভাড়া খাটায়। তার নামই নংপু-কোহিমা সার্ভিস। এই দোকানগুলির মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জল ও আবর্জনাপূর্ণ

গর্তগুলির মধ্যে এখানে সেখানে বাঁশের বাখারি পোঁতা আছে দেখা যাবে। সপ্তাহে একদিন হাট হয়। হাটের দিন ওই বাঁশের বাখারিগুলোর কাছে কাছে তরকারি আনাজের দোকান বসে। শুনতে পেলাম তখন নাকি এদিক ওদিকের পাহাড় থেকে দা হাতে করে রংচঙে কটিবস্ত্র পরে কিছু কিছু নাগা গ্রামবাসী আসে বাজার করতে। তাদের মাথায় পালকের টুপি থাকে কিনা তা বলতে পারল না নাপিত। সে হাসল।

নাপিতকে বললাম,—কোথায় খেতে পাব?

সে একটু চিন্তা করল, তারপর বলল— আমার দোকানে চা আর হবে না এখন, তবে যদি বাজি হন আমার জন্য রুটি বানাব তখন আপনার জন্যও বানাতে পারি। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আহার সমাপ্ত করে নাপিতকে পয়সা দিতে গেলাম। সে আমার প্রসারিত হাতের তেলোর রেজকিগুলি থেকে একটি সিকি তুলে নিয়ে বলল —বহুৎ খুব। অথচ সে দার্জিলিংপুরে চুল দাড়ি কাটতে এর দ্বিগুণ পারিশ্রমিক নিয়েছিল।

তারপর তাকে আমি প্রশ্ন করলাম নংপু সম্বন্ধে। এই হাটই যদি নংপু হয়, তবে, আমার মনে হচ্ছে, আমি ভুল জায়গায় এসেছি, এবং অন্য কোন নংপুর জন্য আরও এগিয়ে যেতে হবে, নতুবা যে পথে এসেছি সে পথেই ফিরে গিয়ে অন্য কোন পাহাড়ে চড়তে হবে। কিন্তু নাপিত বলল—আমার ভুল হয় নি, এই পথেই আরও কিছুদূর যাওয়ার পর বনের ওপারে তামার খনি।

বিকেলের দিকে খনির খোঁজে রওনা হলাম। প্রথম দৃষ্টিতেই ভালো লেগে গেল। এসবেস্টসের ছাদ, কংক্রিটের দেয়াল, কাচের দরজা জানালা বসানো আট দশটি বাংলো। এটাই খনির অফিসারদের পাড়া বলে মনে হল। পিচ বাঁধানো পথ এক বাড়ি থেকে অপরটিতে পাক খেয়ে খেয়ে উঠে গেছে। সাজানো গোছানো একটা শহরের টুকরো। আমি ঢুকতে ঢুকতে শুনতে পেলাম ডিং ডং ডিং করে একটা ঘণ্টা বাজছে। তা হলে এখানে একটি চার্চও আছে। তারপর মনে হল হয়তো সেদিনটা রবিবার। দিগন্তের দিকে তাকাতে গিয়ে এবার চার্চটি চোখে পড়ল। চারিদিক থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন একটা পাহাড়ের অর্বুদের গায়ে চার্চটি দাঁড়িয়ে, নীল আকাশের গায়ে তার মিনারের ক্রসটি বিঁধে আছে। তা হলে এখান থেকেই নংপু শহর এবং এখানেই নন্দর খোঁজ নিতে হবে।

খোঁজটা শহরের ঠিক মাঝখান থেকেই সুরু করা উচিত এই মনে করে দুপাক ঘুরে একটি ছোট বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। রেলের গুমটিঘরের মতো একখানি ঘর, শুধু আকারে কিছু বড় এই যা। প্রবেশ পথটির ভাঁজ করা দরজাগুলি খুলে দিলে একটা টানেলের মতো দেখাচ্ছে। প্রবেশ দরজার বিপরীত দিকে একটি সুদৃশ্য কাঁচের আলমারিতে নানা আকারের বোতল বয়াম প্রভৃতি রক্ষিত। ঘরটির দেয়ালের গায়েও কয়েকটি কাঠের শেলফ। তার উপরেও অনেক শিশি কৌটো বয়াম। ঘরের মাঝামাঝি একটা লম্বা টেবিলের দুপাশে পিঠতোলা বেঞ্চ। বড় আলমারিটায় রাখা শিশি বোতল দেখে মনে হয় এটা একটা ডিস্পেন্সারি। কতগুলি পরিচিত ওষুধের নাম পড়লাম। এদিকে সেল্‌ফের উপর কৌটোগুলোতে বিস্কুট, কফি প্রভৃতিও আছে বলে মনে হল। সেগুলোর মাঝে মাঝে দু একটি বিলিতি মদের নাম পড়া গেল।

আমি কিছু বলার আগে একটি চীনা ভদ্রলোক এগিয়ে এল। অবশ্য লোকটি খাসিয়া নয় হলপ করে বলতে পারব না। সে এতক্ষণ কোথায় ছিল লক্ষ্য করিনি। সে ইংরেজির সঙ্গে হিন্দী মিশিয়ে বলল—কী চাই? চা দেব?

—চা?

—হাঁ চা কিংবা কফি?

—মাপ করবেন আমি ওষুধের দোকান মনে করেছিলাম।

লোকটি হেসে বলল—সেটা ভুল নয়। এখানে এটাই একমাত্র ওষুধের দোকান।

—যা হয় কিছু দিন। আমার ভালো এক কাপ চায়ের নিশ্চয়ই দরকার ছিল।

লোকটি সদালাপী, কথাবার্তার ধরন-ধারণ খুবই সরল।

চা খেতে খেতে তাকে আমি প্রশ্ন করলাম। জানলাম নন্দ এখনও এখানেই থাকে এবং লাল রঙের ছোট বাড়িটা তার।

সেও প্রশ্ন করে জানল, আমি নংপুর কোন কর্মচারী নই, বেড়াতে এসেছি। লোকটি পয়সা নিতে আপত্তি করল। সে বলল--প্রথম ট্যুরিস্ট হিসাবে আপনি নংপুর গেস্ট।

আমি জানতে পারলাম এখানে অনেক বিষয়েরই দুটি পৃথক রূপ আছে। এটা যেমন ডিস্পেন্সারি এবং কাফে, লোকটিও তেমনি কম্পাউন্ডার এবং কাফের মালিক।

পরে জেনেছিলাম এখানকার চার্চের যে ফাদার সেই ডাক্তার

নন্দকে খুঁজে পেতে দেরী হল না। তার বাড়ির দরজার বেল বাজাতেই সে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে যে রকম বিস্মিত হওয়ার কথা তেমনি বিস্মিত হল, যত আনন্দিত হওয়ার কথা তার চাইতেও কিছু বেশী হল।

বিশ্রাম বিশ্রাম। কয়েকটি দিন শুধু ওই কাজটি নিয়েই থাকবে। তারপর এদেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। দুতিন মাসের মধ্যে যেতে তো দিচ্ছি না। তারপর ভেবে দেখব আমার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে আমার কাছেই থাকতে হবে কি না। এক নিশ্বাসে এই কথাগুলো বলে নন্দ কোটও খুলে দিয়ে চিরস্থায়ী একটি ভঙ্গি নিয়ে ফেলল।

নন্দ আমাকে তাদের খনি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। সাহেবপাড়া থেকে খনিটা কিছু নীচে। সেই নীচুতে নামতে হলে পাহাড়ের একটা ফাটলের উপরে বাঁধা একটা কাঠের তৈরী ব্রিজ পার হয়ে যেতে হয়। সেই ব্রিজে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য পড়ে অনেক নীচে পাথরের কালো একটা রাস্তা ডাইনে বাঁয়ে চলে গেছে।

আমি বললাম,—এতক্ষণে এখানে তোমাদের খনি থাকার সার্থকতা চোখে পড়ল। এই রাস্তা না থাকলে খনিজকে চালান দিতে পারতে না। আমি এই পথের কথা জানতাম না।

—হ্যাঁ ওটাই আমাদের লাইফ-লাইন।

আরও অগ্রসর হয়ে খনির কাছাকাছি পৌঁছে অনেক যন্ত্রপাতি, শ্রমিক বস্তি, অফিস ঘর, প্রভৃতি চোখে পড়ল। পাহাড়ের সেই ঢালে নানা জাতের অনেক লোক। শ্রমিকদের বস্তি সর্বত্রই সমান। অফিস ঘর সম্বন্ধেও সে কথা বলা যায়। সেই ফাইল, র‍্যাক, টেবিল, চেয়ার, শেলফ, কেরাণী, সাহেব বস্তি টিন, বাঁশ, খড়ের। অন্য বাড়িগুলি পাথর, কাঠ ও টিনের। অনেক লোক ছাড়া খনি চলে না।

অতঃপর একদিন খনির ভেতরে নেমেছিলাম। এ সম্বন্ধে আমার জানাশোনা প্রায় কিছুই নেই। খাঁচায় বসে নামতে নামতে ভয় ভয় করছিল। একটা ঝাঁকি খেয়ে খাঁচাটা যখন থেমে গেল আমি রীতিমত ভয় পেয়েছিলাম। নন্দ বলল—ভয় নেই আমরা প্রথম হলে পৌঁছলাম।

খাঁচাটা উঠে যেতেই একটা রেলিং এর ছোট দরজা ঠেলে নন্দ অগ্রসর হল। তার হাতে খনি দেখার আলো। অস্পষ্ট অন্ধকার চারিদিকে। আমাদের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। আজ রবিবার, কাজ দেরীতে আরম্ভ হবে। শ্রমিকরা নেই। একটা মরচে ধরা গাঁইতি পড়ে ছিল, নন্দ সেটাকে একদিকে সরিয়ে রাখল। আমার গা ছম-ছম করে উঠল।

আর দু এক পা গিয়ে আমরা যেখানে দাঁড়ালাম সেখানে একটা স্তম্ভ। অনুমান দু'আড়াই ফুট দৈর্ঘ্য-প্রস্থে একটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ উপর দিকে উঠে গেছে। কোথায় কতদূরে গিয়ে শেষ হয়েছে বলা যায় না। আমার মনে হল স্তম্ভটির গায়ে কারুকার্য আছে। সেটা চোখের ভুল তাতে সন্দেহ

কি?

কিন্তু নন্দ তার আলোটা কমিয়ে দিয়ে অগ্রসর হল। দু'এক পা যাওয়ার পর আমার মনে হল আমরা যেন এক অনাবিষ্কৃত চৈত্য গুহায় এসে পৌঁছেচি। দেয়ালে স্তম্ভে নানা কারুকার্য চোখে পড়তে লাগল। কোথাও মাছরাঙা পাখী, কোথাও একটি উর্ধ্বমুখী নেউল। কোথায় বা একটি সশৃঙ্গ ময়াল সাপ, লতাপাতা, অজানা চেহারাব ফুল। কমলা লেবুর রং, তামাটে রং, সবুজ, নীল, পান্না এমন সব রং দিয়ে কারুকার্যগুলি রঙানো। একজোড়া ময়াল সাপের কথা আমি বহুদিন পর্যন্ত ভুলতে পারব না। লাল চোখগুলি মেলে সে দুটি আমাদের দিক প্যাট্ প্যাট্ করে চেয়ে বইল।

আমাদের কথা এবং পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি ছাড়াও একটা শব্দ পেলাম।

—কী, নন্দ?

—এয়ারশাফট্ দিয়ে বাতাস ঢুকছে।

কিন্তু এ কোন অদ্ভুত জায়গায় এলাম। স্তম্ভের গায়ে একটা পাখী যেন নড়ে উঠল। তাবপব সেই অনুভবটা যেন আমাকে পেয়ে বসল। সেই শিল্পলোক যেন এক মুহূর্তে সজীবতা পেয়ে নিজেব প্রাত্যহিক কাজকর্মে লেগে গেল—পাখী ডানা মেলার চেষ্টা করছে, সাপ পাক খুলছে। আমার মনে হল এ দেশে নারী আছে।

—নন্দ, এ তুমি কোথায় এলে?

—দ্বিতীয় হলে।

—এর আগে তুমি এখানে এসেছ?

—হ্যাঁ। এসব কেন বলছ?

—এরা যেন নড়ছে। নাকি আমার চোখের ভুল?

নন্দ কী ভাবল, তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে আলোটা বাডিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে সুরু কবল। নন্দ যখন এই সম্পূর্ণ অজানা রাজ্যে অভ্রান্ত ভাবে পথ চিনে চলছে তখন আমার মনে হল, স্তম্ভেব আড়ালে আড়ালে অসংখ্য গোলক ধাঁধাব পথ ঘুরে ঘুরে সেই জীবরাজ্যের দিকে চলে গেছে।

উপরে এসে নন্দ বলেছিল খনির মধ্যে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে। উপবে উঠে একজন সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। হাল্কা ছিপছিপে চেহারা। এক মাথা কোঁকড়ানো সোনালী চুল। হলুদে-সোনালীতে মেশানো সরু চিকন গোঁফ। ঠোঁট দুটি একটা চাপা হাসিতে সব সময়ে যেন ফুরফুর করছে। নাকটি আমাদের আর দশজনের মতো দ্রষ্টব্য কিছু নয়। পাটকিলে চোখ। পরনে শর্টস্। পায়ে ভারি বুট। আমি তাড়াতাড়ি তাকে সেলাম করে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিলাম।

সাহেব হাসিমুখে নন্দকে প্রশ্ন করল, ইঞ্জিনিয়ার তার বন্ধুকে খাদ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল কি না।

নন্দ বলল,—হ্যাঁ। আজ বুঝি তোমার নতুন ফ্লোর খুঁজবার কথা টোয়াইন্যাম?

—হ্যাঁ।

আমরা এগিয়ে এলাম।

কিছুদূর যাওয়ার পর আমি বললাম,—ইনি বুঝি তোমাদের বড় ইঞ্জিনিয়ার?

—না। ফোরম্যান। এরপরে নন্দ হাসি মুখে বলল,—তা তুমি স্যালুট করে ভালোই করেছ। টোয়াইন্যাম লোকটি ভালো। সে তোমার বন্ধু হয়ে যাবে এর পরে।

কিন্তু নন্দ যতই বলুক, তার কথার ধরনে আমার মনে হল সাহেব দেখা মাত্র স্যালুট করে আমি হয়তো ভারতীয় দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছি। এবং বোধ হয় ফোরম্যান টোয়াইন্যাম পদমর্যাদায় এঞ্জিনিয়ার নন্দর অধস্তন।

নন্দর কথায় ইঙ্গিত ছিল হীনমন্যতা প্রকাশ করেছি, আমারও তেমন মনে হল এটা নন্দর

উন্নাসিকতা। একজন মানুষ সে যদি অধস্তন হয় তা হলেই কি সম্মানের অযোগ্য হয়ে যায়।

আমার মনে হল হয়তো নন্দ এবং তার বড়রা টোয়াইন্যামকে নিয়ে এমন ধরনের রসিকতা করে।

কিন্তু এখানকার লোকগুলো মোটামুটি ভালো। এদের মধ্যে একটি লক্ষ্যণীয় ঐক্য আছে। সব ক'টি সাহেব আড্ডা-বাজ। রোজ না হলেও সপ্তাহে দু'তিনটি সন্ধ্যায় তারা সেই টানেল মার্কা বারে এসে উপস্থিত হয়। সেই চীনা ভদ্রলোক মদ পরিবেশন করে। এ ব্যাপারটা জানি এইজন্য যে নন্দ এদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়ার জন্য নিয়ে গিয়েছিল আমাকে।

আমরা যখন সেখানে গেলাম ফাদার কানলিফ লম্বা টেবিলটার সামনে বসে আঙুল দিয়ে টেবিল বাজাচ্ছিল। পরনে পা পর্যন্ত ঝোলা আলখিল্লা। সাদা কাপড়ে মোড়া সোলাব টুপিটা টেবিলের উপরে রাখা। বাদামী রঙের মুখে খড়রঙের দাঁড়িগোঁফ। চোখে সোনা ফ্রেমের চশমা। লক্ষ্য করলে দেখা যায় কাঁচের আড়ালে ডান চোখের পক্ষ্মগুলি একদম ধবধবে সাদা। এখন টুপি খোলা আছে কাজেই লক্ষ্য করা গেল তার লাল টকটকে চুলের মধ্যে দু'তিন জায়গায় কয়েক গুচ্ছ চুল ধবধবে সাদা। দেহের এখানে ওখানে সাদা হয়ে উঠবার রোগটা তার আছে বলে মনে হল।

আমরা যেতেই ফাদার নন্দর দিকে চেয়ে বলল,—সো দিস্‌জ্‌ য়োর ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ড?

—হ্যাঁ। ইনি ফাদার কানলিফ, ইনি মিঃ বাগচি।

আমি বসামাত্রই ফাদার বলল,—আপনার পরনে গান্ধী পোশাক। আপনি কি আমাদের সঙ্গে থাকা পছন্দ করবেন!

—আমি আপনাদের সঙ্গে আনন্দিত হব।

—তা হলেই হল। অবশ্য আপনি মনে করবেন না গান্ধী পোশাকে আমার আপত্তি আছে। এদিককার তলদেশে নেমে জল ঘুলিয়ে না-তুললেই হল।

অন্য কেউ এসে পড়ার আগেই ফাদার তার বাড়িতে আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করল। নন্দ বিনা-নিমন্ত্রণেই যাবে। এদের পরস্পরের মধ্যে নিমন্ত্রণের প্রথা নেই।

এরপরে চার্লস এল। চার্লস নোল্যান্ড। নীল রঙের জমিতে সাদা স্ট্রাইপেব স্যুটে ফন্ রঙের সাদা বুটিদার টাই। মাথায় অত্যন্ত ছোট করে ছাঁটা তামাটে রঙের হাল্কা চুল। পদনখ থেকে মাথা পর্যন্ত যাকে এক কথায় ওয়েল গ্রুমড বলে। চোখদুটি লক্ষ্যণীয় ভাবে বর্ণহীন, প্রায় সাদা বলে মনে হয়। নাকটি অত্যন্ত উঁচু এবং আকারে মুখের তুলনায় বড়। সাদা কলারের মধ্যে গর্দান যেন ফাট-ফাট করছে। গলার স্বর ভারি।

চার্লস আমাকে প্রশ্ন করল, আমিই নন্দর ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ড কি না।

—হ্যাঁ।

—তোমাকে পেয়ে আমরা আনন্দিত হয়েছি। তুমি বস্তিতে গিয়ে অসন্তোষে ফুঁ দেবে না তো? হেসে বললাম—সে রকম কোন ইচ্ছা নেই।

—তা হলে তুমি আমাদের মধ্যে থাক। সোমবারে আমার বাড়িতে তোমার চায়ের নিমন্ত্রণ রইল। নন্দ এবং ফাদার দুজনে বিনা নিমন্ত্রণে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল।

নন্দ, ফাদার এবং চার্লসের আলাপ সোসাইটি টক্‌সে পরিণত হয়েছে। ফাদার এবং চার্লস মাঝে মাঝে আমাকেও আলাপে টেনে নিচ্ছে। যে যার প্রয়োজনের মতো এটা ওটা চেয়ে নিচ্ছি, চীনা ভদ্রলোক পরিবেশন করছে—এমন সময়ে দরজায় ছায়া ফেলে টোয়াইন্যাম এল।

আমি এতক্ষণে এর কথা দু'একবার ভেবেছি।

সে দরজার কাছেও কিছুক্ষণ দাঁড়াল, তারপর হাসিমুখে এগিয়ে এল।

চার্লস বলল—কী ব্যাপার? এয়ারশাফ্‌ট্‌ ঠিক চলছে না?

—তা চলছে।

যাদার বলল—তোমার সারাদিনের পরিশ্রম এখনও তোমার গায়ে লেগে আছে। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। এতখানি পরিশ্রম করে এখানে না উঠে এলেই পারতে। এতো আর ডিউটি নয়।

টোয়াইন্যাম কিছু না বলে টেবিলের এককোণে বসে ডাবল স্কচ চেয়ে বসল। সে যে তৃষ্ণার্ত তাতে আর সন্দেহ কী।

যাদার বলল—অনেকক্ষণ এসেছি, এবার চলি।

চার্লি বলল—তা বটে আমারও সময় হল। সিজনটা বদলাচ্ছে। আমার বাতটা আবার চাগিয়ে ওঠার লক্ষণ মনে হচ্ছে।

যাদার বলল—চল তা হলে।

ওরা দুজনে চলে গেল।

নন্দও উঠে দাঁড়িয়ে বলল—বাগচি আমার একটু কাজ আছে।

বললাম—বসো। সকলের সঙ্গে আলাপ হল। টোয়াইন্যামের সঙ্গে আলাপ করি।

টোয়াইন্যাম বলল—ঠিক আছে বাবু তুমি যাও, আমার অসুবিধা হবে না।

বার বোয়টি এতক্ষণে তার ডাবলস্কচ এনে দিল। আমরাও উঠে দাঁড়ালাম।

নন্দর বাড়ি ফিরে আমাদের চা-পান হল। ততক্ষণে নন্দ এপ্রন এঁটে তার ল্যাবরেটরিতে ঢুকে খুটখাট করতে বসেছে।

বললাম—এত রাতে কী কাজ?

—একটা স্যাম্পল পরীক্ষা করছি। বিভুদার একটা নতুন খনি পাওয়া যেতে পারে।

—তাহলে ক্লায়েন্ট হিসাবে কিছু রয়্যালটি পাবে? তা বেশ। তুমি কি মনে কর যাদারও এখন কাজ করে?

—ও [illegible] ও প্রাণপণ [illegible] সম্ভবত করছে।

—কিন্তু চার্লি [illegible] তোমাদের [illegible] যে বাতের রুগী তা কিন্তু বোধ হয় না দেখে।

নন্দ বলল—বাত ঠিক নয়। প্রায় চার বছর আগে এক একসিডেন্টে চোট খেয়ে ওর কোমর এবং বাঁ পা একেবারে অকেজো হয়ে যায়। তারপর থেকে প্রায় দুবছর শয্যাশায়ী ছিল। মাঝে মাঝে প্লাস্টার খুলে দিত আবার প্লাস্টার বাঁধত। এখনও ডাক্তারের পরামর্শে চলতে হয়। ঠাণ্ডা লাগলেই ব্যথা হয়।

হাতে কিছু কাজ ছিল না। নন্দ একাগ্র মনে কাজ করছে। বেশ লাগল। কর্মব্যস্ততার মধ্যে নিজেরাই কতগুলি প্রথা তৈরি করে নিয়েছে।

বললাম—নন্দ ওটা কি তোমাদের ক্লাব ঘর?

—প্রায় তাই।

—তোমাদের এই সাহেব পাড়ায় দেখতে পাই কতগুলি ঝকঝকে সাজানো বাড়ি পড়ে আছে। একটা ভালো ঘরে ক্লাব করো না কেন?

—পড়ে আছে কোথায়? ওগুলো গেস্ট-হাউস হিসাবে ব্যবহার হয়।

—তোমাদের এখানে গেস্ট আসে নাকি?

—তা আসে বৈকি। পার্টনারদের কেউ কেউ আসে শীতকালে। তখন শিকারের ব্যবস্থা হয়। এখন এই যে খালি পথ পড়ে থাকতে দেখছ তখন তা থাকে না।

একটা ব্যাপার সন্ধ্যা থেকেই আমার কাছে কৌতুকের মতো বোধ হচ্ছিল।

আমি বললাম—তোমাদের টোয়াইন্যামের কাছে ছাড়া আর দু'জনের কাছেই নিমন্ত্রণ পেলাম।

টোয়াইন্যামের বাড়িতে বিনা-নিমন্ত্রণেই যাব ভাবছি।

—ওর বাসা চেনো?

—এই আট দশ খানার একখানা হবে।

—তা নয়, নন্দ হাসল, টোয়াইন্যাম ব্রিজের ওপারে আফিস-পাড়ায় থাকে।

—তার মানে সে তো বস্তিপাড়া তোমাদের চোখে।

নন্দ চোখ তুলল। বলল—অবাক লাগছে?

—তা লাগছে। সাহেব পাড়ায় সাহেব না থেকে তুমি বাঙালি হয়েছ সাহেব।

—ব্যাপারটা এই . নন্দ হাতের কাজ সরিয়ে রেখে বলল, সাহেবরা এ দেশীয়দের ঘৃণা করে পাড়ায় ঢুকতে দেয় না, এমন কথা উঠেছিল। তাই এ ব্যবস্থা করে দেখানো হয়েছে এই পাড়ায় পাড়ায় ভাগ চামড়ার রং হিসাবে নয়, পদের গুরুত্ব হিসাবে।

—কিন্তু এতে টোয়াইন্যাম দূরে পড়ে যাচ্ছে না?

ফাদারের বাসায় নিমন্ত্রণে আমি আর নন্দ যখন গেলাম তখন সন্ধ্যা হচ্ছে। ফাদারকে পেলাম আমরা তার পরিবারের মাঝখানে। তিন চারটি সাহেবি পোশাক পরা নাক-চ্যাপটা শিশু ফাদারের হাঁটু ধরে গল্প করছে। টেবিলের অন্যদিকে একটি নান বসে আছে। তার সাদা লম্বা গাউন, গলার রূপোর ক্রস, মাথার ভেইল—এই মনে আছে। তার মুখের কথা মনে হলেই বরারের মুখোসের কথা মনে পড়ে।

আমরা যেতেই ছেলেরা চলে গেল।

ফাদার বলল নানকে ডেকে—আমাদের সঙ্গেই চা খাও।

টেবিলে বসে গল্প হল।

নন্দ বলল—ছেলেগুলোকে দেখে তোমার কী মনে হয়েছে বাগচি?

—কানলিফকে তারা নিজেদের ফাদার বলেই মনে করে।

—তা করে। নান বলল।

—এরা বোধ হয় সবাই পিতৃমাতৃহীন অনাথ?

কানলিফ হেসে বলল—সেই তো হয়েছে মুস্কিল। এদের সব বাপ-মা আছে।

—এই স্কুলে পড়ানোর নাম করে আটকে রাখা গেছে। বলল নান।

—আটকে রাখা মানে?

—ছেড়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের পুরানো সংস্কৃতিতে ফিরে যাবে।

—তার মানে খ্রিস্টান থাকবে না?

কানলিফ একটু ইতস্তত করে বলল—ঠিক তা নয়।

চায়ের আয়োজনটা ভালোই ছিল। একটি মহিলা পরিবেশন করছিল। তার জাতি বুঝবার উপায় ছিল না। তার ছাপা-ছিটের সাদা মাটা গাউনের উপরে এপ্রন-আঁটা ভঙ্গিটায় ক্লান্তি ছিল না।

নন্দ বলল—ফাদারের খ্রিস্টানত্ব ছাড়াও অন্য একটি বিষয়ে ফেইথ আছে।

কানলিফ বিস্মিত হয়ে বলল—কী রকম?

—টেবিলের বিশেষ এক ধরনের ম্যানার্সে।

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলাম।

—তা ঠিক বলতে পারি না। বলল কানলিফ, এ কথা সত্যি এই ছেলেগুলিকে বাপ-মায়ের কাছ-ছাড়া করে রাখতে অনেক টাকা খরচ করতে হয়।

—স্কুলের খরচ?

কানলিফ একটু ভাবল, তারপর সবল ভাবেই বলল—ছেলেদের বাপ-মাকে টাকা ঘুষ দিতে

হয়।

—অদ্ভুত!

নান বলল—এটা অবশ্য ফাদার কানলিফের দাক্ষিণ্য গোপনের চেষ্টা।

বাসার পথে ফিরতে ফিরতে নন্দকে বললাম,—তুমি কি মনে করো, কানলিফ আমাদের জাতীয়তাবোধে ফাটল ধরাবার চেষ্টায় কতগুলো চর সৃষ্টি করছে এই ছেলেগুলো দিয়ে?

নন্দ বলল—একই বিষয়ের নানা অর্থ করা যায়।

—তা যায়।

সোমবাব দিন চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল নোল্যান্ডের বাসায়।

তাব বড় ড্রয়িংরুমের মাঝখানে চা খেতে বসেছিলাম আমরা। এক সময়ে দাবার কথা উঠল। চা শেষ হলে দাবা এল। নন্দ এবং নোল্যান্ড সেই ঘরেই একটা ছোট টেবিলে বসে যাবে কিনা ইতস্তত করছিল। কানলিফ উঠে দাঁড়াল, বলল, মিস্টার বাগচি, চলো তোমাকে কিছু দেখাব।

আমার মনে হল বন্ধুকে দাবার নেশায় কৃপণ হতে দেখে কানলিফ এরকম প্রস্তাব করল। আমিও তার পেছনে পেছন উঠে চললাম।

নোল্যান্ডের বাড়ির চারিদিকে একটা লন আছে। সেই লনেব উপর দিয়ে লাল সুরকির রাস্তা। সেটা ধরে আমবা নোল্যান্ডের বাডিব কিচেনের কাছে পৌঁছলাম।

দ্রষ্টব্য কিছু আমার চোখে পড়ে নি তখনও। কানলিফের সঙ্গে এটা সেটা নিয়ে আলাপ করছিলাম চলতে চলতে।

কানলিফ বলল—ওই দেখো।

পাশাপাশি কয়েকটি খাঁচা। কোনটা ছোট, কোনটা বড়। কোনটার মুখ তারের জাল দিয়ে ঢাকা, কোনটায় মোটা লোহাব শিক। তারের জাল দিয়ে ঢাকা খাঁচায় কয়েক জাতের পাখি। লোহার শিক দেয়া খাঁচায় দু এক জাতের বাঁদর।

—বাহ্ এ যে দেখছি বেশ একটি চিড়িয়াখানা। অবিশ্যি আমার বক্তব্যে আতিথ্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টাও ছিল।

এমন সময়ে বড়সড় একটা বাক্সর কাছে দাঁড়াল কানলিফ—এটা দেখো।

আমি বললাম—লেপার্ড?

—ভালো করে দেখো।

ভালো করে দেখে আমাকে মত বদলাতে হল। লেপার্ড বা চিতা এতো মোটা হয় না। এ যেন বসে বসে খেয়ে খেয়ে গতর ফুলিয়েছে।

—এটা জাগুয়ার। অন্য গোলার্ধের জীব। কানলিফ বলল। সে প্রাণীটাকে কিটি কিটি বলে ডাকল। প্রাণীটা যেন কান খাড়া করে শুনল।

জাগুয়ারটার সামনে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমরা আর একটু দূরে গেলাম। সেখানে একপাল হরিণ। বুড়োবুড়ি কাচ্চা-বাচ্চায় মিলে সাত আটটি। পাহাড়ে অনেক সময়ে ঝরনা থাকে। তারই একটিকে সিমেন্টে বেঁধে চির-প্রবাহিত করা হয়েছে। এটাই আমার সব চাইতে ভালো লাগল।

কিন্তু জাগুয়ারটা আমাদেব মনোযোগ আকৃষ্ট করল। সেটা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছে। একটা চাপা গর্জনের শব্দ হচ্ছে। নখ দিয়ে খাঁচা আঁচড়াচ্ছে, ল্যাজও আছড়াচ্ছে বলে মনে হল।

কানলিফ লম্বা লম্বা পা ফেলে খাঁচাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কতকটা ধমকের সুরে জাগুয়ারটাকে ডাকল। সেটা থামল কিন্তু মাঝে মাঝে নীরবে তার ধারালো দাঁতগুলো দেখাতে লাগল।

কানলিফ বলল—যা ভেবেছিলাম তাই। টোয়াইন্যাম এসেছে।

—কি করে বুঝলেন?

—ওই দেখো।

খাঁচার মধ্যে একটা রুমাল শতছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। আর তার উপরে একটা পা তুলে দিয়ে জাগুয়ারটা মেজাজ দেখাচ্ছে।

কানলিফ বলল—টোয়াইন্যামের ওই বদ স্বভাব। এলেই রুমাল দিয়ে ইঁদুর বানিয়ে খাঁচায় ফেলে দিয়ে খেপাবে।

আমাদের কথায় টোয়াইন্যাম বাঁ হাতে এক টুকরো স্যান্ডউইচ কামড়াতে কামড়াতে এক কাপ চা ডান হাতে নিয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল কিচেনের পাশ থেকেই যেন।

কানলিফ বলল—কি করে জানলে আমরা এখানে আছি? গন্ধ পেলে?

—দোকানে যেতেই চীনা বলল। আমি কি কুকুর?

আমি বলতে যাচ্ছিলাম—এত দেরী হল কেন?

কিন্তু, কথা বলে কার সাধ্য! জাগুয়ারটা আকাশ শুঁকে যত টোয়াইন্যামের গন্ধ পাচ্ছে তত যেন খেপে উঠছে।

কানলিফ বলল—দেখেছ কেমন বানিয়েছ এটাকে। কেন বাপু এটাকে ইঁদুর দিয়ে খেপাও।

—বুড়ী হচ্ছে বসে থেকে তার চাইতে খেপাও ভালো মেয়েদের পক্ষে। ওটা আমাদের খেলা।

—একদিন এরকম একটা মেয়েই তোমার ঘাড় মটকাবে।

টোয়াইন্যাম বলল—আমেন।

টোয়াইন্যাম চাপা হাসিতে ফুরফুর করতে করতে চলে গেল। জাগুয়ারটাও আর দু'একবার পাক খেয়ে থামল। একই ভাবে ব্রুকস্ ও স্মিথেব সঙ্গেও পরিচয় হলো। চা খাওয়া হলো তাদের বাংলোয়, নন্দর বাংলোয়। যেমন নন্দ এরাও যেন তেমন ব্যাচেলর সব। নাগা, খাসিয়া স্ত্রী পুরুষ সকলের বাংলো দেখে।

এদিকে ফিরে দেখলাম নন্দর খেলা শেষ হয়েছে, সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

নন্দ তার স্যাম্পেলটা নিয়ে অত্যন্ত মেতে উঠেছে। মাঝে মাঝে বিকেলে একাই বেরিয়ে পড়তাম। একা একা পথ চলতে গেলে সময়ের জ্ঞান আমার থাকে না। এ পথে ও পথে ঘুরে ঘুরে একদিন আমি পথ হারিয়ে ফেললাম। তখন বিকেল শেষ হয়েছে যদিও সন্ধ্যার কিছু দেরী আছে। ধূসব একটা আলোর রং ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে এদিকে। ওদিকের পাহাড়ে ক্ষীণ একটা চাঁদ কোনক্রমে উঠি-উঠি করছে।

পথের ধারে একটা পাথরের উপরে বসে চিন্তা করে দেখছি ডাইনে কিংবা বাঁয়ে কোনদিকে যাওয়া উচিত, পাশের একটা ঝোপের মধ্যে একটা পাখি আর একটির সঙ্গে ঝগড়া করল। আধ-অন্ধকারে তারপর মানুষের গলাও পেলাম। মানুষ দুটি কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। ওদের আলাপের মধ্যে যাওয়া উচিত হবে না। অথচ ওদের পেছন পেছন নিঃশব্দে চলে লোকালযে পৌঁছাতে পারব এই ভেবে চুপ করে রইলাম।

একজন বলল—কিন্তু তোমার ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করা উচিত।

—কিন্তু আমার তো মন বলে একটা কিছু আছে।

—তুমি কি বলতে চাও ফাদার তোমাকে ত্রিশ হাজার টাকা দেয় নি?

—খুব বলেছ। ত্রিশ হাজার টাকায় সন্তান বিক্রি হয় বটে।

—সে কথা তোমার আগেই চিন্তা করা উচিত ছিল। এখন তোমার উচিত হবে তুমি যে ভদ্র ও সজ্জন কথা রেখে তার প্রমাণ দেয়া।

একটু থেমে পুরুষটি বলল—তুমি কি মনে কর, জেন, ত্রিশ হাজার টাকায় স্মৃতিও বিক্রি হয়?

—হয় না, না? তুমি একটি কাপুরুষ। তুমি—ক্যাড ক্যাড ক্যাড।

—তা বলো। কিন্তু মনে রেখো আমি তোমার কিছু করতে না পারলেও তোমার জীবনের সব চাইতে বড় আশাটা নষ্ট করে দিতে পারি। এখন থেকে দশ বছর পরে হলেও শুধু কথায় কথায়, শুধু গল্পচ্ছলেই কোন ছেলেকে কথাটা অর্থাৎ এই ত্রিশ হাজারের কথাটা বলে দিতে পারি।

—তুমি কি অবশেষে আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চাও। কিন্তু কী চাও তুমি? কেন তুমি এমন করবে?

—আমাকে একটু মানুষ বলে মনে করে দেখো না, কী হয়।

—আমি কি তা করি না। আমি কি তোমাকে নিমন্ত্রণ করতেই আসিনি?

—তা, এসেছ।

আমার ধারণা হল এদের মধ্যে একজন টোয়াইন্যাম। মেয়েটি ফাদারের নাম করেছে। ফাদারের বাড়িতে ছেলেকে মানুষ করার সুযোগ পাওয়ার জন্য তাদের বাপ মাকে টাকা ঘুষ দেওয়ার কথা শুনেছিলাম বটে। কিন্তু তার পরিমাণ ত্রিশ হাজার এ যেন অবিশ্বাস্য। দ্বিতীয় কথা টোয়াইন্যামকে যেন নতুন করে চিনলাম। টাকার লোভে কি সে সত্যি কারো সন্তান বিক্রি করেছে?

কিন্তু ততক্ষণে আমি পথের আন্দাজ পেয়েছিলাম। একটা শাখা পথ পেয়ে ওদের পেছন পেছন চলা ছেড়ে ঘোরা পথে এগিয়ে গেলাম। স্ত্রীলোকটি কি কানলিফের বাংলোয় গেল? ছেলেমেয়ে কেনার আড়কাটি? এই অন্ধকারে চেনা যায় না। ব্যস্ত নার্ভাস ভঙ্গি দেখা যায়।

মনে হল নন্দর সঙ্গে আলাপ করি। কিন্তু পরে মনে হল ওই মেয়েটি টোয়াইন্যামকে ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করতে বলেছিল। কথাটা সকলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। গোপনে কারো কথা শুনে তা নিয়ে আলাপ করাটা ভদ্রতা নয়। নন্দ নিশ্চয় আমাকে গুপ্তচর হিসাবে ডাকে নি।

দু চার দিনেই হঠাৎ শীতটা পড়ল। দিনের বেলায় হাল্কা জামায় সহ্য হলেও রাত্রি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেটা বাড়তে থাকে। আরও বেশী শীত পড়লে পায়ে হেঁটে নেমে যাওয়া সম্ভব হবে না।

একদিন নন্দকে বললাম—এবারের মতো তা হলে চলি, কী বলো?

—তা যাও।

নন্দর স্বীকৃতিটা যেন কেমন দমিয়ে দিল আমাকে। অনেক কাল এখানে আছি, নন্দর আতিথ্যে কোথাও কার্পণ্য প্রকাশ পায়নি। চলে যাওয়ার প্রস্তাব তুললে নন্দ একটু আপত্তি তুলবে আশা করেছিলাম।

এখন মনে হল হয়তো বা নন্দ আমার ব্যাপারে আর আগ্রহশীল নয়। ওদের একটা অদ্ভুত সমাজ-বিচরণ আছে। কানলিফ-নোল্যান্ড-নন্দ-টোয়াইন্যাম-স্মিথ ব্রুকস, এদের চাল চলনে পরস্পরের প্রতি একটা টান দেখা যায় যেটা একই কর্মক্ষেত্রে কাজ করলেই শুধু জন্মায় না। আমার উপস্থিতি সেখানে অপ্রয়োজনের।

আহারাদির পর রাত্রিতে কথাটা আবার পাড়তেই নন্দ বলল—যাবে বললেই কি যাওয়া। নোল্যান্ডের ছেলের জন্মদিনের নিমন্ত্রণপত্র এসেছে আজ। তোমার নামেও।

—নোল্যান্ডের ছেলে বউ আছে বলে জানতাম না। এখানে কি তা কারো আছে?

—তুমি না জানলেই কি থাকতে নেই, বলে নন্দ একখানি ঝকঝকে কার্ড আমার হাতে দিল। সে খুশিমুখে বলল—দিন পনেরো হল, নোল্যান্ডের স্ত্রী এসেছে ছেলেকে নিয়ে। আমিও জানতাম না। খনির নতুন সীম নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। ব্রুকস বললে আজ।

—তা হলে থাকতেই হয়।

এরপরে নোল্যান্ডের ছেলের জন্মদিনে কী দেয়া যায় তাই নিয়ে আলাপ হল। নন্দ একটা অত্যন্ত দামী খেলনার জন্য শিলং-এ অর্ডার দেবে স্থির করল। আমি স্থির করলাম খনির ভেতরের যে

কয়েকটি ছবি এঁকেছি কার্যরত শ্রমিক ও ফোরম্যানদের তারই খান দু এক দিয়ে যাব।

নোল্যান্ডের বাড়িতে এর আগে গিয়েছি কিন্তু এমন সমারোহ দেখিনি। টেবিলের ধারে কানলিফ, নন্দ ও আমি বসেছি। নোল্যান্ড হোস্টের কায়দায় কথা বলছে কিন্তু হঠাৎ কখনো তার ঘরোয়া সুরও বেরিয়ে পড়ছে। ব্রুকস, স্মিথ এল। এক রাউন্ড ড্রিঙ্কস্ হল। এমন সময়ে মিসেস নোল্যান্ড তার ছেলেটিকে নিয়ে প্রবেশ করল। ছেলেটির বয়স বছর তিনেক হবে। সুন্দর শিশুটি। তার বৈশিষ্ট্য তার চুলে। এমন অগ্নিবর্ণ চুল সহসা চোখে পড়ে না। এমন চুল মিসেস নোল্যান্ডের ছিল। শুধু মিসেসের চুলে দু একটা সাদা আঁশ দেখা গিয়েছে। ছেলেটির অবয়ব বৈশিষ্ট্যও তার মায়ের, রংটি আর একটু উজ্জ্বল। উপহার পর্ব চুকল। আয়া শিশুটিকে নিয়ে গিয়ে অন্য টেবিলে খাওয়াতে শুরু করলে। তারপর আমরা টেবিলে বসলাম।

গল্প ও আহার চলতে লাগল।

মিসেস্ নোল্যান্ডকে আমার অনেকদিন মনে থাকবে। হাল্কা গড়ন। চৌকো কাচের সোনার ফ্রেমের রিমহীন চশমা। হাতের আঙুলগুলি এককালে খুবই দর্শনীয় ছিল। প্লাটিনামের একটা সাদাসিদে আংটি পরা ডান হাতখানাই আমার বারবার চোখে পড়ল। এখন হাতের পিঠে শিরা বার হয়েছে। তার যৌবন এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায়। কিন্তু তার চুলের কথা আবার বলা যায়—যে চুল তার ছেলে পেয়েছে। একটু যেন বেশী ধীর বলে মনে হল তাকে। তার হাসির চারিদিকে যেন কেমন একটা দূরের কিছু আছে।

আমরা তখন আহার পর্বের মাঝামাঝি, টোয়াইন্যাম এল।

নোল্যাণ্ড বলল,—এসো এসো।

কানলিফ বলল,—তুমি সব সময়ই পিছিয়ে আছ।

টোয়াইন্যাম কিছু বলল না। তার ঠোঁট দুটিতে হাসি ফুটল।

কিন্তু আজ আমার বিরক্ত বোধ হল। সে যেন ইচ্ছা করেই নোংরা হয়ে এসেছে। সে ফোরম্যান হতে পারে তাই বলে তার ডিনারে আসবার একটা পোশাকও নেই এটা বিশ্বাস করা যায় না। তাকে আমি পুরো পোশাকেও দেখেছি। হাঁটুর উপরেও বার করা শর্টস্ ও বুক খোলা ময়লা খাকির সার্ট পরে আসাটা মানাতো যদি এটা ফ্যানসি-ড্রেস বল্ হ'ত। কারো ছেলের জন্মদিনের ডিনারে তা অসভ্যতা।

দুএকটি কথার পর টোয়াইন্যাম নোল্যান্ডের ছেলের কাছে গিয়ে এগিয়ে গিয়ে তার দুহাতে একরাশ টফি দিল। তারপর বলল,—আমার আর কী দেয়ার আছে? বড় হও, খনির কাজকর্ম শিখিয়ে দেব।

ছেলে যারই হক টফিতে তার লোভ থাকবেই। টফি হাতে পেয়ে ছেলেটা টেবিল-ম্যানার্স মনে রাখতে পারল না, চেয়ার থেকে নেমে টেবিলের তলা দিয়ে গলিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ এদিক ওদিক চেয়ে মিসেস নোল্যান্ডও উঠলেন। ছেলের হাত থেকে টফি কাড়তে তাকে বাইরে নিলেন।

—দেখে আসি। ছেলেটার অতগুলি টফি খাওয়া ভালো হবে না।

এই গলা কি আগে শুনেছি? এই ব্যস্ত হয়ে চলার ভঙ্গি কি দেখেছি?

কানলিফ হাসিমুখে বলল—অশান্তি সৃষ্টি করাই তোমার স্বভাব।

টোয়াইন্যাম বলল—টফিগুলোতে কি কিছু ছিল বলে আপনার ধারণা?

নোল্যান্ড বলল—অতগুলো কিনা। ওগুলো দামী হলেও অসুখ করতে পারে।

অত্যন্ত বিব্রত হওয়ার ভান করে টোয়াইন্যাম বলল—তা বটে।

নন্দ এবং আমি ভাঙা আসর জমানোর চেষ্টা করলাম। নোল্যান্ডের ছেলে টফিহারা হয়েও বোধ হয় মায়ের শাসন টেবিলে ফিরে এল। তার চোখ মুখ দেখে বোঝা গেল এইমাত্র তার কান্না মুছিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মিসেস নোল্যান্ড ফিরল না।

আহারাদি শেষ করে আমরা যখন স্মোকিংরুমে অগ্রসর হচ্ছি, মিসেস নোল্যান্ড ক্ষমা চাইতে এলেন। আমাদের সঙ্গে এটা ওটা নিয়ে কথা বললেন মাথা ধরার কথাটা আমরাই এগিয়ে দিলাম। কিন্তু টোয়াইন্যামের দিকে বড় জোর পাশ দিয়ে দাঁড়ালেন, সামনা সামনি দাঁড়িয়ে একটা কথাও বললেন না।

ফিরতি পথে আমি বললাম—টোয়াইন্যামের পোষাকে ভাঁড়ামি ছিল। তার এই টফি আনার ভঙ্গিটাতেও তেমনি থাকতে পারে কিছু। ওদিকে ওব শাস্তিও দরকার। কিন্তু আসর ভেঙে যাওয়ায় সে বোকা প্রতিপন্নই হয়েছে। তা সত্ত্বেও ওকে অমন করে লজ্জায় ফেলা উচিত হয় নি।

—বুড়ো বয়সের ছেলের বেলায় মানুষ অমন অতিশয় সাবধান হয়।

—তা হও। কিন্তু তাই বলে একটি গেস্টকে অমন না করলেও হত। মিসেস নোল্যান্ড ওর সঙ্গে একটি কথাও বলল না। ইংলিশ শালীনতা বোধ?

—এমনও তো হতে পারে মহিলা নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। চেষ্টা করেও টোয়াইন্যামের সঙ্গে কথা বলতে পারে নি।

—তা পারে।

এরপরে আমাদের কথা ছেলেটার দিকে গড়াল।

একটু ইতস্তত করে আমি বলেছিলাম—তুমি বলছিলে, নন্দ, নোল্যান্ড বছব চারেক আগে এক একসিডেন্টে পড়েছিল।

নন্দ বলল—তুমি কি বলতে চাও আমি বুঝেছি।

—এটা তাহলে ওদের দত্তক পুত্র। ফাদার কানলিফের ঘরেও এমন কয়েকটি আছে বটে।

আমি চলে আসব। নোল্যান্ড বলল,—বাগচি, তার আগে চলো একদিন শিকার করে আসি। ওটা না দেখলে নংপু দেখা শেষ হয় না।

—শিকার আমি করি নি কখনও, ওতে আমার আগ্রহ নেই। আপনার...

—নাই থাকল। দেখবে। তা হলে যেতেই হয়, তুমি হয়তো নতুবা ধারণা করবে নোল্যান্ড প্রতিবন্ধী।

বাঘ ভালুক শিকার নয়। ময়ূর শিকার। আর যত না শিকার তার চাইতে বেশী আনন্দ করা।

আমরা যখন কিছুদূর এগিয়ে গেছি নোল্যান্ডের একটি চাকর এসে বলল—জাগুয়ারটা ছাড়া পেয়েছে। খাঁচায় দেখলাম না।

—কী মুশকিল! দরজা খুলে দিল কে? আমাকে তা হলে ফিরে যেতে হয়।

কানলিফ বলল— ও কারো ক্ষতি করবে না। তা ছাড়া তোমার বাড়ির ঘেরা টপকে পালাতে পারবে না। খাঁচায় খাবার রেখে দিলে সময় হলেই খাঁচায় গিয়ে ঢুকবে।

—তা যাবে।

—চাকরকে তাই বলে দাও।

নোল্যান্ড তার চাকরকে উপদেশ দিয়ে বিদায় দিল। তারপর বলল—কিন্তু খাঁচার দরজা খুলে দিল কে?

ঝাড়ুদারের ভুল হতে পারে, বলল নন্দ।

টোয়াইন্যাম বলল—ওতে ব্যস্ত হওয়ার কি আছে। সে হেসে বলল, খাঁচার দরজাটা আমিই খুলে দিয়েছিলাম।

—কেন? ওটাকে না খেপালে কি তোমার একদিনও চলে না? আর এই সাত সকালে তোমার ওর কাছে যাওয়ারই বা কী দরকার ছিল?

টোয়াইন্যাম লঘুচিত্তে বলল—তাতে হল কী? ওটা একটা বুড়ি বিড়াল বইতো নয়। ও হয় তোমার বাড়িতেই বসে থাকবে কিংবা তোমার পেছনে পেছনে তোমার কাছে এসে যাবে।

নোল্যান্ড বলল—এর আগে একবার তা হয়েছে বটে। ভেবেছিলাম হারিয়ে গেছে কিন্তু এল ফিরে।

—তবে? বিড়ালরা কখনো আবামের আশ্রয় ভুলতে পারে?

কানলিফ বলল—একটা পঁচিশ বছরের ছোকরার কাছে এর চাইতে বেশি কি আর আশা করা যায়।

টোয়াইন্যাম দমল না। বলল—পঁচিশ বছরের দোষ বর্তমানে যাদের পঞ্চাশ তাদেরও এক সময়ে ছিল এরকমই ফাদার?

নোল্যান্ড বলল—থামো, বাপু, থামো।

পিচ বাঁধানো পথ ছেড়ে আমরা পাহাড়ের গায়ের আঁকাবাঁকা পথ ধরে নামতে লাগলাম। বেশি দূরে নয়। নোল্যান্ড তা পারে কি? কিছু দূরে গিয়ে আমার মনে হল এই পথ আমি চিনি। এ রকম কোন জায়গাতেই আমি পথ হারিয়ে পাথরের উপরে বসে পড়েছিলাম। আর এখানেই কোথাও টোয়াইন্যামকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল একটি স্ত্রীলোক এবং সেই ত্রিশ হাজার টাকার কথাও উঠেছিল।

শিকারের জায়গাটা সেই পথের ধারেই। একটা ছোট উপত্যকা। বড় বড় গাছ তেমন নেই। সরু সরু ঝরনাধারা কয়েকটি আছে। কোনটিতে জল চলছে, বেশী ভাগ শুকনো। পাথরের অবস্থান দেখে মনে হয় বর্ষায় অনেক ঝরনা নতুন করে সৃষ্টি হয়। এক রকম বড়জাতের ঘাস। এক রকম অত্যন্ত সরু সরু বাঁশের ঝোপ। দুচার রকমের লতা এক রকমের কাঁটা গাছ বেয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রান্তরটির বিচিত্রতম বিষয় অন্য কিছু। এখানে সেখানে গোল, চারকোণা পাথর ইতস্তত ছড়ান অবস্থায় দেখা গেল। সহসা মনে হয় কোন একটি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। জামসিদের প্রাসাদ নয়। দেখে মনে হয় যাদের তৈরি এই প্রাসাদ তারা পাথরকে গোল ও চতুষ্কোণ করতে শিখেছিল, পাথরের গায়ে চিত্র উৎকীর্ণ করার স্তরে পৌঁছায় নি। তেমন উঁচু নিচু নয়। তাহলেও নোল্যান্ডের কষ্ট হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে। বন্দুক বেয়ারার হাতে, নোল্যাণ্ড মাঝে মাঝে এর তার কাঁধে ভর না দিয়ে পারছে না। নন্দ জনান্তিকে বললে, প্রতিবন্ধী দেখাতে চায় সে তা নয়।

ময়ূরও ছিল। নোল্যান্ড আর টোয়াইন্যামের দুই বন্দুকে পাঁচ ময়ূর প্রায় দুঘন্টার পরিশ্রমে বধ হলে আমরা সকলে একটি বীচগাছের ছায়ায় বসেছি। আহার্য এবং পানীয়ের সুবন্দোবস্ত ছিল। তারই সদ্ব্যবহার করছি। টোয়াইন্যাম আতপ্ত ঘাসে একবার গড়িয়েও নিল।

কথাটা তখন ধ্বংসস্তূপ নিয়ে গবেষণা ছেড়ে সম্ভাব্য চা-বাগানে পৌঁছেছে এমন সময়ে টোয়াইন্যাম উঠে বসল।

—আমি প্রাণীর গন্ধ পাচ্ছি। একটা বোটকা গন্ধ নাকে আসছে।

—ভালুক নাকি?

—কদাচিৎ ভালুকও আসে এদিকে।

টোয়াইন্যাম তার রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে কিছুদূর এগিয়ে গেল।

ব্যাপারটা ঘটল দুচার মিনিটের মধ্যে।

টোযাইন্যাম আমাদের দিকে ফিরে হেসে বলল, নোল্যান্ডের সেই বুড়ি বিড়ালটা। ঠিক এসেছে গন্ধে গন্ধে। বলতে বলতে টোযাইন্যাম বন্দুক রেখে পকেট থেকে তার রুমালটা বার করে একটা ইঁদুর বানাতে সুরু করল। একটা চাপা গর্জন উঠতে লাগল কোন ঝোপের আড়াল থেকে।

কানলিফ বলল—আহ্, টোযাইন্যাম কী বাঁদরামি কর।

একটি মুহূর্ত মাত্র। সহসা কালোয় পাঁশুটে মেশান ভারি একটা কিছু কামানের গোলার মতো টোযাইন্যামের দিকে শূন্য দিয়ে ছুটে এল। টোযাইন্যাম কতকটা যেন নাচের ভঙ্গিতে পাশ কাটিয়ে সরতে গেল। কিন্তু তার পাযের তলায় সমান জমি নয়, উঁচুনিচু পাথর। টোযাইন্যাম পড়ে গেল এবং তার উপরে জাগুয়ারটা।

এখন আমার মনে হয় একটা ভয়ঙ্কর ভীত আর্তনাদ করেছিল। সে সময়ে আমার মনও অত্যন্ত ভয়গ্রস্ত এবং বিচলিত ছিল। সে রকম অবস্থায় পলকের সময়কে পাঁচ দশ মিনিট বলে অনুভব হয়। অনেকদিন এই কথাগুলো চিন্তা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে - টোযাইন্যাম জাগুয়ারটার গুরুভার দেহের তলায় ছটফট করছে আর আমরা বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে দেখছি।

কে যেন বারংবার বলছিল,—শুট, শুট, গুলি করো। হয়তো কানলিফ। হয়তো নন্দ।

বিমূঢ়তা কাটাতে হাতে-বন্দুক শিকারীর পক্ষে যতটা দেরী হওয়া সম্ভব, তার চাইতে অনেকটা বেশী যেন দেরী হয়ে গেল নোল্যান্ডের। অথবা অনেকদিনের পোষা জানোয়ারকে হত্যা করতে দ্বিধা হয় মানুষের।

তারপর সে গুলি করল। অব্যর্থ লক্ষ্যের একটি গুলিতে জাগুয়ারটা ঘুরে পড়ে গেল।

রংপুরবাজারে নাপিত বলল—আপনি যে এত বড় সাহেব আমি জানতাম না, মাপ করুন।

—আমি ছোট বড় কোন সাহেবই নয়। কাল চলে যাচ্ছি পিচের পথ ধরে, আজ তোমার কাছে খেতে এলাম।

তার চোখে জল আসবে বলে মনে হল।

সে রুটির ময়দা ঠাসতে ঠাসতে বলল—সাহেব, আপনি যে নোল্যান্ড, কানলিফ, নন্দ সাহবের বন্ধু তা আমরা সকলেই এখন জানি।

তরকারি নামিয়ে রু'টি বেলতে বসে বলল—টোযাইন্যাম সাহেব

—হ্যাঁ। এক্‌সিডেন্ট, মানে জাগুয়ারটা—

একটি মাঝারি মানুষের গল্প

দিনের বেলাতেই ছাপাখানার ঘরটাকে ঝাড়পোঁছ করা হয়েছিল। দরজায় আমের পাতা ঝোলানো, প্রেসমেসিনের গায়ে সিঁদুর দেয়া প্রভৃতিও বাকি ছিল না। সন্ধ্যায় দরজার দু-ধারে গুটি চারেক প্রদীপ জ্বলছে। প্রেসের ছোকরা প্রদীপে তেল দিচ্ছে আর বুড়ো কম্পোজিটর হাতটাকে খাটো করতে বলছে তাকে। সব কটা প্রদীপ না-নেবা পর্যন্ত ছাপাখানার দরজা খুলে বসে থাকতে হবে তাকেই। ফলে ছাপাখানার মালিক বজ্রভূষণের বাড়ির নিমন্ত্রণের রান্না জুড়িয়ে যাবে। অন্যান্যবারের মতো এবার এক ঠোঙা জিলিপি পাঠিয়ে সারছে না সে জন্মদিন। আর এ নিয়েই তারা আলোচনা করছিল।

শুধু ছাপাখানার জন্মদিন নয়, শহরের একমাত্র সংবাদপত্র সাপ্তাহিক জনমতেরও জন্মদিন আজ। পত্রিকাটা দু-এক বছর চলার পরেই একটা হাতে-ঠেলা প্রেস মেসিন ও দু-কেস অক্ষরের এই ছাপাখানা কিনেছিল বজ্রভূষণ, কিন্তু ছাপাখানার দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছিল পত্রিকার জন্মদিনে। পত্রিকার জন্যই ছাপাখানা, কাজেই এটা খুব অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু আর একটা ব্যাপার আছে—বজ্রভূষণ নিজের জন্মতিথিতেই ছাপাখানা এবং পত্রিকার জন্মক্ষণ ঘোষণা করেছিল, তাদের প্রকৃত জন্মক্ষণ থেকে সরে এসে।

শহরের অন্য এক পাড়ায় একটি বাড়ির বারান্দায় আলো দেয়া হয়েছে। গলি রাস্তা থেকে চার পাঁচ ধাপের একটা সিঁড়ি, তারপরে এই সরু বাবান্দা। তার ধার দিয়ে এবং সিঁড়ির ধাপে-ধাপে কয়েকটি প্রদীপ মিটমিট করছে। অন্ধকার সরিয়ে দেবার মতো আলো নয়, গলির উল্টোদিকের লোনাধরা দেয়ালের গায়ে অন্ধকারটা একটু কাঁপছে মাত্র। মিটমিটে সেই আলোয় পুরনো ছোট বাড়িটা বজ্রভূষণের।

বারান্দার দরজা দিয়ে বজ্রভূষণের বৈঠকখানা। একটা হারিকেন জ্বলছে ঘরে। জন্মদিনের দরুন হারিকেনটা অন্য দিনের তুলনায় পরিচ্ছন্ন। কিন্তু হারিকেনের আলো যতটা পারে তার বেশি আলো হয়নি ঘরে। ছায়াই বেশি আলোর চাইতে। ঘরটার একদিকে একটা খোলা র‍্যাকে মলাট-খসা ধুলো-ঢাকা কয়েকখানা আইনের বই। টেবিলের উপরে সুতোয় বাঁধা নথিপত্র অন্যান্যদিন চোখে পড়ে, আজ সেগুলি সরিয়ে রাখা হয়েছে। টেবিলের ছেঁড়া খোঁড়া অয়েলক্লথটা যতটা সম্ভব টান-টোন করা হয়েছে। বজ্রভূষণের মক্কেল-বসা পিঠ উঁচু বেঞ্চটা সরিয়ে ফেলে কয়েকটি বেডৌল চেয়ার পাতা হয়েছে টেবিলটার চারিদিকে নিমন্ত্রিতদের জন্য।

কিছুক্ষণ আগেই গৃহিণী এসেছিল। ছাপাখানার কর্মচারী কয়েকটি ছাড়াও নিমন্ত্রিত আছে। উৎফুল্ল আসবে, অন্যান্য শ্রমিকনেতাও দু একজন আসতে পারে। কয়েক রকমের রান্না হবে। সবগুলি ঠিক পেরে উঠবে কিনা এই সন্দেহ হয়েছে তার।

গৃহিণী তার সন্দেহটা প্রকাশ করেছিল এই ভাবে—তোমার এ সব বদ-খেয়াল পোয়াবে কে? বলি দাসী রেখেছে কটা?

গৃহিণী যখন তার বক্তব্য সুরু করে তখন বজ্রভূষণ হুঁহাঁর বেশি কিছু বলে না। আজও সে একটা ঢোক গিলে চুপ করে ছিল।

সে অত্যন্ত স্থির হয়ে থাকবার চেষ্টা করেছিল বলেই হয়তো গৃহিণীর ক্রোধটা প্রকাশ পেল

না। সে রাঁধতে গেছে। রান্নাঘরটা কাছেই। তার ফলে সাঁতলানোর ঝাঁজালো সৌরভ এ ঘরেও আসছে কখনও। বজ্রভূষণ আহার্যের দিকে একটা টান অনুভব করছে এবং তার থেকে নিজের স্বাস্থ্যটাকেও একটু ভালো বোধ করছে। একটু উদাব হয়ে উঠল তাব দৃষ্টিভঙ্গি।

তখন তার মনে হল, সংসারে যাকে সে এনেছিল, সে কি কোনদিন সুখ পেল! ছোটছেলে হওয়ার পরে যখন দীর্ঘকাল সূতিকায় ভুগেছিল তখন যদি ভালো করে চিকিৎসা করা হত!

বজ্রভূষণ তার টেবিলের সামনে নিমন্ত্রিতদেব প্রতীক্ষা কবছে। বিকেলে সে স্নান করেছে, দাড়ি কামিয়েছে। তার পরনে পাঞ্জাবি, গলায় পাট করা চাদর। এ পোশাকে তাকে যেন একটু অপবিচিতই বোধ হচ্ছে, শান্ত আত্মসমাহিত দেখাচ্ছে বলা যায়।

বোজ এমন দেখায় না। একটা প্রবাদ আছে—উকিলের পুরনো পোশাকই মক্কেল আকর্ষণ করে। এর মূলে হয়তো অভিজ্ঞতাকে মূল্য দেয়ার ব্যাপার আছে। অন্য কারণও থাকতে পাবে। সিদ্ধমনোরথ উকীলদের জীর্ণতা-প্রিয়তার আড়ালে যদি সেই শ্রেণীর অন্য কারো দারিদ্র্যও আত্মগোপন করে তা হলে আমাদের বলার কিছু নেই। উকীল বজ্রভূষণের বেশবাসও জরাজীর্ণ তা সে যে কারণেই হোক।

তার পোশাকের মতো তাব দেহও বয়োজীর্ণ। তেষট্টি হল এবার। অবশ্য জীর্ণ বলতে সচরাচব যে রোগা চেহাবাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে তেমন নয়। বাতে মুটিয়ে গিয়েছে সে। শীতে বর্ষায় রোগ বাড়ে। ফ্লানেলে জড়ানো পাদুটি তখন খেপে চোঙা হওয়া প্যান্টের মধ্যে ঢুকতে চায় না। লিখতে গেলে হাত কাঁপে। কিছু একটাকে স্থির দৃষ্টিতে দেখতে গেলে তাব ঘাড়টাও কাঁপে। এসব নাকি তার বাতেরই আর একটা লক্ষণ। মুখটা বিষণ্ণ, চোখ দুটি ম্লান। মাথায় কোথাও টাক পড়ে নি কিন্তু কটা চুল আছে গুনে বলে দেয়া যায়। সাদা পাটের আঁশের মতো কয়েকটি চুল তার হলুদ রঙের কপালের উপরে নেতিয়ে আছে। মুখের বাঁ পাশটায় ছায়া কিন্তু কপালটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

তার আজকের এই সাদা পপলিনের জামাটা ছোটছেলে কাল কিনে এনেছে। ছোটছেলের কথাই মনে হল। লেখাপড়া তার মাঝপথে বন্ধ হয়েছে। বেকাব বলা যেতো তাকে, কিন্তু লোকে তা বলার সুবিধা পায় না. কারণ সে বাড়ি থেকে খুব কমই বার হয়।

গৃহিণীর স্বাস্থ্য ভালো নয়। একটি মেয়ে থাকলে সংসারের টুকিটাকি অনেক সব তাকে করতে হতো ; ছোটছেলেই তাই করে। মাকে সাহায্যই করে সে। কিন্তু কৌতুকের ব্যাপার যেন : গৃহিণী ছোটছেলেকে ততটা পছন্দ করে না। এরকম কেন হয়? সন্তানদের একটিকে পিতামাতার একজন যেন বেশি পছন্দ করে।

বজ্রভূষণের আঙ্গুলগুলো একটু কেঁপে উঠল। তাব মন কিছুটা চঞ্চল হয়েছে। যেন বিকেলের স্নান দিয়ে শান্ত করা মনে কিছু একটা ঢুকতে চায। অঁহঁহ করে গলা ঝাড়ল সে।

ডাকল, 'ঘটা, ঘটা।'

'যাই বাবা,' বলে সাড়া দিয়ে এল ছোটছেলে। সে বোধ হয় নিমন্ত্রিতদের জন্য চপ তৈরি করছিল। তার দু-হাতে ময়দা-মাখা।

'জনমতের ফাইলটা কোথায় রে?'

'ফাইল মানে?'

'নতুন লেখার নয়। প্রথম সংখ্যা, আর তারপর থেকে যে সব সংখ্যায় নতুন কিছু দেখা দিয়েছিল, সেগুলো তুই যে গুছিয়ে রেখেছিলি।'

ছোটছেলে ফাইল দিয়ে গিয়েছে, বজ্রভূষণ ফাইল খুলে বসল। হলুদরঙের ফুলস্ক্যাপ মাপের চারপৃষ্ঠার প্রথম সংখ্যা। গত বছর কোলকাতায় এক সংবাদপত্র প্রদর্শনী হয়েছিল। মফঃস্বলের সংবাদপত্রগুলো মধ্যে 'জনমত'ও প্রদর্শিত হয়েছিল। সেখানকার সরকারি লেবেলটা আঁটা আছে এখনও।

দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় সংখ্যা। ফাইল উল্টোতে উল্টোতে থামল বজ্রভূষণ। এটার কাগজও বয়সে হলুদ। তা প্রায় পঁয়ত্রিশ বছব হল এবারে। জনৈকা অন্তঃপুরিকা এই ছদ্মনামে একটি কবিতা লিখেছিল কেউ। বিভুপদে মতি থাকবার সেই আকুল ছন্দপতনযুক্ত প্রার্থনা কিন্তু তৎকালীন শহরে একটি আলোড়ন তুলেছিল। সরকারি উকীল বজ্রভূষণের পিঠে চাপড়ে দিয়ে বলেছিল—তুমিই কিছু করছ হে।

আরও কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল অন্তঃপুরিকার। কবিতাগুলো আসতো সুদৃশ্য সুগন্ধি খামে ডাক মাবফত। একবার এমনি একটা খাম খুলে কবিতার বদলে বেরুল একখানা চিঠি। আদিতে সম্পাদক মশাই বলে সম্বোধন শেষে অন্তঃপুরিকা বলে নামসই, তা সত্ত্বেও বিস্ময় ও আনন্দে, অন্য এক জগতের সৌরভে বজ্রভূষণ দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। এ ধরনের চিঠির সংখ্যা পরে বেড়েছিল। অন্তঃপুরিকার ঠিকানা জানা ছিল না, অথচ উত্তর দেয়ার একটা তাগিদ সে অনুভব করতো। সে তার পত্রিকায় উত্তরগুলো ছাপত। আর যে মন সেই উত্তবগুলো বচনা করতে তা একটা অনির্দিষ্ট অথচ প্রবল সম্মুখবেগ অনুভব করত।

কোন রকমে আত্মপ্রকাশ না করেই এ শহব থেকে চ'লে গিয়েছিল অন্তঃপুরিকা। কালে তার আদর্শেবও বিলুপ্তি ঘটে থাকবে। বজ্রভূষণেব পত্রিকায় আবও অনেকদিন তাকে উদ্দেশ্য কবে চিঠি ছাপা হয়েছে। বস্তু ও ভাব জগতের দ্বন্দ্বে বস্তুর জয়ই অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। অন্তঃপুবিকারও পবাজয় হয়েছিল বজ্রভূষণের গৃহিণীর কাছে। প্রথম জীবনে পত্রিকা চালাতে গিয়ে সংসার খরচের টাকায় টান পড়লেও গৃহিণী চেঁচামেচি করত না, ববং পত্রিকা প্রকাশের আগেব বাত্রিতে বজ্রভূষণেব পাশে বসে কখনও আঠার শিশি কখনও কাগজের টুকরো এগিয়ে দিয়ে সে সাহায্যই করত।

এ সব সত্ত্বেও স্ত্রীব আলিঙ্গনবদ্ধ পরিবেশেও হঠাৎ স্পর্শচেতনাহীন হয়ে পড়েছে সে। মৃদু অন্ধকারে একটা কাল্পনিক নারীমুখ যেন চোখের সামনেই ফুটি ফুটি করে উঠেছে। নানা কারণে তার ধারণা হয়েছে সেই অন্তঃপুরিকা শহবেব তৎকালীন এক মুনসেফ গৃহিণী। মহিলাদের দু-একটি সভায় পরিচয় না-দিয়েও যে দু-একজন বজ্রভূষণেব সঙ্গে আলাপ করেছে তাদের মধ্যেই একজন সে হবে। আজ বিকেলের দাড়ি কামানো, স্নান কবা, নতুন জামা পরা হয়তো কারণ হবে, তার মনে ছায়া-ধূসরের চাইতে স্পষ্ট রঙে ত্রিশ বছরেরও আগে দেখা একটি তরুণীর কানের পোখরাজ বসানো মাদ্রাজী ফুলের ছবি ফুটে উঠল।

অন্তঃপুবিকাকে উদ্দেশ্য করে এখনও মাঝে মাঝে চিঠি ছাপা হয়। শহরের টুকি-টাকি খববের মতো, মুনসেফী আদালতের নিলাম-ইস্তাহারের মতো এই চিঠিগুলিও জনমতের বিশিষ্ট ফিচাব হয়েছে অভ্যাসের ফলে।

অভ্যাস বৈ কি। নতুবা সাপ্তাহিক জনমতের কী-ই বা মূল্য আছে? কোনও বিশেষ সংখ্যা দু'পৃষ্ঠার ক্রোড়পত্র নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেও তা এমন কিছু নয়—যা না হলে চলে না। কিন্তু দেখা গেছে এই শহরের প্রবীণ বাসিন্দাদের মধ্যে এমন কি নবীনদের একাংশেও একটা অভ্যাস জন্মে গেছে জনমত হাতে পেলেই উল্টে-পাল্টে দেখার। তারা যেন কী একটা আশা করে। কিন্তু উল্টে-পাল্টে দেখা যেমন অভ্যাস, নেই কিছু বলাটাও তেমনি অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে।

পরশু দিনই হবে। খবরটা বারলাইব্রেবীতে পৌঁছাল বজ্রভূষণের কানে। সে একটু যেন অবাক হল। কাঁপা কাঁপা হাতে চশমা খুলে সে সামনের দেয়ালের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল। সে সংখ্যার জনমতটা মোটেই ভালো ছাপা হয়নি। পত্রিকার মাথায় বড়-টাইপেব জনমত নামটার 'ন'টা একেবারেই ভেঙে গেছে। সে অস্ফুট স্বরে বলেছিল যেমন হয়েছে কম্পোজিটর! কিন্তু মুহূর্তমাত্র। বজ্রভূষণ জানে জনমত নিয়ে আলাপ করাটা বয়স্ক মানুষের ছেলেমানুষি করার মতো লজ্জাকর—অন্তত সহকর্মীদের ভঙ্গি থেকে তাই মনে হয়। প্রৌঢ়ত্বের এই মাত্রাজ্ঞান তার কবে থেকে

হল বলা শক্ত। এক সময়ে এমন ছিল জনমতকে বিদ্রূপ সমালোচনা করলে তাদের প্রতি একটি উষ্ণ বিদ্বেষ বোধ করতো সে। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল এখন তার। সে অবশ্য বুঝল না এই দীর্ঘনিশ্বাস উঠছে সেই পুরনো বিদ্বেষের মৃতপ্রায় অগ্নিকুণ্ড থেকেই যাতে তার জীবনের অনেক মধুর দিন পুড়েছে।

একদিক দিয়ে শহরে সে বিখ্যাত। এখন এই শহরে বাসস্টপের বদলে রেলওয়ে স্টেশন হয়েছে। সেই স্টেশনে নেমে তার নাম বললে প্রতি চারজনে অন্তত এমন একজনকে পাওয়া যাবে যে তার বাড়ির ঠিকানাটা বলে দিতে পারবে। এটাকেই খ্যাতি বলছি না। একই শহরে চল্লিশ বছর বাস করলে এমন হয়। সে বিশিষ্ট।

জনমতের প্রয়োজনেই যেন তার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করেছে। সব কিছুতেই তার একটা নিজস্ব মত আছে। শহরের ভদ্রব্যক্তিরা কখনও রসিকতা কখনও বিদ্রূপ করে তাকে ইন্টেলেক্‌চুয়াল বলে। সাধারণ লোকেরা বলে—উকীল বাবুর কথা, তাকে দিয়ে রাম বলাতে চাও তো তোমরা সকলে রাবণ বলতে থাকো। শুনে সে ভাবে—প্রচলিত মতের বিরুদ্ধাচরণ করাই তার মতের লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব কিছুতেই মত দিতে হলে এবং তাতে অভিনবত্বের সুর লাগাতে হলে যা হয় তাই কি হয়েছে তার ক্ষেত্রে?

স্বভাবের এই প্রবণতা থেকেই জনমতেব দ্বিতীয় বিশিষ্ট ফিচারের জন্ম। শহরে মদন নামে এক ব্যক্তি আছে। নিজের বড়ছেলের সহপাঠি হিসাবে তাকে চিনতো বজ্রভূষণ। স্কুলে মাস্টারমশাইদের এবং বাড়িতে বাপ-মায়ের তিরস্কার এমন কি নির্দয় প্রহারও তার বোধ উন্মেষ ঘটাতে পারে নি। তাকে অবলম্বন করে জনমতে একটা প্রবন্ধ লিখেছিল বজ্রভূষণ কি করে নির্বোধ ছেলেদের মানুষ করতে হয় এবং তা করতে গিয়ে নির্দয় মাস্টারমশাইদের নির্দয় সমালোচনা করেছিল। এর অল্পদিন পরেই ড্রইংমাস্টারের সঙ্গে মারামাবি করে মদন স্কুল ছাড়ল। মদনের পিতার ব্যবসায়ী হিসাবে কিছু প্রতিপত্তি ছিল শহরে। মদনের পিঠ নাকি ড্রইংমাস্টারের বেতে কেটে কেটে গিয়েছিল। ড্রইংমাস্টারের মতো নির্দয় শিক্ষককে স্কুল থেকে বিতাড়িত করা উচিত—এমনি একটা মত শিক্ষিত মহলকেও চঞ্চল করে তুলল। এই মত গঠনে কিছুদিন আগে জনমতে প্রকাশিত প্রবন্ধটি অনেকটা সাহায্য করেছিল। কিন্তু সকলে যা আশা করেছিল এমন কি দু-একজন যার জন্য প্ররোচনা দিতেও এগিয়ে গিয়েছিল জনমত তা করল না। বরং সে যেন নিজস্বতা প্রচার করার জন্যই মদন, তার ব্যবসায়ী পিতা এবং তার সমব্যথী ভদ্রমণ্ডলীকে উপহাস করে একটি প্রবন্ধ লিখে ফেললো। এরই একটা গৌণ ফল হিসাবে শহরের এক নতুন বাসিন্দা সৃষ্টি হল জনমতের পাতায়—মদনা নামে। মদনার কার্যকলাপ দিনে দিনে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। ব্ল্যাক মার্কেট তো সে করতোই, পরে ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার বিশেষজ্ঞ, গলায় ফুলের মালা পরে সভা-সমিতির প্রধান অতিথি।

পুরনো জনমত উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ মদনার জীবনের এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায় চোখে পড়ল তার। নিজের লেখা, তবু প'ড়ে হাসি পেলো।

মদনাকে পাঠিয়েছিল সে দেশোদ্ধার করতে। তার হাতে রিভলবার ছিল, বুকে দেশপ্রেমের অনির্বাণ শিখা ছিল কিন্তু সে নাকি কি কৌশলে মস্তিষ্কটা রেখে গিয়েছিল বাড়িতে কোন সিন্দুকে লুকিয়ে।

বজ্রভূষণের জনৈক সহকর্মী একবার তাকে চেপে ধরেছিল, 'তুমি এদের দেশপ্রেমকে নির্বোধ বলছ কেন?'

'কোথায় বলেছি তা?'

'নতুবা মদনাকে কেন পাঠালে দেশোদ্ধার করতে?

শুধু প্রশ্ন তোলা নয়। সহকর্মীদের একাংশ এই সময়ে বলতে সুরু করেছিল সরকারি উকীলের

প্যানেলে কি এমনি নাম উঠেছে বজ্রভূষণের!

উসখুস করে উঠল বজ্রভূষণ। তার বিবর্ণ মুখ আরও কিছুটা রক্তহীন হয়ে পড়ল। ফাইলটা বন্ধ করতে ইচ্ছা হল তার। জন্মদিনে নাকি অনেকে জীবনের হিসাব নেয়। সে কি তাই নিতে বসেছে যে এ সব কথা মনে করতে হবে। আ-ছি।

বড়ছেলে তার মতের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেছিল। সে তখন কোলকাতায় এম. এ., ল পড়ছে।

'কী হয়েছে, খোকা?'

'আপনি এ ভাবে দেশপ্রেমিকদের নির্বোধ বলছেন?'

'মদনার কথা বলছ বুঝি?'

'তাদের আত্মত্যাগ মৃত্যুবরণ এ সব কি দেখতে পান না?'

'মদনাবা তা চিরকালই করে থাকে। আচ্ছা, খোকা ডাকাতরা ডাকাতি কবতে গিয়ে প্রাণ দেয়, আহত হয়, শুনেছ? আমার হাতেই একটা কেস আছে। জেল-হাসপাতালে আছে। সেরে উঠলে আসামী হয়ে দাঁড়াবে।'

'তাদের ডাকাত বলছেন?'

'দেশপ্রেমিকদের দলে মিশলেই সকলের খুনী-প্রবৃত্তি দেশপ্রেম হয়ে ওঠে না।'

'আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়।'

'কেন, আমাব পিতৃত্ব দুঃসহ ঠেকছে? যাও, উঠে পড়তে যাও।'

কাবো কারো পুরনো কোন বোগ থাকে। অনেক সময়ে মনে হয় রোগটা ছেড়ে গেছে, কিন্তু চোরারোগ লুকিয়ে থেকে আকস্মিক আক্রমণ করে বসে। কিন্তু প্রাবল্যকে রুখবাব, বোগসত্ত্বেও চলাফেরা করার কতগুলি উপায় রোগী নিজের আবিষ্কার করে, কোন মুষ্টিযোগ, দেহকে খাড়া রাখবার কোন ভঙ্গি। বজ্রভূষণের অশান্তি তেমনি কিছু। অশান্তিটি কখন মনে আত্মপ্রকাশ কবছে সে অনেক সময়ে বুঝতে পারে না। অন্য কখনও সে অশান্তিটাকে তখনকার মতো সরিয়ে রাখতে পারে।

বজ্রভূষণ আবার অঁ হঁ হ করে গলা সাফ করে ডাকল—ঘটা, ঘটা।

ছোট ছেলে আবার সাড়া দিয়ে এগিয়ে এল।

'হ্যাঁরে, ওঁরা আসবে তো?'

'আসবে বৈ কি!'

'উৎফুল্ল? সেও আসবে তো?'

'আসবে। একা বসে রয়েছ, রেডিওটা খুলে দেব?'

'তা দে।'

ছেলে চলে গেল।

কিন্তু অন্যমনস্ক হওযাব এই কৌশল আজ কাজ করল না। অশান্তিটা তাকে আজ রেহাই দেবে না নাকি? অথচ তার আজ শান্ত মনেরই দরকার।

ছেলের কাছে বাবা-মা যা আশা করে সবই ছিল তার। দেহে স্বাস্থ্য, বিদ্যাবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা। কোলকাতায় এখন ওকালতি করে ছেলে। সেখানেই তার সংসার। হায়, সে কোলকাতায় ওকালতি করবে এটা বজ্রভূষণও এক সময়ে কামনা করতো!

বড়ছেলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু কী-কী যথেষ্ট কারণ ছিল তার? রাজনৈতিক মতপার্থক্য? সেটা কিছু নয়। পাঁচ সাত দিন আগে এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে সে পৌঁছেছে। তার একটা ধারণা হয়েছে ব্যাপারটাকে বিশ্রী করে তোলার মূলে ছিল তার স্ত্রী এবং ছোটছেলের মানসিক প্রবণতা। নতুবা আজকালকার দিনে ছেলে যাকে বিবাহ করতে চাচ্ছে তাকে নিয়ে এরকম ঘটনা ঘটে না। বড় ছেলের সহপাঠিনী ছিল সে। কুরূপা, কিন্তু পোশাক পরিচ্ছদে বৈশিষ্ট্য ছিল : হাতে

এক গাছা অলঙ্কার নেই, শাড়িতে পাড় ছিল না। সাবান-ফাঁপানো বেঁটে চুলে মেম-ঘেঁষা ভাব ছিল। মেয়েটিকে একটি মেয়ে হিসেবে মন্দ লাগে নি তার কিন্তু পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করতে আপত্তি ছিল। স্ত্রীর অনুযোগটা চাপা, ঘুবিয়ে ফিরিয়ে বলা, ইঙ্গিতের সাহায্যে প্রচারিত। ছেলেকে নাকি বজ্রভূষণই পর করে দিয়েছে। কিন্তু স্ত্রী বড়ছেলের পক্ষ নিয়ে এবং ছোটছেলে তার নিজের পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়ে কাদা ছিটিয়ে কলহ না করলে হয়তো এতটা বেড়ে উঠত না ব্যাপারটা।

মুষ্টিযোগে যেমন কাজ হয নি, এই গোলমেলে বিশ্লেষণেও তেমন হল না। আজ যেন বিশেষ করে কিছু ঘটেছে তার। অশান্তির কথাগুলোই মনে আসছে।

নিজেকে শুনিয়ে বলল সে, শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক মতপার্থক্যকেই দায়ী করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তার, শুধু জেলার নয়, প্রদেশেরও নয়, সমস্ত উপদ্বীপটাব শাসনভারই নাকি হস্তান্তবিত হয়েছে। মদনাকে নিয়ে বাপ-ছেলেতে মন কষাকষি এখন নিবর্থক। জনমতে কবে কোন লেখা বেরিয়েছিল তার কিছুমাত্র মূল্য নেই, পৃথিবীর সকলেই তা ভুলে গেছে। বজ্রভূষণ মদনাকে এখন অহরহই দেখছে, কিন্তু স্থবিরতা এসেছে তার দেহে। লিখতে গেলে হাত কাঁপে। লেখাটা মস্তিষ্কের দিক দিয়েও কষ্টসাধ্য। ছোটছেলে ঘটা তার কাছে শুনে নিযে লিখতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে শহরের মদনগোপাল সাহাব একটা ব্যঙ্গচিত্র খাড়া করতে পেবেছিল মাত্র। কিন্তু মদনা তো ব্যক্তিবিশেযের ব্যঙ্গচিত্র মাত্র নয়, সমাজের একটা চলমান অংশের ব্যক্তিরূপ। মদনা বোধ হয আব দেখা দেবে না জনমতে! অথচ দেখো এই নিরর্থকতা নিয়ে বড ছেলেব সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হল! আর রাজনীতি।

নিরর্থকতা বৈ কি। কী লাভ হল? প্রায় চল্লিশ বছর আগে এই শহরে এসেছিল সে। তখন সেই যুবক বজ্রভূষণ যা সব আশা কবতো তার মধ্যে এমন অনেক কিছু ছিল যাকে এখনকার চোখে অত্যাশা, হযতো বা উত্তুঙ্গ অভিলাষ বলে মনে হবে। কিন্তু যা অত্যাশা নয়, তাও তো হয় নি। তার চাইতে জুনিয়ার উকীলরা বেশি টাকা করেছে, বেশি উপার্জন করে অনেকেই। স্বাস্থ্যও তাদের ভালো আছে। এই তো সেদিনই ডাক্তার পথ চলতে চলতে বলল, 'জনমতের ভার এবাব অন্য কারো উপরে দিন।' 'আপনি কি বলতে চান বসে জনমতের কাজ করেই স্বাস্থ্যটা গেল?' 'তা অনেকটা বৈ কি।' মিথ্যা বলেনি ডাক্তাব। টেবিলে ঝুঁকে পড়ে কাজ করলে ডিসপেপসিয়া বাত ইত্যাদি হতে পারে। এতো হাইজিনের বইতেই লেখে। এক সময়ে সম্পাদনা নয় শুধু, কম্পোজিটর, প্রুফ রীডার সকলের কাজই তাকে করতে হত। এখন বুদ্ধিমানেরা তাকে তৃতীয় শ্রেণীব নির্বোধ প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত রুগ্ন এক মূর্খ বলে মনে করে। যারা তার সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তারা তাকে কঞ্জুস বলে অখ্যাতি রটায়। তার চেহারাই নাকি তার জন্য দায়ী। তার সহকর্মী উকিলরা তাকে আজকাল পিছনের সারির একজন বলে ধরে নিয়েছে। সেদিন একটা মকদ্দমার জেরার সময়ে জজ নিজেই বজ্রভূষণকে তার পত্রিকার কথা তুলে রসিকতাব সুরে বিদ্রূপ করেছে। সকলের হাসিব সঙ্গে সেও হাসতে চেয়েছিল কিন্তু তার কান দুটো লাল হয়ে উঠেছিল।

সে জনমতের সম্পাদক আর—

আর লোহা শ্রমিক সংঘের পরিচালক।

শহরের লোহা-ব্যবসায়ী মদনগোপাল সাহার সঙ্গে শ্রমিকদের একবার মামলা হয়েছিল। উকিল হিসাবে সেই মামলার শ্রমিকদের পক্ষ নিয়েছিল বজ্রভূষণ ; মামলা মিটবার পর শ্রমিকদের পক্ষ থেকে দু-এক কথা জনমতে লিখেছিল সে। শ্রমিকরা একদিন ধন্যবাদ দিতে এসে সংঘ গড়বার কথা বলেছিল। সেই লোহা শ্রমিক সংঘের সূত্রপাত। পনেরো বছর আগেকার কথা। সেই থেকেই বজ্রভূষণ লোহা শ্রমিক সংঘের পরিচালক। এটাও যেন জনমত প্রকাশের মতোই ব্যাপার—বৃদ্ধিও নেই, ক্ষয়ও নেই। গৌরব করার মতো একটি দিকই মাত্র আছে—এই জেলার প্রথম ট্রেড-ইউনিয়ন

সংগঠন লোহা শ্রমিক সংঘ, বয়সের দিক দিয়ে সব চাইতে পুরনো।

বর্তমানে আরও অনেক শ্রমিক সংঘ হয়েছে শহরে। বিড়ি শ্রমিক সমিতি, রিকশা চালক ইউনিয়ন, দোকানকর্মী সংঘ ইত্যাদি। তাদের সংঘদপ্তর আছে। সেই দপ্তরে শ্রমিকরা জমায়েত হয়, তারা মিছিল করে পতাকা নিয়ে, ছাপানো হাতচিঠে বিলোয়, আওয়াজ তোলে। কিন্তু অগ্রভাগে যার থাকার কথা সেই লোহা শ্রমিক সংঘ এসব বিষয়ে অত্যন্ত সেকেলে। পথে তার মিছিল দেখা যায় না, তার আওয়াজ আসে না কানে।

বামপন্থী নেতারা লোহা শ্রমিক সংঘ নিজেদের হাতে নেয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু গত দশ বছর থেকে একটা স্থিতাবস্থা চলছে। লোহা শ্রমিক সংঘের বাৎসরিক সভার কিছু আগে তারা সংঘের অফিসটাকে করায়ত্ত করার চেষ্টায় থাকে, কিন্তু বজ্রভূষণ উপস্থিত থাক আর নাই থাক, শ্রমিকরা তাকেই সংঘের পরিচালক নির্বাচিত করে চলেছে। গত দু-বছর থেকে ছোটছেলে ঘটা তাকে এ ব্যাপারেও সাহায্য করছে। সেই সংঘের নির্বাচিত খাজাঞ্চী।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই সংঘের কাজকর্ম সে এখন আর দেখে দিতে পারে না। ইতিমধ্যে লেবার কমিশনারের কাছে কিছু কাগজপত্র তৈরি করে পাঠানোর দরকার হয়েছিল। সেটা সময় মতো হয়ে উঠল না, দেরি হয়ে যেতে লাগল। উৎফুল্ল নামে একজন শ্রমিক ছিল। লোহা শ্রমিক সংঘের মস্তিষ্ক যদি হয় বজ্রভূষণ, তবে উৎফুল্ল তার মেরুদণ্ড। সংঘ ও তার পরিচালকের প্রতি উৎফুল্লের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এতটুকু টলবে বলে মনে হয় না। এ ব্যাপারটা নিয়ে সেই উৎফুল্লর কপালেও চিন্তার রেখা দেখা দিয়েছিল।

ঠিক আছে, উৎফুল্ল, দেখে দিচ্ছি দাঁড়াও।

বজ্রভূষণ এরকম কথা উৎফুল্লকে অনেক সময়ে বলেছে। এখনও মনে তার তেমনি কিছু বলার মতো ভঙ্গি একটা ফুটল। অর্ধস্ফুট চেতনায় যেন এই কথাটা চক চক করে উঠল—আজ জন্মদিন, আজ থেকেই সুরু। একটু শক্ত হচ্ছি আবার। কিন্তু প্রায় তখন তখনই মনে হল—শক্ত হওয়া মানেই তো জড়িয়ে থাকা। তুমি কি ট্রেড ইউনিয়ন বোঝ? সবে এসো না হয়।

অঁহঁহ করে গলা ঝাড়ল সে। টেবিলের উপরে জনমতের ফাইলে যে হাতখানা ছিল সেটা কেঁপে উঠল।

রেডিওতে একটা উদাস করা সুর বাজছে। তার মনে হল যে বাঁধনগুলো স্নায়ুরূপে তার দেহটাকে ধরে রেখেছে সেগুলো খুলে যাবে আর দেহটার বিভিন্ন উপাদান পৃথক হয়ে লুপ্ত হয়ে যাবে সুরের সঙ্গে সঙ্গে। দেহটাকে ধরে রাখবার ক্লান্তি আর ভোগ করতে হবে না। স্বস্তি, কী স্বস্তি, কী আরাম।

সুরটা হঠাৎ যেন বন্ধ হল। চেয়ারে একটু হেলে বসেছিল সে। আবার সোজা হয়ে বসল। বর্তমানকে ফিরে পেল। একটা ঢোক গিলল, হাতটা কাঁপল একটু। শক্ত হতেই হবে। অন্তত আজকের জন্য। মাস ছ-এক আগে এক বিকেলে আদালত থেকে বাড়ি ফিরে সে গানের শব্দে বিস্মিত হয়েছিল। পোশাক খুলে খুশি খুশি মুখে সে পাশের ঘরে রেডিওটার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল। ঝকঝকে নতুন রেডিও। রেডিওটার সম্মুখে হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে সে নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এ কেন্দ্র ও কেন্দ্র নিয়ে কিছুক্ষণ খেলাও করল। তারপরই হঠাৎ মনে হয়েছিল পরের জিনিস, হাত দেয়া ঠিক নয়।

কিন্তু তার নিজের ঘরে সত্যই তো পরের জিনিস আসতে পারে না। ছোটছেলে তার ছেঁড়া-ছেঁড়া ইজিচেয়ারটা টেনে এনে দিয়েছিল সেখানে, একটা টুল রেখে তার উপরে চা দিয়ে গিয়েছিল তার স্ত্রী।

ইজিচেয়ারটায় কাৎ হয়ে গড়গড়া টানতে টানতে হঠাৎ তার মনে পড়েছিল—রেডিওটা আনল কে? এ নিশ্চয়ই তার ছোটছেলের কাজ। এতগুলো টাকা—। ঠিক যখন তার উপার্জন কমে গেছে এবং যখন সামান্য সঞ্চয়ের উপরে নির্ভর করে তাকে হয়তো ওকালতি থেকে সরেই দাঁড়াতে হবে।

কিন্তু রেডিওর সখ তার অনেকদিনের। যেমন তার গৃহিণীর সখ ছিল একটা সেলাই কলের। এই সখের ব্যাপারগুলো চিরদিনই তাকে বাদ দিয়ে চলতে হয়েছে। জীবনে সুস্বাদ আনতে পারতো তারা। অন্য কেউ না জানলেও সে জানে জনমতের জন্য সে এই দীর্ঘদিন ধরে যে অর্থব্যয় করে এসেছে তা না করলে শুধু সখগুলোই মিটতো না, কিছু সুখের সঞ্চয়ও করতে পারতো।

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল তার। এবারও সে প্রস্তুত ছিল না। একটু চমকে উঠল সে।

তিনচার মাস পরে বজ্রভূষণ বলেছিল একদিন, 'রেডিও আনলি, টাকাটার কী হবে?'

'হবে খন, ধীরে ধীরে দিলেই হবে।'

এখন তার মনে হল বড়ছেলেকে পর করে দেয়ার পর থেকে নিজেকে ভয় পাচ্ছি তা তো নয়। ছোটছেলেকে জেদী বলে শাসন করার কি আছে? আমি নিজেই অত্যন্ত জেদী তাই ওরা অমন হয়েছে। ছোটছেলেকে শাসন করি না এটা কি দুর্বলতা?

গলা সাফ করার মৃদু একটা শব্দ হল।

কিন্তু এসব হিসাব নেবার জন্যই তো সে আজ বিকেলে বাত সত্ত্বেও অবেলার স্নান করে নি, দাড়ি কামিয়ে নতুন জামা প'রে বসে নি। যৌবনকে ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছে না। কিন্তু একটু তীক্ষ্ণতা, একটু বা দৃঢ়তা।

জনমতের ফাইলটা টেনে নিল সে।

গত বছর হঠাৎ একদিন ছোট ছেলে প্রস্তাব করে বসল—একটি বিশেষ সংখ্যা বার করা যায় জনমতের। শ্রমিক সংখ্যা। মোটা বই হবে। শহরের শ্রমিক সংগঠনগুলি সম্বন্ধে আলোচনা থাকবে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্বন্ধেও নামকরা কেউ কেউ লিখতে রাজী আছেন।

'অনেক টাকার ব্যাপার যে?'

'উঠে যাবে টাকাটা।'

এও আর একটা সখ বজ্রভূষণের। উচ্চাশাও বলতে পারা যায়। অনেক পত্রিকাই সে দেখেছে, অনেক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা। অনেক সময়েই সে তেমনি নয়নশোভন ও মূল্যবান লেখা দিয়ে জনমত বার করতে চেয়েছে।

কিছুদিন পরে সে ছেলেকে প্রশ্ন করল, 'কী হল তোর পত্রিকার?'

'ঠিক বেরুবে।'

'সে কি এখনও ভুলিস নি?' লোভে কাঁপতে লাগল বজ্রভূষণের মন।

ভুলবার ব্যাপার নয় ছেলের কাছে। নানা যুক্তি দিয়ে সে বজ্রভূষণকে উৎসাহিত করেছে। তার মধ্যে একটি যুক্তি এই ছিল—এখন তো আর আগেকার মতো দিন নয়। যদি বজ্রভূষণ ভালো করে পত্রিকা বার না করে, অন্য অনেকে ভালো করে পত্রিকা বার করার কথা চিন্তা করছে, তারাই কেউ বার করবে। জনমত একেবারে চাপা পড়ে যাবে। এতদিনকার জনমত!

এ কথা স্বীকার করতেই হবে মে ডে-তে প্রকাশিত জনমতের শ্রমিক সংখ্যা দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতোই হয়েছিল। শ্রমিকরা বলেছিল—ওস্তাদের মার শেষরাত্রে। জনমতের সঙ্গে আর কারো পারতে হয় না। কোলকাতার দৈনিক কাগজে এই বিশেষ সংখ্যাটিকে নিয়ে আলোচনা হল। এই একবারই যেন জীবনে বজ্রভূষণ মাঝারির স্তর ছাড়িয়ে বড়দের স্তরে গিয়ে উঠল। এ যেন স্বপ্নের স্বর্গে পৌঁছে যাবার ব্যাপার।

ফাইল থেকে বিশেষ সংখ্যাটি বার করল বজ্রভূষণ। লাল রঙের চকচকে মলাট, তার উপরে শ্রমিকদের শোভাযাত্রার একটা ছবি। ইতিমধ্যে শতবার দেখেছে এই সংখ্যাটিকে সে। সম্পাদক হিসাবে লেখাগুলোকে যাচাই করেছে। নিজের লেখা সম্পাদকীয় পড়েছে। প্রকাশক হিসাবে মনে মনে চিন্তা করেছে জুস্‌বাইণ্ডিং না হয়ে অন্য বাঁধাই হলে আরও ভালো হতো কি না ; নিজের

প্রেসে এমন একটি সংখ্যা ছাপাতে হলে প্রেসের কী-কী উন্নতি করতে হবে।

শ্রমিকরা অবশ্যই এই বিশেষ সংখ্যা পড়ে নি। কিন্তু এবার তারা মে ডে উদ্‌যাপন করল। যা কোনদিন হয়নি এই বিশেষ সংখ্যার প্রভাবেই যেন হল। তার নিজের লোহা শ্রমিক সংঘ পতাকা নিয়ে অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে মিলে শহর পরিক্রমণ করল। বজ্রভূষণ নিজে শোভাযাত্রা চালনা করে নি। ছোট ছেলে করেছিল। প্রাচীনতম শ্রমিক সংগঠন হিসাবে সেই সম্মিলিত শোভাযাত্রার সর্বাগ্রে ছিল লোহা শ্রমিক সংঘ। বার লাইব্রেরীর সম্মুখ দিয়ে যখন সে জলুস যাচ্ছে, খবর শুনে দেখবার জন্য বজ্রভূষণ বেরিয়ে এসেছিল। খাপ থেকে চশমা বার করতে করতে তার হাত কাঁপতে লাগল আনন্দের উত্তেজনায়। উত্তেজনার কথা বই কি। শহরের অন্য অনেকের তা হয়েছিল। মে ডে সংখ্যা শহরের যেন নিজস্ব সম্পদ বলে বোধ হয়েছিল অন্তত দুদিনের জন্য। আর একটা সভায় উল্লেখ করেছিল এক বক্তা : এই শহরে যখন রেল ছিল না তখন থেকে প্রগতির দিকে চোখ রেখে চলেছে জনমতের সম্পাদক। জনমতের ব্যাপারে নয় ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপারেও সে পথিকৃৎ।

কিন্তু বিশেষ সংখ্যাটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতেই বজ্রভূষণ উঠে দাঁড়াল। বিকেলের স্নানের স্নিগ্ধতা যেন আর অবশিষ্ট নেই। বৈঠকখানা আর শোবার ঘরের মাঝে দরজার উপরে ঝোলানো ছিল ভিজে গামছা। বজ্রভূষণ গামছাটা টেনে নিয়ে কপালে চেপে ধরল, ঘাড় মুছল। তারপর আবার এসে বসল টেবিলের সামনে।

শহরের রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতা দখলের জন্য চেষ্টাই লোহা শ্রমিক সংঘের দিকেও তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট রেখেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছোটছেলের বন্ধু। জনমতের বিশেষ সংখ্যা বার করার ব্যাপারে তারা সাহায্য করেছে। লোহা শ্রমিক সংঘকে আধুনিক করে তোলার ব্যাপারেও সাহায্য করতে চায়। কিন্তু বজ্রভূষণকে সরাতে পারবে না বলে তাদের ভয় হয়েছে এবং সে জন্য তারা প্রচারের সাহায্য নিয়েছে।

একদিন উৎফুল্ল এসে বলল, 'বাৎসরিক অডিট-টা করাতে হয়।'

'সে তো প্রতি বছরই হয়। ভালো মনে করেছ, ধীরেন গোঁসাইকে খবর দিও তো।'

উৎফুল্ল ইতি-উতি করে অবশেষে অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'তার আগে নিজে একবার দেখে দিলে হতো না।'

বজ্রভূষণের ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হল, 'তার মানে?'

'ওরা বলছে—'

'কি বলছে ওরা?'

'সে কিছু নয়, ছোটদার হাতে একাউন্ট আছে! ছেলেমানুষ কী করতে কী করেছে। একবার দেখা উচিত।'

উৎফুল্ল চলে গেলে বজ্রভূষণ তার উপরেই ক্রুদ্ধ হল। নিমকহারাম আর কাকে বলেছে। ছোট ছেলেকে খাজাঞ্চীতো নিজেরাই করেছিলে ভোট দিয়ে।

কিন্তু পরে তার মনে হল ছোট ছেলের পক্ষে হিসেবে ভুলভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নয়। এবং রাজনৈতিক নেতারাই হয়তো সে ভুলভ্রান্তিগুলোকে বড় করে দেখাচ্ছে। নীতিগত দোষ সংঘ পরিচালনায় খুঁজে না পেয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে থাকে তারা।

ছোটছেলেকে ডেকে বজ্রভূষণ বলেছিল, 'তোর কাছে সংঘের হিসাবপত্র আছে, দেখা দরকার।'

'দেখো, এক সময়ে,' বলে ছেলে চলে গেল।

তিন চারদিন পরে এক সন্ধ্যায় বজ্রভূষণ বলল, 'কই হিসেব দেখালি নে?' ছেলে রেডিও শুনছিল, কাজের ভান করে উঠে গেল।

রাত্রিতে গৃহিণী বলল, 'তোমার জন্য কি আমি এ ছেলেকেও হারাব?'

বজ্রভূষণ ব্যথিত হয়ে বলল, 'কেন কী করেছি আমি?'

'হিসেব চাইছ।'

'হিসেব চাইলে চলে যেতে হয়?'

সে নিজেই একদিন হিসেবের খাতা খুলে বসল। সাত আট মাসে সংঘের আয় প্রায় সাত আটশ' টাকাই হবে। প্রতি মাসেই নির্দিষ্ট একটা অঙ্ক খাতায় দাখিল হয়ে ব্যাঙ্কে জমা পড়ার কথা। তা হয় নি।

সাত আটশ টাকা তার পক্ষে কম নয়। তা হলেও নিজের স্বল্প সঞ্চয় থেকে সে তা পূরণ করতে পারে। তার ফলে এই অপটু দেহভার নিয়ে কোর্টে গিয়ে বসতে হবে স্বল্প আয়ের আশায়। কিন্তু তাতে কি ঢাকা পড়বে? জুন মাসে যে টাকা জমা পড়ার কথা ছিল সে টাকা ডিসেম্বরে জমা পড়লে নীতিগত অপরাধ ঢাকা পড়ে না। এ রকম ধরনের মামলায় সে উকীল হয়ে দাঁড়িয়েছে এর আগে। আইনের ধারাগুলো তার অজানা নয়। ভয়ে আশঙ্কায় তার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

কিন্তু একি উৎফুল্লকে বলা যায়? নিজের জীবনটা চোখের সামনে ভাসতে থাকে। আজ যখন সব কিছুর ফল বুঝবার সময় হল একি হিসেবের গলতিতে জড়িয়ে পড়ল সে?

একদিন গৃহিণী বলল,' 'শুনছ?'

দু তিনবার ডাকবার পর স্ত্রী সাড়া পেল।

'তুমি কি এ ছেলেটাকেও পর করে দেবে?'

'কেন?'

'তোমাদের সংঘে কী হয়েছে? তোমার উৎফুল্ল নাকি ভয় দেখিয়েছে?'

ভয়! এ কথাটাই যেন তার শিরা-উপশিরায় ভয়কে ছড়িয়ে দিতে যথেষ্ট। হাত কেঁপে হাত থেকে ভাতের গ্রাস পড়ে গেল। তা হলে, তা হলে উৎফুল্ল কি জেনে ফেলেছে?

একদিন ছোট ছেলে বলেছিল জনমতের মে ডে সংখ্যার দরুনই ও টাকাটা খরচ হয়েছে। বজ্রভূষণ অর্থহীন দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে রইল। অর্থহীন প্রশ্ন করল, 'তা হলে রেডিওর জন্য নয়?' মে-ডে সংখ্যার জন্য হলে যেন কম নৈতিক বিচ্যুতি হবে।

কিন্তু এ সব পুরনো কথা। এ সব বেদনার সোপান পার হয়ে হয়ে আজকের এই জন্মদিনে সে পৌঁছেছে। বাতের রোগ সত্ত্বেও অবেলায় স্নান করেছে। আজ তার মস্তিষ্ককে স্নিগ্ধ রাখতে হবে। আজ যেন মামলার সওয়াল-জবাবের তারিখ। কিন্তু কী-কী সে করেছে, আর কী-কী অসমাপ্ত থেকে গেছে তার হিসাব নয়। যে আদর্শবাদ তাকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে এবং যা অকৃতকার্যতার তলায় ডুবে গেছে আবার যেন তাকেই সে ফিরে পেতে চায় আজ।

বজ্রভূষণ এবার নিজেই উঠে গেল অন্দরে। ছোট ছেলে তখন লুচি বেলছে বারান্দায় বসে।

বজ্রভূষণ নিচু গলায় বলল, 'হ্যাঁরে, ওরা আসবেই যদি—'

'আসবে। এই তো সবে সাতটা বাজল।'

গলা আর একটু নামিয়ে বজ্রভূষণ বলল, 'উৎফুল্ল আসবে তো?'

'আসবে।'

'আচ্ছা। ওরা যদি বুঝতে পারে এ জন্যেই এত ঘটা করে জন্মদিন।'

'কী যে বলো তুমি, বাইরে গিয়ে স্থির হয়ে বসো।

বজ্রভূষণ বৈঠকখানায় ফিরে চলল। পথে আড়াল পেয়ে হঠাৎ চোখ দুটি মুছে নিল সে। এক করতে আর হচ্ছে। কখন কী ঘটছে তার বুঝতে পারছে না। বারান্দার প্রদীপগুলি প্রায় নিবু নিবু। ছায়া আরও বেড়েছে। সামনের দেয়ালের গায়ে ছায়াগুলো এখনও কাঁপছে। একটু যেন ধীরে ধীরে আগের চাইতে। ওরা কি মনে করবে এ জন্যেই জন্মদিন?

টেবিলের সামনে বসে অঁহঁহ করে গলা সাফ করল। গলাটা যেন জড়িয়ে আসছে। স্থির হয়ে বসে হারিকেনটা বাড়িয়ে দিল। জনমতের ফাইলটা টেনে নিল। মে ডে সংখ্যাটা বার কবল সে। গেটআপ্। জনমত সম্বন্ধেও যে গেটআপ কথাটা বলা যায়, কে জানতো এর আগে। ইট রং-এর মলাটে পটের কায়দায় আঁকা শ্রমিকের মিছিল। খুব মন দিয়ে সারা মন দিয়ে, মনে আর কিছু আসতে না দিয়ে সে দেখবার চেষ্টা করল পত্রিকাটা।

কথাটা সে ভেবে ভেবে ঠিক করে রেখেছে। কী ভাবে আরম্ভ করা যায় মনে মনে তার অনেক খসড়াও করেছে। শেষ অবধি সে স্থির করেছে কথাটাকে জন্মদিনেব সঙ্গে জড়িয়ে দেবে। হেসে-হেসে, হাসিমুখেই বলবে সে। বলবে, আজকের এই জন্মদিনে তোমরা আমাকে একটা সত্যি কথা বলতে দাও। সংঘের অনেকগুলি টাকা আমি নিজের প্রয়োজন খরচ কবে ফেলেছি—দিয়ে দেব দু-এক মাসে। কোন ছলচাতুরীব আশ্রয় নিতে চাই না। যা হয়েছে তাই বলছি।

কাল্পনিক বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই টেবিলের উপরে রাখা বজ্রভূষণের হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ হল। কে যেন তাকে টেবিল থেকে তুলে দিতে চাচ্ছে আর সে আঁকড়ে থাকতে চায়।

কিন্তু তার সত্যভাষণের কী মূল্য? পৃথিবীতে আসবার পর থেকে যা যা সে করেছে তাব কোনটিই বা মূল্যবান হয়ে উঠেছে। আব এক্ষেত্রে সত্যভাষণ আইনের ভাষায় কনফেশ্যন। অপরাধ কবুল কবা। মিথ্যা বললে কী হয়? বললে হয়—কাজের চাপে টাকাটা সময় মতো জমা দেয়া হয় নি।

পুণ্য কাজের জন্য পবিত্র করা নয়, মস্তিষ্ককে স্নিগ্ধ ও চিন্তাশীল করাব জন্যই সে অবেলায় স্নান করেছে। একটা কিছু করতে হবে। বুদ্ধির সাহায্য নিতে হবে।

গৃহিণী বলেছিল একদিন, 'যা হওয়াব তা হয়েছে। এখন ছেলে যা বলছে তাই করো না। তারও দুর্নাম। প্রাপ্য টাকা নিলেই বা ক্ষতি কি?'

বজ্রভূষণেব গলার কাছে কী একটা শক্ত হযে উঠতে লাগল। সে ঢোক গিলল।

ছোটছেলে একদিন বলল, 'লোহা শ্রমিক সংঘের বিধানে প্রতি মাসে তোমার পঁচিশ টাকা করে অনোরেবিয়াম পাওয়ার কথা লেখা আছে। তুমি সেটা এই পনেবো বছরের কোনদিনই নাও নি।'

'তা বটে।'

'এখন নিলে ক্ষতি কি?'

'তা বটে।'

আর একদিন সে বলল, 'বাবা জুন থেকে ডিসেম্বর এই কমাসে নিজেব চিকিৎসার জন্য তুমি সংঘ থেকে সাতশ বায়াত্তর টাকা নিয়েছ।'

'নিয়েছি? চিকিৎসার জন্যে?'

'সত্যি কি তাই! সভার আর সাতদিন মাত্র বাকি। উৎফুল্লদের একগুঁযেমির ফলে রাজনৈতিক নেতারা ক্ষেপে রয়েছে। সব কিছু নিয়েই এবার টানাটানি হবে।'

'চিকিৎসার জন্য নিয়েছি? রেডিও নয়, মে ডে-র জনমতও নয়?'

'দেবে সই করে রসিদ টাকাটাব জন্যে?'

বজ্রভূষণের মাথাটা তখন ডাইনে থেকে বাঁয়ে একটু একটু কাঁপছিল। কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় আবার তেমনি কেঁপে উঠল এখন। তার একবার মনে হল পিনাল কোডটা নামিয়ে এনে দেখবে। অ্যানোটেশনগুলোর মধ্যে দিয়ে গলিয়ে আসা যায় কিনা।

হঠাৎ একটা অর্ধোস্ফুট শব্দ উচ্চারিত হল তার মুখে। যেন সে কাউকে ডাকছে।

'কী? ডাকছ?' বলে ছোটছেলে এল।

বজ্রভূষণ ফিসফিস করে বলল, 'ওরা এসে পড়ল। একটু আগেই যেন। ওদের ছায়া পড়ছে, কতবড় ছায়া দেখ।'

ছোট ছেলে বুঝতে পারল না তার বাবা কী বলতে চায়।

বজ্রভূষণ বিবর্ণ মুখে বলল, 'আমাকে বাঁচা, বাঁচা। শিগ্‌গির দে কাগজ সই করি।' যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে এমন ভাবে গলার বোতাম খুলতে, গলা থেকে চাদরটা সরিয়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগল তার কাঁপা কাঁপা আঙুল।

ছ-সাত মাসের চিকিৎসা খরচের ছ-সাতখানা রসিদ। টাকার অঙ্কগুলি যোগ করলে যে অঙ্কটা জমা দেয়া উচিত ছিল কিন্তু জমা পড়ে নি তারই সমান হয়। সবগুলিতে লেখা আছে প্রাপ্য অনোরেরিয়াম থেকে চিকিৎসার জন্য বজ্রভূষণ টাকাটা নিচ্ছে।

লিখতে বা সই করতে স্বভাবতই হাত কাঁপে তার। হাত কাঁপতে কাঁপতে সে কাগজ কয়েকটিতে সই করে দিল। তখন তার মুখের একপাশে ত্বক্ কুঞ্চিত দেখাচ্ছিল। কতকটা যেন হাসি-হাসি মুখ। ছোট ছেলে তা দেখে ভাবল এতদিন পরে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে তার বাবা। মাঝারি বজ্রভূষণ। একটা সত্য কিংবা নির্ভেজাল মিথ্যা কোনটি তার পক্ষে বহনযোগ্য নয়।

ওরা এল। প্রেসের কর্মচারীরা আগে। রাত হয়েছে। তারা নমস্কার করল, কিন্তু সামনের সাজানো চেয়ারে বসল না। সাড়া পেয়ে ছোট ছেলে এসেছিল। সে বলল—একেবারে ভিতরে আসুন, রান্না জুড়িয়ে যাচ্ছে। সংঘের প্রধান সভ্যরা এল। তাদের মধ্যে বড় ছায়া ফেলার মতো কেউ ছিল না। তাদের মধ্যে একজন রাজনীতি করে। সে এক ছড়া গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে দিল বজ্রভূষণকে। অর্ধেক উঠবার ভঙ্গি করে বজ্রভূষণ সে মালা নিল। আবার ছোটছেলে বেরিয়ে এসে বলল—রাত হয়েছে, রান্না জুড়িয়ে যাচ্ছে।

'আপনি খাবেন না, এখন?' অতিথিদের একজন জিজ্ঞাসা করল বজ্রভূষণকে।

ছোট ছেলে উত্তর দিল, 'বাবা, রাত্তিরে দু-টুকরো রুটি খান।'

বজ্রভূষণ যেন মাথা কাঁপিয়ে সায় দিল।

নিমন্ত্রিতরা বোধ হয় অনুভব করেছিল অনেক রাত করে ফেলেছে তারা, যার জন্য অসুস্থ এই বৃদ্ধটি কষ্ট পেয়েছে। আহার শেষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু-একটা কথা বলে তারা বিদায় নিয়ে গেল। বজ্রভূষণ মাথা কাঁপিয়ে তাদের অভিনন্দন গ্রহণ করল। তার মুখে হাসি ফুটে আছে। অভিভূত হয়ে যেন সে কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

ছোটছেলে এসে বলল, 'সকলের খাওয়া মিটে গেছে, এবার আমি আর মা খাব। তোমার? তুমি লিখবে এখন? তা হলে খাবার তোমার শোবার ঘরে থাকবে?'

এই নিয়ম এ বাড়ির। বজ্রভূষণ যখন জনমতের জন্য লেখে সে যত রাত্রিই হোক তাকে খাওয়া শোওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করা হয় না। হয়তো আজও সে অনেক রাত অবধি লিখবে। লেখা শেষ হলে শোবার ঘরে গিয়ে খুশি হয় কিছু খাবে, নতুবা খাবে না। ছোটছেলে জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই এরকম দেখে আসছে। এখন সে দেখলে। কলম ধরা ডান হাতটা কাঁপছে বজ্রভূষণের। এটাই লেখার ভঙ্গি, হাত তার কাঁপে আজকাল। অতিথিদের আদর আপ্যায়ন নিয়ে ব্যস্ত ছিল বলে ছোটছেলে মনে করতে পারল না রসিদে সই করার জন্য কলমটা সেই বজ্রভূষণের হাতে দিয়েছিল। সেই কলমটা হাত থেকে আর নামে নি, হাত শুদ্ধ কেঁপে যাচ্ছে।

পরিশ্রমের পরদিন বেলায় ঘুম ভেঙেছিল গৃহিণীর। ঘরে নেই বজ্রভূষণ। ঘরে থাকেও না। গৃহিণী এ ঘরেই সকলের চা দিতে এসেছিল। সে দেখল বজ্রভূষণ টেবিলের অত্যন্ত কাছে মাথা নামিয়ে কী দেখছে। গৃহিণীর শরীর কালকের পরিশ্রমে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। মেজাজ খারাপ হয়েছিল। ঠক্ করে চায়ের কাপটা নামিয়ে দিয়ে চলে গেল সে। ছোটছেলে দাঁত মাজতে মাজতে এ ঘরে এসে তাকে দেখে বলেছিল, 'সকালেই আবার লিখতে বসেছ? এ বয়সে কি অত সয়।' সকালের আলোটা খটখটে। একটা দিন আসছে। কিছুদিন ধরে যে গ্লানি জমছিল বাড়িতে সে কাল রাত্রির

অন্ধকার মিশে গেছে। সেই আলোভরা দিনের দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে সে বজ্রভূষণকে ভালো করে দেখল না।

তা করলে সে দেখতে পেতো—বজ্রভূষণের ডান হাতটা অবিবত কাঁপছে, ডান দিকের চোয়াল একটা হাসির ভঙ্গিতে কেঁপে যাচ্ছে। চোখে জল এসেছিল বোধ হয়। সেটা পিচুটির মতো শুকিয়ে চোখের কোণে ও নাকের পাশে লেগে আছে। ঠোঁটেব কোণায ফেনা দেখা দিয়েছে। মুখ দিয়ে একটানা একটা মৃদু শব্দ হচ্ছে পু-পু।

বজ্রভূষণের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল।

খবর খেয়ে হাজার টাকা চাঁদা তুলে উৎফুল্ল কোলকাতা থেকে স্পেশ্যালিস্ট ডাক্তার নিয়ে এলো। বজ্রভূষণের মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'উকীলবাবু, আমি এসেছি, উৎফুল্ল।' শ্রমিক উৎফুল্লর হাঁড়ির মতো প্রকাণ্ড মুখ। সে মুখ চোখের জলে ভিজে উঠছে।

একবার মনে হল বটে বজ্রভূষণের আধবোঁজা ডান চোখটা একটু প্রসাবিত হল। তার মুখে আবার একটু অস্ফুট শব্দ শোনা গেল ফু-পু, ফু-পু। নিশ্বাস নেবাব চেষ্টাতে অসাড় ঠোঁট দুটি থেকে যান্ত্রিক ভাবে ও শব্দটা হল কি না, কিংবা সে উৎফুল্লকে ডাকতে চাচ্ছে, অথবা আতঙ্কে সে পুলিস পুলিস বলার চেষ্টা করছে তা বোঝা গেল না।

মৃত্যু পর্যন্ত নাকি জ্ঞান ছিল বজ্রভূষণের। প্রকাশের ক্ষমতা না থাকলেও যন্ত্রণা বুঝবার ক্ষমতা ছিল। হাতটা অবিবত কাঁপছিল।

এখন সেই ছোট শহরটা বড় হয়েছে, আধুনিক হয়েছে। ইনফ্লেশনেব দরুন আগেকার কালের টাকা পয়সার অঙ্কগুলো হাস্যকর রকমে তুচ্ছ শোনায়।

ইনফরম্যাল ডিনার

মনে পড়ল মৃন্ময়ীব এমনি অন্ধকাব ছিল সেই ভোরবাতে। স্বামীর শোবার ঘরের পাশে নার্সেব ঘরে গিযে বসেছিল সে। মৃদু শব্দ করে স্টোভ জ্বলছিল সেই ঘবে। মৃন্ময়ী অস্পষ্ট আলোয হাতড়ে হাতড়ে চা করে দিয়েছিল নার্সকে। নিচে বসবার ঘরে ফোনের পাশে সোফায স্যান্ডউইচে দু-দিন কাটছে প্রাইভেট সেক্রেটাবিব। তাকেও এক কাপ চা পাঠিয়ে দিয়েছিল মৃন্ময়ী। এসব ব্যাপারগুলো ঘটিয়ে দিয়েছিল মৃন্ময়ী। সেটা একটা বিহ্বল অবস্থাই ছিল মনের।

এখনও যেন তেমনি ভোরের অন্ধকার। এও যেন সেই পাশের ঘর।

বসবার ঘর নয়, ডাইনিং রুম। দূর প্রান্তে একটিমাত্র মৃদু আলোর ছোপ। টেবলের একটা কোণকে ঢাকনাসমেত চোখে পড়ছে। সাদায় সাদা বুটি তোলা, দেখাচ্ছে ধূসর। টেবলের মাঝামাঝি এসে অস্পষ্ট স্বচ্ছ রঙে আঁকা অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবির মতো জড়ো করে রাখা কাচের বাসনপত্র। এ ঘরে কোনো আলো জ্বলেনি, জ্বালানো হয়নি। ফ্রেঞ্চ উইনডোর বাইবে বাগানের উপরে যে আলোটা গতরাত্রিতে কেউ জ্বেলেছিল, সেটাই আছে, তারই কিছু আসছে এ ঘরে। টেবলের এ প্রান্তে, টেবলটাকে ডানপাশে রেখে বসে আছে মৃন্ময়ী, আলো পাওয়া কোণটির বিপরীত প্রান্তে। টেবলের এটাই মাথা, শীর্ষদেশ। এদিকটা ঘরেরও প্রধানতর অংশ। ড্রয়িং রুমের থেকে ডাইনিং রুমে আসবার দরজাগুলো এদিকেই। এদিকেই যেন ভোরের স্পষ্টতা।

মৃন্ময়ীকে চেনা সহজ নয়। তার গায়ের ড্রেসিং গাউনেব কাশ্মিরী কাজগুলি প্রায বোঝাই যাচ্ছে না। একরঙা মেটে মেটে রঙের মনে হচ্ছে। তার ভ্রু-দুটি ক্লান্ত, চোখদুটি স্তিমিত। গায়ের রঙ পুরনো হাতির দাঁতের মতো, কপালটা চওড়া। ঠোঁটে রঙ আছে বলে তা মুখের অন্য অংশের চাইতে কিছু স্পষ্ট। মাথার কপিশ চুলগুলো মাথার পিছনে টেনিস বলের মাপের একটা খোঁপায় জড়ানো। তার ডানহাতখানি টেবিলের উপরে। বিশীর্ণ আঙুলগুলি। আংটিটা অত দূর থেকেও আলো ধরে জোনাকির মতো স্পষ্ট। আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে একটা সিগারেটকেস ঝিলমিল করছে।

আসলে এটা এখন শীতকালের এক অবসন্ন সন্ধ্যা নেমে আসছে। আর এই সন্ধ্যায় এই ভোরের অন্ধকার তৈরি করে বসেছে সে এই নির্জন ডাইনিং রুমে। ওপারে ড্রয়িং রুমে শুকনো চাঁপা ফুলের রঙের সার্টিনে মোড়া আসবাবগুলিতে আলোর হালকা সবুজের প্রতিফলন। সেই ড্রয়িংরুমের দরজা পার হয়ে এ ঘরে ঢুকে সে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। বনবাসের মতো নীরবতা। অন্ধকারে ডুবে থাকাও বলা যায়। এখানে তাকে কেউ চট করে খুঁজে পাবে না। অনেক দূর অনেক গোপন যেন এই ঘরখানি। সবকিছু থেকে দূরে সরে আসা।

তার আঙুলগুলি সিগারেট কেসটার উপরে কেঁপে উঠল। কোনো উপায়ই ছিল না। কোনো উপায়ই ছিল না তার এ ঘরে পালিয়ে না এসে। জনাকীর্ণতা থেকে সরে আসা। সারা বাড়িটা যেন ভরে উঠেছে। স্থানাভাব ঘটেছে। সারা বাড়িটা ভরে রেখেছে তার মেয়ে মণি, মণিশোভনা।

ভরে রাখাই যদি বলো, দুটি সন্তান মৃন্ময়ীর। ছেলে বড়, মেয়ে তার পিঠে পিঠে। এতেই তার এত বড় বাড়িটা ভরে ছিল এতদিন, হৃদয় যেমন থাকে। পাঁচ-ছ বছরের ফ্রক পরে, চুল দুলিয়ে এ ঘর থেকে ও ঘরে নেচে নেচে ছুটে চলা, ঝকঝকে আলোয় জন্মদিনের উৎসব, বন্ধু আসতে শুরু করা, পার্টি থেকে রাত করে ফেরা—কতভাবেই তো সে ভরে রাখত বাড়িটাকে। হ্যাঁ, পার্টি

থেকে রাত করে ফেরাও বৈকি। নিস্তব্ধ রাত্রিতে ড্রাইভের কুচি পাথরের মৃদু সরসর শব্দ করে গাড়ি আসা, দরোয়ানের নিঃশব্দ গেট খুলে দেয়া, শাড়ির কোঁচানো অগ্রভাগ একটু তুলে ধরে জুতো থেকে বাঁচিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা—এসব নিঃসাড় নৈশব্দ্যও বাড়িটাকে ভরে দিত। হৃৎপিণ্ডটার নৈঃশব্দ শব্দ যেমন ভরে রাখে। মৃন্ময়ী নিজের ঘর থেকে না বেরিয়েই যেন মেয়ের গায়ের মৃদু সৌরভ পেত, তার হাতে সিগারেটের কোমল গন্ধ, তার বুকের গোড়ায় জমে ওঠা উষ্ণতার ছোঁয়াচ।

মেয়েই বাড়িটাকে জনাকীর্ণ করে রেখেছে। দোতলার সেই ঘরটাতেই সে আছে, লাইব্রেরির পাশের ঘরটিতে। ঘর থেকে সে কমই বেরোয়। ধীরে ধীরে পা ফেলে সে হয়তো কখনও লাইব্রেরিতে আসে। অতি ধীর তার চলা। এই ধীরে ধীরে চলাই যেন মনে কবিয়ে দেয়। তারপর তার সাদা শাড়ির লালপাড় চোখে পড়ে। কপালের সিঁদুর, সিঁথির সিঁদুর। চুড়েব আডালে শাঁখা। ভরে রাখা, আবৃত করা, সর্বত্র সঞ্চরমান থাকা। বাড়িটাই যেন। সিঁদুরে লজ্জাজনকভাবে মাখামাখি হয়ে গেছে। কোলাহল, দুঃসহ কোলাহল করছে তার অস্তিত্ব।

আর এই অন্ধকার যেন সাময়িকভাবে তার নিবৃত্তি করতে পারে।

মৃন্ময়ীর একটি জানু অন্যটির উপরে তোলা। ড্রেসিং গাউনের নিচেব দিকটা যেন একটু ফাঁক হয়ে আছে। সাদা রেশমের শাড়িটা নড়ছে। পা দোলাচ্ছে সে। কাটা-নকশার ঘাসের চটির ফাঁক থেকে রঙ করা বুড়ো আঙুলের ডগাটা চোখে পড়ছে যেন। টেবিলের উপরে রাখা আঙুলগুলি একটু একটু নড়ল।

এমনি একটি অন্ধকারই ছিল সেই ভোর রাতে। এমনি বিহ্বল হয়ে উঠেছিল তার মন। কিন্তু আজকের এই অন্ধকারের বিহ্বলতায় সে কী করবে।

মৃদু একটা শব্দ করে. কিংবা শব্দ হওয়া উচিত ছিল তা হল না, ড্রয়িংরুমের দবজাটা একটু ফাঁক হল। ও ঘরের মৃদু সবজে আলোটার একফালি এসে পডল এঘরে। মৃন্ময়ীর পিছন থেকে তার পিঠের ও বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে ডান হাতটার উপরে গিয়ে পড়ল আলোটা। আঙুলের হীরেটা জ্বলজ্বল কবল। তাব হাতের পাশের বোতলটায় মদটুকু যেন নড়ে উঠল। ওয়াইন গ্লাসটা কাঁপল।

তারপর আবার অস্পষ্টতা এল। আর পদশব্দটা মৃদু কিন্তু ভারী হয়ে মৃন্ময়ীর পিছন দিক থেকে ঘুবে ঘুরে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

'তুমি এখানে আছ?'

মৃন্ময়ীর মাথাটা একটু কাঁপল।

টেবলের উপরেই মৃন্ময়ীর হাতের পাশেই একখানা হাত রেখে দাঁড়াল সে। তারও আঙুলগুলি যেন অস্বস্তিতে চঞ্চল। একটু পরে বোতল থেকে গ্লাসে দু-আঙুল মদ ঢেলে নিল। দু-হাতের দশটা আঙুল, মদের বোতল, গ্লাসে গ্লাসে ঢালা মদটুকু, গ্লাসসমেত হাতের উর্ধ্বগতি, তারপর তার মুখ। ঠিক তারই মতো। স্বামীর মতোই ছেলে। তার মুখে অবশ্য থোকা থোকা রেশমের মতো কোমল-স্পর্শ গোঁফ ছিল। সেদিনও এমনি বিহ্বলভাবেই মৃন্ময়ী একে তাকে ওকে দেখেছিল। এক কথা ভাবতে গিয়ে অন্য কথায় পৌঁছে যাচ্ছিল। একথা অস্বীকার করা যাবে না, দাম্পত্য জীবনে প্রেম ও বিদ্বেষ মিশে থাকে। নিজের জঠরে যাকে লালন করেছে সে অন্য জনটির ব্যক্তিত্বের অনুকৃতি নিয়ে ভূমিষ্ঠ হল—এটাই সে বিদ্বেষের বড় প্রমাণ। একথা ভাবল মৃন্ময়ী এবং ভাবতে গিয়ে অনুভব করল এটা তার চিন্তার বিষয় নয়।

মদের গ্লাসটা নামিয়েছে সে। মৃন্ময়ীর হাতের উপরে নিজের হাতটা রাখল। তারপর টেবলের মাঝখানে জড়ো করে রাখা বাসনগুলোর মধ্যে থেকে একটা ওয়াইন কাপ আনল সে। দুটো গ্লাসই পূর্ণ করল। মৃন্ময়ীর মুখের কাছে তুলে ধরল একটা।

চেয়ার নিয়ে বসল ছেলে। ছ-বছরের ছেলেকে যেমন সে উপদেশ দিত তেমনি সুরই ফুটল তার কথায়, আর এটা সে অনুভবও করল।

'ওটা কি, সিগারেট'?

মৃন্ময়ী কেসটা খুলে ছেলের সামনে ধরল।

ছেলে এবং মেয়ে তারই। বাধ্য, তা বলে নরম নয়। আর অবাধ্য হওয়াও ভালো। তা যদি বলো, সব ব্যাপারেই তাই। অ্যাবসিন্‌থ্‌ ও ভারমুথ্‌ ছাড়া ককটেলে স্বাদ আসে না।

'কিছু বললে'? সিগারেটের ধোঁয়াটা ছাড়ল ছেলে। পাকিয়ে পাকিয়ে কুয়াশার মতো ছড়াল ধোঁয়া।

পাইপের মাথায় সিগাবেট পরানো শেষ করেছে মৃন্ময়ী, যেন সে হাতের কাছে দেশলাইটা খুঁজে পাচ্ছে না। ছেলে জ্বেলে দিল।

আর সে সময়েই মৃন্ময়ী বিড়বিড় করে বলেছিল—কিন্তু এটা অবাধ্যতাই নয়।

'তুমি জানো, মা, কতদূর'?

'জানি। বুকের গড়ন দেখেই'।

'ও'।

'কিন্তু শোভন—' 'একটা অর্ধউদ্যত কান্না যেন মৃন্ময়ীর।

শোভন অস্বস্তিতেই উঠে দাঁড়াল যেন। নিঃশব্দে পা ফেলে ফেলে পায়চাবি করল সে। মনে হল ঘরটির উত্তাপ যেন বেড়ে যাচ্ছে। দেয়ালের একটা আলো কি সে জ্বালল? আবার সে কথাই, সেদিনেব অনুভবই মনে এল। প্রত্যুষের বিহ্বলতাকে এখানে ওখানে দীর্ণ করে সংবাদটি বাস্তবসম্মত রূপ নিযে প্রখর আলোয় ফুটে উঠেছিল ক্রমশ। শোক, সহানুভূতি, শোক, সান্ত্বনা। এখনও তেমনি হবে। মেয়ে যেন এতক্ষণ তবু মায়ের বিহ্বল অন্ধকার বুকে লুকিয়ে ছিল। এখন কী হবে? এখন কী হবে?

'তুমি কি ওকে জিজ্ঞাসা করেছ'?

'জিজ্ঞাসা! ওকে চিঠি লিখতে দেখেছি। সে চিঠিব ঠিকানা জানি। চিঠি আসেও। তুমি কি মনে করো, শোভন, চিঠিতে প্রেমের কথাও থাকে না? হয়তো . '

'কী'?

'হয়তো সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়েও আলোচনা'।

দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল শোভনের। নিঃশব্দে টেনে টেনে ফেলা দীর্ঘশ্বাস। 'আর, শোভন, এ নিয়ে আমি কিছুই করতে পারি না, প্রায় কিছুই না। এর চাইতে তোমার মনে আছে, জেনারেল সামন্তর কথা? গত বছরের খয়েরি গোঁফের বুড়ো সামন্ত। আমি বুঝতে পারি সে সুখী করতে পারত না মণিশোভনাকে। সেদিক দিয়ে বড়জোর পনেরো বছরের একটি কিশোরের মতোই ছিল সে। তাকে বিয়ে করে মণিশোভনা যদি অন্য অনেক—তাও, আর এ রকম ঘটেও থাকে'। বলে মৃন্ময়ীও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

'আচ্ছা, মা, তুমি তো আমাকে বিশ্বাস করো। একটা কিছু করতে পারব বলেই আশা করছি'। শোভন উঠে দাঁড়াল। চুরুট ধরাল। ধোঁয়াটা নীল চুলের মতো উড়তে লাগল।

আর এই সময়েই তার দিকে চেয়ে চেয়ে মৃন্ময়ীর মনে হল ছেলেকে সে ভালোবাসে, অত্যন্ত গভীর ভাবেই ভালোবাসে। ছেলে এবং মেয়েই তার জীবনের অবলম্বন। একটা যুদ্ধে যেন তাদের সঙ্গী করেই এ বর্তমান অবস্থায় পৌঁছনো গেছে। কিন্তু যুদ্ধটার স্বরূপ তার চিন্তায় ফুটল না।

শোভন বলল, 'কিন্তু অবাকও হচ্ছি। ঠিক তিন মাস, তাতেই—? বন্‌ থেকে রওনা হয়েছিল ২৮ অক্টোবর, ৩ নভেম্বর কলকাতায় পৌঁছে চিঠি দিয়েছিল, আজ ২ ফেব্রুয়ারি।...পারব না'?

পাশের কোনো ঘরে একটা ঘড়ি টিক্‌ টিক্‌ করছে তা শোনা গেল। আর সেই নিস্তব্ধতায় মৃন্ময়ী

তার গ্লাসে খানিকটা কনিয়াক্ ঢেলে নিল। তার শব্দ হল। 'আজ ২রা। তোমার কি এ তারিখটা মনে পড়ে? মৃন্ময়ী বলল, 'কয়েকটি আলো জ্বালো না হয়।'

আলো জ্বালল শোভন। দেয়ালের গায়ে কাট-গ্লাসের চৌখুপি কয়েকটি তাবা। সব স্পষ্ট হল না। টেবলের মাঝখানে জড়ো করে রাখা কাঁচেব বাসনগুলি আলোক প্রতিফলিত করছে, ছায়াও ফেলেছে। ঘরখানিই মৃন্ময়ীর মনের পরিসর। আলো এসে পড়েছে, ছেলে পায়চারি করছে, অন্ধকার কাটছে না। সেদিনের সেই ভোরের পরে সকাল দুপুর এসেছিল। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না কোনো সকাল দুপুরই আর সেই ভোরের আগেকার সকাল দুপুরগুলির মতো উজ্জ্বল নয়। এটাই অনুভব করল মৃন্ময়ী।

'২রা। মানে'?

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তোমার বাবার জন্মদিন পালিত হত এই তারিখে। অবশ্য মন্ত্রী হওযাব পবে'।

'মনে পড়ছে বটে। তখন যেন জন্মদিনেব মতো ব্যাপারকে কোমলতা বলতেন'।

'এটা বোধ হয় তোমাদের বংশেব ধারা। তোমার ঠাকুরদাকে লোক লিবারেল কংগ্রেসেব জিঞ্জার ব্রেড্ নাম দিয়েছিল'।

'ব্রেড্'।

'হ্যাঁ। তিনি কথায় কথায় ব্রডনেসের কথা বলতেন, আর পিপলেব ব্রেড্ নিয়ে'।

'ইন্টাবেস্টিং— তুমি যখন ঠাকুরদার কথা বলো, সেই বুড়ো শেয়ানা, চার্মিং। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও বংশধর্ম অনুসারে আমরা অনুদার? দুষ্টু মা, এটা বলা তোমার উচিত হয় না। এখন তুমি আমাদেরই একজন'।

মৃন্ময়ী হাসল। এতক্ষণ পবে সে একবাব হাসতে পারল। যেন মৃদু বাতাসে পাতা কেঁপে তাব তলদেশের পাণ্ডুরতা সন্ধ্যার আলো প্রতিফলিত করল।

'কী খুঁজছ, শোভন'?

'তোমার এ কনিয়াকটা—'

'আলমারিটা খুলে দেখো'।

শোভন উঠে গিয়ে আলমারি ঘাঁটাঘাঁটি করে একটা বোতল নিয়ে এল।

'কি পেলে'?

'লেবেলটা স্প্যানিশ দেখছি। ধুলোও জমে আছে। বাবার আমলের কিছু হতে পারে।

বোতলের মুখ খুলে শোভন মৃন্ময়ীর মুখোমুখি গিয়ে বসল।

'আচ্ছা মা'?

'এটাও তোমাদের চরিত্রের একটা লক্ষণ, শোভন, যে বংশের কথা শুনতে তোমার ভালো লাগে'।

'আচ্ছা, তুমি দেখো স্বাদ নিয়ে। ভালো যদি লাগে বংশেব দু-একটা গল্প উপহাব দিও'।

'দুষ্টু ছেলে, তাই খোসামোদ'?

নতুন ওয়াইন গ্লাসে স্প্যানিশ ওয়াইন মুখের কাছে নিল মৃন্ময়ী। নিঃশব্দে আস্বাদ করল। নতুন করে সিগারেট ধরাল। বলল, 'শোভন, সব সময়ে মনে থাকে না। এখন বলে রাখি। মা আর ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই এখানে। এটাকে তুমি লোভ মনে করো না। সব মায়ের মনেই তার ছেলের হয়ে কিছু উচ্চাভিলাষ থাকে। তুমি অ্যাম্বাসাডর হয়েছ, ভালোই হয়েছে। কিন্তু, বলব কি কথাটা? আমি তোমাকে প্রধানমন্ত্রী দেখতে চাই। তার কম নয়, নয়, আর তোমাব কাকা—'

'কাকামশাই—আহা, কাজটা ঠিক হয়নি। ভেবেছিলাম ফোন করব'।

'তা এমন কিছু দেরি হয়নি! কালই তো ল্যান্ড করেছ। তা, ফোন করা উচিত বৈকি। তোমাদের

পরিবারে এমন তিনিই বয়ঃজ্যেষ্ঠ পুরুষ। কিন্তু, শোভন, আমার উচ্চাভিলাষ এড়িয়ে যেয়ো না'।

'যাচ্ছি নে। কিন্তু অনেক কৌশল, অনেক তার টানাটানি—'

'তুমি তা সবই পারবে।'

আচ্ছা, কাকামশাইএর চেহারা কি এখনও তেমনি আছে?'

'তা আছে। কিন্তু, শোভন, তুমি তোমার কাকামশাইকে বাজুকা বলতে সেই তো ভালো। কাকামশাই একটু ভাবী নয়'?

'বাজুকা'! শোভন হাসল। 'আচ্ছা, মা, সেকালে বোধ হয় বাজুকা নামে একরকমেব বন্দুক কিম্বা কিছু ছিল, তাই নয়? তা থেকেই নামটা রেখেছিলাম হয়তো। উনি কি এখনও ঠাকুবদাব সেই বইএর ব্যবসা নিয়েই আছেন?'

'হ্যাঁ। তা ছাড়া আব কি। অবশ্য একাদেমী ন্যাশিওনালের ডাইরেক্টবও একজন। যে দশজন প্রকাশক সারা ভাবতের বই ব্যবসার মাথা তাদেরই একজন'।

'বাহ, বাজুকা'!

'অত জোবে বোলো না। যে কোনো সময়ে এসে পড়তেও পারেন'।

'বলেছ নাকি'?

'আজ ২রা ফেব্রুআরি। আজ সে আসবেই। বিকেল থেকে রাত বারোটার মধ্যে যে কোনো সময়ে সময় করে। গত বছর সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে এসেছিল। আমাব শোবার ঘবে দাঁড়িয়ে একটা ব্রান্ডি পাঞ্চ খেয়ে তারপর গেল। এটাই তোমাদের বংশের ধারাই। ২ ফেব্রুআরি তার ভাইএর জন্মদিন এ তার কোনো না কোনো সময়ে মনে পডবে'।

'বাজুকা তা হলে এখনও তেমনি ইনফরম্যাল আছেন'?

'তা বলতে পারো। এখনও তেমনি সব ব্যাপাব ঘটিয়ে দেয়। অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নেযার ব্যাপারে তার জুড়ি নেই'।

মৃন্ময়ী শোভনেব গ্লাসটা ভরে দিল আবাব। বোতল ধরা হাতের ছায়াটা বাদুড়ের কোমল ডানার মতো দেয়ালের গায়ে গায়ে উড়ল যেন।

এই ভালো, তবু এই ভালো। কী করা যাবে যদি এই সন্ধ্যার এই অস্পষ্টতার চাইতে উজ্জ্বল কিছু সে মনে আনতে না পারে।

'আর সে সিদ্ধান্ত অনেকসময়ে লোকে মেনেও নেয়'। বলল মৃন্ময়ী। সিগারেট ধরাল সে, 'অন্তত কখনও কখনও'।

আর এমন হবেই কারণ এসব উপাদানেই স্বপ্ন তৈরি হয়। কিম্বা যেন যারা তার মনে আসতে পারে তারা এ ঘরেও আসবে। ফুটে উঠতে পারে ছায়ার মতো মনের এই চতুষ্কোণ পরিসরে। মন এবং এই ঘর যেন এক হয়ে গেছে। দরজায় মৃদু মৃদু আঘাতও হল। দরজা ফাঁক করে ওপার থেকে লাল লিভারি পরা আর্দালি সেলাম দিয়ে এগিয়ে এল। রুপোর থালা থেকে কার্ড নিয়ে পড়ে শোভন বলল—'বসতে বলো গে'।

চেয়ার থেকে উঠে পায়চারি করল শোভন। নতুন করে চুরুট জ্বালাল।

মৃন্ময়ীর সামনে ফিরে এসে বলল, 'তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, আমার এক বন্ধুই বলতে পারো। তাকে আসতেও বলেছিলাম। সেই এসেছে'।

'যাও'।

'একটু কথা আছে। মানে, এর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল ভিয়েনায়। লোকটি ভারতীয়, মস্তিষ্ক রোগের স্পেশ্যালিস্ট'।

'মস্তিষ্কবোগ'?

'হ্যাঁ'।

'শোভন, শোভন—'

'উতলা হচ্ছ কেন?'

'মস্তিষ্করোগ? তুমি বলছ আমাব মেয়ে—'

'মা, মা—'

মৃন্ময়ী দু-হাতে চোখ ঢাকল।

'মা, শোনো। আমি বলিনি তাকে। তার সঙ্গে মণিব সম্বন্ধে আলাপই হযনি। হবেও না, যদি তোমার ইচ্ছা না থাকে'।

মৃন্ময়ী সামলে নিল। উদাস সুবে সে বলল, 'শোভন, শোভন তুমি বড় হয়েছ। প্রকৃতপক্ষে এ পরিবারের কর্তা। মণিশোভনা এবং আমি নিজেও তোমার কথা শুনতে নীতিগতভাবে বাধ্য। কাবণ আমরা ভারতীয। যদি তুমি মনে করে থাকো মণিশোভনার—'

মৃন্ময়ী আবার ভেঙে পড়ল।

কিন্তু শোভনের যাওয়া হল না বন্ধুকে রিসিভ কবতে। টাকমাথা হাসিখুশি ধবনের এক বৃদ্ধ দেখা দিল।

'শোভন! মাই—'

'বাজুকা!'

'গ্র্যান্ড! কিন্তু তোমরা এই সন্ধ্যামাখা ডাইনিং রুমে কী করছ? কেউ কি আসবে? আ বিষাদ! অবশ্য এর একটা ড্রামেটিক এফেক্টও আছে। বিশেষ করে কেউ আসবে, ডাইনিং রুম সাজাতে গিয়ে হঠাৎ যেন সংবাদ পেয়েছ সে আর আসবে না। জীবনটাই এ রকম ব্যাপার। ঠিক ঠিক। দাদা, মানে আমার দাদা বিজন বোনার্জিব ড্রামাটিক এফেক্ট সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টিই ছিল। কথাটা কী, শোভন? বুজাব না বাজার্ড? ওলড বুজাব বিজন বোনার্জি। আজ তার জন্মদিন কিন্তু সে আজ আসবে না। আর কখনই আসবে না। আ বিষাদ'।

'বাজুকা'।

'না, শোভন, শোক নয়। আজ তার জন্মদিন। আলো জ্বালোনি ভালোই করেছ। আইল ড্রিঙ্ক হিস হেলথ্। হেলথ অ্যান্ড চিয়ার'।

টেবলের মাঝামাঝি আর একটি আলো জ্বালল শোভন। টেবলের কাঁচের বাসন, নিকেলের ছুরি চামচ কাঁটায় সে আলো পড়ল। আর ছায়াও তৈরি হল নতুন কয়েকটি।

'এবার ঠিক হয়েছে' বলল কাকামশাই। 'এই আলো এবং আলোর চাইতে বেশি ছাযা। মৃন্ময়ী তুমি একটা স্পিরিটল্যাম্প জ্বেলে ফেলো। শেকাবটা কোথায়? আমি একটা কক্‌টেল তৈবি কবি। শোভন, তুমি দু-একজন অতিথিকে ডাকতে পারো ফোনে। কোনো বিশেষ লোক নয়। যে কোনো লোক যে আজকের এই সন্ধ্যায় বাড়িতে আছে এখনও। সেটাই হবে বিজনেব মতো। বিজন দুঃখ পছন্দ করত না। আর আমরা একটা ডিনারপার্টি পেয়ে যাব। ফ্যামিলি ডিনাব উইদ্ টু অব থ্রি গেস্টস থ্রোন ইন'।

'মা—'

'হ্যাঁ। তাকে তুমি ডাকতে পার এখানেই। কাউকে পথে বলে যেয়ো ডিনার ফর ফাইভ। ভালোই হবে বেশ ইনফর্ম্যাল।'

শোভন চলে গেল। কাকামশাই শেকারে কক্‌টেল মেশাতে শুরু করল। কাকামশাই বলল, 'মৃন্ময়ী, মিনু বউদি, তুমি, মানে, ছেলের সামনে তোমাকে বলিনি, তোমাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে'।

মৃন্ময়ী কিছু না বলে মুখ নিচু করে স্পিরিট ল্যাম্পটা জ্বালতে লাগল। অনেক ছায়া জালি কাটল

ঘরের দেয়ালে।

'দ্যাখো, তোমাকে মিনু বউদি বলার মতো এই একটি লোকই অবশিষ্ট আছে। আমার সামনে অন্তত—কিম্বা তোমার মনে কিছু আছে'? নিচু হয়ে একটা বোতলের লেবেল পড়ল কাকামশাই।

'হায়, ব্রজেন্দ্র'।

'দেখো, মিনু, গ্রেটম্যানদের জন্মদিনে কেউ শোক করে না। আর আমার দাদা আমার কাছে অন্তত গ্রেটম্যান। আবাল্য সে আমার হিরো'।

'তোমাকে কী বলব বুঝতে পারছি না। মণি—'

'উঁ, মণি'। কাকামশাই হাতের মেজার-গ্লাসে মদের পরিমাণ বিচক্ষণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করল।

'মণিশোভনার কথাই'।

'কী আবার হল তার? অবশ্য হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এবার তার আটাশ হল'?

'আঃ বজ্র, সে তোমার ভাইঝি'।

'দেখো ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট হতে হলে গবেষণাও দরকার। তাতেই ঠিক হয়েছে নায়িকাকে যদি উদগ্র আগ্রহশীলা করতে হয় তবে তাকে আটাশ বছরেই দিতে হবে। যৌবনের পূর্ণ অভিজ্ঞতা ঝরে যাওয়ার ত্রিশএ এগিয়ে এসেছে অথচ নিঃসঙ্গ। এটাই উপন্যাসের নায়িকা হওয়ার সর্বোত্তম বয়স'।

'আস্তে বলো, ব্রজেন, আঃ বজ্র, আমার বেদনা নিয়ে উচ্ছ্বসিত কথা বলো না'।

'বেদনা? মণিশোভনা কী করেছে তোমার'? কাকামশাই মৃন্ময়ীর দিকে চোখ তুলল এবার।

মৃন্ময়ীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মনে হল তার আবার তার হৃদয়ের মতোই এই ঘর। চারিদিকে দৃষ্টি দিয়ে যেখানে কোনো কথা খুঁজে পাওয়া গেল না। কিন্তু শোভন এল অভ্যাগত নিয়ে।

'মা, মা—সুরঞ্জিত। বাজুকা বোনার্জি ব্রজেন্দ্রভূষণ—ডক্টর সুরঞ্জিত পার্থসখা'।

'এসো, বাবা'।

'আস্তেজ্ঞে হোক'। কাকামশাই শেকার ঝাঁকালো।

এগিয়েও এল সে। মৃন্ময়ীর পাশে শোভনরা, তাদের সামনে কয়েকটি ওয়াইন কাপ রাখল। বলল, 'মণিশোভনার কথায়—'

'শ্—' ঠোঁটেও আঙুল রাখল মৃন্ময়ী।

'ও, মানে—' ব্রজেন্দ্র ঢোক গিলল।

'গোপন করবার কিছু নেই, মা, এটা আমার মনে পড়ল। মণিশোভনাও সুরঞ্জিতকে চেনে। ভিয়েনাতেই আলাপ। পরে ওয়াশিংটনেও। আর আজ এখনও আলাপ হয়েছে। সুরঞ্জিতই বলছে—মণিশোভা লুক্‌ড্ রাদার স্ট্রেঞ্জ'।

'বাইরের ড্রয়িংরুমে লাল শাড়ি পরা যে মেয়েটি বসেছিল'? ব্রজেন্দ্র প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ; সেই'। বলল শোভন।

দ্যাখো, মণিশোভনা যদি লাল শাড়ি পরে—' ব্রজেন্দ্র কথাটা সমাপ্ত করল শ্রাগ করে।

'তা নয়'। ডাক্তারের যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনই গলা সুরঞ্জিতের।

ওয়াইন কাপগুলি পূর্ণ হয়েছে। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে গ্লাস নিল তারা। গ্লাস উঁচু করে ধরে কাকামশাই বলল, 'দাদাকে স্মরণ করছি'।

সুরঞ্জিত ও শোভন গ্লাস উঁচু করে ধরে ঠোকাঠুকি করল। চিং চিংক্; 'হিয়ার্স টু মৃম্‌ম্, বুঝলে, ডক্টর, আটাশ বছর'—চুরুট মুখে দিল ব্রজেন্দ্র।

'মানে, তা হয় না, এমন নয়। পরে আরও স্টাডি—থাক না হয় এখন'।

শোভন বলল, 'একটা পুরনো কথা মনে পড়ল, মা। সুরজিতই মনে করিয়ে দিয়েছে। আর এখানে বললেই বোধ হয় ভালো হয়। ইনফরম্যাল হয়। অন্তত ফরম্যালি ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ

কবাব চাইতে ভালো হয়। আব এখানে আমাদেব পবিবাবেব সবাই আছি। কাকামশাইও আছেন'।

কী ব্যাপাবটা'? মুখ থেকে চুরুট নামাল ব্রজেন্দ্র মনোযোগ দিতে।

'ওয়াশিংটনে—মানে ওয়াশিংটনেই। না, আমাকে কথাটা বলতেই হবে। মণিশোভনাব একটা অ্যাফেয়াব। আব সে অ্যাফেয়াবটা ঘটেছিল এক নিগ্রো গায়ককে নিয়ে। হ্যাঁ, মণিশোভনা তাকে নিয়েই মেতে উঠেছিল। তাব কালো বং, পুরু ঠোঁট এ সবই। এসব সত্ত্বেও নয়, এসব কাবণেই। মানে রুচিব একটা বিশেষ প্রবণতাব পবিণতি। বিবাব কথাটা বলা যাবে বিনা ভেবে দেখতে হবে। কী বলো সুবঞ্জিত'?

'হয়। অ্যাবনবম্যাল ডিজায়াব'।

'হুঁ'? ব্রজেন্দ্র চুরুট দিল ঠোঁটে।

'কিছু বললেন'? শোভন জিজ্ঞাসা কবল।

'সব না শুনে—' ব্রজেন্দ্র চুরুটেব ছাই ঝাড়ল।

মৃন্ময়ী বলল, 'কী শুনবে আব ব্রজ, কী শোনাবো তোমাকে। মণিশোভনা সাহিত্যিককে বিয়ে কবেছে'।

'সাহিত্যিক'?

'হ্যাঁ, বিয়ে কবেছে'।

'সাহিত্যিক'?

'হ্যাঁ'।

'অ্যাফেয়াব নয়?'

'না। শাঁখা, সিঁদুব। আব, আব—'

'কিন্তু,' বলে থেমে গেল কাকামশাই। ঢোক গিলল সে। টেবলেব চাবদিকে নিস্তব্ধতা নামল। আঃ বিষাদ। সুবঞ্জিত গ্লাস নামাল। পাশেব কোনো গ্লাসে লেগে চিংকচিংক কবে শব্দ হল।

ঝি এল। মৃন্ময়ীব কাছে গিয়ে নিচু গলায় সে কিছু বলল। মৃন্ময়ী বলল— 'এখানেই আসতে বলো। ঝি চলে গেল'।

'মণিশোভনা'।

'মণিশোভনা'।

'শোভন, শোভন, সে আমাব মেয়ে। আমি কী কবে ভুলে যাব'। মৃন্ময়ী প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল।

শোভন। 'আসুক'।

ব্রজেন্দ্র। 'আসতে দাও'।

ডাক্তাব। 'দূবে বাখা— '

'সাহিত্যিক? তাই বললে না'? ব্রজেন্দ্র প্রশ্ন কবল।

'হ্যাঁ, সাহিত্যিক'।

'কে'? ব্রজেন্দ্রব ভ্রু কাঁপল প্রশ্নে।

'সুচিত্র বোস'।

'সুচিত্র? মাই—। হ্যাঁ, তা নাম কবেছে বটে। উঁ? একটা শান্ত প্রকৃতিপ্রীতি আছে বটে লেখায়। বস্তুত যারা পাঁচ হাজাবেব কাছাকাছি পায় সেই দবেব। সাহিত্যিক, না। সাহিত্যিক, হুঁ? মিনু বউদি, সাহিত্যিক হচ্ছে আত্মাব স্থপতি। বুঝলে'? যেন সুচিত্রকে অপছন্দ ও মণিশোভনাব ববকে পছন্দ করাব দ্বিধায় দ্বিধায় দুলল তাব কথা।

'দেখুন, এসব ক্ষেত্রে' বলল ডাক্তার, 'দূবে দূরে সবিয়ে বাখতে পাবলে—'

'সেটা কি খুব কঠিন'? ব্রজেন্দ্র হাসি হাসি মুখে গ্লাস পূর্ণ কবে নিল।

'কিন্তু—' মৃন্ময়ী শুরু করল।

'হ্যাঁ, বুঝি। তাও বুঝি। সাহিত্যিক হয়ে সুচিত্র এতদূর এগিয়েছে। কারো উচিত তাকে নিষেধ করা'।

'আহা যদি নিষেধ করার ব্যাপারই হতো। হৃদয়ের ব্যাপার বলছিলে না? হৃদয়ের স্থপতি'? মৃন্ময়ী বলল।

'কিন্তু—'

কিন্তু নয় ব্রজ, লোকটি আমার মণিশোভনার হৃদয়কে নিজের বাড়ি বানিয়েছে'।

'তাও হয়, তাও হয়। তুমি নিশ্চয় দেখছ, মিনু, পাখ পাখালি অনেকসময়ে অবাঞ্ছিত স্থানে যেমন কার্নিসের খাঁজে বাসা বানায়'।

সে বাসা ভাঙা কি খুব সহজ'?

'ভাবনার কিছু নেই তা নয়। কিন্তু এতই কি সেটা? তা হলেও কই মণিশোভনা এল না তো'।

'অনেক সময়েই আসে না। যেন একা একাই থাকতে চায়। ব্রেকফাস্টের মতো ডিনারও যায় ট্রেতে করে শোবার ঘরে'। বলল মৃন্ময়ী।

ডাক্তার বলল, 'কাকামশাই অবশ্য বলেছেন পাখ পাখালির বাসা, কিন্তু প্রেম, বিশেষ করে যদি অ্যাবনর্ম্যাল হয়, তাকে বরং জটিল গ্রন্থি, স্নায়ুর জটপাকানো গ্রন্থির সঙ্গে তুলনা করাই ভালো'।

'তুমি বলছিলে না, শোভন, সেই নেগ্রয়েড টাইপ ?'

শোভন বলল, 'প্রায় ছ-মাসই বলতে পারো। একটা নেশার মতো ধরেছিল'।

'নেশাই বরং। দারিদ্র্যকেও কেউ কেউ নেশা করে। আত্মপীড়ন রোগেরই নামান্তর। নেশা মানে কোকেন কিম্বা ভাঙের অর্থে। মাথা ঝাঁকাল সুরঞ্জিত। মৃন্ময়ী নিঃশব্দে নাক চোখ মুছল।

'সাহিত্যিক অব অল মেন, আশ্চর্য'। ব্রজেন্দ্র এই বলে উদাস হয়ে গেল। ধীরে ধীরে আলমারিটার দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা নতুন বোতল পেড়ে আনল।

'ইটালিয়ান?' শোভন বলল।

'মনে হচ্ছে'। বলল ব্রজেন্দ্র।

'তাই হবে'। বলল মৃন্ময়ী।

'সাহিত্যিক। যারা নিজেদের পায়ে জীবনের শেষ দিনেও দাঁড়াতে শেখে না। বরং গ্যাংস্টার হতে পারলেও জেল কিম্বা ফাঁসির আগে তবু সুদিনের সাক্ষাৎ পায়। কথা কথা কথা। যদি কোনো রাজনৈতিক দলের আশ্রয় পেলো এক রকমের গোস্ট রাইটার হয়ে জীবন কাটল পচা ডিমের ওমলেট খেয়ে, কাচা কয়লার ধোঁয়া ভরা রেস্তোরাঁয় , নতুবা তাদের কী হয় আমি জানি না'। দৃশ্যতই শোভনের গা গুটিয়ে উঠল।

'অবশ্য সাহিত্য সম্বন্ধে। ঠিক তা নয় অবশ্য,' বলল ব্রজেন্দ্র, 'গোস্ট রাইটার বলাটা। পার্টিলাইনের মধ্যে ওদের স্বাধীনতা দেয়া হয়ে থাকে। পার্টিলাইনটা তো একটা সরল রেখা নয়, কি বলো? একটা সমতল ক্ষেত্রই বরং। তাতে বিচরণ করার অধিকারও থাকে। তবে আর যা বলেছ খানিকটা অ্যাবনর্ম্যালও ঘটে। পাঁচ হাজার করে গড়ে বছরে দুবার পায় এমন সাহিত্যিক আমার ফার্মেও আছে। কিন্তু যেসব কেরানি কর্মচারি বছরে তিন হাজার পায় তাদের চাইতেও অবস্থা খারাপ। অ্যাবনর্ম্যাল, তা বলা যায়'।

'আর এ যদি স্নায়ুতে জট পাকানোই হয়' মৃন্ময়ী নিজের কথাতেই চমকে উঠল, কথাটা শেষ করতে পারল না।

'দূরে সরিয়ে দেবার কথা বলছিলে না, ডাক্তার'? কাকামশাই বলল।

'হ্যাঁ, প্রথমে তাই'।

'বেশ, দেখো, শোভন, এ ইটালিযানটা অন্তত মন্দ নয, তাই নয? বেশ, তা হলে তাই হোক না হয'। শোভনের ওযাইন গ্লাস ভবে দিলেন ব্রজেন্দ্র। 'দূবে দূবেই থাক'।

'আব, ব্রজ, তোমাব এই ছেলেমানুষি সিদ্ধান্ত নেযাব ফানি অভ্যাস আব গেল না'।

'ছেলেমানুযি, মিনু'।

'তাই নয? তুমি হয়তো বলবে একজন যাক আমেবিকায অন্যজন– '

'ছেলেমানুযি? মাই মানে যাওযাটা ওদেব হাতে'?

'তাই তো মনে হয। কিন্তু--' মৃন্ময়ী শুরু কবল। বলতে যাচ্ছিল হলে ভালো হতো, কি শশ্ কবে একটা শব্দ তুলে থেমে গেল।

মণিশোভনাও এলো। গাউনেব উপবে জড়ানো টিসুবেনাবসিব শাড়ি। পাড়েব নকশায লাল ভাবটা আছে। শাড়িটা একটু বেসামাল। হাঁটুব নিচে গাউনটা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ। তাব চোখ দুটি টানাটান টলোমলো। তাব চলাব ভঙ্গিতে একটু হাতড়ে চলাব ভাব আছে। টালমাটালেব আগেব অবস্থা।

'মা'।

'কে, মণি, আয, মা, আয'।

'মণি যে! আবে, এসো, এসো। বাজুকাকে চিনতে পাবছ তো'? হাসি চকচক কবে উঠল ব্রজেন্দ্রেব টাকেব চাবিদিকে।

'ককটেল'? মণিশোভনাও মিষ্টি মিষ্টি হাসল।

'নয কেন'? ব্রজেন্দ্র একটা ওযাইনকাপ এগিযে দেযাব ভঙ্গিতে হাতে কবল।

'আয। বোস। আজকাল তুই কিছুই খাস নে। আমাব পাশে বোস'। মৃন্ময়ী মেযেকে হাত ধবে বসালো।

'কাকামশাই'। মণিশোভনা খিলখিল কবে হাসল। বলল, 'শুনুন, শুনুন, আপনাব সুচিত্র বোস। আপনাব ফার্মেবই তো? তাকে আমি বিয়ে কবেছি। দস্তুবমতো বিয়ে। কী লোক বাস্তবিক! ইউ নেভাব ক্যান টেল্। বেগুলাব গড়্হেড্। আমি ভেবেছি এবাব তাকে নিযে ইটালি যা'ব'।

ব্রজেন চমকে উঠল। তাবপব শ্রাগ কবল। শোভন তাড়াতাড়ি একগ্লাস ককটেল এগিযে দিল মণিব সামনে। ঝিকমিক করে হাসল মণিশোভনা।

গ্লাসটা উঁচু কবে বলল—ফব অ্যাপিটাইট।

শোভনও তাব খালি গ্লাসটা শূন্যে তুলে, 'ফব অ্যা মমম্'।

'আবে! ও কে? ডক্টব সুবঞ্জিত'?

'হ্যাঁ, মিস্ বোনার্জি'।

'আপনি যাননি? কোর্স ওযেলকাম। কি পচা ওযাইন সব তোমাব, মা'।

মণিশোভনা হাসল।

'উঠলি কেন'? মৃন্ময়ী বলল।

'এব চাইতে ভালো আমাব ঘরে আছে। এইমাত্র বেখে এলাম'। মণিশোভনা বলল।

'তুমি বোসো আমি খুঁজে দেখছি'। বলল শোভন।

টেবল থেকে সবে দাঁড়াল মণিশোভনা।

'বসুন না, কতদিন কথা বলিনি আপনাব সঙ্গে'? ডক্টব সুবঞ্জিত বলল।

ব্রজেন্দ্র কক্‌টেল তুলে দিল মণিশোভনার হাতে।

মৃন্ময়ী বলল, 'তাড়াতাড়ি এসো মা-মণি, ডিনাব দেবে'।

গুড্ হেলথ, বিড়বিড় কবে এই বলতে বলতে কাঁধেব উপব দিযে পিছন দিকে ফেলে দিল ওয়াইন কাপ মণিশোভনা। দেওয়ালেব গায়ে খান খান হযে ভেঙে গেল। যেন সে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ ফিরেও দাঁড়াল। তার চোখ দুটি ঝকঝক করল। তারপর জল দেখা দিল সে চোখেই। বলল সে, 'আশ্চর্য, তোমরা আমাকে আলোচনা করছ? স্ট্রেঞ্জ! কিন্তু, কিন্তু—শোনো বলি। সুচিত্র আমার দেবতা, আমার আদর্শ, আমার হিরো। কোনো সুরঞ্জিত কোনো ডক্টর পার্থসখা তাকে সেখান থেকে সবাতে পারবে না কোনো মনঃসমীক্ষাব সাহায্যে'।

কথাগুলি সে নিচু গলায় বেদনার সুরে প্রায় তেজে মিশিয়ে মিশিয়ে বলল। আর তারপর সে চলেও গেল টলোমলো করতে করতে।

সব শেষ হয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে হাত উল্টে দিল শোভন। মৃন্ময়ী দুহাতে মুখ ঢাকল। একটু ইতস্তত করে নতুন চুরুট জ্বালাল কাকামশাই।

নিস্তব্ধতার পরে ব্রজেন্দ্র বলল, 'তুমি কি বন্-এই ফিরছ? কবে ফিরছ শোভন'?

'দিন পনেবো পরে'।

'আগে হলেই ভালো ছিল। কিন্তু ওতেও হবে'।

সুবঞ্জিত বলল, 'হ্যাঁ, অন্যত্র নিযে যাওয়া দবকার। একটা পরিবর্তন। এবং দূরে দূরে থাকাও বটে। অবশ্য এখন উনি খুব হেভিলি ড্রিঙ্ক করেছেন বলেই মনে হল। অন্য সময়ে কথা বলা দরকার। তা হলেও'।

'একটা ভালো লক্ষণ,' বলল ব্রজেন্দ্র 'দাবদ্রোর আদর্শবাদ খুব গভীরে প্রবেশ করেনি। আর তা ছাড়া নিজের মধ্যেই একটা দ্বন্দ্ব চলছে বলেই হয়তো'।

'ভালো। রিঅ্যাকশনের স্টেজ এখনও পাব হয়নি। বযস কত হল—আটাশ'?

'দি ডেঞ্জারাস এজ। দ্যাখো ডক্টর, দরিদ্রদের বাবা মা মেয়েদেব বিয়ে দিয়ে দেয। সে ইভিলেও কিছু ভালো আছে দেখছি'।

'প্লিজ, প্লিজ, ডোন্ট বি মববিড'। সুরঞ্জিত হাসল, 'অত হোপলেস নয় কেস, বিশেষ এই ড্রিঙ্কেব ঝোঁক দেখে মনে হয'।

'কিন্তু,' মৃন্ময়ী বলল গোপন কথা বলার চাপা ভঙ্গিতে, সুরঞ্জিত ও শোভন তা না শুনবাব ভান কবল।

'তুমি কি চোখে দেখেও বুঝতে পারো না, ওদের কাকামশাই'? বলল মৃন্ময়ী।

'কী? মানে—'

'হ্যাঁ'।

ব্রজেন্দ্র চিন্তা করল। গভীবভাবেই চিন্তা করল। তার চেম্বারের গোপনে গভীরতর সমস্যাগুলিকে নিয়ে যেমন কবে কবে। মাথার টাকে দু-একবাব হাত রাখল। কক্‌টেলের শেকারটা উপুড় করল। কিছুই ছিল না সেখানে। নিস্তব্ধতা এল আবার। সেই অস্পষ্ট আলো এবং আলোর চাইতে বেশি ছায়া। মৃন্ময়ী টেবলেব উপরে মাথা রাখল। নিঃশব্দে ফোঁপাতে লাগল সে। তার ছায়াটা টেবলেব উপরে ওয়াইনকাপগুলোর গা ঘেঁষে ঘেঁষে ছড়িয়ে পড়ল। তার মন এবং ঘর।

'দ্যাখো, এসব ব্যাপারে আমি—। আর্টিফিসিয়াল ব্যবস্থাও তো কোনো কোনো মেয়ের করতে হয়। এও না হয় তাই হয়েছে। মণিশোভনারই সে এ পরিচয় কি কম হল? অন্য কে তাকে সাহায্য করেছে তা মণিশোভনারও না জানলে চলে। আর শোভনের ভাগনে সে। শোভন বিয়ে করেনি, করবেও না। ওর চাকরিতে হোস্টেস দরকার। তা মণিশোভনাই ছিল, সেই থাকবে। দ্যাখো, আমি—। শোভনও বিয়ে করবে না, বোনার্জি বংশটা, ধারার কথা যদি ভাবো'। ব্রজেন্দ্র যেন কালদক্ষ নাবিক, ঝড়ঝঞ্ঝার পরে ক্ষতি থেকে ভবিষ্যৎ গড়ছে।

'আ ব্রজ, ব্রজ, তুমি কি কখনই ছেলেমানুষি ছাড়বে না'? মাথা তুলে কাতর কণ্ঠে বলল মৃন্ময়ী।

'কিন্তু এতে ছেলেমানুষি কোথায়? সুচিত্র বছর দু-একের জন্য সাউথ আমেরিকায় যাচ্ছে। মানে

আমি কথাই দিলাম। তার হয়ে আমি তা পারিও'। ব্রজেন্দ্র বলল। আর মনে হল কুয়াশার উপরে শীতের প্রার্থিত সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখে।

'সে যদি দাবি করে'? শোভন বলল।

'দাবি, সুচিত্র, উঁ? দাবি, না? আইনে তা অবশ্য পারে। সে থাকবে সাউথ আমেরিকায় আর যদি বলো তোমরা সাউথ সিতেও হতে পারে, আর মণিশোভনা ইওরোপে। তা ছাড়া জজদের বোঝানো যাবে মানুষ করার ব্যাপারে মণিশোভনাই উপযুক্ততর'।

'আর নীতি'?

'দ্যাখো, মিনু বউদি, এটা তোমার সেই ব্রাহ্মঐতিহ্য। সাত পুরুষ বাদেও তোমাদের বিবেক নীতি-কণ্টকিত। কিন্তু,' হাসল কাকামশাই, 'তিন চার মাসের কথা বলছিলে না'?

'অনুমান'।

'অবশ্য সুচিত্র দাবি তুলবে না এমনও করা যেতে পারত। তোমার নীতির কথা ভেবেই ববং। এবং এ কথা অস্বীকাব করব না তোমার কাছে থেকে থেকে, মিনু, আমার দাদা আজ যার জন্মদিন, এবং আমার নিজেরও বিবেকে নীতি বলে একটা কড়া ভাব সৃষ্টি হয়েছে। দ্যাখো, তিন চাব মাসে সাধারণত সুচিত্র একটি উপন্যাস শেষ করে। তার জন্য সে অবশ্য পারিশ্রমিকও পায। কত পায়? না পাঁচ হাজার বা ওই রকম। বেশ কথা, সুচিত্র তাব এই সময়টা মণিশোভনার জন্য ব্যয় করেছে। আমি এখনই একটা চেক্ দিতে রাজি আছি, একটা উপন্যাসের সর্বস্বত্বের জন্য যা দিই সেই পাঁচ হাজাবই। তা হলে আর কি বইল সমস্যার'?

স্বল্প বিরতির পর শোভন বলল, 'আর আমাদের কাকামশাই আই মিন, বাজুকা, তাঁর অদ্ভুত সব সিদ্ধান্ত নেয়াব একটা দৈব দক্ষতা আছে'। হাসল সে, 'আর কখনও কখনও দেখা গিয়েছে সেসব সিদ্ধান্তই একমাত্র সিদ্ধান্ত হতে পাবে'।

মুখের চুরুটটা অ্যাশট্রেতে টিপে দিল বাজুকা। নতুন করে ওয়াইন ঢেলে নিল। বলল, 'ডিনার? দু-একটা আলো জ্বালো'।

সুরঞ্জিত বলল, 'ড্রেস করিনি'।

'সকলেই অপরাধী।' শোভন বলল।

'না হয়, শোভন, হিয়ার্স টু অ্যাপিটাইট।' মৃন্ময়ী ভাবল, সেই সেদিনের বিহ্বল প্রত্যুষের শেষে এক সময়ে ডিনারের ব্যবস্থা হয়েছিল আর সেই ইনফরম্যাল ডিনারে কি বিজনের প্রিয় খাদ্য অ্যাসপ্যারেগাস ছিল?

ডিনার—এই মৃদু ঘোষণা করে শেফ এবং তার দুজন সহকারী প্রকাণ্ড তিনটি ট্রেতে ইনফরম্যাল ডিনার বহন করে প্রবেশ করল। এমন করে প্লেটগুলিকে বহন করতে শেফরাই পারে সার্কাসওয়ালাদের সাধ্য নেই।

দু-একটা আলো জ্বালল শোভন।

'তোমার এই সসেজ! আ মিনু, আ বিউটি'। বলল ব্রজেন্দ্র।

অহেতুক

আমার নতুন করে মনে হল অর্থের গভীরে আরও অর্থ থাকে শব্দের। ইংরেজি নর্মাল কথাটাকে দেখা যাক। বাংলায় বলে স্বভাবী। অথচ স্বভাব, নিজের ভাব বলতে কী বুঝি? যদি কোন মানুষের পক্ষে তা সম্ভবও, আমরা কি তার বাইরের প্রকাশ থেকে ধরতে পারবো লোকটি স্বভাবে আছে? ইংরেজরা এ বিষয়ে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, নর্মাল বলতে তারা মাপেকাটা মানুষকে বোঝায়। সমাজের মাপ আছে, তার মধ্যে পড়লেই নর্মাল মানুষ হল।

এ কথা বলছো কেন? গৃহিণী এই প্রশ্ন করে উঠে বসলেন।

কারণ আছে। আমি বলতে চাইছিলাম, গৌরহরি কুণ্ডু সব দিক দিয়েই নর্মাল বাঙালি। সে রাজা রামমোহন, মুচিরাম গুড, গোপালচন্দ্র ভাঁড়ের সঙ্গে রক্তের দিক দিয়ে সম্পৃক্ত। বেণীমাধবের ট্রানস্লেসন, যাদব চক্রবর্তীর পাটিগণিত, লংম্যানের জিওগ্রাফি আর শেষ দিকে লাহিড়িস্ সিলেক্ট পোয়েমস্ পড়ে সংস্কৃতিসম্পন্ন হয়েছিল। এখনও এ সব বই অন্য নামে পড়ে লোকে। তার মানসিক গঠনে কেরোসিন কুপির ধোঁয়া ও গ্যাসের আলো ছিল। মাঝে মাঝে তাতে ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি লাগে।

গৃহিণী বললেন, নর্মাল বলে কি তেমন বাঙালির আদর্শবাদ নেই?

সময়-সময় গৃহপালিত হাঁস যেমন ডানা ঝাড়ে এবং তাদের তখনকার সমস্বর ডাকাডাকি থেকে ভ্রান্তি হয় তারা বুঝি এবার উড়বে, তেমন বাঙালির আলাপ-আলোচনা থেকে মনে হয় তারা অন্য কোথাও যেতে চায়। কিন্তু এ বলতে গেলে গৌরহরিবাবুর কথা আজ রাতে শেষ হবে না।

সুতরাং গৌরহরি কুণ্ডু আই. এসসি. পাশ করে ডাক্তারি বা ওই জাতীয় মহৎ-কিছু একটা করবে ভাবছে এমন সময়ে তার পিতা অত্যধিক কুইনাইনের ফলে রক্তহীনতা অবশেষে শোথে ভুগে ইহলোক ত্যাগ করল। কিছু একটা করার কথা ভুলে গিয়ে প্রথমে স্কুলের মাস্টার পরে একটু সুবিধে বুঝে কালেক্টরিতে কেরানির চাকরি জুটিয়ে নিল। সে চাকরি করতে করতে দুটি ছোট ভাই-এর লেখাপড়া এবং একটি ছোট বোনের বিবাহ থেকে শুরু করে নিজের চারটি ছেলের লেখাপড়া এবং দুটি মেয়ের বিবাহপর্ব সমাধান করল। বছর চল্লিশ বয়সে সে কিছু মেদযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় মেয়ের বিবাহের পর তৃতীয়ার কথা ভেবে সে মেদ নষ্ট হয়ে গেল। ফলে সে হাঁটবার সময়ে সামনের দিকে কিছু ঝুঁকে চলতো। বর্ষায় বাতের কষ্ট, শীতে সর্দিকাশি ছিল।

কিন্তু, গৃহিণী বললেন, গৌরহরিবাবুর মর্যাদাও ছিল।

সে টাউন ক্লাবের মেম্বার ছিল। শনিবার করে সে সেখানে তাসটা-পাশাটা খেলতে যেতো। সেজন্যে সে শহরের মাঝারি-বড়ো দু-চার জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিল। ক্লাবের সম্পাদকও নাকি ছিল সে দু-চার বার। আর এ-সবের ফল ভালোই হয়েছিল, অন্তত দুটো ছেলের চাকরি করে দিতে তাকে বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু ক্লাবটা তার বাড়ি থেকে কিছু দূরে বলে বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ক্রমশ সেখানে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছিল।

অবশ্যি পাড়ার লাইব্রেরিটার সে সভ্য ছিল। প্রথম জীবনে ডি. এল. রায় বড়ো না রবীন্দ্রনাথ বড়ো এ নিয়ে যেমন তর্ক করেছে, তেমনি উপন্যাসের ব্যাপারে শরৎবাবুর ধারে কাছে রবীন্দ্রনাথ আসতে পারেন কিনা এ বিতর্কেও উৎসাহ দিতো। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সেক্স্টন ব্লেকের

দিকে ঝুঁকেছিল, কিন্তু তাব সঙ্গে সঙ্গেই বলতে হবে, লাইব্রেবিতে ব্রহ্মচাবীদেব জীবনী ও কথামৃত আনানোব মূলেও সেই ছিল। লাইব্রেবিব কর্মকর্তাবা তাব মতেব মূল্য দিতো।

কিন্তু গৌবহবিবাবুব জীবনেব অনেকদিনেব মধ্যে একটি দিনেব কথা এখানে বলতে পাবি। শহবে একটি হবিভক্তিপ্রদাযিনী সভা ছিল। হযতো এখনও আছে। যে সমযেব কথা বলছি তাব ঠিক আগে সভ্যসংখ্যা কমতে-কমতে দু'-তিনজনে দাঁড়িযেছিল। প্রতিষ্ঠানেব ঘবটাব দেযাল থেকে আস্তব যেমন খসে খসে পড়ছিল তেমনি খোলগুলোও ফুটো হযে গিযেছিল। ঠিক এ সমযেই শহবে এক সদবওযালা এল। এত জনপ্রিয অফিসাব এব আগে আব দেখা যায নি। কিন্তু সে যে হবিভক্তিপ্রদাযিনী সভাব সভাপতি হতে পাবে এবং ববিবাবেব কোনো কোনো সন্ধ্যেয শহবেব বুড়ো লোকদেব, এমন কি তরুণতবদেব নিযেও, খোল কবতাল যোগে তাবস্ববে হবিনাম কবতে পাবে এতদূব কল্পনা কবা যায নি। এ-বাবদ সে একটা আলাপেব বিষয হযে দাঁড়াল। যাদেব বযসেব অভিজ্ঞতা আছে তাবা কে কতজন একসেন্ট্রিক আই সি এস সাহেব দেখেছে তাব স্মৃতিবোমন্থন শুরু কবল।

গৌবহবিব বাড়িব পাশ দিযে আসছিলাম। বাস্তাব মোড়ে দু' তিনজন বুড়ো মুখোমুখি দাঁড়িযে উষ্ণ হযে আলাপ কবছে। তাদেব সমালোচনায গৌবহবিব উল্লেখ ছিল, তাব নামেব ব্যঙ্গাত্মক ব্যাখ্যা ছিল এবং কুষ্মাণ্ড কথাটাব একাধিক উল্লেখ ছিল। কিছুদূব এগিযে গৌবহবিকে দেখতে পেলাম। আকাশেব তলায দাঁড়িযে সে কিছু ভাববাব ভঙ্গিতে সকালেব বোদটুকুকে উপভোগ কবছে। গলা ও মাথা পেঁচিযে আধমযলা একটুকবো ফ্লানেল। গাযে পুবোনো একটা আলোযান। তেলচিটে মনে হয, কিন্তু সেটা আলোযানেব বংও হতে পাবে।

কী খবব গৌবহবিবাবু?

এই তো।

বুড়োদেব একজনেব নাম কবে বললাম, ওঁদেব দেখলাম।

আমাব কাছেই এসেছিল।

এখানে বলতে পাবি গৌবহবিবাবুব 'ত' উচ্চাবণ ঈষৎ 'ট'-বর্গীয এবং তাব শ-ষ-স-এব উচ্চাবণে চ বর্গেব আভাস থাকে। কথা-বলাব সময তাব ডান ও বাঁ কাঁধ পর্যাযক্রমে সামনে এগোয। ফলে তাব কথাব শব্দগুলোকে দুলছে বলে মনে হয।

দল বেঁধে যে?

আমাকেও ভেড়াতে চায।

ইন্টাবেস্টিং।

কীর্তনেব দল খুলেছে। মশাই, হাঁ কবে, চিৎকাব কবে, হাঁকার্হাঁকি কবে কীর্তন না কী কবে ওবা। জুটেছে এক পাগল সদবওযালা।

কীর্তন মন্দ কী? বলে, নাম বামাযণ।

তাহলেও ভদ্রতা বলে একটা কিছু আছে। বিটলেপনা সবাইকে মানায না।

এ থেকে তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছো? গৃহিণী আবাব প্রশ্ন কবলেন।

প্রথমত গৌবহবিবাবুব নিজস্ব রুচি বলে একটা কিছু ছিল। সে আলোচনায বামধুনেব কথা এনেছিল, বলেছিল—ওই রামধুন, মশাই, বাঙালী ববদাস্ত কবে না। পলিটিকসে ওসব কী? আমি আলোচনায চৈতন্যব কথা তুলেছিলাম। গৌবহবিবাবু চৈতন্য সম্বন্ধে কোমল হযেছিল। কিন্তু দেখলাম সেটা সংস্কৃতিব ব্যাপাব। যেহেতু চৈতন্যেব আন্দোলন হিন্দু জীবনবীতি বক্ষা কবতে সাহায্য কবেছিল। নতুব ভগবান সম্বন্ধে দস্তুবমতো সন্দেহ আছে এটা জানাতে তাব কোন কুণ্ঠাই ছিল না।

বলেছিলাম, বযেস হলে ইহলোকেব বাইবেব কিছু মনে আসতে থাকে। গৌবহবি হেসে বলেছিল, আপনাব সে বযেস নয।

আর এ-সবই ঘটেছিল গৌরহরিবাবুর স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে। একথা বলবার তাৎপর্য এই যে সদরওয়ালা মূলকীর্তনীয়া যেমন পারে নি, শোকও তেমন পারে নি তাকে ধর্মের দিকে টানতে। সাধারণত শোক মানুষকে পরলোক সম্বন্ধে কৌতূহলী করে থাকে।

গৌরহরিবাবুর স্ত্রীর মৃত্যুটা কি—

আকস্মিকভাবে শোনা গেল তার স্ত্রী অত্যন্ত অসুস্থ। তারপর তার মৃত্যু-সংবাদ শোনা গেল।

তাই নাকি? কী হয়েছিল?

জ্বর।

তাতেই? তা ভালো, বাপু, স্বামীর বয়েস হয়েছিল। এয়োস্ত্রীর তখন বিদেয় নেয়াই ভালো।

তা বটে। কিন্তু ভদ্রলোকের সুবিধা অসুবিধা—! তাব চাইতে তার সংসারের সে-সময়েব অবস্থার কথা বলতে পারি। গৌরহরির চার ছেলেই চাকরি করে। তাদের তিনজন বিবাহিত। তারা বিদেশে। বউরা কখনো এখানে কখনো ছেলেদের কর্মস্থলে। বড়ো দুই মেযের বিয়ে অনেক আগেই হয়েছে। ছোট ছেলে, ছোট মেয়ে এবং স্বামী-স্ত্রী, এ নিয়েই গৌরহরিবাবুর প্রৌঢ় বযসের সংসার। গৌরহরিকে নাতিদের হাত ধরে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেতো, এক হাতে বাজারের ঠোঙা, অন্য হাতে নাতির হাত ধরা, যখন অবশ্যি বিবাহিত মেয়েরা কিম্বা বেটা-বউরা কেউ আসতো।

স্ত্রী মৃত্যুর পব কিছুদিন গৌরহবিকে দেখা যেতো না। মায়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে ছেলেমেযেরা সবাই এসেছিল। সে কদিন গৌরহরি ছেলেবউ মেযেজামাই নাতিনাতনী নিয়ে শোক ভুলে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিছু টাকা ছিল তার। তার অধিকাংশই সে শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে ব্যয় করল। বাড়াবাড়িও হল কিছু! তা বলতে বাড়ির সবার জন্যে নতুন কাপড় জামা পোশাক কিনে দেয়াও বুঝতে হবে। মনে বাখতে হবে, পরিবারের যে যেখানে আছে এমন করে একত্র মিলবার যোগাযোগ আর হয় নি।

তারপর তারা চলে গেল। মেযে-জামাইরা আগে। তারপর তার বড়ো ছেলে ও তার বউ-ছেলে। মেজ-সেজ বউ আপাতত থেকে গেল। কারণ গৌরহরির ছোট মেয়েকে নতুবা একা থাকতে হয়। সে অবিবাহিতা এবং তার বয়েস হযেছে।

বছব না পুবতেই গৌরহরির ছোটমেয়েটির বিবাহ হয়ে গেল। তার দাদারাই দিল। সে শ্বশুরবাড়ি যাওয়াব পর কখনো মেজ বউ, কখনো সেজ বউ এসে সংসারে থাকতো। ছোট মেযেও কখনো-কখনো ফিরে আসতো।

একদিন শোনা গেল গৌরহরি ইহলোক ত্যাগ করেছে।

হঠাৎ?

তাইতো।

ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য কোনদিনই তেমন মজবুত ছিল না।

হ্যাঁ, স্ত্রী যত্নআত্তি করে টিকিয়ে রেখেছিল।

তা হবে। একটু যেন চাপাচাপি, একটু যেন গোপন করার মতো কিছু, এ ছাড়া মৃত্যুতে গৌরহরি বাবুর জীবনের শেষ অনুচ্ছেদ শেষ হল বলা যায়।

এই নাকি? বললেন গৃহিণী। কেন তিনি গৌরহরির কথা শুনতে চেয়েছিলেন জানি নে। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন।

একদিন গৃহিণী বললেন, শুনেছো?

হ্যাঁ। শুনেছি। তোমরা যখন গল্প করছিলে তখন আমি লেখবার টেবিলে বসেছিলাম বটে, তোমাদেব কথাই কানে যাচ্ছিল। কে মেয়েটি?

গৌরহরিবাবুর মেজ বৌমা।

নিজের দোষস্খালনের চেষ্টা করছিলেন যেন।

ঢাকাঢাকি না করেই তো বলল। প্রতিবেশীরা নাকি গৌরবাবুর বেটা-বউদের এই বলে দোষ দেয়, বুড়োকে যে রকম সেবা করা উচিত তা তারা করে নি।

বুড়োদের দাবি নিয়ে আমি অনেক সময় ভেবেছি। এই সিদ্ধান্তই নানারকম চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছে, যেহেতু জীবনের বৃদ্ধি-বিস্তারের পক্ষে তারা আর অপরিহার্য নয়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপরে টান কমে আসে। সমাজে দুর্নাম রটবার ভয় আছে। কখনও কর্তব্যবোধেব সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা আছে। মোটামুটি এই রকমের একটা বক্তৃতা দিলাম।

স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয় ঘটায়, ঘটালও তা। বললেন তিনি, শ্বশুর-শাশুড়িকে শ্রদ্ধা না করলে সমাজ বন হয়ে যাবে।

তা হযতো হবে, কিন্তু কেন?

মানুষ উদাহরণ থেকেই শেখে।

তুমি বলতে চাও তুমি তোমার শ্বশুরকে শ্রদ্ধা না করলে তোমাব বেটা-বউ তোমাকে শ্রদ্ধা করবে না?

নিশ্চয়।

তার মানে তুমি শাশুড়িকে শ্রদ্ধা না করলে তোমার ছেলেব বউ তোমাকে অগ্রাহ্য করবে?

আমি কি অত স্বার্থপর, স্বার্থের জন্যেই সব কবি? বলে কেঁদে-কেটে গৃহিণী বিচার-বিশ্লেষণকে তলিয়ে দিয়ে সেই হস্তীপাণ্ডিত্যকে প্রমাণিত করলেন যার বক্তব্য : নারীরা মস্তিষ্কের বদলে হৃদয়ের নির্দেশেই চলে।

মাস চার-পাঁচ পরে গৃহিণী বললেন আবার : শুনেছো, গৌরহরিবাবুর বড়ো বেটা-বউ এসেছিল।

বলো, এখন দেখা হবে না।

বাব্বা, লেখা বলে কি অন্য কারো কথা শুনতেও নেই?

কলম বন্ধ করে চেয়ার ঘুরিয়ে বসলাম · কী বললে, গৌরহরিবাবুর বড়ো বেটা-বউ?

আসলে দোষী সেজ বউ।

তাই নাকি, জানতাম না তো।

মেজ বউ তার ভাইঝির বিয়েতে চলে গেছে, গৌরহরিবাবুর মেয়েরও শ্বশুরবাড়িতে না গেলে চলে না। তারাও তো তার ছেলেটাকে দেখতে চায়। আর সে হচ্ছে সে বাড়ির বড়ো বউ, আব সেই তার প্রথম সন্তান হয়েছে। সেজবউ-এরই সে-সময়ে থাকা উচিত ছিল বুড়ো শ্বশুরের কাছে।

তা সে-রকম কোন কৈফিয়ৎ যদি যোগাড় না করে থাকতে পারে তা হলে তা উচিত ছিল বৈকি।

গৌরহরিবাবু কি শেষ দিকে একাই ছিলেন নাকি?

নিষ্পট্ট। যদি ছোট ছেলের কথা না ধরো। ছোট ছেলেই রেঁধে-বেড়ে খাওয়াতো।

গৃহিণীকে কাজে যেতে হল। পিতাপুত্রের যৌথচেষ্টায় পরিচালিত একটা সংসারের ছবি মনে এল। উদাসীনের সংসার, কিন্তু মন্দ নয়। মস্তিষ্ক নিয়ে চলার উপযুক্ত পরিবেশ। নারীবর্জিত হওয়ার ফলে হয়তো বা কোমলতার, অন্য কথায় ভাবপ্রবণতার কিছু অভাব আছে ; কিন্তু তাকে অর্থহীন বলার কিছু নেই।

সেজ বউ এসেছে।

তা, আসতে গেল কেন?

ও মা, বলো কী! তাদের নিজেদের বাড়িতে তারা আসবে না?

তা বটে।

কুণ্ডুমশাই-এর বুঝলে, মানে, বোধ হয় মাথার দোষ হয়েছিল।

তা হলে সেজ বউ একটা কৈফিয়ৎ পেয়েছে বলো।

সেজ বউ বলে নি , কুণ্ডুমশাই এর মেয়ে সুদু বলছিল।

তাকে আবার এটা আবিষ্কার করতে হল কেন?

বলল, ঘুম হতো না, তা থেকেই।

ঘুম না হলে তা হয় বটে। এখন কিন্তু আমার ঘুমের সময় হল।

ঘুমোও। মেয়েটি কিন্তু বড্ড কাঁদল।

তা কাঁদে। মেয়েরা বোধ হয় ছেলেদের চাইতে বাবাকে বেশি ভালোবাসে।

সুদু কেঁদে কেঁদে বলল, কেমন যেন একটু মাথার গোলমালই হয়েছিল। বোধ হয় স্ত্রীর কথা ভেবে ভেবে। অনেকদিন একসঙ্গে কাটালে হয়তো পুরুষের মনে মায়াও হয়, স্ত্রীর জন্যে। বোধ হয় এত যে সেবা করতো তার কথাও মনে পড়ে। বিশেষ করে কুণ্ডুমশাই-এর শরীরটা খুব মজবুত ছিল না, কাজেই সাধারণ বউ-এর চাইতে তার বউকে সেবা একটু বেশিই করতে হতো।

সে তখন দেখা যাবে। আগে অনেকদিন তোমার সঙ্গে কাটাই, কিন্তু তাই বলে সেবা করার সুযোগ দিতে আমার শরীরটাকে অমজবুত করতে পারি নে। বলে পাশ ফিরলাম।

প্রতিবেশীরাই দুরাত্মা, এটা বেদ খুলে না হোক, পুরাণ খুলে প্রমাণ করা যায়। সেজ বউকে আসতে হল। বাড়িতে ঢুকবার দরজায় একটি বউকে ঘোমটা টেনে বেরিয়ে যেতে দেখলাম।

সেজ বউ এসেছিল কুণ্ডুবাড়ির। চা ও সংবাদ একসঙ্গে পেলাম।

বাড়িটা বিক্রি করবে, না ভাগাভাগি করে নেবে?

সে সংবাদে আমার দরকার কী?

তা বটে। একটা সূক্ষ্ম হাসি এনেছিলাম মুখে, কাজে লাগল না।

সংবাদটা এই যে গৌরহরিবাবু আত্মহত্যা করেছিলেন।

ছি।

কথাটা সেজ বউএর নয়, লোকে বলছে।

যতো না শুনছে তার চাইতে বলছে বেশি।

ও কী, সিগারেট ধরাচ্ছো কেন? খাও। আর বাপু, এ-সব কথা তোমাকে বলবো না।

কিন্তু জলখাবারের পিরিচ শেষ না করে সরিয়ে দিলেই সব কিছু শেষ হয় না।

সুদু যা বলেছিল—একদিন আবার গৃহিণী কথাটা তুললেন।

সে মিথ্যে বলবে তার কী বাধ্যবাধকতা আছে।

কুণ্ডুমশাই নাকি বলতেন, তুই আমার কাছে এসে বোস।

মেয়েকে কাছে বসতে বাবা বলে, বিশেষ করে যদি সে মেয়ে অনেকদিন পরে শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে আসে।

ওদিকে সুদুর আঁতুড়। ষষ্ঠীপুজো হয় নি, তার আগেই।

পুজোটুজো আজকাল অনেকে মানে না।

সেজ বউ চলে গিয়েছিল কেন জানো?

মেয়েদের কথা না কি ভগবানও জানেন না।

সুদু যা পারে বউ তা পারবে কেন?

ভালো মেয়ে সুদু।

কিন্তু বউএর পক্ষে তা কঠিন।

শুনছি।

সুদু শ্বশুববাড়ি যাবার পর কুণ্ডুমশাই নাকি সেজ বউকে—

কী?

তাব ঘরে শুতে বলেছিল।

হুঁ।

শুধু বলা নয়। বলেছিল পায়ে-পায়ে ঘুরে, কলতলার দবজায় দাঁড়িয়ে, বান্নাঘবেব জানলা দিয়ে, তুলসীতলায় প্রদীপ দেবার সময়ে। শেষ পর্যন্ত—বউমা, দযা করো।

যাক্‌গে, যাক্‌গে, ঘুমুতে দাও।

পাড়াব ডাক্তারের কাছে যেতে হল। উপন্যাসেব তাগিদে ঘুমকে তাড়িয়েছিলাম, ঘুম যেন অভিমান করল। চেষ্টা কবেও যখন ঘুম না আসে, সে এক দুঃসহ অবস্থা। এক নাগাড়ে পবপব সাতদিন যখন ঘুম হল না, আরশিতে দেখলাম শরীর খারাপ হতে শুরু কবেছে। এই চিন্তা ঘুম-না-হওয়া রাতে চোখের সামনে নানা ছবি দেখাতে লাগল। এক বিনিদ্র বজনীর সারাক্ষণ অসংলগ্ন চিন্তায় কেবলই মনে হতে লাগল—স্বাস্থ্যহীনতার ছাপ লেখাতেও পড়ছে, আর তাহলে তো মৃত্যুই হল। এমন কি গৃহিণীকে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে বাত্রি-জাগবণেব সঙ্গী কবার স্বার্থপর ইচ্ছেটাও উঁকি দিতে লাগল মনে।

ডাক্তার বলল, আমি তো বুঝতেই পারি নে, মানুষ কি কবে না ঘুমিযে থাকে।

ঠিক-ঠিক। আমি তো বুঝতেই পারছি নে মানুয ঘুমোয় কী করে।

দৈহিক পবিশ্রম করুন।

আপনাব কি ধাবণা বই লিখতে দৈহিক পরিশ্রম হয না? মস্তিষ্ক কি দেহ নয?

ডাক্তার হেসে বলল, তা হলে ঘুমের ওষুধ খাবেন?

ভালো থাকলে দিন।

ভালোই আছে। কুণ্ডুমশাইকে চিনতেন? কটি ফাইল তার জন্যে আনিয়েছিলাম। তারই একটা আছে।

না গছিয়ে ছাড়বেন না মনে হচ্ছে। দিন।

ওষুধ দিল কম্পাউন্ডার। ততক্ষণে ডাক্তার বললেন, কিন্তু অন্য চেষ্টাও করুন। ওষুধেব অভ্যেস ভালো নয। কী কষ্টই পেয়েছিলেন ভদ্রলোক। শেষ পর্যন্ত মানুষ এব জন্যে আত্মহত্যাও কবে।

বলেন কী?

আমার এক বোগী কবেছিল বলে মনে হয়। অবশ্যি সার্টিফিকেট দিয়েছিলাম পক্‌স্ বলে, কিন্তু আসল সেগুলো আগুনেব পোড়া।

কিন্তু ওষুধ এনে খাওয়া হল না। সন্ধের পর থেকেই যতবার ওষুধের শিশিতে চোখ পড়ল কুণ্ডুমশাই-এর কথাই মনে পড়ে গেল। রাতে যথারীতি ঘুম হল না। উষ্ণ মস্তিষ্কের পাগলামিতে মনে হল যেন শিশিটার গায়ে কুণ্ডুমশাই-এর মাফলার-জড়ানো মুখের ক্লোজ আপ থেকে থেকে ফুটে উঠছে। এ-পাশ ও-পাশ করে অবশেষে স্ত্রীকে ডেকে তুললাম। বললাম · আমার কাছে এসো, আমার গায়ে হাত দিয়ে থাকো।

আমার স্বরে বোধ হয় আকুলতা ছিল। শয্যায় উঠে এসে গৃহিণী হয়তো বিস্মিত হলেন।

ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে মনে হল স্ত্রীর মৃত্যুর পরে কুণ্ডুমশাই হয়তো এ-সুযোগ পায় নি আমি যা চাইবা-মাত্র পেলাম। ঘুম না হলে কখনো কখনো অদ্ভুতভাবে নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। মনে হয় হারিয়ে যাচ্ছি। মৃত্যুর পরে যেমন হবে তেমনি একটা কিছু যেন। তখন প্রিয়জনের কণ্ঠস্বর,

তার দেহের স্পর্শ মনকে স্বাভাবিক করে আনে।

সুদু বলছিল।

সে আবার এসেছে নাকি?

হ্যাঁ, তার স্বামী এই শহরেই বদলি হয়ে এসেছে, আহা এটাই যদি আগে হতো।

তা না হলে জীবনকে আর ট্র্যাজিক বলেছে কেন?

সুদু বলছিল, বুঝতে পারি নে, মনে হয়, বাবা হয়তো আত্মহত্যাই করেছিলেন।

মেয়েটা বোকা দেখছি।

এ কথা কাউকে না বলে সে একা মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারছে না।

তা হবে।

বলছিল, বাবাকে তাঁর পুরোনো ঘরে না রেখে যদি অন্য ঘরে নিয়ে যেতো। সে ঘরেই পাশাপাশি দু'খানা চৌকিতে বাবা-মা চিরকাল শুয়েছেন। রাতে অসুখের কষ্টে ঘুম হতো না। মা যতোদিন ছিলেন উঠে গিয়ে বাবার পাশে বসে গায়ে হাত বুলিয়ে কথা বলে ভুলিয়ে রাখতেন। মা নেই, ঘুম না-হওয়ার কষ্টে, অসুখেব কষ্টে বাববাবই বাবা হয়তো তাঁকে খুঁজেছেন। আব মায়ের খালি চৌকিটাই চোখে পড়েছে।

আরেকদিন গৃহিণী বললেন, মানুষেব কিন্তু পরকাল সম্বন্ধে সঠিক মত থাকা উচিত।

কেন?

মৃত্যুর পরে কী হবে, প্রিয়জনের সঙ্গে আবার দেখা হবে কিনা। নাকি এই দেহ পঞ্চভূতে মিশে গেলেই সব শেষ হল—এ নিয়ে ঠিকঠাক করে নেয়া উচিত মনকে।

এ-সব চিন্তা করলে কাজের ক্ষমতা কমে যায়।

তা যায় হযতো। কিন্তু কী হবে কী হবে এই দুশ্চিন্তার চাইতে কী হবে তা জেনে এগোনো ভালো।

তা মন্দ নয়। অন্ধকার গুহায় ঢুকতে হবে, গুহায় কী-কী আছে জেনে রাখলে মনটা অন্তত সুস্থির থাকে।

রোগীর ওপর ডাক্তারের দৃষ্টি আছে।

ওষুধ খেয়েছেন?

তা খেয়েছি। কথাটা মিথ্যে। ঘুমের ওষুধের সেই শিশি কোথায় গেছে কে জানে।

বসুন, বসুন। আজকাল দেখতেই পাই নে।

বসলাম।

আচ্ছা, মশাই।

কী বলছেন? ডাক্তার তার প্রেসক্রিপশ্যান থেকে মুখ তুলল।

আচ্ছা, গৌরহরিবাবুর মৃত্যুর সময়ে কি উপস্থিত ছিলেন আপনি?

অন্য ডাক্তারও ডেকেছিল। তবে শেষ সময়ে আমিই ছিলাম। কেন?

হঠাৎ কেন যেন মনে হল।

স্যাড্।

একটি রোগীই ছিল। সে চলে-না-যাওয়া পর্যন্ত ডাক্তার অপেক্ষা করল।

বলল, মশাই, প্রায় শেষ পর্যন্ত জ্ঞান ছিল। এমনভাবে চারদিকে তাকাচ্ছিলেন যেন অনুভব করলেন আমি এসব ছেড়ে যাচ্ছি।

মনের ভেতরে কী হচ্ছিল কে বলবে।

তা হতে পারে। ঘুমের একটা ওষুধ দিয়েছিলাম। একবার চোখ বুঝছিলেন, আর একবার তাকাচ্ছিলেন। অত যন্ত্রণায় কি ওষুধ কাজ করে! হঠাৎ 'ও মা' বলে কেঁদে উঠলেন, আর শূন্যের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। চোখে একটু জলও এলো। আবার ভয় পেলে শিশুদের চোখের চেহারা যেমন হয় তেমনি হল। কী হল কে জানে।

একটু থেমে ডাক্তার বলল, পক্স্ বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলাম। পাড়ার লোক, মশাই।

দূরভাষিত

আমাব আর মিহিবের জন্মনক্ষত্র দুটিব ভ্রমণপথে কাটাকাটি হয়ে গিয়েছে কি না জানি না। পৃথিবীতে কিন্তু একের জন্য অন্যেব সাবা জীবনেও শান্তিলাভ করা ঘটে উঠল না.

স্বজাতি স্বদেশ ত্যাগ কবে সবকারি চাকবির অজুহাত নিয়ে ভারতেব এই সুদুব সীমান্তে এসে ভেবেছিলুম— বাঁচা গেল, এবার অন্তত মিহিবেব নাগালেব বাইরে এসে পডা গিয়েছে। তাছাড়া তখন যুদ্ধের কুয়াশায় মানুষেব সাধারণ স্বাভাবিক দৃষ্টি যুদ্ধোদ্যোগের বাইরে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ভেবেছিলুন সেটাও একটা অন্তরাল।

কিন্তু একদিন অতি প্রত্যুষে একটা ঠিকাগাড়ি এসে থামল আমার দরজায় আর তা থেকে মিহির নামল, সঙ্গে তার স্ত্রী। এবার যেন সে চিরকালের জন্য থাকতে এসেছে।

জানতুম একসময়ে সে নিজে থেকেই তার আসবাব কারণ বলে আমাকে বুঝিয়ে দেবে— তার এ রকম না বলে-কয়ে আসবার জন্য আমাব কতখানি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কাজেই সেসব জিজ্ঞাসা কবার প্রয়োজন ছিল না। শুধু বললুম— কিন্তু এত কাজ থাকতে তুমি টেলিফোঁ অপারেটর হতে গেলে কী বলে? এর চাইতে সাহিত্য-টাহিত্য কবতে, সেই তো ভালো ছিল।

মিহির 'বউদি কোথায়' বলে তার বউদির খোঁজে উঠে গেল। এদিকে তাব উপরওয়ালা কর্মচারী হিসাবে আমার আহাব-বিহারে রুচি বলতে কিছুমাত্র অবশিষ্ট রইল না। দুজনেব ভাগ্য এবার চাকরির ক্ষেত্রেও জড়িয়ে গেল।

আমাকে অন্তত কিছুদিনের জন্য বিশ্রামের অবকাশ দেবাব জন্য মিহিব খানিকটা দূবে বাসা করল। আমি আবার বললুম— বাঁচা গেল।

কিন্তু দুদিন যেতে না যেতে ব্রাহ্মণী একদিন বিষণ্নমুখে বললেন— মিহির ঠাকুরপোর শরীরটা কিছুদিন থেকে ভালো যাচ্ছে না। দেখছি না তাকে আজকাল। কিছু বলেছ নাকি?

বললুম, অসুখ করেছে— তা ডাক্তাব দেখায় না কেন?

এসব নিজে কখনও করেছেন— এই বলে তিনি চলে গেলেন।

অতএব সন্ধ্যার দিকে মিহিরের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে তার বাসায় গিয়ে উপস্থিত হতে হল। শহরের দরিদ্র পল্লীব একান্তে সস্তার একখানি বাসা ভাড়া করেছে সে। পরিবেশটা ভালোলাগার কথা নয়। মিহিরের শুকনো মুখখানার দিকে চেয়ে চেয়েও একটা কষ্ট বোধ হল।

সুতরাং পবদিন সকালে তাকে নিজের বাসায় তুলে আনতে হল। আমবা যখন আমার বাসার সামনে ঠিকাগাডি থেকে নামছি ব্রাহ্মণী ঈষৎ হেসে সরে গেলেন। মিহির শুধু বলল— এই তোমার চিরদিনের বাড়াবাড়ি ছোড়দা, ও বাসায় আমাদের তেমন কষ্ট হচ্ছিল না।

কিছুদিন পরে মিহিরের বউদি আবার একদিন বলল—ওঁর মতো লোক হয় নাকি?

এ আমার জানা ছিল। অন্তত অনেক দিন থেকেই তা শুনছি। বললুম—তোমার মিহির ঠাকুবপোর অদ্বিতীয়ত্ব সম্বন্ধে আমিও কিছু-কিছু জানি। কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ আমাদের মতো সে কি সরকারি চাকরির কিছু দাম দেবে?

এদিক-ওদিক চেয়ে একটু নিচু গলায় তিনি বললেন—তুমি কিছুই বোঝো না। বিয়ের পরেও কি মানুষ বদলায় না?

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয় বোধ হয়। নতুবা মিহিব টেলিফোঁর চাকরি নেবে কেন? তাও বেশি বয়সে, আর তাও যুদ্ধের সময়ের এজ রিল্যাকসেশনে।

বাল্মীকিমুনির সময় থেকেই একটা কথা চলে আসছে যে আগুন ছাই চাপা পড়লেই নিবে যায় না। মিহিরের পূর্বজীবনের অনেক কথাই আমার জানা ছিল। কাজেই এরপরে মেঘমুক্ত মিহির যখন আত্মপ্রকাশ করল তখন আমার আশ্চর্য হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু আশার কুহকে পড়েছিলুম বলেই কষ্টটা হল।

সেদিন অফিসে গিয়ে বসতে না বসতেই বৃদ্ধ মাবাঠি সুপাবভাইজাব ছুটে এসে জানালেন— নতুন অপারেটারকে নিয়ে চলা দায় হয়ে উঠেছে। এবার অন্তত আপনি নিজে একটু না-দেখলে চলে না।

বললুম—কী হয়েছে, কী করেছে সে?

সুপারভাইজার বললেন—আপনাব নিজেব কানে শুনুন, স্যাব। আমিও বুঝি না সে কী কবছে, তবে মনে হয়, সে বাংলাদেশেব খাঁটি সোনা— সব ভেঙেচুবে ছত্রখান না করে দিয়ে সে থামবে না।

বললুম—খাঁখোঁজে, আমিও বাঙালি। মিহির যদি আইনেব চোখে অপবাধ করে থাকে তাব শাস্তি সে পাবে। কারো জাতি সম্বন্ধে ইঙ্গিত কবার কোনো অধিকার আমাদেব নেই।

সুপারভাইজাব স্তিমিত হল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে বলল—তাই ভালো স্যাব। মিহিরবাবুকে আপনার আত্মীয় জেনেই এতদিন বিপোর্ট করিনি।

দুঃসহ ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। কিন্তু এত বড অপমানটা নীববে সহ্য কবা ছাড়া উপায় ছিল না। সুপারভাইজার শুকনো নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিয়ে গেলেন। মনে হল ছোটবেলাব মতো এখনই উঠে গিয়ে হতভাগাটাব চুল ধরে টেনে আনি, আর তাব সেদিনকাব সেই কিশোরী-প্রায় বউদিব চোখের জলে বুক ভেসে যাক। বুঝুক তারা দুজনে মিলে কতখানি কষ্ট আমাকে নিরন্তব দিচ্ছে। ছি-ছি, আজই তারই জন্যে নিবেট মাবাঠি সুপারভাইজাবটিও জাত তুলে অপমান কবে গেল।

কিন্তু বাগের মাথায় তাকে নিবেট বললেও অনেক দিন একসঙ্গে কাজ কবে এটুকু বুঝেছিলুম— নিন্দা করাব দিকে কিছু ঝোঁক থাকলেও বিনা প্রমাণে সে কারো বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে না। দু'এক দিনেই বিপোর্ট এল মিহির অপরাধ করছে। কিন্তু তাব অপরাধ ও গুরুত্ব বোঝাতে হলে একটু আনুপূর্বিক বলা দরকার।

সরকারের নিয়ম এই যে তার প্রয়োজন বিনা ও বিনামূল্যে তাব বৈদ্যুতিক কাবেন্ট খরচ কবে টেলিফোঁর যন্ত্র কেউ ব্যবহার কবতে পারবে না। করলে তার জন্য শাস্তিব ব্যবস্থা আছে। তবু ছোট কাজেব মতো যারা এ বিভাগে কাজ করে তারা অন্যান্য বিভাগের মতোই নিজেব কাজে সময়ে-অসময়ে তাব ব্যবহার করে। এসব এত ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয না। কিন্তু এখন যখন যুদ্ধোদ্যোগে সিভিললাইনগুলোও চাপে ফেটে কিংবা পুড়ে যাবে?

কিন্তু আইন যখন আছে তখন তাকে বলবৎ বাখবার উপায়ও আছে। ট্যাপিং বা লাইন ট্যাপ কবাব কথা বলছি। বোর্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করে একটা গুপ্ত তার বাখা হয়— সে তারেব অন্য প্রান্ত থাকে উপরওয়ালা কর্মচারীদেব কাছে। এ থেকে তারা লাইনে কোথায় কী হচ্ছে, ঘরে বসেই তা বুঝতে পারে। মিহির সম্বন্ধে যে রিপোর্ট সুপাবভাইজাব পাঠিয়েছে তা তাব ট্যাপিং-এবই ফল।

এই রিপোর্টেই মিহিরের শাস্তি হতে পারত, কিন্তু সে যা করছে তা সব কল্পনাকেই ছাড়িয়ে গেল।

মর্মত ব্যাপারটা এই : সারা বিশ্বভারতে যত টেলিফোন অপারেটর আছে তাদের নিয়ে একটা দল গড়ে উঠছে। দলের উদ্দেশ্য বুঝতে না পারলেও বুঝলুম তার মূলে মিহিরেব প্রতিভাই কাজ কবছে। বুঝলুম প্রতি রাত্রিতেই এই দলেব সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে সভা বসে, আর সে বৈঠকে তিন চার ঘণ্টা ধরে সরকারি কারেন্ট খরচ করে নানা রকমেব বিষয়ের আলাপ আলোচনা হয়, প্রস্তাব গৃহীত হয়। না, বোধ হয়, ইউনিয়ান নয়।

এ সম্বন্ধে আমার একমাত্র কর্তব্য কী তা বুঝতে বিলম্ব হল না। কিন্তু দু-চারদিন ঘরের মেঝেতে পায়চারি করে বেড়িয়েও কোনো উপায় খুঁজে পেলুম না। মিহিরকে বললে ফল হবে, জানবামাত্র হাসতে হাসতে সে কাজ ছেড়ে দেবে? কিন্তু তাব স্ত্রী? স্বামীর উপরে অগাধ বিশ্বাস রেখে, তার উপার্জনের ভরসাতেই সে তাব ভবিষ্যতের কল্পনা গড়ে তুলছে। মিহিরকে শাস্তি দিতে গিয়ে তার স্ত্রীর ভবিষ্যৎ কী করে নষ্ট করা যাবে?

এ রকম সময়ে আমাব একবাব মনে হল— মিহিরকে কিছু করতে না পারি তার দলের কয়েকটিকে ধরে শাস্তি দিতে পাবলে দল ভেঙে যাবে, দল ছাডা মিহির কিছুদিনের জন্য শান্ত থাকবে।

গভীর রাত্রিতে চুরুট জ্বালিয়ে গুপ্ত যন্ত্রটির কাছে গিয়ে বসলুম।

কিছুক্ষণ নিঃসাড থাকবার পর যন্ত্র সজাগ হয়ে উঠল। গলা শুনে বুঝলুম এদিকের অফিসে মিহিরই কাজ কবছে।

মিহিব বলল, 'হ্যালো, শিলং'।

'কে আপনি'? শিলং থেকে উত্তব এল, 'আমি রাজেন, রাজেন রায়। আপনি কে'?

'মিহির। তোমাদেব আবাব কী হল? বার বার এত ঝগড়া হয় কেন? পান্না কালও আমায় বলছিল'!

'দাঁড়ান একটু, ঠিক শোনা যাচ্ছে না। হাঁ, বলুন তো এবার, কার সঙ্গে ঝগড়া হল আমাব'?

'পান্নার সঙ্গে। ও বেচাবিকে কষ্ট দিযে তুমি যে কী আনন্দ পাও বুঝিনে। কাল বলতে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেললে'।

'কী বলছ শোনা যাচ্ছে না? বৃষ্টি হচ্ছে কোথাও? তা হবে, কিন্তু আসলে তুমি একটা দুর্মুখ'।

'একটু অপেক্ষা করুন উত্তর দিচ্ছি। একটা বুকিং আছে'।

শিলং-এর লোকটি বোধ হয় কাজেব খাতিরে কল ছেড়ে দিল। এদিকে মিহিরের কাজও বেড়ে উঠল। সংযোজন করতে যে সময় লাগে তারপরেই ওপার থেকে মিহিরেব ডাকে ঢাকা অফিস সাড়া দিল ·

'কে? মিহিরদা নিশ্চয়'?

'হ্যাঁ। সব খবর ভালো'?

'ভালো। কী করছ তুমি? কালকের গল্পটা কিন্তু শেষ হয়নি সেইটে আগে বলো'।

'ওটাকে কি তোর গল্প বলে মনে হয় নাকি? বাংলাদেশে বসে আছিস। তাই আমার কথা উলটো উলটো লাগে। এইমাত্র রাজেন বলল, শিলং-এর ওদিকে কোথায় বৃষ্টি হচ্ছে। আর এদিকে এই যে আষাঢ় মাস যাচ্ছে, আকাশে বাতাসে তার চিহ্ন মাত্র নেই। শুকনো প্রবঞ্চিত প্রকৃতি যেন আকাশের দিকে কটমট করে চেয়ে আছে। সবুজ কোথাও নেই— জার্মানির পেন্টের মতোই তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে'।

'তুই সেদিন যা বলেছিলি তাই যেন সত্যি হতে পারে— বড্ড একা একা বোধ হচ্ছে'।

'না। এ ঘরে কিন্তু একটা মজার জিনিস আছে। তোকে বলব বলে ভেবে রেখেছি। কার বুদ্ধিতে যে রাখা হল জানি না। ঠিক বোর্ডের উপরে দেওয়ালটার গায়ে একখানি ফটো আছে। বেশ বড় আর জীবন্ত। অল্প অল্প আলো গিয়ে পড়েছে ওটার গায়ে'।

'কার ফটো, বউদির'?

'না। তলায় কী নাম লেখা আছে বোঝা যায় না। শুনেছি আমি আসবার কিছুদিন আগে মারা গেছে। আমাদের মতোই! কিন্তু এখনও শান্তি পায়নি। দীর্ঘ রাত্রিতে একলা বসে কাজ করবার মতো নিঃসঙ্গতা, সারা জীবনের ক্ষতি স্বীকার আজও যেন ওর ছবিতে ওর দুরন্ত ক্ষয় ব্যাধির মতোই ধরা পড়ে আছে'।

ওপার থেকে সহানুভূতি-মৃদু গলায় ঢাকার পান্না জিজ্ঞাসা করল, 'এ রকম কেন হয়'?

'বোধ হয় স্বাভাবিক বলেই'।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঢাকার অপারেটরটি জিজ্ঞাসা করল, 'কদিন থেকেই কথাটা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব ভাবছি– এত বুদ্ধি এত জ্ঞান নিয়ে তুমি আমাদের দলে নেমে এলে কেন'?

মিহির হাসতে লাগল।

'হাসি দিয়ে সব ঢাকা যায় না তা তুমি জানো। তোমার পরিচয়েই আমরা পরস্পরকে পরিচিত করতে পেরেছি, তুমি আমাদের একত্র করেছ, তবু মনে হয় এ তোমার স্বাভাবিক নয়'।

মিহির বলল, 'তোর আজ কী হল– এসব প্রশ্ন কেন? তুই বলবি, স্বামী আর যাই করুক, তোর মা-ভাইয়ের ভার তার কাছে বিড়ম্বনা বলে বোধ হবে। কিন্তু এমন বরও জুটতে পাবে– যার প্রচুর টাকা আছে, হৃদয়ে মমতা আছে। বেহালা বাজাতেও জানে।

'সে শুধু একবার বলে না কেন– পান্না তোকে আমার দরকার। .'আচ্ছা, দাদা'।

'কী রে'?

'তোমাকে কোনোদিনই দেখিনি, একবারও কি দেখা হতে পারে না'?

'দেখবার মতো এমন কিছু নয় আমি। এ রাজেনদের জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবি'।

'ওরা ভয়ানক হিংসুক, বলতে চায় না'।

মিহির হা-হা করে হেসে উঠল। বলল, 'সবই বৃথা হল, বোন। বেহালাও বাজাতে জানি, কিন্তু হয়েছে কনজামসান্'।

'সারে না ?

'তোরা তো কোনদিনই ফিরে চাইলিনে। কোথাকার কে রাজেনই হল বড়'।

মেয়েটি এবার খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, 'বউদিকে খবরটা পৌঁছে দিতে হবে। আচ্ছা, গুড নাইট। কাল এসে আবার তোমার কনজামসানের গল্প শুনব'।

ঢাকার অপারেটরটি বোধ হয় ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফিরল।

হয়তো এদের কথায় যে অনির্দিষ্ট দুঃখের রেশ ছিল তাতে অভিভূত হয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। কিন্তু পান্না বিদায় নিতে না নিতে, যখন একসঙ্গে চার-পাঁচটি কেন্দ্র সংযোগ চেয়ে মিহিরকে ডাকতে লাগল, তখন কী করা উচিত খুঁজে দেখবার মতো মনের অবস্থা রইল না।

পেড্রাওনা থেকে লালজি বলল, 'সময় হল মিহিরবাবু'?

'হ্যাঁ। আপনার দিকের সব খবর ভালো'?

'হ্যাঁ। তাহলে এবার সভার কাজ আরম্ভ করা যাক'।

ওয়াল্‌টেয়ারের গোপালন বলল, 'লালজিভাইয়া মারমুখো হয়ে আছে, একটু আলাপও করতে দেবে না'?

লালজি বলল, 'আলাপ করার সময় এরপরও পাবে। পেটে যাদের খিদে তাদের আলাপ ভাঙা কাঁসির মতো শোনাবে'।

রক্‌সৌলের দিক থেকে কে যেন তীব্রস্বরে লালজিকে সমর্থন করল।

লালজি বলল, 'মীরাটের মহম্মদ জান আজ সভায় প্রস্তাব আনবে, তাকে অনুমতি দেওয়া হোক'।

সভাপতি হিসাবে মিহির মহম্মদ জানকে ডেকে নিল। কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই মিহির বলল, 'লালজি, আপনাদের সভা আরম্ভ হওয়ার আগে আমার কিছু বলার আছে। কিছুদিন থেকে বলব মনে করেও বলা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আজ না বলে পারছিনে। যদি আপনাদের কারো এতে আঘাত লাগে আশা করি আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন।

হয়তো কলকাতার এথেলের কাছে, হয়তো পান্না-রাজেনের কাছে আপনারা দল তৈরির গোড়ার খবর পেয়েছেন। সেদিন কী এর উদ্দেশ্য ছিল তাও আপনাদের অজানা নেই। কিন্তু আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে এখন আমাদের দেখার দরকার হয়েছে যাতে আমরা সে উদ্দেশ্য থেকে বহু দূরে সরে

না যাই। লেবার প্রবলেম আছে— তার বিষয়ে আমিও আপনাদেব মতো জানি। তার সমস্যার সমাধানে কোন পথ ভালো, কোনটি বা মন্দ তা নিয়েও আলোচনা করতে চাই না। কতটুকু অর্থ পেলাম, না পেলাম তার হিসাব কববার জন্যে অন্তত আমাদেব এ সমিতি তৈবি হয়নি। ইউনিয়ানের কাজ তা'।

ওপাব থেকে লালজি বাধা দিয়ে বলল, 'এসব কথা এর আগে অনেকবাব শুনেছি। কিন্তু আমাদের এ সমিতিব উদ্দেশ্য যদি শুধু মানুষ হিসাবে বাঁচাই হয, তবে তারই উপকরণ টাকাটাকে বাদ দিয়ে রাখা যেতে পাবে না— বোধ হয় আপনি স্বীকার কববেন'?

'না, স্বীকাব করি না'। মিহিরের কণ্ঠস্বব উষ্ণ হযে উঠল। 'টাকাটা বাঁচাব উপকবণ নয, যেমন নয় সালোযাব আচকান। লালজি আমাদেব বাঁচতে হবে। অর্থেব পবিমাণ ছেড়ে দিলে আমবা সবাই এক— শুধু অর্থ উপার্জনের যন্ত্রমাত্র। শুধু অর্থোপার্জন, শুধু দেহ ধারণই কি জীবনের শেষ কথা হবে? অর্থেব ধূসব বন্ধ্যা বর্ণে সব একাকার হয়ে যাবে— এটাই কি ভেবে দেখার মতো নয়? তবু কি আপনাবা আমাদেব বিপথে চলতে বলবেন'?

লালজি বলল, 'মনে করুন শিল্প-সাহিত্য। তার চাইতে মূলতর প্রয়োজন—

লালজিব কথা শেষ হতে পাবল না। মীবাট থেকে মহম্মদ জান আর বক্‌সৌলের সেই লোকটি একই সঙ্গে হা-হা করে হেসে উঠল। রক্‌সৌলের লোকটি রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'আপনি বাঙালি তাই না খেয়ে থাকতে পারেন। আমাদেব পাহাড়ী শরীবে ক্ষুধাটা কিন্তু বড প্রবল। কবিতা দিয়ে তা ভবে না'। ভর্ৎসনাব সুবে মিহিব বলল, 'তেজবাহাদুব আপনাব শবীবে শক্তি আছে তা আমাব অজানা নেই। এ অশান্তিব মূলেও যে আপনি সেটাও কি ওই গায়ের জোরের উপরেই নির্ভব কবে? কিন্তু সবরকম প্রশ্রয়েবই যে একটা সীমা আছে তা আপনাবা ভুলে যান কেন'?

তেজবাহাদুর বলল, 'আমরা খেলবাব মতো পুতুল নয়'।

ওয়াল্‌টেয়াবেব গোপালন বলল, 'তবে বুঝি তুমি আগুন, কী বলো তেজবাহাদুর'?

তেজবাহাদুব বলল, 'এ কথাটাই মনে রেখো, আর তোমার বাঙালি বন্ধুদের বলে দিযো এ আগুন দিয়ে খেলতে গেলে একেবারে অক্ষত হাত নিয়ে ফেরা যায় না'।

কী সাংঘাতিক! ভাবতবর্ষের সমস্ত টেলিফোন জালকে একত্র জুড়ে এ কী কবছে এরা। কত সিভিল, কত মিলিটারি, কত বিপন্ন মানুষেব প্রাইভেট কল সব হযতো নো বিপ্লাই হচ্ছে।

আজ এই গল্প বলতে বসে অনেক কথাই স্পষ্ট করে মনে পড়ছে না। মিহির সেদিনকাব সভায শেষ পর্যন্ত কী বলেছিল তাও মনে পডছে না। অনুভব করছি তাদের সেই সভা আলোচনার আন্তরিকতায, বিতর্কের তীব্রতায় যে কোনো গুপ্ত সমিতিব সভার মতোই আমাকে অভিভূত করে দিযেছিল। আব—একথা বলতেই হবে— যদিও আমি মিহিরেব দোষ ধববাব জন্যই সেদিন রাত জেগে বসেছিলাম সেই আমার সহানুভূতি আকর্ষণ করতে লাগল। অনুভব করছিলুম সেই সভায় হঠাৎ একটা বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে, আর মিহির তার নেতৃত্ব রক্ষার জন্য উদ্দেশ্যকে অমলিন রাখার জন্য সংখ্যালঘু হযেও পড়েছে। কিন্তু নিহিলিস্টের দল নাকি?

পরদিন সকালে মনে হল কাউকে দেখানোর জন্য যেন ডাক্তার ডাকা দরকার। পরে মনে পড়ল কাল রাত্রিতে পান্নার কাছে মিহির কনজামসনের কথা বলেছিল তা থেকেই এমন হয়েছে। মিহিরকে দেখলুম চায়ের টেবিলে— কোথাও কনজামসনের লক্ষণ নেই। মনের কনজামসন। স্ত্রীকে ডেকে সব বললুম। মিহিরের স্ত্রী যমুনার পরাজয় হচ্ছে বোঝাতে চাইলাম। অথচ দিনের আলোয় তাকে দেখে তার সমিতির কথা বুঝবার উপায় নেই।

অফিসে গিয়ে সুপারভাইজারকে ডাকিয়ে এনে বললুম, 'খাঁখোঁজে আমারই ভুল হয়েছে। মিহির আমার স্বজাতি হলেও আপনিই তাকে আমার চাইতে ভালো চিনেছেন। যা করবার আপনাকেই করতে হবে, আমি তাকে একবার সতর্ক করে দেবার পর'।

এটা আমার কাপুরুষতা এবং অযোগ্যতার নিদর্শন হতে পারে যে এরপরে দিন পনেরো আমি মিহিরের কোনো সংবাদ রাখিনি। চায়ের টেবিলে একদিন শুধু বলেছিলাম, 'অফিসাববা লাইন ট্যাপ করে, ওযাচ করে তা তো জানো'। এতেই বোঝা উচিত।

একদিন দুপুর বাত্রে টেলিফোঁ বেলের তীব্র ঝনঝনানিতে ঘুম ভেঙে গেল। রিসিভার তুলে নিলুম। ওপার থেকে কথা এল, 'সেই হল, বডসাহেবকে একবার ডেকে দিন'।

আশঙ্কায় তার গলা কাঁপছে, তাহলেও বুঝলুম সুপারভাইজাব খাঁখোজেই কথা বলছে।

বললুম 'কী হয়েছে বলুন'।

'মিহির, মিহিব—

'কী করেছে'?

'জানি না। বুঝতে পারছি না। সাংঘাতিক কিছু একটা'।

দুঃখে হাসি পেল। রাত জেগে জেগে বেচাবাব মাথা খারাপ হয়েছে।

বললুম, 'আচ্ছা আপনি বিশ্রাম নিন, আমি দেখছি'।

ও ঘরে শয্যায় মিহিরের বউদি সুখনিদ্রিতা। হিংসা হল। দীর্ঘনিঃশ্বাস পডল। ট্যাপিং কবাব রিসিভার তুলে নিলাম।

'ইযেস্, পুট থ্রু টু ঢাকা'। এপারের অপাবেটর কলকাতাকে ডেকে ঢাকার সঙ্গে সংযোগ চাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পবে ঢাকার অপারেটর বলল, 'হ্যালো। হোয়াট? পুরানো পল্টন সেভেন ও নাইন থ্রি? রাইট'।

এরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে। পুরানো পল্টনেব গ্রাহকেব সঙ্গে এপাবেব গ্রাহক যোগ চাচ্ছে। সমস্ত কথাবার্তাই অফিসেব ভাষায় হচ্ছে, 'এতে দোষ ধরার কিছু নেই।

এপাবের গ্রাহকটির কথা শেষ হল। 'হ্যাভ ইউ ফিনিসড্? রাইট'।

পুরানো পল্টনের যোগ খুলে দিয়ে ঢাকা জিজ্ঞাসা করল, 'কত চার্জ হল মশাই, আঠারো টাকা সাত আনা? রাইট'।

পায়ের উপরে একটা মশা কামড়ে ফুলিযে দিযেছিল। শয্যাব দিকে চেযে চেয়ে হয়তো একটু অন্যমনস্ক হয়ে পডেছিলুম। আবার কল বেজে উঠল।

এপারের অপারেটর জিজ্ঞাসা করল, 'শিলং নাকি'?

'হ্যাঁ, মিহির দা! তোমার গলার স্বর অবধি বদলে গেছে দেখছি'।

'কী করি বলো, পান্নার হুকুম, ওর ধারণা গলার স্বব বদলে রাজবোষকে ফাঁকি দেওয়া যায়। কিন্তু এদিকের ট্যাপিংসেটার বিশেষ জাগ্রত। আজ আব কথা নয়'।

'কিন্তু. .

'কিন্তু আর কোরো না। পান্নার মা রাজি হয়েছেন আমার কথায়, আর পান্নার কথা তুমি নিজেই জানো'।

মিহিরের কপট গাম্ভীর্যেই বোধ হয় ওপারের রাজেন হেসে উঠল। মিহির বলল, 'তোমাদের বিয়ের পবে যদি পারি একবার তোমাদের সংসার দেখে আসব। কিন্তু আজ আর নয়। আজ কী দিন মনে আছে তো'?

'হ্যাঁ, ছাড়ছি। ভারি গলার এক ব্যাটা ঘোঁত ঘোঁত করছে, দিল্লি চায়। মনে হচ্ছে আর্মি সিভিল লিয়াসঁ কেউ'।

ভাগ্যে শিলং-এর লোকটি লাইন ছেড়ে দিল। কিন্তু এপারের আফিস নীরব থাকতে পারে না। শিলং লাইন ছাড়তেই ঢাকা কথা বলে উঠল, 'দাদা'।

'তুই ঘুমোসনি, দুষ্টু মেয়ে'?

'উঁহু, উঁহু, আমাকে ওভাবে শাসন কবা চলবে না আর। দু দিন বাদে আমাব বিযে। কিন্তু তুমি আমাকে একটু দূবে ঠেলে দিলে না'?

'দিলুম তাই। তোব মতো দুষ্টু কেউ কাছে থাকলে কাজে খালি ভুল হয'।

'কিন্তু এসব বলে আমাকে আজ তুমি এড়াতে পাববে না। সত্যি আজ আমাকে বলতে হবে তুমি কে। তুমি আমাদেব মতো একজন নও'।

'আমি মিহিব অপাবেটব'।

কিছুক্ষণ ভেবে পান্না বললে, 'ওতে আমাব উত্তব নেই। বলবে না'?

মিহিব হাসতে হাসতে বলল, 'ভযঙ্কব কিছু মনে হয, না বে'?

'কী হয জানিনে'।

'না জানলি। ক'জন ডিউটিতে আছিস? একবাতেব ঝড়াক স্ট্রাইকেব মতো সবাই ঘুমিয়ে পড়। এখুনি। অর্ডাব। সকলকে ঘুমাতে বলেছি'।

সাসপেন্ড কবব, বাঁদব। মাবব থাপ্পড, মর্কট কোথাকাব।

হাসিব শব্দে দেখলাম স্ত্রী এসে দাঁড়িযেছেন। বললেন—অত জোবে মশা মাবে? শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। কাকে গাল দিচ্ছ? কফি কবে আনি?

ঝাঁঝেব সঙ্গে বললুম—মশা মাবছি, মশা? এটা সম্বন্ধে দেওবেব সঙ্গে আঁচলে কাঁচা আম বেঁধে ফাটিযে খাওযা নয। বেণী দুলিয়ে একসঙ্গে কলেজে যাওযা নয। অর্ডিনান্স জাবি আছে। হয তোমাব গুণেব দেওবকে সাসপেন্ড কবতে হবে, নয আমাকে পুলিশ ধববে সাবোটাজেব জন্য।

এটা সেই যুদ্ধেব সমযেব, যখন এসটিডি ছিল না, অটোমেটিক ডাযালিং ছিল না, অপাবেটব লাইনে লাইন জুড়ে দিত।

ঢাকাব পান্না ঘুমায়নি। বললে, 'ঘুম আসছে না'।

বোধ হয় প্রশ্নটাকে ভাষায় রূপ দিতে অসুবিধা হল পান্নাব। শেষে সে বলল, 'ধবো আজ বাত্রিব এই ব্যাপাবটা'।

'অন্য কথা বল্'।

'এমনি কবেই তুমি চিবদিন এড়িযে চলো। আমবা বুঝিনে তোমাকে, কেন তুমি বুঝিযে দিতে একটু নেমে আসবে না? প্রতিটি বাত্রি যাদেব জেগে কাজ কবতে হবে একটা বাত্রির কয়েক ঘণ্টা তাবা সবাই ঘুমোবে কাজ করবে না— এ বিদ্রোহে কতটুকু তোমাব কাজ এগোবে বুঝতে পাবিনে। তোমাকে প্রশ্ন কবেও লাভ নেই। কিন্তু যারা তোমাব নির্দেশে অনেক ক্ষতি সহ্য কবাব ঝুঁকি নিচ্ছে তাদেব কি প্রশ্ন করারও অধিকাব নেই'?

'সবাই মিলে যদি এমন প্রশ্নই কববি, আমি একা কত উত্তব দিতে পাবি বল'।

'এটাও এড়িযে যাওয়া। তুমি জানো আমাদের প্রশ্নে যতই ছেলেমানুষি থাক সেসবেবই উত্তব তোমার আছে। তুমি বলেছ— আমরা স্বাভাবিক মানুষ। স্বাভাবিক মানুষেব মতো আলো বাতাসেব অধিকার আমাদের আছে। ঘুম থেকে বঞ্চিত হয়ে উদরান্নেব ব্যবস্থা করব, আত্মার অভিপ্রেত নয। এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থাকে তুমি ভেঙে দিতে চাও। আজ কি সেই সত্যটাকে কিছুটা প্রতিষ্ঠা কবার জন্যই এই আয়োজন? ইউনিয়ান তোমাব উপরে ক্ষেপে গেছে তুমি নাকি ইউনিয়ন ভাঙছ'।

তুলনাটা ঠিক মনে আসছে না। নির্বুদ্ধিতাকে যদি বাষ্পের বা গ্যাসের সঙ্গে তুলনা কবা যেত তাহলে বলতুম আমার অন্যমনস্কতার অবসরে সারা ঘর সে গ্যাসে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে সে গ্যাস আমার মস্তিষ্ককে অসাড় করে দিচ্ছে। কী চায় মিহির, কীসের আয়োজন তার। সব কিছুই যেন আমার জানাশোনার মধ্যে ঘটবে আর আমার কিছুই করবার থাকবে না। ওদের আলাপ থেকে বুঝতে পারছি মিহিব অর্থ চায না— দল পাকিয়ে ভিক্ষা কবতে বা চোখ বাঙাতে তাব সমান আপত্তি। সে কাজ,

যদি তা কাজই হয়, অন্য কারো। যাকে সে কুৎসিত মনে করে অনেক বেশি টাকা পেলেই বা করবে কেন?

শুনলুম মিহির বলছে, 'আজ নয় পান্না, আব একদিন। ওরা সবাই বলবে মিহির বোনের কাছে ডিসিপ্লিন রেখে চলতে পারে না। ঘুম আজ সারা ভারতে'।

মাথার চুলগুলি কখন ঘামে ভিজে উঠেছিল। কপাল বেয়ে গাল বেয়ে ঝবতেই যেন সম্বিত পেলাম। কী করি কী করি এই ভাব নিয়ে চেয়ারে সোজা হয়ে বসলুম।—শুনলে? স্ত্রী বললেন, এ রকম ঝড়াক স্ট্রাইকও তো হয়। তফাত, এটা এক কবির হাইপাববোল। দ্রব্যসামগ্রী বেশি কিনতে পাবাকেই দাসত্ব-মুক্তি বলে না। ঘুমেব দাম টাকার চাইতে বেশি।

ঝনঝন করে কল বেজে উঠতেই আবাব বিসিভার তুলে নিলুম। কলকাতা কথা বলছে।

'এথেল নাকি? কাজ হল'? মিহির প্রশ্ন করল।

'হয়েছে। অদ্ভুত তোমাব ক্ষমতা মিহির, তাব চাইতেও অদ্ভুত তোমাব অর্গানাইজেশন। এত বড় ভরসা তুমি ছাড়া আর কেইবা দিতে পাবত। এখানে আমি মাঝে তুমি আব ওদিকে পল। আব সকলে ঘুমিয়েছে'।

'কিন্তু তুমি তো নিশ্চিন্ত বিশ্রাম পেলে না'।

'তাই তো বলছিলুম পান্নাকে। গোপালন ওয়ালটেয়াব থেকে দুঃখ কবে বলছিলেন আমাব জন্যে। তাঁকে বললুম আপনিও ঘুমোন। মাস্টার অপাবেটবেব হুকুম— জাগতে আমাকেই হবে'।

'কী বলেছে সে'?

'আমার বদলে তিনি জাগতে চান রাত্রি'।

'বললে কী'?

'বললুম, তাবারা যখন ঘুমোয় জেগে থাকে সূর্য, আব সূর্য যখন বিশ্রাম চায় তখন আলো দেবাব ভার চন্দ্রের— আকাশে অনেক বড় বড গ্রহ উপগ্রহ থাকলেও তোমার নামেব মানে সূর্য'।

'তোমার নাম লুনা হলে ভালো হতো'।

কলের দু-প্রান্তে দুজনে হাসল।

'এখন কি বাজাব বেহালা'?

'দাঁড়াও আগে দেখেনি তাবারা সবাই ঘুমিয়েছে কি না'।

কিছুক্ষণ সাড়াশব্দ নেই। এরা দুজনে মিলে কবছে কী? কালো গভীর ষড়যন্ত্রের মতো অস্পষ্টই ছায়া যেন। আবাব কলে সাড়া পাওয়া গেল।

'হ্যাঁ, মিহির, সবাই ঘুমিয়েছে। ডিব্রুগড, শিলং, ঢাকা, দার্জিলিং, বেনারস, বেবেলি, পেড্রোওনা, সব। ওয়ালটেয়ার বোম্বাই স্তব্ধ। মীবাটের মহম্মদ জান, রকসৌলের তেজবাহাদুর রাত বারোটার পর থেকে যেন নেশায় বেহুঁশ। গোটা ভাবতবর্ষের লাইনে এখন শুধু তুমি আর আমি। পলও ঘুমিয়েছে।

এক মুহূর্তে সমস্ত ছবিখানি নগ্নতার বীভৎসতা নিয়ে চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল। কী হবে? কী হবে? সমাজের হৃৎপিণ্ডের দিকে যে শিরাগুলি প্রবাহিত ঘুমের ঘোরে কি তা স্তব্ধ হয়ে আসছে না? শত সম্ভাব্য বিপদে মানুষ টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াবে কিন্তু কোনো সাড়া পাবে না। অথচ এ শ্রমিকের ধর্মঘট নয়। তার চাইতেও গভীরে গিয়ে সমাজের সভ্যতার ভিত্তিতে আঘাত করছে এদের চিন্তা।

ঝনঝন করে আবার কল বাজল।

'ইয়েস লুনা'?

'আমার একলা ভয় করছে, মিহির'। এথেল কথা বলছে কলকাতা থেকে।

'ভয় কী গো'?

'না, এমন করে তুমি সবাইকে একসঙ্গে ছুটি দিও না। অফিসের দারোয়ানটাও ঘুমিয়ে পড়েছে'।

'এসো গল্প করি। বেহালা আজ নাই বাজালাম। তোমার দেশের কথা বলো। তুমি দেশেও অপারেটর ছিলে তো'।

'সে কথা আর একদিন। কিন্তু খবর আছে একটা'।

'কী গো'?

'বিয়ের'।

'হ্যাঁ। বিয়ে তো। রাজেনদের। আসতে হবে কিন্তু ওদের বিয়েতে। দেখবার লোভ সামলাতে পারছিনে'।

'আমারও সেই দশা'। এথেল খিলখিল করে হাসল।

আবার বলল, 'মিহির'।

'কী'?

'পান্না বলে, তুমি নাকি দেখতে খুব সুন্দর'।

'ওটা অমন বলে'।

'বলে, তোমার চোখের দিকে নাকি চাওয়া যায় না।

'অমন নিন্দুক ও। আমাকে কবে দেখল'?

'আমার বিশ্বাস হয় না। মনে হয় তোমার দু'হাত নিজের হাতে নিলে তোমার চোখে চোখ রাখতে সাহস পাব'।

মিহির উত্তর দিল না।

এথেল বলল, 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব রাগ করবে না বলো'?

'কী এমন কথাটা'?

'আগে বলো রাগ করবে না'।

'বললুম'।

'পান্না বলে, না-থাক, শুনলে তুমি আমাকে নীচ ভাববে'।

'কখনও নয়। আমি হলপ করে বলতে পারি'।

'ওরা বলে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি। ওরা বলে তুমি নাকি বিয়ে করেছ, তোমার নাকি বউ আছে। চুপ করে আছ কেন? ওতে বুঝি আমার সন্দেহ হয় না। এইজন্যেই তো বলেছিলুম তুমি রাগ করবে'।

মিহির বলল, 'ওরা সত্যি কথাই বলেছে এথেল। কিন্তু এসব আজ তুমি কী বলছ ভাই? যুদ্ধ থামলে দেশে যাবে না। যুদ্ধের জন্যই তো তোমাকে এনেছে'।

'যাঃ, এ কখনও সত্যি? শুধু শুধু আমাকে ভয় দেখানো'।

এথেল ভয় ঢাকবার জন্যই হয়তো টেনে টেনে হেসে উঠল।

'তুমি আজ খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, এথেল। তুমি ঘুমোও'।

এথেল হো হো করে হেসে উঠল।

'কী হল এথেল'? মিহির ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করল।

তখন সেই যুদ্ধের সময়ে ভারতীয়রা তত এফিসিয়েন্ট নয় বলে, সাবোটাজ করতে পারে ভয়ে, ইংল্যান্ড থেকে টেলিফোন অপারেটরও এনে মাঝে মাঝে বসানো হতো।

কেউ সাড়া দিল না। অনেকক্ষণ কান পেতে রইলুম। হঠাৎ কলকাতার দিক থেকে কী যেন একটা ভারী জিনিস পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে গেল। তার একটা ভীষণ শব্দ শত শত মাইল পার হয়ে ভেসে এল।

টলতে টলতে যখন টেলিফোঁর ঘরে গিয়ে পৌঁছালুম তখন কলের দিকে পিছন ফিরে বসে মিহির বেহালা বাজাচ্ছে। আর তারই একটা ক্ষয়গ্রস্ত ছায়া যেন ঘরের হলুদে আলোয় ফুটে উঠেছে।

ধীরে ধীরে কলের কাছে গিয়ে বুঝলুম সমস্ত লাইনকে আবার প্রাণ দিতে হবে। কিন্তু রিসিভার তুলবামাত্র কানে এল, 'হ্যালো, মিহিরবাবু, এথেলের কী হল? ওরা অনেকে ডাকছে যে'।

বললুম, 'জানি না'।

ওপরের স্বরটা শাসিয়ে উঠল, 'কে? কে আপনি? কে? নিশ্চয় মিহিরদা নয়'।

আমার অপরিচিত গলা ওরা বুঝতে পেরেছে।

আর একটা কেন্দ্র থেকে ডাক এল— মিহির তখনও ঝুঁকে পড়ে বেহালা বাজাচ্ছে।

'হ্যালো আমি পেড্রাওনা থেকে বলছি। গিরিধারী। মিহিরবাবু, হ্যালো। কী হল মিস এথেলের? বিপদ শুনছি'।

একটা ভয় শিরশির করে গা বেয়ে উঠল।

ঢাকার আলো জ্বলে উঠল। 'মিহিরদা, মিহিরদা, আমি পান্না। কথা বলো। আছো? ওরা বলছে— ভয়ে ফোঁপাচ্ছে পান্না।

বললুম, 'জানি না'।

মিহির তখনও ঘাড় গুঁজে বেহালা বুকে চেপে বসে আছে। আর তার মাথার উপরে বাল্‌ব্‌টায় আলো যেন কাঁপছে।

এ গল্পটা বলতে বসে এখন মনে হচ্ছে : মানুষের সমাজ ব্যবস্থা যা, তাই-ই যতদিন, কাউকে কাউকে নাইট-ডিউটি করতেই হবে। কাজেই রাত্রি ঘুমানোর জন্যই তৈরি হয়েছিল, কিংবা নাই হোক, মিহিরের পরিকল্পনাটা অবাস্তব ছিল। যেন দূর থেকে ভেসে আসা কিছু। আর তার সঙ্গে এও মনে হচ্ছে (তা অবশ্য আমার নিজের যেটুকু টেলিফোঁর বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আছে তা থেকে) সেদিন সেই টেলিফোঁর ঘরে যা অনুভব করেছিলাম তাই মিহিরের পরিকল্পনার মতোই অবাস্তব।

যাক সে কথা, যা অনুভব করেছিলাম তাই বলি।

হঠাৎ ঝড়ের মতো শব্দ করে বোর্ডের সবগুলি ডালা একই সঙ্গে খুলে গেল। সবগুলি আলো বিদ্যুতের মতো দপ করে জ্বলে উঠে নিবে গেল। পাশের ঘরের ব্যাটারিগুলিতে কি আগুন লেগেছে? মনে হল আলোর বাল্‌বে গন্ধক পুড়ছে।

মনে হল লাইনে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। মনে হল একদল তারা ধূমকেতুর মতো দিগন্ত জ্বালিয়ে দিয়ে ছুটছে। একদল ক্রুদ্ধ দানব যেন জেগে উঠে তাদের মৃত্যু কবচ রক্ষা করার জন্য ছুটে আসছে।

মনে হচ্ছে মিহিরকে ডেকেছিলুম। এই মিহির, ইয়ারকি হচ্ছে? বেহালা রেখে সে উঠে দাঁড়াল। আমার তখন মনে হল সূর্য জেগে উঠেছে, আর ভয় নেই।

অসমাপ্ত

একটা জ্বালা বোধ হচ্ছে। অশেষ জানলা খুলে দিয়ে চেয়ার টেনে নিয়ে জানলার পাশেই বসল।

বাইরে তখন আর একটা দিন আসছে। এখনি শিশিরে কুয়াশায় স্নিগ্ধ পৃথিবীতে পাখি ডেকে উঠবে।

কাল রাতে কী হল, ঘুম হল না। হঠাৎ না চাইতে মায়ার আকৃতি মনের মাঝখানটায় সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে হাসল।

কথাটা আবার মনে আসতেই, অশেষ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে শরীর টান করে আলসেমি ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। সে দেখতে পেল জানলার ওপারে নতুন কৃষ্ণচূড়া গাছটায় আজ আর একটা ফুল ফুটেছে। আরও গোটা কয়েক কলি রাতারাতি বেশ বড়ো হয়েছে। গাছটার তলায় কয়েকটি শালিক আসর করেছিল। অবশেষে সাড়া পেয়ে যেন শেষ শালিকটি এদিক ওদিক চেয়ে পিঠটা একটু নীচু করে স্প্রিংয়ের মতো উড়ে গেল।

অশেষ সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোনে এসে দাঁড়াল। এটা এ বাড়ির বাইরের দিকের উঠোন। মস্ত চকমিলানো সেকালের বাড়ি। অনেক শরিকের অধিকারে। তাই নানা চেহারা নানা অংশের। অনেক ধরনের আর্থিক অবস্থার অনেকগুলি সংসার। বাইরের দিকের একতলায় দুখানা ঘরে অশেষ বাস করছে। হয়তো সেকালের গেস্টরুম।

বাইরের উঠোনটা কোনকালে বাগিচা ছিল হয়তো। এখন দু-একটি দুর্লভ গাছই আছে এখানে ওখানে। ত্বক খসে যাওয়া ইউক্যালিপটাস বোধ হয় তাদের মধ্যে প্রাচীন। কুটরাজ গাছটার তলায় প্রকাণ্ড ইঁদারা। কাঠের চাকা থেকে দড়ি ঝুলতো। কেন এটা এত বড় করে করা হয়েছিল? এ অংশটা এজমালি আছে।

এতক্ষণ অন্ধকার গাছের পাতায়, ডালের আড়ালে জমে ছিল। অশেষ দাঁড়াতে দাঁড়াতেই পাতাগুলো রঙে রেখায় পরিপূর্ণ, পরিচিত হয়ে দেখা দিল। পায়ের তলায় এক সার খুব ছোটো লাল পিঁপড়ে উঠোনের পূবদিকটা পর্যন্ত সার বেঁধে চলেছে। অশেষ সরে দাঁড়াল। একটা মিঠে হাওয়া বইছে। সে ভাবল এত বড় রাতটা কি করে কাটল, ঘুম হল না। আজও যদি এমন হয়? কোন চিন্তা আজ মাথায় ঢুকতে দেবে না—এই আশ্বাস দিল নিজেকে সে।

এরপরে সে কুটরাজ গাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়াল। একটা সাধারণ গাছ তবু ফুলের প্রাচুর্যে অবাক হয়ে যেতে হয়। এত ফুল রোজ ঝরে পড়ে, তবু ফুলের এই মরসুমে পাতা পর্যন্ত দেখা যায় না। ইঁদারার চারিদিকের চত্বরটা ফুলের গন্ধে ভরে আছে।

ইঁদারার কাছে এসে মনে হল তার, স্নান করে নিলে হয় এখানেই। সে ঘরে ফিরে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে যখন সে স্নানের জন্য এল তখন রোদ উঠেছে। কুটরাজ গাছটার ছায়া পড়েছে ইঁদারার চত্বরে। ঝপ্ ঝপ করে কয়েক বালতি জল ঢালল সে গায়ে। একটু তাড়াতাড়িই করতে হবে। বাড়ির ভিতর থেকে লোকজন আসতে সুরু করবে। পাড়ার মেয়েরা কখনও কখনও জল নিতে আসে। সঙ্কোচ বোধ করল সে। মেয়েরাই তার কারণ নয়। এদেশের সঙ্গে তার যেন কোথায় অমিল আছে। তাদের দৃষ্টি যেন তার পদক্ষেপে কানাকানি করবার মতো কিছু খুঁজে পায়।

ঘরে ফিরে প্রসাধন করল অশেষ। দেয়ালের বাইরে তত সকালের স্নানকে আড়াল করা গেল।

আকাশের বঙের সঙ্গে মনের রঙের সঙ্গে, একটু চেষ্টা করে, জামার রঙটাও যদি মিলিয়ে নেওয়া যায়?

নীলে সবুজের আভাস দেয়া একটা পাঞ্জাবী পছন্দ করল সে। বকুলের মতো গন্ধের সেন্ট ব্যবহার করল।

এবার, সে ভাবল, একটু ঘুরে আসবে। ঘর থেকে বেরুবার সময়ে সে একটু সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল। কাল তার মনে হয়েছিল, তার অনুপস্থিতিতে কেউ বা তার ঘরে এসেছিল।

টেবিলের উপরে কাগজের প্যাড, কলম, ডায়েরি বই ছড়ানো আছে, ছড়ানো থাকে। গুছিয়ে বাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অগোছালো স্তূপ থেকে প্রয়োজন মতো টেনে বাব করে নেয় যখন যা দরকার। কিন্তু কাল যেন একটু গোছালো মনে হয়েছিল টেবিলটাকে। প্রতিমার ঝি হয়তো। অন্যেব গেস্টরুমে কে আর তালা দেয়?

তা হলেও ডায়েরিখাতাখানাকে সে বইএর আড়ালে সরিয়ে রাখল।

তাব বেরুনোর সময়ে বাঁ হাতের কাছে উপরে যাওয়ার সিঁড়িটা পডল। এই সিঁড়ি দিয়েই প্রতিমাদের ঘরগুলিতে উঠতে হয়। কিছুদিন আগে সিঁড়িতে রঙ দেয়া হয়েছে মনে হয়। রংটা সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নেমে এসেছে যদি মনে করা যায়, তা হলে ধরে নিতে হবে উপরেও বং ব্যবহাব কবা হযেছে।

প্রতিমাও ঘুম ভেঙে উঠে দেখল শ্রীপতি নেই পাশে। একটু লজ্জা বোধ করল সে। বেচারা বোজ নিজের হাতে চা কবে খায়। কিন্তু বোজ লজ্জা হয না—ভালোও লাগে শ্রীপতি যখন চায়ের পেযালা হাতে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকে—এই যে চাটা খেয়ে নাও, জুড়িয়ে গেল। কিন্তু একজনের যদি একটু বেশি ঘুমুতে ভালো লাগে? এটা বুঝে একটু সকাল সকাল ঘুমুতে দিলেই তো হয়। সারা দিনের কথা বলাব ইচ্ছা রাত্রির কযেক ঘণ্টায় মিটিযে নিতে হয বলবে? কিন্তু তাতে প্রতিমার কী দোষ? সে তো সারাদিন বসেই থাকে, নয় পুরনো মাসিকপত্রেব বিজ্ঞাপন পড়ে বসে বসে।

প্রতিমা কপাল থেকে চুলগুলি পিছনে সরিয়ে আঙ্গুলগুলি বাঁকা করে করে খোঁপা বাঁধল।

শ্রীপতি মুখ হাত ধুয়ে ফিরেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ানোর ভান করে প্রতিমার প্রতিবিম্বিত হাত দুখানির দিকে চেয়ে ছিল।

প্রতিমা উঠে বসেছিল, শুয়ে পড়ে গায়ে চাদর টেনে দিয়ে বলল— দাও বলছি।

শ্রীপতি আকাশ থেকে পড়বার অভিনয় করল।

প্রতিমা বলল, 'আহা-হা, জানে না কিছু!'

'তা হারিয়ে যখন গেছে গায়ে চাদর জড়িয়ে উঠে খুঁজে নাও না?'

'ইস্, কখ্খনো না। আমি শুয়ে থাকবো। ওরা আসুক খোঁজ কবতে, দেখো তখন।'

'আচ্ছা, স্টোভটা ধরিয়ে চা করে নিয়ে আসি। খুঁজে দিচ্ছি তারপর।'

অগত্যা প্রতিমাকে গায়ে কাপড় জড়িয়ে নামতে হল বিছানা থেকে।

কাল রাত্রিতে স্নিগ্ধ আনন্দে যে কাহিনী শেষ হয়েছিল প্রভাতের তরল হাসিতে তার পুনরভিনয সুরু হল।

মাটির পথ। অল্প-পরিসর। মাটিটা কালো, স্নিগ্ধ, খালি পায়ে হাঁটতে ইচ্ছা করে।

কিছুদূর গিয়ে খানিকটা খোলা জায়গার মাঝখানে থানা। থানার বড় দরজার সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময়ে অশেষ চোখ তুলল। সুনীল দারোগা ছিল বারান্দায় ; হাত তুলে নমস্কার করল সে। নীরবে প্রতিনমস্কার করে অবশেষে ছাতিম গাছগুলির তলা দিয়ে নেমে গেল। পথটা এখানে ঢালু। এটুকু

নেমে সামনের মাঠটুকু পার হলেই তার অফিস—এখানে সে সাবরেজিস্ট্রার।

অফিস ঘরটা টিনের আটচালা, চুনকাম কবা মাটিব দেয়াল। একটা কম্পাউণ্ড আছে চারিদিকে। জিওল গাছেব চারা আর বাঁশের বাখারি দিয়ে বাগানের আকারে খানিকটা তার ঘেরা হয়েছে।

ঠিক দুপুরে দু-এক ঘণ্টা কাজ থাকে না। কলমটা দোযাতেব গায়ে বেখে অশেষ তখন বেরিয়ে আসে। একটা প্রাচীন বিলেতি গাব গাছ আছে তার তলায় দাঁড়ায় সে। পাখা টানা ছোকরাটা ছাতি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। যতদূব দেখা যায় লোকজন থাকে না পথে। ধূসর দুপুরের পথ যথেচ্ছভাবে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে। ছোকবাটি কী ভাবে কে জানে। বাজার শেষ করে দু-একজন গোয়ালা-জেলে পাশেব পথ দিয়ে যাওয়ার সমযে কথা থামিয়ে পার হয়ে যায়। এরা কি বুঝেছ নতুন এই সাবরেজিস্ট্রাব মশাইটি কথা ভালবাসেন না? হযতো এদের কোলাহলে কোনদিন অশেষ চোখ তুলে চেয়েছিল, হয়তো বিরক্তি ছিল তাতে, কিম্বা তার চাইতেও বেশি ছিল মিনতি। কিম্বা নীরবে উপভোগ করার মতো অভিনব বোধ হয তাদেব কাছে এই দৃশ্যটি।

বাগানেব পাশে গিয়ে দাঁড়াল অশেষ।

ডাইনে বাঁযে গ্রামের আঁকাবাঁকা পথ। সেগুলির বৈশিষ্ট্য এই তাবা যেন ছোট ছোট চড়াই উৎরাই দিয়ে বয়ে গিয়েছে।'সেগুলির এদিক ওদিকে টিলার মতো উঁচু উঁচু জমি চোখে পড়ে। বোধ হয ভূমিক্ষয়ের ফলে কোন এক সময়ে এই সমতল দেশের এমন গঠন হয়ে থাকবে। বাঁ ধারে কিছুদূরে ডাকবাংলোর লোনাধবা লাল ইঁটের বাড়ি। তার একপাশে কালো রঙের লোহাব সাঁকো। ডানদিকে একটা টিলা। তার উপরে হাল্কা সবুজের ঘাসবনেব মধ্যে একটি বাঁশঝোপ। বাঁশগুলোর রং হলুদ। আকাশ দেখা যায় বাঁশগুলোর পাশ দিযেই, তাব রং নীল।

গ্রামেব দৃশ্য। কিন্তু ডাকবাংলোটার দিকে চাইলে একটা নতুন কিছু চোখে পড়ে স্কাইলাইনে। দুটি সরল রেখা যেন টানা হযেছে নীলেব গাযে। ইলেক্‌ট্রিকের তার। গ্রামটা শহব হযে উঠছে তারই চিহ্ন। আগেও নাকি শহব ছিল এই গ্রাম। তার একটি প্রমাণ এখনও আছে। থানাব হাতার মধ্যে অশ্বত্থ গাছটার নিচে বেলেপাথবের ফলকযুক্ত একটি সমাধি। কোন এক গোমেসেব সমাধি, সে নাকি মুন্‌সেপ ছিল। তাবপর গ্রাম হয়ে যায় আবার। ভূমিক্ষয়ের সঙ্গে যোগ আছে নাকি ব্যাপারটার। কিন্তু এবার শহব এগিয়ে আসছে আরও শক্ত পায়ে ইলেক্‌ট্রিকের তারে। আর তাকে যারা এগিয়ে আনছে তাদের মধ্যে শ্রীপতিও একজন। সেই কনট্রাক্টর। নতুন কবে মুন্‌সেপি আদালতও বসতে পারে। অফিসের দিকে তাকালো অশেষ। কথাটা তাব মনে পড়ল—টাকা রোজগার হয় ওখানে! উপরির কথাই। পক্ককেশ ক্লার্ক বলেছিল—মাসে যদি চার পাঁচশ' না হল এদিকে ওদিকে, হুজুর, আপনার মতো জ্ঞানীগুণী লোক এই অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকতে গেলেন কেন? তার মতোই বুড়ো ডিড্‌রাইটার হেঁ হেঁ করে হেসে সমর্থন করেছিল। হঠাৎ যেন বুকের মধ্যেই একটা ঝাঁকুনি লাগল। কিন্তু সেটাকে সামলে নিল সে। এর একটা স্বাদ আছে। নিষ্ঠাবান পরিবারের কোন ছেলেব হোটেলে বসে অখাদ্য খাওয়ার মতো। স্বাদটা বোধ হয় গোপনতার, পদস্খলনের। নিজেকে কলঙ্কিত করার। মুখের ভিতরেই সে যেন স্বাদটাকে অনুভব করল।

কিন্তু এরপরেই সে অনুভব করল—অফিসটা এই গ্রামে তোমার একমাত্র নিজস্ব হতে পারে। আজ কিন্তু রবিবার। আর তা ছাড়া সকালে প্রাতরাশের জন্য ওরা খুঁজবে। সেটা বিড়ম্বনা। একটা সঙ্কোচ বোধ করল সে।

শ্রীপতি কাজে বেরিয়ে গেল। বেশ দেখায় শ্রীপতিকে এই গ্যাবার্ডিন সুটে। স্নান সেরে নিয়ে প্রতিমা ঘরে আসতে আসতে দেখল। রাগ হয়েছে? রোজ তো তুমি এ সময়ে বাইরে যাও না। আচ্ছা বাপু কাল থেকে একটু পরেই যাবো স্নান করতে—প্রতিমা নিজের কাছেই কৈফিয়ৎ দিল।

বসবার ঘর থেকে শোবার ঘরে এল প্রতিমা। এ ঘরে সামান্য কাজই বাকি ছিল। পটু হাতে, চুড়ি বাজিয়ে, গুন্‌গুন্‌ করে গান করতে করতে প্রতিমা কাজ শেষ করে ফেলল। অনেকটা সময় হাতে আছে। সকালে ঘুম ভেঙে আজ যেন সে সময়ের আগে ছুটেছে।

প্রতিমা উচ্ছ্রিত জানু জোড়া করে তার উপরে প্যাড্‌ রেখে রেবাকে চিঠি লিখতে বসল : তোমাদের শ্রীপতিবাবু এখন কনট্রাক্টর। বই-এ যেমন পড়ো তেমন না হলে জমিদারই ছিলেন। মনিব হিসাবে বড্ড কড়া। সময় পাওয়াই দায় হয়ে উঠেছে। আশা করি খোকাখুকিকে নিয়ে ভালো আছো।

এখন বেলা আটটা থেকে ন'টার মধ্যে। শ্রীপতিবাবু কাজে গেলেন। অশেষও বাড়িতে নেই জানলাম। অশেষকে তুমি চেনো না। এবার এসে দেখছি। বছর পঁচিশ হবে। শহরের ছেলে। পোশাক সম্বন্ধে অতি পরিপাটি। কিন্তু বড্ড বেশি নির্বাক। লাজুক নয়, ইচ্ছা করেই কথা বলে না। এদের কাজিন, বোধ হয় তৃতীয় পর্যায়ের।

একটা মজা হয়েছে তাই ওর কথা বললাম। বোধ হয় ঝি ঘর ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। ওর লেখা একখানা চিঠি। কাকে লিখেছে বুঝি নি। পড়ে মনে হয়েছিল—ভদ্রলোক পৃথিবীর দিকে মুখ বাঁকা করেই আছেন। মনে হল পৃথিবী যেন আমার তোমার মতোই একটি মেয়ে— যাকে ভালোবাসতে পারতেন, যাকে নিয়ে সংসার করতেও পারতেন ; কী করেছে তাঁর জানি না, তাকে কৈফিয়ৎটা দেবারও সময় দেবেন না, এমন ভঙ্গি। তোর কৌতূহল খুব বেশি—তাই একটা খবর দিলাম।

আমার খবর? এতে তোর কী কবে আনন্দ হয় বুঝি না। বুঝিস না এ ওদের ছল! ধরতে না পেরে ভাবি, এই বুঝি আমাদের সার্থকতা। খেটেখুটে বড কবে দেবো আমবা। যাদের জিনিস একটু দাঁড়াতে পাবলেই ছুটে তাদের কাছে যাবে। ইনিয়ে বিনিয়ে কথা না ফুটতেই নালিশ কববে : বাবা, মা মেরেছে, বকেছে, চুমু খায় নি। তোর খোকা কতো বড হল জানাস।

চিঠিটা শেষ করল প্রতিমা। কিন্তু হাসি-হাসি মুখে কী ভাবল। পুনশ্চ দিয়ে লিখল : কারো ডায়েরি পড়া কি পাপ? মত জানালে পরে কারণ জানাব এই প্রশ্নের।

চিঠিটা শেষ করে এবার প্রতিমা উঠে দাঁড়াল। ভাঁজ করে খামে পুরে টেবিলের উপরে চাপা দিয়ে রাখল।

সত্যি লজ্জা করে। শ্রীপতির দিকে চাইতেও। প্রতিমা আয়নার সম্মুখে দাঁড়াল। এখনও কারো বুঝবার কথা নয়, কিন্তু ইতিমধ্যে যেন মুখে চোখে একটা ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চোখের পাতা দুটিতেও যেন পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

পিছন থেকে শ্রীপতি এসে বলল, 'লজ্জা কিসের। ওটাতো আর দোষের কিছু নয়? চেহারা একটু সুন্দর হলেই তা দেখতে হয়। নিজের চেহারা নিজে দেখা যায় না বলেই তো আয়না।'

প্রতিমা বলল, 'ভাগ্যে অফিস করতে হয় না, নতুবা চাকরি যেতো সাতবার।'

শ্রীপতি বলল, 'তা যেতো। কিন্তু কথাটা বলতে তোমাকে ফিরে এলাম। আজ রবিবার। বড়বিলে শিকারে গেলে কেমন হয়?'

'সে কি গো?'

'এঞ্জিনিয়ার এসেছে, সে থাকবে। আমি, তুমি, অশেষকেও নেয়া যেতে পারে। বুনো হাঁস নাকি অজস্র।'

'আমি যাবো শিকারে?'

'শিকার না হয়, একটা হলিডে ট্রিপ। প্রকাণ্ড একটা বজরা আছে। শীতের দুপুর থেকে সন্ধ্যা।'

'মাথাটা একেবারেই গেছে।' শ্রীপতিকে জীর্ণ করে দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে প্রতিমা একটু

যেন থামল, 'ঘুরে এসো, দুপুরে কথা হবে।'

দিন তিনেক আগে যে জন্মদিন চলে গেছে অশেষ ঘরে বসে তার কথাই ভাবছিল। অদ্ভুত জিনিস জন্মদিন। আর দশটা দিনের মতোই আটপহুরে এর আলো বাতাস, তবু একটা বিশেষ অনুভূতি এর আছেই।

সাড়া পেয়ে চা দিয়ে গিয়েছিল ঠাকুব। চা খেতে খেতে এই ভাবছিল অশেষ। টেবিলের উপরে ডায়েরিখাতাখানা পড়ে ছিল। সেটাকে টেনে নিল। তার কৌতূহল হল কয়েক বছর আগে অশেষ কী ভাবতো—তাই দেখতে। তারিখ খুঁজে পাতাটা পেতে দেরি হল না। আলোর দিকে ফিরিয়ে পাতাটা খুলে অবাক হল সে। অনেকদিন পব উষ্ণ হয়ে কথাটা মনে এল।

"কেন—এ প্রশ্ন কবো না, মায়া। এ ডায়েরির পাতা তোমার কাছে পৌঁছাবে না। নইলে সেদিন মুখে যা বলতে পারি নি, আজ তা শুনতে পেতে। বিয়ে করো। আমি অভিশাপও দেবো না, চিবকুমার ব্রতও অঙ্গীকার কববো না। শুধু আমার কষ্ট হয় এই ভেবে তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারলাম না। কী দরকার ছিল এই চিঠি লেখার?

মাঝে মাঝে আশ্চর্য বোধ হয় এই ভেবে—এতদিনের সাহচর্যেও কি তুমি জানতে পারো নি? হযতো তোমার দোষ নয়। কিন্তু আমাকে যে ভাবে পেয়েছিলে তাতে কি তুমি নিজেও সুখী হতে পারো নি? তুমি যা তা নিয়েই তো আমি সুখী হতে চেযেছিলাম। তোমার কল্পনা অনুযায়ী একটি অশেষ গড়ে নেয়ার সাধ হযেছিল তোমাব। তোমার কল্পনার অশেষের কাছে আমার মাথা করে দিলে নিচু। সমাজ?"

বাতাসে পাতা উল্টে গেল। অশেষ বাইরেব দিকে চেয়ে নিজের মনকে খুঁজতে লাগল। পরিবর্তন তবে হয়, তাকে অস্বীকাব করাও চলে না। কিন্তু মাত্র দুচার বছরেই এত বড় পবিবর্তন হল!

সে মেনে নিয়েছে। মেনে নিয়েছে পৃথিবীকে, মেনে নিয়েছে মাথা নিচু করে থাকা। তার যে অস্তিত্বকে গ্রহণ কবতে মায়াও দ্বিধা করেছিল, তা আজ আড়ালে পড়েছে। আড়ালটা দিয়েই পৃথিবীতে তার স্থান নির্ণয় হয়ে গেল। সে যা করেছে তার মুনাফা দিয়েই তার স্থান নির্বাচিত হয়েছে। সে যা করতে পারে, যেটুকু পারে নি?

মনে হল আবার জন্মদিনের হিসাব নিতে বসেছে। গত বছরের তারিখ খুঁজে এক বছরে কতটা পরিবর্তন হয়েছে দেখতে ইচ্ছা হল।

এ যেন সৃষ্টিনাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথমদিকের অস্পষ্টতাকে কাটিয়ে উঠে ভাষা কঠিন বস্তুকে রূপ দিতে সুরু করেছে। একটি দুটি তারা দানা বেঁধে উঠেছে। অশেষ পড়ল :

"বামনের পক্ষে চাঁদ ধরতে যাওয়াটা হাস্যকর কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। বামনকে আমরা উত্তুঙ্গ-আকাঙ্ক্ষী বলতে পারি কিন্তু তার সততায়, বিশ্বাসে, উদ্দেশ্যে সন্দেহ করা উচিত নয়। হাত বাড়ানোর সময়ে নিঃসন্দেহে সে বিশ্বাস করে চাঁদ তার নাগালের বাইরে নয়।

মানুষের অসম্ভব রকমের সুখী হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলেই সে অসম্ভবের পিছনে ছুটেছে। এই প্রেমিকতায় কিন্তু প্রেমাস্পদ অসম্ভব বস্তুটি লক্ষ্য নয়। উদ্দেশ্যকে অনুধাবনের চেষ্টায় দেহ ও মনের সবটুকু কর্মঠতা ক্ষয় হয়েছে, পরিক্লান্ত হয়ে পড়েছি—সেটাই বোধ করি তৃপ্তি।

ভাষাটা গম্ভীর হয়ে গেল ভাই, দোষ নিও না। কিন্তু প্রীতিনিলয়েষু যখন বলেছি, গোপন কথা বলতে বাধা নেই। আমি আর পারছি নে।

আমার দুঃখ এ নয় যে চব্বিশ ঘণ্টার অধিকাংশ সময় অর্থকরী কিছু করতে হয় আমাকে। মৃত্যুর পরে যশস্বী হওয়ার ট্রাজেডিও আমি মেনে নিতে রাজি আছি। দুঃখের কারণ, তোমরা বলছো, নইলে সমাজে তোমার স্থান নেই। আমি কৃতজ্ঞ হতে চাই, কিন্তু কেন তোমরা ধানের বদলে গান নিতে পারো না?"

এসব নিজেরই লেখা। তবু এ পড়ে সে এক বছরের পুরনো অশেষের জন্য সমবেদনা অনুভব করল। তার বেদনায় দুঃখিত হয়ে সে ভাবল—না জানি কত কষ্ট পেয়ে বেচারি এসব লিখেছিল।

একটা কৌতুক বোধ করে অশেষ সোজা হয়ে বসল। কলমটা তুলে নিয়ে ডায়েরি খুলে একটু ভাবল। এক টুকরো বাঁকা হাসি ঠোটের কোণায় কোণায় দেখা দিল। প্রথম ও দ্বিতীয়র পরে স্বভাবত আসে তৃতীয়। তৃতীয় অঙ্ক লিখতে বসল অশেষ। যা এবারের জন্মদিনের পাতায় লিখতে পারত।

"অত্যুচ্চ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে মায়া সরে গেছে। অতুল স্তম্ভিত। অসম্ভবকে আয়ত্বে আনার এই প্রয়াস থেকে সেও স্বাভাবিক বুদ্ধিতে সরে দাঁড়াবে।

অথচ কেন এই নিরন্তর যুদ্ধসজ্জা, কেন এই অবিরত আত্মপীড়ন? একটা ভালো গান গাওয়া, একটা ভালো গল্প বলতে পারা এই কি মানুষের চরম কাম্য?

এক সময়ে ভাবতুম আমার রচিত চরিত্রগুলোর মতো আমিও বড় হতে চাই। জনাথন সুইফটের মতো বলতে পারতুম যে হেতু আমার টাকা নেই, যে হেতু আমাকে অভিজাত বলে স্বীকার করা হয় না—একটা কিছুকে আমি অবলম্বন করেছি—সেটা হচ্ছে লেখা। ম্যাক্‌হিথের মতো যেন পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। ছ' ঘোড়ার গাড়ি থেমেছে রিভলবারের সামনে, লর্ডবিশপের আলখেল্লায় কাদা লাগল, আর্ল হাঁটু ভেঙে বসেছে, মাই লেডির ব্রকেড পেটিকোট কাদায় নষ্ট হল। কিন্তু খবর পাওয়া গেল যশের মন্দির থেকে যা আসবার কথা ছিল তা অন্য পথে গেছে। রাগে দুঃখে আকাশে রিভলবার ঝেড়ে সরে যেতে হবে। কিন্তু—"

'কী করছেন?' বলে প্রতিমা এসে দাঁড়াল, 'এ কি চা জুড়িয়ে গিয়েছে, খাবারগুলো ন্যাকড়া হয়ে গেল।'

ডায়েরি বন্ধ করে, কলম রেখে, হাসি-হাসি মুখে অশেষ মুখ তুলল। কিছু বলার না পেয়ে চায়ের কাপটা তুলে নিতে গেল।

বলল সে, 'ভাবছিলুম কারো সঙ্গে কথা বলি।'

প্রতিমা বলল, 'ও চা খাবেন না। সকালে কিছু না খেয়ে বেরিয়েছিলেন। চা আনাতে বলি বরং'

'এত বেলায়?'

'আজ রবিবার। তা ছাড়া রান্নার একটু দেরি হবে।' এই বলে প্রতিমা আবার চলে গেল।

অশেষ হাত চালিয়ে ডায়েরিটাকে শেষ করতে মন দিল। লিখল :

"কিন্তু এখন আর তা মনে হয় না। এখন ভাবছি কী হবে লিখে। ভালো কিছু করা? কিন্তু একদিন তো ভাষারই মৃত্যু হতে পারে! অপমৃত্যু নয়। পৃথিবীর বয়সের এখনও কিছু হয় নি। কত ভাষারই না স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটবে পৃথিবী যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়ার আগে। আজ থেকে দশ বছর আগে সে তুলনায় কী বলো? অথচ এই স্বল্প সময়ের পরেই কেউ কি জানতে পারবে কে ছিল অশেষ, কি ছিল তা সাধনা?

তার চাইতে ভালো একটা জীবন যাপন করা কি বড় কিছু নয়? এমনি বাঁচা, প্রতিমার মতো বাঁচবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে। যে মাটির সঙ্গে সহস্র-শিকড়ে নিজেকে জড়িয়ে রেখে সে পূর্ণ হয়ে উঠছিল, এই যে তাকে সেখান থেকে উপড়ে নিয়ে এসে অজানা অচেনা মাটিতে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, এখানেও তেমনি শিকড় বিস্তারের আয়োজন প্রতিমা করেছে। এমনি বাঁচবার আয়োজন করা।"

বাস্তবিক এতটুকু অপরিতৃপ্তি নেই প্রতিমার জীবনে। যৌবনের উচ্ছল আনন্দে ইতিমধ্যে যেন তৃপ্তির স্থৈর্য দেখা দিয়েছে।

প্রতিমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনের কথা মনে হল। ইতিপূর্বে সে তাকে দেখেছে। খাবার

ঘবে দু-একবার অনুবোধও শুনেছে। কিন্তু সেই যে প্রতিমা এ জানতো না! সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল প্রতিমা। শনিবারের দুপুরে ফিবেছিল অফিস থেকে অশেষ।

অশেষ বলল, 'আপনি—'।

'আমি প্রতিমা।'

নমস্কাবের জন্য হাত তুলে অশেষ বলল, 'নমস্কারটা জানানো হয়নি আপনাকে।'

প্রতিমাও হাত তুলে নমস্কার করল, বলল, 'আমারও সেই দশা।'

তাবপর একটু হেসে আবার সে বলল, 'একটা অপরাধ হয়ে গেছে যে।'

'অপবাধ?'

অশেষ লক্ষ্য করল প্রতিমার কনুই, চোয়াল, নাকের পাশটায় গ্রামের তৈলাক্ত গোলত্ব ভাবটা যেন নেই। একটু যেন জ্যামিতিক গড়ন তার। যেমন শহরে হয়।

প্রতিমা বলল, 'একটা কাগজের টুকবো হাতে পড়েছিল, পড়েছিলুম। ভেবেছিলুম গল্পের ছাঁট। চিঠি তা বুঝতে পাবি নি। আপনি কি গল্প লেখেন?'

অশেষ বিপন্ন বোধ কবেছিল। অবসর সময়ে নিজের নিরাবরণ মনের যে চিত্র সে আঁকে তার কথা মনে হল। তাতে কারো চোখ পড়লে সঙ্কোচের কারণ আছে।

সে বলল, 'পড়ে ভালো লাগে নি তো?'

প্রতিমা বলল, 'প্রথম আলাপেই অপরাধ স্বীকার কবলুম। গল্প হিসাবে কিন্তু বড্ড পক্ষপাতদুষ্ট।'

প্রতিমা সিঁড়ি ধরে উঠে গেল।

অশেষ অনুভব করেছিল প্রতিমার স্বকীয়তাই তার বৈশিষ্ট্য। তার এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল এই বিচিত্র জনতাবহুল গ্রামে যেখানে সে অন্তরীণতা অনুভব করছে সেখানে প্রতিমাতে যেন স্বজাতীয়ের মুখ দেখতে পেয়েছে।

প্রতিমা ফিরে এল কিছুক্ষণের মধ্যেই। প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই ঝি চায়ের উপকরণ দিয়ে গেল। অশেষ বলল, 'তৈরি ছিল নাকি?'

'চা না খেয়ে বেরিয়ে গেলেন এ চিন্তা ছিল।'

অশেষ চা করতে সুরু করল।

প্রতিমা বলল, 'একটা প্রস্তাব করতে পারি। শিকারে যাবেন?'

'শিকারে? আমি?'

'শ্রীপতিবাবু বলছিলেন। বড় বিলে অনেক বুনো হাঁস। দুপুরে বেরিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসা।'

প্রতিমা হাসি মুখে বলল, 'তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে যান, অনেক জিনিস গুছিয়ে নিতে হবে আমাকে।'

অশেষ বলল, 'কিন্তু আমাকে তৃতীয়পক্ষকে কী প্রয়োজন?'

প্রতিমা তেমনি সপ্রতিভভাবেই বলল, 'রসভঙ্গ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। সেখানে অন্য অনেক পক্ষ থাকবে।'

অশেষ ভাবল। বলল সে, 'না, সে আমি পারি না।'

প্রতিমা যেন একটু অবাকই হল। কোন ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করা দূরের কথা অনুরোধও করা হয় নি। একটা প্রস্তাব মাত্র। এ অবস্থায় সাধারণত একটা সাধারণ কথায় নিজের অসম্মতি জানানো যায়। কারো কারো বোধহয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত দৃঢ়তা দেখানোর দুর্বলতা থাকে।

কিন্তু তখনই প্রতিমা বলল, 'এবার কিন্তু চা জুড়িয়ে ফেলবেন না।'

এই বলে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে তুলে সে চলে গেল।

প্রতিমা চলে গেলে অশেষ ভাবল। তার মনে হল এইমাত্র সে আর একবার ভুল করল। নিজের

কণ্ঠস্বরের নীরসতা নিজের কানেও লেগেছে। অথচ এটা তার কল্পনাতেও ছিল না যে প্রতিমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলবে সে।

প্রতিমা এসেছিল এটাই ভাবো। তুলনা দিতে হলে বলা যায় সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ার মতো ব্যাপার। নতুবা কেন এল সে এ প্রশ্ন তুলে এরকম অনেক আনুষঙ্গিক প্রশ্ন তোলা যায় তার চারিদিকে যে মনে হবে শেষ পর্যন্ত প্রতিমার আসাব পিছনে কোন যুক্তি ছিল না। যুক্তিও নয়, উদ্দেশ্যও নয়। নিছক ছড়িয়ে পড়া।

সেদিন সন্ধ্যায় ব'সে অশেষ বন্ধুকে চিঠি লিখল

এ বাড়িতে একজন আছেন প্রতিমা। কিন্তু তাঁব কথা তোমাকে বলবার আগে—এ বাড়িতে আমি কি করে এলাম তা বলতে হবে। আমার কোয়ার্টার্স বাসযোগ্য কবার চেষ্টা হচ্ছে। ততদিন থাকবার মতো একটা জায়গা খুঁজছিলাম। এঁরা বললেন, ততদিন এখানেই থাকুন। থেকে গিয়েছি। দূর থেকে শুনেছিলাম নষ্টধন জমিদার। এখন যাঁরা এ বাড়িব উত্তরাধিকারী তাঁদেব অনেকেই আমার আত্মীয়। অনেক শরিকের বাড়ি, তাঁদের মধ্যে আত্মীয়তাব পর্যায়ে কে আমার নিকটতব এ খোঁজ করা নিরর্থক। শ্রীপতিবাবুর সঙ্গেই প্রথম আলাপ কাজেই তাঁর অংশেই একতলার দুখানা ঘব নিয়ে আছি। অবশ্য তার একখানা ঘরে মাসে একবার শ্রীপতিবাবু এসে বসেন, তাঁর কাছে যখন বাইরের লোক আসে হিসাবপত্রের কথা বলতে। নতুবা সে বৈঠকখানাটিও আমারই ব্যবহারের জন্য খোলা রাখা হয়। ভাড়ার কথা তোলা দূরে থাক—আহাবেব ব্যবস্থাও এঁবাই কবেছেন।

প্রতিমার কথা বলছিলাম। এদেশে বোধ হয় আমাবই মতো প্রবাসী। আমার হোস্টেস্। শ্রীপতিবাবুর স্ত্রী। রুচির দিক দিয়ে আধুনিকা। আমি ঘরে বসে দেখলাম স্বামীব পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বেড়াতে গেলেন। গাম্ভীর্য ছিল মুখে কিন্তু চোখ দুটি খুশিতে চকচক কবছিল। ওঁবা শিকাবে গিয়েছেন। এখনো ফেরেন নি। কৌতুকের এই, আমাকে সঙ্গে যেতে ডেকেছিলেন আমি যেতে পারি নি। বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে শ্রীপতিবাবু আমাকে অনুরোধ করে গেলেন, ঝি-ঠাকুব দুজনে বিকেলের জলখাবারের ব্যবস্থা করবে—ত্রুটি হতে পারে, কিছু যেন মনে না কবি।

কেন একথাগুলি লিখতে ইচ্ছা হল তা মনে করতে পারছি না। তোমার অনুযোগের মর্ম এবার আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমার এমন ভুল ধারণা হল কেন আমি সিনিক? যদি বিশ্বাস কর তবে বলবো আমিও তোমাদেব মতো সঙ্গ-পিপাসু। হাতড়ে ফিরছি। যাচ্ঞা করছি সঙ্গী। পাইনে বলে ব্যথা পেয়েছি। কিন্তু আমি যে সঙ্গী পাই না সে কি আমারই দোষ?

মায়ার সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত পরিচয় হয়েছে, এটা জানলাম। সে আমার জন্য দুঃখ বোধ করে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কি করি বলো এই যদি আমাদের ভাগ্য হয়ে থাকে। এক সময়ে এই দুঃখ হতো চিনবার অনেক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মায়া আমাকে চিনতে পাবে নি। এই আত্মম্ভরিতার কথাগুলি মনে হলে এখন হাসিই পায়। আমরা কেউ কাউকে চিনতে পারি না। চিনবার চেষ্টাও কি করি? যা শুনে বলি চেনা হল, সেটা কথা, ভাবের বাহন হিসাবে তা অত্যন্ত অবিশ্বাসী।

কিন্তু এত ভারী ভারী কথা বলে লাভ নেই। যে ব্যবধানকে মেনে নিতেই হবে তার গায়ে মাথা খুঁড়ে কি লাভ?

যাক সে কথা, ছুটি পেলেই যাবো তোমাদের কাছে। তোমরা যা পেয়ে সুখী হয়েছো, আমি তাতে সুখী হতে পারি না এ দোষ আমাদের কারো নয়।

পায়ের শব্দে অশেষ চোখ তুলল। কনট্রাক্টরের কুলিরা হ্যাজাক বয়ে নিয়ে আসছে। সেই হ্যাজাকের আলোয় শ্রীপতিকে দেখা গেল। তার পাশে প্রতিমা। ঝক্‌ঝক্ করছে খুশিতে ক্লান্তি সত্ত্বেও। পিছনে আর একজন কুলির হাতে নিজেদের রক্তে অস্বাভাবিকভাবে ডানা রঙানো নিঃসাড় কতগুলি

হাঁস। কুলিরা বারান্দার কাছে এসে থামল। ওরা বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল।

অশেষ টেবিলের দিকে চোখ দিয়ে বন্ধুর চিঠিটা শেষ করল।

বন্ধুকে চিঠি লেখা শেষ করে মায়ার চিঠির কথাও অশেষের মনে হল। এবারের জন্মদিনে মায়ার চিঠিও সে পেয়েছে। এটা মায়ার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য—এই জন্মদিনকে মনে রাখা, যথা সময়ে চিঠি লেখা যাতে জন্মদিনে তা হাতে এসে পৌঁছায়। চিঠিটা পড়ল আবার অশেষ। অতুলের চিঠির খবর আর মায়ার চিঠির ঠিকানা মিলিয়ে পড়লে মনে হয় মধ্যপ্রদেশের কোন এক শহরে সে মিশনারিদের কলেজে অধ্যাপিকা হিসাবে যোগ দিয়েছে। জায়গাটা নাকি স্বাস্থ্যকর।

কিন্তু মায়া অধ্যাপিকা হতে গেল কেন? মানুষ কি নিজের জীবনে কাল্পনিক লোকগুলিকে অনুসরণ করে?

কিন্তু আজ মাথায় কিছু আসবে না। লিখবার মতো সুন্দর পরিপূর্ণ কোন কথা। অশেষ আর একটা সিগারেট ধরিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। গাছের মাথার উপরে চাঁদ। বৃষ্টি হবে নাকি? শ্রাবণের চাঁদের মতো দেখাল যেন।

সিগারেট নিঃশেষ করে অশেষ কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে চেয়ে চেয়ে কি ভাবল। তারপর কাউকে উদ্দেশ না করেই সে লিখল

"আরও কিছুদিন কাজ করবো আমি—আমার অর্থহীন কাজগুলি। জীবনের একাংশ পার হয়ে এসেছি। চুলে পাক ধরবে যেদিন, যেদিন ত্বকে স্পর্শ-বিহ্বলতা থাকবে না, সেদিনও তো খুব দূরে নয়, তখনকার কাজ তখন করবো। আজকের অনুভূতিগুলিকে ধরে রাখার জন্য একটু বেশি শ্রম করতে হচ্ছে

মায়ার চিঠিটা আবার পড়ে আজ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছি। মধ্যপ্রদেশের সেই শহরটিতে কেন আমাকে যেতে হবে? এমন হল কেন মায়া? নিজেকে প্রতিফলিত করে চারিদিকের স্বাভাবিক আলোকে এমন ছায়াময় করে তুলেছে যেন দৃষ্টির ইন্দ্রিয়টিও অনুভব হারিয়ে ফেলবে।"

এ পর্যন্ত লিখে অশেষ লাইনটা কেটে দিল। তার মুখে হাসিই দেখা দিল বরং। এটা তো ঠিক মায়ার মতোই হয়েছে, অনেক গম্ভীর মুহূর্তকে লঘু করার জন্য সে এমন কথা বলতো যা শুনে মনে হবে মেয়েটি প্রথম শ্রেণীর বোকা। তুমি এটা অনুভব করে হেসে ওঠো। তখন স্নায়ু জুড়িয়ে আসা সেই স্নিগ্ধতায় বুঝবে বোকার মতো বলা কথাটি এমন প্রস্তাব যা থেকে এই হাসাহাসির পর আর ফেরা যায় না।

অশেষ লিখল আবার

"আর কিছুদিন পরে, মায়া, নিজেকে আমি তুলনা দেবো খাঁচায় ভরা হিরেমোন পাখির সঙ্গে। সে দেখে খাঁচায় বসে চারিদিকে তার কত লোক, কত ভিড়, কত আয়োজন। কেউ চায় তার গান শুনতে, কেউ দেখে তার গঠন। হিরেমোন শুধু ঝিমোয় দাঁড়ে বসে। নয় এ পাশ থেকে ও পাশে যায়। মাঝে মাঝে তার একা বোধ হয় বোধ করি।"

রবিবারের তিন চারদিন পরে আর একটা ছুটির দিন পড়েছিল।

অশেষ সকালে উঠেই দিনটা কি করে কাটানো যায় তা ঠিক করে নিল। এক সময়ে একখানা বই কিনেছিল সে—কিছুতেই তা পড়া হয়ে উঠছে না। ভালো লাগার মুডটা কিছুদিন থেকে আসছে না। দেখা যাক সুর করে দিয়ে মুডটা ফেরে কি না। দ্বিতীয়ত একটা প্রবন্ধ লিখবে সে।

আজকের আবহাওয়াটায় কিছু বিশিষ্টতা আছে। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল এইমাত্র। ইউক্যালিপটাস গাছের নিচে একটা গাঢ় বাদামি রঙের গোরু বাঁধা আছে। তার গা থেকে ধোঁয়া উঠছে। ইউক্যালিপটাসের গা থেকেও। আকস্মিক বৃষ্টির ঠিক পরেই কড়া রোদ লেগে এমন হচ্ছে।

বাড়ির ভিতর থেকে হঠাৎ একদল ছেলেপুলে এসে তাদের চেঁচামেচি ছুটোছুটিতে বাইরের উঠোনটা ভরে ফেলল। প্রথম দিকে একটু বিরক্ত হয়ে পরে হার স্বীকার করে নিল অশেষ। তাদের উচ্ছ্বাসের কারণটাও বুঝতে পারল সে। ইউক্যালিপটাস গাছটার মাথার উপর দিয়েই দেখা গেল। রামধনু উঠেছে। সে জানলার পর্দাটা একটু একপাশে সরিয়ে দিল।

এমন সময়ে উপর থেকে প্রতিমা নামল। তার সঙ্গে একটি হাফপ্যান্ট পরা কিশোর। গায়ে গেঞ্জি কিন্তু পায়ে জুতো। গ্রামের পক্ষে পোশাকটা একটু অসাধারণ বলতেই হবে। পরিচ্ছন্ন থাকতে অভ্যস্ত এমন কোন পরিবারের ছেলে।

প্রতিমা বলল, 'হৈমন্তীদিকে সব বলবি, আচ্ছা? মিটিংটা এখানেও হতে পাবে। তবে আজ দুপুরে একবার আসা চাই।'

ছেলেটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল। প্রতিমা গলা একটু উঁচু করে বলল, 'আর বলিস শ্রীপতিবাবু দুদিন পরে ফিরবেন। ফাণ্ডের কথা তখন হবে।'

ছেলেটি ইউক্যালিপটাস গাছের মাথার উপরে লক্ষ্য করতে করতে চলে গেল। প্রতিমাও দু-এক মুহূর্ত আকাশের দিকে চেয়ে রইল, তারপরে ফিরল উপরে যাওয়ার জন্যই। কিন্তু অশেষ বাইবের দিকে তাকিয়ে ছিল, কাজেই মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

প্রতিমা বলল 'রামধনু—'

'হ্যাঁ, ছেলেদের গোলমালে—'

প্রতিমা বলল 'ছুটিতো আজ? বেশ আবহাওয়াটা হয়েছে, তাই নয়? একটু চা—'

অশেষ কিছু বলার আগেই প্রতিমা তার ঝিকে দেখতে পেয়ে উঁচু গলায় ডেকে বলল চা দিতে।

এই দ্বিতীয় বার অশেষ প্রতিমাব উঁচু গলা শুনল। তার মনে হল সাধারণত যে সুরে প্রতিমা কথা বলে—এই উঁচুগ্রামের সুরটা যেন তার তুলনায় করুণতর।

প্রতিমাই বলল, 'আসুক চা, বসি আপনার ঘরেই।'

এই বলে সে ঘরে ঢুকল পর্দা সরিয়ে। একটা ডেক চেয়ার ছিল, তার উপরে বসল সে। তাব হাতের চুড়িগুলো রিনঠিন্ করে বেজে উঠল। সকালের স্নানের আগেকাব রুক্ষ চুল দু এক গাছা তার কপালে। আর তার তলায় কানের পাশে একটুখানি লাল আভা দেখা দিল।

কী বলবে তা অশেষ খুঁজে পেল না। সে কোলের উপবে মেলে রাখা বইখানি টেবিলের উপরে রাখল। প্রতিমার চোখ পড়ল টেবিলে। কমলা রঙের খদ্দর দিয়ে বাঁধানো মোটা খাতাখানার একটা পাশ দেখা যাচ্ছে। একটা হাসি ফুটল তার মুখে। কাল রেবাকে একটা চিঠি দিয়েছে সে। তাতে লিখেছে—চুরি করে কারো ডায়েরি পড়াকে তুমি অন্যায় বলেছো। এ বক্তব্যকে আমি সমর্থন করতে পারি। কিন্তু তার যে একটা আনন্দ আছে তা তুমি বোধ জানো না। আর এ পৃথিবীতে আনন্দ এত কম যে সুযোগ এলে উপেক্ষা করা উচিত নয়।

প্রতিমার মুখে হাসি ফুটে ছিল। তার ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক হয়ে কয়েকটি ধবধবে সাদা দাঁতের সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছে। অশেষ লক্ষ্য করল একটি দাঁতের গড়ন যেন ডালিমেব দানার মতো। আর তার ফলে দুঃসহ সুন্দর দেখায় প্রতিমাকে।

প্রতিমা বলল, 'আপনার টেবলটায় বইখাতা আঁটছে না। একটা র‍্যাক হলে সুবিধা হয়।'

'না, তার এমন কি দরকার। গুছিয়ে নিলেই এঁটে যায়।'

'ঝি ঘর ঝাঁট দেয়। টেবলে হাত দিতে সাহস পায় না।'

'সে এমন কিছু নয়, আমি গুছিয়ে রাখবো।' অশেষ বিব্রত বোধ করল।

কোলের উপরে রাখা নিজের হাত দু'খানার দিকে চেয়ে চেয়ে কি ভাবলে প্রতিমা। বোধ হয় মনে মনে কথাটা গুছিয়ে নিল। বলল, 'আপনি বই লেখেন—'

'কই—সে এমন—তা'

'অস্বীকার করতে পারলেন না। হৈমন্তীদিকে আমি তা হলে ঠিকই বলেছি। আচ্ছা লেখকদের ডায়েরি আর তাদের জর্নালে কি তফাৎ থাকে?'

অশেষ আবার বিব্রত বোধ করল।

প্রতিমা বলল, 'থাকে বোধ হয়। জর্নাল বোধ হয় ডায়েরির ফেয়ার কপি।'

'তা হতে পারে। কিন্তু এ কথাগুলো কেন আপনার মনে হচ্ছে?'

প্রতিমা একটু উঁচু গলায় বলল 'বাহ্‌, এ একটা আলোচনার বিষয় হতে পারে না?'

আর এই উঁচু গলার স্বর আবার ভালো লাগলো অশেষের।

সে বলল, 'ছেলেমেয়েরা কিন্তু এখনও রামধনুটাকে দেখছে। গোরুটার গা থেকে এখন আর ধোঁয়া উঠছে না। রোদটা বেশ চক চক করছে দেখুন।'

প্রতিমা বলল, 'ছুটির দিনের এই সময়টাই সব চাইতে ভালো—এই নটা থেকে দশটা। এই সময়েই তফাৎটা বেশি চোখে পড়ে বলেই হয়তো।'

'হ্যাঁ ছুটির মেজাজটা ধরা পড়ে। আপনার কিন্তু সুবিধা আছে।'

'রোজই ছুটির মেজাজ বলছেন?'

'তা হয় না, না? হঠাৎ-এর ভাবটাও থাকা চাই বোধ হয়।'

চা এল। অশেষের পেয়ালায় চা ঢেলে দিয়ে, নিজের জন্যও এক পেয়ালা করে নিল প্রতিমা।

সে বলল, 'চা-টা ভালো হয়েছে কিন্তু, দেখুন।'

'আপনার চা রোজই ভালো হয়। তা হলেও আজ এখন ভালো লাগছে।'

প্রতিমা বলল, 'ছেলেরা গাব্দু খুঁড়ছে দেখুন। বোধ হয় খানিকক্ষণ খেলবে ওরা।'

অশেষ বলল, 'আমরাও যে আলোচনা করছিলাম তা চালিয়ে যেতে পারি।'

প্রতিমা হাসল, বলল, 'আমি কি তা পারবো? কোন কোন লেখকের জর্নাল ছাপা হচ্ছে আজকাল, তাই মনে হল।'

'তা নয়। ছুটির মেজাজের কথা—'

'এর সঙ্গে মিলবে কি না জানি না। আমরা একটা ক্লাব করছি। মহিলাদের ক্লাব। আজ তার মিটিং হবে দুপুরে।'

'নিছক মহিলাদেরই ক্লাব?'

'পুরুষদেরও মেম্বার করা যেতে পারে, এসোসিয়েট-মেম্বার। ওটা আমরাও ভেবেছি। টাকা পয়সার দিকে সুবিধা হবে।'

'আমি কিছু ডোনেশন দিতে পারি।'

প্রতিমা হেসে বলল, 'আগে রসিদ বই তৈরি করাই।'

অশেষের মনে পড়ল সে লিখেছিল গ্রাম্য আবহাওয়া থেকে প্রতিমা যতখানি পৃথক ততখানি যেন তাকে স্বদেশের মানুষ বলে মনে হয়।

চায়ের কাপটাকে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে উপভোগ করল অশেষ। পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে সে চেয়ারটাকে বরং প্রতিমার দিকেই একটু ঘুরিয়ে নিল।

প্রতিমা বলল, 'আপনি সিগারেট খেতে পারেন। আর একটু চা নেবেন?'

অশেষ কৃতার্থ বোধ করল। প্রতিমা এমন করে বলতে জানে!

সিগারেট ধরিয়ে অশেষ বলল, 'রামধনুকে ধন্যবাদ।'

'চায়ের জন্য?' কিন্তু প্রতিমার মুখে হাসির টোলের চারপাশে খানিকটা লাল আভা দেখা দিল আবার।

তার মন খুব তাড়াতাড়ি খোঁজ নিল—খুব দুঃসাহসের কিছু কি করেছে সে? দুঃসাহসের মতো শোনাবে বলেই তারপর সে বলল, 'আপনাকে আমরা আমাদের ক্লাবের মেম্বার করে নিচ্ছি।'

ঝি এল চায়ের বাসন নিতে। পটে চা ছিল অনেক।

প্রতিমা বলল, 'আর দরকার হবে না।'

ঝি চলে গেলে প্রতিমাও উঠে দাঁড়াল। ডেক চেয়ারের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়াল সে। অশেষ লক্ষ্য করল নখে রং নেই, কিন্তু পরিচ্ছন্ন নখগুলি বড় বড়, প্রয়োজন হলেই রং করা যেতে পাবে। আর তখন তার কৌতূহল হল জানতে প্রতিমা যখন বাইরে বেরোয় তখন চুলগুলিকে খোঁপায় বাঁধে কিম্বা জালে জড়িয়ে গুছিয়ে রাখে।

প্রতিমা বললে, 'চলি এখন।'

এই বলতে গিয়ে সে হাসল। আবার ডালিমের দানার মতো তার সেই দাঁতটি দেখা গেল দুর্নিবার সুন্দর হয়ে।

প্রতিমা চলে গেলে অশেষ ভাবল। ক্লাব করেছে প্রতিমা। তার মতো আরও চার পাঁচজন মহিলা কি আছে এই গ্রামে? সার্কেল অফিসর, পুলিশের ইনস্‌পেক্টর—বোধ হয় এঁদের স্ত্রীরা।

রবিবারের তিন চারদিনের মধ্যে যদি একটি ছুটির দিন থাকে তবে সেটা পার হতে না হতেই আর একটি ছুটির কথা মনে হয়—তা হচ্ছে আর একটি রবিবার।

এর আগের ছুটির দিনে প্রবন্ধটা শুরু হয়েছে। তারপরে দু তিনদিন সেটা নিয়ে বসাও হয়েছে। আজ সেটা শেষ হবে। শেষ করার আগে অশেষ সেটাকে আদ্যান্ত পড়ছিল। সকাল শেষ হয়ে গিয়েছে। যতদিন এখানে অশেষ থাকবে—এটা বোধ হয় ছুটির দিনেও দস্তুর হয়ে গেল বেলা নটার অবেলায় আর একবার চা এসে পৌঁছানো। তখন ঠাকুর এসেছিল চায়ের ট্রে নিয়ে। সে বলেছিল : মাংস এসেছে, কোর্মাই হবে তো।

অশেষ বলল, 'শ্রীপতিবাবু যা ভালোবাসেন।'

তখন ঠাকুর বিব্রত হয়েছিল। সে বলেছিল, 'বাবু আজ সকালে আবার সদরে গেলেন।'

অশেষ হাসল। বলল, 'তা হলে? খুব মুস্কিল হল তোমার?'

সে ভাবল প্রশ্নটা হয়তো প্রতিমার। এই ভেবে সে বলল, 'কোর্মাই বেশ ভালো, কি বলো?'

ঠাকুর চলে গেলে এই নিঃশব্দ আতিথেয়তা উপভোগ করল অশেষ।

প্রবন্ধটা পড়ল অশেষ। মোটামুটি ভালোই হয়েছে। ভালো একটা জীবনের দাম ভালো একটা উপন্যাসের চাইতে কম নয়—এ যেন সে প্রমাণ করতে পেরেছে। কিন্তু তা কবতে গিয়ে একটা বেদনার সুর লেগেছে রচনায়। ভালো জীবনের জন্য যে কলাজ্ঞানের প্রয়োগ দরকার তা অভিনয় কলাজ্ঞানের চাইতেও গভীর এবং সূক্ষ্ম, উপন্যাসের প্রয়োগশিল্পের চাইতেও সুষম এবং সংযত। তা সত্ত্বেও উপন্যাস টিকে যায়, অভিনয় কুশলতার কথা অভিনেতার মৃত্যুর পরেও কিছুদিন আমবা আলোচনা করি, কিন্তু ভালো জীবন? তার যদি কিছু রং থাকে, কিছু যদি অর্জন করে থাকে সে জীবন তবে হয়তো মনে রাখি। কিন্তু অর্জিত যা কিছু সে কি ওই ভালো জীবনের পদচিহ্ন মাত্র নয়।

প্যাডটা সরিয়ে রেখে অশেষ ভাবল : এই প্রতিমার কথাই ভাবো। কী-ই বা সে অর্জন করবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত! কিন্তু আশা হয় জীবনটা তার সুষমায় ভবে উঠবে। কিন্তু অর্জিতের নিশান দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না বলে কেউ কি সেই সুষমার সন্ধান নেবে? অথচ দেখো তার পক্ষে জীবনটা স্কুলের ছাত্রের মতো মাষ্টার মশাইদের নির্দেশে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবরদারির মধ্যে পাশ ফেল করার ছকে গাঁথা নয়। সামাজিক রীতিনীতি আদর্শ অনুজ্ঞার অস্পষ্ট পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী সে অভিনয়

করছে বলে মনে হয় না।

ঠিক এই সময়েই প্রতিমা এল।

অশেষ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন।'

সে ভাবল যার কথা ভাবছি ঠিক তখনই সে যদি আসে তবে কেমন যেন অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়।

প্রতিমার পোশাক বাইরে বেরুবার সজ্জার চাইতে কিছু কম, কিন্তু ঘরকান্নার কাপড়ের চাইতে বেশি। অশেষ চোখ মেলে চেয়ে রইল। চুলগুলিকে বিন্যস্ত করার কোন ভঙ্গি, কিম্বা সাড়ির রং—ঠিক বুঝতে পারলো না অশেষ, কিন্তু খুব পরিচিত মনে হল। মায়ার মতো দেখাচ্ছে নাকি প্রতিমাকে?

প্রতিমা বলল, 'আপনার লেখায় বাধা দিলাম।'

'ওটা শেষ হয়েছে। বসুন।'

বসল প্রতিমা।

অশেষ বলল, 'আমরা এখন কি নিয়ে আলোচনা করতে পারি?'

'বিষয় ঠিক করেই এসেছি।' বলল প্রতিমা, 'আজ আমাদের ক্লাবের প্রথম রবিবাসর।'

'তাই? বেশ ভালো খবর।'

'কথাটা কি করে উত্থাপন করা যায় বুঝতে পারছি না। সোজাসুজি বলাই ভালো।'

'বলুন তাই।'

'আপনাকে আমাদের রবিবাসরে থাকতে হবে আজ।'

'আমি? তাই বলছেন? আমি?'

'সেটাই সব চাইতে ভালো হবে। আজ আমরা যে আলোচনা করবো দেখবেন তাতে সাহিত্যের কথাও থাকবে।'

'আমি?'

'সেখানে আমরা চার পাঁচজন থাকবো। আর আপনি। হৈ-হৈ হবে না। প্রায় নিরিবিলি বলা যায়।' প্রতিমার মুখে স্নিগ্ধ একটা প্রত্যাশা ফুটে উঠল।

'কিন্তু আমি কি করে যাবো?'

'আর এমন কিছু দূরেও নয়। উপরে যে ঘরে বসে আমি সেলাই করি।'

'না সে আমার বড্ড বাধো বাধো লাগবে।'

'তা হলে এক কাজ করি। আপনার এ ঘরেই বসবো আমরা।'

অশেষ প্রতিমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

'তা হলে? নিশ্চয় আপনার মত পেলাম। পাবো আমি জানতাম। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা না করেই ওদের বলে দিয়েছি আপনি থাকবেন।'

'কিন্তু- না, না। সে হয় না। এ আপনি বলতে গেলেন কেন?'

'কী হল না?' প্রতিমার মুখখানি বিবর্ণ দেখাল।

'দেখুন। আলোচনায় যোগ দিতে আমি পারি না।'

অদ্ভুত হতাশ দেখাল প্রতিমাকে। তার মুখের দিকে চেয়ে মনে হল সে যেন অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে কোন ব্যর্থতার কাছে। যাদের হৃদয় সহজে উদ্দীপ্ত হয়, হতাশও কি তারা সহজেই হয়? কিম্বা হৃদয়ের অনুভূতি সূক্ষ্ম হলেই কি আঘাতও তারা সহজেই পায়!

এমন সময়ে সেদিনের সেই কিশোরটি এল। সে বোধ হয় প্রতিমার গলা শুনে থাকবে। অশেষের ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে বলল— হৈমন্তী মাসি পাঠিয়ে দিলেন।

তার হাতে সিলোফেনে মোড়া গুটি কয়েক গোলাপ। সে বলল—হৈমন্তী মাসি বললেন আপনি

দেখলেই বুঝতে পারবেন কেন।

প্রতিমার গালে যেন ফুলগুলির ছায়া পড়ল। সে বলল, 'উপরে আমার টেবলের ভাসে রেখে এসো।'

সে চলে গেল।

প্রতিমা বলল, 'আপনি যেতে পারবেন না বুঝতে পারছি।'

অশেষ বলল, 'আপনার মনে কষ্ট দেবার ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু আমি সত্যি যেতে পারি না।'

প্রতিমা উঠে দাঁড়াল, বলল, 'এ অবস্থায় আর কী-ই বা করার আছে।'

দরজা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে সে ফিরে দাঁড়াল। হাসতে চেষ্টা করল। বলল, 'চলি তা হলে।'

অশেষও উঠে এসেছিল। প্রতিমা চলে গেলে সে দরজার পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ফুলগুলোর কথা ভেবেই যেন তার মনে হল—কী লজ্জার ব্যাপারটা ঘটল।

আকাশে একটা চাঁদ উঠেছে। তৃতীয়ার মতো বাঁকা। খুব স্পষ্ট নয়, কারণ মাঝে মাঝে খুব দূরের মেঘ তার গায়ে লাগছে। কিন্তু আলো আছে। কুটরাজগাছটা সাদা ফুলে ভরে আছে সেই আলোয়। খোলা জানলা দিয়ে চোখের পাতায় আলো এসে পড়তেই যেন প্রতিমার ঘুম ভেঙে গেল।

এক এক সময়ে এমন হয়। চাঁদের আলোয় ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে থেকে ফুলের গন্ধ ভেসে এসে একটা অভাববোধকে জাগিয়ে তোলে। কী করে এ হয়, জানি না।

প্রতিমা বিছানায় উঠে বসল।

ওদিকে জানলার পাশে লাইম গাছটায় অনেক ফুল এসেছে। সারাদিন মৌমাছি আর কাঠপিঁপড়ে গাছটাকে ছেয়ে রাখে। গভীর রাত্রিতে মৌমাছিরা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

প্রতিমা উঠে গিয়ে জলার গরাদে মাথা রেখে দাঁড়াল। এতক্ষণে তার মনে হল আজ সন্ধ্যাবেলাতেই খুব মাথা ধরেছিল। বাইরের বাতাস কপালে লাগল ভালো বোধ হতো।

পৃথিবীতে সবাই ঘুমিয়ে পডেছে। রোগী ছাড়া আর বোধ হয় কেউ জেগে নেই। বাইরের চাঁদের আলোটা যেন নিঃসঙ্গতায় ছমছম করছে। চাঁদের আলো হলুদে হয়, এ যেন তা নয়।

কোথা দিয়ে যে কী ভাবনা এসে পড়ে কে বলতে পারে? হঠাৎ প্রতিমার মনে হল বহুদিন সে বাড়ি ছাড়া। মা, ভাই, ছোট বোনটি, নিজের পড়বার সে ছোট টেবলটি—কিছুই যেন তার কাছে নেই। মা ঘুমিয়ে পড়েছেন, বোনটিও বোধ হয় এতক্ষণে ক্লান্ত হয়েছে, বই রেখে সেও হয়তো ঘুমিয়ে পড়ল। ছোট ভাই অজয়। কতটুকু ছেলে সে, তবু চালচলন গলার স্বরটা পর্যন্ত কত গম্ভীর। মা বলেন—বাবার মতো নাকি ওর গলা শোনায়।

প্রতিমা ভাবল—বাবা কত দুঃখ পেয়ে গিয়েছেন, সমস্ত জীবনে একটি দিন বিশ্রাম নেওয়া হয়নি। মৃত্যুর পরে যদি কোন স্বর্গ থাকে, ওরা কি বুঝবে তিনি কত ক্লান্ত?

খুব কম লোকেই তাঁর কথা বুঝতে পেরেছিল। তাদের পারিবারিক গণ্ডির বাইরে তাঁর জীবনের কিছু মূল্যই ছিল না। কী মূল্যই বা থাকবে? নিজেদের পারিবারিক জট পাকানো যে ব্যবস্থার তিনি উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তা সহজ করতে করতেই তাঁর জীবনটা কেটে গিয়েছে। নিজের প্রয়োজনে ফাঁকি দিয়ে আর সবাইকে প্রয়োজনে অতিরিক্ত সামান্য কিছু দিতে তিনি কি প্রাণপণই না করেছেন! কিন্তু এতে কী-ই বা রঙদারী মহত্ত্ব আছে যে লোকের চোখে পড়বে! আর এই কি জীবন?

কিন্তু অজয় খুব কম বয়সেই তাঁকে বুঝতে পেরেছিল। কারণ অকারণে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতো। পৃথিবীতে সঙ্গী পাওয়ার মতো অবকাশ স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর ছিল না। অজয় কি তা বুঝতে পেরেছিল?

অজয় হয়তো জেগে আছে। মায়ের চোখ আলো থেকে আড়াল করে বই খুলে সে পড়ছে। আলোয় ওর কপাল গরম হয়ে উঠেছে, চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে। ছোট টাইমপিসটার দিকে চেয়ে কী ভাবে, আবার পড়ে। নীরবে সে নিঃসঙ্গ পৃথিবীতে পথ করে নিতে চেষ্টা করছে?

কেন যে এ কথাগুলি মনে হয়।

নিজেকে অন্যমনস্ক করার জন্য সামনের নেবুফুলের থোপাটার দিকে সে চাইলো। হাত বাড়িয়ে যেন ছিঁড়ে আনা যাবে। গরাদ দিয়ে হাত গলিয়ে প্রতিমা থোপাটাকে ধরার চেষ্টা করল। নাড়া পেয়ে একবাশ ছোট পিঁপড়ে আঙ্গুল বেয়ে উঠলো। প্রতিমা শিউরে উঠে হাত টেনে নিল।

রাতের বেলায় গাছে হাত দিতে নেই। বর্ষীয়সীরা একথা বলেন বোধ হয় সাপের ভয়ে। প্রতিমা শিউরে উঠল। হয়তো ওই ডালটার সঙ্গেই একটা সাপ জড়িয়ে আছে। বড় নয়, কালো নয়, ছোট সবুজ রঙের একটি। প্রতিমার মতো মেয়ের পক্ষে তাই যথেষ্ট। ক্ষীণাঙ্গী প্রতিমা।

অদ্ভুত গড়ন প্রতিমার। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাংস শরীরে এতটুকু কোথাও ছিল না। অপরিমেয় লাবণ্যে হঠাৎ একদিন সারা গা ভরে উঠেছিল। কী অদ্ভুত এই লাবণ্য জিনিসটি। কোথা থেকে যে আসে। সে গায়ের কাপড় সংযত করে দিল।

কেন যে শ্রীপতি এত অসহিষ্ণু! প্রতিমার সব কিছুতেই তো তার অপ্রমেয় অধিকার। তবু—। নিদ্রিত শ্রীপতির দিকে চেয়ে যেন প্রতিমা অবাক হয়ে যায়। কোন কোন দিন ঘুম ভেঙে গেছে, উঠে দেখেছে সে, প্রতিমার বালিশের পাশে একখানা হাত কোমল হয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে। কত আকুতিতে যেন আঙুলগুলি মুদ্রিত। কিন্তু—সারা দেহ কাঁটা দিয়ে উঠলো প্রতিমার। শ্রীপতির দৃষ্টি তাকে মোহাবিষ্ট করে দেয়। কী যেন এক জান্তব উষ্ণতা। শয্যায় যেন তা লেগে আছে।

প্রতিমা আবার গবাদে মাথা রেখে দাঁড়াল। চোখের জলের দুটি ধারা নিঃশব্দে তার গাল বেয়ে নামল। কে কাঁদছে? সে নিজেই কি? কেউ কেউ কি অপমানিতা? বিধিসম্মত, বহুপ্রচলিত,—এতে অপমান কোথায়?

প্রতিমার মন কথাটাকে কোমল করে নিল চিন্তা করতে গিয়ে, নতুবা নিজের কাছেই কি লজ্জার শেষ থাকবে?

বোধ হয় স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা কথাটা পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়।

কিন্তু ঠিক ও কথাটাও যেন নয়। প্রতিমা স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় নয়। সে চায় না সকলের কাছ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে রাখতে, নিজেকে ঘিরে রাখতে ব্যবধান নিয়ে।

কিছুক্ষণ যেন কিছু খুঁজলো নিজের মনে। তার জীবনের এই বর্তমান অবস্থাকে যাচাই করে করে দেখছে। আর তা করতে গিয়ে অন্য আর একটি শহরে তার যে অন্য রকমের জীবন ছিল তা মনে পড়ে যাচ্ছে। তার মনে পড়ল রেবার কথা, সুনীতির কথা। তাদেরও বিবাহ হয়েছে। বোধ হয় তাদের জীবনেও দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হয়েছে। রেবাই একদিন বলেছিল, হয়তো রহস্য করে, হয়তো খেয়ালে—যেমন ধরো মেহগনি কাঠের কথা। গাছ হিসাবে মেহগনির যে বৈশিষ্ট্য তা তার প্রাণধারণের পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু মানুষের কাছে মেহগনির যে দাম তা এই অপরিহার্যতাকে বিচার করে না। গাছ হিসাবে অস্তিত্ব শেষ হওয়ার পরে মেহগনির অস্তিত্বের যে দ্বিতীয় পর্ব তার জন্য মেহগনির দুঃখ আছে কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের যেন কখনও কখনও কষ্ট হয়। এ কষ্টকে অন্য একটি শহরের আর এক রকম জীবনের জন্য বিচ্ছেদ-বোধ বললে ঠিক বলা হয় না। এ কি গৃহগত প্রাণের কান্না?

একটা উদাহরণ নেয়া যাক। প্রতিমা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত নয়, বরং জীবনানন্দর পক্ষপাতী। উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র বারবার সে পড়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস তার ভালো লাগে। এই যে বিশেষ পছন্দ এর কী নিদর্শন আছে স্বামীপ্রেমে? কোন বই না পড়লেও স্বামীকে

সে একাগ্র প্রীতি দিতে পারতো।

এ ছাড়াও অন্য দিক আছে। রেবা তার স্বামীকে ভালোবাসে, প্রতিমাও। রেবার নাম ছিল চিত্রাঙ্কনে আর গানে খ্যাতি ছিল প্রতিমার। বিগত জীবনের এই বিশেষত্বগুলি দরজার বাইরে রেখে দুজনে স্বামীর ঘরে ঢুকেছে। সেখানে দুজন এক। তারাই শুধু নয়, সুনীতিও স্বামীর ঘর করতে গিয়েছে। তার একমাত্র বৈশিষ্ট্যই ছিল অপারদর্শিতা। সেও, তার চিঠিই প্রমাণ, স্বামীকে বুকের সবটুকু ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছে।

কিন্তু এই যদি হবে—?

অন্য সময়ে ভাবতে গেলে লজ্জা করে—এমন সব কথা দু' চারজন সমবয়সী একসঙ্গে বসলে উঠে পড়ে। রূপসীর বিয়ের সময়ে তেমনি একটা কথা উঠে পড়েছিল। রূপসীর নাম যে রসজ্ঞ পিতামহ রেখেছিলেন তাঁর সত্যিকারের রসজ্ঞান ছিল। সে যেন কোন সাহিত্যিকের কল্পলোকের রচনা। তাকে দেখে পুরুষ উন্মাদ হবে না, এটা ছিল অসম্ভব।

প্রতিমার প্রশ্নের উত্তরে রেবা বলেছিল—ওর বরের কিন্তু তপস্যা ছিল। সুনীতি বলেছিল—শত বছরের।

রেবা বলেছিল, তা হবে। কিন্তু মজাটা এই যে রূপসীর রূপটার ন্যায্য দামটা পাওয়া হল না। সুনীতি বলেছিল, স্বামী পাওয়া কি দাম পাওয়া হল না।

রেবা বলেছিল, তা তো বটেই। সময়ে সময়ে আমার কী মনে হয় জানিস? আমার কথাই ধর। ভগবান যে রূপ দিয়েছেন আমায় তার জন্য তাঁর গৌরব করার কিছু নেই। অথচ স্বামী আমিও পেয়েছি। বল এবার রূপসী কি দাম পেল, স্বামী পাওয়াই যদি রূপের মূল্য হয়।

প্রতিমা হাসতে হাসতে বলেছিল—অঙ্কের হিসাবে রূপসীর দশটা স্বামী পাওয়া উচিত ছিল। রেবা বলেছিল, হাসির কথা নয়, ভাই। রূপ যদি দেখবার জিনিস হয়, সে কেন চাইবে না অনেক দর্শক?

সুনীতি ছি-ছি করে উঠেছিল।

কিন্তু রেবা থামবার মেয়ে নয়। সে বলেছিল—রূপ ছেড়ে দিলাম। প্রতিমার গানের কথাই ধর। এরপরে প্রতিমার যখন বিয়ে হবে কে দেবে তার গানের মূল্য? একশ'জন শোনবার পরেও যে গানের মাধুরী এতটুকু ক্ষয় হয় না—একটি মাত্র পুরুষ—হোক সে রাজার রাজা, সে কি পারে তার দাম দিতে?

প্রতিমা বলেছিল, একেবারে বখে গেছিস। স্টেজে দাঁড়িয়ে সারা জীবন গান গাইলেই বুঝি আমার সার্থকতা?

রেবা তবু বলেছিল, মানুষ হিসাবে কি হয় জানি নে, কিন্তু তোর মধ্যে যে গুণী, যে গাইয়ে তার পক্ষে সেটাই একমাত্র সফলতা। শুধু কি তাই? পৃথিবীর কাছে থেকে যেটুকু তুই বিশেষ করে পেলি তা থেকে সবাইকে বঞ্চিত করে একজনকে দেয়া তোর কেমন ন্যায়? আর সেও হয়তো সে দান নেবে না।

প্রতিমা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। মনের মধ্যে রেবার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ফিরে চাইলো।

অনেক রাত হয়েছে। চাঁদ আকাশে ঢলে পড়েছে। বাইরে কুটরাজ গাছ থেকে এলোমেলো গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। প্রতিমা ভাবল রেবাকে বহুদিন দেখে নি। অথচ হঠাৎ কি করে ওর কথা মনে হয়ে গেল। এখনও যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে—আর হয়তো সেও কোনদিন সে দান নেবে না।

কানের পাশটায় গরম হয়ে উঠেছে। বাইরে করিডরে জল আছে, মুখে চোখে দিলে বোধ হয় ভালো লাগবে।

কিন্তু দরজাটা খোলা কেন? আ-ছি-ছি, প্রতিমা! আজ শ্রীপতি বাড়িতে নেই তোমার তো বেশি

হুঁসিয়ার হওয়ার কথা। তোমার হাত দুটো কখন কী করে তা কি তুমি জানতে পারো না? আর তুমি এসব ভাবছোই বা কেন?

কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে এক নিশ্বাসে অনেকটা খেয়ে শরীরটা যেন স্নিগ্ধ হল। জলে হাত ভিজিয়ে কানের পিছনে, ঘাড়ে বার কয়েক বুলিয়ে দিয়ে প্রতিমা বিছানায় গিয়ে বসল। তার আগে দরজাটাও বন্ধ করে দিল।

এবার সে ঘুমোবে। গায়ের কাপড় শ্লথ করে দিতে দিতে প্রতিমা ভাবল এই সব ছাই-পাঁশ চিন্তার মূলে—

কথাটা কি পাপ? এক মুহূর্তের জন্য প্রতিমার মন যেন সেই নীতিভ্রষ্টতাকে লালন করল। পাপ নয়। সুনীতি-বিরোধী কিছু বলতে পারো। আর গোপনও। একজন পুরুষের ডায়েরি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়া যেন তার পাশে বসে তার অন্তরের গভীরতম কথাগুলি শোনা। আর ভাবো সেই লজ্জাকর প্রত্যাখ্যান। আর ঠিক তখনই সেই দগদগে ফুলগুলি নিয়ে এসেছিল বটু।

অশেষের ডায়েরি। আর গল্পের পাণ্ডুলিপি। গল্পের নায়কগুলো যেন ওর নিজের ছাঁচে গড়া, ওর মনের এক একটা প্রবৃত্তি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। আর সবই যেন রাহুগ্রস্ত, ক্ষয়িষ্ণুতার একটা ছায়া পিছনে লেগেই আছে। আশ্চর্য! পৃথিবীতে ওই ক্ষয়িষ্ণুতাই কি পূর্ণতার চাইতে মানুষকে বেশি আকর্ষণ করে নাকি?

প্রতিমা বিছানায় শুয়ে হাত বাড়িয়ে মাথার দিকের জানালার পর্দাটাকে একটু সরিয়ে দিল। নিচেব উঠোনটা চোখে পড়ে। উঠোনের উপরে লম্বা লম্বা টানা টানা ছায়া পড়েছে। গরাদের ছায়া এমন ভাবে পড়ে যদি ঘরের ভিতরে উজ্জ্বল আলো থাকে। আলো জ্বলছে অশেষের ঘরে? আশ্চর্য তো, ঘরে এত বড় আলো রেখে ঘুমুচ্ছে কি করে?

এদেশে ইলেকট্রিক আসছে শ্রীপতির শক্তিমান বাহুকে আশ্রয় করে। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত কেরোসিনই চলবে। ছোট একটি হ্যাজাক জ্বলছে অশেষেব ঘরে। অনেক রাত হল। আলোর ঝাঁজটা এখন তীব্র ও কটু বোধ হচ্ছে।

আলোর জ্বালা থেকে চোখ ফিরিয়ে ঘরের অন্ধকারের দিকে চাইতেই অশেষের চোখে পড়ল আলো এবং অন্ধকারের মাঝের জায়গাটিতে তার নিজের ছায়া। কি জানি কেন কিছুক্ষণের জন্য তার চোখ জড়িয়ে রইল তাতে। খুব রোগা হয়ে গিয়েছে নাকি সে? একথা ভেবে আর কী হবে। মধ্যরাত্রির আলো পোড়ানোর নিঃসঙ্গতা এর আগেও অনেকের ভাগ্যে হয়েছে। কলেজের দিনে ম্যাকবেথের ঘুম না হওয়ার আতঙ্কের উচ্ছ্বাস শুনতে শুনতে সে একদিন মন্তব্য করেছিল সেক্সপীয়র কিছুদিন যাবৎ অনিদ্রায় কষ্ট পাচ্ছিলেন বইটা লিখবার সময়ে। ঘুমকে ফাঁকি দিলে ঘুমের প্রেতাত্মা মুখ ভেংচায়।

টেবলের উপরে ছোট টাইমপিসটা চলছে। উপমা দেয়া যায়, সমস্ত পৃথিবীর মতো সেও প্রভাতের আলোতে পৌঁছানোর জন্য ছুটে চলেছে।

অশেষ টেবল ছেড়ে উঠে চেয়ারটা টেনে নিয়ে জানালার ধারে গিয়ে বসল। উঠোনে আলো আছে চাঁদের। যেন এটা একটা মধ্যরাত্রি নয়, এই সবে সন্ধ্যা হয়েছে। সন্ধ্যা কাটানোর মতো অনেকক্ষণের জন্য বসবার জায়গাটাকে সে ঠিক করে নিল।

চিন্তাগুলি মুখ ফুটে কথার আকার নিতে চাচ্ছে। সে অস্ফুট স্বরে বলল, লেখার ধারাটাই পাল্টাতে হবে। সত্যি হতে পারে কিন্তু আর আঁকতে পারছিনে। নিজের তৈরি অসার্থক-প্রবৃত্তি, ইচ্ছা-প্রপীড়িত নরনারীগুলির মাঝখানে বাস করে নিজের অসাফল্যগুলি মনের উপরে গভীর ছাপ এঁকে দিচ্ছে।

কিন্তু সঙ্কল্পের গোড়াতেই সে টের পেল—এ তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। সে নিজে যে অভাব

বোধ করছে, যে ব্যথা সে নিজে পাচ্ছে তার বাইরে তার সাহিত্যিক দৃষ্টি স্পষ্ট দেখতে পায় না। মনে হতে থাকে পৃথিবীর আনন্দগুলি বেদনার তুলনায় অগভীর। ওদের আশা ছিল, প্রত্যয় ছিল। আমাদের কিছু নেই।

অশেষের মনে হল উঠোনে পায়চারি করার কথা। বাইরের বাতাসের জন্য লোভ হল। কিন্তু দরজা পর্যন্ত গিয়ে সে ফিরে এল। উঠোনটা শ্রীপতিদের ঘর থেকে নিশ্চয় দেখা যায়। ওরা যদি জেগে থাকে?

অশেষ ফিরে এসে আবার চেয়ারটাতেই বসল। প্যাডটার পাশে কলমটা রয়েছে। ছোট একটা ফিরোজা রঙের কলম। কিন্তু কী অদ্ভুত তার ব্যবহার।

প্রতিমা নিজের হাতখানাকেই যেন দেখল। চুড়িগুলিতে আলো পড়েছে। ভাবল সে অশেষ কি সত্যি বই লিখেছে? অন্তত একখানা উপন্যাস হয়তো তার ছাপা হয়ে বেরিয়েছে। চেয়ে নিয়ে পড়লে মন্দ হয় না।

তারপর আরও পূর্ণিমা এসেছে, আরও ছোটখাট আলোভরা রাত্রি। ফুল ফুটেছিল, দু-একটা পাখিও ডেকেছে। কখনও শ্রীপতির ডাকে, কখনও নিজে থেকেই প্রতিমার ঘুম ভেঙেছে। কিন্তু চাঁদের আলো মনের অসমতল পৃথিবীতে আলো-ছায়া রচনা করবে এমন রাত বহুবার আসে না। প্রতিমাব নানা রাতের স্মৃতির মধ্যে এটুকু মনে পড়ে একদিন রাতে—সেদিন হয়তো পূর্ণিমা ছিল—তার ভালো ঘুম হয় নি। রাত জেগে ছাই-পাশ কী সব ভেবেছিল।

দি ক্যাস্‌ল্‌

প্রায় নিঃশব্দে গাড়িটা থেমেছিল। রেলস্টেশনের পর্টিকোতে নয়—তার খানিকটা দূরে রাস্তার পাশে প্রাচীন নাগকেশর গাছটার নিচে, যেখানে রাস্তাটা ক্যানালের ব্রিজটার কাছাকাছি। নাগকেশরের পাতাগুলো লাল ; ঝরে পড়া পাতায় তার তলায় মাটি অনেকখানি জুড়ে বাদামি। অন্ততঃ দুচার বছরের পাতা জমে আছে। রাস্তাটা এখানে ব্রিজে যাওয়ার জন্য খানিকটা উঁচু। গাড়িটা তার ফলে আকাশের রেখাকে পশ্চাদ্‌পট হিসাবে পেয়েছে। আকাশটা সাদামাটা নীল, ইতিমধ্যে তার মাঝ বরাবর মভ্‌ রঙের একটা লম্বা রেখা পড়েছে।

এই জেলার ডেপুটি কমিশনারের স্ত্রী, অবশেষে, গাড়ি থেকে নামল যেদিকে স্টেশন। হাতে তার উলের কাঁটা। দরজা খুলে নেমে গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে স্টেশনের দিকে মুখ করে সে উল বুনতে লাগল। কারণ সোফার এবং ডেপুটি কমিশনার অতিথিকে আনতে প্ল্যাটফর্মে গিয়েছে। ট্রেনটাও এইমাত্র এসে থেমেছে।

এইভাবেই দ্বিতীয়বার চোখ তুলে চাইতেই সে দেখতে পেল ডেপুটি কমিশনার ফিরে আসছে, সঙ্গে তার ছিপছিপে চেহারার মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক। অতিথি ছাড়া আর কে হবে? নিচু করে রাখা চোখের পাতার তলা থেকে ডি সির স্ত্রী দেখল, পোশাকটা যেমন হওয়া উচিত তেমনই বটে। অন্তত গায়ের চাদরটা রঙীন।

পরিচয় করিয়ে দিল ডি সি—আমার স্ত্রী, কবি।

গাড়িটা ছেড়ে দিল। সোফার আসছে পরে অতিথির লাগেজ নিয়ে। ডি সি গাড়ি চালাচ্ছে। পিছনের সিটে কবি এবং ডিসির স্ত্রী।

কী আলাপ করবে ডিসির স্ত্রী যেন খুঁজে পাচ্ছে না। নিজের নিঃশব্দতায় সে অবাকই হল। কথা বলতে সে নিশ্চয়ই জানে। আর অতিথি নিয়ে যাওয়াও নতুন নয়। গত সপ্তাহেই কমিশনার এসেছিল।

কবি বরং বলল—'আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে ভাবি নি। নরেনবাবুর চিঠি পেয়ে অবাক হলাম, ভালো লাগল। দেরি করতে পারলাম না।'

ডিসির স্ত্রী বলল, 'আমরাও যারপরনাই খুশি হয়েছি।'

তবু যেন নতুন লাগছে পরিস্থিতি, ডিসির স্ত্রী পক্ষেও অভিনব। সে বরং আড়চোখে কাউকে দেখল। দোহারা গড়ন। দাঁড়ালে যেমন ছিপছিপে মনে হয়, এখন তেমন লাগছে না। চোখের চশমার কাঁচ মাঝারি পুরু, রিমটা সোনালি। মাথার চুলগুলো রেশমের মতো নরম বলে মনে হয়। কিন্তু সাদার দুএকটা দাগ পড়েছে ইতিমধ্যে। আর তা হওয়ারই কথা যদি ডিসি ভুল না করে থাকে। ডিসির সমবয়সীই হবে। ডিসির একটু বেশী সাদা দাগ চুলে। তা পঁয়তাল্লিশ হল তার।

এ রকম সময়েই, ডিসির স্ত্রীকে ব্রততী বলা যায়, তার মনে হল—কবিকে যেন কোথায় সে দেখেছে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কবির মুখের একটা বিশেষ অভিব্যক্তি তার পূর্ব পরিচিত কোন মুখের স্মৃতির সঙ্গে কিছু মিলে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু হারিয়ে যাওয়ার মতো আলুথালু মহিলা নয় সে। তার মনে হল সেই পূর্ব পরিচিত লোকটি স্বামীর বংশেরই কেউ, হয়তো তার শ্বশুর স্থানীয় কেউ।

ব্রততীর না হক, ডিসির পূর্ব পরিচিত বটে। ডিসি ভুল করেনি। ভুল করেনি তার প্রমাণ কবির এই আসা।

ব্রততী ভাবল—বলবে নাকি সে সেই ব্যাপারটা কবিকে? হাসি হাসি মধুর একটা ঘটনা। যার শেষ ধাপে এইমাত্র ব্রততী বিজয়িনী হয়েছে। জজের বিলেত-ফেরত মেয়ে ড্রয়িং রুমের হালকা গল্পে হঠাৎ গম্ভীর সুর এনে ফেলেছিল। কারণ আলাপটা হচ্ছিল আধুনিক কবিদের নিয়ে, তাদের কোন এক জনের রাষ্ট্রীয় সম্মান পাওয়া নিয়ে। তখন ব্রততী বলেছিল ; কবি তাদের পরিচিত। তখন সেই বিলেত-ফেরত মহিলা বলেছিল—তা অসম্ভব কী আপনি ডিসির স্ত্রী তো! এটা ব্যঙ্গই, যেন ব্রততীর চালবাজীকেই ধোঁকা দেয়া। অন্য মহিলাবাও সাহস পেয়ে কেমন করে যেন তাকিয়েছিল। অন্য দিনের চাইতে অনেক আগে, প্রায় অকস্মাৎ, ড্রয়িং রুম থেকে চলে এসেছিল ব্রততী। গাড়ির কোণে আশ্রয় নিয়ে সে দু-এক মুহূর্ত ভেবেছিল—সত্যি কি কখনও কখনও সে চালবাজী করে থাকে? তারপরে অবশ্য সোজা হয়ে সীটের মাঝ বরাবর বসেছিল। অন্ততঃ এটা যে নয়, তা সে প্রমাণ করতে পাবে না? সেদিনের সকালের কাগজেই ছিল কবির রাষ্ট্রীয সম্মান পাওয়ার কথা। ব্রেকফাস্টের টেবলে ডিসি বলেছিল, কবিকে বোধ হয় সে চেনে। সে বলেছিল —আসলে তার নাম মনোবঞ্জন দাস, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই সুমন্ত্র এই ছদ্মনামে লিখতো টিকতো। অন্ততঃ তার কোলকাতার বাড়ির ঠিকানা দেখে তাই মনে হয়। এত কথার পরও, ডিসির চেনা হলে কি তাব স্ত্রীবও চেনা হল না কবি?

বাংলোয় ফিরে ব্রততী বলেছিল, 'তুমি তো ডিসি?'

'তোমার কাছে নয়।'

'তাই হও। অচেনা হলেও, তোমার ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণে কোন কবি কি তোমার অতিথি হয়?'

'তা হতে পারে।'

'সুমন্ত্র সেনের মত কবি?'

'সুমন্ত্র আমার পরিচিত নির্ঘাত।'

'অনেকে বিশ্বাস করে না।' এই বলে ব্রততী ড্রয়িংরুমের গল্পটা বলেছিল। বলতে গিয়ে তার গালটা লাল হয়ে উঠেছিল। তাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল তখন। তার বয়স বেশি হলে পঁয়ত্রিশ।

'বটে?' বলল ডিসি।

সুতরাং কবি এল।

কিন্তু এ গল্প কবিকে বলা যায় না।

ব্রততী বলল, 'কবি, আমরা যদি আপনার পরিচিত না হতুম, আসতেন না আমাদের ডাকে?'

কবি বলল, 'আমি কবি। যে আমাকে ভালবাসে, আমি তারই হয়ে যাই।'

কথাটা কবির মতোই। তার একটা নাম নিশ্চয়ই আছে ; কিন্তু তাকে সুমন্ত্র সেন বলে বেশ কিছুদিন ধরে ডাকা হয়েছে নানা সভায়। আর এখন সে কবি হিসাবে এতদূর খ্যাত হয়েছে, যে আচমকা কেউ কবি বলে তাকে ডাকলেও সে চমকে ওঠে না। ওটাই তার নাম হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু ততক্ষণে ডিসির বাংলো এসে পড়েছে।

শাসকদের বাসাগুলো, শহরের কেন্দ্রে না হয়ে, প্রান্তে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও তাই। জেলার বড় কয়েকজন অফিসারের বাংলো এ পাড়ায় পরস্পরের দিকে নিজের নিজের বাগানগুলির মধ্যে থেকে চেয়ে থাকে। ডালিয়ার বেড যেন। অবস্থানকারী অফিসারের পদমর্যাদার সূক্ষ্ম পার্থক্য ফুটিয়ে তোলে নানা রঙের সিংগল ডাবল পেটাল ডালিয়া। স্বভাবতই ডিসির বাংলো সব চাইতে জমকালো। এমন কি অন্যান্য জেলার ডিসির বাংলোর তুলনাতেও। আর তা হওয়া স্বাভাবিকই, কারণ এরকম একটা প্রথা তখন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, এ জেলায় ডিসিরা ইংরেজই হতো বরাবর এবং অল্প বয়সী

অনভিজ্ঞ কেউ নয়। সেক্রেটারিত্ব পাওয়ার আগে এক পাক তারা এখানে থেকে যেতো। এ জেলাটার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এ জেলায় বদলী হওয়াটা সে জন্য এখনও ম্যাজিস্ট্রেটেব দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। ব্রততী একটা ব্যাপারে বৈশিষ্ট্যটাকে বুঝতে পেরেছিল। এর আগে ঘোষ সাহেবকে কোন জেলাতেই এত ট্যুর কবতে হয় নি। আর অফিসটা বাড়িতেই হবে—তাও এমন বেশি করে, আর কোন জায়গাতেই হয় নি। ডিসি এই জেলায় আসবার পর থেকে টেনিস খেলছে না। এর আগেও এ জেলার কোন ডিসি তা খেলে নি। একদিক দিয়ে তা ভালোই। কোন অফিসারই টেনিস খেলার মতো নৈকট্যে আসে নি ডিসির।

ইউক্যালিপটাস, ইউ, সাইপ্রেস গাছের অরণ্যোপম অবস্থানের মধ্য দিয়ে লাল সুরকির ড্রাইব ফ্লাওয়ার বেডের সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে। কোন ক্যাসলের অনুকরণ। কিন্তু কলোনিয়াল গভর্ণরের প্রাসাদের মতো বিদেশী গাছের অরণ্যের পর্দা দিয়ে ঘেরা। বাড়িটার নাম দি ক্যাসল, চিঠির ঠিকানায় লেখা হয়ে থাকে।

একটা পিলার যেন একটু বাঁকা। পর্টিকোতে একটা বিদ্যুতেব ডোম জ্বলছে দিনের বেলাতেও। ডোমটার গায়ে অনেকদিনের ময়লা। আঠার মতো লেগে থেকে আলোটাকে প্রাচীনের চোখেব ঘোলাটে দৃষ্টির মতো করেছে। অদ্ভুত লাগে যেন। কিন্তু ততক্ষণই বা সে ভাব থাকে।

ব্রততী হাসল। রিনরিনে মিষ্টি হাসি।

ব্রততী বলল, 'আমরা এসে গিয়েছি।'

ডিসি বলল, 'কবি, এই আমাদের কুটীর।'

'কুটীর?' কবি সাধারণ মানুষেব মতোই বিস্ময় প্রকাশ কবল।

আর তা ভালো লাগল ব্রততীর। কবি খ্যাতিমান, কিন্তু প্রাসাদটাও তুচ্ছ নয়।

এমন একটা প্রাসাদে অতিথির পৌঁছানো থেকে ক্রমশঃ ঢিলে ঢালা হয়ে বসা পর্যন্ত অভ্যর্থনাব কতগুলো প্রটোকোল আছে। সেগুলি পাব হতে হতে কবিকে নিয়ে ডিসি এবং ব্রততী কবির জন্য নির্দ্দিষ্ট শোবাব ও বসবার ঘবগুলিতে ঘুবে ঘুরে বেড়াল। অবশেষে ডিসি বসল, কবি বসল তার মুখোমুখী, ব্রততী বলল, 'এবার কফি আসুক।' এটা ডিসির উপরতলার ড্রয়িংরুম।

ডিসি বলল, 'ছোটবেলার কথা মনে পড়ে সুমন্ত্র? কিম্বা তখন তোমাকে সুমন্ত্রই বলতুম না। তোমার মামাবাড়ির ঠিক পাশের বাড়িটাই ছিল আমাদের। তখনও তো সেইটেই তোমার ঠিকানা।'

কবি মুগ্ধ হয়েছিল, বলল, 'মনু বলাই স্বাভাবিক হবে।'

কফি আনলো আয়া। অত্যন্ত সুন্দরী একটি মেয়ে সে এখনও।

ব্রততী কফি পরিবেশন করল। চুরুট ধরাল ডিসি।

কী যেন ভাবল সে। মিটমিট করে হেসে বলল, 'দেখো কবি, একটা কথা তোমাকে বলি ; তোমরা সব কিছু নিয়ে কবিতা লিখে থাকো। এবং রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির পর নিশ্চয় বলবো তা ভালো হয়। কিন্তু এই মাত্র যে কফি দিয়ে গেল, সে কিন্তু, মানে কী বলবো তোমাকে, মিসেস ঘোষের বোন নয়।'

কবি বলল, 'ধরতে পারলুম না।'

'মানে তাকে নিয়ে যেন কবিতা লিখো না। লিখতে চাওয়া স্বাভাবিক। সত্যি বলতে কি, ওকে যখন প্রথম মিসেস চাকরি দিলেন, আমারই কেমন একটা—'

কবি লজ্জিত বোধ করল।

ব্রততী বলল, 'আ, ডিসি।'

ডিসি মিস্টার ঘোষ ঘোঁ ঘোঁ করে হেসে উঠল। এটা তার স্মোকিংরুম রসিকতা।

সে বলল, 'সিগারেট নাও, কবি।'

একটু যেন ভাবল সে, তারপরে বলল, 'সুমন্ত্র তুমি যে এতো বড় হবে তা কিন্তু আমি ভাবি নি। মানে স্কুলে তুমি মেধার জন্য খুব বেশি খ্যাত ছিলে না।'

ব্রততী বলল, 'এটা তোমার হিংসার কথা।'

'ম্—তা বলতেও পারো। কবি, গডস্ আর এনভিয়াস অব ইউ। কন্‌গ্র্যাচুলেশনস্।'

ডিসির চোখে মুখে অকুণ্ঠ প্রশংসার সুস্পষ্ট ছাপও ফুটে উঠল। এটা তার অভ্যাস করাও দরকাব। কারণ সে ফরেন সার্ভিসে যাচ্ছে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। অর্ডারটা যে কোন দিনই আসতে পারে। আউট অব দি অর্ডিনারি।

সে হেসে বলল, 'এবার তোমরা বসো। আমার একটু কাজ আছে।'

ব্রততী অন্যমনস্কভাবে তার হাতঘড়ির দিকে চাইল।

কবি বলল, 'কাজ এখন?'

'আর কবি, আমরা শ্রমিক। আমাদের ঘর্মাক্ত মলিন কাজগুলি করতে হয়। তোমাদের মতন সৌভাগ্য নয় আমাদের।'

ডিসি তার প্রাসাদের অন্য অঞ্চলে তার অফিসে গেল।

ব্রততী বলল, 'আর একটু কফি দেবো?'

'না, থাক।'

সিগারেট ধরাল ব্রততী। হেসে বলল, 'স্মোকিং ইজ পারমিজিবল।'

'নিশ্চয়।' একটু ভাবল কবি। একটু ধাক্কা লেগেছে তাকে। বলল সে, 'আপনার আর আমার ব্র্যান্ড দেখছি একই।'

ব্রততী বলল, 'অবশ্য আমরা কেউই বিখ্যাত নই আপনার মতো। আর আমরা আনন্দিত যে আপনি আমাদের পূর্বপরিচিত।'

যেখানে তারা বসেছিল তার কিছুদূরে বাঁ দিকে একটা ছোট টিপয়। ব্রোঞ্জের উপরে কারুকার্য তার। সহজেই চোখে পড়ে। আর চোখে পড়বে বলেই তার উপরে একখানা বই দাঁড় করানো আছে। রাখবার কায়দায় বইখানিও চোখে না পড়ে পারে না।

কবির চোখে পড়ল। মলাট দেখে সে চিনতে পারল।

ব্রততী বলল, 'বলুন তো কী?'

কবি উঠে গেল। বইখানি হাতে করল। কলমটা খুলে নিল পকেট থেকে।

'কার নাম লিখে দিই?'

'কবিতায় যদি হয়—'

'আপনারই হওয়া উচিত।'

মনে মনে দুটি চরণ ঠিক করে নিয়ে লিখল কবি টাইটেল পেজে। তলে নামসই করে দিল। আর বইখানাকে ঠিক আগের মতো দাঁড় করিয়ে দিল ব্রততী। কাল কি প্রতিবেশীরা কেউ আসবে না? তাদের কারো চোখে পড়তেও পারে এবং জানাজানিও হবে।

কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই ডিসি এল আবার।

বলল সে, 'আচ্ছা কবি, তোমার কোন ছবি আছে?'

'কবির সঙ্গে ছবি মিলিয়ে বলার জন্যই ভাবছিলে নাকি কথাটা?' ঝকঝক করে হেসে উঠল ব্রততী।

'দেখো, কবির সঙ্গে ছবি মিলিয়ে দিতে পারলেও কাব্য আমার ধাতে নেই।'

কবি বলল, 'সবাইকে কাব্য লিখতে হবে এমন কি কথা আছে?'

'তা অবশ্য নেই। এ তুমি ঠিকই বলেছো।'

'আর সিভিলিয়ান হলেই মেধাব অপচয় হবে এমন কথাও নেই।' কবি বলল।

'এ বিষয়ে তুমি দেখছি ব্রততীর সঙ্গে একমত। সিভিলিয়ানত্ব তা হলে মেধার অপচয়? কিন্তু আমি অনেকানেক—'

'হ্যাঁ, তাও বলতে পারেন। অনেক আই. সি এস ইতিহাস চর্চা করেছেন। এদেশের অর্থনীতি নিয়ে বই লিখেছেন।'

'দেযার, কেমন বলি নি? তা দেখো এই বাড়িটাব খ্যাতিও আছে এ বিষয়ে। এখানে অন্তত একখানা মূল্যবান বই লেখা হযেছে, এক আই সি এস দ্বারা।'

'কিন্তু তুমি কিছু করো নি এ বিষয়ে।' বলল ব্রততী।

'এখনও সময় যায় নি, এখনও সময় যায় নি।' ডিসি যেন দীর্ঘনিঃশ্বাসই ফেললো।

'তা গিয়েছে এমন কথাও বলছি নে আমবা।' বলল কবি।

'দেখো, আমি কলাব ছাত্র ছিলাম না। বিজ্ঞান ববং মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার বলতে পারো। বিশ্ববিদ্যালযে প্রথম হয়েছিলাম ওই বিদ্যায়। চাকরিব পবীক্ষাতেও। তা গবেষণাব কাজ এখনও একটু-আধটু কবা হয়ে থাকে।'

'কবি কিন্তু ভয় পেযে যাবে।' বলল ব্রততী।

ডিসি হাসি মুখে বলল, 'তাই? কিন্তু দেখো তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে পারি কবি। এটা একটা খেলাই। আবিষ্কার বলাব মতো মূল্যবান নয়।'

সেই ড্রইংরুমেরই একপাশে ঢাকনা দেয়া কিছু একটা ছিল যাকে এতক্ষণ বড় একটা অর্গ্যান মনে হয়েছে। উঠে গিয়ে ডিসি সেই ঢাকনাটা সবাল। একটা অপবিচিত মেসিন। পিতল ও প্ল্যাস্টিকেব বর্তুলাভাস চোখে পড়ল। সুইচ টিপল ডিসি। হঠাৎ ঘবটাব আলো বদলে গেল। সবুজ আলোতে ভবে গেল ঘরটা। সবুজের একটা নতুনত্ব আছে। যেন কালো কালো ছায়ার দাগ মেশান ওই সবুজ।

দু'এক মিনিটে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ডিসি ফিরে এল।

'কিছু বুঝলে কবি? থিযেটারে আলো ফেলার মতোই ব্যাপারটা। কিন্তু স্থির নয় আলো। ছায়াও আছে আলোর মধ্যে তাই নয়? কতকটা যেন বনের এফেক্ট, প্রভাত হচ্ছে এমন এক অরণ্য।'

কবি বলল, 'নতুন বটে।'

'এটাই আমার হবি। আবিষ্কার নয়, বৈজ্ঞানিক হিসাবে নাম কেউ করবে না। খেলাই বলতে পারো।'

ব্রততী হাসল। তার চোখে স্বামী-সৌভাগ্যেব স্বস্তি। বলল, 'এখনও বিজ্ঞান নিয়ে ঠুকঠাক করে থাকেন।'

'তা কবিকে বলা দরকার, ব্রততী। দেখো সুমন্ত্র তোমার এই হোস্টেস, মানে মিসেস ঘোষও একজন শিল্পী। এসো আমার সঙ্গে।'

'ডিসি এ কিন্তু ভালো হচ্ছে না।' ব্রততী যেন লজ্জিতা হল। কিন্তু ততক্ষণে কবি ও ডিসি উঠে দাঁড়িয়েছে।

ড্রয়িংরুমের পাশেই একখানা ঘর। ছবির গ্যালারি বলে মনে হয়। প্রকাণ্ড পোর্টেট, ল্যান্ডস্কেপ, স্টিললাইফ, রঙীন, একরঙা।

ডিসি বলল, 'কিন্তু ওই যে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট স্টিললাইফ দেখছো! ওটাও ফটোগ্রাফি। এ সবই তাই। মিসেস ঘোষের। মানে দেখো, একেবারে নির্গুণ ধনবানের বেনা ক্ষেত নয় এটা।'

কবি হেসে বলল, 'তা আমি মনে করিনি মিষ্টার ঘোষ।'

'আর, কি মনে হয় আমাদের? পরস্পরকে নিয়ে আমরা সুখেই আছি?' ডিসি যেন হৃদয়ের

কাছাকাছি এই কথাটা বলে ফেলে একটু লজ্জা পেল, আর তা ঢাকবার জন্য ঠা-ঠা করে হেসে উঠল।

কবি বলল, 'আপনাদের সুখে আমিও সুখী হতে পারবো মনে করি।'

সেদিনই ডিনারে বসে ডিসি বলল, 'আর তোমার হোস্টেসের অন্যান্য গুণ—? মানে গান যদি তুমি শুনতে না পাও, যদি শোনাতে রাজি করাতে না পাবো, সে বুঝবো তোমারই ভাষা জ্ঞানের অভাব। হ্যাঁ, কবি হওয়া সত্বেও। দেখো, কবি হয়ে কাগজে বই লেখা, আব একটি জীবন্ত হৃদযে কথার ছাপ রাখা বোধ হয় এক নয়।'

কবি বলল, 'আমার কথার ছাপ কি জীবন্ত হৃদযে পডে না।'

'কী বলছি, তা—তুমি এখনও অবিবাহিত কেমন কি না?' ডিসি হাসল। বলল, 'অবশ্য অভিনয়—অভিনয়কে আর্ট মনে করো তো তোমরা?'

ব্রততী বলল, 'ডিসি এত এনভিয়াস কেন তুমি?

'তাই? আচ্ছা থাক তা হলে।' ডিসি শাম্পেনটা টেনে নিল।

কবি বলল, 'অভিনয়ের কথা বলছিলেন না?'

'অভিনয়ও নিশ্চয়। সেটা তো একা একা হয় না। বড জোব আবৃত্তি শুনতে পারো। কিন্তু তবুও আমি তোমার হাতেই ছেড়ে দেবো। পাবো তো শুনে নিও৷

ব্রততী বলল, 'না।'

ড্রয়িংরুমের তিনপাশের তিনখানা ঘর শোবার ঘর হযেছে। তা হতো না, যদি না ড্রযিংরুমের উত্তরের পুবের জানলা খোলা সেলাই এর ঘরখানি কবিব শোবার ঘব করতে না হতো। বাত একটু বেশিই হযেছিল শোবার ঘবে আসতে ব্রততীর। কাবণ কবি এবং ডিসি ধূমপান পর্ব মিটে গেলে যখন যার যার ঘরে শুতে গেল, তখনও ব্রততীব কাজ ছিল। আযাকে ডেকে ব্রেকফাস্ট সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হল। বাবুর্চিকে বলা দবকাব করে না, তা হলেও বোস্ট চিকেনেব বঙটা সম্বন্ধে একটু মত জানাল সে।

শোবার ঘরে এসে ম্যান্টেলপিসে বাখা সোনালি ডাযেলেব গাযে ঝিনুকে আকা অঙ্কে দেখল সে এগাবোটা বাজে। ঘব পাহারাব সাদা আলোটা বদলে বিছানার পাশে ঘেবাটোপেব আলোটা জ্বাললো। বিছানার পাশে টিপযের উপবে জলের গ্লাসে, বাঁধানো বই এব সোনালি অক্ষরে আলোটা ঝল্‌মল্‌ করল।

খুট করে শব্দ করে ছোট দরজাটা খুলে পাশের বাথরুমে গেল সে। গরম জল সেখানে। মুখ হাত ধুয়ে ফিরে এল সে। ছোট ড্রেসিং টেবলেব সামনে —শোবাব ঘবের ড্রেসিং টেবল কত আর বড় হবে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে জামা পালটাল, শাড়ি বদলাল। গাযে তোয়ালে দিয়ে গালেব উপবেব চুল থেকে জলের বিন্দুগুলো মুছে ফেলল। চিরুনি চালিয়ে এল খোপায় গুছিয়ে নিল চুল। আয়নাব সামনে দাঁড়িয়ে ব্লাউজের বোতামগুলো খুললো আবার। পাউডারেব পাফ তুলে নিযে বুলিয়ে বুলিয়ে দিল বুকে।

এবার শুতে হবে। বিছানায় এখনও রাগ রাখতে হচ্ছে। ভোবের দিকে শীত শীত করে। কাজেই রাতে শোবার সময়ে কোমর অবধি রাগটাকে টেনে দিতে হয়।

বিছানায় শুয়ে টানা একটা দম নিল ব্রততী। আজকের দিনটা একটা উত্তেজনার দিনই গিযেছে। গেস্ট আসা নতুন নয়, কিন্তু কবির ব্যাপারটা একটু অন্য রকম, অসাধারণ বলতে হয়।

কোমর অবধি রাগটাকে টেনে নিল ব্রততী। ঘুমুবে না পড়বে—এই দুই-এর মধ্যে দু-একবার দ্বিধা করল, আর সেই অবসরে সে ভেবেও চলল। ডিসি গানের কথা বলছিল না? গান অবশ্য, আর অভিনয়, তাও বটে।

ডিসি অভিনয়ের কথা তিনবার বললে, আজও দুবার, অতীতের পুরনো একটা অভিনয়ের কথাই মনে হয়। সিজর এন্ড ক্লিওপেট্রার বাংলা অনুবাদ করে তার অভিনয় হয়েছিল সেবার কলকাতায়। উপলক্ষ একটা নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সেটা অন্য কিছুর উপলক্ষ হয়েছিল। ক্লিওপেট্রার অভিনয় দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল তরুণ সিভিলিয়ান মিস্টার ঘোষ। বিয়ের কিছুদিন পর পর্যন্ত অসম্ভব এক পরিকল্পনা ঘুরতো সিভিলিয়ানের মাথায়। সিনেমার ডাইরেক্টর হবে—আর সহধর্মিণী ব্রততী হবে শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির নায়িকা।

রাগের উপরে একখানা হাত লুটিয়ে আছে ব্রততীর। একগাছা চুড়ি তাতে, কিম্বা বলা যায় খুব সরু ব্রেসলেট বোধ হয় কুচি হীরে বসানো, আলোটা টেরচা হয়ে পড়েছে গর্তে। নিটোল মসৃণ হাত। হাতখানিকে চোখের সামনে নিয়ে এল ব্রততী। লম্বা গড়নের হাত। আর্টিস্টহ্যান্ড বলা হয় নাকি একে? লম্বা সূচলো হয়ে আঙুলগুলো সূচলো নখে গিয়ে ঠেকেছে। নখগুলি যেন গজদন্তের এক হাল্কা রং। বালাটা খুলল ব্রততী। হাতখানা অন্য হাতে ধরে যেন দেখল। ক্লিওপেট্রার বাহু দুটি অনাবৃত ছিল কাঁধ পর্যন্ত, পিঠের অনেকটাও বোধ হয়। এক হাত দিয়ে অন্য হাতটিকে পেঁচিয়ে ধরল ব্রততী। ব্রেসলেটের হাতে দাগ নেই, কিন্তু ঘড়ির ব্রেসলেস্টটা টাইট। একটা দাগ পড়েছে। নখগুলি কি তখন এমনি ছিল? বোধ হয় আরও রক্তাক্ত ছিল।

হাত বাড়িয়ে ঘেরাটোপের আলোটা নিবিয়ে দিল ব্রততী। মাথার কাছে হাত বাড়িয়ে বেডসুইচ টিপে রাত্রির আলোটা জ্বালল সে।

কেন সে সিনেমায় গেল না? উত্তরটা ছোট, সাধারণও বটে। একরকম আভিজাত্য বোধ। সেটা কি প্রফেশ্যান নয়?

আর অভিনয়। তা সংসারে করতে হয়। বিরক্ত হলে হাসি দিয়ে তা আড়াল করে, বোরড্ বোধ করলে অন্য কথায় তা ঢেকে। এমন কত উদাহরণ। বিশেষ করে যদি ডিসির মতো কারো স্ত্রী হতে হয়। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে ডিসির জীবন অর্ধেক নিজস্ব অর্ধেক জনসাধারণের। সভাসমিতি লেগেই আছে। অভিনয় না করলে অনাসৃষ্টি লেগে যাবে। অন্যদিকে অভিনয়ের সব চাইতে বড় পুরস্কার কি এই নয় যে সে মিসেস ঘোষ?'

তা যদি বলো, অভিনয় অন্তত ছোট খাট অভিনয় করেই এই ডিসিকে নিয়ে সংসারে থাকা যাচ্ছে।

ব্রেসলেট হাতে পরলো ব্রততী। নখগুলো তখন নিশ্চয়ই রক্তাভ ছিল। বছর পনেরো হল এবার। রাগটাকে টেনে নিয়ে হাতখানাকে ঢুকিয়ে নিল তার তলায়। আর একটু গভীরে যেন নিজেও ঢুকল। একটু শীতই পড়েছে বোধ হয়।

বিশেষ করে নারীকে। তাকে অভিনয় করতে হয়। একথা ব্রততী বলতে পারে। একটা চাক্ষুষ জ্ঞান হয়েছে তার। মর্গে যেতে হয়েছিল তাকে। পুলিশ ইনসপেক্টরের স্ত্রী হঠাৎ মারা গেল। কেমন যেন ব্যাপার! সৎকার না হয়ে মর্গে। এক দুর্ঘটনাই এই যাওয়া, কেউ কখনও শুনেছে যে ডিসির স্ত্রী মর্গে গিয়েছে? সাহস? সহৃদয়তা? সে অন্য গল্প—কিন্তু চাক্ষুষ জ্ঞানটার কথাই। মাংস, স্নায়ু, অস্থি। কী বলো তো নারী? অভিনয় ছাড়া তারা কী?

অভিনয়ই যদি তা বলো।

জজের বিলেত—ফেরত মেয়েকে দেখাতে হবে বটে। তা বলে তাকে ডেকে নিয়ে এসে সাড়ম্বরে? কিম্বা পথে যেতে যেতে হঠাৎ বৃষ্টি নামল বলে তাদের বাংলোয় কবি সমেত ঢুকে পড়ে? এ ধরণের অনেক কথাই ভাবা যায়। ব্রততীও ভেবেছে কিন্তু ভেবে অচল নেগেটিভ প্লেটের মতো দূরে সরিয়ে দিয়েছে। একদিন তার আলোকচিত্রের গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে কবির একটা প্রফাইল ফটো ডেভেলপ করতে করতে ব্রততী ভাবল, কবি আরও দিন পাঁচ সাত থাকছে এখানে। ইতিমধ্যে পায়ে

হেঁটে কবিকে নিয়ে এই পল্লীতেই ঘুরে বেড়ানো যায়। আর তখন কবিকে কখনও তার প্যারাসল, কখনও ভ্যানিটি ব্যাগ বইতে দিতে পাবে। লোকের চোখে পড়াই উদ্দেশ্য। তাবপর যখন ব্রততীব এই বিশেষ ভঙ্গি আলাপের বিষয় হয়ে যাবে পল্লীতে, কবির আতিথ্যেব মেয়াদ শেষ হয়ে সে চলে যাওয়ার পর আলাপে কানে আসবে কোন ড্রয়িংরুমে। তখন ব্রততী বলতে পারবে—সে কী। তোমবা জাননা? বড্ড ভুল হয়ে গেছে—এতো সেই কবি, আমাদেব সুমন্ত্র। আব তখন অনেক প্রমাণও থাকবে। কবির নাম সই কবা দু একখানি বই। কবির দু একখানা ফটো ক্যাসেলেব পটভূমিকায—যা তোমবা কাগজের চতুর্থ শ্রেণীব ব্লকেব সঙ্গে মিলিযে দেখতে পাবো।

মন ঠিক করে ফেলেই ব্রততী কাজে নামতে পাবে।

ডিসি বলল, 'এখন তো পারছি না যেতে তোমাদেব সঙ্গে। তোমরা দুজনেই যাও। পাযে হেঁটে যাচ্ছ?'

এক্ষেত্রে তাই প্রটোকোল। ব্রততী বলল, 'কাজের চাপ পডল যেন।'

'তা দেখো বদলির আভাস যখন পাচ্ছি খেটেখুটে ফাইলগুলো দুরস্ত কবে বেখে যাওয়া ভালো। সুনামটা পাওয়ার চাইতেও রাখা কঠিন।'

সুতবাং ক্যাসলের পাশ দিযে, কখনও পল্লীব ভিতবে, কখনও ব্রেকফাস্টেব পবে, কখনও পডন্ত বিকেলেব আলোয ব্রততী কবিকে নিযে বেড়াতে বেরুল। কবিকে প্যাবাসল বইতে দিলে সে বিব্রত হয না। আর ব্রততীও জানে কি করে বুঝতে না দিয়ে পুরুষকে দিযে প্যাবাসল কিম্বা ভ্যানিটি ব্যাগ বইযে নেযা যায়।

কিন্তু এখনও সেই জজের সেই বিলেত ফেবতেব সঙ্গে মুখোমুখী হওযা হযনি। তাব অন্য ব্যবস্থা। জজের বাংলো এবং ডিসিব বাংলোর পিছন দিক দুটি কাছাকাছি। মাঝখানে দুহাত চওডা সুঁড়ি পথ। দুপাশেই বাগান। জজেব বাগানে ফুলগাছের বেডেব কাছে দাঁড়িয়ে যদি কেউ কথা বলে ডিসিব কিচেন গার্ডেন থেকে তা শোনা যায। মেহেদিব মাথা ছাঁটা বেডাব উপব দিয়ে চোখেও পড়ে এ বাগান থেকে ও বাগান। ফুল বাগানে এসে অনেক সময়ে বসে জজের মেয়ে। বিলিতি কাগজগুলো পড়ে। কেন, লাইব্রেবী নেই বাংলোর? কিম্বা ড্রয়িংরুমে কি লোক গিস গিস কবছে?

ব্রেকফাস্টের পর একদিন ব্রততী বলল, 'চলুন, কিচেন গার্ডেনে কী স্যালাডেব যোগাড আছে দেখে আসি।'

ব্রততী তৈরি হযে এল। সঙ্গে ছোট একটি সুদৃশ্য থলে। হাতে সাদা বঙেব ববাবেব গ্লাবস্, লম্বা সরু কাঁচি।

কবির পাশে চলতে চলতে তাব মনে হল, আর যাই হোক কবিকে নিয়ে চলা ফেবা কবা যায। এমন পবিস্থিতিতে তাকে বিব্রত দেখায না। হযতো এবকম সমাজ সম্বন্ধে দুচাব খানা বই পড়েছে। গল্প উপন্যাসে থাকেও তো। নতুবা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কথা বলতে গেলে হযতো, বেচাবাব এই প্রথম সুযোগ জীবনে।

যা আশা করা গিয়েছিল তাই। কিচেন গার্ডেনে দাঁড়িয়ে ওপারের মেহেদি বেডাব আডালে শুকনো পাতার রঙের চুলের খোপা, চশমার ফ্রেমের একটা পাশ চোখে পডল। খবরের কাগজ উল্টানোব শব্দ হল। ওটা যে টাইমস্ লিটারেরি সাপ্লিমেন্ট জজের মেয়ের হাতে, তা হলপ কবে বলতে পারে ব্রততী। বই না পড়ে একেবারে সদ্য বেরুনো ইংরেজী বই সম্বন্ধে যদি কিছু বলতে হয, তবে টাইমস্ পড়ো, এটা অনেক দিনেব পুরনো উপদেশ।

হাতে গ্লাবস্ এঁটে সরু কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে স্যালাড যোগাড় করল ব্রততী। আব কবির হাতের ঝোলায় ভরলো। একবার সে একটু দূরে চলে গিয়েছিল। মেহেদির বেডার একেবারে পাশে।

সুমন্ত্র, সুমন্ত্র, তীক্ষ্ণ নিটোল অতি উচ্চ কণ্ঠের আর্ততা।

কবি চমকে উঠল।

'কী হল, কী হল।'

হাসি ভয় বিপন্নতায় মিশানো, আদুরে গলায় বলল ব্রততী, 'দেখো, দেখো সুমন্ত্র, আঁচলটা আটকে গেছে কাঁটায়।'

কবি এগিয়ে গেল, আঁচল খুলে দিল। একটু সময় লাগল। বিশ্রী রকমের মেহেদির কাঁটায় এবং লোহার তারে জড়িয়ে গিয়েছিল আচল। ওপারের বাগানে, যেমনটা আশা করা গিয়েছিল, চশমার পাশটা অনেক উঁচু হয়েছিল, খোপার অনেকটাও চোখে পড়ল, মুখ তুললে যেমন হয়।

চলুন আর নয়।'

পথে বলল ব্রততী, ছল করে তার বাধল আঁচল সহকারের ডালে।'

কবি বলল, 'অভিনয়?'

ব্রততী বলল 'ডিসি বলে নি আমার অভিনয় দক্ষতার কথা?'

ব্রততীর চোখে গভীর একটা আনন্দ তৃপ্তির। রিনরিন করে হাসল সে।

কিন্তু ক্লান্তও যেন লাগছে ব্রততীর। বসন্তের উত্তপ্ত বিকেলে যেমন ক্লান্তি থাকে। ক্যাসলের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে ঠোঁট চিবে নিশ্বাস নিল ব্রততী।

সেদিনই লাঞ্চে কবি বলল, 'এবার অতিথির বিদায় নেবার সময় হল।'

ব্রততী বলল, 'গৃহকর্তা ডিসি। তিনি না বললে কি করে যাচ্ছেন।'

গত দুদিন লাঞ্চে ডিসির সঙ্গে দেখা হয় নি। আজ সে ছিল।

কবি বলল, 'এবার যেতে হয় মিস্টার ঘোষ।'

'সে কি? কোথায়?' ডিসি অবাক হল। 'আমি খুবই দুঃখিত কম্পানি দিতে পারছি না। মানে বাড়ের—'

এই বলে ডিসি চাইল ব্রততীর চোখের দিকে ইঙ্গিতের জন্য। কিন্তু সেখানে কোন ভাববৈচিত্র্য নেই। ভাবল ডিসি পরে এক সময়ে জেনে নিলে হবে এ বিষয়ে ব্রততীর আগ্রহ অবসিত কি না। আপাতত বুদ্ধি করেই বলতে হবে। সে বলল, 'তাও কি হয়। এখনও অন্তত এ বাড়িকে স্মরণীয় করার জন্য একটা সনেটও তুমি লেখো নি।'

কবি হেসে বলল, 'সনেট না লিখে ছুটি নেই তবে?'

আলাপের সুযোগ আসায় ডিসি বলল, 'সনেট কিম্বা সনেট গুচ্ছ।'

ব্রততী চুপ করে রইল। কেমন যেন উদাসীন মনে হচ্ছে তাকে।

সুমন্ত্রর একবার এরই মধ্যে মনে হল—এটা কি ব্রততীর পক্ষে আগ্রহের অভাব। সেও তো বলতে পারতো কেন এখুনি যাবেন?

ডিনারে ডিসির থাকবার কথা নয়। কিন্তু পায়ে চপ্পল, হাতে কবোষ্ণ জলে ভেজা তোয়ালে দিয়ে ঘাড় মুছতে মুছতে সে হন্তদন্ত এসে বসল ভিতরে।

'সে কী?' হেসে বলল ব্রততী। আয়াকে আর এক প্রস্থ প্লেটের কথা বলে দিল।

ডিসিকে একটু চপল মনে হল ডিনারে।

ব্রততী তার ঘরে চলে গিয়েছিল। সিগার ধরিয়ে ডিসি বলল, 'বাড়িতে বার নেই, কিন্তু তোমাকে বলতে কি সুমন্ত্র এটা আমার একটা বাজে অভ্যাস। চা দিয়ে পার্টি চলে, দেশ বিদেশের অতিথি এলে টমাটোর রস। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অতিথিকে খুশি করতে হলে—'

'আমার জন্য কিন্তু এরকম কোন ব্যবস্থা করেন নি।'

'কবিবর সুমন্ত্র, এদিকে কি তোমার ঝোঁক আছে? কিন্তু তাই বা কেন, ওটাকে আমি একটা সারপ্রাইজ হিসাবে রাখবো ভেবেছিলাম। কিন্তু কথাটা যখন বললেই এসো আমার স্টাডিতে।

ডিসি উঠে দাঁড়াল, কাজেই কবিকেই উঠতে হল।

যেতে যেতে ডিসি বলল, 'তোমার কাব্যের যদি কোন বিশিষ্ট রং থাকে তবে তা ধূসর নয়? তোমার কাব্যে সব চাইতে ঘন ঘন যে প্রতীক ব্যবহার করো তা ক্রসের, কেমন কিনা?'

কবি বলল, 'লোকে এরকম বলে।'

'তা হলেই দেখো। অবশ্য আমি জানতাম না। দিন তিন হয় শুনেছি।'

স্টাডিতে এসে দাঁড়িয়েছিল তারা।

ডিসি বলল, 'দেখো ওই কোণের ওই যন্ত্রটা। বেশ দেখতে না? গঠনটাই দেখো। মানে ফর্ম। আর ওই দেখো ওই প্যাডেব উপরে রাখা ওই পেপার কাটাব।

হাতে করে পেপার কাটারটা তুলে ধরলো ডিসি। 'চেনা চেনা লাগছে? ওটা বাজা আলফ্রেডেব মূর্তির ডিজাইন থেকে চুরি করা। তরোয়াল আব ক্রসে মিলেমিশে একাকাব।'

এগিয়ে গিয়ে যন্ত্রটার গায়েব সুইচ টিপল ডিসি। এর আগে যেমন সবুজ আলো হযেছিল এখন তেমনি একটা ধূসর আলো দেখা দিল। আর সে ধূসরতা যেন কিছুটা অপ্রাকৃত বোধ হয়। এজন্যই যে আলোটা কাঁপে। ধূসরতা বাড়ে কমে।

ডিসি হেসে বলল, 'দেখলে যন্ত্রটার কেরামতি? এটা তোমাব। আব ওই ক্রসটাও। হাতে কবে দেখো, একটু অসাধাবণই। স্টিলেরই বটে তা হলেও হাতলে জেড বসানো আছে।'

কবি বলল, 'আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেবো বুঝে উঠতে পাবছি না।'

'ধন্যবাদ?' ডিসি ঠা ঠা করে হাসল। 'অতিথি অতিথিই। আব তা ছাড়া এটা আমাব একটা খেলা এই ইলেকট্রিক নিয়ে। বেশ লাগে যেন। বলো, জীবনটাই এমন খেলার মতো ব্যাপাব নয়? সারাদিনেব পর অবশ্য কখনও একটা অবসন্নতা আসে। তা আমি ভেবে দেখেছি সেটা হয়তো নস্ট্যালজিয়া। কিন্তু ব্যাপাবটা কি লক্ষ্য করেছো? আমিও বড একটা করি না। ছেলেপুলেদের অনুপস্থিতির কথাই বলছি।' হাই তুললে ডিসি, 'কিন্তু গুডনাইট। কাল সকালে যদি তোমাদের জন্য একটা ট্রিপের ব্যবস্থা করতে পারি, পাহাড়ে পিকনিক করে এসো।'

ডিসি চলে গেল। তার মুখ যেন মদের কল্যাণে থম থম করছে।

বিছানায় শুয়ে কবি ভাবল একটু। সাতদিনের নিমন্ত্রণ, পাঁচ দিন হয়ে গেল। এখন যাওয়ার কথা ভাবতেই হয়। সনেট লেখার কথা বলেছে। যদি ব্রততীর কোন জর্ণাল থাকে, তবে তাতেই না হয় লিখে দেয়া যাবে। কথাটা মনে পড়ল। সকাল বেলার সেই কিচেন গার্ডেনে সেই নিটোল পরিশীলিত কণ্ঠের উচ্চারণ। আর তারপব ঝক্‌ঝকে হাসিতে বলা সেই ছলের কথা। কিন্তু লাঞ্চের সময়ে তাকে উদাস এবং বিষণ্ণ দেখিয়েছিল, কিম্বা কথাটা বোধ হয় মুডি।

আর বিদায় নেবার কথায় সে তেমন কিছু বলে নি বলে তাকে চিন্তার গুরুত্ব দেয়া বোধ হয় উচিত নয়। অতিথির জন্য নিজের হাতে খুব একটা কিছু করতে না হলেও খানিকটা আঁটসাট হয়ে অস্বাভাবিক হয়ে চলতে হচ্ছে তো তাকে। অবশ্য তার তো মাথা ধরেও থাকতে পারে।

ছেলেপুলের কথা? তার জন্য ব্রততী মুডি হবে এমন মনে হয় না। তাবা কি কনভেন্টে? দুরকম অর্থই করা যায় ডিসির কথা। আর এ ভেবেই বা কী হবে? ডিসি যাকে নস্ট্যালজিয়া বলেছে তা যদি সত্যি সত্যি কখনও সে বোধ করে থাকে, তবে তারা কি আর চেষ্টার ত্রুটি রেখেছে? কনসাল্ট করতে গিয়ে হয়তো ওদের সব রকম শাস্ত্রই জানা হয়ে গিয়েছে।

কবিরা এক চিন্তা থেকে অন্য চিন্তায় যেতে অভ্যস্ত! সে ভাবল বর্তমান ক্ষেত্রের কথা ছেড়ে দিলেও বলা যায় এ বিষয়ে মানুষ এখনও সেকালের মতোই ক্ষুধার্ত। আমেরিকায় আজকাল আর্টিফিসিয়াল ব্যবস্থা নাকি হচ্ছে। আর সে ব্যবস্থা নীতিসংক্রান্ত অনেক কিছুকেই উল্টে পাল্টে দিতে পারে।

কবির ঘুম ভাঙতে দেরী হয়েছিল, অন্তত তাই তার মনে হল। কারণ মৃদু কড়া নেড়ে কেউ ডাকছে। দরজায় বাইরে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে আয়া বলল, ব্রেকফাস্টের জন্য কি নীচে যাবেন? না—'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমি দুমিনিটেই যাচ্ছি!'

মিনিট পনেরো পরে নীচে গিয়ে কবি দেখতে পেল ডিসির ব্রেকফাস্ট হয়ে গিয়েছে।

ডিসি বলল ন্যাপকিনে মুখ মুছতে মুছতে, 'বসো সুমন্ত্র, আমার একটু তাড়াতাড়ি।'

'সবি, আমাব বড্ড দেরি হয়ে গেছে।'

'সে এমন কিছু নয়। আমিই বরং মিনিট পনেরো আগে—'

ডিসির খুব তাড়াতাড়ি ছিল বোঝা যায়। আব এটা স্বাভাবিকই। কবিও তাই ভাবতে চেষ্টা করল। এমন একজন নামকরা সিভিলিয়ানের পক্ষে এটা একটা হলিডে মুড ছিল তার এ কয়েকদিন।

ঘোষ সাহেবকে দবজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল ব্রততী।

ফিরে এসে দেখল কবিও ডাইনিং রুমের ব্যালাস্ট্রেড থেকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে দেখছে।

ব্রততী টক্ টক্ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছে। একটু হাঁপাচ্ছে সে।

বলল সে, 'এখন কী করবেন ভাবছেন। ভালো কথা, ডিসি বললেন এইমাত্র, আজ আপনার যাওয়া হতে পারে না কারণ ডিসির ফিবতে অনেক দেবি হতে পারে। আর কাল হয়তো ডিনারে কাউকে কাউকে বলবেন।

কবি বলল, 'তা হলে পরশু দিনটাই ঠিক রইল।'

ব্রততী বলল, 'তাই করতে হয় তা হলে।'

'ভালোই হল। ইতিমধ্যে সনেটটাও শেষ করে ফেলবো।'

ব্রততী হাসল।

'হাসলেন যে?'

'ভাবছি, সত্যি কি আপনি একজন বড় কবি?'

'এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'মানে আমরা যখন কেউ থাকবো না। তখনও কি আপনার নাম অনেকের মনে থাকবে?'

'থাকবে হয়তো,' কবি বলল। তারপরে যোগ করল, 'অন্তত কিছুদিন।'

'আমি কিন্তু আপনার কবিতা এর আগে কোন দিনই পড়িনি।'

'তাই নাকি? অথচ এমন ভাবে অতিথি করে রেখেছেন।'

'সে সব—' ব্রততী ঝিক্‌মিক্ কবে হাসল।

কবি বলল, 'কিন্তু আপনার জর্নালটা দেবেন? একটা সনেট সত্যি লিখবো।'

'কোন ছলের কথা লিখবেন না তো?'

'নাবী কি শুধু ছলনাময়ী? দুঃসাহসিকতা, মর্যাদাময়ীও বটে।'

'তাও ভালো।, ব্রততী হাসল। সিগারেট কেসটা ছিল কাছের টিপয়ের উপরে। সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'আপনার কবিতা এতদিন না পড়লেও, কাল কয়েকটি পড়েছি।'

'ভালো লেগে থাকলে ধন্য হবো।'

'সাধারণের সঙ্গেই আমার মত মিলিয়ে দিতে পারি।'

'কি সেটা?'

'ধূসর রঙের চরাচরে কালো ক্রস পোঁতা।'

কবি হাসল। বলল, 'কিন্তু বড্ড সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।'

গলায় এক ছড়া নতুন ধরনের হার আজ ব্রততীর। আঙুল দিয়ে পাকাতে লাগল সে। উঠে দাঁড়াল সে এর পরে। বলল, 'জর্নাল পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু কী লিখবেন সনেটে? ওটা

একটা অভিনয়ই। তার কারণ অবশ্য বলতে পারছি না।'

সিগারেট ধরা ধবধবে আঙুলের সূচলো নখগুলো চোখে পড়ল কবির যখন ব্রততী পর্দা সরাল।

দুপুরে ব্রততী এল কবির ঘরে। বলল, 'এখানেই লাঞ্চ দিতে বলেছি। গল্প করা যাবে। কখনও কখনও এ বাড়িটায় বড় একলা একলা লাগে। বিশেষ করে ডিসি যখন কোন দূরের টুরে বেরিয়ে যায়।'

আয়া চাকরের সাহায্যে লাঞ্চের ব্যবস্থা করল সে ঘরে।

লাঞ্চ চলতে চলতে ব্রততী বলল, 'আপনি যে কেন বিষণ্ণ তা বোঝা যায় না। আপনি কি জানেন আপনার মুখের চেহারায় বরং একটা হাসি হাসি ভাব আছে। আপনার প্রফাইলের একটা এনলার্জ কপি দেবো আপনাকে।'

'তা হবে হয় তো।'

'আমি কাল একটা মজার কথা ভেবেছি। ডিসি অন্তত কখনও কখনও ছেলেমানুষের মতো আনন্দ করতে পারেন, যেমন ধরুন তার এই ইলেক্ট্রিকের যন্ত্রপাতি নিয়ে। আপনি সব সময়েই গম্ভীর। আপনার অনুভূতিতে নিশ্চয় প্রগাঢ়তা আছে, ডিসির বিজ্ঞান-চিন্তাতেও। এ দুই ধরণের মধ্যে কোনটা গভীরতর?'

'বলা কঠিন। ডিসির খেলাটা মন্দ নয়। জীবনের অনেক কিছুই বোধ হয় খেলা। কখনও কখনও এ রকম অনুভব আমারও হয়—বিজ্ঞান, রাজনীতি সবই তো খেলা। ইতিহাস নিয়ে আমরা কত কি বলি। যাদের সম্বন্ধে বলি তারা যদি ফিরে আসতো, বলতো, কী বলছো ছেলে মানুষের মতো, কিছুই জানো না আমাদের সম্বন্ধে।'

'তা হয়।' বলল ব্রততী। বেল টিপল সে। আয়া এলে বলল, 'কফি।' আয়া চলে গেলে বলল, 'আপনি যদি জীবনটাকে খেলা বলেই নিতে পারেন তবে অমন ধূসর বিষণ্ণ কবিতা লেখেন কেন?'

'কি জানি।' কবি হাসল, 'আমার মধ্যে যে খেলোয়াড় সে বোধ হয় রং কানা।'

ব্রততী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'পাঠিয়ে দেবো জর্নাল।'

আজ বাইরে যাওয়ার কোন প্রোগ্রাম নেই। কবি বিকেল লাইব্রেরীতে বসে কাটাবে স্থির করল। জর্ণালের পৃষ্ঠায় যদি পারে সনেট-টাও লিখবে।

একবার ব্রততী দরজা পর্যন্ত এসেছিল। বলল, 'একটু বাইরে যেতে হচ্ছে আমাকে।'

'ঘুরে আসুন।'

ব্রততীর হাতের টেনিস র‍্যাকেটের একটা কোণ দেখা দিয়েছিল। মোটরের শব্দ মিলিয়ে গেলে কবি ভাবল—এটা না হলেই অবাক হতুম। কিন্তু স্বগতোক্তি করতে হল তাকে—টেক ইট্ ইজি। মনের গভীরে নেয়ার কী আছে? অবশ্য টেনিসটা আজ আর কালকের দিনটা বাদ দিয়ে হলেও চলতে পারতো। কিন্তু কবি এই অবসরে তুমি সনেটটাও লিখে ফেলতে পারো। অতিথি হিসাবে কেমন লাগে, তাই নয়?

সন্ধ্যায় উঁচু তরল হাসিতে কবি অবাক হল।

'একি করেছেন?' বলে ব্রততী ঘরে ঢুকল।

কবি সম্বিত পেল। ডিসির খেলনা সেই ধূসর আলোটা জ্বলছে তার ঘরে। আলোটাকে নিবিয়ে দিয়ে কবি বলল, 'আসুন। ডিসির এটা বেশ জিনিষ। উপহারটা আমার মনে লেগেছে।'

ব্রততী বলল, 'একটা গল্প মনে পড়ছে, স্যালামান্ডার নামে এক রকমের টিকটিকি নাকি বিসুবিয়াসের গর্ভে জ্বলন্ত আগুনে বাস করে। আগুনে তাদের শরীর তৈরি, আগুনই খায় তারা।'

'এই ধূসর রংই আমার জীবনের উপাদান বলছেন?'

ব্রততী খিলখিল করে হাসল। তার দুহাতের মধ্যে র‍্যাকেটটা ঘুরলো। খাটো করে পরা শাড়ি।

পায়ের গোছাটা চোখে পড়ছে।

আয়া এল চা নিয়ে।

তার হাত থেকে চা নিয়ে বলল ব্রততী, 'আর কই'।

কবি বলল, 'আমি খেয়েছি এখনই।'

টেনিস র‍্যাকেট নিয়ে আয়া চলে গেলে, ব্রততী বলল, 'আয়াটি ভাল। মনে রেখে কাজ কবতে পারে।'

'আপনাব ব্যবস্থা নিখুঁত সন্দেহ কি?'

ব্রততী বলল, 'তার চাইতে আপনাব এই ধূসরতার গল্প হ'ক। আপনি ধর্মে খ্রিস্টান নয়, অথচ—'

'দেখুন ক্রসে আত্যন্তিক বেদনার মধ্যে একটা আশার রেখা যেন আছে। যাকে ওরা মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান বলে।'

'কিন্তু পৃথিবী কি সত্যি এমন বিষণ্ণতায ভরা?'

'কি জানি হয়তো আমার অনুভূতিতে ত্রুটি আছে।'

'শুধু আপনার হলে তা বলা যেতো, অন্য অনেকেও বলেছে।'

'তা বলেছে বৈকি।'

'ওঁরা বলেছেন যাকে আদিম পাপ বলে তার মূলে যাই থাক তা থেকেই বিষণ্ণতার সৃষ্টি, বুদ্ধও পৃথিবীকে বিষণ্ণই দেখেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করুন সবাই তা দেখে না।'

'এজন্যেই তাঁরা অসাধারণ।'

'কিন্তু এর অন্য একটা দিকও আছে।' বলল ব্রততী, 'কিন্তু এমন যুক্তিসিদ্ধ দার্শনিক মতও আছে যে মানুষ প্রচণ্ড দস্তুর জীব। যেন তেন প্রকারে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া তাব পক্ষে স্বাভাবিক। সে পরার্থে আত্মোৎসর্গ কদাচিত করে। করলেও তা স্বাভাবিক নয়। পরাজয়ের সে প্রতিশোধ নেবেই।'

কবি বলল, 'কিন্তু পরাজয় কি কখনও কখনও মহৎ করে না।'

'তা কি সত্যি মহৎ? এর জবাব না পেলে বলা যাচ্ছেনা। আপাতত বোধ হচ্ছে মানুষ দুঃখেব কথা বলতে আর শুনতে ভালোবাসে। তার প্রমাণ হাতের কাছেই আছে।'

'আমার কবিতা?'

ব্রততী হেসে বলল, 'উঠি এখন।'

সে চলে গেলে কবি ভাবল, ব্রততীকে এখন প্রাণপূর্ণ দেখাচ্ছে। এমন কারো কাছে পৃথিবীকে বিষণ্ণ লাগার কথা নয়।

ডিনারে ডিসি এলনা।

কবি বলল, 'ডিসি কখন ফিরবেন জানেন কিছু?'

'খবর পেলাম, সত্যি দাঙ্গা লেগেছে। আর দাঙ্গাটা না মিটলে ডিসি ফিরতে পারবেন না। কিন্তু এর চাইতে আমাদের সন্ধ্যার আলাপটা চালিয়ে যাওয়া ভালো।'

কবি বলল, 'ক্রাইষ্টের কথা কি বলবো বলুন। এমন বেদনাই বা কার জীবনে আসে, এমন মহৎভাবে বেদনাকেই বা কজন অতিক্রম করে?'

'আমার কি মনে হয়, ক্রাইস্ট স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন না। অস্বাভাবিক বলেই অসাধারণ। স্বাভাবিক মানুষ এত স্বাভাবিকভাবে বাঁচে যে তার জীবনে আবিষ্কার করার কিছু থাকে না।'

কবি হাসল।

ব্রততী বলল, 'স্বাভাবিক জীবনে সত্যি কি গভীরতা থাকতে পারে? কিম্বা মূল্যবান কিছু? তা কি খেলার চাইতে বড় কিছু?'

কবি বলল, 'হয় তো আমিও জানি না।'

ডিনার তখন শেষ হয়েছে। ব্রততী বলল, 'রাতটা ঘন অন্ধকার।'

'আলোয় আলো হয়ে আছে তো।'

'দরজার বাইরে দেখুন, যেখানে আলো শেষ হয়েছে, কী রকম অন্ধকার।'

'তা বটে।'

ব্রততী সিগারেট ধরাল। বলল 'খুব.বড় বড় কথা খানিকক্ষণ বললুম। আপনার কবিতা পড়েই। আপনার সনেটটা এখনও পড়া হয় নি অবশ্য। আমাদেব মতো সাধারণ লোকেব জীবনে লিখবার মতো কি পেলেন জানতে কৌতূহল হচ্ছে না, এমন নয়।'

'সাধারণের জীবনও কবিতার মতো অপূর্ব হতে পারে।'

'হয় নাকি? আপনি দুঃখের কবি। আমাকে দেখে কী দুঃখ হল জানি না। অবশ্য দু'একজন বলেছে। তাবা বর্ষিয়সী। কিন্তু সত্যি সেটা এমন কিছু দুঃখের নয়। হয়তো যেমন অনেকের এই রাত্রিতে একা একা বোধ হলেও হতে পারে। কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে না বাইরের অন্ধকারকে। কিন্তু এই বাড়িটাই বোধ হয় প্রয়োজনেব চাইতে বড়।'

কোন কোন রাত্রির বয়স সহজে বোঝা যায় না। কবি তার টেবিলে বসে লিখছিল ব্রততীর জর্নালে। বিকেলেব লেখা সনেটটাতে সে কাটাকাটি করেছে। পড়ে দেখেছে তার ফলে আর একটু যেন ভালো হয়েছে। সেটা কপি কবা হয়েছে জর্নালে। কিন্তু কাটাকাটি করে যে কথাগুলো বাদ দিয়ে ফেলেছে তা থেকেই নতুন একটা সনেট জন্ম নিচ্ছে। তাই স্বভাব মতো লিখবার আগে নিঃশব্দ পাযচাবি কবে ফিরছিল সে। ডিসির উপহাব সেই ধূসব আলোটা জ্বালিয়েছে সে। বাস্তবিক এ লেখা তার মনোহরণ করেছে।

যেন শব্দ হল। কিম্বা সেটা কবিব ধাবণা।

সে দেখল ব্রততী এসে দাঁড়িয়েছে ঘরেব মধ্যে। কেমন অদ্ভুত করে হাসল ব্রততী।

'কিছু হয়েছে?'

'কই, না। ঘুম হচ্ছে না।'

'অনেক' রাত হল না? বসবেন?'

'বসি।'

ব্রততী বসল। বলল, 'এমন কখনও হয না। ডিসি কখন ফিববেন কে জানে। সত্যি সেখানে কিছু হয়েছে। আর এ ভেবে ভেবেই আমার স্নায়ুগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছে।' আবার অদ্ভুত করে হাসল সে।

'কিন্তু এখন অনেক রাত হল, অনেক বাত।'

'সনেটের লাইন?'

কবি এসে দাঁড়াল ব্রততীর সামনে।

'কাল সকালেই আমি যাচ্ছি।'

'তাই তো স্বাভাবিক।'

'আপনার চোখ দুটি যেন হীরা।'

'আ—'

'ভাবছি কোন দরজা দিয়ে আপনি এসেছেন। সব কটাইতো বন্ধ।

'একটা বোধ হয় ওদিক থেকে খোলা যায়। আর সেটা খুলে এসে, অভ্যাসবশেই হয়তো বন্ধ করে দিয়ে থাকবো।'

'দ্বিতীয় একটা সনেট লিখবো।'

'ও। কেমন অদ্ভুত লাগছে না?'

'নিচে কারো কারো পায়ের শব্দ।'

'আয়া, হয় তো বাবুর্চি। তাতে কি হয়েছে।'

'ব্রততী, ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে তোমার?'

'ঈশ্বর!' ব্রততী হাসল নিঃশব্দে যেন। 'আমাকে কাঁপিয়ে দিয়েছো। আমার ভয় করছে।'

'আমরা একা। আমরা একা।'

'কে যেন সিঁড়িতে হাঁটল না?'

'হয় তো আয়া। কিন্তু ওরা কি প্রভুদের নিয়ে গল্প করে?'

'কি বলছো বুঝতে পারছো না।'

সুমন্ত্র ব্রততীর কাঁধে হাত রাখল। 'রাত্রিটা অদ্ভুত!'

'ডিসি কেন ফিরছে না কে জানে।' ফিস ফিস করে বলল ব্রততী।

'তোমার এই হাত দুখানা—'

ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল ব্রততী। নিজের পায়ের কাছে নিজের ছায়াটাকে যেন সে খানিকক্ষণ দেখল।

'যাচ্ছ?'

'দাঁড়াও দেখে আসি। মনে হল করিডরে কারো পায়ের শব্দ।'

'যেয়ো না।'

'সুমন্ত্র, কাল সকালে তুমি যাচ্ছ।'

'দেখে আবার আসবে?'

ব্রততী নিঃশব্দে দরজা খুলে বার হল। আশ্চর্য!

কবি বেরিয়ে এল তার পাশে পাশে।

বলল সে, 'অদ্ভুত থাকে এক একটা রাত্রি।'

'অত আস্তে কথা বলছো কেন?'

'কেউ নেই। ঘরে ফিরে যাই চলো।'

'আবার ঘরে?'

ঘরে ফিরে এল তারা।

কবি দরজাটা বন্ধ করে দিল।

'বন্ধ করে দিলে?'

'ক্ষতি কী?'

'না—না।'

'ভয় পাচ্ছ?'

ব্রততী হাসল। 'তার আগে তোমার ধূসর আলোটা আবার জ্বালবে? তখন যেন কেমন অপ্রাকৃত দেখাচ্ছিল তোমাকে।'

কান্নার মতো ঢেউ তোলা নিস্তেজ হাসি।

ফিস ফিস করে ব্রততী বলল, 'এস পাশাপাশি বসি আমরা তার চাইতে।'

কবি বলল, 'কী জানি?'

'কী?...আচ্ছা কবি, পৃথিবীতে কি সুন্দর নেই?'

'হয় তো তুমি।'

'শ্'। সিগারেট আছে? দাও না তোমার কেস থেকেই একটা।'

সিগারেট ধরালো না ব্রততী। হাতে করে অন্যমনস্ক হয়ে রইল।

'সুমন্ত্র, আমি একটু নিচে যাবো। একটা ফোন করা দরকার।'

ব্রততী উঠে দাঁড়াল।

'আবার আসবে।'

'রাত প্রায় ভোর হয়ে এল। এবার তুমি ঘুমোও।'

ব্রততী নিচে নেমে এল। সিঁড়িতে ছায়া ফেলা আলো জ্বলছে। করিডেরও। আয়াকে দেখা গেল। ঘুমুচ্ছে সে টেবিলে মাথা রেখে।

প্যানট্রির পাশে বাবুর্চি টুলে বসে। পায়ের শব্দে সে চোখ তুলে তাকাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধও করল।

কী করবে ব্রততী এখন? আ—কী করবে সে?

প্যানট্রিতে ঢুকল। আলমারির দরজা খুলে দেখল বাসনপত্রগুলো ঝক ঝক করছে মৃদু আলোতে। কাঁটা চামচ ছুরি।

রান্নাঘরে ঢুকল সে। কয়লার উনুনটা আবার নিবে এসেছে। সরে এসে সুইচ টিপল আর ইলেকট্রিকের হিটারটা তখনই লাল হয়ে উঠল।

মনে হল কথাটা। প্যানট্রিতে ফিরে এসে, সে দেখল রেফ্রিজারেটরকে পরীক্ষা করে। আর ঠিক তখনই মনে হল তার—কেন? কেন? কেন এমন? সেই নববিবাহিতার অবিবেচনা।

ফোন করতে হবে। ফোন করে কী হবে? বা-বা কী বোকা তুমি? ফোন করে খোঁজ নিতে হবে ওদিকের দাঙ্গা মিটেছে কিনা। স্বামী বাড়িতে না ফিরলে কি স্ত্রীর মনে চিন্তা হয় না?

রান্না ঘরেই আবার ফিরল সে। কয়লার উনুনের পাশ দিয়ে যে গরম পাইপটা গিয়েছে উপর তলার তার একটা ট্যাপ আছে এ ঘরেই। কলটা খুললো সে। ঝর ঝর করে জল পড়ল। জলটা স্নানের মতোই গরম আছে। ডিসির বাথরুমে এ জলটা গিয়েছে। বলো না কেন ঘটল? আকৃতিতে সামঞ্জস্য সাহস দেয়?

ব্রততী নিচের তলার ড্রয়িংরুমটা পার হতে দেখল, সেই ঘরের কোণেই চেয়ারে ব'সে টেবিলে মাথা রেখে আয়া ঘুমিয়ে আছে।

'কবি।'

'এসো।'

'কেন বলো তো?'

'কী?'

'মনে পড়ছে না। আমার মনে হচ্ছে—হ্যাঁ, তা এখন গভীর কিছু আলোচনা করা ভালো। মানুষ কেন অসাধারণ হয় বলো তো?'

'পূর্বপুরুষ থেকে অসাধারণত্ব সঞ্চিত হয়ে আসে নাকি?'

ব্রততী হাসল। 'না কি অস্বাভাবিক বলেই? তুমি কি লক্ষ্য করেছো ক্রাইস্টের জন্ম। হ্যাঁ তাই বলছি। সমাজের চোখে সেটা কী ছিল? কারো কারো মনে কি অতিপ্রাকৃতে অবিশ্বাস ছিল না? হয়তো সেই মর্মবেদনাই ক্রাইস্টকে মহান করেছিল।'

'একথা মনে পড়ছে কেন?'

'জানিনা, জানিনা।'

দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল যেন ব্রততীর।

কবি ভাবল জীবন কেন বিষণ্ণ হয়। বলল সে 'বসো।'

'কিন্তু তুমি ডিসির ধূসরখেলার প্রেমেই পড়ে গেছ। মেসিনটা নিয়ে খুট-খাট করছো। আব হাতে বুঝি সেই ক্রসটা।'

'এটা সুন্দর।' আলোটা জ্বালল কবি। এক ঝলক ধূসবতা যেন ঝিলমিল করে উঠল। হাতের পেপার কাটারটার দিকেও চোখ পড়ল। বেশ বড়ই বটে। ফলাটাকে মুঠ করে ধরলে মনে হবে একটা ক্রসকেই ধরে আছো। আর ক্রসটাকে হাতল হিসাবে ব্যবহার করলে একটা তরোয়াল যেন। তরোয়ালকেও কখনও কখনও প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছে নাকি সে? কিন্তু আলোটাই অবাক করার মতো। এমন ধূসরতা কি সত্যি তৈরি করা যায়? কেমন সুন্দর যেন দীর্ঘ নিঃশ্বাসেব মতো। আকৃতি কথাটাকে প্রায় ব্যবহার করাই যায়। কবিব মনে পড়ল ব্রততী বলেছিল, ধূসব তাব জীবনের উপাদান। ইংরেজীতে বোধ হয় এলিমেন্ট বললে, আরও পরিষ্কাব হয়ে ওঠে।

'সুন্দর কেন বলছ?' ব্রততী জিজ্ঞাসা করল।

'সু দর এর গঠন। এই বর্তুলের আভাস ধরা অর্ধ—সামঞ্জস বক্রতা। ডিসি ফর্মেব কথা বলেছিল।'

ক্রসটা দিয়ে মেশিনের উপরের বড় নবকে স্পর্শ কবে দেখাল কবি।

'সুমন্ত্র, কথা বল, অনেক অজস্র কথা।' বলল ব্রততী।

কবি ভাবল, সুন্দর কী? এই বর্তুলতায়, রেখার বঙ্কিমতায় যে বৃত্ত ধরা দেয তার আভাস?

সে ভাবল তার কবিতায় কেন এত বেদনা? কেন অস্বাভাবিকতা, যদি তা বল। সেই অস্বাভাবিকতার কথাই?

সে ভাবল, পুরুষের সব ভাস্কর্যে, তার শিল্পের সব গঠনে এই বর্তুলতায সুন্দবকে ধবেছে।

কথাটা হঠাৎ তার মনে আসে তাই? সেই রমণীব স্তনের বর্তুলতা? সব সৌন্দর্যের মূলে? মনে হল কবির, সে যেন দেখবে মেশিনের গায়ে বসানো উল্টে রাখা প্লাস্টিকের বাটিটাব নিচে কি সৌন্দর্য আছে। হাতের ক্রশটা দিয়ে চাড় দিযে দিয়ে সে বাটিটাকে তুলতে চেষ্টা করল। আব, আব তখন তার চেতনা যেন সৌন্দর্যের মূলে পৌঁছে যাওয়াব চেষ্টাই করছে।

এই সুমন্ত্র, ওটা হাই ভোলটের, এই সুমন্ত্র খুলো না আর।

হঠাৎ কুঁক করে একটা শব্দ হল। সুমন্ত্র যেন শিউরে উঠে কিছু বলতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মেশিনের আলোটা দপ করে জ্বলে উঠে নিবে গেল। অদ্ভুত তীব্র সাদা আলো ধূসবের মেসিন থেকে।

ব্রততী বলল, 'কী হল?'

কবির মাথাটা ঝুঁকে পড়ল যেন একটু। তার হাতের ক্রসটা বাটির নিচে একটা তারকে স্পর্শ করে আছে।

ব্রততী তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

কী করবে সে? কী করবে?

ফোনের কাছে গিয়ে ফোন তুলে নিল।

কেন যেন পুলিশের কথাই মনে হল তার।

'কে পুলিশ সাহেব? হ্যাঁ, আমি মিসেস ঘোষ।'

'এই মাত্র ফিরেছি আমি। ডিসির গাড়ি আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল। হয়তো বা এতক্ষণে আপনাদের বাংলোয় ঢুকছে।'

ব্রততী ফোন ছেড়ে দিয়ে তর তর কবে সিঁড়ি দিয়ে নামল ড্রাইবে। অন্ধকার। না, না। ওই তো গাড়ির হলুদে আলো।

গেট খোলাই ছিল। দারোয়ান উঠে দাঁড়াল।

ব্রততী গেটের মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঘ্যাস করে ব্রেক কষে ঝাঁকি খেয়ে গাড়িটা থামল।

'কী কাণ্ড! তুমি?' ডিসি গাড়ি থেকে নেমে ব্রততীর পাশে এল।

আর ব্রততী তার দু' কাঁধে হাত রেখে জড়িয়ে ধরল তাকে। ডিসির ঠোঁটের অধরে অজস্র চুমু দিতে লাগল সে। দারোয়ান ড্রাইভারই বরং সরে গেল।

'আ, ডার্লিং, নার্ভাস হয়েছো কেন?' বলল ডিসি।

'আমার ভয় করে না?'

'ভয় কেন করবে? এবার তবু তো বাংলোর চাকর বাকব ছাড়াও একটি ভদ্রপুরুষ ছিল।'

'কী যে বলো, তার ঠিক নেই।'

ডিসি ব্রততীর কোমরে হাত দিয়ে হাঁটতে লাগল। বলল, 'বেশ লাগছে এই ক্লান্তি। দাঙ্গাটা বেড়ে ওঠার আগে থামানো গিয়েছে। কী বিপদ যে হতে পারত। মেয়েদের কথা ভাবছি। আর শিশুদের। ভয় পেয়ে তারা কি রকম করে চাইছিল। রক্ষা পেয়েছে শিশুরা।'

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ল ডিসির। তার স্ত্রীর সন্তান নেই।

সে বল্লল, 'এখন একটু গরম জল চাই স্নান করার।'

'ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি?'

'খাবো না। খুব ভোবে ঘরে ব্রেকফাস্ট দিতে বল। কবির যাওয়ার কি হল? সখ মিটেছে তো তোমাব। কবির ঘরে ওরকম আলো কেন? জেগে আছে নাকি? সাদা পড়াব আলো যেন জ্বলছে।'

'কি জানি কী হয়েছে। তাতেই আরও নার্ভাস হয়ে পড়েছি।'

'অদ্ভুত লাগছে।'

'তবে চলো আগে ওদিক থেকেই ঘুরে আসি।'

ডিসি বুঝতে পারল, বলল, 'আনফরচুনেট। স্যাড। কিন্তু এখনই কি পুলিশকে খবর দেবো?'

'কেন এমন হল? কিছুক্ষণ আগেও তো আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন।

ডিসি মেসিনটাকে চোখ দিয়ে পরীক্ষা কবল।

'বাটিটাকে খুলবার কী দরকার ছিল! ইচ্ছা করে চেষ্টা করে না খুললে অমন খোলে না। আশ্চর্য! ভাবতে আশ্চর্য লাগছে। তোমার একটা খেয়ালের খেলায় ও এসেছিল এখানে। স্যুইসাইড?'

'স্যুইসাইড?' অর্থহীন দ্বিরুক্তি করল ব্রততী।

'দেখো ব্রততী, কবির জীবনে সুখ ছিল না, তা তাব লেখাতে পেয়েছো। অনেক সম্মান সত্ত্বেও। বলবো কি তোমাকে কথাটা? কি করে জানলাম তা তুমি জিজ্ঞাসা করো না। ওর মামাবাড়ি আমাদের বাড়ির পাশেই। মনে করো সেই বাড়ির একটা মেয়ের বিয়ে হল। বিয়ের পর সেই গ্রামে সে ফিরেছে নতুন শ্বশুরবাড়ি থেকে। পাড়ার একটা ছেলের সঙ্গে আলাপ ছিল--ছেলে বেলার সঙ্গী। সে গিয়ে সেই সদ্যবিবাহিতা মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতো কখনও কখনও। শুনেছি সে বাড়ির গিন্নির নিচের তলায় বসে কাজ করতে করতে হঠাৎ এক দুপুরে মনে হল কী যেন ভেঙে গেল, ধ্বংস হল। তরতর করে সিড়ি বেয়ে উপরের ঘরগুলি দেখবার জন্য তিনি ছুটে এলেন। কেউ কোথাও নেই। বাড়িতে লোকসংখ্যা এমনি কম। পুরুষরা অফিসে। বাড়ির ঝিটিও দুপুরের ছুটি নিয়ে বাড়িতে। তারপরে তার নতুন বিয়ে হওয়া মেয়ের ঘর বন্ধ দেখে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দরজায় করাঘাত করতে গিয়ে আধখোলা জানালায় চোখ পড়ল তাঁর। নিঃশব্দে নিচের তলায় ফিরে গেলেন তিনি। লজ্জা? না বিমূঢ়তা? সে যাই হক, তার মেয়ে আর কোনদিন শ্বশুরবাড়ি যায় নি। আর সে ছেলেটিও তারপর কোথায় চলে গেল আজও জানা যায় নি। কারও দোষ ছিল বলে মনে হয় না। সে যাই হক এভাবেই সুমন্ত্র পৃথিবীতে এসেছিল।'

'অবৈধ?'

'আ—এখন আর বলে কী হবে? কবি হয়তো কিছু আন্দাজ করে থাকবে। কিম্বা স্পষ্ট জানে নি।'

'তাই?'

'কিন্তু বিষণ্ণ ছিল সে স্কুলের পড়ার সময়েও।'

কথাটা হঠাৎ বলল ব্রততী, 'ডিসি, ডিসি',

'দুঃখের কথাই বটে। গেষ্ট তো। আর এ নিয়ে কেলেঙ্কারীও হবে কিছু।'

'কিন্তু হয়তো আমিই ওকে মেরে ফেলেছি।'

'সে কী? কেন বলছো?'

ডিসি কবির দিকে চাইলো। বিছানাটাও চোখে পড়ল তার। ব্রততীর মুখের দিকে চাইল সে। ব্রততীব চোখের নীচে গোল হয়ে কোমল কালো একটা দাগ পড়েছে।

আর ঠিক তখনই ব্রততীর খোপা খুলে গোছা চুল আলগা হয়ে ভেঙে পড়ল তার কাঁধের উপরে।

ডাউন কিউল প্যাসেঞ্জারে

কিউল প্যাসেঞ্জার থেকেই এই গল্পটা পেয়েছিলাম। সেদিক দিয়ে বলতে গেলে একে গল্প বলা যায় কিনা এমন কথা উঠতে পারে, কারণ বাস্তবকে কথায় ফুটিয়ে দেযাই আর্ট কিনা এ নিয়ে তর্ক আছে। সে যাই হক, ঘটনাটার বিবৃতি দেয়া যাক।

কিন্তু কোথায় আরম্ভ করা যাবে? গোড়া থেকেই। আমি সেবারে কিউল প্যাসেঞ্জারে কোলকাতা যাচ্ছিলাম। সঙ্গে বিরিঞ্চি ছিল। সময়টা বোধ হয় পুজোর কিছু পরে। মনে পড়ছে বাইরের প্রকৃতি দুপুরেও ততটা উত্তপ্ত ছিল না ঋতুর গুণেই, কিন্তু আমাদের সেই ছোট কামবায় যাত্রীব ভিড়ে একটা গুমোটেব ভাব দেখা দিয়েছিল। একটা ছোট ক্লাস টু কামরা—এত ছোট যে কেন এমন তৈরি কবা হয়েছিল ভেবে পাওয়া যায় না। তিনখানা বেঞ্চ—তিন না বলে বরং আড়াই বলাই উচিত। দুটো পাশাপাশি, আর তাদের মাথার দিকে আড়াআড়ি ছোট তৃতীয়টি। দরজার উপরে দেয়ালের গায়ে লিখিত নির্দেশ : দশজন বসিবে। কম করেও আমবা জন বার তের ছিলাম।

নিজেব দুই হাঁটুর উপরে কনুই বেখে ঝুঁকে পড়ে কাগজে মন হাবিযে দেবার চেষ্টা কবছিলাম—সোজা হয়ে বসলে ট্রেনেব ঝাঁকুনিতে দুপাশেব যাত্রীদেব সঙ্গে গায়ে গায়ে ঘষে যাচ্ছে। মুখ তুলতে গিয়ে পাশের যাত্রীব কনুইএব গুঁতো খেলাম। কিন্তু বিরিঞ্চির উপবে বিবক্ত হতে পারলাম না। কাবণ সে আমাকে খাতিব কবে। সে সাহিত্যটাহিত্য করে। কথা না বলে থাকতেও পারে না। আর তা ছাডা সে বোধ হয় লজ্জাই অনুভব করছে কিছুক্ষণ আগে যা ঘটেছে তার জন্যে।

'এটা কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তৈরি।' সে বলল।

'কামরাটার কথা বলছ?'

'বলছিলাম এককালে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হয়েছিল। এটা সাবেকী সেকেন্ড ক্লাস। মধ্যবিত্ত সাহেবসুবোরা যাতে গোটা কামরা রিজার্ভ করতে পারে তার জন্যই এমন সব ছোট মাপের ফার্স্ট সেকেন্ড ক্লাস কামরা তৈরি হতো। সেকেন্ড ক্লাস উঠিয়ে দেয়ার পর এটাকে ক্লাস টু করেছে।'

'তা হলে আভিজাত্য আছে বলো?'

'না কি তার ঐতিহ্য?' বলল বিরিঞ্চি।

'যা তুমি বলো।'

আমাদের ঠিক সামনের যাত্রীটি বলল, 'কথাটা মিথ্যে নয়, মশায়, আমাদেরই হযেছে গেরো। জমিজিরাত সব কেড়ে নিল। চাষী হয়েছি বলতে পারেন। কিন্তু থার্ড ক্লাসে চড়তে এখনও—। তবে হবে, একদিন তাও হবে, একদিন তাও সয়ে যাবে।'

বিরিঞ্চি আমার চোখে চোখে কিছু বলার চেষ্টা করল, কিন্তু আমি চোখ ঘুরিয়ে নিলাম। সে বলল, 'ঠিকই বলেছেন। এ ক্লাসটা আপনাদের জন্যেই।'

আর একজন সহযাত্রী বলল, 'যার জন্যই তৈরি হক মশাই—এমন সব খাঁচা বানানোর সার্থকতা কী বলতে পারেন?'

'খাঁচা? ঠিক বলছেন, খাঁচাই?' বলল বিরিঞ্চি।

'তা নয় তো কী?'

'প্যাকিং কেস্ নয় তো?'

বিরিঞ্চির রসিকতায় দু একজন সহযাত্রী হাসল। কিন্তু যে খাঁচার উপমাটা তুলেছিল সে আরও তেতো মুখ করে বলল, 'খাঁচাই বলুন আর বাক্স। ব্যাপাবটা খুব বদলাচ্ছে না তাতে। আসলে আমরা সবাই সহ্য করি বলেই এ অবস্থা। মনে হয়—'

বিরিঞ্চি বলল, 'আর যাই হক, বোমা ক্র্যাকার এ সবেব কথা বলবেন না।'

সহযাত্রী বলল, 'আপনারা ইয়ংম্যান, আপনাবাই এ নিয়ে তেতে ওঠেন না—আমরা আর কি করবো। গিয়েছিলুম বোম্বাই, দেখে এলুম বটে।'

'বলুন মশায, বোম্বাই ব্যাপার শুনতে সব সময়েই ভালো লাগে।' বলল বিরিঞ্চি।

'তা মশায় বোম্বাইকে যত ঠাট্টাই করুন, সেখানে কিন্তু অমন ভিড় থাকে না। শহরের ট্রামেবাসে আমি তো কাউকে দাঁড়িয়ে যেতে দেখি নি। সে দেশের লোক কি আমাদের মতো! এই তো সেদিন বোম্বাইএর এক এম-পি চেন টেনে গাড়ি থামিয়ে দিয়েছিল—যা লেখা আছে তার চাইতে বেশি লোক উঠেছিল বলে।'

'বলেন কী? এখানেও তো তা হলে করা যায়।' ওদিক থেকে একজন সহযাত্রী যোগ দিল।

'ঝুলে পড়ুন, মা দুর্গা যা করেন।' বিবিঞ্চি আবাব মুখ খুলল।'

কিন্তু ঝুলে কেউ পড়ল না। নানা কারণ ছিল। বোম্বাই-এর কথা যে তুলেছিল সে বলল ঝুলে সে পড়তোই, কিন্তু গাড়ির অন্য যাত্রীরা সাহায্য করবেন এ ভরসা তার নেই। একথা শুনতে স্বজাতি নিন্দা হলেও না বলে সে পারছে না। বাঙালিরা কোন ব্যাপারেই একমত নয়।

বিবিঞ্চি বলল বিড়বিড় করে, 'ঝুলে পড়ার ব্যাপারে অবশ্য—'

মনে হল সহযাত্রীর মুখ চোখ যেন একটু থম থম করছে। বললাম, 'আ বিরিঞ্চি, এই গরম এব মধ্যে এত কথা কেন? কথারও তো উত্তাপ আছে।' কিন্তু এটা মন্দ নয বিবিঞ্চি লজ্জাটাকে কাটিয়ে উঠল কথা বলে বলে।

কিন্তু লজ্জা পাওয়ার কী হেতু ছিল? কারণ গাড়িটা ঠিক তখই আবার এক স্টেশনে ধরল আর বিরিঞ্চি যা ঘটিয়েছিল তার পুনবাবৃত্তি ঘটল। কয়েকজন যাত্রী কামরাটায় ঢুকবার জন্য ছুটোছুটি করে এগিয়ে এল। কামরার ভিতর থেকেও কযেকজন তাদের বাধা দেয়ার জন্য হৈ হৈ করে উঠে দাঁড়াল। ধ্বস্তাধ্বস্তি, ঠেলাঠেলি। গালিগালাজ। গাড়ি ছেড়ে দিল। কামরাব মধ্যের যাত্রী কয়টি কতকটা বিজয়ীর ভঙ্গিতে ফিরে দাঁড়াল সহযাত্রীদের দিকে। আর তাদেব মধ্যে সেই দুজন সহযাত্রীও ছিল এর আগে স্টেশনে কামরায় উঠতে গিযে যারা বিরিঞ্চির কাছে বাধা পেয়েছিল, আর তার ফলে বিরিঞ্চির সঙ্গে যাদের এক হাত হয়ে গিয়েছিল।

মনে হল বিরিঞ্চি কিছু বলবে। কিন্তু তার আগেই আমাদের সেই সহযাত্রী দুটির একজন ডান হাতখানা বাঁ হাতে তুলে ধ'রে বলল, 'আরে মশায়, এরা কি মানুষ? খিমচে দিয়েছে দেখুন।'

'আহা, তাইতো।' বিরিঞ্চি বলল, 'আয়োডিন দেবো? আছে আমার সঙ্গে।'

'থাক, থাক, মশায়, কাটে ঘায়ে আর—'

না হেসে পারলাম না। অনেকেই হাসল। এমনকি আড়াআড়ি বেঞ্চের সেই অভিজাত ভদ্রলোকটি পর্যন্ত।

কিন্তু হাসির চাইতেও হাস্যকর, ভেবে দেখতে গেলে। আমি আর বিরিঞ্চি যখন উঠছি তখন কামরায় পাঁচ ছ'জন যাত্রীই ছিল। তা সত্ত্বেও দরজা বন্ধ করে রেখে তারা আমাদের কিছুতেই কামরায় উঠতে দেবে না এমন ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভাগ্যে গাড়িটা স্টেশনে প্রায় মিনিট পনেরো দাঁড়ায়। বিরিঞ্চি পিছন দিয়ে হামলে পড়েছিল, ভিতর থেকে কামরা খুলেও দিয়েছিল। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আবও জন তিনেক যাত্রী উঠে পড়েছিল। কিন্তু এই স্টেশনের আগের স্টেশনে যখন অনেক যাত্রী

দরজার কাছে ভিড় করে এল তখন কামরার দরজায় বিরিঞ্চিই ব্যূহমুখে সেনাপতির ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন তার চেহাবাই বদলে গিয়েছিল। পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটিয়ে, মাসল্ ফুলিয়ে সে এক যাচ্ছে তাই ব্যাপার।

বিরিঞ্চি:কে ডেকে বলেছিলাম, 'কি করছো, আ, সরে এস।'

সে বলেছিল, 'আপনার অসুবিধা হবে, দাদা।'

'হোক, সবে এস।'

সে সরে আসতে জন কয়েক যাত্রী উঠে পড়েছিল। তাদের মধ্যে একজন দরজার পাশেই বাক্স পেতে বসেছিল একটি মহিলাকে নিয়ে। এ বারের ব্যূহরক্ষায় সেই সব চাইতে বীরত্ব দেখিয়েছে।

বিরিঞ্চির ক্ষেত্রে যা লজ্জাজনক মনে হয়েছিল এখন তাকে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না? অর্থাৎ প্রথমে যে উঠবে সে দ্বিতীয়জনকে বাধা দেবে, দ্বিতীয় তৃতীয়কে, এমন ভাবে চলতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত কামরার দরজার বাইরে যাত্রীদের একটা ঝুলন্ত ভিড় দরজাকে অদৃশ্য করে দেয়। তখন তারাই ব্যূহ রক্ষা করে, আব ভিতরের যাত্রীরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে সময় কাটাতে পারে।

আর এ বিষয়ে প্রথম বোধ হয় আড়াআড়ি বেঞ্চের অভিজাত চেহাবার ভদ্রলোকটি। আমার মনে হচ্ছে, আমরা যখন কামরায় উঠতে যাচ্ছিলাম তখন যারা দরজার কাছে পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে সেই প্রধান ছিল। অন্তত সেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বেশী। কারো কাবো উপস্থিতি ভিড়ের মধ্যেও দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। গায়ের বং, মুখচোখের গড়ন, পোশাক, পৃথকভাবে এগুলি, এবং এদের সমাহার। আমবা অভিজাত বলে একটা শব্দ ব্যবহাব কবি। আজকাল কোন কোন ক্ষেত্রে এটা অনীহা বাচক। তা সত্ত্বেও ওই শব্দটায় এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় কিছু মনে করি। আমাদের এই সহযাত্রীটিকে দেখে এ কথাটাই মনে হয়েছিল। তার গলার টাইটা রং জ্বলে যাওয়া, কোটের আস্তিনের প্রান্তদুটি ফেটে যাওয়ায় আলগা সুতো চোখে পড়ছে। এখন সেটা তার গায়ে নেই, দেয়ালেব হুক থেকে ঝুলছে। তাব গায়েব শার্টটা ধবধবে সাদা, যদিও বাঁ কাধেব কাছে খানিকটা রিফু করা। কিন্তু তার চেহারায় এ সব যেন অন্য একটা অর্থ পেয়েছে। বলা যায় অনভ্যাসের আনকোরা কিছু নয়, এমন পোশাকেই সে অভ্যস্ত। কিন্তু দরজার কাছে সে যখন ব্যূহমুখ আটকে দাঁড়িয়েছিল তখন এ সব সূক্ষ্ম ব্যাপার চোখে পড়ে নি। যা চোখে পড়েছিল সেটা তার স্পর্ধা। সে বলেছিল আমাদের দিকে তাকিয়ে—ক্লাস টু এটা, টিকেট আছে তো? আমি পকেট থেকে টিকেট বার করেছিলাম। এটা তার স্পর্ধারই বিশেষত্ব, সেটা এমন নিখুঁত এবং এমন আকস্মিকতাব প্রকাশ। এর পরে অবশ্য বিরিঞ্চি ব্যূহের পিছন দিককে আক্রমণ করেছিল। আমাদেব এই অভিজাত সহযাত্রীটি এখন যেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের হাতে ব্যূহরক্ষার ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। একটা ছবির বই-এর পাতা উল্টাচ্ছে সে। আপন মনে হাসছেও যেন। এ ছাড়া তার আভিজাত্যের যেন অন্য আর একটি লক্ষণও আছে। সেটা তার অন্যান্য সহযাত্রীদের দুরে সরে থাকার ভাবটি। আড়াআড়ি বেঞ্চটায় তারা মাত্র দুজন চলেছে। একজন শুয়ে, আর সে নিজে বসে। ভিড় কম দেখে বিরিঞ্চি ওদিকে বসতে গিয়েছিল—অভিজাত যাত্রীটি বলেছিল নীরস গলায়—ওদিকে যান। শুয়ে থাকা যাত্রীটি নির্লজ্জের মতো শুয়েই রইল।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। লাইনের দুপাশে আবার গ্রাম্য দৃশ্য দেখা দিয়েছে। গবম লাগছিল। খবরেব কাগজখানা নেড়ে নেড়ে বাতাস খেলাম। আর তা করতে গিয়ে লক্ষ্য কবলাম এতক্ষণ তবু সব যাত্রী চাপাচাপি করে হলেও বসেছিল, এখন দু একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও চলেছে। অসম্ভব ভিড় হয়েছে অনুভব হল। এ যেন উটের পিঠের শেষ তৃণখণ্ড।

বোম্বাই-অভিজ্ঞ সহযাত্রী বলল, 'বোম্বাইএর—'

বাক্সের উপরের সহযাত্রীটি হাতেব পিঠে ফুঁ দিচ্ছিল। বলল, 'চেপে যান। আর কেন। এটা কোলকেতা, মশায়।'

আমার ঠিক মুখোমুখি যে যাত্রীটি বসেছিল, সে বলল, 'আমরা বাঙালিরা কোন ব্যাপারেই একমত হতে পারি না। এ বিষয়ে মুসলমান আর মেড়োদের দেখুন তো।'

সহযাত্রীটির মুখের দিকে তাকালাম। রোগা শুকনো একটি মুখ, মাথায় বড় বড় চুলের উপরে খদ্দরের টুপি, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা।

বিরিঞ্চি বলল, 'মশায় কি রাজনীতি করেন?'

'কেন বলুন তো?'

'চেহারা দেখে তাই মনে হয়, কেমন কি না বলুন।' বলল বিরিঞ্চি।

গোপনে তার হাতে চাপ দিয়ে তাকে নিরস্ত কবতে গেলাম, কিন্তু তার আগেই আমাদের রাজনৈতিক সহযাত্রী বলল, 'তা করা হয়ে থাকে। মেড়োদের কথাই ধরুন। দেখুন গে ওদের ট্রেড ইউনিয়ন, বাঙালি ছাঁটাই করে মেড়োদের ভর্তি করার ব্যাপারে কেমন সাহায্য করছে। সাধ্য আছে কোন বাঙালির সেদিকে এগোনোর।'

'যা বলেছেন।' তার পাশেব সহযাত্রী বলল, 'ওই দোষেই গেলুম আমরা। আর দেখুন আমাদের কম্যুনিস্টদের, তারা তো চীনাদেব ভাই ভাই করে অস্থির, এদিকে বাংলাদেশে বাঙালি চাকরি পায় না, তা কি ভাবে? বরং মেড়ো শ্রমিকদের চটানোর ভয়ে তাদেব বিরুদ্ধে রা কাড়ে না।'

বিরিঞ্চি বলল, 'এই মরেছে।'

রাজনৈতিক সহযাত্রী বলল, 'কী হল?

বিরিঞ্চিকে যেন ভাবতে হল উত্তর দেয়ার আগে। বলল সে, 'ছারপোকা, মশায়।'

'তা আব বিশেষ কি। গাড়িটা মেড়োর দেশ থেকে আসছে না?'

'কিন্তু জামার মধ্যে ঢুকেছে যে।' বলল বিরিঞ্চি।

তবু রক্ষা আলাপটা রাজনীতিব দিকে আর এগোতে পাবল না। ওদিক থেকে হুস করে ক্লান্তির একটা শব্দ উঠল। কোন যাত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে থাকবে। বাক্সব উপরে যে বসেছিল, মনে হল শব্দটা সে দিক থেকেই এল। আর তা স্বাভাবিকও। গাড়িটা কোন বাঁকে ঘুরে গিয়েছে। দরজা দিয়ে দুপুবের রোদ ভদ্রলোকের গায়ে এসে পড়েছে। সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরছে তার, আর তার ঠিক পাশের মহিলাটি রোদে পুড়ে রাঙা হয়ে উঠেছে। তার উপরে তাদের ঠিক সামনেই বাতাস আটকে জন দু এক যাত্রী দাঁড়িয়ে আছে।

ভদ্রলোক আর থাকতে না পেরে দাঁড়ানো সহযাত্রীদের বলল, 'একটু এগিয়ে যান না, মশায়, ওদিকে। বসুন গে।'

দাঁড়ানো যাত্রী দুটি বসবার জায়গার খোঁজে এদিক ওদিক চাইল, কিন্তু তারা এগোনোর ভাব করতেই এ পাশ থেকে চার পাঁচজন একই সঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠল।

কোথায় যাবেন মশায়—তিল ধরবে না তার মানুষ—না, না তা কি করে হবে!

রাজনৈতিক যাত্রীটি বলল, 'এ কি মেড়োদের থার্ড ক্লাশ পেয়েছেন? একজনের ঘাড়ে আর একজন বসবেন?'

গ্রাম্য চেহারার দাঁড়ানো যাত্রী দুটি দুদিকের তাড়া খেয়ে যেখানে ছিল তা থেকে দু পা এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে রইল।

এ অবস্থায় কামরার সর্বত্র সকলেই চোখ বুলিয়ে দেখে কোন যাত্রী কোথাও সঙ্কুচিত না হয়ে স্বাভাবিক ভাবে বসেছে কি না। তা যদি কেউ বসে থাকে তবে তার সেই স্বাভাবিক ভঙ্গিই পীড়াদায়ক হয়। মনে হতে থাকে সে প্রয়োজনের চাইতে বেশী জায়গা নিয়েছে। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে

আড়াআড়ি বেঞ্চটার দিকেই সকলের নজর পড়ল। সেখানে মাত্র দুজন। যদিও বেঞ্চটা অন্য বেঞ্চ দুটির তুলনায় ছোট—তা হলেও একেবারেই ফাঁকা লাগছে।

একজন বসেছে—আর একজন শুয়ে। অন্তত জন পাঁচেক তো বসতে পারতো।

চুপিচুপি বিরিঞ্চি বলল, 'ও লোকটি তো সেই সকাল থেকে ঘুমুচ্ছে। এবার উঠে বসলে হয় না।'

আমিও চাপা গলায় বললাম, 'আর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকো। কোলকাতা আব কয়েক ঘণ্টার বেশী নয়।'

'কিন্তু মেয়েটির কষ্ট হচ্ছে ওই বাক্সের উপরে। রোদ পুড়ে যাচ্ছে।'

চুপিচুপি বিরিঞ্চিকে বললাম, 'মেয়ে না হয়ে ওই ভদ্রলোকের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীও তো হতে পারে। আর স্ত্রীদের স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে কষ্ট করাই উচিত।'

বিরিঞ্চি থেমে গেল।

কিন্তু আড়াআড়ি বেঞ্চের অভিজাত চেহারার যাত্রীটি তার স্বাতন্ত্র্য, তার ভঙ্গি দিয়ে সকলেবই আক্রোশকে আকর্ষণ করে থাকবে। অসম্ভব নয় আমরা কামরায় উঠবার আগে কাবো কারো সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে কিনা।

বোম্বাই-অভিজ্ঞ যাত্রীটি বলল, 'একজন মহিলার চাইতে ঘুম বড়ো নয়।'

কয়েকজন যাত্রী সমস্বরে বলল, যান না মশায়, তুলে দিন না। একি শুয়ে থাকার জায়গা? একশ বার নয়। নির্লজ্জ না হলে কেউ পারে শুয়ে থাকতে?

ওদিক থেকে একজন জোয়ান যাত্রী উঠে দাঁড়াল। যেন তখনই শুয়ে থাকা যাত্রীটিকে জোর করে তুলে দেবে। সে বলল, 'লজ্জা করে না, একটি মেয়েছেলে রোদে পুড়ছে। কতলোক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, আর একজনের শুয়ে থাকা হচ্ছে।'

বিরিঞ্চিও উঠে দাঁড়াচ্ছিল। পিছনের দরজা দিয়ে গাড়িতে উঠবার জন্য যে আক্রোশ সেটা তার মনে তখনও ধিকি ধিকি জ্বলছে। তাকে টেনে বসালাম।

জোয়ান যাত্রীটি বলল : ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ করলেই হয় শুয়ে যেতে হলে।'

অভিজাত চেহারার যাত্রীটি এতক্ষণ কামরার হঠাৎ উঠে পড়া বিচলিত ভাবটা লক্ষ্য করছিল, এবার বলল, 'আমাদের বলেছেন নাকি?'

'নয় তো কাকে?'

'তা হলে শুনুন ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ করলে শুয়ে যেতে হয না, বসেও যাওয়া যায়।'

তার ঠোঁটে একটা বাঁকা হাসি খেলা করে গেল।

'লজ্জা করে না?'

'কারণ দেখতে পাচ্ছি না।'

'মহিলাটি কি ভাবে চলেছে দেখতে পাচ্ছেন না? চোখ নেই?'

অভিজাত চেহারার যাত্রীটি হেসে বলল, 'ভালো বলেছেন। এটা কি বাস-ট্রামের মহিলা লেখা সিট, যে আমাকে উঠে যেতে হবে?'

বিরিঞ্চিকে থামিয়েছিলাম, কিন্তু পিত্ত জ্বলে গেল। আশ্চর্য নির্লজ্জ তো লোকটা।

মনে হল এখনই একটা বিপত্তি না ঘটে যায় না।

কিন্তু একটা স্বাভাবিক কারণে সেটা বাধা পেলো। মহিলাটির জন্য এতগুলি লোক উত্তেজিত হয়ে ওঠার ফলে সকলেরই দৃষ্টি পড়েছিল তার উপরে। সে ফিসফিস করে তার সঙ্গের ভদ্রলোককে কিছু বলে থাকবে। ভদ্রলোকটি বলল, 'থাক্, মশায়, গাড়ি বাঁক নিলেই রোদ সরে যাবে। আর তা ছাড়া এখানে বরং আলগা হয়ে বসা যাচ্ছে। ওখানে চাপাচাপি হয়।

জোয়ান লোকটি ধপ করে বসে পড়ল। বলল, 'তা হলেও একজন সুখ করবে, আর সবাই কষ্ট করবে এ সয় না।'

অভিজাত চেহারার লোকটি কোটের পকেট থেকে একটা সিগারেটের টিন বার করল। সিগারেট বার করে ধীবে সুস্থে ধরাল। বলল, 'একজনের সুখটুকু ভাগ করে নিলেই কি সকলের দুঃখ দূর হবে?'

আমাব আবাবও মনে হল · আশ্চর্য লোকটির স্পর্ধা। কামবার সব কয়েকটি যাত্রী যখন একদিকে তাব বিরুদ্ধে 'তখনও এমন ঠান্ডা ভাবে কথা বলতে পাবে?

এব পবে কী হতে পাবতো তা বলে লাভ নেই। যা ঘটল তাই বলি। গাড়িটা একটা স্টেশনে এসে পড়াতে অন্তর্দ্বন্দ্ব মুলতুবী রেখে দরজার ব্যূহমুখ রক্ষার জন্য যাত্রীরা মন দিল। খুব সৌভাগ্য নতুন যাত্রী কেউ উঠতে পারল না। একটি শীর্ণ চেহারার বৃদ্ধ বার কয়েক 'একটু উঠতে দাও, বাবা' বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চলে গেল। আমার মনে হল আমাব কোন আত্মীয় হলে এরকম বৃদ্ধকে একা একরকম চলতে দিই নে।

কথাটা বিরিঞ্চিকে বলতে সে বলল, 'এমন হতে পারে বৃদ্ধের পক্ষে এরকম দুঃসাহস কবা ছাড়া উপায নেই। হযতো কাবো অসুখ, খুব নিকট কাবো, কিংবা অন্য কোন বিপদ। বাড়িতে হয়তো পুরুষও নেই আর।'

যাক্‌, গাড়িটা ছাড়ল।

কিছুক্ষণ নীববতায় কাটল। খবরের কাগজখানা আবাব খুলবার চেষ্টা কবলাম। কিন্তু বিরিঞ্চি বলল, 'কথাটা মিথ্যা নয় এটা ক্লাস টু।'

'হঠাৎ এ কথা বলছো যে?'

'বুঝছেন না?' একজন যাত্রী বলল, 'উনি বলছেন থার্ড ক্লাস হলে সত্যি মাবামাবি হতে পারতো।'

'তা হয না, মশায়, হয না। আমরা মুখেই তড়পাই। জোয়ান লোকটি বলল। ব্যাপারটা হাতাহাতিতে না পৌঁছানোয় সে যেন দুঃখিতই হয়েছে। 'এই সেদিন কাটিহারে এক নেপালী তিনজনকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে কুকরি দিয়ে।'

ওদিক থেকে একজন যাত্রী বলল, 'নেপালীটাই কি শুয়েছিল কিংবা বসবাব জায়গা না পেযে দাঁড়িয়েছিল?'

কথা বলতে হল। বললাম, 'সেটা কি একটা আদর্শ ব্যাপার, মশায়?'

অভিজাত চেহারার যাত্রীটি বলল, 'যেতে দিন, কারো কারো কাছে কুকরিওয়ালাই আদর্শ।'

জোয়ান যাত্রীটি আবাব উঠে দাঁড়ানোর উপক্রম করল, মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'কি বললেন, আবার বলুন তো?'

উত্তর না দিয়ে অভিজাত চেহারার লোকটি নিজের হাতে সিগারেটটাকেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল।

বললাম, 'ঢের হয়েছে, থাক্‌ না। মহিলাটি তো ওখানে বসতে চান না।'

যারা দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল তাদের একজন বলল, 'কিন্তু আমরা তো দাঁড়িয়ে আছি।'

কী গেরো!

বললাম, 'কিন্তু আপনাদের দেখেও তো কুকরিওয়ালা মনে হচ্ছে না।'

কী সৌভাগ্য, তারা হাসল।

বিরিঞ্চির মুখের কথা ওরা কেড়ে নিয়েছিল। সে বলল, 'আমি কিন্তু ক্লাস টু সম্বন্ধে অন্য একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম। এটাকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কামরা বলাই উচিত। এটাকে আমাদের সমাজের ছবিও বলতে পারি। আগে যারা সেকেন্ড ক্লাসের মধ্যবিত্ত ছিল তারা এখন ক্লাস টুর ধাপে নেমেছে। নিম্নমধ্যবিত্তের উচ্চাভিলাষ এখন আর সেকেন্ড ক্লাসের বৈশিষ্ট্যে পৌঁছুতে পারে না। ক্লাস টুতেই

গড়াগড়ির দধিকর্দম। ওদিকে কিন্তু সাম্রাজবাদী ব্রিটিশ শাসনে যা হয়নি—এখন তা হচ্ছে, সমাজে একটা এয়ার-কনডিশানড্ ক্লাস দেখা দিচ্ছে।'

হেসে বললাম, 'কী ভয়ঙ্কর শ্রেণী-বিদ্বেষ তোমার, বিরিঞ্চি, তুমি কট্টর মার্ক্সবাদী তাতে সন্দেহ নেই।'

আমাদের রাজনৈতিক সহযাত্রী বলল, 'তা মশায়, কথাটা মিথ্যা নয়। এই এয়ার-কনডিশানড্ ক্লাসে দেখবেন যতো মেড়ো। আর তারাই সমাজকে শোষণ করছে।'

তার পাশের যাত্রীটি বলল, 'দেখুন না কাণ্ড, যাত্রীদের হাজারকরা দুজনের জন্য গাড়ির মোট দৈর্ঘ্যের তিন ভাগের এক ভাগকে সাদা করে রেখেছে।'

তা ভালো, এ রকম আলাপ চলতে চলতে যদি গাড়িটা কোলকাতায় পৌঁছে যায়। বাইরে হাল্কা মেঘ কখনও কখনও রৌদ্রের উজ্জ্বলতাকে ঢেকে ছুটন্ত মাঠগুলির গায়ে ছায়া ফেলছে। জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে থেকেও খানিকটা সময় কাটানো যাবে।

একটা ছোট স্টেশন পার হল গাড়ি। কয়েকজন চাষী যাত্রী হিসাবে প্ল্যাটফর্মে ছিল। তারা এই দেড়া ভাড়ার কামরার দিকে এগোল না।

কামরার ভিতরেও একটা শান্তির ভাব যেন দেখা দিল। দাম্ভিক সেই অভিজাত যাত্রীটি দেখলাম তার ছবির বই-এর পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে বিরিঞ্চির আলাপে কান রাখছে। সে বলল, 'এয়ার-কনডিশানড্ কামরার ব্যাপার যাই হোক, কামরা জুড়ে দেবার ব্যাপারেও রেলের লোকের গাফিলতি আছে।'

'তা নয় তো কী? হয়তো হুকুম আছে দুখানা ক্লাস টু কামরা দিতে হবে ট্রেনে। দিল হাতের সামনে যা পেল তাই জুড়ে। দেখল না সেটা কি দিল।' বলল ওদিক থেকে একজন সহযাত্রী।

'ঠিকই বলেছেন। দশজন বসবার কামরা না দিয়ে পঁচিশজন বসবার কামরাও তো দিতে পারত।' বলল বিরিঞ্চি।

বোম্বাই-অভিজ্ঞ যাত্রীটি বলল, 'বলে আর কি করছেন। আমাদের ভাগ্য সয়ে যাওয়া, তাই যাবো।'

অভিজাত চেহারার যাত্রীটি বলল, 'অন্তত এখনই কামরায় বসে কোন প্রস্তাব নিচ্ছি না।'

বিরিঞ্চি বলল, 'কখনও কখনও অপমান মনে হয়।'

'হয় না?' অভিজাত চেহারার যাত্রীটি বলল, 'ট্রেনটা যখন ঝম্ ঝম্ করে স্টেশনে ইন করতে থাকে আর যাত্রীরা পড়ি মরি করে ছোটে অপমানে তখন কান্না পায় না?'

বিরিঞ্চি সিগারেট বার করল। নিজে ধরানোর আগে অভিজাত চেহারার যাত্রীটির দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে ধরল। সে নিল, দু'জনে একই সঙ্গে সিগারেট ধরল!

এই ভাবেই সূত্রপাত। কামরার ভিতরে এই লাগে লাগে যে ভাবটা হয়েছিল, সেটা কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছে। বিরিঞ্চিকে ধন্যবাদ।

বিরিঞ্চি অভিজাত চেহারার যাত্রীটির ছবির পত্রিকাটা চেয়ে নিয়ে পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে দৈনিক খবরের কাগজের বিষয় নিয়ে আলাপও সুরু করল।

একটা স্টেশন এল। ছোট স্টেশন। প্ল্যাটফর্মের বাইরেই পাহাড়। অভিজাত চেহারার যাত্রীটি উঠে দাঁড়াল।

'উঠছেন যে?'

'এখানে চা খুব ভালো। মাটির ভাঁড়ে চা দেয়—কিন্তু এ লাইনে এমন চা আর পাবেন না।'

বিরিঞ্চি বলল, 'ভেণ্ডার কোথায়?'

'এত চাহিদা যে তারা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দু'হাতে বিক্রি করেও শেষ করতে পারে না।' বলল অভিজাত যাত্রীটি।

'নামছেন?' বলল বিরিঞ্চি, 'দাঁড়ান আমিও যাবো।'

তারা নেমে গেল। কিছুক্ষণ বাদে একজন ফিরিওয়ালাকে পাকড়াও করে নিয়ে এল তারা। ফিরিওয়ালা বলল—গাড়ি খুলে যাবে।

'উঠে পড়ো, তারপর দেখা যাবে।' অভিজাত যাত্রীটি বলল পিছন থেকে ফিরিওয়ালাকে তার মাটির ভাঁড়ের ঝাঁকা সমেত উঠতে সাহায্য করতে করতে।

তখন তাব মুখের হাসি দেখে হঠাৎ আমার মনে হল তার বযস সম্বন্ধে এর আগে যে ধারণা করেছিলাম, সেটা ভুল। বয়সে সে বিরিঞ্চির মতোই হবে।

ফিরিওযালা মাটির ভাঁড়ে করে সব যাত্রীকেই চা দিচ্ছে। চা খেতে খেতে বিরিঞ্চি ফিরিওয়ালার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।

'আজ খুব ভিড়, তোমার খুব বিক্রি।'

ফিরিওয়ালা বলল, 'অতনা নেহি।'

বলে কি? এর চাইতেও ভিড় হয় নাকি?

দাঁডানো যাত্রীদের একজন বলল, 'তা হয়, এব চাইতেও ভিড় হয়। আর আজও হতে পাবে। নলহাটিতে অনেক উঠবে।'

গাডি ছাড়ল। চা-ওয়ালাও চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে গেল। বিরিঞ্চি আব অভিজাত চেহাবার যাত্রীটি আবার আলাপ সুরু করেছে।

'কোলকাতায যাবেন তো?'

'হ্যাঁ। আপনারাও?'

কিন্তু শান্তিতে থাকা ভাগ্যের কথা। আর সেই ভাগ্য সকলেব নয। নলহাটি পৌঁছানোর অনেক আগেই একটা স্টেশনে ভয়ঙ্কর ভিড় দেখা দিল। সকলে মিলে দরজা ঠেলে বেখে, দেডা ভাড়া বলে চেঁচিয়ে সে ভিড ঠেকানোর চেষ্টা করা হল। কিন্তু বন্যা রোধ করা গেলেও বাঁধ ডিঙিযে কিছু জল এসে পড়ল। জানলা গলিয়ে কিছু যাত্রী উঠে পড়ল।

— চেন টানুন না, মশায়। গাড়ি ছাড়তে দেবেন না। আহ্লাদের কথা নাকি। চেকার ডাকুন। আগেব যাত্রীরা প্রায় সমস্বরে চেঁচামেচি প্রতিবাদ সুরু করল।

নতুন যাত্রীব ভিড়টা দাঁড়ানোব জায়গার খোঁজে অভিজাত যাত্রীটির আড়াআড়ি বেঞ্চটার দিকে এগোচ্ছিল।

সে বেশ চড়া গলাতেই ধমক দিল, 'যাও, যাও। আর এগোবে না।'

'কেন?'

'আমার ইচ্ছা। এটা গাড়ির কামরা, হাঁসমুরগীর খাঁচা নয়।'

'আমরা হাঁস-মুরগী?'

'নইলে জানলা দিয়ে উঠতে না।'

আগের যাত্রীদের একজন বলল, 'গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে, চেন টানুন না।'

এই চেন টানা নিয়ে এর আগে কত কথাই না হয়েছে। নীরস এক রসিকতাই যেন। গাড়ি ছেড়ে দিল বাঁশি বাজিয়ে।

কিন্তু রসিকতা নয়। হঠাৎ গাড়ি থেমে গেল, কে যেন সত্যি চেন টেনেছে। ফাঁকা একটা মাঠের মধ্যে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল।

গার্ড এল। তার সঙ্গে দুএকজন চেকারও।

'আপনার চেন টেনেছেন?' গার্ড জিজ্ঞাসা করল।

বিরিঞ্চি বলল, 'না টেনে উপায় ছিল না।'

অভিজাত যাত্রীটি বলল, 'প্রায় চলন্ত গাড়িতে জানলা দিয়ে এতগুলো লোক উঠে পড়ায় আমাদের ভয় হয়েছিল ডাকাত পড়েছে।'

'দিনদুপুরে ডাকাত?' গার্ড রাগত স্বরে বলল, 'বিনা কারণে চেন টানলে কি হয় জানেন?'

'তা জানি। কিন্তু এটা বিনা কারণ নয়।' বিরিঞ্চি বলল, 'আপনি আমাদের নামে কমপ্লেন করতে পারেন। তার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আপনার কমপ্লেন বইটাও আমি চাই। সাহেবগঞ্জ থেকে এ পর্যন্ত একবার গাড়ি চেক করেন নি, এটা লিখতে চাই সেখানে।'

গার্ড যেন একটু নিষ্প্রভ হল।

অভিজাত যাত্রীটি বলল, 'আমারও কিছু লিখবাব আছে। এখনও দেখুন পা-দানিতে তিন চারজন যাত্রী দাঁড়িয়ে আছে। এরা এ অবস্থায় থাকতেই আপনারা গাড়ি ছেড়েছিলেন।

ওদিক থেকে একজন যাত্রী বলল, 'এসেছেনই যখন দয়া করে, গাড়িটা একবাব চেক করুন না।'

আমার মনে পডছে গাডিটা চেক করতে শুরু করেছিল তারা। কিন্তু গার্ডের সঙ্গে বিবিঞ্চিদের যখন কথা হচ্ছে তখনই নতুন যাত্রীরা নেমে যেতে শুরু করল। গাড়ি ছাড়বার আগে আমাদের কামরাটা অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেল।

গাড়িটা তখন চলছে। বিরিঞ্চি বলল, 'ধন্যবাদ, মশায় ; চেনটা যদি সাহস করে না টানতেন—'

অভিজাত যাত্রীটি অন্যমনস্কেব মতো বসেছিল। সে বলল, 'আত্মরক্ষার জন্য অনেক কিছু করতে হয়।'

কামরাটার দিকে চোখ ফেরালাম। প্রথমেই লক্ষ্য করলাম কোন যাত্রীই আর দাঁডিয়ে নেই। যে দুজন যাত্রী এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আসছিল তারাও ভিড়ে মিশে নেমে গিয়েছে। সামনের সারিটা একটু নতুন লাগল। ঠাহর করে দেখে মনে হল মাথায় টুপি, মোটাফ্রেমের চশমা-পবা সেই রাজনৈতিক যাত্রীটিও নেমে গিয়েছে। আর বাক্সর উপরে সেই মহিলা যাত্রীটি একা, তার সঙ্গের ভদ্রলোকটি নেই। মহিলা যাত্রীটির চোখমুখ উৎকণ্ঠায় শুকিয়ে উঠেছে।

এ ব্যাপারটা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে।

অভিজাত যাত্রীটি বলল, 'আপনার ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। আপনার সঙ্গেব ভদ্রলোক টিকেট বদলে নিচ্ছেন দেখলাম। এর পরের স্টেশনেই আসবেন।'

মহিলাটি আরও লজ্জা পেযে দু-হাতে মুখ ঢাকল।

বিরিঞ্চি আবার সিগারেট বার করল। সে সাধারণত সিগারেট এত খায় না, তবে বিড়ম্বনায় বিব্রত হলে এ রকম করে থাকে। অভিজাত যাত্রীটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—নিন।

একজন যাত্রী বলল, 'এ সবই কিন্তু ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা নয়।'

'তা তো ঠিকই। প্রচুর সংখ্যায় থার্ড ক্লাস থাকলে এমন সব লজ্জার ব্যাপার ঘটে না।'

'যা বলেছেন, মশায় ; ক্লাস টুতে এমন কিছু আরাম নেই যে তার জন্যে এব উপর টান হবে।'

'আর অনেক সময়ে ক্লাস টুতেই থার্ড ক্লাসের চাইতে ভিড় বেশি হয়।'

বোম্বাই-অভিজ্ঞ যাত্রীটির গলা অনেকক্ষণ শোনা যায় নি। এবার শোনা গেল। সে বলল, 'কিন্তু আমাদের দেশে যত ভিড় হয়—'

'অন্য দেশে তা হয় না—এই বলবেন তো? আমাদের দেশেব আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা বেশী।'

'শুধু তা নয়, মশায়, আমরা চলিও বেশি।'

'আর তার বেশীর ভাগই কোলকাতাকে কেন্দ্র করে। সে জন্যে যত কোলকাতার কাছে আসবেন তত ভিড়।'

বিরিঞ্চি বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে। সে বলল, 'কোলকাতাকে শুধু রাজধানী বললে তো সব বলা হয় না। ধরুন, সেটা শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্র, এমন কি শিল্পী সাহিত্যিকরাও সেখানেই আড্ডা গেড়েছেন। অথচ ট্রামবাসের ঘর্ঘরানিতে শিক্ষাদীক্ষাব কী সুবিধা হয়, কিংবা ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত, নিবন্ন কেরানী আব বড়বাজারের ফাটকাওয়ালাদেব সাহচর্যে শিল্প-সাহিত্যের কী উন্নতি হয় তাও কেউ বলে দিতে পারছে না।'

অভিজাত যাত্রীটি বলল, 'বেশ বড় সাইজেব একটা প্রদীপ, পুরনো তেল মযলাব কালো, তাতে ভাঙা কাঠি, পুরনো সলতে পচছে, প্রদীপটাব গায়ে অনেক মরা পোকা লেগে আছে। ধোঁযাই বেশি, তবে শিখাও আছে।'

বিরিঞ্চি হেসে জিজ্ঞাসা করলে, 'কোলকাতার উপমা নাকি?'

অভিজাত যাত্রীটি বলল, 'যতক্ষণ না বিকেন্দ্রণ হচ্চে কোলকাতা টানবেই। বিলাসের জন্য যেমন, আর্ত হযেও তেমন আমবা কোলকাতায ছুটি। আমাদের আশা, হতাশা, আমাদের সর্বনাশ সবেতেই কোলকাতাব টান। আমরা সবাই কোলকাতায যাচ্ছি না?'

খুব তাড়াতাড়িই একটা স্টেশন এল, মহিলাব সঙ্গীটিও উঠল কামবায। আমার তখন মনে হল সব ভালো যার শেষ ভালো। আর আপাতত কোলকাতায় পৌঁছে আমাব ভালোই লাগবে বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু নলহাটিতে যা ঘটল তার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না।

অবসন্ন দুপুরের স্তব্ধতাই যেন কামবাটায বিবাজ কবছে। শবীরটাকে একটু জুতসই করে রাখবাব চেষ্টায় যাত্রীবা এঁকে-বেকে বসেছে এক রকম কবে। দু একজন পত্রিকা ইত্যাদিও পডছে। এ অবস্থায় এর চাইতে বেশী স্বস্তি আশা করা যায় না।

কিন্তু এরই মধ্যে একটা কৌতুক বোধ হল। আডাআড়ি বেঞ্চে যে যাত্রীটি শুয়ে আছে দেযালের দিকে মুখ করে তাকে ক্ষুদে কুম্ভকর্ণ বলতে হয়। ঘণ্টা চার পাঁচ তাকে দেখছি। দিনেব বেলা, হৈ-হল্লা গোলমাল কম হচ্ছে না, কিন্তু কিছুতেই তার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে না। সে যদি পাশ ফিবে থাকে তবে তা আমাব নজরে পড়ে নি। পাতলা একটা চাদরে গা ঢেকে সে ঘুমুচ্ছেই। সাহিত্যে এমন গাঢ় ঘুমের যে সব গল্প পড়া ছিল তা মনে পড়তে লাগল।

বোধ হয় মিনিটটাক সময়ের জন্য চোখ বুঁজেছিলাম বসে বসেই, কিংবা ঝিমিয়েছিলাম—ধড়মড় কবে উঠে বসলাম। কোন একটা বড় স্টেশনে গাড়ি থেমেছে, অনেক যাত্রীব হৈ-হল্লা। দেখতে দেখতে হড়াৎ করে দরজা খুলে গেল আমাদের কামরার। আর একটা জনস্রোত ঢুকে পড়ল। কম কবেও পনেবো জন হবে। সকলেব পোশাকই প্রায় এক রকম—আজকাল যাকে লংপ্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট বলে। তেল জুবজুবে পাতাকাটা চুলের নানা রকমের সিঁথি। বিনা ছাতায় বোদে ঘুবে তামাটে মুখ—কপালে ঘাম। বয়স দেখে সন্দেহ হয় ছাত্র হবে। তাদের গল্প-গুজব রসিকতা, পরস্পরকে জোরে জোরে ডাকা—সব মিলে হাটের মতো শোনাচ্ছে।

গাড়ি ছাড়া পর্যন্ত তারা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হৈ-হৈ করে গল্প করল। তারপর গল্প ছাড়লো। তারা যে ভাবে সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটা অবশ্য সুখের নয়।

তাদের একজন বলল, 'গরম লাগছে, সবে সরে দাঁড়া না, শালা।'

'সরবে কোথায়, মাইরি?'

'বেঞ্চের ফাঁকে ফাঁকে গলে যা।' আর একজন বলল।

তাদের দলপতি হতে পারে, একটু হৃষ্টপুষ্ট দেখতে, সে বলল, 'দাদুরা একটু সিধে হয়ে বসুন না। আমরাও বসি।'

পুরনো যাত্রীদের একজন বলল, 'এর মধ্যে কি বসবার জায়গা দেখতে পাচ্ছেন?'

'ইচ্ছা করলেই জাযগা দেখা যায়। গুটিযে বসছেন না কেন?'

কী উদ্ধত। কী অপমানকর ভঙ্গিতে কথা বলা! অথচ দেখে আদর্শবাদী তরুণ মনে হয়। ছাত্রও ভেবেছিলাম।

একজন পুরনো যাত্রী বলল, 'আপনাবা যাবেন কতদূর?'

'পরের স্টপেজ।'

'অথচ আমরা অনেকেই আট-দশ ঘণ্টা এই ধকল সহ্য কবছি ঠায় বসে বসে।'

একজন তরুণ বলল, 'বসে এসেছেন তো সিটগুলো কিনে নিয়েছেন, মাইরি।'

বলতে বলতে তারা বেঞ্চগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে পড়ল। এমন ভাবে দাঁড়াল যে বাতাসের অভাবে কষ্ট হতে লাগল।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা ঘটল আড়াআড়ি বেঞ্চটার সামনে।

ওঁদের একজন বলল, 'এ বেঞ্চটায় তো জন কয়েক বসতে পাবে। দিনে দুপুরে শুয়ে বযেছেন কি। উঠে বসুন না। কই, দাদু উঠুন তো।'

অভিজাত চেহারার যাত্রীটি বলল, 'গোল করবেন না, লোকটি অসুস্থ।'

'অসুস্থ হয়েছে তো মাথা কিনেছে আর কি? ফার্স্ট ক্লাসে গেলেই হয।'

অভিজাত যাত্রীটি বলল, 'আচ্ছা অভদ্র তো।'

'অভদ্র বললেন যে?'

'আর কী বলবো?'

'বটে—'

'আপনাদেব কি ক্লাস টুব টিকেট আছে?'

'কী আমাব চেকাব, মাইরি!'

এই লাগে তো এই লাগে। নতুন পাঁচ সাতজন যেন একটা লড়াইএর জন্য প্রস্তুত হযে দাঁড়াল।

যুদ্ধের আগেব আল্টিমেটমের মতো এক নতুন যাত্রী বলল, 'তা হলে উনি উঠবেন না?'

'না।'

'জোর করে তুলে দাও না।' পিছন থেকে ওদের দলের একজন বলল।

'খবরদার—' অভিজাত চেহারার যাত্রীটি রুখে দাঁড়াল।

ওদের কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় বিকৃত, এমন কি অভিজাত চেহারার যাত্রীটির স্বরও বদলে গিয়েছে। সমস্ত নতুন যাত্রী একসঙ্গে হৈ-হৈ কবছে। যেন তারা এখনই জিন্দাবাদ বলেও চেঁচাতে পাবে। কী কবা উচিত আমরা খুঁজে পেলাম না। বিরিঞ্চি উঠে দাঁড়াল, তাকে টেনে বসাতে ভুলে গেলাম। ব্যাপারটা দাঙ্গায় গড়াতে পারত। কিন্তু নতুন যাত্রীদলের একজন অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিল, বোধ হয় সকলের চাইতে বেশী উত্তেজিত হয়েছিল , আর কিছু করার না পেয়ে কিছু একটা করার তাগিদ থেকেই দাঁত কিড়মিড় করতে করতে মাথার উপরের চেনটাকে টেনে দিল। এই দ্বিতীয়বার এই কামরা থেকে চেনা-টানা হল। গাড়িটাও থেমে গেল।

আবার গার্ড এল, দু একজন চেকারও। মুখ দেখে বোঝা যায় এবার তারা বিশেষ বিরক্তই হয়েছে।

'কে চেন টেনেছে এবার?'

নতুন যাত্রীদলটি মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। কিন্তু বিরিঞ্চি খপ করে বলল, 'ওই ছেলেটি।' এই বলে সে তাকে দেখিয়েও দিল।

গার্ড বলল, 'এমন করছেন কেন আপনারা? গাড়ি এমনি দেড় ঘণ্টা লেট রান করছে।'

গাড়ি ছাড়বার জন্য যা ব্যবস্থা করা দরকার তা করে গার্ড ফিরে যাচ্ছিল। বিরিঞ্চি বলল, 'এর আগের বার টিকেট চেক করার কথাতেই গাড়ি ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। এবার তা নাও হতে পারে।

এঁরা হয় তো সবাই ক্লাস টুর টিকেট করেই উঠেছেন। তা হলেও একবাব চেক কবলে হয় না।'

'চেক কি আপনাদের হুকুমে করবো?' গার্ড বিরক্ত হয়ে বলল।

'কখনও নয়। আপনাদের আইন অনুসারেই করবেন। আমার কর্তব্য শুধু সংবাদপত্রে রিপোর্ট করা। আমি একটি পত্রিকার মাইনে-করা রিপোর্টার।'

যে জন্যেই হক গার্ড এবপবে চেকারকে টিকেট যাচাই করে দেখতে বলল। দেখা গেল নতুন যাত্রীদলের অর্ধেকের থার্ড ক্লাস টিকেট আছে, বাকির কোন টিকেট নেই।

চেকার সকলেরই টিকেট দেখাল। পুরনো যাত্রীদের সকলেরই টিকেট ছিল। অভিজাত যাত্রীটি পকেট থেকে একখানা ভাঁজ-করা কাগজ অর্ধেক টেনে বাব করল—কার্ড পাস।

চলন্ত গাড়ির আর এক কামবায় চলে যাওয়ার আগে চেকার নতুন যাত্রীদলকে বলল—রাজবলহাটে সব নেমে যাবেন।

এর পরে স্বাভাবিকভাবেই যেন নতুন যাত্রীদল নিজেদেব মধ্যে আলাপ আলোচনা করতে লাগল। বাঁকাভাবে অন্য যাত্রীদের উল্লেখও কবল তারা কয়েক বার। শ্লেষ বিদ্রূপ বর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু বিনা পয়সার যাত্রীর শ্লেষে ধার থাকে না। আমার মনে হল—আহা এতগুলি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলে।

রাজবলহাটে ট্রেন থামল। এই যাত্রীদল দরজার কাছে ভিড করে রইল, কেউ নামলো, কেউ দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল—সবাই মিলে যেন ঘোঁট পাকাচ্ছে।

কিন্তু এর পরে যা ঘটল তাব জন্য বোধ হয বিরিঞ্চিই দাযী। সে নিজেকে সংবাদপত্রের মাইনে করা রিপোর্টার বলাতেই কি এমন হল? কিংবা অন্য কিছু হযতো গার্ডের মনে তার কর্তব্যবোধকে জাগিয়ে দিয়ে থাকবে। হঠাৎ কোথা থেকে জন দু এক কনস্টেবল দেখা দিল। জানলা দিয়ে দেখলাম যে ছেলেটি চেন টেনেছিল সে কনস্টেবলদের হাতে গিযেছে।

গার্ড গাড়িতে উঠে এল। সে বিরিঞ্চির সাক্ষ্যে ছেলেটিকে ধরেছে। কাজেই সে বিরিঞ্চিব নাম ধাম টিকেট নম্বর প্রভৃতি নিল।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চলে যেতে যেতে তার মনে পডল এর আগেও একবার এই কামরাতেই চেন টানা হয়েছিল। আর অভিজাত চেহারার যাত্রীটিই তা টেনেছিল বলে নিজেই স্বীকার করেছিল।

গার্ড তার ধড়াচূড়া সত্ত্বেও হাসল, আর তার দিকে ফিবে বলল, 'কিছু মনে কববেন না। এব আগের বারের চেন টানার ব্যাপারটা পাদানিতে ঝুলন্ত যাত্রীদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে টেনেছিলেন বলে ধরে নিচ্ছি আমরা। তা হলেও দিনকাল ভালো নয়। আপনার ঠিকানাটা নিয়ে রাখি। প্রয়োজন হলে আপনিও সাক্ষ্য দেবেন।'

অভিজাত যাত্রীটিকে বিমনা দেখাল। সে বলল, 'থাক না হয়।'

'কাইন্ডলি আপনার নামটা বলুন।'

'অমরেশ রায়।'

'ঠিকানা?'

'দু নম্বর গার্ডেনরিচ রোড।'

'টিকেটের নম্বরটা দিন।'

হঠাৎ অভিজাত যাত্রীটির মুখ যেন বিবর্ণ হয়ে গেল।

'কই দিন।' হাতের কাগজে নামধাম টুকতে টুকতে গার্ড মুখ তুলল।

অভিজাত যাত্রীটি বলল, 'টিকেট নেই।'

মনে হল দুপুর স্তব্ধ পুকুরে টুপ করে একটা ঢিল পড়ল।

গার্ড এতো বিস্মিত হল যে কী বলবে খুঁজে পেল না।

বিরিঞ্চি এ অবস্থায় সাহায্য করতে অগ্রসর হল। সে অভিজাত যাত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিল—'এর

আগে চেকারকে যে পাশ দেখালেন?'

'দেখাই নি।'

গার্ড বলল, 'শুয়ে আছেন, উনি কে?'

'আমার ভাই।'

'ওঁর টিকেট?'

'আছে।' অভিজাত চেহারার যাত্রীটি একখানি ক্লাস টুর টিকেট দেখাল।

গার্ড বলল, 'তা হলে আপনার টিকেটের টাকাটা? দেবেন?'

'টাকা নেই।'

'তা হলে তো মশায় নামতে হয়।'

ইতিমধ্যে একজন চেকার এসেও উপস্থিত হল।

এর পরের ব্যাপারটা খুব সংক্ষিপ্ত। গার্ড তাকে সেই স্টেশনেই নামতে নির্দেশ দিল। দরজার কাছে কনস্টেবল দুজন ছেলেটিকে নিয়ে গার্ডের জন্যই অপেক্ষা করছিল। তাদেরও ইঙ্গিত করল।

এতক্ষণে সেই নিদ্রাপরায়ণ যাত্রীটি উঠে বসল। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের একটি যুবক। কিন্তু মুখখানা শুকিয়ে এমন হয়েছে যে দেখলে ভয় করে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, ক্লান্ত মুখের উপরেও কিছু লুটিয়ে আছে। চোখের কোণে গাঢ় কালিমা।

সে বলল, 'দাদা, টাকা তো আছে। ষোলোটা টাকা তো থাকবার কথা।'

'ষোলোটা নেই বে পুরো। কাল সকাল থেকে আজ দুপুর পর্যন্ত আমি তিন আনা খরচ করেছি নিজের জন্যে। পনেরো টাকা তেরো আনা আছে।'

'তাতে তোমার টিকেট হয় না?'

'আব কোলকাতায় তোর লাগবে না? খালি হাতে কোলকাতায় যাবি?'

'তুমি না গেলে আমার সঙ্গে টাকা কয়টিই কি আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে?' তার চোখে ছলছল করে এল।

'আরে পাগল, দাদা না থাকলেই কি তুই অসহায়? কতলোক সেখানে, কত ডাক্তার। কত বড়ো মানুষ, শুনিস নি পড়িস নি তাদের দয়ার কথা? সেই বেলা দশটার পরে তুই কিছু খাস নি। ঝুড়িতে পেঁপে আছে খেয়ে নিস গাড়িটা ছাড়লেই। কামরায় কত ভদ্রলোক। সবাই তোকে সাহায্য করবেন, দেখিস।'

কথা বলতে বলতে সে গার্ড আর চেকারের সঙ্গে দরজার কাছে কনস্টেবলদের মাঝে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

যুবকটি বলল, 'দাদা, আমি কী করব? একা আমি কী করতে পারি? কাউকে চিনি না, পথ ঘাট জানি না।'

না হয় শেয়ালদায় থাকিস। কয়েক দিন। দিন সাতেকের মধ্যে আমাকেও ছেড়ে দেবে। দেখিস, ঠিক তুই সেরে উঠবি। আর আমিও পৌঁছে যাব?'

গাড়িটা ছেড়ে দিল।

যুবকটি গায়ে চাদর টেনে আবার শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর তার দিকে একবার চোখ পড়ল। সে কি কাঁদছে! চাদরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে থেকে থেকে।

শিয়ালদায় যখন পৌঁছুলাম রাত হয়ে গিয়েছে। নিওন লাইটের তলায় লাল জামা পরা কুলিদের সারি পার হয়ে হয়ে গাড়িটা মন্থর গতিতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে।

রীতিমতো গল্প

গজেন্দ্র পূততুণ্ড আমাকে এই গল্পটা বলেছিল।

গজেন্দ্রব চেহাবাটা মনে হলেই আমাব হাসি পায। কালো, যাচ্ছেতাই রকমেব মোটা। মোটা পেটের উপবে যখন সে ক্রসবেল্ট আঁটে, তখন সে বেল্ট কখনও যথাস্থানে থাকে না। হাসতেও পারে লোকটা, আর হাসির পরেই বেল্টটা খুলে ঠিক কবে পরতে হয তাকে, কারণ যদিবা তার আগে বেল্টটা কোন রকমে ভুঁড়িব উপরে ছিল, হাসির দমকে সেখানে যে কাঁপন লেগেছিল তাতে বেল্টটা ভুঁড়ির নিচে নেমে গিয়েছে।

কিন্তু পরিচিতদের মধ্যে যে দুচারজনকে আমি ভালোবাসি সে তাদের মধ্যে একজন। প্রায় সাত আট বছব পরে, সেদিন সন্ধ্যায় বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রিটে হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হযে গেল। দেখলাম তাব চুল পেকেছে, গালের মাংস অনেকটা ঝবে গিয়েছে কিন্তু দেহের মাঝামাঝি জাযগায তেমনি বাড়বাডন্ত। আর হাসি? সেটা একটুও বদলায নি। বিস্ময় লাগল লোকটা এই হাসি নিযে পুলিশের চাকরি কবে কি করে।

গজেন্দ্র বলল—চলো, মোহিত, একটু খাওযাদাওযা করা যাক। এই বলে সে ফাঁদলের মধ্যে দিযে গলে যাবার ভঙ্গিতে বেল্টটাকে তুলে ভুঁড়ির উপরে স্থাপন করল।

বললাম—খাওয়া দাওয়া, মানে চা?

—তা আবার কবে থেকে হল। তবে তোমরা লিখিযে পড়িযে মানুষ।

এর পরে কি করে তার সঙ্গে একটি প্রায় নাম করা হোটেলে গিয়ে পৌঁছলাম, কি করে সে ডিনারের অর্ডার দিল, এসবই যেন পূর্বপরিকল্পিত ব্যাপার।

ডিনারের কিছু দেরি হবে জানতে পারলাম। কী একটা কল বিগড়েছে রান্নাঘরে। কিংবা আমরা আগে এসে পড়েছি। আমরা লাউঞ্জে গিয়ে বসেছিলাম। সেখানে বসে আমরা যখন গল্প করছি তখন হঠাৎ একটা কুকুর সেখানে দেখা দিল। জিভ লকলক, কান লটপট। হাল্কা হলুদে ছাইরঙেব ছোপ দেয়া লোমশ একটা প্রকাণ্ডতা। ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক চেয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। আমি কুকুর ভালোবাসি না। আমার গা শিরশির করে উঠল। কিন্তু গজেন্দ্র যেন তার সঙ্গে আলাপ করবে। কিন্তু কুকুরটার মালিক বোধহয় রাস্তায় ছিল। সেটা এদিক ওদিক ছোঁক ছোঁক করে বেরিয়ে গেল। আর যাবার সময়ে দরজার কাছে পা তুলে—

গজেন্দ্র (তার চোখ দুটি চক চক করল) বলল, পেডিগ্রি ডগ্।

—কিন্তু ভদ্রতা জ্ঞান দেখলে তো?

—পেডিগ্রি ম্যান তো বলি নি।

এই থেকে ক্রমে ক্রমে গজেন্দ্র পূততুণ্ডের গল্পটা শুরু হল। গোলযোগে ডিনার যখন একঘণ্টা পিছিয়ে গিয়েছে, এবং যখন পূততুণ্ড তার পুলিশ-সুলভ ভঙ্গিতে সন্দেহ প্রকাশ করছে, এই গোলযোগের পিছনে সাবোটাজ থাকতে পারে, আমি যখন আলাপটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই কাল্পনিক সাবোটাজের পিছনে যন্ত্রের প্রতি মানুষের অন্তর্নিহিত বিদ্বেষ কিনা, এই গবেষণা করছি তখন গজেন্দ্র এই গল্পটা বলেছিল। অবশ্য সে বারবার, প্রথমে, শেষে, গল্প চলার মাঝে মাঝেও

স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল এটা নেহাৎ গল্পই, কিছুমাত্র সত্য নেই এতে, নায়ক নায়িকা সবই কাল্পনিক।*

গজেন্দ্র তখন ক-থানার অফিসার ইন চার্জ। মহকুমা বা জেলার সদর নয়। চারিদিকে চা বাগান। চা বাগান থেকে তাদের নিজস্ব রাস্তাগুলি বেরিয়ে যেখানে ন্যাশনাল হাইওয়েতে মিশেছে তার কিছুদূরেই থানা। থানার চৌহদ্দির মধ্যে চা বাগান ছাড়া আর যা আছে তা রিজার্ভ ফরেষ্ট। সুতরাং বাসিন্দা বলতে চা বাগানের কুলি, কর্মচারী, ম্যানেজার, ফরেস্ট বিভাগের কর্মচারী, দুচারজন কন্ট্রাক্টর এবং তাদের খালাসি, কিছু দোকানদার, ফরেস্টবিভাগ থেকে চাষ আবাদ করতে যাদের বসিয়েছে তেমন কিছু গবীব গৃহস্থ জঙ্গলে জঙ্গলে। আর সব রকমের সমাজেই কর্মহীন, নোঙরহীন কিছু লোক থাকে—তাদের কয়েকটি। কিন্তু ইদানীং কিছু রকমফের হয়েছে। থানাব এক্তিয়ারের মধ্যেই চা বাগানগুলো থেকে কিছুদূরে একটা কয়লার খনি আবিষ্কার হয়েছে। তাকে কেন্দ্র কবে একটা নতুন ধরনের কিছু হবে তা বোঝা যায়। বিরাট আকারের ক্রেন ইত্যাদি আসতে আরম্ভ করেছে। একটা শ্রদ্ধাসংযুক্ত বিস্ময় আকাশের গায়ে।

কিন্তু যেহেতু চা বাগানই এখানে সভ্যতার প্রতীক, থানার ঘরবাড়ি চা বাগানের ঘরবাড়ির কায়দাতেই তৈরি। থানার ইন চার্জ, আর তার অধস্তন সাব ইন্সপেক্টর এবং অ্যাসিষ্ট্যান্টদের জন্য কাঠের তৈরি বাংলো। কেবল থানাব অফিসঘবটা লাল ইটের দেয়াল তোলা। সম্ভবত মাঝে মাঝে কয়েদখানা হিসাবে ব্যবহার করতে হয় বলেই কিছুটা দৃঢ়।

পৃথিবীব যেখানে যেখানে মানুষ বাস করে সে সব জায়গাতেই কিছু সুবিধা এবং কিছু কিছু অসুবিধা আছে। এখানেও ছিল। অসুবিধা বলতে সিনেমা নেই, স্কুল, কলেজ নেই। সুবিধা বলতে থানাব কাছেই একটা হাসপাতাল আছে—দু তিনটে চা বাগান মিলে যা চালায়। হয়তো সংস্কৃতির কোন কেন্দ্র ছিল না, কিন্তু ভদ্রশ্রেণীর লোক খুব বেশি না থাকায় যে কজন ছিল সকলেই পরস্পরের পরিচিত ছিল। থানাতেও আড্ডা বসাতে পারতো। থানার টেবলেই তাসখেলার রেওযাজ ছিল না এমন নয়।

থানার কাজের চাপও খুব বেশি ছিল না। অপবাধ যা ঘটতো তা প্রায়ই মামুলী ধরনের। দুচারটে চুরি, দুচারটে ছিনতাই, মদ খেয়ে মাথা ফাটানোর ব্যাপার। দুএক ক্ষেত্রে ছোরাও মারা হয়, কিন্তু এ সবেরই একটা বিশিষ্ট ধারা আছে। অপরাধী ধরার জন্য খুব একটা পরিশ্রমও করতে হয় না।

ভাগ্যই মানুষকে চালনা করে তার কর্মক্ষেত্রে, শুধু চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে নয়। গজেন্দ্রের বিশ্বাস, এটা তার ভাগ্যই যে তাকে অন্য অনেকের চাইতে বেশি খাটতে হয়। কিন্তু ভাগ্যটা তার অবিমিশ্রভাবে খারাপ নয়। তদন্তে গেলে খাওয়াদাওয়াটা তার ভালোই হয়। কখনও কখনও বিলেতি মদের একটা বোতলও কোন কোন পার্টি তার সম্মুখে স্থাপন করে।

কাজেই সে থানায় আসবার এক মাসের মধ্যে যখন একটা খুন হয়ে গেলই, তখন তা তার ভাগ্য। থানার খাতাপত্র থেকে সে জানল গত চার বছরে একটা মাত্র খুন হয়েছে, আর সে আসতে না আসতে একটা ঘটে গেল। তার অজান্তেই একটা ক্লান্তির দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল, কিন্তু সে বিব্রত বোধ করল না। তার অধস্তন সাব-ইন্সপেক্টর যোশেপ কুজুরকে তদন্তের ভার দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হল। কারণ কুজুরের ভাগ্য গজেন্দ্রর ভাগ্যর চাইতে সদয় ছিল। সে সদরে বসেই দুএকবার শুনেছে ক্রাইম-ডিটেকশ্যনে তার একটা পটুতা আছে। কিন্তু সমশ্রেণীর অফিসারদের মধ্যে এই দক্ষতাকে সৌভাগ্যের নিদর্শন বলে মানা হয়। সদরে ডি. এস. পি একবার কুজুর সম্বন্ধে বলেছিল—লাকিডগ্। আর এটা কুজুর শুনেছিল। সেজন্য কেউ তাকে লাকিডগ্ বললে সে সন্তুষ্ট হয়। সে নিজেও বিশ্বাস

* গল্পের ফুটনোট হয় না। গল্প মিথ্যে ছাড়া আর কিছু নয়। তা হলেও এখানে বলা ভালো এ গল্পের সব কিছুই কাল্পনিক।

করে সে অনেক ব্যাপারেই সৌভাগ্যের সাহায্য পেয়েছে।

শুধু ক্রাইম-ডিটেক্‌শ্যন কেন অন্যান্য ব্যাপারেও তার সৌভাগ্য আছে। তার মেমবউএর কথাই ধরো। তার গাউন পরা হাল্কা চেহারার ট্যাঁশ বউকে দেখে, সত্যি কথা বলতে কি, অনেকেরই ঈর্ষা হতো। কুজুরের গায়েও রংও ফর্সা ছিল। তার উপাধি যাই সূচনা করুক, তার পিতৃকুলে অথবা মাতৃকুলে কোন বকমে পাহাড়ি রক্তের একটা ছোঁয়াচ ছিল। কিন্তু তার বউএর রক্তে যে, দুচার পুরুষ আগেকার হলেও, চা বাগানের সাহেবদেব রক্ত মিশেছিল এ বিষযে সন্দেহ নেই। একটা বিষয় বেশ পরিষ্কার হয় এ থেকে, যোশেপ এ অঞ্চলেরই অধিবাসী।

এই থানা না হক, পাশের জেলার এমনি কোন চা বাগান অঞ্চল। এ অঞ্চলগুলো নৃতত্বের আলোচনাব দিক দিয়ে আকর্ষণীয়। সব সময়ে না হলেও, মাঝে মাঝে নেপালি, ইউরোপীয়, মুণ্ডা ও মদেশীয়া রক্তের মিশ্রণ চলেছে এখানে। সংস্কৃতি ও ধর্মের নানা পরিবর্তন হচ্ছে। কুজুরের মেমবউ সম্বন্ধে অবশ্য দুটো কথা শোনা যায়—প্রথমত মিশ্রিত রক্ত হলেও, তার মিশ্রণেব উপাদানগুলি কুজুরের মিশ্রণের উপাদানের চাইতে দামি ছিল। আর কুজুর পাহাড়ি শহরের কলেজে সিনিয়ার কেমব্রিজ পাশ হলেও, দারোগার মতো সরকারি চাকুরে হওয়া সত্ত্বেও, এবং তার মেমবউ নিরক্ষরা হওয়া সত্ত্বেও, তার পক্ষে ওই মেমবউ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপারই। অবশ্য একথা জানতে কারো বাকি ছিল না, ব্যাপারটা সেকেন্ডহ্যান্ড—মেমবউএর আগের স্বামী তাকে ডাইভোর্স কবেছিল বলেই।

সে যাই হক কুজুরের ভাগ্য এই খুনের ব্যাপাবেও তাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। খুনী ধরা পড়ল। খুন যে বস্তিতে হয়েছিল সেটা একটা চা বাগানেব এলাকা। বাতারাতি, বারো মাইল পথ ফরেস্টের মধ্য দিয়ে চলে, খুনী তার বোনেব বাড়িতে গিয়েছিল। কুজুব লাশ চালান করে দিয়েছিল মোষের গাড়িতে কনস্টেবলদের খবরদারিতে। নিজে স্কুটারে করে আসছিল। হঠাৎ তার মনে হল অকুস্থলে যে খবর পেয়েছে, সেটাকে যাচাই কবে দেখলে মন্দ হয় না। সত্যি কারো বোনের বাড়ি আছে নাকি তুংসুং বস্তিতে। বিশেষ কবে বস্তিটাকে যখন একটু ঘুরে গেলে থানায় ফেরার পথেই ছুঁয়ে যাওয়া যায়। সেখানে হরকামাযার বাড়ি খুঁজে পাওয়া গেল, আর হরকামায়ার বাড়িতে তার ভাইকেও যে নাকি হত স্ত্রীলোকটির স্বামী। স্বামী মহাশয়ের অবস্থাও তখন ভালো নয়। সেও বিশেষ রকমে আহত, পুরু করে ন্যাকড়া পোড়ানো ছাই দিয়ে রক্ত বন্ধ করা হয়েছে মাত্র।

কুজুর তাকে জিজ্ঞাসা করল,—কি করে সে এমন আঘাত পেল?

তখন সে বলল আঘাত সে নিজেই করেছে নিজের শরীরে।

—কেন, তা করতে গেল কেন? আহা, খুব জখম হয়েছে তো! তখন সে স্বীকার করল, জনানাকে খুন করে সে নিজেও মরতে চেয়েছিল।

সুতরাং আর একটি মোষের গাড়ি করে আহত স্বামীকে চালান করে দিল কুজুর, থানা ঘুরে হাসপাতালে।

ঘটনাটা প্রেমঘটিত। গজেন্দ্র হাসপাতালে লাশ দেখতে গিয়েছিল। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি নেপালি স্ত্রীলোক। স্বজাতীর বাইরের রক্ত মিশ্রণের ফলে গায়ের রং কালো। নাকচোখেমুখে পাহাড়িভাবের সঙ্গে ওঁরাওদের আকৃতি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কানের ভারি পিতলের গহনাই তাকে নেপালি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বলে প্রমাণ দিচ্ছে। কিন্তু গজেন্দ্র এই স্ত্রীলোকটির প্রেমের ব্যাপারে খুন হওয়ার কোন কারণই দেখতে পেলো না। চ্যাপ্টা বুক, শীর্ণ উরু, নিতম্বহীনা এই স্ত্রীলোকটি কি একই সঙ্গে দুটি পুরুষকে উন্মত্ত করতে পেরেছিল? একটা মাত্র বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়, যদি সেরকম মেজাজ থাকে, তা এই মৃত স্ত্রীলোকটির দৈর্ঘ্য। এ রকম দীর্ঘ দেহ নেপালিদের হয় না! অভিনবত্ব, তা আকৃতির এমন কি পোশাকেরও, অনেক ধীরস্থির মানুষের মতিভ্রম ঘটায়—তা

তুমি এ গল্পেই দেখতে পাবে।

কিন্তু তার মৃত্যুটা মিথ্যা নয়, বীভৎসও বটে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে বুকের গোড়া থেকে তলপেট পর্যন্ত যেন দুফালা করে কেটে ফেলা হয়েছে।

নাকে রুমাল দিয়ে বেরিয়ে এসে, যখন সে হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করছে, হাসপাতালের হাতায় স্কুটারের শব্দ শোনা গেল। তারপর কুজুরকে দেখা গেল।

—কী খবর, কুজুর?

—খুনী আসছে?

—খুনী? সে কি?

মোষের গাড়িতে খুনীকে রওনা করে দেয়ার কথা বলল কুজুর। গজেন্দ্র বিস্মিত হয়ে বলল, —খুনী বলছো, অথচ মোষের গাড়িতে তাকে রেখে চলে এসেছো? কী মুস্কিল।

কুজুর বলল,—তার এখন আর পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। তা ছাড়া গাড়ির ধুরোর সঙ্গে তাকে এমন করে বেঁধেছে গাড়োয়ান যে উঠে বসার ক্ষমতাও তার নেই।

গজেন্দ্র বলল,—খুনী যদি না পালায় তা হলে তোমাকে লাকি বলবো। আর পালালে কী হবে বুঝতেই পারছো। অবিশ্যি, তোমার লাক।

মোষের গাড়িতে আসতে এত রক্তক্ষরণ হয়েছিল যে খুনীকে বাঁচানোর আশাই ছেড়ে দিল ডাক্তাব। কিন্তু কী অদ্ভুত জীবনীশক্তি। কয়েকটা সেলাই দিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধার পর গোটা দুতিন ইনজেকশন দিতেই লোকটির নাড়ি যেন স্বাভাবিক হযে এল।

বিকেলের দিকে হাসপাতালে যাদের পাহাবায রাখা হয়েছিল, তাদেব একজন কনস্টেবল থানায় এল রান্নার যোগাড় করতে। তার মুখে শোনা গেল ডাক্তাব বলেছে, কাল নাগাদ জবানবন্দী নেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

[গজেন্দ্র পূততুণ্ড বেশ মনোযোগ দিয়ে তাব গল্প বলে যাচ্ছিল। বললাম—কিন্তু এর মধ্যে, গজেন্দ্র, তোমার কুকুর নেই কিন্তু।

গজেন্দ্র হাসল। বলল, নেই মানে। তুমি কি আমাকে সাহিত্যিক পেয়েছো যে কুজুরকে লাকি ডগ্ বলে কুকুরের কাজ সেরে নেব?]

পরদিন সকালে থানায় বসে গজেন্দ্র কুজুরের রিপোর্ট পড়ছে। ডাক্তার বলেছে, আর একটু সুস্থ হলেই জবানবন্দী নেয়া যেতে পারে, কারণ জখমী খুনীর ক্রাইসিস কেটে যাচ্ছে। বেশ ভালো লাগছিল গজেন্দ্রর। সকালের রোদটা বেশ খটখটে রকমের নাতিশীতোষ্ণ। তা ছাড়া প্রাতরাশটা আজ বেশ ভালো হয়েছে। সকালেই ডিমের ডেভিল সহযোগে লুচি পুরুষের মনকে নিশ্চয়ই পৃথিবীর সকলকে ভাই বলে ডাকবার উপযুক্ত করে দেয়। পরদায় হাওয়া লেগে দুলছে। তাতে থানার পিছন দিকে কোআটার্সগুলিও চোখে পড়ছে। আরে! তাইতো! এটাতো এতদিনেও নজরে পড়েনি। ও কোয়াটারটাই বোধ হয় কুজুরের। একটা খাড়া করা বাঁশে দড়ির ফাঁস পরিয়ে সে দড়িটাকে অন্য একটা খাড়া করা বাঁশের মাথার উপর দিয়ে গলিয়ে দড়ির মাথাটা মাটিতে একটা খোঁটায় বেঁধে দিল একটি মহিলা। ওই বোধ হয় কুজুরের মেমবউ। কাঁধ থেকে অনাবৃত বাহু দুটি চকচকে রোদে লালচে দেখাচ্ছে। একবার যেন মুখটার একপাশও। বাদামি রংএর চুলগুলি ঝুঁটি করে বাঁধা। কুজুর হয়তো ঘুমাচ্ছে। কুজুরের ভাগ্যকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। গাউনের নিচে সুন্দর পা দুখানা। গজেন্দ্রর মনে হল অনেকদিন সে বউকে আদর করেনি। এখন গিয়ে একটু করলে হয়।

কিন্তু রিপোর্টে ব্যাপারটা কুজুর এমন করে সাজিয়েছে যে ভাগ্যের চাইতে দক্ষতাই প্রাধান্য পেয়েছে। হ্যাঁ তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং দক্ষতা। এটা একটা দুর্বলতাই বোধ হয় মানুষের, যে সৌভাগ্যকে

পেলে সে তাকে অস্বীকার করে নিজেব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভৃতিকেই প্রশংসা করে। আর এ জন্যেই বোধ হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সৌভাগ্যও মুখ ফিরিয়ে থাকে।

রিপোর্ট পড়তে পড়তে গজেন্দ্র আব একটা কিছুকেও আশা করেছিল। খুনের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে রেডিওতে সদরকে জানিয়েছে। তার একটা উত্তর সে আশা করছিল। হয়তো খবর আসবে সার্কেল ইনস্‌পেক্টর বা দুনম্বর ডি. এস. পি আসছেন। পাশের ঘরে বেতারযন্ত্র গোঁ গোঁ করে উঠছে। কথা চলছে। এ. এস. আই সুধীর মুখোটি ঢুকল গজেন্দ্রর ঘরে হন্তদন্ত হয়ে। খবর, স্যার। এক নম্বর ডি. এস. পি আসছেন, এস. ডি. পি.ও আসছেন, সার্কেল ইনসপেক্টর আসছেন, আর মিস্ ক্যাথলীন।

গজেন্দ্রর রক্তপ্রবাহে সকালের রোদ যে অলস আমেজের বুদ্‌বুদ্ রচনা করেছিল এক মুহূর্তের বন্যায যেন তা সব ভেঙে গেল, ভেসে গেল। সময়ের দিক দিয়ে বারো ঘণ্টাও নেই আর। বারো ঘণ্টায় একটা ওলোটপালোট হয়ে যাবে। উঠে হাঁক দিল গজেন্দ্র। সাজো সাজো রব পড়ে গেল সেই হাঁক থেকেই। থানার টেবল চেয়ার, দেয়াল মেঝে, লন, রাস্তা, বুট, বোতাম, বেল্টের চামড়া মেজে ঘষে, ঝেড়ে পুঁছে, ধুয়ে পাখলে সব কিছু ঝকঝকে করে ফেলতে হবে। গজেন্দ্র হুকুম দিলে। বেলা চারটেতে কনস্টেবল এবং এস. আই. দেব পুরো পোশাক ফল্ ইন করতে হবে। কিন্তু এই তার শেষ কাজ নয়, সবে শুরু। সে কুজুরের স্কুটারে করে ফরেষ্ট অফিসে গেল। তাদের সঙ্গে কথা বলা দরকার, এখনই দরকাব। কাবণ এ অঞ্চলে একটিমাত্র ডাকবাংলোই আছে—আর সে ডাকবাংলো ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের।

এদিকে সময়টা সাঁ সাঁ করে এগিয়ে আসছে। বেলা চারটের ফল ইন পর্বে খুশী হল গজেন্দ্র। তা সত্ত্বেও মনে হল তার আর একবার ডাকবাংলোটা ঘুরে দেখে আসা উচিত। চারখানা কামরা পাওয়া গেছে। নেয়ারের খাটা পাতা, নেটের মশাবি। ঝকঝকে টেবিল চেয়ার। টেবলে ফুলদানিতে ফুল। একেবারে উত্তরের ঘবে থাকবেন ডি এস পি, তার পাশের ঘরে এস. ডি. পি. ও, তার পরেরটিতে মিস্ ক্যাথলীন, এবং সবশেষের ঘরে ইন্সপেক্টব। রসুই ঘরে একটা পাঁঠা, এক ঝাঁকা মুবগী, ঝুড়িভরা ডিম, বালতিভবা দুধ। খুশি হল গজেন্দ্র। কিন্তু পায়ে পায়ে সে ফিরে এল মিস্ ক্যাথলীনের জন্য যে ঘরখানা রাখা হয়েছে সেখানাতেই। সে অনুভব করল জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সে জানে না মিস্ ক্যাথলীনের মতো যারা তাদের ঘর কি করে গোছাতে হ'। টেবিলটা চেয়ারটা সে অকারণে টানল। বিছানার ধবধবে চাদরটা একবার টেনে আর একটু ঠিক করে দিল। ঘরে ঢুকবার দরজায় ভালো একটা পর্দা ঝুলছে। পর্দার ঠিক নিচেই প্রকাণ্ড পাপোষ। এমন পাপোষ এর আগে দেখনি সে। এত বড়, এমন সুন্দব। আর সে জানেও না মিস্ ক্যাথলীনের মতো যারা তাদের ঘরে পাপোষটা ঠিক কোথায় থাকে —পর্দার ভিতরদিকে, না বাইরে, না খাটের পাশে।

ঘণ্টা চারেক বাকি আর। গজেন্দ্র থানায় ফিরে গেল। কী করবে তা সে খুঁজেও পাচ্ছে না। কিন্তু কিছু না করেই বা এমন উদ্বেগ নিয়ে মানুষ কি করে থাকবে? অগত্যা গজেন্দ্র নাপিত ডাকিয়ে আনল। নিজের কোয়াটারের বারান্দায় বসে নাপিতকে দিয়ে চুলে আর একবার কাঁচি বুলিয়ে নিল। হ্যাঁ, এবার যেন আরও স্মার্ট দেখাচ্ছে।

এমন সুন্দর ব্যবস্থা হয়ে যাবে অথচ গজেন্দ্রকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না? এমন সৌভাগ্য। পাশের ঘরে বেতারযন্ত্র আবার বেজে উঠল। খবর দেয়া নেয়া হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে মুখোটি এসে খবর দিল, যে ব্যবস্থাই হক, মিস্ ক্যাথলীনের পাশের ঘরেই তার অভিভাবককে থাকতে দিতে হবে।

—সে কি? তা হলে ইনস্‌পেক্টরবাবু থাকবেন কোথায়? মুখোটির পক্ষে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।—কেন, ক্যাথলীন আর তার অভিভাবক কি এক ঘরে থাকতে পারে না? গজেন্দ্র

প্রায় আর্তস্বরে জিজ্ঞাসা করল।

মুখোটি বলল,—তা হয় না ওরা বলছেন। তাতে নাকি ক্যাথলীনের ঘুম হয় না।

—এখন? এই মুহূর্তে আর একখানা ঘর কি আমি ডাকবাংলোয় গড়াবো? গজেন্দ্র খেঁকিয়ে উঠল। এসে তো শুনবেন খুনী ধরা পড়েছে। তার জন্যে—

কিন্তু বাগারা।ািতে সমস্যাটা দূর হচ্ছে না। এ. এস আই দত্তগুপ্ত বরং সাহায্যে এগোল।—আমাদের এদিকে রাখলে হয় না, স্যার।

—কোথায়? থানার টেবিল জোড়া দিয়ে শোয়াবে? মলো যা।

—তা নয়, স্যার, আপনার কিম্বা কুজুর সাহেবের বাসায়।

—তালেই হয়েছে। আমার বাসা। আস্ত একটা মশারি দিতে পারবো কিনা সন্দেহ। আর দেয়ালে রং পড়ে না কতদিন, তা জানো।

—কিন্তু কুজুর সাহেবের বাসাটা বেশ সাজানো গোছানো। মেমবউ এ বিষয়ে—

গজেন্দ্র ভাবল। এই সময়ে কুজুর এসে দাঁড়াল। বয়স তার কম। ছিপছিপে স্মার্ট চেহারা। কড়া ইস্ত্রি করা খাকিতে যেমন তাকে দেখাচ্ছে তেমন আর কোনদিনই দেখায়নি।

—গজেন্দ্র বলল,—আচ্ছা, কুজুর –

—বললেন কিছু?

—একটা সমস্যায় পড়া গেছে। ইনস্‌পেক্টব বাবুকে কোথায় রাখি? তোমার বাসাতে কি ব্যবস্থা হয়?

—আমার বাসায় ইনস্‌পেক্টর? কুজুব ভাবলো। আপনার বাসায়?

—বড্ড ময়লা, বড্ড ময়লা। আমি থাকি বলেই কি ইনস্‌পেক্টর থাকতে পারে? তোমার বাসায়।

কুজুর বলল—আচ্ছা, তা হলে।

গজেন্দ্র আবার হাঁক দিল। কয়েকজন কনস্টেবল সঙ্গে কুজুর গেল তার বাসায়, অতিথির যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে।

কুজুর যখন ওদিককার ব্যবস্থা কবে ফিবে এল, গজেন্দ্র কিন্তু ততক্ষণে আর একটি সমস্যা ভেবে রেখেছে।

—আচ্ছা, কুজুর।

—বলুন।

—আমাদের দুজনেরই এখন থানায় বসে থাকা ভালো দেখাবে? মানে যেন আমাদের হাতে কোন কাজই নেই।

—কাজের অভাব কি?

—সেটাইতো দেখাতে হয়। কোন একটা তদন্ত নিয়ে তুমি কিম্বা আমি বেরিয়ে যাই। ওরা আসার কিছু পরে ফিরলেই হল।

কুজুর কিছু ভাবল, তার পরে বলল,—তা হলে আমিই যাই। হবে না কিছু তবু তিনঝোরা বাগানের চুরির তদন্তটা সেরে আসি।

—তাই যাও না হয়।

কুজুর স্কুটারের শব্দ তুলে চলে গেল।

এটা গজেন্দ্রর মনের একটা জটিল প্রক্রিয়া। কুজুরের মতো স্মার্ট এবং দুর্লভ-সৌভাগ্যবানকে কে নিজের পাশে রাখে কোন পরম মুহূর্তে? সে থাকলে কি তারই উপরে প্রথম দৃষ্টিটা পড়বে না? কিন্তু প্রথম দৃষ্টির চাইতে এমন মূল্যবান আর কি? কাজেই কুজুরকে সরিয়ে দেয়া।

[গজেন্দ্র নিজের মনের প্রক্রিয়াটাকেও গোপন রাখল না, কিন্তু তার গল্পটা কী রকম দাঁড়াচ্ছে?

কুকুর দিয়ে সুরু হয়েছিল, খুন এসে পড়ল, তারপরে এল মেমবউ, এখন তাকে পাশ কাটিয়ে ক্যাথলীন! এর পরে কি ক্যাথলীনকেই সে খুনের কারণ হিসাবে দাঁড় করাবে? ক্যাথলীন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান একটি মহিলা হলেও পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে খুনের তদন্তে সে ঘুরে বেড়ায়, এটা যে শিশুর কল্পনার পক্ষেও বাড়াবাড়ি তা কি গজেন্দ্র বোঝে না?]

জিপ এসে থামল। আর জিপের ঠিক আগে আগে কুকুরের স্কুটার। ঠিক যেন ভি. আই. পি-দের মোটরের আগে স্কাউটদের মোটর বাইক।

তখন ঠিক রাত আটটা। থানার ডেলাইটগুলো জ্বলে দিনের আলো করে ফেলেছে। থানার কনস্টেবলরা গার্ড অব অনার দেয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল। জিপ থামতেই আর্মস প্রেজেন্ট করল তারা। ঝক ঝক করছে তাদের সদ্য ইস্ত্রি করা উর্দি, বোতাম, বেল্ট, বুট থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে।

জিপ থেকে নামলেন ডি. এস. পি, তারপর ক্যাথলীন আর তার এক সঙ্গী, তারপর অর্ডারলিরা। অন্য জিপ থেকে এস. ডি. পি. ও এবং ইনস্‌পেক্টর। আর তারপর জিপকে পথ দেখিয়ে আনবার জন্য খেয়াঘাটে যে কনস্টেবলটিকে পাঠানো হয়েছিল সে আর তার সঙ্গে একজন ভদ্র চেহারার ব্যক্তি।

অভ্যাগতরা যখন থানার ঘরে ঢুকছে, দুএক পা পিছনে গজেন্দ্র কুজুরের পাশে পাশে চলার সুযোগ করে নিযে জিজ্ঞাসা করল,—লোভ সামলাতে পারলে না বুঝি?

—কিসের লোভ?

—কী বলি, মিস্‌ ক্যাথলীনকে দেখবার?

কথাটা নিচু গলায় রসিকতার মতো বলা হলেও যথেষ্ট ঝাঁজালো।

কুজুরের মুখে ধরা পড়ল ঝাঁজের ধাক্কা। কিন্তু সে বলল,—চোর ধরে আনলাম যে। তিনঝোরা বাগানের নয়। অনেকদিন আগেকার বাকডোরা বাগানের চায়ের দোকানের ক্যাশ ভেঙে পালিয়েছিল।

সাধে কি লাকি ডগ্‌ বলে তাকে! অভ্যাগতদের সামনেই হাজতের দরজা খুলে কুজুর ভদ্রচেহারার সেই ব্যক্তিটিকে তার মধ্যে পুরে দিল। চোব হলেই যথেষ্ট ছিল। এ তার চাইতেও বেশি। এবস্কন্ডার। এটা কি ডি. এস. পি-রা নোট করবেন না?

কিন্তু তখন কি এদিকে লক্ষ্য করার সময় ছিল? ডি. এস. পি বসেছেন, এস. ডি. পি. ও বসলেন। ক্যাথলীন? সেই লঘুদেহা তন্বঙ্গী বিদেশিনী? গজেন্দ্র অনেকদিন মনে থাকবে এই প্রথম মিনিট কয়েকটিকে। ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্যাথলীন। এদিক ওদিক যাচ্ছে, এটা দেখছে, ওটা পরখ করছে। এই চঞ্চলতা, যাকে অন্য কেউ কেউ চটুলতা বলে থাকে, ক্যাথলীনের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কী করবে গজেন্দ্র? কুজুর অবশ্য পিছিয়ে দাঁড়িয়েছে। গজেন্দ্র এই সময়ে তার উপস্থিতি চায় না এটা বুঝতে পেরেই। গজেন্দ্র ভাবলো, সে কি ক্যাথলীনকে কিছু বলবে? নাকি তার পক্ষে তা বলা অসমীচীন হবে? আর কথা যদি বলতেই হয়, তবে তা কি ইংরেজি কিম্বা বাংলায় হবে?

কিন্তু অতিথিই অনেক সময়ে আমাদের দুশ্চিন্তার লাঘব করে দেয়। মিস্‌ ক্যাথলীন আসন গ্রহণ করলেন। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ যেন এই নতুন পরিবেশও তার কাছে পুরনো মনে হল। এটাও ক্যাথলীনের একটা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। কিছুটা সিনিক সে। এ রকম জীবনের ফলই তাই। অনেক অভিজ্ঞতার ফলে যে ঔদাস্য আসতে পারে তেমন কিছুই যেন। উত্তেজক কিছু ছাড়া এখন কিছুই তাকে উৎসুক করতে পারে না।

হাজতের সামনেই সে বসে পড়ল। আর তখন তার ছোট্ট সুন্দর জিভটার অগ্রভাগ খানিকটা প্রকাশিত হল। নীলাভ চোখ দুটিতে যেন অলস বিরক্তির ছায়া। গলার রুপোলি কলারটায় আলো পড়ে চক চক করল। কান দুটো একটু নড়ল।

[বললাম,—বা, গজেন্দ্র, বা। ক্যাথলীন তা হলে?
—হ্যাঁ, সে আমাদের মেয়ে কুকুর যে শুঁকে শুঁকে খুনী ধরে।
সিগারেট ধরিয়ে গজেন্দ্র আবার সুরু করল।]

অনেকটা পথ জিপে এসেছেন কাজেই ওঁদের বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া গজেন্দ্রর ব্যবস্থা অনুসারে ডিনারও নটায় তৈরি। যেটুকু থাকবার থেকে ডি. এস. পি-রা বিদায় নিলেন ডাকবাংলোয় যাওয়ার জন্যে। লেখাপড়ার কাজ যা দরকার কাল সকালে হবে, আর আসল কাজও। গজেন্দ্র এবং কুজুর ডাকবাংলোয় গিয়েছিল। তারা কিছু কিছু খুঁটিনাটিও জেনে এসেছে। ক্যাথলীন যখন তার কাজ করবে তখন কি বাইরের লোককে সরিয়ে দিতে হবে? এটা একটা সমস্যাই। যেখানে খুন হয়েছে সেই অনেক দূরের চা বাগান থেকে পথ শুঁকে শুঁকে এগোবে ক্যাথলীন তখন তো একটি পথই, একটি নির্দিষ্ট পথেই, সে চলবে না। তার গতি হবে ভাগ্যেব মতো অনির্ধারিত। সেই অনির্দিষ্ট পথে কি করে পাহারা বসানো যাবে? ডি. এস. পি বলেছেন ক্যাথলীন কি করে অপরাধী খুঁজে বার করে এ লোকে যত দেখে ততই ভালো। কাল দুপুর নাগাদ যদি ক্যাথলীন এই প্রথম কাজটা শেষ কবতে পারে, কিছু কিছু খেলাও দেখাবে আর তখন তো ঢ্যারা পিটিয়ে না হক, মুখে মুখেও লোক ডাকতে হবে খেলা দেখার জন্যে।

গজেন্দ্র এবং কুজুর যখন থানায় ফিরল বাত এগারোটা বাজে। গজেন্দ্রকে তখন খুব উৎফুল্লই দেখাচ্ছে। তা থেকে বোঝা যায় অফিসারদেব সঙ্গে আলাপটা বেশ ভালোই হয়েছে। তার আযোজন সার্থক হয়েছে।

থানায় তখন ডেলাইটগুলো জ্বলছে। কিন্তু গজেন্দ্র একটু অবাক হল সব কটি কনস্টেবল, সব কটি এ. এস আই তখনও কাজ কবছে যেন। অবশ্য ভেবে দেখতে গেলে দোষ দেয়া যায় না। তাদেরও কি উত্তেজনার কারণ নেই?

গজেন্দ্র হাসিমুখে বলল—আজ কি সকলেরই ডিউটি নাকি?

ওবা লজ্জিত হল।

এ. এস. আই মুখোটি বলল—এই যাই, স্যার, আপনি ফিরলেই যাবো ভাবছিলাম।

এ. এস. আই গোবিন্দ বাড়ুয্যে বলল—আসল কথাটা বললেই হয়, বাপু, খুনী ধবার ব্যাপাবটা সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাও।

এ. এস. আই সুভগ সিং বলল—অন্যাই কি? আচ্ছা স্যাব, আমবা তো দেখতে পাবো?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

মুখোটি বলল,—দেখো, বলেছিলাম।

বোঝা যায় সাহেবরা যখন ডাকবাংলোয় ডিনার নিয়ে ব্যস্ত এবং গজেন্দ্র এবং কুজুর তাব তদারকে, এরা তখন থানার ঘরে গভীর একটা আলোচনা করেছে। সেটা স্বাভাবিকও। খুনের জায়গায় কীইবা আছে। লাস কাটা ঘরে লাস পড়ে আছে। আর কোন ঘরে খুন হয়েছিল তা জানা আছে। এ থেকেই কে খুন করেছিল তাকে খুঁজে বার করে দেবে ক্যাথলীন। আর তা দেবে সব বুদ্ধির অগম্য উপায়ে।

মুখোটি বলল—আচ্ছা, স্যার, ওর গলার যে কলার সেটা কি প্লাটিনামের?

বাঁড়ুয্যে বলল—এ তোমার বাড়াবাড়ি। রূপো কী এমন কম হল।

গজেন্দ্র এদের চাইতে বেশি জানার ভান করল কিন্তু কী উত্তর দেবে খুঁজে পেল না। পদমর্যাদা অনুসারে দুজনকেই নিরস্ত করে বলতে হয়-প্লাটিনামও নয়, রূপোও নয়।

সুভগ সিং বলল—ওর বাবা নাকি ইংরেজ?

—তাইতো শুনলাম।

—আর মা ফরাসী?

—তাই হবে।

—আচ্ছা? সুভগ সিং চেখে চেখে সংবাদটাকে অনুভব করল।

গোবিন্দ বাঁড়ুয্যে বলল—আচ্ছা, স্যার, ওকি সাহেবদের সঙ্গে একই টেবলে খেল?

মুখোটি বলল—বাঁড়ুয্যের যে কথা, ওকি অফিসার?

—তা তুমি অস্বীকার করবে কি করে? সাড়ে চারশ মাইনা পায় জানো?

--তাই পায় নাকি, স্যার?

--তাই তো শুনলাম। গজেন্দ্র বলল।

বেশ লাগছে পরিস্থিতিটা। তার থানায় এমন একটা ব্যাপার ঘটবে তা সে ইতিপূর্বে আশা করেনি। যতক্ষণ ওরা থাকবে ততক্ষণ তো বটে, তার পরেও বেশ কিছুদিন তার থানা সম্বন্ধে লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলবে, আর থানার কর্তা হিসাবে তার সম্বন্ধেও। একটা সিগারেট ধরাল গজেন্দ্র আয়েস করে। আর তার বসা দেখে তার অধস্তন এ এস আই এবং কনস্টেবলরা চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে দাঁড়াল।

এ এস আই মুখোটি বলল—খুনীতো আমাদের কুজুর সাহেবই ধরেছেন। তবে কাকে ধরবে তাই ভাবছি।

গজেন্দ্র বলল- সেই যদি খুনী হয় তবে তাকেই ধরবে।

—বারো তেরো মাইল গন্ধ শুঁকে এসে হাসপাতালে?

—তোমার কী মনে হয়?

—তাই সম্ভব।

একজন কনস্টেবল বলল সাড়ে চারশ মাইনা? ইনস্‌পেক্টরের চেয়ে বেশি?

—কাজটাও দেখো।

—তাহলে পেন্সানও পাবে?

গজেন্দ্র নিজে এ বিষয়ে ঠিক কিছু জানে না। কাজেই ব্যাপারটাকে ধোঁয়াটে করে দেয়ার জন্য সে পাল্টা জিজ্ঞাসা করল—তোমার কী মনে হয়?

—তাই হবে, স্যার।

গোবিন্দ বাঁড়ুয্যে বলল— টেবলে খাবার রেখে চেয়ারে বসে খেয়ে ও সত্যি আরাম পায় কিনা তাই ভাবছি।

—কেন পাবে না? সুভগ সিং বলল। তার দেবদ্বিজে পরলোকে গভীর ভক্তি। ও কি যা তা ব্যাপার ভাবেন। আগের জন্মে খুব বড় জ্ঞানী কেউ ছিল।

একজন কনস্টেবল বলল, চারশ টাকা? কী করে টাকা দিয়ে। ছেলে মেয়ে তো নেই। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল তার।

মুখোটি বলল—আমি ঠিক ধরতে পারছি না একটা ব্যাপার। মনে করুন যদি ও হাসপাতালের আসামীকে না ধরে তবে কি আমরা বুঝবো কুজুর সাহেব যাকে ধরেছেন সে আসামী নয়?

আলোচনায় বাধা পড়ল ইনস্‌পেক্টর আসাতে। ডিনার শেষে গল্পগুজব শেষ করে শুতে এসেছে সে। তাকে দেখে আর একবার স্যালুট করল সবাই। তারপর সে কুজুরের সঙ্গে তার বাসার দিকে চলে গেল। আর তখন কনস্টেবলরা আর এক দফা আলোচনা করল।

—কুজুর সাহেব কিন্তু খুব মনমরা হয়ে আছে।

—বোধ হয় ভাবছে যদি ঠিক আসামী না ধরে থাকে।

—কিন্তু একটা মজার ব্যাপার দেখো। চারশ' টাকা যদি মাইনা পায় তাহলে তো ও ইনস্‌পেক্টরই হল। সেলুট কবতে হবে নাকি?

পরদিন সকালে যা হল তাকে তুলনা দিতে হলে বিলেতি ফকস্‌হান্টের কথা বলতে হবে। বললে গজেন্দ্র। এখন সে দেশে সে খেলা আছে কিনা জানি না, তোমরা সাহিত্যিকরা বলতে পারো। ঘোড়ায় চড়ে বিশেষ ভদ্রলোকরা (খানদানি ভদ্রলোক ছাড়া কার বা তেমন পোশাক বা ঘোড়া থাকে, কাদের মহিলারাই বা অমন সাদা গ্লাবস পরে) শিয়ালকে তাড়া কবেন। খানাখন্দ মাঠ বেড়া টপকিয়ে ডিঙ্গিয়ে উঠে পড়ে ছুটে সেই খেলা চলে। একটা শিয়ালের পিছনে পঁচিশজন ভদ্রলোক। গজেন্দ্রদের ব্যাপারটাও তেমনি হলো। একটা কুকুর ছুটে চলেছে আর তার পিছনে তারা ছুটছে, কেউ জিপে, কেউ স্কুটারে, কারো পনি, বেশির ভাগ পায়ে হেঁটে। বনবাদাড় ডিঙিয়ে টপকে কুকুর চলছে তো তারা চলছে, সে থামছে তো তারাও থামছে। শোঁক শোঁক করে মাটি শুঁকছে, কান লটপট করছে, জিভ লকলক করছে। একটা চাপা উত্তেজনায় যেন সে অস্থির হয়ে উঠেছে। আর তার সে উত্তেজনা তাদের দেহমনেও সঞ্চারিত। যে ঘরে খুন হয়েছিল সেখান থেকে বেরিয়ে রিজার্ভ ফবেস্টের মধ্যে কযেক পাক এলমেলো ঘুরে ক্যাথলীন ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে ছুটে চলল। তার সঙ্গে গজেন্দ্ররাও। শুধু পুলিশের লোকরা নয়। ফরেস্টের লোকেরা। কাছাকাছি চা বাগানের দুচারজনও। ছুট ছুট। সুভাগ সিংএব পা মচকে গেল এক খানায পড়ে, বনের মধ্যে গাছেব ডালে মাথা ঠুকে গেল ইন্সপেক্টরেব—বাপ বলে সে বসে পড়ল কিন্তু ছোটা বন্ধ হল না। সকাল থেকে শুরু হয়েছিল দুপুর দুটোয় ক্যাথলীন তুংসুংএ হরকামাযার বাড়িতে পৌঁছে এঘব ওঘর ঘুরঘুর করে বেড়াতে লাগল। ডি সি. পি হাসিমুখে বলল সমবেত সকলকে, দেখলেন তো! বারো মাইল পথ কি করে এসে পৌঁছাল।

হাসিমুখে সিগাবেট ধরালেন তিনি। রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছতেও ভুলে গেলেন।

প্রস্তাবটা দিতে হল গজেন্দ্রকেই।

সাহসভরে এগিয়ে গিয়ে সে এস. ডি. পি ও-কে বলল। তিনি ডি.এস.পি-কে বললেন। আয়োজনটা গজেন্দ্ররই। এস.ডি.পি. ও-র নিজের আসনের নিচ থেকে বেরুলো স্যান্ডউইচ-এর চ্যাঙারী এবং কফি ফ্ল্যাস্ক। ডি. এস. পি, এস. ডি. পি. ও এবং চা বাগানের সাহেবরা তার সদ্ব্যবহারে লাগলেন। কিন্তু গজেন্দ্র প্রত্যক্ষদর্শী। তার আয়োজনে খুঁত থাকে না। কুজুরের স্কুটারের পিছনে বাঁধা কম্বলের পুঁটিলি খুলতে বেরুলো চা, চিনি, এক কৌটো দুধ। চায়ের কাপ, গ্লাস।

এই বিশ্রামের পরেই আবার যাত্রা। কিন্তু ঠিক আগের মতো নয়। ডি. এস. পি কফি পানের পর বললেন—এখন ক্যাথলীন বিশ্রাম করতে পারে। আপনারা যারা এখানে এসেছেন তাঁরা দয়া করে সন্ধ্যায় হসপিট্যালে যাবেন। সেখানে আপনারা অন্য একটি দৃশ্য দেখতে পাবেন।

এর পরে এক জিপে উঠলেন ডি. এস. পি, এবং পদস্থ যাঁরা। ক্যাথলীন অবশ্যই। সে এস. ডি. পি. ওর পাশের সিটেই উঠে বসেছে।

গজেন্দ্র কুজুরের পিছনে উঠে বসল। সুভগ সিং প্রভৃতি চললো সাইকেলে। অন্যেরা হেঁটে।

ডি. এস. পি যা বলেছিলেন ঠিক তাই হল। আশ্চর্য আর কাকে বলে? চোখে না দেখলে প্রত্যয় হয় না। হসপিট্যালে লোকে লোকারণ্য। এত লোক যে কী করে খবর পেল ভাবতে অবাক লাগে। এটা বোধ হয় মানুষের একটা মৌলগুণ সে সত্যকারের ভালো কিছু স্বার্থপরের মতো আত্মসাৎ করে না। প্রত্যেক মানুষই অন্য অনেক মানুষকে খবর দিয়েছে ক্যাথলীনের। তখন আকাশে কনে দেখা আলো; ক্যাথলীনকে ছেড়ে দেয়া হল হসপিট্যালের কাছে একটা জামগাছতলায়। কিছুক্ষণ সে যেন উদ্ভ্রান্তের মতো আকাশ শুঁকলো কিন্তু তা এক মুহূর্তই। তারপর সে হসপিটালের হাতায়

ঢুকে পড়ল। একটু বিমর্ষতা, একটু যেন স্তব্ধতা, তারপর দৌড়ে ছুটে গেল। শিকল ধ'রে তার সঙ্গীও তার সঙ্গে। একেবারে লাশকাটা ঘরের বন্ধ দরজার উপরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারপর আবার একটু দ্বিধা। এর পবে সে দৌড়ে গিয়ে ঢুকল হসপিট্যালের ঘরে। এঘরে ওঘরে কাউকে যেন খুঁজে ফিরছে। হস্‌পিটালের দুতিনটে সিট খালি ছিল সেখানে কনস্টেবলরা রোগী সেজে শুয়েছে। সেদিকে দৃক্‌পাতও করল না। এ দরজা দিয়ে ও দরজা দিয়ে, হসপিট্যালের দরজাগুলো নতুন আগন্তুকের কাছে গোলক ধাঁধা বিশেষ, বেরিয়ে ঢুকে অবশেষে সে সেই ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো যেখানে আসামী। এক মুহূর্ত দ্বিধা তারপরই নিচু একটা ক্রোধের শব্দ করে সে শয্যাশায়ী আসামীর হাত কামড়ে ধরল। ভাগ্যে আসামীব হাতে আগে থেকেই হলদে মোটা কাপড়ের একটা পটি বাঁধা ছিল।

দর্শকদের থামাতে বেগ পেতে হয়েছিল। হসপিট্যালে গোলমাল করা বারণ একথা বলে হাঁকডাক গোলমাল করে বেড়াতে হল গজেন্দ্রকে।

থানার দিকে ফিরে চললো দলটি। ফুটবল-বিজয়ী-ক্লান্ত কিন্তু আনন্দ উচ্ছল একটি দল যেন। বাকি খেলা কাল হবে। আংটি খুঁজে দেবে ক্যাথলীন, রুমাল চোরকে পাকড়াও করবে। দলের মুখে এই কথাই। কী আশ্চর্য! একি কেউ ভেবেছে। তাজ্জব। কেয়াবাৎ! অদ্ভুত!

সকলেই গল্প করছে। একজন কনস্টেবল বলল—কুজুর সাহেব তা'লে ঠিক আসামীই পাকড়েছেন।

—বেশক্‌।

—দেখো, কুজুর সাহেবও কম যায় না। ধরেছিল তো।

—ভাগ্যবান লোক যে।

—কিন্তু ভাগ্য তো প্রতিবারেই সাহায্য কববে না।

—তা ঠিকই বলেছ। এর বেলায় ভাগ্য টাগ্য কিছু নয়? কুজুর প্রশ্ন করল।

—আচ্ছা গলার কলারে কিছু লেখা দেখলে না? একজন কনস্টেবল চাপা গলায় বলল।

—আমারতো মনে হল ইন্সপেক্টর কথাটাই লেখা আছে।

—তাহলেই বা দোষ কি? কোন ইন্সপেক্টর এমন পারে বল।

থানার ঘরে ওরা সবাই বসল। ডি. এস. পি, এস. ডি. পি. ও, ইন্সপেক্টব। ক্যাথলীনের আজ আর দ্বিধা নেই। সেও একটা চেয়ারের উপরে লাফ দিয়ে উঠে বসল। ডি. এস. পি হেসে সিগারেট ধরাল।

মানুষের মনের অবস্থা সামান্য একটা কথাতেই প্রকাশ পেতে পারে। এস. ডি. পি-ও একটা পরিতোষের নিশ্বাস ছেড়ে বললেন,—আহা, গজেন্দ্র, একটু চা হয়?

[বললাম—গজেন্দ্র, চা তোমরা খাও, কিন্তু তোমাদের কারো মনেই প্রশ্ন ছিল না?

—কেন থাকবে। যদি তুমি একটা গল্প লেখার মেশিন পাও তুমি কি প্রশ্ন করবে, না কলের হাতল ঘুরাবে? তদন্ত, তদন্ত, তদন্ত, সারা জীবনই আমাদের তদন্ত আর তার মধ্যে বেশির ভাগই ব্যর্থ। এই একটা সুযোগ পাওয়া গিয়েছে।

বললাম—বলো।]

হাঁকডাক করে মুহূর্তে চায়ের ব্যবস্থা করে ফেলল গজেন্দ্র। চা খেতে খেতে ডি. এস. পি. বললেন, আমরা তো চা খাচ্ছি, কিন্তু ক্যাথলীন?

—ওকি চাও খায় নাকি?

এস. ডি. পি-ও সোৎসাহে বললেন—মদ খেলেও মানায়। কিন্তু ক্যাথলীনের মদ কিম্বা চা কোনটার দরকার ছিল না। সে হঠাৎ টপ করে চেয়ার থেকে নামল। তারপর দরজার দিকে চলল।

তার সঙ্গী বলল—বোধ হয় বিশ্রাম করতে চায়।

ডি. এস. পি বলল—আন্প্রেডিক্টেবল

এস. ডি. পি. ও বলল—কিছুটা হয়তো দাম্ভিকও

ইন্সপেক্টর বলল—আশ্চর্য কি!

ক্যাথলীন সত্যি সত্যি চলে গেল। অনুমান সে যখন বারান্দা পার হচ্ছে তখন হঠাৎ পাহাবাবত কনস্টেবল চিৎকার করে উঠল—আইজ রাইট—অ্যাজ ইউ আর। খট খট করে জুতোয় জুতো লাগানোর শব্দ হল, রাইফেল নামানো ওঠানোর শব্দ হল।

এস. ডি. পি ও বললেন,—কী হল?

—স্যালুট করল পাহারাদার।

—তা ঠিকই করেছে। ডি. এস. পি বললেন।

চা খেয়ে ওঁরা গেলেন।

গজেন্দ্র বলল—কুজুব, এক হাত তাস খেললে কেমন হয়?

—তাস?

—ভালো লাগছে না? বেশ দিনটা আজকে।

—তাস? একটু চা খাই বরং।

—খাও, খাও। ওরে দেখ না কেটলিতে আর চা আছে নাকি?

একজন কনস্টেবল প্রশস্ত কেটলিটা নিঙড়ে কয়েক কাপ চা পেল। এগিয়ে দিল গজেন্দ্র ও কুজুরের সামনে। এ. এস. আই রাও হাত বাড়িয়ে নিল চা। গজেন্দ্র আর একবার তার থানাব জন্যে গর্ব অনুভব কবল। ইতস্তত চেয়ে দেখল সে। কুজুর মন দিয়ে চা খাচ্ছে। চায়ের কাপেই তাব মন। এ এস আই-বা দাঁড়িয়ে আছে তাকে ঘিবে। তাব কিছু দূবে কনস্টেবলবা।

—তোমরা কি আজও রাত জাগবে নাকি? হাসি মুখে বলল গজেন্দ্র।

—না, না এই যাই।

—তা হলই বা, স্যাব, একটু বাত, একদিনই তো।

—কুজুর; তোমাব কি খুব ঘুম পাচ্ছে? ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। অভিভাবক-সুলভ গলায় বলল গজেন্দ্র।

কুজুর নিশব্দে চা খেতে লাগল।

সুভগ সিং বলল—আচ্ছা, স্যার, পাহারাদার সেলুট করে ভালোই করেছে, কি বলেন?

গোবিন্দ বাঁড়ুয্যে বলল—পুলিশের চাকরি করে চারশ টাকা মাইনে পায় তো। তাহলে ইন্সপেক্টবেব র‍্যাঙ্কই হয়।

সুধীর মুখোটি বলল—ডি. এস. পি তো বললেন ঠিকই করেছে স্যালুট করে।

কুজুর বলল—কিন্তু কুকুর তো।

—তা হক। গজেন্দ্র বলল, সে সব কথা যাক, আমি ভাবছি তোমার মতো লাকি আর কে?

—লাকি?

—তা নয়তো কী বলো। তুমি যে ঠিক আসামী ধবেছ তাতো প্রমাণই হল।

—কুকুরটাও তো লাকি।

—না, স্যার, ওকে ঠিক লাকি বলা যায় না। ওর ক্ষমতাই ওইরকম। সুধীর মুখোটি হাসতে হাসতে বলল।

—তা হবে। কুজুর বলল। কী ভাবল সে।

গজেন্দ্র বলল—ভাগ্যবান, সব দিকেই তোমার ভাগ্য কুজুর।

এ কথা বলার সময়ে গজেন্দ্রর মনে কুজুরের মেমবউএর কথাও ভেসে উঠেছিল।

কুজুর বলল—আসামীর হাতে কিন্তু একটা হলুদ কাপড়ের পট্টি বাঁধা ছিল। ঘরের সবাই প্রায় সমস্বরে বলল—তাতে কী?

—আর কারো হাতে কিন্তু তা বাঁধা ছিল না।

এ. এস. আই সুধীর বলল—সে তো যাতে আসামীর গায়ে দাঁত বসিয়ে না দেয় সেজন্যে।

কুজুর ভাবতে লাগল।

গজেন্দ্র মনে করল, এটা তার হিংসা হতে পারে। একটু একটু হিংসা তারও তো হচ্ছে।

পরের দিন সকালে ওদের চলে যাওয়ার আগে আংটি চুরি, রুমাল লুকনো এসব খেলা হবে। এটা থানার হাতাতেই হয়েছিল। তার মূলে গজেন্দ্রর একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। ক্যাথলীন কাল খুনী সনাক্ত করার পর যখন গজেন্দ্র বাড়িতে ফিরল তখন তার ছেলে দুটি যুযুদ্ধমান অবস্থায়। ব্যাপারটা ক্যাথলীনকে নিয়েই। বড়ছেলে বলেছে, ক্যাথলীন টেবিল চেয়ারে বসে খানা খায়। ছোটছেলে তা মানতে রাজি নয়। ছোটছেলে বলেছে, ক্যাথলীন টিপসই দিয়ে মাইনে নেয়, বাবার চাইতেও অনেক বেশি। বড়ছেলে বলেছে—বাবার চাইতে বেশি মাইনে পেতে পারে, তাই বলে আঙুল যার নেই সে টিপসই দেবে, তা মানা যায় না। কিন্তু এসব কারণ নয়। গজেন্দ্রর পত্নী বলেছিল, তোমাদের কুকুরটি বেশ দেখতে। দেখেছ নাকি? হ্যাঁ। বড়ছেলে বলল—বলো তো কী রকম দেখতে? কেন বাদামি রং। ল্যাজটা ঝাঁকরা। ছাই দেখেছ, ওটাতো থানার নেড়িটা। রাত্রিতে পত্নী অভিমান করলেন। অভিমানের মূল বক্তব্য, জীবনে সব কিছু থেকেই তিনি বঞ্চিত। একটা এরোপ্লেনে পর্যন্ত চড়েন নি। কী দেখেছেন, কী শুনেছেন? কাজেই গজেন্দ্রকে ব্যবস্থা করতে হল থানার হাতাতেই যাতে খেলাটা হয়।

খেলা শুরু হল। তার আগে ডি. এস. পি একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিলেন। তার সারমর্ম এই রকম · মানুষ অনেক কিছু করতে পারে বটে, কিন্তু যন্ত্র সেই অনেক কিছু করাকে সহজ করেছে, নিশ্চিত করেছে। ঘড়ি সময় দেয়, এরোপ্লেন আকাশে ওড়ে, এগুলো ভেল্কি নয়। ক্যাথলীন চোর ধরে খুনী ধরে, তাও ভেল্কি নয়। বিজ্ঞানবিদরা বলেন ইত্যাদি। এখানেই মানুষের উপরে যন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ক্যাথলীনের মতো প্রাণীদেরও।

তার পর খেলা শুরু হল। তিনঝোরা চা বাগানের মেমসাহেব নিজের আংটি খুলে দিলেন, কিন্তু কে তা চুরি করবে। কারোই যেন সাহস হয় না। অবশেষে যে এগিয়ে এল সে কুজুর। আংটিটা গোপনে তার হাতে দেয়া হল। সে যখন গজেন্দ্রর পিছন দিয়ে চলে যাচ্ছে তখন গজেন্দ্র ফিসফিস করে বলল—দেখো বাপু কঠিন কিছু করো না।

—কেন, পারবে না মনে হচ্ছে? কুজুর হাসল—ফ্যাকাসে মুখে।

—ঠিক তা নয়। তবে—

গজেন্দ্রর মনের অবস্থা, ভাই পরীক্ষা দিচ্ছে, এমন একজন দাদার মতো। কুজুর কত কীই করল অনেক মিনিট ধরে ভিড়ের মধ্যে গলে, এদিকে ওদিকে চলে, এক পথে দুবার তিনবার ঘুরে, পায়ে পায়ে গোলক ধাঁধা রচনা করে অবশেষে সে কনস্টেবলদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ক্যাথলীনকে ছাড়া হল। মেমসাহেবের হাতটাকে কয়েকবার শুঁকল সে। তারপর ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কুজুরের লুকোতে বেশ কিছুক্ষণ লেগেছিল, ক্যাথলীনের দুমিনিটও লাগল না। দ্বিতীয় খেলা শুরু হল যখন দর্শকদের আনন্দ কোলাহল তখনও মিলিয়ে যায় নি। ডি. এস. পি বললেন, এবার আমার পকেট থেকে কেউ রুমালটাকে সরিয়ে নিয়ে দুশ গজের মধ্যে কোথাও থাকুন। তাই তো, এ খেলাটা কি করে হবে? ডি. এস. পি-র পকেট থেকে রুমাল সরাবে কে? কেউ এগোয় না।

অবশেষে ডি. এস. পি বললেন, তাহলে আপনারা কেউ আসুন, আমার পিছনে দাঁড়ান, রুমালটা আমি বার করে দিচ্ছি। কিন্তু পকেট হাত দিযে দেখা গেল রুমালটা সত্যি নেই। কি আশ্চর্য, কে নিল? ডাকবাংলোয় রেখে এসেছেন? তখন ক্যাথলীনের সঙ্গী বলল, ক্যাথলীনই বলুক। ডি. এস. পি-র পকেট শুঁকিয়ে ক্যাথলীনকে ছেড়ে দেয়া হল। এদিক ওদিক ঘুবতে লাগল সে। একটু যেন দিশেহারা ভাব। গজেন্দ্রর বুকের ভিতরটায় ধক করে উঠল, তা হলে এবার কি ক্যাথলীন পারবে না? কিন্তু ক্যাথলীন তো মানুষ নয়। যন্ত্রের মতোই নির্ভুল। থানার হাতা পার হয়ে, থানাব ঘরেব মধ্যে ঘুরে, থানার বাড়িকে কয়েক পাক ঘুরে সে সোজা থানার কর্মচারীদের কোআর্টার্সের দিকে দৌড়ল। সে কী কোথায় যায়? এবার আর পারবে না। দেখা যাক না কি হয়। জনতা স্তব্ধ হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কয়েক মিনিট মাত্র। ক্যাথলীন কুজুরকে নিয়ে এল তার কোয়াটার থেকে। ইতিমধ্যে কুজুর তার পোশাক বদলেছে। সাদা ট্রাউজার্স আব হাওয়াই শার্ট পরেছে, তা সত্ত্বেও তাব মুখের চেহারাটা দস্তুর মতো অপরাধীব। ডি. এস পি বললেন সমবেত জনতাকে—আর কিছু প্রমাণ চান আপনাবা? জনতা নিরুত্তর। গজেন্দ্র বলল—দেখো, কুজুর, তুমি কিন্তু আব এগিয়ো না। ভালো দেখায না।

—কেন, বারবাব তিনবাব। কুজুর বলল।

—তুমি কি এখনও বিশ্বাস করো না?

কুজুর বলল—আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

গজেন্দ্র অবাক হল। কুজুরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। চোখ দুটি চকচক করছে।

গজেন্দ্র বলল--শত হলেও কুকুরটা তো আমাদের ডিপার্টমেন্টেরই। ফেটিগ বলে তো কিছু আছে।

ডি. এস. পি-ও বললেন—কি কুজুর, আবাব নাকি?

আর একবাব খেলা হল। এবারও ফাউন্টেনপেনটা গাছতলা থেকে এনে দিলে ক্যাথলীন।

খেলা শেষ হয়েছে কিন্তু জনতার ভিড় ভাঙছে না। ডি. এস. পি সিগার ধরালেন। পুলিশ অফিসারবা কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। খুশী মনে যেমন কথাবার্তা হয়ে থাকে।

ডি. এস. পি হাসিমুখ বললেন,—কুজুরও আজ অনেক বুদ্ধি দেখিয়েছে।

এস. ডি. পি. ও বললেন—কিন্তু হারল তো।

প্রকৃতপক্ষে কুজুর যেন ক্যাথলীনের সঙ্গে বুদ্ধির পরীক্ষাই দিয়েছে। থানার ঘরে এসে বসলেন ওঁরা।

এর পরে ডি. এস. পি থানার কনস্টেবলদের সঙ্গে দুএকটা করে কথা বলতে লাগলেন। তাবা সকলেই স্যালুট করে এসে দাঁড়াতে লাগল। তাবপর ডি. এস. পি-রা গেলেন গজেন্দ্রর কামবায় খুনের তদন্ত রিপোর্টটা আলোচনা করার জন্যে।

একটা রেজিস্টার নিতে গজেন্দ্র এসেছিল এই ঘরে। সকলের অলক্ষ্যে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখল। বলা যায় না, হঠাৎ যদি কোন খুঁত কারো চোখে পড়ে। এটা চাকরিও তো বটে। সে দেখলো দত্তগুপ্ত এবং কুজুর গল্প করছে মুখোমুখি বসে।

—কী ব্যাপার?

দত্তগুপ্ত বলল—কুজুর সাহেব বলছেন, ক্যাথলীনের সঙ্গী যে তাকে শিকল ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করে নি তার প্রমাণ কী।

—হাউ অ্যাবসার্ড, কী যে বলো কুজুর। কিন্তু তোমার পরনে এখনও সিভিল ড্রেস।

কুজুরের খেয়াল হল। সে পোশাক বদলাতে গেল।

থানার দরজার সামনে তখনও ভিড়। কারণ ক্যাথলীন একটা চেয়ারে উঠে বসেছে। তার গায়ের পশমগুলো চকচক করছে ঘামে। জিভ ঝুলিয়ে সে অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে।

[গজেন্দ্র বলল—আচ্ছা, মোহিত, তোমরা সাহিত্য কঁরো। মনস্তত্ত্বের কথা নিশ্চয়ই জানো। বলতে পাবো কুকুর যা করল তা সম্ভব হল কি করে?

—কী করল তা বলো আগে।

—নতুন ইস্ত্রি কবা পোশাক পরে কুজুর থানায ফিরলো। তাব পোশাক পরাটার বৈশিষ্ট্যই এই সব সময়ে তা সদ্য ইস্ত্রি করা। বোধ হয় তাব মেমবউএর হাতের কাজ। যাক সে কথা। পোশাক পরে হাসতে হাসতে সে যখন থানার ঘরে ঢুকছে তখন সে ঘরে তার উঁপরওয়ালা কেউ ছিল না। ক্যাথলীন অবশ্য ছিল চেয়ারের উপরে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে একটা জনতা তাকে দেখছে। তাদের দিকে চেয়ে সে তখনও জিভ লকলক করে হাঁপাচ্ছে। দরজা পেরিয়ে ঘরে পা দিয়েই জুতো ঠুকে স্যালুট করল কুজুর।

—কাকে, ক্যাথলীনকে? কনস্টেবলদের মতো সেও কি ক্যাথলীনকে উপরওয়ালা মনে করেছিল।

গজেন্দ্র বলল—এটা, অবশ্য, এমন হতে পারে যে তার বিবেক শান্ত হচ্ছিলো না এমন কিছু না করে?

—কেন, কেন?

—সকালের খেলার সমযে সে ক্যাথলীনকে জব্দ করাব জন্য কম চেষ্টা করে নি।

—এটা কন্‌ডিশানড্ রিফ্লেকস্‌ও হতে পারে। পোশাকেব ইস্ত্রির সঙ্গে যাব যোগাযোগ আছে। কিন্তু গল্পটা বলো।]

গজেন্দ্ররা এই ডামাডোলে ভুলেই গিযেছিল হাজতে একজনকে ধরে বাখা হযেছে। এবার সে মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সে যেন চাপা গলায় কাশল। দৃষ্টি আকর্ষণ করল, বলা বোধ হয় ঠিক নয়। কাল রাত্রিতেও যখন গল্প হচ্ছিল তখন হাজতী আসামীও শিকের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গল্প শুনছিল। এ. এস আই সুধীর মুখোটি তাব খাবার ব্যবস্থাও কবেছিল। কাশির শব্দ শুনে কুজুর ফিরে দাঁড়াল। মনে হল সে যেন কিছু বলবে। কিন্তু কিছু না বলে, ববং ভাবতে লাগল সে মুখ নিচু করে।

ডি. এস. পি ও এস. ডি. পি. ও তদন্তের রিপোর্ট পড়া শেষ করে উঠলেন। তাঁবা লাঞ্চে যাবেন ডাকবাংলোয়। লাঞ্চ শেষ হলেই জিপ রওনা হবে। ইনস্‌পেক্টর থাকবেন বাকি তদন্ত পরিচালনার জন্য। ক্যাথলীনকে তারা থানা থেকে তুলে নিয়ে যাবেন। ততক্ষণে যত লোকে পারে দেখে নিক।

ওঁরা বেরিয়ে যেতে গজেন্দ্র থানার ঘরে এল। কুজুর একটা চেয়ারে বসে বাজে কাগজ ছিঁড়ছে কুটিকুটি করে।

গজেন্দ্রর মন ভালো ছিল। ওঁরা আসবাব সময়ে সে কুজুরকে দূরে রাখতে চেয়েছিল। এখন তা প্রয়োজন বোধ করল না। বলল, খাওয়া দাওয়া করে নাও কুজুর। ওঁদের সঙ্গেই নদীর ঘাট পর্যন্ত যাও তুমি। আর হাজতী আসামীর চালান লিখে দিচ্ছি ওকেও রওনা করে দাও।

এই বলে গজেন্দ্র নিজের কামরায় ঢুকে হাজতী আসামীর চালান লিখতে বসল। চব্বিশ ঘণ্টার বেশি আটকানো হয়েছে। সেটা ঢাকতে হবে।

কিন্তু দুএক মিনিটের মধ্যেই তাকে অবাক হয়ে লেখা ছেড়ে উঠতে হল। কে যেন কাকে মারছে, প্রচণ্ডভাবে মারছে। কাঁদছে কেউ।

থানার ঘরে ঢুকে গজেন্দ্র স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাজতের দরজা খুলে ঢুকেছে কুজুর, আর নির্দয়ভাবে মারছে আসামীকে একটা বেল্ট দিয়ে।

—আহা করো কি, করো কি, বলে গজেন্দ্র এগিয়ে গেল। মারছো কেন মিছিমিছি। কুজুর আরও কয়েকটা চড় মারল আসামীর গালে। হুহু করে কেঁদে উঠল সে।

গজেন্দ্র কুজুরকে প্রায় ঠেলে বার করে দিয়ে হাজতের দরজা বন্ধ করে দিল। গম্ভীর গলায় বলল, খেয়ে নাওগে। সাহেবদের সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে।

কুজুর মুখ তুলে তাকাল। অবাক লাগল গজেন্দ্রর—এ যেন অন্য কোন কুজুব।

এখানে গজেন্দ্রর গল্প বাধা পেল। ওরা যান্ত্রিক গোলযোগ পার হতে পেরেছে। ডিনার দেয়া হচ্ছে খবর এল।

বললাম,—বেশ কথা, কিন্তু কুজুর হঠাৎ আসামীটাকে মাবল কেন?

গজেন্দ্র বলল, এ নিয়ে তদন্ত হয়েছিল। সুধীর মুখোটি বলেছিল—কুজুর যখন ক্যাথলীনকে স্যালুট করে তখন আসামী হেসেছিল। আসলে সেটা তাব কাশি নয়।

বণিক লক্ষেশ্বর

পাহাড়টার পাশ দিয়েই তাদের যেতে হবে। কিছুদিন আগেও এবকম কোন পাহাড় ছিল না সমতটে। অবশ্য, শুধু পাহাড় বলে অন্য অনেক পাহাডের সঙ্গে তুলনা দিলে এটাক্কে পাহাড় বলার জন্য সমতটের বণিকদের বিদেশীরা বিদ্রূপ করতে পারে। একশো থেকে দেড়শো হাত উঁচু মাটি এবং পাথরের স্তূপ। গা বেয়ে বেয়ে ফণী মনসার কাঁটাজঙ্গল উঠছে চূড়ার দিকে। সেখানে রাত্রিতে আলোর ব্যবস্থাও করা হয় জাহাজকে পথ দেখানোর জন্যে। কিন্তু এজন্যেই এ পাহাড়টাকে সমতটের লোকেরা মনে রাখবার মতো কিছু মনে করে না। আসল কারণ এই শেখরসেন সেবার পোতাশ্রয় সংস্কার কবেছিল। চম্পাবতীব মোহনায় বহুদিন ধবেই কাদা জমে যাচ্ছিল। এক হেমন্তে দেখা গেল সমুদ্র ও নগবেব মধ্যে যেন কাদার পাথার তৈবি হযেছে, জোয়ারে লুকিয়ে যায়, ভাঁটায় কদর্যভাবে আত্মপ্রকাশ করে। শেখরসেন পৌরসভায় একদিন ঘোষণা করল চম্পাবতী নিজে পারছে না, বান্ধবীকে সাহায্য করতে সমতটের বণিকদেরই অগ্রসর হতে হবে। লক্ষ্য করা গিযেছিল চম্পাবতী সেই পাথারের উপর দিয়ে তিনটি বিশীর্ণ ধারায় প্রবাহিত। শেখরসেন প্রধান খাতটিকে শুকিয়ে তোলার জন্য জাঙ্গাল বেঁধে নদীকে অন্য দুটি ধারায় চালিত করেছিল। শীতে প্রধান খাত শুকিয়ে এলে সুরু হল পঙ্কোদ্ধার। অমানুষিক এই পরিকল্পনার পিছনে ছিল তার অমানুষিক মনোবল। অবশ্য বণিকরাও সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল নতুবা খনকদের বৃত্তি যোগাতে পৌরকোষ নিঃশেষ হয়ে যেত। পঙ্কোদ্ধারের পর স্তূপীকৃত পঙ্ক আর শিলা এখন পাহাড় হয়ে আছে।

আর এই সময়েই লক্ষেশ্বর ক্রীতদাস বাণিজ্যে তার বিশিষ্টতা প্রমাণ করেছিল—দুটো জাহাজে সে এক হাজারের বেশী ক্রীতদাস এনেছিল বিদেশ থেকে শেখরসেনকে সরবরাহ করার জন্য। সকালের স্নিগ্ধতা তখন তপ্ত হয়ে উঠেছে, তা সত্ত্বেও সমুদ্রের যে হাল্কা বাতাস মাঝে মাঝে তাদের উত্তরীয় উড়িয়ে দিচ্ছে শরীরকে তা স্নিগ্ধও করছে। দূরের নীল সাঁওতালি পাহাড় আর কাছের নীল সমুদ্রের মতো শুরসেনের উত্তবীয়ও নীল দুকূলের।

কিছুক্ষণ আগে তারা শেখরসেনের প্রতিভা নিয়ে কথা বলছিল আর তা প্রমাণ করতে গিয়ে শুরসেন শেখরসেনের আর একটি কীর্তির কথা বলেছে। ব্যাপারটা যখন ঘটে তখন চন্দ্রশেখর সমতটে, ছিল না। অন্যের মুখে শোনা শুরসেনের মুখে শোনা এক কথা নয়। কাজেই আগে শুনে থাকলেও শুরসেনকে সে অনুরোধ করেছিল ঘটনাটাকে বর্ণনা করতে।

আর একবার নগর পরিষ্কার করেছিল শেখরসেন। প্রাচীন মিশরে নাকি একবার দৈবী অভিশাপে এক মহামারী দেখা দিয়েছিল। তেমনি এক ভয়ঙ্কর ক্ষতরোগ আকস্মিক বিপর্যয়ের মতো এসে পড়েছিল সমতটে। গলিত কুষ্ঠের মতো সেই ব্যাধি, কিন্তু তার চাইতেও শতগুণে সংক্রামক। সমাজের নিচুতলায় সুরু হয়ে, অনেক বিচক্ষণ মত এই লক্ষেশ্বর যে ক্রীতদাস এনেছিল তাদের থেকে সূত্রপাত, নাবিকদের মধ্যে প্রসারিত হয়ে চলল সেই মৃত্যু। গলিত পারদ দিয়ে কতনা অবলেপ তৈরি করল ভিষকরা। তবু ব্যাধির বিরামহীন সংক্রমণ নিচুতলা থেকে ক্রমশ সমাজের উঁচু দিকে বিস্তারিত হয়ে গেল। প্রমোদভবনগুলি বন্ধ হয়ে গেল। নৃত্যের ছন্দে লীলায়িত নগরনায়িকার দেহে হঠাৎ সে রোগ আত্মপ্রকাশ করল। বণিকদের প্রাসাদের দ্বারগুলো রুদ্ধ হল, কিন্তু সেই রুদ্ধদ্বার প্রাসাদের কক্ষ থেকেও হাহাকার ধ্বনি উঠতে লাগল। নাগরিকরা রোগগ্রস্তদের নিজেদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করে

দিল—আত্মীয় প্রিয়জন নয় তারা আর, রোগী, মৃত্যুর স্পর্শবাহক। ক্ষুধা আর রোগের যন্ত্রণায় ব্যাধি নিয়ে সমতটের পথে পথে হাহাকার করে বেড়াতে লাগল তারা।

কিন্তু নগরপ্রধান শেখরসেন ছিল নগরের অতন্দ্র প্রহরী। তার কর্মচারীরা নগরের বাইরে চম্পার সৈকতে অসংখ্য কুটির তৈরি করল। আহার্য এবং পানীয় যেন নগরকে নিঃশেষ করে সঞ্চয় করা হল সেখানে। রোগীদের জন্যই এই আয়োজন। শুধু আহার্য ও পানীয় নয়, সুরা এবং স্রক্‌, ভেষজ এবং চন্দন। স্বভাবতই ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ এক নতুন উত্তেজনার সন্ধান পেল।

তারপর হঠাৎ সুরু হল শেখরসেনের বহ্ন্যুৎসব। লেলিহান শিখার মধ্যে শেষবারের মতো আর্তনাদ করে উঠল তারা, কিন্তু সশস্ত্র নগরসেনা ঘিরে রেখেছিল তাদের সেই জতু-উপনিবেশকে। তাদের পিছনে ছিল নগরপরিষদদের কর্মচারীরা যাতে চম্পার সৈকতের আগুন নগরের দিকে অগ্রসর হতে না পারে। কেউ বলে পাঁচশ, কেউ বলে দুহাজার। শেখরসেন শেষবারের মতো নগরকে পরিচ্ছন্ন করেছিল।

কেন শেখরসেন এই উপায় অবলম্বন করেছিল? চন্দ্রশেখর চিন্তা করল। মিশরের বেলায় দৈবী অভিশাপ কারণ হিসাবে উপস্থিত ছিল, কাজেই মানুষের খুব একটা করাব কিছু ছিল না ; কিন্তু সমতটে মানুষের নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবার সুবিধা ছিল না। এটা, যদিও, শেখরসেনের চরিত্রও হতে পারে যে সে এই উপায়টিকেই বেছে নিয়েছিল।

এ ঘটনার পবেরটুকু চন্দ্রশেখর নিজেই জানে। মানুষের সব রকমের গতিরই বোধ হয় একটা সীমা আছে। খনির দেশ সুমাত্রা থেকে ফিরে সে নিজেই ইতিহাসের সে অধ্যায়ে অংশগ্রহণ করেছিল। তখন রাঘবারির মতো কোন বণিক সমতটে ছিল না যে খরধার জিহ্বার কষায় এক নগরপরিষদের অধিবেশনে শেখরসেনকে স্তব্ধ করে দেবে। বস্তুত রোগ এবং তার প্রতিকার দুই-ই বণিকদের সমান নির্বাক করে দিয়েছিল। কিন্তু একটা পরিবর্তনই এসেছিল যেন শেখরসেনের চিন্তায়। সরে দাঁড়াল সে। আর তাবই ফলে চিত্ররথ নগর-প্রধান হয়েছে।

বল্গা দুলিয়ে রথের ঘোড়া দুটোকে মৃদু মৃদু আঘাত করে তাদের গতি বাড়াল শুরসেন। হেসে বলল : 'প্রতিভা এমন একটা বিষয়, চাঁদ, যার বর্ণনা করা কঠিন। মনে হয় সেটা একরকমের কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা, যার সাহায্যে কিছু একটা ঘটিয়ে দেয়া যায়, কিন্তু ঘটে যাওয়ার পর কষ্টের কথা কারো মনে থাকে না।'

চন্দ্রশেখর বলল, 'কবিদের সম্বন্ধে তোমার কথা খুব খাটে। পূর্ব-অনুভূত দুঃখগুলিকে নতুন করে ভোগ করে বাক্যচয়ন করার শ্রম স্বীকার করে তারা যা লিখে ফেলে আমরা সে কাব্য পড়ে সুখই পেয়ে থাকি।'

'এ যুক্তি বণিকদের সম্বন্ধেও সত্য, যদি ভেবে দেখো।' এই বলে শুরসেন হাসল।

'তুমি কি লক্ষেশ্বরের দাসব্যবসায়ের কথা বলবে?' বলল চন্দ্রশেখর।

"না, ঠিক তা নয়। দাসব্যবসায়! শুনেছি তার গ্রামে নাকি পিঁজরাপোলের মতো একটা ব্যবস্থা আছে। বুড়োবুড়ি দাসদের কয়েক কড়ি দিয়ে কিনে নাকি লক্ষেশ্বর সেখানে তাদের আশ্রয় দিতো। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের নাকি সন্তানসন্ততিও হতো। এই ব্যবসায়ে নাকি পিঁজরাপোলের খরচটা উঠত। কিন্তু আমি বলতে চাইছিলাম, চাঁদ, তুমি কবি হলে আমরা একটি মহাকাব্য পেতাম। এ বিষয়ে আমার আর সন্দেহ নেই।'

'লক্ষেশ্বরের কথা উঠেছিল, তা নিয়েই তো চলতে পারত।' চন্দ্রশেখর বলল। 'তাই নয়?'

'আচ্ছা, চাঁদ, তোমার প্রতিভার স্ফুরণের জন্য তুমি কি শ্রীবিজয়ের সামন্তর কাছে ঋণী? তাঁতী চুরির ব্যাপারে কি তিনিই তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন? নাকি তোমারই ইশারায় ইঙ্গিতে বলা কোন কথা থেকে সুরু?'

'আহা, শুর,' চন্দ্রশেখর বলল, 'এটাকে তুমি কি চুরি বলবে? বজ্রসেন লীলাকে উপহার পৌঁছে দিয়ে দিগনগরে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে সে শুনতে পায় কয়েকজন তাঁতী দাদনের মর্যাদা রাখতে চায় না ফলে তাদের সমাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। তখন বজ্রসেন সেখানকার বণিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা সুরু করল। সেই বণিকরাই এক জাহাজ শঙ্খের বদলে দশটি তাঁতী পরিবারকে বজ্রসেনের জাহাজে তুলে দেয়। সেই শঙ্খ নিয়েই আজ যাচ্ছে 'মধুলুব্ধা'। দামটাও ভেবে দেখো।'

'চাঁদ, তোমার বিবৃতিটাকে আমি অবসর সময়ে ভেবে দেখবো। এটাকে বিবৃতি দেয়ার আদর্শ যেসব পুঁথিতে লেখা হয়ে থাকে সেখানে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত মনে হচ্ছে।' এই বলে শুরসেন হাসল।

সময়ে সময়ে সমতটের বণিকদের অনেকে অনুভব করেছে সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের জন্য বাংলাদেশের বণিকদের মুখ চেয়ে থাকতে হয় তাদের। সমতটেও কি মসলিন তৈরি করা যায় না? অনেকের এই চিন্তাই কাজে লাগিয়েছে চন্দ্রশেখর। এক জাহাজ শঙ্খের বদলে দশটি তাঁতী পরিবার এনেছে সে বাংলা দেশ থেকে।

ব্যাপারটা সমতটে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে এখনও স্বীকৃতিলাভ করেনি। তাঁতীরা কাজ করছে বটে কিন্তু বাংলাদেশের শাড়ি এখনও তৈরি হচ্ছে না যেন। চাঁদ বলল, 'শুর, তোমার মন খুব ভালো আছে আজ। সেটা যে ইরাণী সুরার আশ্বাস তাও বুঝতে পারছি।'

'অস্বীকার করছি না, এগিয়ে যাও।'

'তোমাকে একটা সমস্যার কথা বলতে চাই। তাঁতীদের সাধারণ ক্রীতদাস থেকে পৃথক করে রাখার ব্যবস্থা করতে চাই।'

শুরসেন চিন্তা করল। বলল, 'এ তুমি ভালোই করবে, চাঁদ, শিল্পের সূক্ষ্মতাই যদি তুমি চাও, তারা স্বাধীন অন্তত এই ভ্রান্তির সৃষ্টি করতে হবে।'

প্রতিভা নিয়ে এই আলাপের যে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে তা নয়। এদের সম্বন্ধে এমন বলা যায় যে চকচকে কথার টানে যে কোন বিষয় নিয়েই এরা এ ধরনের আলোচনা করতে পারে।

একটা মোড় ঘুরতেই তাদের রথ চম্পাবতীর ঘাটের কাছাকাছি এসে পড়ল। দূর থেকেই, যেমন স্বাভাবিক, অনেকগুলি নানা আকারের জাহাজকে দেখতে পাওয়া গেল। আরও দূরে আরও জাহাজ। জাহাজগুলোর আকারে এমন একটা মিল আছে যা থেকে অন্যদেশের জাহাজের সঙ্গে তুলনায় তাদের সমতটীয় বলে চেনা যায়, কিন্তু নিজেদের মধ্যে তাদের পার্থক্যের শেষ নেই। লক্ষেশ্বরের দুখানি জাহাজের পাশে ইন্দুধবর একখানিকে দেখা যাচ্ছে। ঘাটের কাছে তাদের থেকে কিছুদূরে চাঁদের ময়ূরপঙ্খী মধুলুব্ধাকে চেনা যাচ্ছে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে লক্ষেশ্বরের 'দিগ্‌গজ' কিম্বা ইন্দুধবর 'বলাহক' থেকে তো বটেই চাঁদের নিজের মধুকর ও মধুমক্ষিক জাহাজের সঙ্গেও মধুলুব্ধার গঠনে কিছু পার্থক্য আছে। মধুলুব্ধা অন্য দুটির তুলনায় ছোট কিন্তু অন্যান্য সমআয়তনের জাহাজের তুলনায় তাকে দীর্ঘ বলে মনে হয়। এর ফলে তার গতিটা দ্রুততর, যদিও সে মধুমক্ষিকের মতো ভারবহন করতে পারে না, কিম্বা মধুকরের মতো সমুদ্রগামিতার আশ্বাস দেয় না।

চাঁদের রথ থামতেই তার বাণিজ্য দপ্তরের বৃদ্ধ অধিকর্তা এগিয়ে এল। প্রথাসম্মত মঙ্গলাচরণের জন্য চাঁদের পরিবারের পুরোহিত-পরিজনরা এসেছিল। তাদের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। চাঁদের জন্যই জাহাজ অপেক্ষা করছে। সব জাহাজের যাত্রার সময়ে থাকা সম্ভব হয় না এখন আর চাঁদের, কিন্তু আজ সে তার প্রাসাদ থেকে সংবাদ পাঠিয়েছিল শেষ মুহূর্তের কিছু উপদেশ দেয়ার আছে তার।

জাহাজের উপরে যারা ছিল তারাও চাঁদকে দেখতে পেয়েছিল। জাহাজের পাটাতনের সিঁড়ি

বেয়ে জাহাজের অধ্যক্ষ নেমে এল। মধুলুব্ধার অধ্যক্ষ আয়ুষ্মান। তার কপালে দই, চন্দন, চাল দিয়ে নানা মঙ্গল চিহ্ন আঁকা। চাঁদ তা নিয়ে আয়ুষ্মানেব সঙ্গে মৃদু মৃদু বসিকতা করল। অধ্যক্ষ হিসাবে এবারেই আয়ুষ্মানের প্রথম সমুদ্রযাত্রা।

'কিছু চাই নাকি?' বলে চন্দ্রশেখর হাসল এবং বলতে বলতে হাসিমুখে নিজের গলা থেকে এক ছড়া মুক্তাহার খুলে নিল।

আয়ুষ্মান বলল, 'আমার জন্য কিছু নেই একি কখনও হতে পারে?'

চাঁদ বলল, 'শোনো, আয়ুষ্মান, এবার তোমাকে কাজের কথা বলি। বণিক সুমনসের কাছে হুণ্ডির টাকা আদায়ই তোমার সমুদ্রযাত্রাব প্রথম সার্থকতা। তুমি মনে বাখবে বণিক সুমনস মহামানী শ্রেষ্ঠি। তার সঙ্গে সাক্ষাতে যদি তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তাহলেও কদাচ কোন কটূক্তি করবে না। তুমি তার সঙ্গে আলাপ করার সময়ে মনে করবে আমার সঙ্গেই আলাপ কবছো। তা হলে তোমার কথায় কোন ত্রুটি দেখা যাবে না। তুমি মনে রাখবে সমতটের কৃষ্টির সমস্ত লক্ষণই বহন করে চলেছ তুমি। এই কয়েকটি কথা মনে বাখলেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।'

চাঁদের এই শেষ সময়ে দেয়া উপদেশ অধ্যক্ষ মাথা নিচু করে শুনল।

জাহাজ প্রস্তুত ছিল। অধ্যক্ষ ফিরে যেতেই পাটাতন উঠল। নোঙ্গবের বশি খুলে দিয়ে একজন নাবিক প্রায় তুলে ফেলে দেয়া পাটাতনের উপর দিয়ে দৌড়ে গিযে উঠল জাহাজে। তিন থাকে ত্রিশ জোড়া দাঁড় নড়ে উঠল, পালেব বশি টেনে ধবল কাণ্ডারীব সঙ্গীবা। শরতেব নীলদিগন্তে বৃদ্ধের কেশকুণ্ডলীর মতো শুভ্র মেঘ। বাতাসে টাটকা কষায স্বাদ, সেই বাতাসে ভবে উঠল পালগুলি। এই চিরাচরিত দৃশ্যগুলোর মধ্যে মধুলুব্ধা সমতটেব পোতাশ্রয় থেকে বওনা হল।

জাহাজ কিছুদূব অগ্রসব হলে চাঁদ বলল, 'চলো, শুব, এবাব দেখা যাক বীবসেনেব ইবাণী বণিক কি দেখাতে পারে।'

'যদি তুমি গৃহের জন্য কাতর না হয়ে থাকো।'

'গৃহ? ও!' চাঁদ হাসল, 'চলো, চলো।'

এটা চাঁদের দুর্বলতা নয় যে সে তাব সাঁওতালি প্রাসাদের কথা চিন্তা করে থাকে গৃহকাতরবা যেমন করতে পারে, যদিও তেমন নয় সে। সাঁওতালি পাহাড়ে প্রাসাদ তুলবার পরিকল্পনাটা তাব অনেকদিনের। প্রাসাদটা এখন অনেকটা গড়ে উঠেছে। প্রাসাদ নয়, প্রাসাদ-দুর্গ কিম্বা প্রাসাদপুরী বরং বলা যেতে পারে। পাহাড়ের দুটি বাহু যেখানে নগরের দিকে প্রসারিত সেখানেই প্রাসাদপুরী উঠছে। আধুনিক কালের তুলনা দিতে গেলে গোলকোণ্ডার দুর্গপুরীর উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রয়োজন ছিল কি এই প্রাসাদপুবীর? প্রয়োজনেব কথা তুলতে গেলে বলতে হবে চন্দ্রশেখরের পারিবারিক প্রাসাদই স্থাপত্যের দিক দিয়ে অনন্যসাধারণ ছিল সমতটে। কিন্তু প্রয়োজনের চাইতেও অন্যতর কোন কোন প্রয়োজন দেখা দেয় মানুষেব জীবনে। কাজেই সেই প্রাসাদ নির্মাণ করার জন্য কাঞ্জীভরমের স্থপতি ভাস্করদের আহ্বান করা হল। পাথরে গাঁথা হবে প্রাসাদ। সমতটের শিল্পীরা কাঠের কাজে দক্ষ ; সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং দৃঢ়ভিত্তিক বিপুলতা কাঠের সাহায্যেই গড়ে তুলতে পারে তারা। কাঞ্জীভবমের স্থপতিরা এল যাদের গোপুর গগনকে স্পর্শ করে, এল চান্দেলি ভাস্কররা যারা পাথরের গায়ে কবিতা আঁকতে জানে। কাঞ্জীর স্থপতিপ্রধান বিশ্বকর্মা, তার পরিকল্পনা অনুসাবে এবং তারই তত্ত্বাবধানে গগনস্পর্শ করে উঠছে প্রাসাদদুর্গ। লাল লোহাপাথরের প্রাকাব উঠেছে মালাব মতো সাঁওতালি পাহাড়ের গায়ে। সেই প্রাকারের মধ্যে কালো নিকষের ভিত্তিতে গড়ে উঠছে শ্বেতপাথরের প্রাসাদপুরী। প্রস্ফুটিত একটা পদ্মের মতো দেখাবে সবটুকু তৈরি হলে। সেই পদ্মের কেন্দ্রে চাঁদের নিজের পাঁচমহলা বাসভবন। গোপুর সমন্বিত সেই ভবনশীর্ষে থাকবে স্ফটিকগৃহ।

কাঞ্চী থেকে শুধু বিশ্বকর্মাই আসে নি। তাকে সাহায্য করতে তার শিষ্য-উপশিষ্যরা এসেছে, তেমনি এসেছে অনেক শ্রমিক। পাঁচ বছব ধরে প্রাসাদ গড়ে উঠছে। ভাস্কর, স্থপতি, শ্রমিকদের অনেকে ইতিমধ্যে স্বদেশে যাওয়া আসা কবেছে। চাঁদ তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছে, অকৃপণ দান করেছে।

এর একটা কারণ দেখানো যায় . নগরের সামগ্রিক বাণিজ্যজীবনে ওঠানামার পরে তখন একটা স্থিতির কাল এসেছিল। কাবো কাবো পক্ষে অবশ্য স্থিতির চাইতেও বেশী, বাণিজ্যের স্বর্ণযুগই বলা যেতে পাবে। এদেব মধ্যে বণিক চন্দ্রশেখরও একজন। সুমাত্রাব কাছে একটি ছোট দ্বীপে সে যে খনিজ আবিষ্কাব করেছিল, যা আহবণ করার জন্য সমতটে প্রথম যৌথ বাণিজ্যের প্রবর্তন হয়েছে, গবেষকরা তামাব সঙ্গে চাঁদের আনা সেই ধাতু মিশিযে সোনা তৈরি করতে পারে নি বটে, স্বর্ণবর্ণ এক নতুন ধাতুই যেন সৃষ্টি কবেছে। আব যৌথিকেব ভাগ্যও ভালো। তাদের খনির কাছেই তারা একটি রূপার খনিও আবিষ্কার করেছে। সে রূপাও সমতটে এলে দ্বিগুণিত হয়। এইসব মিশ্র উপাদানের বাণিজ্যিক মূল্য দিনে দিনে বাড়ছে। সমতটের মন্দির চূড়ায় চূড়ায়, ভবনশিখবগুলিতে সেই মিশ্র ধাতুব অলংকরণ সকালের আলোয় জ্বলতে থাকে, সন্ধ্যার আলোয় ঝলমল করে। শহরের উপান্তে একটা উপনগরই সৃষ্টি হয়েছে, ধাতুবিদদেব এবং কাংসকারদেব বসতি সেখানে। এই মিশ্রধাতুর তৈজস, দীপাধাব, গৃহসজ্জা জাহাজে করে বিদেশে চালান যায় ; কাশী, কোশাম্বী, কনৌজ যায় স্থলপথে, সারাভাবতে ছড়িযে পড়ে। যে কারুশিল্পীবা বংশানুক্রমে হাতিব দাঁতকে তাদের শিল্পের একমাত্র উপাদান বলে জানতো তাদের কেউ কেউ শিল্পের মাধ্যমে বদলেছে। রূপোব সঙ্গে মিশে সেই ধাতু যে নূপুর গড়ে সমতট ও অন্যান্য দেশের বসিক পুরুষরা বলেছে তাব নিক্বণ নাকি নিখাদ রূপার তুলনায ভাষাবহুল।

চন্দ্রশেখরেব এই প্রাসাদ তোলাব মধ্যেও অবশ্যই এই প্রাচুর্যের কথা মনে পড়ে। প্রাচুর্য ছাড়া আব কিছু নয়, সেই প্রাচুর্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত কবা। আব সেই প্রাচুর্যের কেন্দ্রে যখন স্বর্ণকায়া সনকার মতো একটি নাবী অবস্থান করে তখন চাঁদেব মতো কোন কোন পুরুষ সপ্তাশ্চর্যেব একটিকে গড়ে তোলাব দিকে ঝুঁকে পড়ে।

শুবসেন বলল, 'তুমি কিছু চিন্তা কবছো, চাঁদ , নতুবা দেখো বীরসেনেব পণ্যগৃহ চোখে পড়ছে।'

চন্দ্রশেখর বলল, 'কই না, চিন্তা কেন?'

সে গৃহকাতর হয়ে উঠেছিল নাকি?'

শুরসেন হাসল যেন সে চন্দ্রশেখরের চিন্তাকেও ধরতে পারে।

পোতাশ্রয়ের এত কাছে আর কোন বাড়ি নেই। বীরচন্দ্র দরজার কাছে এসে চাঁদ এবং শুরসেনকে অভ্যর্থনা জানালো। বীরচন্দ্র যথেষ্ট বৃদ্ধ হয়েছে ইতিমধ্যে। তার সারা মাথা জুড়ে যেন তুলো লেগে আছে।

শুরসেন বলল 'সুরা যদি আপনার মতো প্রবীণ হয় তাহলে অবশ্যই শ্লাঘ্য হবে।'

বীরচন্দ্র বলল, 'আপনার তৃপ্তিবিধানেই আমার যত্ন।'

সুরা এবং অন্যান্য অনেক ব্যাপারেই শুরসেনের রুচিকে পরিতৃপ্ত করা সহজ নয়। ছোট ছোট অনেকগুলি পানপাত্র এল। পাশাপাশি সাজানো মুখঢাকা বড় বড় ভাণ্ড ভৃঙ্গার এবং স্বচ্ছপ্রায় রোমক কাঁচপাত্র থেকে রুপা ও সোনার পাত্রগুলিতে সুরা ঢেলে চাঁদ এবং শুরসেনের সম্মুখে রাখতে লাগল ইরাণী বণিক নিজেই। পাত্রে কনিষ্ঠা ডুবিয়ে জিহ্বায় স্পর্শ করে, কিংবা পাত্রটিকে মুখের কাছে এনেই অনেকগুলি নমুনা বাতিল করাল শুরসেন। অবশেষে একটি নমুনা যেন তার পছন্দ হবে বলে মনে হল।

ইরাণী বণিকের দোভাষী প্রত্যেকটি নমুনার ক্ষেত্রেই বিশেষণের মুখর মালা রচনা করছিল। এ নমুনাটা পছন্দ হয়েছে দেখে সে বলল 'রুমের বাদশার জন্যেই কেবলমাত্র এ সুরা প্রস্তুত হয় ইরাণের

সুউচ্চ মালভূমির সর্বোৎকৃষ্ট দ্রাক্ষা থেকে।

'ইরাণেও একজন বাদশা আছে শুনেছি।' শুরসেন সুরাটার ঘ্রাণ নিতে নিতে বলল, 'তা সে ভদ্রলোক অত বোকা কেন?'

'বোকা?'

'নইলে নিজের রাজ্যের সর্বোৎকৃষ্ট সুরা রুমের বাদশাকে দিয়ে শূন্য পাত্র নিয়ে বসে থাকেন?'

চাঁদ হো হো করে হেসে উঠল। দোভাষী বিব্রত হয়ে মুখ নামাল। ইরাণী বণিক রসিকতাটা বুঝতে পারে নি কিন্তু দোভাষীর বিব্রত মুখভঙ্গী থেকে বুঝতে পেরেছিল ঘটনাটা তার অনুকূলে যাচ্ছে না। সে তার নিজের ভাষায় ইলবিল্ করে কী বলে উঠল।

বীরচন্দ্র হাসিমুখে বলল, 'প্রশস্তির আতিশয্য বাদ দিলে এটাকেই তো ওরা সর্বোৎকৃষ্ট সুরা বলছে।'

শুরসেন বলল, 'মন্দ নয়, চলবে। কী বলো চাঁদ? বিশ দ্রোণ পাঠিয়ে দেবেন।'

শুরসেনের নমুনা পছন্দ করা হয়ে গিয়েছিল। চন্দ্রশেখর সেই সুযোগে দোভাষীব সাহায্যে ইরাণী বণিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করে নিল। সে আলাপে লবণসমুদ্রের কূলে কূলে যে বন্দরগুলি আছে তাদের কথাই প্রাধান্য পেল—ভরোচ, সৌপার, দ্বারকা, অবমুজ।

বীরচন্দ্রর বাড়ি থেকে বেরিয়ে শুরসেন বলল, 'পশ্চিম সমুদ্রে যেতে চাও নাকি?

'কবে কোথায় কে যাবে বলা যায়? আপাতত প্রাসাদে ফিরছি।' এই বলে চাঁদ রথের রশি নিজের হাতে নিল।

সৈকতের বালিমাটির পথে ধীরে ধীরে রথ চালাতে হল কাজেই রথ যখন নগবের ইট বাঁধানো পথে উঠল তখন বেলা হয়েছে। পথের ধুলো উড়ছে। ঘোড়া দুটির ঘর্মাক্ত দেহে ধুলো চিকচিক করছে। স্নানের তাগিদ অনুভব করছে আরোহীরা। রথ পথের ভিড় কাটিযে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে চলেছে এখন।

এ পথটিকে নতুন বলে মনে হয়। পথ আগেও ছিল। নগবের যে কয়েকটি পথকে শেখবসেন চওড়া করেছিল এটা তাদের মধ্যে একটি। পথ চওড়া করাব পর নতুন সীমায় চারা গাছ লাগানো হয়েছে। বাতাসে সেগুলোর লাল রঙের পাতাগুলি কাঁপছে। সজীবতার তাজা ভাবটা মনকে প্রফুল্ল করে কিন্তু দেবার মতো ছায়া তারা পাবে কোথায়?

হঠাৎ নগরপ্রধান চিত্ররথের সঙ্গে দেখা হল পথে। দৈনন্দিন কাজ সেরে সে পৌরভবন থেকে ফিরছিল। হাতির দাঁতের কারুকার্যময় চতুর্দোলার কালো আবলুসের বাঁট ঘর্মাক্ত ক্রীতদাসরা বয়ে নিয়ে চলেছে। কথা বলার জন্য সে তার চতুর্দোলা থামিয়েছে দেখে চাঁদও তার রথ থামাল।

চাঁদ বলল, 'কি মশায়, রথশুল্ক আদায় ভয়ে নাকি চতুর্দোলা?'

'মিথ্যা বলেন নি, যে রকম মন্দা চলেছে। খরচ বাঁচালে মন্দ হয় না।' চিত্ররথ হাসল।

চাঁদ বলল, 'কাজের কথা ছিল নাকি?'

'তেমন নয় কিছু। কিছু কৃষ্ণমর্মর পাওয়া যায়? নতুন পৌরভবনের সিঁড়িগুলো কালো পাথরে তৈরি হওয়ার কথা। ভাবছি এদেশি কালো পাথর না দিয়ে নিকষ দিলে কেমন হয়?'

শুরসেন বলল, 'আমার বন্ধু চাঁদ অবশ্যই উত্তম বলবেন।'

চাঁদ হাসিমুখে বলল, 'কাজ আরম্ভ করার মতো কিছু থাকতে পারে, লোক পাঠাবেন।

চতুর্দোলা রাস্তা পার হয়ে গেলে রথ আবার চলতে লাগল।

শুরসেন বলল, বাণিজ্য কখনও কখনও কৌতুকের মতো মুখ নিয়ে আসে দেখো, চাঁদ।'

কথাটা মিথ্যা নয়। চেদি রাজ্য থেকে নিকষ এবং মর্মর আসছে সাঁওতালি প্রাসাদের জন্য। গোশকটের বহর বর্ষার দুমাস ছাড়া অহবহ সেই পাথর বয়। সব পাথর মর্মর হলেও কাজে লাগে

না চাঁদের ভাস্করদের। সেই অমনোনীত পাথর কেউ কেউ কিনছে।

কিছু পরে চাঁদ বলল, 'আজ উত্তাপটা যেন বেশি লাগছে।'

'উত্তাপের দোষ কী বলো। নগরের বন উপবন গাছপালা তোমরা আর রাখলে না।'

'প্রয়োজন, শুর, বাসের জন্য গৃহও দরকার।

'উত্তাপও সহ্য করতে হবে।'

'তা হবে। এ বাবদে তোমাকে একটা ভালো কথা বলতে পারি। বণিক সোমদত্ত কিছুদিন আগে প্রধান পণ্যকেন্দ্রের ঘিঞ্জি ঘরবাড়িগুলোর উন্নতি করার কথা বলেছিল চিত্ররথকে। বলেছিল গরমে, কোলাহলে, বদ্ধ বাতাসে ওদিকে আর যাওয়া যায় না। চিত্ররথ বলেছে স্বর্ণনিষ্কাশনের চুল্লিতে উত্তাপ হবে না তবে কি মলয় সমীরণ বইবে?'

'বেশ বলেছে তো কথাটা।' শুরসেন এই চকচকে কথাটাকে উপভোগ করল।

চাঁদ বলল, 'কিন্তু এর অন্য একটা দিক আছে। কালক্রমে এই উত্তাপই নাগরিকদের প্রিয় হয়ে উঠতে পারে না কি? যারা এখন কিশোর তাদের কাছে সমতটের এই আবহাওয়াই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দেবে। তাদের মনে এ উত্তাপও সমতটের দিকে তাদের প্রীতির একটা কারণ হবে নাকি?'

'এমন হয়।'

এ অঞ্চলটা মসলার বাজার। তীব্র মধুর ঝাঁজালো গন্ধের বাতাস দূর থেকেই তা বুঝিয়ে দেয়। সন্দেহ হয় বাতাসে যত ধুলো আছে মসলার গুঁড়ো তার চাইতে কম নয়। দাসরা মাথায় বড় বড় কাপড়ে বাঁধা পুটুলি নিয়ে চলেছে। কারো কারো কাঁধে সুরা বা তেলের জালা। পরিশ্রমে এবং রোদের তাপে তাদের পেশল কালো শরীর বেয়ে ঘাম ঝরছে। এখানে পথচারী এবং রথের ভিড়ও বেড়ে উঠেছে। পণ্যকেন্দ্রের সকালের কাজ শেষ করে ঘরে ফেরার তাড়া এখন। সাবধানে রথ চালাতে লাগল চাঁদ।

সাঁওতালি প্রাসাদের সিংহদ্বারে চাঁদকে নামিয়ে দিয়ে শুরসেন রথ ঘুরিয়ে নিয়েছে। এমন সময় একজন দাস হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল—মা দময়ন্তী ডাকছেন।

'দময়ন্তী? এখানে?'

দাস এমন ইঙ্গিত করল যে প্রথমে চাঁদ পরে শুরসেনকেও চোখ তুলে তাকাতে হল। তারা দেখতে পেলো অলিন্দে দাঁড়িয়ে দময়ন্তী হাসছে।

চাঁদ বলল, 'বন্ধু শুর, শুনেই যাও। চটিয়ে লাভ কি?'

রথের রশি একজন দ্বাররক্ষীর হাতে ছুঁড়ে দিয়ে শুরসেন চন্দ্রশেখরের পাশে পাশে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

শুরসেন বলল, 'এরকম কথা ছিল নাকি, চাঁদ?'

শুরসেনের স্ত্রী দময়ন্তী। চন্দ্রশেখরের বন্ধুও সে। বণিক দুজন যখন সমুদ্র সৈকতে ব্যস্ত ছিল সনকাই তখন হয়তো দময়ন্তীকে আনিয়ে নিয়েছে কিম্বা দময়ন্তী নিজে থেকেই এসেছে। আর সে আসবার পর দিনটা কাটানোর পরিকল্পনা তৈরি করে থাকবে।

তারা প্রাসাদে প্রবেশ করলে দময়ন্তী এবং সনকা দুজনেই এগিয়ে এল। দময়ন্তী বলল, 'আমাদের স্নান হয়ে গেছে। রান্নাও তৈরি। বিশ্রাম করে স্নান করে নাও।'

শুরসেন করুণ মুখ করে বলল, 'কিন্তু তৃষ্ণা বোধ করছি।'

'এখন?' দময়ন্তী বিপন্ন মুখ করল।

কিন্তু সনকা জানে শুরসেনকে। পাখা নিয়ে দাসীরা এগিয়ে এল। আর তাদের পিছনে সোনার ভৃঙ্গারে সোনা রঙের সুরা নিয়ে পরিচারিকা।

সুরার স্বাদ নিয়ে শুরসেন বলল, 'আ চাঁদ।'

'কিছু বলছো?'

'অনেকদিন হয় না, না? সেই ঢিলেঢালা হয়ে বসা।' শুরসেন বলল।

সুরার প্রতি শুরসেনের একটা আসক্তি আছে যা অদম্য না হলেও গভীর বটে। তা যদিও প্রাত্যহিক ব্যাপার নয় কিন্তু কখনও কখনও উৎসবের মতো প্রাচুর্যে উৎসারিত হয় ; এবং কচিত তা চন্দ্রশেখরকেও সংক্রামিত করতে পারে। তাকেই তারা ঢিলেঢালা হয়ে বসা বলে। অর্থাৎ সময় তখন তার চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে চলবে অথচ তারা সওয়ার হবে না।

দময়ন্তী বলল, 'কিন্তু ছেলেরা আছে, তারা এখন বড় হয়েছে।'

শুরসেন গম্ভীর মুখ করে কিছু বলতে গিয়ে বিপন্ন মুখে থেমে গেল। কিছুক্ষণ পরে শুরসেন হাসি মুখে বলল, 'আমার একটা প্রকল্প আছে, চাঁদ। তুমি পথে আসতে আসতে সমতটের কিশোরদের কথা, কী বলছিলে না? তাদের সম্বন্ধে, কিম্বা সব কিশোরদের সম্বন্ধেই।

'প্রকল্প বলছো?'

'তাই বলা যাক। শিশু ও কিশোরদের মানুষ করার ভার, বুঝলে চাঁদ, তাদের দাদামশায় দিদিমাদের নেয়া উচিত।'

'যুক্তি?'

'উভয় পক্ষেরই লাভ। তাদের দাদামশায় দিদিমায়েরা করবার কিছু পেয়ে সুখে থাকবেন। আব তাদের বাপ মায়েরা কর্তব্যমুক্ত হয়ে জীবনটাকে আবও কিছুদিন উপভোগ কবতে পারবে। আর এ ব্যবস্থায় ক্রটি নেই, কারণ পর্যায়ক্রমে দাদামশায় দিদিমা পাওয়া যাবে।'

চাঁদ কলরব করে হেসে উঠল, বলল, 'জীবনের উপরে তোমার বড় লোভ, শুর।'

সনকা বলল, 'কিন্তু এখন তাড়াতাড়ি করলে হতো না? দময়ন্তী মধু এবং সুরা দিয়ে তিতিব ভাজার নির্দেশ দিয়েছেন। দেরি হলে ওরা গরম রাখতে পারবে না।'

চাঁদ বলল, 'কী বলে, শোন, শুর!'

শুরসেন হাতের পাত্রটিকে নিঃশেষ করে বলল, 'তা হলে আর দেরী করা যায় না।'

দুপুরে আহার ও বিশ্রামের পর আবার তারা সমবেত হয়েছে—এখন তারা সতরঞ্চ খেলতে বসেছে। সুসজ্জিতা সালঙ্কারা দাসীরা নিঃশব্দে তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে পাখা চালিয়ে বাতাস করছে। শ্বেতপাথরের মেঝে, শ্বেতপাথরের দেয়াল। দেয়ালের গায়ে কোথাও লতাপাতা, কোথাও যক্ষিনীদেব প্রসাধন এবং অভিসারের দৃশ্য অনতিগভীর করে খোদাই করা। জানালা দিয়ে যে বাতাসটা আসছে তা স্নিগ্ধ। শুরসেনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সুস্নিগ্ধ মধুরস্বাদ সুরা এসে গিয়েছে ইতিমধ্যে। সে যেমন পছন্দ করে তেমনি বটে। লাল ইরাণী সুরা রোমক কাচপাত্রে। কাচপাত্রের গায়ে মাকড়সার জাল যেন এখনও জড়িয়ে আছে স্নিগ্ধতার আশ্বাস নিয়ে।

খেলতে খেলতে তারা আলাপ করেছিল। সাধারণ ভাবে বাড়িঘরের কথা উঠে পড়েছিল। চাঁদ এক সময়ে বলল, 'গত সপ্তাহে যে প্রস্তাবটা করেছিলাম ভেবে দেখেছ শুর?'

'প্রস্তাব? ও তোমার সেই পাথর বিক্রির কথা?'

'আহ্—'

'না, না, সে কিছু নয়। তা আজই তো চিত্ররথ কিছু কিনবে বলেছে।' শুরসেন বলল।

'তুমি যদি ওরকম করে—'

'আচ্ছা, চাঁদ,' বলল শুরসেন, 'বণিগ্‌বৃত্তি কী রকম অর্থলোলুপ করে মানুষকে তা দেখো। আমি তোমার আবাল্য বন্ধু, আমাকেই তোমার প্রাসাদ তৈরি থেকে উদ্বৃত্ত ভাঙা অকেজো পাথরগুলো গছাতে চাচ্ছ।'

শুরসেনের রসিকতায় সনকা ও দময়ন্তী খিল খিল করে হেসে উঠল। চাঁদ বলল, 'বেশ, তা হলে তোমার প্রাসাদের কোথায় কোথায় পাথর বসাতে হবে বলে দিও। ব্যবসায়ের কথায় যখন বন্ধুত্বের কথা এনে ফেলেছো তখন তা যে বিনে পয়সায় পাথর হাতানোর জন্যে তাও বুঝতে পেরেছি।'

চাঁদের এই লাগসই উত্তরে সনকা এবং দময়ন্তী তো আবার হাসলই, শুরসেনও উচ্ছসিত হয়ে হেসে উঠল।

শুরসেন বলল, 'না, চাঁদ। নিছক রসিকতা নয়, তোমার এ প্রাসাদ দেখবার জন্য যদি বিদেশ থেকে তীর্থযাত্রী না আসে তবে বুঝতে হবে সৌন্দর্য, এবং মানুষকে তা কী ভাবে আকর্ষণ করে সে সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নেই।'

দময়ন্তী বলল, 'কিন্তু এ সম্বন্ধে সকলের মত একরকমের নয়। সনকার ধাত্রীর কথা বলতে পারি। সাতমহলার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে তার পায়ের দড়ি নাকি ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

চাঁদ বলল, 'আহা বুড়ো মানুষ! তাকে তা করতে হচ্ছে কেন?'

'সেটা অন্য কথা।' দময়ন্তী বলল, 'মুহূর্তে মুহূর্তে সে সনকাকে হারিয়েও ফেলে। সে বেশ আজ রাগ করেই বলছিল বেনের ছেলে বলতে তো ওই একটি, নাতি কি সওয়া লাখ হবে যে তার জন্যে এই বাড়ি তুলছে বেনে।'

'আহা, সনকা, ধাইকে অত কষ্ট দাও কেন?' এই বলে চাঁদ মৃদু মৃদু হাসল একটা সার্থকতার তৃপ্তিতে।

জানলা দিয়ে প্রাসাদের কোন কোন অংশ চোখে পড়ছিল। প্রাচীরের মধ্যেই, কিন্তু বেশ খানিকটা নিচে একটা জলাশয়। বিকেলের রোদ পড়ে দর্পণের মতো চক চক করছে। লাল লোহা পাথরের অসংখ্য সিঁড়ি জলাশয় থেকে প্রাসাদের দিকে উঠে এসেছে। সেই সিঁড়ির গায়ে পুতুলের মতো অনেক মানুষ কিছু বহন করে উঠছে। বোঝা যায় ক্রীতদাসরাই। জল তুলছে তারা প্রাসাদের সরোবরে। দৃশ্যটা শুরসেনের মতো চাঁদের চোখেও পড়েছিল।

প্রাসাদের সরোবরে জল আনার ব্যাপারটাও এই প্রাসাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাহাড়ের নিচে চম্পাবতীর একটা শাখাকে বাঁধে ধরে একটা কৃত্রিম হ্রদ করা হয়েছে। পরিকল্পনাটা এই যে বর্ষায় সে হ্রদে জলের উচ্চতা এমন হবে বাঁধের দরজা দিয়ে নালা বেয়ে প্রাসাদের সরোবরেও জল এসে যাবে। কিন্তু বাঁধ দিতে দেরি হয়েছে, এবারের বর্ষায় প্রাসাদের সরোবরে জল আসে নি।

চন্দ্রশেখর বলল, 'এটা, এই দাসদের দিয়ে সরোবরে জল আনা কিন্তু মূল পরিকল্পনা নয়। এটা বরং আমার অন্যত্র ব্যস্ত থাকার ফল। বলতে পারো লক্ষেশ্বর এবং ইন্দুধবর প্রতিদ্বন্দ্বিতাই এর কারণ।'

কথাটা বাড়িয়ে বলা নয়। গত পাঁচ বছরে চন্দ্রশেখরকে তিনবার সমুদ্রযাত্রা করতে হয়েছে, খনিজের দেশে যেতে হয়েছে, এক কথায় সমতট থেকে দূরে থাকতে হয়েছে। আর তার কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাই। যৌথিকের খনিজ বাণিজ্য যেমন সমতটে স্বর্ণযুগ এনেছে তেমনি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাও সৃষ্টি করেছে। প্রথমে শুনে যৌথিকের বণিকরা অবজ্ঞাভরে হেসেছিল—যৌথিক বহির্ভূত এক প্রতিষ্ঠান থেকে নাকি সস্তা দামে খনিজ বিক্রি হচ্ছে। ইন্দুধব এবং তার বন্ধুস্থানীয় দু একজন বণিকের সেই প্রতিষ্ঠান। কিন্তু অন্যদিকে চন্দ্রশেখর, শুরসেন সমেত তিনটি বসু পরিবার সহ দশজন বিত্তশালী বণিকের যৌথিক। আপাত দৃষ্টিতে প্রতিযোগিতা অসম হলেও যৌথিক প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানকে মেরে ফেলতে পারে নি, এমন কি অনেকদিন ধরে ক্রমাগত ধাতুর দাম কমিয়ে দিয়েও নয়। তার কারণ বোধ হয় এই যৌথিক যখন লাভলোকসানের অঙ্কের দিকে দৃষ্টি না রেখে পারত না, ইন্দুধব বোধ হয় বিনামূল্যে খনিজ বিলিয়ে দিতেও প্রস্তুত ছিল।

চাঁদ এবং ইন্দুধবর খনিজ সংগ্রহের পদ্ধতিতেও প্রভেদ ছিল। স্বর্ণদ্বীপ সাম্রাজ্যের যে

অংশে—মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলই হবে সম্ভবত—চাঁদের যৌথিকের খনিগুলি, সেখানে সমতটের একটা উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। সমতটের সহস্র শ্রমিক, যৌথিকের শতশত কর্মচারী সেখানে যাওয়া আসা করে। বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে যৌথিকের এই উপনিবেশ বিখ্যাত হয়ে উঠবে এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হয় চাঁদকে। ফলে প্রচুর শুল্ক দিতে হয় শ্রীবিজয়ের সেই সামন্তকে। উপনিবেশের উন্নতিব জন্যও প্রচুব অর্থব্যয় করতে হয়।

অন্যদিকে ইন্দুধবর খনিজসংগ্রহের ব্যাপারে এমন কোন অর্থব্যয়ের প্রয়োজন ছিল না। সুবর্ণভূমির কিছু দক্ষিণে অরণ্য-পর্বত-সঙ্কুল এক উপদ্বীপ আছে। (এখন তাকে টেনি সেবিম বলা হয়।) সেখানেই ইন্দুধবর খনিজ সংগ্রহের কেন্দ্র। সুবর্ণভূমিব অধিবাসীদেব সঙ্গে ইন্দুধবব দেয়ানেযার কোন সম্বন্ধ ছিল না। অগ্নি ও তরবারির সাহায্যেই করবিহীন খনিজভূমি সংগ্রহ হয। খনি থেকে ধাতু তুলবার শ্রমিক ক্রীতদাসকে কিনতে হয়, তার আহারেব জন্যও কিছু ব্যবস্থা রাখতে হয়। কিন্তু যুদ্ধদাসের জন্য এমন কোন অর্থব্যয করতে হয না। চাঁদ এবং ইন্দুধবব এই দুই পৃথক পদ্ধতির মধ্যে কোনটি শেষ পর্যন্ত অর্থকরী ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃত হবে এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

আর এ প্রতিযোগিতার উত্তাপ এখনও কমে নি, লক্ষেশ্বরের মৃত্যুর পরেও নয়। তার প্রমাণ হিসাবেই যেন শুরসেন বলল, 'প্রতিযোগিতা ভালোই, চাঁদ, কী বলো? ওটা জীবনের স্বাদকে তীক্ষ্ণ করে। কিন্তু, চাঁদ, তুমি কি ভেবেছ ও পক্ষের নেতৃত্ব করছে কে?'

'ইন্দুধবকেই প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়।'

'সঙ্গত ভাবেই।'

দম্ভ ও দর্প অন্যান্য বণিকদের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়, কিন্তু ইন্দুধবর বেলায় সেগুলো যেমন শাণিত তেমন কদাচিৎ চোখে পড়ে। শাণিত কথাটাই তার সম্বন্ধে সব সময়ে মনে আসে। তার রূপ শাণিত, দীপ্তিমান তার দৃষ্টি, তার যুক্তি তীব্র, ব্যঙ্গ ক্ষুরধার, তার কটিলম্বিত অসি ক্ষুরনিশিত। আর ব্যঙ্গ, যুক্তি, অসির ব্যবহারে সে সমতটে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

'কিন্তু, শুর, বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আর একটি বিষয় দরকার। সুতীক্ষ্ণ দূরদর্শিতা, শীতল অঙ্কের হিসাবে বহুদূর ভবিষ্যতের বাণিজ্যের ওঠাপড়া যার নখাগ্রে। আর অন্তত তিনটি বসু পারিবারের আর্থিক শক্তির বিরুদ্ধে অর্থবল নিয়ে প্রায় একক দাঁড়ানোর মতো আত্মপ্রত্যয়।'

'আমারও তাই মনে হয়, চাঁদ, আর সে ব্যক্তি অবশ্যই লক্ষেশ্বর।'

কিন্তু চাঁদ এবং শুরসেনের আলাপ শুনে দময়ন্তীর মুখে বিব্রতভাব দেখা দিল। দুই বণিকগোষ্ঠির প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা কারো অজানা নেই। চিত্ররথকে নগরপ্রধান নির্বাচন করা নিয়ে সমতটের পথে পথে শুরসেন এবং ইন্দুধবর দাস ও পরিজনদের মধ্যে একাধিকবার দাঙ্গা হয়ে গিয়েছে। বণিকরা সাধারণত তাকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মতো লঘু করে দেখবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু লঘু করে দেখা এবং লঘুভাবে ঘটা এক নয়। দুদশজন ক্রীতদাসের মৃত্যু ঘটল বৈকি, আর তাদের রক্তাক্ত দেহ পথের ধূলায় কয়েক প্রহর পথে পড়ে রইল।

সুতরাং ইতস্তত করে দময়ন্তী বলল, 'এর চাইতে, চাঁদ, তুমি একটা গল্প করো। ও বিষয়ে তোমার জুড়ি নেই। তুমি নাকি একবার আকাশে আকাশে উড়েছিলে।'

'হ্যাঁ, আমিও শুনেছি' বলল শুরসেন, 'কোন পাখির পায়ের সঙ্গে নাকি খুব কষে বেঁধে নিয়েছিল নিজেকে।'

চাঁদের মুখে লজ্জার চিহ্ন দেখা দিল। সে বলল, 'ওটা প্রথম লক্ষেশ্বর সম্বন্ধে শোনা গিয়েছিল। এখন জানা গিয়েছে ওটা আরবীদের গল্প। তা ছাড়া এরকম গল্প কখনও আমি তোমাদের বলিনি।'

দময়ন্তী বলল, 'চাঁদ, তুমি সিংহলের রাজাকে কি একবার খুব ঠকিয়েছিলে?'

'সে আর এমন কী?' বলল চাঁদ।' মুক্তা তোলার অনুমতি নেয়ার ব্যাপার বলছো?'

'বলো না, শুনি।' আবার অনুরোধ করল দময়ন্তী।

চাঁদ বলল, 'গল্পটা তোমরা সকলেই জানো। খানিকটা সাঁতার দিতে হয়েছিল সমুদ্রে। তা, রাজামশায় ভেবেছিলেন অতদূর মানুষ সাঁতার দিতে পারে না।'

'কতদূর হবে, চাঁদ?' দময়ন্তী বলল।

'তা প্রায় পাঁচ ক্রোশ হবে। কী বলো, শুর?' বলল চাঁদ।

শুরসেন বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম না, বাপু।'

'কিন্তু সেবার নাকি সিংহলের উপকূলে হাঙ্গর কুমীরের খুব উপদ্রব হয়েছিল, সেই ভয়ে কোন সিংহলী ডুবুরীই আব নামতে চাইলো না।' সনকা বিবর্ণ মুখে বলল।

'সেটাই তো কৌশল।' বলল শুরসেন, 'সে সব হাঙ্গর কুমীর সবই চাঁদেব নাবিকদের মুখে মুখে তৈবী।'

'কিন্তু', দময়ন্তী বলল, 'সত্যিকারের হাঙ্গর কুমীরও থাকে জলে। তোমার এখন বয়স হচ্ছে, চাঁদ। ভেবেচিন্তে কাজ করা উচিত।'

'না, না। তা তো বটেই। এমন আর করবো না।' এই বলে চাঁদ পুবানো গল্পটার প্রভাব আবাব নতুন কবে নিল।

কিন্তু শুরসেন বললে, 'হায় দমযন্তী তুমি জানতে যদি এই সব প্রতিশ্রুতিব অর্থ।'

'কেন কী হযেছে?' দময়ন্তী শুরসেনের বলাব ভঙ্গিতে একটু শঙ্কিতই হল। 'চাঁদকেই জিজ্ঞাসা করো।' বলল শুরসেন। 'আচ্ছা, চাঁদ, তুমি কি বলতে পাবো তোমার জাহাজগুলো এখন কোথায়?'

চন্দ্রশেখব বুঝতে পারল না শুরসেন কোনদিকে অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু যদি তা কৌতুক হয় তাকে সাহায্য করাই ভালো এমন একটা ধারণা থেকে বলল, 'সে আর বেশি কথা কী। মধুলুব্ধা সিংহল বাণিজ্য থেকে সমতটে ফিরেছিল, আজ সে যাত্রা করেছে বঙ্গদেশে। মধুমক্ষিক সিংহলের মুক্তাক্ষেত্র থেকে যবদ্বীপে গিয়েছে। দুখানা জাহাজে আছে যৌথিকেব খনির দেশে। মধুলিহ সিংহলের মুক্তাক্ষেত্রেব ভার নিয়ে সেখানে অবস্থান কবছে। আব মধুপ এখন কলিঙ্গেব কোন বন্দরে মাধ্বীব বদলে ধান সংগ্রহে ব্যস্ত।'

'কিন্তু, চাঁদ, তোমার মধুকর?'

চাঁদ হাসল। বলল, 'এই কথা। স্বর্ণদ্বীপ সুমাত্রার বাণিজ্য শেষ করে মধুকর নিয়ে বজ্রসেন সমতটে ফিরছিল। এখন সে পশ্চিম বাণিজ্যে ভারুচ বন্দরে গিয়েছে।'

'শোন, দময়ন্তী।'

দময়ন্তীর মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন দেখা দিল, সনকার মুখ শুকিয়ে উঠল।

দময়ন্তী বলল, 'লবণসমুদ্র?'

'কেউ-না-কেউ যাবেই।' চাঁদ বলল, 'আর ভারুচ বন্দর বজ্রসেনের তেমন অপরিচিত নয়।'

'কিন্তু?' শুরসেন কিছু বলবে মনে হল। সে মৃদু মৃদু হাসল। 'কেউ কেউ ওদিকেব খোঁজ নিচ্ছে যেন।'

চাঁদ বলল, 'শুর, তুমি কি মিশরকে অজ্ঞাত দেশ মনে করো?'

'না। কে বলেছে?'

চাঁদ বলল, 'মিশরের উত্তরে সমুদ্র। আর সেই সাগরের উত্তরে রুম। সে দেশে এক সময়ে মরিচের ওজন সোনা পাওয়া যেতো। এখনও বাণিজ্যের কল্পরাজ্য। রুম, শুরসেন, রুম। মিশর থেকে পশ্চিমে গিয়ে মিশরের উত্তর সাগর পশ্চিম সাগর মিশেছে। যেমন শ্যাম কম্বোজের দক্ষিণ সমুদ্র চম্পার পূর্ব সমুদ্রে মেশে। তুমি কি সেই পূর্ব সমুদ্রে যাও না। মিশরের পূর্বে সমুদ্র, সেখান থেকে তার দক্ষিণ সমুদ্রে যাও হাবশিদের সেই লবঙ্গ দেশে। সেই দক্ষিণ সমুদ্র থেকে কি তুমি পূর্ব সমুদ্রে

যেতে পারো না? আ, শুর, কেনন তুমি তা পারবে না? আর তা ছাড়া, কান্দাহার, ইরাণ, বাবিলনের রাজাদের প্রীতিভিক্ষা করে করে যে ধুলোর পথ—অন্ততঃ সমুদ্রে ধুলো নেই।'

এ আশঙ্কা সনকার অনেকদিনের। লবণসমুদ্রই অবিরত আহ্বান করে সমতটের বণিকদের। চাঁদের পিতার শেষ জীবনের সব চাইতে বড় আঘাত এসেছিল এই উচ্চাশা থেকেই।

শুরুসেনও যেন এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। চাঁদ অদাম্ভিক নয়, কিন্তু তার দম্ভ প্রকাশ পায় ব্যাপারটা ঘটিয়ে দেবার পর। কিন্তু শুরসেন হাসল, বলল সে, 'কিন্তু সুরার অভাব হয়েছে সমতটে জানা ছিল না, বিশেষ করে শ্বেত সুরার, যা স্বচ্ছ চৈনিক পানপাত্রে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। আর দেখো, চাঁদ, আমি একটা বিষয়ে কিন্তু অবাক হচ্ছি—তোমার আর তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী লক্ষেশ্বরের নানা বিষয়ে মিল দেখে।'

'সে কি লবণসমুদ্রে—'

'তা নয়, তা নয়। একজন যা করেছে, অন্যজন তার চাইতে বেশি করতে পারে। এই সাঁওতালি পাহাড়ে সেই তোমার প্রতিবেশী, যদিও তার প্রাসাদের তুলনায় তোমার প্রাসাদ অনেক বড়ো।' শুরসেন হাসল।

সনকা ইঙ্গিত করে থাকবে। সুরা এল।

ভৃঙ্গার থেকে সুদৃশ্য চৈনিক পানপাত্রে, যা প্রায় স্বচ্ছ, শ্বেত সুরা ঢেলে নিল শুরসেন। সুরাপাত্র হাতে নিয়ে সে বলল, 'কখনও আমি ভাবি বৃদ্ধ বিগত লক্ষেশ্বর আর বর্তমানের এই চাঁদ বাণিজ্যকে কে বেশি বুঝেছে।'

চাঁদ হেসে বলল, 'শুর, তুমি আজ আত্মবিলোপের আদর্শ বিনয়ের শ্লোকগুলো মনে রেখে কথা বলছো যেন!'

কিন্তু দময়ন্তী কথা বলল আবার। সে বলল, 'বণিকের স্ত্রী বলে আমাদের দিনবাত বাণিজ্যেব কথাই শুনতে হবে এমন কি বিধি আছে? তুমি তো গল্পও করতে পারো, শুব।'

'তা পারি।' এই বলে শুরসেন হাসল। 'বেশ লাগছে এই অপরাহ্ন।'

সুরাপাত্রটা মুখের কাছে তুলে সে ভাবলো। তাদের গায়ের কাছে মর্মরের দেয়ালের গায়ে একটা লতার কোমল ছায়া পড়েছে। লতাটা গবাক্ষের বাইরে। বাইরে চম্পার বাঁধের প্রাকারটা এখন একটু স্পষ্ট দেখাচ্ছে, তার কারণ বোধ হয় এই দুপুরের উজ্জ্বল আলোতে জলাশয়ের প্রতিফলিত আলোক পার হয়ে দৃষ্টি বাঁধে যেতে বাধা পাচ্ছিল।

শুরসেন বলল, 'তুমি কি সুনন্দিনীর কথা সবটুকু জানো না চাঁদ? কিশা অথবা সুনন্দিনীর কথা?'

সনকা চাঁদকে বলল, 'দু একদিন আগে যে কিশা এসেছিল?'

চাঁদ বলল, 'লক্ষেশ্বরের প্রতিভূ বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিল, আর তারই উপযুক্ত জাঁকজমক করে এসেছিল সে। তার কথা বলছো?'

শুরসেন বলল, 'এটাও লক্ষেশ্বরের সঙ্গে তোমার আর একটা মিল চাঁদ, তুমি গল্পটা জানো না। লক্ষেশ্বরকে সমতটের উৎসবে, পৌরভবনে, এমন কি পণ্যকেন্দ্রেও তাকে কেউ দেখেছে বলে মনে করতে পারে না। আর বহুবার সমুদ্রযাত্রার ফলে তুমিও নগরের অনেক ব্যাপারে পিছিয়ে আছ। তোমার বাণিজ্য ব্যাপক আর তাব বাণিজ্য প্রগাঢ়। প্রগাঢ় নাকি কথাটা? ফল কিন্তু একটাই, কিছু দুর্লভ-দর্শন তোমরা।'

চাঁদ বলল, 'কিন্তু মনে হচ্ছে তুমিও খুব বেশি দিন হয় শোন নি।'

তখন শুরসেন এই গল্পটা বলল।

'লক্ষেশ্বর বণিক ছিল এবং সে যখনই যা করেছে তার মধ্যে তার এই বণিকত্ব ধরা পড়েছে। সুনন্দিনীর সঙ্গে লক্ষেশ্বরের বিবাহ হয়েছিল। এখন থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে। এটা তার

দ্বিতীয় বিবাহ। লক্ষেশ্বরের তখন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হবে কিম্বা তার দু এক বছর এদিকে কিম্বা ওদিকে। লক্ষেশ্বব তার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে কখনও কখনও, যদিও তা ক্বচিৎ, উৎসবে যোগ দিত। এ রকম এক উৎসবে সে কিশাকে প্রথমে দেখতে পায়। কিশা তখন বণিক গুণবর্মণের স্ত্রী। তার বয়স তখন বছর কুড়ি হবে। বুঝতেই পারছো তার প্রথমা স্ত্রী এখানে অবান্তর।'

দময়ন্তী বলল, 'লক্ষেশ্বব কি গুণবর্মণকে হত্যা করেছিল? কী ভয়ঙ্কর কথা।' সনকা ভাবল, আশ্চর্য! কাল কিশা এসেছিল। এখন তার বযস পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে আন্দাজ করা যায়। তার চোখ দুটি যতই টানা টানা হক, নাকের গড়নটা যতই শ্রীমণ্ডিত হক, সে কখনও এমন সুন্দরী ছিল বলে বিশ্বাস হয় না যে তার স্বামীর পক্ষে সে রূপ বিপজ্জনক হবে।

শুরসেন বলল, 'না হত্যা করে নি লক্ষেশ্বর। তা ববং ইন্দুধব হলে হতে পারত। তবে গুণবর্মণকে সে বাধ্য করেছিল কিশাকে তাব হাতে সমর্পণ কবতে।'

চাঁদ বলল, 'এ তো ক্ষত্রিয়দের নাবীহরণের মতো ব্যাপার। বণিকবৃত্তি কি বলছো?'

সনকা বলল, 'লক্ষেশ্বরের মাথা খাবাপ হয়েছিল। সমতটে কি বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল না।'

শুরসেন হাসল। বলল সে, 'অভীষ্টকে সংগ্রহ করার ব্যাপারে ক্ষত্রিয় আর বণিকে তফাৎ শুধু পদ্ধতিতে। তরবারি, আর স্বর্ণ, কোনটিব দম্ভ বেশি, চাঁদ? আর মাথা খাবাপ! আমার আর চাঁদের বেলাতেও লোকে প্রশ্ন করতে পারে কেন দময়ন্তী, কিম্বা কেন সনকা, কেন শুধু তাবাই অন্য কেউ নয়।'

দমযন্তী বলল, 'খুব খোসামোদ করেছ। এবাব গল্পটা বলো।'

শুরসেন আবার তাব গল্প সুরু কবল। 'গুণবর্মণকে বাধ্য করাই শেয কথা নয়। বণিক লক্ষেশ্বব চিন্তা করেছিল যা ঘটবে তাব বিধিব সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকা উচিত। কন্যাকে সম্প্রদান করতে হয়। কে সম্প্রদান করবে? কিশার পিতা জীবিত, কিন্তু কিশা তো গোত্রান্তরিতা। বরং সে গুণবর্মণেরই সগোত্রা। সুতরাং গুণবর্মণই তাকে সম্প্রদান কবল লক্ষেশ্বরের হাতে।'

সনকা বলল, 'কী অদ্ভুত! লোকটা সত্যি খেপে গিয়েছিল।'

চাঁদ বলল, 'এরকম ব্যাপারে কি ধর্মশাস্ত্রে নিষেধ আছে? সগোত্র পুরুষই নাবীকে সম্প্রদান কববে পিতা ও ভ্রাতার অনুপস্থিতে, তাই না, শুর?'

শুরসেন তার সুরাপাত্রে মন দিল।

একটু পরে সে বলল, 'বিবাহের পবে কিশাব নাম সুনন্দিনী হযেছিল। কিশা অবশ্যই লক্ষেশ্ববেব কাছে বমণীরত্ন ছিল। কাজেই দুজনে তারা কী কী উৎসবে দিন কাটিয়েছে তার সমারোহ আমবা কল্পনা করে নিতে পারি। আমি জানি কিশাকে দেবার মতো একটি উপহার আনবার জন্যই লক্ষেশ্বব কান্দাহারে এক বাণিজ্যকটক পাঠিয়েছিল। উপহার এসেছিল আরও দূর, ইরাণের দক্ষিণ থেকে—আর সেটা একটা চারা গাছ।'

চাঁদ বলল, 'ফুল নাকি? কিন্তু কিশাকে দেখে—'

শুরসেন বলল, 'বন্ধুবর চাঁদ, এ পৃথিবীতে আশ্চর্য বিষয় মানুষই ঘটিয়ে থাকে।'

চাঁদ বলল, 'এর মধ্যে আশ্চর্য আছে, কিন্তু তা খুব বেশী নয়।'

শুরসেন বলল, 'তারপর একদিন লক্ষেশ্বরের দিগগজ জাহাজের বহর সত্ত্বেও তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল। তখন কিশাকে ডেকে তার মাথায় হাত রেখে সে বলেছিল আমি যখন থাকবো না, তার পরেও অনেকদিন তুমি থাকবে। তোমার মধ্যে আমি থেকে যেতে চাই। আজ থেকে তুমি আমার কন্যা। কাগজপত্র সব ঠিক করাই আছে। আমার যা কিছু সবই তোমার। তোমাকে আমি দত্তক কন্যা গ্রহণ করলাম।'

চাঁদ বলল, 'অদ্ভুত, এমন তো শুনি নি!'

'তোমার কথা শুনলে লক্ষেশ্বরও অবাক হতো। তোমার অনেক কথা সেও জানতো না। কারণ এক—বাণিজ্যে একনিষ্ঠতা।'

দময়ন্তী বলল 'সুনন্দিনী এখন তবে লক্ষেশ্বরের নন্দিনী? আশ্চর্য!'

ভৃঙ্গার থেকে একটি পানপাত্রে সুরা ঢেলে নিল চাঁদ। তার মনে হল সে প্রশ্ন করবে এমন দত্তক কি প্রথাসম্মত, কিন্তু তা যেন অবান্তর এখানে।

সনকা অনুভব করল, কেউ যেন ভয় পেয়ে কিছু বলেছে, কিন্তু তা যে ঠিক নয় তা তো বোঝাই যাচ্ছে, এই ভাবল সে।

চাঁদের মন অনেক দূরে চলে গিয়েছিল চিন্তার পরিধি ধরে চলতে চলতে। কাজেই সে যখন কথা বলল হঠাৎ ধরা কঠিন হল তার প্রয়োগটা কোথায়। সে বলল, 'পশু এবং এক সময়ে মানুষও সন্তানকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতো, আর এখন বোধ হয়—'

দময়ন্তী একটু ইতস্তত করে শুরসেনের পাশে গিয়ে বসলো উঁচু আসনটাতে।

সনকার মনে পড়ল ; ভয় পাওয়ার কথাটা হয়তো তার মনগড়া, আসলে সেটা একটা গান। নাবিকরা দাঁড়ের তালে তালে যা করে, আর যার ধুয়োটা হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসের মতো কলরব করে ওঠে। চাঁদ বুঝিয়ে দিয়েছিল গানটার কথা। নাবিকদের প্রিয় গান। যখন চারিদিকের শতক্রোশ বিস্তৃত সমুদ্রের জল মৃত্যু-নিকষ, ছিঁড়ে যাওয়া পালের চারিদিকে মৃত্যু ঝড়েব শব্দে হা হা করে হাসছে, যখন জাহাজের মাস্তুলও অন্ধকার মেঘে ঢেকে গিয়েছে তখন তারা গানটা করে। তার অর্থ ঃ গৃহে বণিতার ক্রোড়ে আমার পুত্র, হে পবন, আমার ভয় কী? অবশ্য এটা কোন তুকমন্ত্রের পরিণতিও হতে পারে।'

চাঁদের অঙ্গদে দিনশেষের আলো ঝিকমিক করছে, সেটাই দময়ন্তীর হীরার কণ্ঠিতে দু একবার ঝলসে উঠছে, কিন্তু সনকার মুক্তার চিকহারে পায়রায় বুকের মতো মসৃণ ছায়া ফেলেছে।

চাঁদ হো হো কবে হেসে উঠতে গিয়ে হঠাৎ থামল মাঝপথে। মৃত্যু এই কথাটা মনে হল তার, আর তা হয়ে অদ্ভুত লাগছে।

শুরসেন একটি পাত্রে সুরা ঢেলে দময়ন্তীর দিকে এগিযে ধরে বলল, 'দেখো, সুরাটা ভালো।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল তার।

অ্যাভলনের সরাই

ব্রজেন ওদিক থেকে ফিবে এসে এই গল্পটা বলেছে। সে জার্মানিতে কী ট্রেনিং নিতে গিয়েছিল, কিন্তু সেখান থেকে কি করে এবং কেন মধ্য ইউরোপের অন্য এক রাজ্যে গিয়ে বাস করতে শুরু কবেছিল, তা সে বলেনি। বোধহয় ঝোঁকের মাথাতেই সে এই গল্পটা বলে ফেলেছে ; এ বিষয়ে তাকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করে লাভ নেই, যা কিছু অস্পষ্ট তাকে সে কিছুতেই স্পষ্ট করবে না, কিছুতেই না, তা আমরা তখনই বুঝতে পেরেছিলাম।

গল্পটা উদ্বাস্তুদের নিয়ে। যুদ্ধের সময় যারা বাস্তুহারা হয়েছিল তাদের অনেক পরিবারকেই পুনর্গঠিত ইউরোপের এ-নগরে ও-নগরে পুনর্বসতি পেতে দেখা গিয়েছে। তাদের মধ্যে মনের দিক দিয়ে এমন অনেককেই খুঁজে পাওয়া যাবে যারা ডিসপোজালের যুদ্ধ-উপকরণের মতো কিংবা পুরনো লোহার দোকানের ফুটপাতে স্তূপ করে রাখা জাংকের মতো, কারণ মানুষ কখনো অতীতকে বিস্মৃত হতে পারে না। তা হলেও এরা বেশিরভাগই পুরনো উদ্বাস্তু, ওদিকের বাষ্ট্রগুলো এদেব সম্বন্ধে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ায় এসে গিয়েছে। এদের দুঃখ, যন্ত্রণা, হতাশা, মৃত্যু এ সব সম্বন্ধেই একটা না একটা ফবমুলা প্রচলিত হযে পড়েছে।

এ ছাড়াও এক রকমের উদ্বাস্তু আছে। যুদ্ধের অত বড়ো জোয়ার-ভাঁটায় যাবা অন্তত বাসভূমির দিক দিয়ে দেখতে গেলে স্থির ছিল, হঠাৎ তাদের মধ্যেই কেউ কেউ যেন উন্মনা হয়ে ওঠে। হ্যাভারস্যাকে কিছু সঞ্চয় নিয়ে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিযে নিজেদের দেশেব বাইরে অন্য কোথাও যেতে চায়। স্বভাবতই, কাঁটাতারের বেডার কাছাকাছি যেখানে বড়ো বড়ো ঘাস কিংবা অন্য ঝোপঝাড়ের আড়াল আছে, সীমান্ত পার হওয়ার জন্য সে জাযগাগুলোকেই বেছে নেওয়া হয। খরগোশের মতোই তারা নিঃশব্দ দ্রুততায সীমান্ত পাব হতে চেষ্টা করে। কিন্তু কখনো দেখা যায় বর্ডার আউটপোস্টের বাইফেল থেকে একটা নগণ্য শব্দ হয, দেখা দেয় খানিকটা ধোঁয়া, যা মিলিয়ে গেলে কাঁটাতারের বেড়াব কাছে ঘাসগুলোব মধ্যে মুমূর্ষু খরগোশের মতোই একটা মানুষ উলটে-পালটে আকুঞ্চিত হতে থাকে। অনেক সমযেই অবশ্য আউটপোস্টকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয়।

এই একক চেষ্টা কখনো কখনো দলবদ্ধ প্রয়াসে পরিণতি লাভ কবে। এরকম সময়ে কাঁটাতারের ওপারে সাহায্য করার মতো লোকও কিছু কিছু থাকে। আউটপোস্টের পাহারাদারদের মনেও সম্ভবত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কোনো কোনো জায়গায় কাঁটাতারের বেডাটাই তারা ভেঙে ফেলে। তার পরে অবশ্য আউটপোস্টের পাহারাদারদের মধ্যে আরো কড়াকড়ি পড়ে যায়। রাইফেলের বদলে মেশিনগান আসে। বেড়ার এপারে ওপারে, বেড়ার গায়ে অনেক মৃতদেহ—শিশু বৃদ্ধ যুবক এবং নারীর—জমা হয়। কিন্তু ততক্ষণে অনেকে সীমান্তেব ওপারে জঙ্গলে আগাছায় ঢুকেও পড়েছে। এরকম সময়ে বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব—এমন সব শব্দ রয়টারের মতো সংবাদ-বণিকরা সংবাদে ব্যবহার করে।

এরকম একটা নতুন উদ্বাস্তু দল কিংবা দলের ধ্বংসাবশেষ নিয়েই এই গল্প। কথাটা ওভাবে বলা বোধহয় ঠিক নয়। এটা এমন একটা দল নয় যারা একই সঙ্গে সীমান্ত পার হয়েছিল। সীমান্তের নানা অংশে নানা দলে পার হওয়ার চেষ্টা করেছিল, হঠাৎ একদিন বা দু-তিন দিন ধরে সেসব

দলের থেকে ধরা পড়ার পরে, এবং মৃত্যুর পরে যারা অবশিষ্ট ছিল তারা সকলে মু শহরে এসে পৌঁছেছিল। সেখানে খোলা আকাশের নিচে এই দলটি গড়ে উঠেছে। এদিক দিয়ে দেখতে হলে দলটি অবশ্যই নতুন, কিন্তু অনুভূতির দিক দিয়ে এটা সত্য ছিল না, কারণ দলের প্রায় প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয় ছিল পূর্ব অবস্থার ধ্বংসস্তূপ। এমন কেউই ছিল না যার সঙ্গী অথবা সঙ্গীনীদের দু-একজন সীমান্ত পার হতে ব্যর্থ না হয়েছে।

এ বিষয়ে ব্যতিক্রম বোধহয় সেন্ট সাইমন, সে একাই। তার মুখ দেখে তার মনের ভাব কিছুই বুঝবার উপায় ছিল না, তার সম্বন্ধে এরকম ধারণা হওয়ার এটা কারণ হতে পারে। আর তার মুখ দেখে মনের ভাব বুঝতে না পারার একটা সহজ কারণ এই ছিল যে তার মুখটা ছিল মুখোশে ঢাকা। ফ্যান্সিড্রেস বলে যে রকম কিম্ভূত মুখোশ পরা হয় তেমন কিছু নয়, বরং মুখোশটাকে মুখোশ বলে যাতে মনে না হয় প্রস্তুতকারক সেদিকেই নজর রেখেছিল। পাতলা হলুদ রবারের তৈরি। কাছে থেকেও প্রথমবারে ব্যাপারটা ধরা না পড়তে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় বার চাইলেই বোঝা যায়। চোখের নিচে থেকে চিবুক অবধি তার মুখের যে মোমের মতো মসৃণতা, যা চিন্তাতেও স্থির, এমন মানুষের মুখের ত্বক হয় না। দলে এ কথাটা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে, এখন সকলেই জানে। কে প্রথম বলেছে তা নিয়ে এখন আর কেউ আলোচনা করে না, এখন সকলেই চায় মুখোশ যেন সে না খোলে। ব্যাপারটা যুদ্ধের সময়ে ঘটেছিল। যা তার মুখ ছিল এখন হয়তো তা পোড়া কুঞ্চিত খানিকটা চামড়া, নাকের জায়গায় হয়তো দুটো গর্ত আছে যেমন কঙ্কালের থাকে। দলের সর্বসম্মত অভিমত এই যে সেন্ট সাইমন মুখোশ পরে ভালোই করেছে।

অন্যদিক দিয়েও সেন্ট সাইমনের কাছে দলের সকলেই কৃতজ্ঞ বোধ করে থাকে। লোকটি সব চাইতে কম কথা বলে, সব চাইতে কম হা-হুতাশ করে। দলের প্রায় শেষে যেখানে সব চাইতে ক্লান্ত মানুষ কয়েকটি প্রায় দলের সঙ্গে সংযোগ ছাড়া হয়ে চলে পথের ধারে বসে পড়ে, যে-কোনো সরাইয়ে ঢুকে পড়ে পকেটের শেষ কয়েকটি ফ্রাঁর বিনিময়ে গাদা গাদা বিয়ার খায়, কিংবা সস্তা জুয়োর আড্ডার ধারে ঝুঁকে দাঁড়ায়, তখন সেন্ট সাইমনকে তাদের কাছাকাছি দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তার ফলে রাস্তায় বসে পড়ার মোহ যখন কাটে, তখন দলের সেই পথভ্রষ্ট লোকগুলো তার সঙ্গে দলের ভিড়ে আবার ফিরে আসতে পারে। যদিও এটা সেন্ট সাইমনের নিজের মুখোশের জন্য হীনমন্যতার ফলই হয়তো যে সে দলের শেষ দিকে চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

নিনা, পুরো নাম নিনচ্‌কা, একবার এমন একটা অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল। অটমের মাঝামাঝি তখন, দুপুরে দলটি একটা গ্রাম পার হয়ে চলেছিল। সীমান্ত পার হওয়ার পরে তখন প্রায় পনেরো দিন হয়ে গিয়েছে। ধুলো, তৃষ্ণা, পথের ধারে ধুলোয় ঢাকা সাইট্রাস। নিনা পিছিয়ে পড়েছিল। তার ক্যানভাসের জুতোও যেন পায়ের পক্ষে দুঃসহ। গরমের ফলে স্ট্র হ্যাটের নিচেও তার দুই চিবুকওয়ালা মুখটা গাজরের রং নিয়েছে। পথে তখন খড় বোঝাই ট্রাকগুলো চলেছে। তাদের একটিকে সে হাতের ইশারায় থামিয়েছিল। হিচ-হাইকিং-এর পদ্ধতিতে চললে মন্দ হয় না। ড্রাইভার পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি কৃষক। নিনার ভারেই যেন ট্রাকটার গতি মন্থর হয়ে গেল। পিছনের কয়েকখানা ট্রাক পার হয়ে গেল সেটিকে, আর পার হওয়ার সময়ে দ্ব্যর্থক ভাষায় নিনার ট্রাকের ড্রাইভারকে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে গেল, যদিও তখন দুপুর পার হয়নি।

বিকেলে পথের ধারে একটা সরাইতে ট্রাকটা থেমেছিল। জানলার ভাঙা কাচে কাগজ-সাঁটা, দরজার পাশে ফ্লাই পেপার ঝুলছে, টেবলে ভন ভন করে মাছি উড়ছে—সেই সরাইতে গিয়ে নিনা ট্রাক-ড্রাইভারের টেবলসঙ্গিনী হয়ে বসেছিল। বিয়ার দিয়ে শুরু করে, পুরনো কেক যার গন্ধটা পচা নাশপাতির মতো, আর কালো কফি যার স্বাদ অনেকটা রং করা চকের মতো, তা দিয়ে তারা ক্লান্তি দূর করেছিল। আর তারপর হাঁটতে হাঁটতে তারা যেখানে ট্রাকটাকে পথ থেকে নামিয়ে নির্জন

মাঠের মধ্যে একটা খড়ের পাঁজার পাশে রেখে গিয়েছিল ড্রাইভার, সেখানে পৌঁছালো। নিনার কাছে পুরুষ নতুন নয়। তার এক-কামরার ফ্ল্যাটের নোংরা হলুদ রঙের সস্তা কাগজে মোড়া চার দেয়ালের সঙ্গে সোনালী লাল হয়ে আসা খোলা আকাশের আবহাওয়াটাতেই যা পার্থক্য, আর অন্য নতুনত্ব বোধহয় এই যে ট্রাক-ড্রাইভারের ভাষা তার কাছে বিদেশী ভাষা।

কথা ছিল ট্রাক-ড্রাইভার তাকে পৌঁছে দেবে দলের কাছে, কিন্তু নিনা যখন ট্রাকের কাছে এসে পৌঁছেছে, তখন সে সেন্ট সাইমনকে দেখতে পেয়েছিল। নিনা বর্ণহীন হাসি দিয়ে—তার ফ্ল্যাটের দরজায় ক্রেতাদের যে হাসিতে বিদায় দিতে অভ্যস্ত ছিল—ট্রাক-ড্রাইভারকে বিদায় জানিয়ে সেন্ট সাইমনের পিছন পিছন হাঁটতে শুরু করেছিল। কিছুক্ষণ নিনার মনে বিদেশী যুবক ট্রাক-ড্রাইভারটির দ্বিধাগ্রস্ত অকৌশলী আচরণগুলো রিমঝিম করতে লাগল। সে ভাবতে চেষ্টা করল, এমন কিছু সে অনুভব করেছে কি না এরও আগে। তখন তার কম বয়সের পলিটেকনিকের ছাত্রদের কথা মনে পড়ল, যাদের একজনকে অশিষ্ট কৌতূহলের জন্য শাসন করেছিল সে এক দুপুরে। কিন্তু তারপর থেকে সে ছাত্রটির কাছ থেকে অনেকদিনই কিছু নেয়নি। এবং তার সন্দেহ হয়, পঁয়তাল্লিশ বছরের সাদা ও বাদামী রঙের চুলের মাথা ও দুটি চিবুক সমেত মুখ আঁকবার ছুতো করে আর্ট স্কুলের যে ছাত্রটি সপ্তাহে একবারের বেশি তার ঘরে এসে বিকেল থেকে রাত দশটা অবধি কাটাতো, সে পলিটেকনিকের সেই ছাত্রটির কাছেই কিছু শুনে থাকবে। ছাত্রমহলেই তার পসার ইদানীং কিছুদিন ধরে বেড়ে উঠছিল।

কিন্তু হঠাৎ একটা অনুতাপের মতো কিছু নিনা অনুভব করেছিল, যেন শুক্রবারে সে মাংস খেয়েছে। যেন একটা পবিত্র কোনো দিনে—সব জীবনেই এমন একটি পবিত্র দিন আছে, নিনারও ছিল নভেম্বরের সাতাশে, সেদিন তার মায়ের মৃত্যুদিন—যা উচিত নয় তাই সে করেছে। সে কি অ্যাভলনের সরাইয়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে না? নিনা লক্ষ্য করে দেখল কয়েক ধাপ আগে সেন্ট সাইমন হেঁটে চলেছে। মাথায় ক্যানভাসের হ্যাট, গায়ে সাদা—এখন ময়লা মেটে রঙের—পা পর্যন্ত লম্বা ঝুলের স্মক্ ফ্রক। খানিকটা দৌড়ানোর ভঙ্গিতে চলে সে সেন্ট সাইমনের পাশে পাশে চলতে শুরু করেছিল, তারপরে এক সময়ে খুব হালকা করে আঙুলের ডগাগুলো সেন্ট সাইমনের আস্তিনের উপরে রেখেছিল। আর সেই সন্ধ্যাতেই নিনা আবিষ্কার করেছিল, অস্পষ্ট অন্ধকারে সেন্ট সাইমনের ক্যানভাস হ্যাট এবং লম্বা ঝুলের স্মক্ ফ্রক পরা চেহারাটা কতকটা পাদরির মতো দেখায়। নিনা সেন্ট সাইমনের সঙ্গে দলে ফিরে এসেছিল। ফিরে আসতে আসতে সন্ধ্যার হাওয়ায় শরীরটা জুড়িয়ে এলে অনুতাপের জ্বালাটাও কমে গেল।

পঁচিশ থেকে ত্রিশ জনের দল। সংখ্যাটা অনির্দিষ্ট থাকার কারণ এই, একেবারে সামনে সামনে যারা চলেছিল আর একেবারে পিছনে যারা, তাদের মধ্যে অনেক সময়ে ধুলোভরা গ্রাম্য পথের এক-আধ মাইল ব্যবধান থেকে যাচ্ছিল। অন্যদিকে বেশ কিছুদিন হল সামনের এবং পিছনের মানুষগুলোর ছাড়াছাড়ি হচ্ছে না, যে পথে সামনের লোকগুলি চলেছে সে পথেই একেবারে শেষের লোকগুলিও। আর অন্তত দু-একবার তারা একই জায়গায় একত্র বসেছে—একটা পরিত্যক্ত স্কুলঘরের বারান্দায়, কিংবা একটা অমনিবাস স্টেশনের শেডের নিচে।

দলের মাঝামাঝি যা চলেছে তাদের মধ্যে একজন ছিল যাকে আমরা যোশেপ বলবো, কারণ এখন তার কৌলিক উপাধি অর্থহীন, যেহেতু তার একমাত্র পুত্র যে তার পরে সেই প্রাচীন কৌলিকতাকে জীবিত রাখতে পারত, সে সীমান্তের কাঁটাতারের কাছেই এক ভলি সাবমেশিনগানের গুলিতে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, এবং কারণ তাকে এখন আর প্রফেসর বলেও লাভ নেই, যেহেতু সে কোনোদিনই আর কোথাও অধ্যাপনা করবে এমন সম্ভাবনা নেই। এ বিষয়ে সে চিন্তাও করেছে। তার অধ্যাপনার বিষয়টাও কি নিরর্থক হয়ে যায়নি? তার লেখা বইগুলোতে জাতির প্রাচীন ঐতিহ্য

সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত আছে তা সবই বন্ধ্যা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। এক সময়ে তার ছাত্ররা তার মাথার পিছন দিকের মরচে আর সাদায় মিশানো ফাঁপা ফাঁপা চুলগুলো দেখে কল্পনা করতে ভালোবাসতো ওই চুলগুলোর নিচেই অধ্যাপকের প্রকাণ্ড মস্তিষ্কটা থাকে। এখন তাকে কেউ হয়তে ফ্লাপি জো বলতে পারে তাব দরুণ সস্তা কমরেডারি দেখাতে।

অধ্যাপকের সঙ্গে তার স্ত্রী আছে। তাকে দেখলে বরং অধ্যাপকের ছাত্রী বলে মনে হয়। তার বেশভূষাতেও বেশ একটা ছিমছাম বাবুয়ানার ভাব আছে। তার পায়ে যে ব্রাউন রঙের জুতো, তার গায়ে যে মসলিনের গাউন তা বেশ দামী। মনে হতে পারে অধ্যাপকের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী। আসলে তা নয়। অধ্যাপকের প্রাপ্তবয়স্ক যে ছেলেটি কাঁটাতারের বেড়ার কাছে চিরকালের জন্য মুক্তি পেয়েছে তারই মা সে। ভুলটা হওয়ার প্রথম কারণ তার দেহের গড়ন, দ্বিতীয় কারণ অধ্যাপক সীমান্তের এপারে প্রথম শহরে পৌঁছে তার যথাসর্বস্বের একটা মূল্যবান অংশ ব্যয় করেছে স্ত্রীর পোশাকের জন্য—যেন তা করে, কিছুই হয়নি, যা হয়েছে তাকে সে গ্রাহ্য করে না—এমন কিছু প্রমাণ করা যাবে। অধ্যাপকের স্ত্রীর নাম রুথ।

যোশেপ এবং রুথের সঙ্গে অনেকেরই রোজ দেখা হয় না, সেন্ট সাইমনেরও হয় না। এমন নয় তারা কাউকে এড়িয়ে চলে, কিংবা দলের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের রোজ দেখা হয়। সেন্ট সাইমনের সঙ্গে একবার তাদের দেখা হয়েছে, দলের এমন অনেকের সঙ্গেই দু-একবার তাদের দেখা হয়ে থাকবে, কিন্তু তার সম্বন্ধে একবার তারা আলাপ করেছিল নিজেদের মধ্যে। যোশেপ বলেছিল—ওর পূর্বপুরুষ বোধহয় ফরাসী দেশ থেকে এসেছিল আমাদের দেশে। ফরাসীদের অমন নাম হয়। রুথের মনে কৌতূহল ছিল, কাজেই যোশেপ প্রায় আধঘণ্টা ধরে মধ্য ইউরোপে প্রচলিত কৌলিক উপাধি নিয়ে, কোনটা কোন দেশের পক্ষে স্বাভাবিক, সেটা অন্য দেশে গিয়ে কীভাবে উচ্চাবণে ক্রমশ বদলে যায়—এমন সব আলোচনা করে গেল চলতে চলতে। রুথ তার পাশে পাশে হেঁটে যেতে যেতে বেশ মন দিয়েই শুনল। কিন্তু এতে তার কৌতূহল মিটল না। মিটবে এমন আশাও ছিল না। তার ধারণা হয়েছে সেন্ট সাইমনের ছেঁড়া স্মক ফ্রকের নিচে অন্তত সে একবার একটা পিতলের তারা দেখতে পেয়েছে, যার গায়ে কলঙ্ক জমলেও, অস্পষ্ট আলোয় যা চিক চিক করছিল। কোনো লিজিঅনের সভ্য হওয়ার চিহ্ন। অথচ এ নিয়ে আলাপ করতে তার সাহস হচ্ছিল না। এ রকম তারা এর আগেও সে দেখেছে বলে তার মনে হয়েছে। তার ছেলের বন্ধুদেব, যারা অনেক সন্ধ্যাতেই আসতো তাদের ফ্ল্যাটে, কোটের বুকে লাগানো দেখেছে। তার ছেলে তারাগুলো নেহাত পিতলের তৈরি বলে রসিকতা করে হাসতো। ছেলের হাসি ছেলেকেই মনে করিয়ে দেয়। আর তখন সব সাহসই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু এখন তা হলে চলবে না, কারণ অ্যাভলনের সরাই কোথাও আছে এবং সেখানে পৌঁছুতে পারলেই ওরা আসবে সাহায্য নিয়ে এগিয়ে। রুথ বুঝতে পারল তার নিজের চোখের জলের স্বাদই সে পাচ্ছে। তা হলে সে ঠোঁট দুটোকে চেপে রাখতে পারেনি, তারা কাঁপছে।

অ্যাভলনের সরাইয়ের দিকেই উদ্বাস্তুদের দলটি এগিয়ে চলেছে। পথ চলার শ্রম, এবং উদ্বাস্তু হওয়ার হাজার রকমের অসুবিধার কথা—এক কথায়, অভিজ্ঞতা কম হয়নি বলা যেতে পারে। এ বিষয়ে অন্যতম নির্ভরযোগ্য বক্তা বোধহয় জন। জন নিজের শহরে রাজমিস্ত্রী ছিল। অন্তত তাই সে বলতো নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে। সে জানতো এটা তার দম্ভর অনুচিত প্রকাশ, এবং এই অনুচিতের বোধ থেকেই সে এমনটা বলতো তা সে জানতো না। কারণ রাজমিস্ত্রী হয়ে জীবন শুরু করে উদ্বাস্তু হওয়ার ঠিক আগে যেখানে পৌঁছেছিল সেখানে রূপোর কর্ণিক হাতে করেও তাকে ইট বসাতে হতো না। কিন্তু কিছুই সে সঙ্গে আনতে পারেনি, অন্য দিক দিয়ে সে যোশেপের চাইতে ভাগ্যবান। কারণ যোশেপের ছেলের পক্ষে যা সম্ভব হয়নি তার মেয়েদের—দুটি মেয়ে

তার—পক্ষে সেই কাঁটাতারের সীমান্ত পার হওয়া সম্ভব হয়েছে। অবশ্য এসবের মধ্যে এমন কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যার জন্য সে পথের রোজনামচা রাখবে। এই একটা বিশেষত্ব ছিল সে রোজনামচার যে তারিখ তাতে খুব কমই লেখা হয়েছে। তার ফলে এ রকম মনে হয় যে লেখকের কাছে সব দিনগুলি মিলে একটিমাত্র দিনে পরিণত হয়েছে। তা হলেও তার রোজনামাচা, যা তার পুরনো নোট বইয়ের এখানে সেখানে, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকবারই ফেলে রেখে আসা ব্যবসা সম্বন্ধে টুকিটাকি মন্তব্যের নিচে, পেনসিলে লিখে রাখা মতামত মাত্র, আমাদের আলোচনার দিক দিয়ে মূল্যবান, কারণ তা থেকে উদ্বাস্তু দলের পথপরিক্রমার একটা ধারণা করা যায়। উদাহরণ হিসাবে দু-তিনটি দিনলিপি উদ্ধার করা যেতে পারে।

এই গ্রামের পথে অমনিবাস পাওয়া যাবে ভাবা যায়নি। কোনো বিশেষ গন্তব্য নয়, ড্রাইভার বলেছিল, এই হাই রোডের উপরেই মাইল পনেরো পরে সে বাঁক নেবে, ততদূর সে পৌঁছে দিতে পারে। অনির্দিষ্ট থেকে আর একটি অনির্দিষ্ট বিন্দুতে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু হাত দিতে ঘৃণা করে, চড়তে ভয় হয় এরকম অমনিবাস কাদের কাজে লাগে? গ্রামের কৃষকরা মেলায় যায়? উৎসবের মতো মনের ভাব থাকে তাদের তখন, বোধহয়, তাই নিজেদের ঘোড়ার গাড়ির বদলে এই বাসটাকে ভাড়া করে। বাসের দু-একজন যারা যাত্রী ছিল, তাদের কারো কারো গলায় উৎসবের ভঙ্গিতেই রুমাল জড়ানো। বিশেষ কারো জন্যেই তারা বাসে ওঠেনি, শাশার পায়ে ফোসকা পড়েছে এটাকেই কারণ হিসাবে দাঁড় করানো যেতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতাটা কেমন হল না? বাফ রঙের কনুই-ছেঁড়া পুরনো কোটপরা, গলায় হলুদে রুমাল জড়ানো, সেই যাত্রীটি নিজেকে বোধহয় নিজের হারেমে উৎসবরত কোনো তুর্কী সুলতানের মতো কিছু মনে করে থাকবে। সে তার বিদেশী, সুতরাং জনের কাছে দুর্বোধ্য, ভাষায় চিৎকার করছিল, গান করছিল, শাশার উরুতে চাপড় দিয়ে রসিকতার মর্মটা ধরিয়ে দিচ্ছিল। আর জন তখন নিষ্ক্রিয়, কতকটা সুলতানী হারেমের খোজা পাহারাদারদের মতো, সেই বেহায়া ইতরতার সাক্ষী হয়ে বসে রইল ; কিন্তু ঠিক খোজা পাহারাদার তো নয় সে। তার মন থেকে উঠে একটা ভয়ঙ্কর কালো, ভয়ঙ্কর হিংস্র, তেমনি অসম্ভব অসহায় কিছু তার হৃৎপিণ্ডটাকে কামড়ে ধরেছিল। উদ্বাস্তুদের পক্ষে যা সম্ভব তাই করেছিল শাশার মা। জনের গলার টাই খুলে দিয়েছিল, জলের বোতল থেকে রুমাল ভিজিয়ে জনের কপাল, ঘাড় মুছে দিয়েছিল। কিন্তু অমনিবাস থেকে নেমেই ড্রাইভারদের সঙ্গে যা ঠিক হয়েছিল তার চাইতে বেশি দু-এক ফ্রাঁ তাকে দিয়েছিল জন। তার হাত ধরে তাকে বিদায়-সংবর্ধনা জানিয়েছিল। আর শাশার মা তখন নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে শাশার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদছে। ঠিক তখনই যেন কালো একটা ভয় জনকে মুহ্যমান করে দিল। কী আহাম্মক সে। হাসি এবং ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল পাসপোর্টহীন এই ভ্রমণকারীদের কথা লোকটির জানা আছে, একরকম সহানুভূতি বরং আছে তার— যা প্রায় ধর্মভাবের মতো। কী হয় কেউ যদি শাশার উরুতে চাপড় মেরে রসিকতা করে থাকে? এ কেমন রাগ তার? এ কেমন বেহিসেবী রাগ?

অ্যাভলনের সরাইয়ের দিকেই সকলে চলেছে। কিন্তু সকলেই পৌঁছুবে এমন কথা নেই। ভ্যান ব্রনও পারলো না। সে যুবক ছিল, যোদ্ধা ছিল, লেফটেনেন্টের ইনসিগনিয়া তার প্রমাণ। কিন্তু হয়তো ক্ষয়রোগ ছিল তার। যুদ্ধ থেকে অনেকেই এমন রোগ নিয়ে ফিরেছে শত্রুপক্ষের বন্দীশালায় না গিয়েও।

গ্রামটার নাম কারো জানার কথা নয়। যুদ্ধের সময়ে হঠাৎ বিখ্যাত হয়ে উঠে যুদ্ধ চলতে চলতেই বিস্মৃত হয়েছে, এমন কোনো গ্রামই হবে। দলের প্রায় সকলেই ক্রমশ এসে এসে কিছু দূরে দূরে ভাগ হয়ে বসেছে বিশ্রাম করতে। কিন্তু এখনো অনেকদিন পরেও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যুদ্ধ বিরাজ করছে বলে মনে হয়। শহরের ধ্বংসস্তূপ যেমন হয়ে থাকে তেমন নয়। ছোট ছোট কয়েকটি বাড়িই

ছিল এ গ্রামে—তাদেব ধ্বংসস্তূপ, ধ্বংসেব ছবিতে যেমন দেখা যায়, ঠিক তেমন কবেই সাজানো। গ্রামে ঢুকবাব মুখে একটা ট্যাঙ্কেব ধ্বংসাবশেষ। তাবপব কামানের গোলায় তৈরি গহ্বব সমেত পথটা যতই এগোতে থাকে, অদ্ভুত নিস্তব্ধতাব মধ্যে অনেক ধ্বংসেব চিহ্নের মধ্যে অযত্নে পড়ে থাকা জীবনের স্মৃতিবাহী ছোটোখাটো জীবনের উপকরণ ছড়ানো—একটা ভাঙা খেলনা, একটুকবো খববের কাগজ, পথেব পাশে একটা লাইটপোস্ট, যার গাযে বিভিন্ন কোণে লাগানো কালো এনামেলেব ফলকে সাদা অক্ষরে লেখা অন্য কযেকটি নগণ্য গ্রামেব নাম পডা যায়।

এখানে তাদেব ভালোই লাগছিল—তাব কাবণ এখানে তারা ছাড়া কেউ ছিল না। এমনকি তাদেব দু-একজন যেন পথেব ধারেব সাইনপোস্টটাতে একটি নাম খুঁজল—যে নামটা লিখিত অবস্থায় কোথাও তাবা দেখেনি কিন্তু যা তাদেব মনেব মধ্যে যেন লেখা দেখতে পেযেছে। কিন্তু সিনেমায বা চিত্রে সাধাবণত যা থাকে না তেমনি কিছু ছিল। একটা ঘরেব ধ্বংসাবশেষে—আগুন ধবে গিযেছিল তা দেয়ালেব কালিতে বোঝা যায়—একটা ঘোড়াব কঙ্কাল। মাটিতে পড়ে না থেকে একটু যেন খাড়া হযে আছে সেটা, দানা-দেয়াব টাবে আটকে যাওযাব ফলেই হযতো। আব সেই কঙ্কালেব দাঁতগুলোতে বীভৎস হাসিব মতো একটা হ্রেষা জড়ানো।

এটা দেখেই কি ভয পেযেছিল ভ্যান ব্রন? কিন্তু ভযের চাইতেও বড়ো ঘটনা ঘটেছিল। সে তাব সার্বিস বিভলবাবটা দিযে নিজেব মাথাব খুলি ফাটিযে দিল।

ভ্যান ব্রন খুব সম্ভবত ক্ষযবোগীই ছিল , (নতুবা আতঙ্ক বোগেব কথা বলতে হয, আব সে বোগের নাম কে কবে শুনেছে?) তাদেব আশা একটু বেশি স্পর্শকাতব হয, সহজেই জ্বলে ওঠে, তেমনি সহজেই নিবে যায। অবশ্যই সাইনপোস্টেব গাযে কোনো ফলকেই 'অ্যাভলন' লেখা ছিল না। সে কি খুব জোব দিযে আশা কবেছিল, দক্ষিণ-পশ্চিমেব দিকে বাঁকানো কোনো ফলকে লেখা থাকবে—অ্যাভলন ৪২ কিঃ মিঃ?

কিন্তু কান্না বোধহয সংক্রামক হতে পাবে। হঠাৎ অনেকেই যেন কাদতে শুরু কবল। ফুঁপিযে কেউ, কেউ রুমালে চোখ ঢেকে। অথচ ভ্যান ব্রনকে কেউ চিনতো বলে মনে পড়ে না। নিবর্থক, একেবারেই নিরর্থক শোকেব দিক থেকে। উত্তব সমুদ্রেব কোনো শীতেব বাতে সীলবা দল বেঁধে এমন কাঁদে বটে। যেন কোনো অদ্ভুত উপাযে সকলেবই বযস ক'মে গিযেছিল।

একদিন যেমন অনেকে কেঁদেছিল, কেন এবং কবে তা ঠিক মনে পড়ছে না (জনেব), আজ আবাব সকলে হাসছে। সবাই দাঁড়িয়ে কোমবে হাত বেখে সামনে ঝুঁকে পড়ে হাসছে তা নয। প্রফেসব যোশেপের মুখে একটা হাসি খেলা কবছে, তাব চশমাব উপবে প্রতিবিম্বিত আলোব শিখাব মতোই। তার স্ত্রী কেরোসিন স্টোভে চায়ের জল ফোটাচ্ছে পথেব ধারে বসে। সে কিছু বলে থাকবে, নিজে বলে নিজেই খুশি হয়েছে, খুশিটা তাব মুখে জড়িয়ে আছে। জনেব দল—সে নিজে, শাশা, মিশা এবং তাদের মা—বসবার মতো জায়গা খুঁজে নিতে এগিযে চলেছে। যোশেপেব কাছে পৌঁছানোব আগেই সে আরো দু-একটা উপদলেব পাশ দিয়ে এসেছে। নিনা তাব মাথায সাদাপাড় টকটকে লাল রঙের রুমাল বেঁধেছে। সে দুটো গাছের ডালে দড়ি টাঙিয়ে জামা-কাপড় মেলছে, গুন গুন করে একটা সুরও ভাঁজছে যেন। কিন্তু বুড়ো আইজ্যাকেব হাসিটাই সব চাইতে স্পষ্ট। পুবনো স্টেশনেব ধারে, ট্যাক্সি স্ট্যান্ডেব পিছনে, যে বড়ো তামাকের একটা দোকান বাখতো, কতকটাই তারই মতো, ছুঁচলো চিবুক সমেত তার টাক মাথাটা যেন একটা বড়ো ডিম যার উপরে তুলো লাগিয়ে ভুরু আঁকা হয়েছে। লম্বা লম্বা শুকনো হাত পা লটপট করে তার। সেই লটপটে ডান হাতখানা, যেন তা সাইনপোস্টের গায়ে লাগানো তেরছা ফলক, সামনের দিকে বাড়িয়ে দোলাতে

দোলাতে খুঁত খুঁত করে হাসছিল। এরকম মনে হতে পারে সে সামনের দিকে কিছু একটা দেখিয়ে দিয়েছে, আর তা সকলকেই।

কিছুক্ষণের মধ্যে যেন রটেও গেল—যেমন করে ঝরা পাতা থেকে বসন্তের কথা রটতে থাকে—অ্যাভলনের কথা নতুন করে কেউ বলেছে। কিন্তু কে বলতে পারে? এমন কি সম্ভব অ্যাভলনের সরাইতে যারা আসবে তাদের দলেরই কেউ সমস্তটা পথ সঙ্গে সঙ্গে থেকে উৎসাহ দিয়ে চলেছে? স্বভাবতই, তা হলে, সে নিজেকে গোপন রাখবে। এই প্রশ্নটাই যেন অনেকের মনে একটা আশ্বাসেব ঢেউ তুলে চলেছে হাসির আড়ালে। এবকম সময়ে সহযাত্রীদের অনেকের মুখ নতুন করে চিনতে চেষ্টা করা স্বাভাবিক। সে কি বুড়ো আইজ্যাক, কিংবা সেন্ট সাইমন? সেন্ট সাইমনের মুখোশের কাছেই প্রশ্নটা একটু বেশি কৌতূহলী হয়ে ওঠে। মুখোশ-মাত্রেরই অমন কৌতূহল জাগাবার যোগ্যতা আছে অবশ্য।

কিন্তু কেউ যেন সত্যি বলেছে—অ্যাভলন আর বেয়াল্লিশ কিলোমিটার।

জনের রোজনামচায় বুড়ো আইজ্যাকের কথা আছে। এতদিন প্রায় নিঃশব্দে চলেছে সে অনুল্লেখযোগ্য ভাবে। এই পাহাড়টার কাছাকাছি এসে সে যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অথচ পাহাড়টা খুব একটা উঁচু কিছু নয়, যদিও পথে এই প্রথম পাহাড় বলে তাকে কিছু সম্ভ্রম না দেখালে চলে না। আইজ্যাকের পায়ের তলা শির শির করে উঠছে এই ভেবে—চূড়ায় উঠতে সে হয়তো পারবে, কিন্তু সেখানে গম্বুজের মতো জায়গাটায় চোখ খুলে দাঁড়াতে সে কি পারবে? ইদানীং নিজের ফ্ল্যাটের সিঁড়ি দিয়ে নামতে তার মাথা ঘুরে উঠত নিচের দিকে চাইলে। এটা একটা ক্রাইসিসের মতো কিছু বলে মনে হচ্ছে। আইজ্যাক বলার মতো স্পষ্ট করে ভাবল, কিংবা বলা এবং চিন্তা করাকে যেখানে পৃথক করা যায় না, সেখানে শব্দ দুটি শোনা যাচ্ছে—আভে মারিয়া, আভে মারিয়া।

কিছুদিন থেকে কিছু একটা যেন সে অনুভব করছিল তার বুকের মধ্যে, এখন তা উঠে এল। অনেক সময়ে পুরনো শ্লেষ্মা বুকে আটকে শরীর অস্থির করে, পরে সেটা উঠে গেলে শান্তি পাওয়া যায়। বিশেষ করে বুড়ো বয়সে আইজ্যাক এটা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে। খানিকটা কাশি ফেলল সে। আভে মারিযা! তা কথাটা প্রায় চল্লিশ বছর পরে উঠে এল মনের তলা থেকে। আইজ্যাক মিট মিট করে হাসল যেন খুব একটা আবিষ্কার করেছে সে।

সামনের পাহাড়টার চূড়ায় একটাও গাছ নেই। খয়ের রঙের পাহাড় আর তার গায়ে ছাই রঙের পথ, যেখানে পাহাড় ভেঙেছে সেখানে পাথরের রঙ সাদা দাঁতের মতো ধারালো।

একটা তুলনাই যেন আসছে তার মনে যে জন্যে তার ধারণা হচ্ছে, চল্লিশ বছর আগেও সে একবাব যেন উদ্বাস্তু হয়েছিল। অবশ্য এখন কিছু আর এসে যায় না, যদিও সে পরে জানতে পেরেছিল, রেবেকার ক্ষয়রোগ ছিল আর তার সন্তানও কোনোদিন হয়নি। কিন্তু একদা সে ধর্ম এবং সুতরাং সমাজ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে রেবেকার বাবার তামাকের দোকানের পিছনে সেই ছোট ফ্ল্যাটটায় পৌঁছেছিল এক সন্ধ্যায়, যেখানে রেবেকার আপত্তি ছিল না শেমিজ পরে তার সামনে দাঁড়াতে। তার পর থেকে দশ বারোটা বছর—এই মোটামুটি সময়টা, নিচের তামাকের দোকান আর দোতলার শোবার ঘরের বাইরে যায়নি সে, কারণ সেখানে রেবেকা ছিল, সবুজ শেমিজ পরা, লেসের শেমিজ পরা, লাল শেমিজ পরা, লাল, সোনালী, সবুজ মদের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে শেমিজ পরা, হাতির দাঁতের তৈরি রেবেকা।

ধর্ম আর সমাজ এক না হলেও তাদের গণ্ডি দুটো সমকেন্দ্রিক বৃত্তদ্বয়ের মতো। আর তখন—পঁচিশ বছর বয়সেই—একটা ধর্মীয় ক্রাইসিসের অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছিল আইজ্যাকের। যদিও ধর্ম বিষয়টাই যৌবনের পক্ষে আকর্ষণীয় নয়, সভ্য সমাজে যুবকদের চার্চে যাওয়ার রীতি থাকলেও। উপরন্তু

সে তখন ন্যাশনাল আর্মির এক সাবলটার্ন, আর তার চোখের সামনেই একটি একুশ বছরের মেয়ে বিরাজ করছে। তার বেলায় কিন্তু যৌবনই, অর্থাৎ এই মেয়েটিই, ক্রাইসিসটাকে টেনে এনেছিল। আইজ্যাক আবার হাসল—বুড়োটা একটা বুড়ো শেয়ালই ছিল।

কিন্তু এখানে আসল কথা হচ্ছে—রেবেকাকে দুই বাহুর উপরে তুলে নিলে পবিত্র কিছু মনে হতো না? যদিও তা একটা উষ্ণ নারীদেহ। উদ্বাস্তু হলেই অপবিত্র কিছু হয় না। কে জানে মারিয়া রেবেকার মতো হালকা গড়নের ছিল কি না?

এখানে আসল কথা এই নয়—সিনাগগ আর চার্চের মধ্যে যে পথ তা পাহাড়ী পথের মতো ঢালু, যে পাহাড়ে উঠতে গিয়ে মহত্তম মাতা মারিয়ার কথা মনে হবে। আইজ্যাক পবিত্রতা কথাটাকেই আবার অনুভব করল।

এর একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চায় আইজ্যাক। নিনার জন্যই—যদিও সে নিমিত্ত মাত্র হতে পারে, মনে আসছে এসব কথা। নিনা নোংরা মেয়েমানুষ, তা বোঝা যায়। এবং তখন বিশেষ করেই বোঝা গিয়েছিল রুথের নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকে, যখন নিনা যোশেপকে জিজ্ঞাসা করেছিল, পাহাড়টা পেরোলেই সত্যি একটা রেল স্টেশন পাওয়া যাবে কি না, যে রেল স্টেশনে কয়লা টানার ফ্রেট কারে তাদের জন্য জায়গা হবে। গৃহিণী মেয়েরা ওদের দেখামাত্রই বুঝতে পারে। তাছাড়া নিনার বাদামী-সাদায় মেশানো চুলে, খয়েরী চেক সুতোর গাউনে এমন একটা সুস্থ পশুর ভাব আছে, যা থেকে ওর শরীরটার কথাই মনে হয়।

কিন্তু রাত্রিতে আইজ্যাক চাপা গলার একটা মৃদু রিনরিনে আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। সেটা অবশেষে একটা প্রার্থনার রূপ নিল। মহান মাতা মেরির কাছেই কেউ প্রার্থনা করছে। মাথা তুলে এদিক ওদিক চেয়ে সে দেখতে পেলো নিনাই যেন—নিনা ছাডা আর কে—প্রার্থনা করছে। একটা ক্ষীণ মোমবাতি জ্বলছে একটা পাথরের উপর। অস্পষ্ট ছায়ার মতো কেউ যেন এগিয়ে এল সেই আলোর দিকে। যেন অতিকায় একটা পুরুষ, যার গায়ে রোমান চার্চের পাদরীদের মতোই পোশাক, যদিও সে ধোঁয়াটে অন্ধকার এবং মোমবাতির অস্পষ্ট আলোয় তৈরি। মোমবাতি নিবে গেলে নিনা শুয়ে পড়েছিল, আর সেই আবির্ভাবটাও মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে যাওয়ার পদ্ধতিটা আইজ্যাকের বিশেষ করে মনে আছে। কেউ দাঁড়িয়ে থেকে তার পরে বসলে যেমন পা দুখানা প্রথমে অদৃশ্য হয়, তেমন করে যেন দৃশ্যটা মিলিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ আগে নিনা, সেন্ট সাইমন, জনের পরিবার পর পর তাকে পার হয়ে চলে গিয়েছে পাহাড়ের দিকে। সে সেন্ট সাইমনকেই জিজ্ঞাসা করেছিল—গাড়িটা পাওয়া যাবে তো?

আইজ্যাক এবার হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়টার দিকে চলতে শুরু করল।

সকালে উঠে সে মনে করেছিল উৎকণ্ঠায় তার ঘুম হয়নি, খুব সকালে সকলের আগেই সে উঠে পড়েছে, কিন্তু সে দেখতে পেয়েছিল নিনা ইতিমধ্যে উঠেছে, খয়েরী একটা নেটে সে তার বাদামী-সাদা চুলগুলোকে জড়াচ্ছে, আর তার কিছু পিছনে নিজের বাঁধা বিছানার উপরে ব'সে সেন্ট সাইমন কফি খাচ্ছে।

আভে মারিয়া। আইজ্যাক হাসল খুঁত খুঁত করে। কয়লার গুঁড়ো থাকবেই ফ্রেট কারে, আর ভিড়ও হবে। হয়তো সীমান্ত পার হওয়ার সময়ে—কি জানি আর একটা সীমান্ত পার হতে হবে কিনা—লোহার দরজাগুলোও এঁটে দেবে ওরা। কিন্তু এখানে আসল কথাটা—একটা ক্রাইসিস নয়? ধর্মের ক্রাইসিসেও একটা যন্ত্রণা থাকে।

পাহাড়ের উপরে ইতিমধ্যে কাউকে দেখা যাচ্ছে, তার চেহারাটা আকাশের গায়ে কেটে বসেছে যেন। অবশ্য কাল রাত্রিতে সেন্ট সাইমনই হয়তো নিনার প্রার্থনার জায়গার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পাহাড়টাকে লক্ষ্য করে থাকবে।

পাহাড়টাকে পার হয়েছে উদ্বাস্তুদের প্রথম দল, আর প্রথম দলেই নিনা পাহাড়তলির ছোটো রেল স্টেশনে এসে পৌঁছেছে। তার আগে যারা এসেছে তাদের মধ্যে সেন্ট সাইমন আর জনের পরিবার আছে।

নিনা দেখতে পেল, জন ইতিমধ্যে নিজেদের বসবার জায়গা খুঁজে নিয়েছে পুবনো একটা পিয়ার গাছের নিচে, আব সেন্ট সাইমন লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে যেন লাইনটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। যেখানে তারা বসেছে তার থেকে দূরে, বরং বিকেলের আলোয় বাদামী হয়ে ওঠা একটা বনের কাছাকাছি, একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে। অনেকটা দূরে চলে যাওযা গাড়ির শেষে গার্ডের কামরা যেমন দেখা যায়। নিনা ভাবল—আজই ব্যাপারটা প্রমাণ হয়ে যাবে। অন্য সকলে এসে পৌঁছানো পর্যন্ত এখন অপেক্ষা করা চলছে, কিন্তু সকলে পৌঁছে যাওয়ার পরেই সে গাড়িটার দিকে যাওয়ার জন্য যে প্রথমে উঠে দাঁড়াবে সেই যে প্রকৃতপক্ষে এই দলটিকে নিয়ে চলেছে তা বোঝা যাবে। কিন্তু কে হবে সেই লোকটি? প্রফেসর, আইজ্যাক, জন কিংবা সেন্ট সাইমন? নিনা হাসল মনে মনে আর সেই হাসির প্রভায় তার মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল—অন্য কেউ লক্ষ্য না করলেও সে এ সুযোগটাকে নষ্ট করবে না, বরং চোখ খোলা রেখে সে দেখে নেবে, যদিও উত্তেজিত হয়ে কোনোদিকে লক্ষ্য না রাখবার যথেষ্ট কারণ থাকবে।

স্টেশনটা খুব ছোটো এবং একেবারেই নির্জন। স্টেশনের ঘব বলতে একখানিই ঘর আছে, আর তার দরজাতেও একটা মরচে ধরা তালা ঝুলছে। স্টেশনেব সীমাটাকে চারিদিকের দৃশ্যপট থেকে আলাদা করার জন্য যে লোহার বেড়া ছিল তা অনেক জায়গাতেই নেই, যেখানে আছে সেখানে রংচটা, সুতরাং মরচে ধরা, লোহার গায়ে শুকনো নিকেল। চোখে দেখা এই খুঁটিনাটিগুলো বিড়বিড় করে আওড়াল সে, যেন আগে থেকে জানা কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে নিচ্ছে। তার পরে সে ভাবল, কিন্তু গাড়িটা হয়তো ওখানেই থাকবে, আর উদ্বাস্তু দলটিকে ওখানে গিয়ে উঠতে হবে। ব্যাপারটা তো প্রকাশ্য কিছু নয়। ডানদিকে পাহাড়টা এখন গাঢ় বাদামী হয়ে উঠেছে, আব এখান থেকে পাহাড়ের গায়ে একটা গ্রাম চোখে পড়ছে—গ্রাম ঠিক নয়, বাদামী পর্দার মধ্যে দিয়ে দেখা দু-একটা বাড়ির সাদা দেয়াল, লাল ছাদ। নিনা অনুভব করল, ওই গ্রামটার নিচেই, কিংবা আড়ালেই হয়তো কয়লার সেই খনি যেখান থেকে কয়লা নেয়ার জন্য এই স্টেশন।

শুকনো পিয়ার গাছটার নিচে একটা পুরো সংসারই যেন গুছিয়ে নিয়েছে জন—শাশা, মিশা আর তাদের মাকে নিয়ে। ইতিমধ্যে ওরা খাবার ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। তাদের যুক্তি এরকম হতে পারে যে হঠাৎ কখন গাড়িটা এসে থামবে, আর তখনই তাড়াতাড়ি করে উঠতে হবে সেই গাড়িতে। কিন্তু একটা কথা বোধহয় ওরা বুঝতে পারেনি। নিনা ভাবল। যদিও এটা নিনার আন্দাজ মাত্র, এবং তার পক্ষে এ সব বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলার মতো কোনো অভিজ্ঞতাই নেই ; যদিও সে বারোয়ারী স্নানের ঘরে মিশাকে স্নান করতে দেখেছিল অনেকক্ষণ ধরে—এক সপ্তাহের স্নান একদিনে। অন্যদিকে শাশাকে যুবতী বললে মিশাকে কিশোরী বলতে হয়। জনের স্ত্রীর নিশ্চয়ই বুঝতে পারা উচিত, কিংবা সে হয়তো বুঝতে পেরেছে, কিন্তু তার ঠোঁটের দু'পাশে চিন্তার চিহ্নের মাঝে মাঝে দুঃখের মেছেতা আছে—তার ফলে নতুন কোনো চিন্তা-ভাবনার ছাপ আর স্পষ্ট করে ফোটে না। অথবা—কথাটা নিনার মনে হঠাৎ নির্লজ্জ সাহস নিয়ে ফুটলো—হয়তো জনও জানে, কিন্তু এটাকে ওরা হয়তো নতুনের সূত্রপাত বলে মনে করেছে। ওপারের প্রথম নতুন মানুষ। সম্ভবত এ ব্যাপারে মিশার অপরপক্ষ সীমান্তের ওপারে থেকে গিয়েছে, সুতরাং পুরনো বীজ থেকে নতুন চারাগাছ। মিশা এত ছোটো, হয়তো তখন তার মৃত্যুও হতে পারে, ভগবান না করুন। কিন্তু নতুন প্রাণটুকুকে জনের স্ত্রী হয়তো বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। এ যেন প্রার্থনার মতো পবিত্র কোনো কথা।

কিন্তু কেন মন জুড়িয়ে যাচ্ছে এ কথায় তা সে বুঝতে পারছে না।

চোখ তুলতে সেন্ট সাইমনও আবার চোখে পড়ল। সে তখন রেল লাইন থেকে সরে এসেও দূরের রেল লাইনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তাকে দেখে, নিনা চিন্তায় যা খুঁজছিল তার যেন একটা অবলম্বন পেল, মনে পড়ল, তার মায়ের মৃত্যুর পরে কফিনের ধারে যে প্রার্থনা করেছিল, সেই পাদরীর মুখেই পুরনোর বীজ থেকে নতুনের জন্মের কথা কিছু শুনেছিল।

ওদিকে পিয়ার গাছটার নিচের সংসারে তখন শাশা চর্বিতে কিছু ভাজছে, আর পাশে বসে মিশা চায়ের জল ফোটাচ্ছে। তার মা জনের এক জোড়া মোজা হাতে নিয়েছে সারতে। শাশার চাটু থেকে পোড়া পোড়া একটা মিষ্টি গন্ধ উঠছে ধোঁয়াব সঙ্গে। জনের স্ত্রীর হাতের কাঁটা দুটো মৃদু দ্রুত শব্দে চলছে। জন তার হ্যাভারস্যাক থেকে তামাকের কৌটো আর পাইপ বাব করল। তা করতে গিয়ে রোজনামচার বইটাও চোখে পড়ল তার। এখন কিছু লিখলে চলে—এরকম একটা আয়াসের ভাবও এল তার মনে। পাহাড়টার দিকে সে চাইল পাইপে তামাক ভরতে ভবতে। সমতল মাটির উপরে বাঁধানো পথ এরকম দেখা যায় না, পাহাড়ের গায়ের পথটাকে যেমন দেখা যাচ্ছে—যেন তার নিজের অতীত বলতে যা বোঝায় তাবই একটা অংশ। কিন্তু প্রফেসরকে নামতে দেখলো জন। লোকটা মোটা, পিঠে হ্যাভারস্যাক, একটা বোঝাও। পাশে রুথ, তার হাতে একটা লাঠি। তার পিঠেও একটা বোঝা। কষ্ট হচ্ছে, ওদের নামতে দেখেই বোঝা যায়, হয়তো ওদের খুবই কষ্ট হচ্ছে। কষ্টের শেষটাই সব কষ্টের চূড়ান্ত হয়ে থাকে। স্টেশনে পৌঁছুলেই তখন আবার সাহস ফিরে আসবে, এখন যদিও এ পথটুকু নামতে আধ ঘণ্টা লেগে যাবে হয়তো। আর, একজন প্রফেসবের পক্ষে বাত হওয়া অসম্ভব নয়, হয়তো বা আছেও তা যোশেপের। পাইপে আগুন ছোঁয়ালো জন।

স্টেশনটা খুবই ছোট—তাই বলে সে নিজের শহরের নতুন স্টেশনটার মতোও কিছু আশা করেনি—আর সম্ভবত এ সব ব্যাপারে এমন স্টেশনই উপযুক্ত, এবং এ বিষয়ে তাব পূর্বের অভিজ্ঞতা যখন নেই তখন মেনে নেয়াই ভালো।

কিন্তু কিছু লিখবার কথা সে ভাবছিল—এই চিন্তায় ফিরে এল সে। রোজনামচার খাতাটাকে বার করল। কয়েকটা পাতা উলটে একটা সাদা জায়গা সে দেখতে পেল। ঠিক সাদা নয়—উপরের দিকে লেখা আছে। ফার্মের বুড়ো অ্যাকাউন্ট্যান্ট ম্যালিঞ্জারকে বেরিয়ে আসার কয়েকদিন আগে বিদায় দিয়েছিল জন। লেখা আছে ম্যালিঞ্জার রিটায়ার করবে। সেই সভায় ম্যালিঞ্জার কেঁদে ফেলে বলেছিল—তাহলে আমি আজ থেকে ফার্মের কেউ নই আর? যদিও সে মাইনে করা কর্মচারীই শুধু। কিন্তু দেখো নিনা কেমন সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে—গলাটা সামনের দিকে বাড়ানো। ওকেই উদ্‌গ্রীব হওয়া বলে। কিন্তু পথের পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছেও যেন সে। তাহলেও এটা স্বাভাবিক—একটা জীবনের হিসাব করে করা পরিশ্রম—যা আদর্শের মতো পবিত্র ছিল—তা যদি একদিনেই নিরর্থক শূন্যতা হয়, তাহলে কষ্টের কারণ হয় না? তবু তো ম্যালিঞ্জার কর্মচারী ছিল। কিন্তু সময়েই সব হয়—এই স্টেশনটা পাওয়ার পরেও সময় ভবিষ্যতের দিকেই চলবে আরো অনেকদিন। ওপারেও বাড়িঘর আছে—কেমন কিনা?

কিং ভাজছে আজ শশা? জন মুখ তুললো—ভারি সুগন্ধ চর্বিতে ভাজা এই শাকটার।

আইজ্যাক তখন আর হামাগুড়ি দিয়ে চলছে না বরং সামনে হাত রেখে টাল সামলাতে সামলাতে সোজা হয়ে চলার চেষ্টা করছে। যোশেপের দলে লোক বেশি নেই বলেই যেন আইজ্যাক তার সঙ্গে ভিড়েছে, যদিও আসল কারণটা এই, আইজ্যাক একা চলতে পারছিল না তার স্নায়ুর দুর্বলতার

জন্য, আর যোশেপ অন্যদিনের তুলনায় ধীরে চলছিল, যেহেতু সংসারের সমস্ত বোঝা স্ট্র্যাপে বেঁধে অনভ্যস্ত পিঠে ঝুলিয়ে পাহাড়ে উঠতে সে সহজে পারছিল না। সে ভাবছিল আরথ্রাইটিস নামে যে রোগটা আছে তা সংক্রামক কি না, অথবা তা কি আকস্মিক, আর এ ভাবতে গিয়ে তার কপালে ঘাম ফুটে উঠছিল। কিন্তু পাশে রুথ যার মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে। অবশেষে যোশেপ তার গলার মধ্যে কিছু অনুভব করতে লাগল, কপাল বেয়ে গাল বেয়ে যে ঘাম কপালের মধ্যে দিয়ে ঘাড়ের উপরে নামছে, তার মতোই কিছু, যেন তা চোখের জল হতে পারে।

ঠিক এই সময়ে আইজ্যাক আলোচনাটা শুরু করেছিল · ফ্রেট কারে আলো থাকবে না, আর তা কয়লার গুঁড়োতে ময়লা হবে। বেশ খানিকটা সময় তারা এ নিয়ে আলোচনা করতে পেরেছিল— কখনো গম্ভীর হয়ে, কখনো লঘুস্বরে, খুঁটিনাটি বিষয়গুলোকে মূল্য দিয়ে দিয়ে। অবশেষে তারা দুজনে একমত হয়েছিল ফ্রেট কার তার কয়লার গুঁড়ো এবং গুমোট অন্ধকার নিয়ে যুদ্ধের সময়ে যে সব ট্রেঞ্চে তারা কাটাতো শহরে বাস করেও, তার চাইতে খারাপ হবে না। এ আলোচনাটা পথ চলার ব্যাপারে তাদের অনেকটা সাহায্যও করল।

অবশেষে যখন রেলের লাইনটা চোখে পড়ল তখন তারা হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এইটাই তো প্রত্যাশার বিষয়, অথচ যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। বেলজোড়া তখনো এক কিলোমিটার দূরে এবং তখনো তাদের সম্মুখে এক কিলোমিটার হাঁটুর জোড়া খুলে দেয়া উতরাই। আইজ্যাকের হঠাৎ মনে হল, পিছনে যারা আসছে তারা কত পিছনে তা যেন দেখা দরকার। একটা অধীরতাই সে সম্ভবত বোধ করল, ট্রেনটা খুব দেরি না করতেও পারে। যোশেপ, অবশ্য, রুথের দিকেই তাকাল। তার বিবর্ণ মুখে যেন একটা চিন্তার ছায়া নড়ছে। যোশেপ অনুভব করল সে রুথকে বলতে পারবে—আমরা তাহলে পৌঁছে গেলাম দেখো।

এখানে আমরা রুথের কথাও বলতে পারি, কারণ অদ্ভুত রকমে এক বিস্মৃতি তার মনে কাজ করছিল। তার মন অনুভব করতে পারছিল না, যে প্রশ্নটা তার মনে একটা আকুঞ্চিত বেদনার সহযাত্রী হিসাবে দেখা দিয়েছে তা বিশ বছরেরও অতী   এক বিকেলের স্মৃতি। গভীর রাত্রির ব্যাপার যদি হয়, তবে তা হবে একটা পরিপূর্ণতার প্রতীক, দিন যেহেতু রাত্রিতে পরিপূর্ণতা লাভ করে , আর যদি খুব সকালের দিকে ঘটে, তবে সেটা হবে আগন্তুক আশার ইশারা। এর পরে তার মনে পড়ল—এসব কথাই সে লজ্জায়, আশায়, আনন্দে বেদনায় ক্লিনিকের সেই পোর্সিলেনের দেয়াল দেয়া ঘরে নার্সের সঙ্গে আলাপ করেছিল যেদিন তার ছেলে হয়েছিল।

মাথাটা নেড়ে সে যেন অস্বীকার করল, না না, একথা সে ভাবতে চায়নি, ভাবেনি। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল সে, চোরা চোখে যোশেপকে দেখল, যাচাই করতে চাইল তার কাছে তার চিন্তা ধরা পড়েছে কিনা। এ ব্যাপারটাকেই বিস্মৃতি বলা যেতে পারে এ জন্য, যে রুথ গোড়ায় ভাবছিল ফ্রেট কারটা গভীর রাত্রিতে ছাড়বে কিংবা খুব সকালে।

চিন্তায় ফ্রেট কারটাকে ফিরে পেয়ে সেটাকেই তার মন আঁকড়ে ধরল। কিন্তু চোখের জল তার গালের উপর ঘামের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল। সন্তানহারা কোনো মা—সেই যেন সব আশার প্রতীক—এরকমের একটা বক্তব্যকে, যা প্রার্থনার মতো পরিপূর্ণ এবং বহু পরীক্ষিত, তার মন স্মৃতিতে খুঁজতে লাগল। যেন অন্ধকার হয়ে আসা কোনো ক্রুসের নিচে কোনো মা, সে মা-ও কি আশা করছে না কোনো এক সরাইয়ে পৌঁছে ছেলেকে ফিরে পাবে, কিংবা সেই সরাই-ই তার ছেলে।

নিনা আজ রান্না করতে পারলো না উৎকণ্ঠায়। এমন উৎকণ্ঠা তার একারই নয়। সন্ধ্যার পরে রাত্রি আসছে। প্ল্যাটফর্মের উপরে ততক্ষণে সব উদ্বাস্তুই এসে পৌঁছেছে। অল্প আলোকিত আকাশের নিচে তারা বিশ্রাম নিতে বসেছে। ক্লান্তিতে কেউ নিজের হাঁটুর উপরে মাথা রেখেছে, কেউ পুঁটুলির উপর শরীর ছেড়ে দিয়েছে, যেন মরুভূমির প্রান্তে বিশ্রামরত ক্লান্তিতে অঋজু একদল শান্ত মেষ।

কখন গাড়িটা এসে যাবে তার ঠিকানা নেই। কেউ শোয়ার কথা ভাবতে পারেনি।

নিনা একটা চাদর বিছিয়ে বসেছিল তার উপরে। দৃষ্টি কখনো কিছুক্ষণ আগে যেখানে রেল-লাইনজোড়া দেখা যাচ্ছিল, কখনো যেদিক থেকে গাড়িটা আসতে পারে, সেদিকে ঘুমের পর্দা সরিয়ে সরিয়ে চলেছে। তখন কথাটা আবার তার মনে এল ফিরে। সব ব্যবসায়ের মতো তার দোকানদারিতেও প্রতিযোগিতা আছে এবং প্রতিযোগিতা থাকলে যা হয়, সব দোকানেরই বিশেষ আকর্ষণ আছে নতুবা সব ক্রেতাই এক দোকানে যেতো। তা যায় না। নিনার কাছে ছাত্ররা আসতো, পাশের বিক্রেতা তাকে একদিন রসিকতা করে বলেছিল—নিনারা ছেলেরা; আর পলিটেকনিকের সেই ছাত্রটা একদিন যা বলেছিল নিনাকে, বেশ মায়ের মতো দেখায়। এটাই হয়তো আকর্ষণ, এই মায়েদের মতো গাম্ভীর্য তার দোকানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। কথাটা নিশ্চয়ই লজ্জার, কিন্তু ছাত্রদের আদর তার ভালোলাগত না এমন নয়, এবং শেষের দিকে ছাত্রদেরই ভিড় হতো। কিন্তু সে এই চিন্তায় পৌঁছেছে মিশার কথা চিন্তা করতে গিয়ে, মিশা মা হবে—এই চিন্তা থেকে শুরু করেছিল সে। সকলেই কি তা পারে—এই নতুন হয়ে ওঠা? একেবারে যেন প্রথমে যৌবনে ফিরে যাওয়ার অব্যক্ত উচ্ছ্বাসের মতো। নিনা এই ভাবল, কিন্তু প্রশ্নটার উত্তরের দিক দিয়ে সে নিরপেক্ষ নয়, বরং খুব ছোট একটা সলজ্জ হ্যাঁ শুনতেই যেন তার পক্ষপাতিত্ব। অ্যাভলনের ডাক্তাররাই, কিংবা নির্বিশেষে ডাক্তারী বিদ্যাই যদিও এ বিষয়ে শেষ কথা বলার পক্ষে উপযুক্ত, তা সত্ত্বেও এখন এরকম বলা যায়—নিনার সেই অনেক ছাত্ররা নয়, নিনার একমাত্র ছেলে পরে যে এক সময়ে ছাত্র হবে, আর মায়ের মতো গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ এই শরীরটা যার প্রাণের অপব্যয়ের হেতু না হয়ে, প্রাণ হবে, স্নেহ হবে। রেল-লাইনজোড়াও অনেক দিনের অপব্যবহারে মলিন কিন্তু তার সম্বন্ধে সেটাই শেষ কথা নয়। মিশা নতুন হয়ে উঠবে, যদিও সে পুরনো বীজই বহন করছে। স্বপ্নের মতো একটা অব্যক্ত আবেগের পরিমণ্ডল—পরম সার্থকতার প্রতীকের মতো একটা উষ্ণ শূন্য আলিঙ্গনে নিনা মগ্ন হয়ে রইলো। নিনার মনের বিস্মৃতির অন্ধকার গহ্বর থেকে, একটা অপরিচিত আশার মতো, যেন বাক্যটা মুক্তি পাবে। আমিই রেসারেকসন। এই কথাটাকেই নিনা মনে আনবার চেষ্টা করতে লাগল ; তা না পেরে এই অনেকগুলো কথায় সে ভাবল।

কিন্তু ভোর হওয়ার আগেই কেউ কথাটা বলে থাকবে, হয়তো নিঃসংশয়ে নয়, হয়তো অস্ফুট স্বরে, হয়তো ক্লান্ত কোনো শ্রমিক যারা উচ্চাশা কোনোদিন নিরঙ্কুশ উচ্চতায় পৌঁছুতে অভ্যস্ত নয়, কিন্তু বলেছে কেউ।

ঠিক যখন প্রফেসরের চিন্তাটা পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, সে স্থির করেছে প্রায়—হয়তো আর একখানা বইয়ে এই অভিজ্ঞতার আলোকে সত্যের কাছাকাছি কিছু বলতে পারবে সে, এখনো হয়তো তার জন্যে কিছু সময় অবশিষ্ট আছে, তখনই যেন কথাটা সোচ্চার হয়ে উঠল, কোথায় ফ্রেট কার? একে কি রেল লাইন বলে? দিনের আলোয় প্রকাশ পেল, যেন কাল দিনের আলো ছিল না, কিংবা শ্রমিকরা যখন তাদের ক্লান্ত দেহ টানতে টানতে এখানে এসে পৌঁছেছিল তখন দিনের আলো অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, এখন দিনের আলোয় তারা বুঝতে পেরেছে যাকে পাহাড়ের গায়ে কয়লার খাদ মনে করছিল তারা, সেটা ডিনামাইটের গর্ত। হয়তো কোনো কালে পাহাড় ফাটিয়ে পাথর নেয়া হতো, হয়তো বিশবছর আগে, হয়তো তখন ফ্রেট কার আসতো। দেখছো না মরচে ধরা লোহার রেল দুটোর নিচে প্লেট নেই।

মিশা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ; আর দিনের উত্তাপ যত বেড়ে উঠতে লাগল, উদ্বাস্তুর দল হাঁপাতে লাগল তৃষ্ণায়, ক্লান্তিতে, যেন কাল এমন তাপ ছিল না দিনের। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে তারা, তা থেকে যেন অব্যক্ত একটা সাবধানী বাক্য উচ্চারিত হচ্ছে,—ভ্যান ব্রনের মতো করো না, কেউ যেন ভ্যান ব্রনের মতো করো না।

এটা কি মরুভূমি? রেল লাইনের ওপারেব নেড়া পাহাড়ে ওগুলি কি ক্যাকটাস সত্যি সত্যি?

সাত দিন হয়ে গিয়েছে প্রাচীন ক্ষীয়মান একটা গ্রস্ত উপত্যকায় বাঁক ঘুরেছে উদ্বাস্তুর দল। কোনো একসময়ে সবুজ ছিল এই পাহাড়ের গা—এখন ধূসর, ধূমল। কোথাও মনে হয় আগ্নেয়শিলার চাঙড়গুলো ভেঙে পড়বে নিশ্বাস পড়লে, কোথাও মনে হয় পায়ের তলায় গোল ক্ষয়িত শিলাগুলো পিছলে যাবে, আর সবটা মিলে পাথরের গুঁড়োর আঁধিতে তাবা পথ হারিয়ে ফেলবে। নিশ্বাসে-নিশ্বাসে ছাইয়েব গুঁড়োব মতো পাথরের গুঁড়ো আসছে নাকে মুখে জমা হচ্ছে।

এখনো ফেবেন্স হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে চলছে। অনেকটা ঢালু উঠতে হচ্ছে। এতক্ষণ হাতের লোহা বাঁধানো লাঠিটা সে পাথরে ঠুকছিল, তারপর হঠাৎ মনে হয়েছে বৃথা শক্তিক্ষয় হচ্ছে। ফেবেন্স থুথু ফেলল। থুথুটাও আঠার মতো, মুখ থেকে সহজে সরতে চায় না। যে বকম মনে হচ্ছে, ঝরনা বা নদীর দেখা না পেলে কাল সারা দিন জলের খোঁজেই কাটাতে হবে। হাত দুটো মুঠো হয়ে উঠল ফেবেন্সের। একটা হতাশ নিরুপায় ক্রোধ চাপা পড়ে পড়ে অবশেষে স্থায়ী খিটখিটে মেজাজে পরিণত হবে বলে মনে হয়েছিল। এখন সে সামনের দিকেই যেতে চায়। ফেরেন্সের মুখটা কালো, আরো কালো দেখাচ্ছে ময়লার জন্যে, শুধু তার চকচকে ধারালো চোখ দেখে, যা মাঝে মাঝে নিষ্প্রভতাকে কাটিয়ে উঠেছে, আর তার চিবুকেব কাঁচা পাকা গোটি দেখলে মনে হয়, সে হয়তো নিছক শ্রমিক নয়।

কিন্তু এই পাহাড়ের চূড়াটা এখানে থাকবে পথের উপরে, দিন যখন ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত, তা এতক্ষণ বোঝা যায়নি, ফেবেন্স ঝোলাটা পিঠের উপবে ঠিক করে নিয়ে হাত আব পায়ের সাহায্যে উঠতে লাগল। প্রথম দুমিনিটেই তাব হাতের তালুটা একটা ধাবালো পাথরে কেটে গেল, ছাই ঢুকে জ্বালা করতে লাগল।

নিনাও আবাব চলেছে। পা টিপে টিপে চলার মতো ভঙ্গি তাব। তার একমাত্র তুলনা হতে পারে ধর্ষিতা একটি নারীর সঙ্গে, তেমনি সর্বস্বলুণ্ঠিতা, তেমনি ভবিষ্যৎ মুছে যাওয়া; তার চোখে মুখে ধুলোব আস্তরণ, তাব পোশাক ছিন্নভিন্ন। যদিও তার সম্বন্ধে, মনে হতে পারে, এ কথাটা বলার খুব বেশি মূল্য নেই।

দুদিনেব পথে ছড়িয়ে পড়ে উদ্বাস্তুরা আবার চলেছে, যেন শামুকের মতো ধৈর্য তাদের। যোশেপ বা আইজ্যাক অথবা সপরিবারে জন কোথায়, আগে না পিছনে তা সে জানে না। সকাল থেকেই তাব সামনে একজন চলেছে, তাকে দেখে যদিও সে বুঝতে পারছে না সেও উদ্বাস্তু কি না, তাকেই সে অনুসরণ করে চলেছে, কাবণ কাউকে অনুসরণ না করলে যেন সে আর চলতেও পারবে না।

এখন আর ভেবে লাভ কী? (এই কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবতে চেষ্টা করছে নিনা) —দলের চেহারাটাও বদলে গিয়েছে—এ যেন অন্য কোনো দল। কিন্তু তা তো নয়, পুরনো সেই দলটাই এমন হয়েছে। অবশ্য তার একটা বাস্তবসম্মত কারণও প্রত্যক্ষ—যোশেপ, জন, আইজ্যাক নেই, তাদের বদলে, গ্যাংম্যান সিমার, ট্রাক্টর ড্রাইভার ফ্লিন্ট আর ফেরেন্স আছে।

কিন্তু প্রত্যক্ষর আড়ালেই যেন এই পরিবর্তনের কারণটা লুকিয়ে আছে, এরকম অনুভব করছে নিনা আর সেই কারণটার এমন অপ্রাকৃত প্রভাব থাকা সম্ভব, এটা মেনে নিতে গিয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছে। তখন সেই রেল লাইনের ধারে নিনা গিয়েছিল প্রফেসর যোশেপের কাছে--প্রফেসরের মতো কে আর এত জানতে পারে--যেন প্রবঞ্চনাটাকে তখনো সে যাচাই করে নিতে চায়, যদিও প্রবঞ্চনার দিনটা গড়িয়ে গড়িয়ে তখন তৃষ্ণার্ত একটা জ্বালাময় সন্ধ্যায় পৌঁছে গিয়েছে, তখনো তবু যেন যাচাই করার মতো কিছু অবশিষ্ট আছে। কিন্তু প্রফেসরের স্ত্রী রুথ তখন যেন বার বার তার গায়ে জ্বলন্ত কোনো অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছিল। তার কথাটার পিছনে হয়তো বিশ্বাসের জোর

ছিল, হোক তা ভুল বিশ্বাস, আর কিছুক্ষণ নিনাও যেন সেই বিশ্বাসকে আশ্রয় করেছিল, কিংবা সেই বিশ্বাসই তাকে মুহ্যমান করেছিল, আসল কথা একটা অনুভূতির অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে সে ভেবেছিলা, তার অপবিত্রতাই এ প্রবঞ্চনার কারণ। কথাটা অ্যাসিড নয়, বোধহয় বিষ, আব তখন মানুষগুলি যেন বঞ্চনার জ্বালায় সরীসৃপের মতো ছুবলে দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। নিনার ক্ষেত্রে বলা যায় সে নিজেকেই শতবার দংশন করেছিল, আর সেই রাত্রিতেই সে নিজের হাতে নিজেব পুতুল ভাঙার মতো প্রমাণ করেছে সেন্ট সাইমন তার অন্য অনেক ক্রেতার মতোই একজন সাধারণ মানুষ, যে উদ্বাস্তুও বটে। সে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সেন্ট সাইমনের কাছে প্রার্থনা করার মতো অনুতপ্ত মন নিয়ে গিয়েছিল কি না—এখন এ প্রশ্ন অবান্তর। অথচ এই ঘটনাই যেন স্বপ্নে পাশ ফেরার মতো কোনো ব্যাপার, যার ফলে দলটাই বদলে গিয়েছে বলে অনুভব করছে নিনা।

চলতে তার কষ্ট হচ্ছে, এই পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে উঠতে, যদিও তার হতাশার মধ্যে একটা যান্ত্রিক একগুঁয়েমি আছে এখনো। পাহাড়ের গা ধরে ধরে সে আরো কিছুদূব এগিয়ে গেল, কিন্তু সামনে না চেয়ে পিছনে চাইল সে। ফেরেন্সকে সে দেখতে পাচ্ছে, তা সত্ত্বেও সে একটা পাথবের উপরে বসে পড়ল।

বেলেব গ্যাংম্যান সিমারই হয়তো সেই লোক যে প্রথমে কথাটা বলেছিল—প্রবঞ্চনাব কথা, অন্তত তার পক্ষেই তা স্বাভাবিক, কারণ পরিত্যক্ত রেলজোড়ার অবস্থা দেখে সে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল, তার উপর দিয়ে ভবিষ্যতের সব আশার প্রতীক সেই ফ্রেট কারটার আসা সম্ভব কি না। কিন্তু অসীম ধৈর্যের মতো কিছু—যাকে সে অনুভব করছে অন্ধকার রাত্রির কানায় কানায় ভরা কালো জলের মতো, সে নিজের বুকের মধ্যে ধরে রাখবার চেষ্টা করছে। সে ইতিমধ্যে স্থির কবেছে ফেরেন্সের সঙ্গে এখন কয়েকটি দিন দেখা যাতে না হয় তেমন ভাবেই সে চলবে। ততদিনে তার চিন্তাটা শীতল হওয়ার সুযোগ পাবে। জারোর পাশে পাশে কাল সে হেঁটেছিল আর তখন জারো বলেছিল বোশাম্পের কথা। জারোর কাঁধে যেখানে মেশিন গানের গুলিটা ছুঁয়েছিল সেখানে মাংসে পচন ধরেছে বলে সন্দেহ হয় গন্ধ থেকে। জারো হয়তো তা জানে না। আব জারো আরো কিছু জানে না। ফেবেন্স এব আগে সিমারকে বোশাম্পের কথা বলেছে—তা এই যে বোশাম্প স্কুলের ফরাসী ভাষার মাস্টার আর ফেরেন্স কাস্টমস-এর কেরানী হলেও তাবা দুজনে এক সঙ্গেই একই কোম্পানিতে থেকে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল, এবং একদিন এমন হয়েছিল কোম্পানির মৃতাবশেষ তিন জনের মধ্যে তারা দুজন ছিল, আর সেদিনই সেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম বোশাম্পের জামার নিচে ব্যাজটাকে দেখতে পায় ফেরেন্স। জারো যা বলেছে তা সুতরাং ফেরেন্সকে বলা যায না অন্তত এখন বলবার মতো স্থিবতা নেই সিমারের, হয়তো তার মুখটাও কালো হয়ে উঠেছে, আর নিজের মুখের মধ্যে যে লোনা আর তরল কিছুর স্বাদ পাচ্ছে যাকে রক্ত বলে মনে হয় হয়তো, তা তার মনের উপরে জারোর গল্পেরই ফল ; যেহেতু জারো বলেছে রেলস্টেশনের ছোটো কফি হাউসেই বোশাম্পকে তার নিজের রক্তে স্নান করানো হয়েছিল, রসুইকরই শুরু করেছিল ব্যাপারটা আগুন খোঁচানো লোহা দিয়ে। অথচ সে লিসার কথাই ভাবতে গিয়েছিল।

সিমার লিসার কথা ভাববে তা আশ্চর্য নয়। ইউনিয়ানের হলে গিয়েছিল তারা যাত্রার আগে শেষবারের মতো সমবেত হওয়ার জন্যে, কিন্তু ব্যারাকের কাছে ফিরে সিমার এবং তাদের মতো অনেকে দেখতে পেয়েছিল, ব্যারাকের দরজাগুলোয় তালা ঝুলছে, আর সেই বন্ধ দবজাগুলোর সামনে স্টেনগান হাতে পাহারার সারি। উদ্দেশ্য খুব সহজে বোঝা গেল। যাতে ব্যারাকের ঘর থেকে শ্রমিকদের স্ত্রীরা, ছেলেমেয়েরা বাইরে আসতে না পারে। ব্যারাকের একটা তালাবন্ধ ঘরে সিমারের স্ত্রী লিসা থেকে গিয়েছে। সিমারকে দেখতে পেয়ে জানলার গরাদে মাথা ঠুকে কাঁদছিল সে তখন।

সিমারের মুখটা কঠিন হয়ে উঠল, সে দেখতে চেষ্টা করল ফেরেন্সকে দেখা যায় কিনা, কিন্তু

সে আগ্নেয়শিলার কালো একটা স্তূপকেই দেখতে পেল, আর তখন উঠবার পরিশ্রমেই যেন সে হাঁপাতে লাগল কারণ পথটা চড়াই।

নিনা উঠে দাঁড়িয়েছিল, কয়েক পা চলেওছিল, কিন্তু আবার পড়ে গিয়েছে। হাত দিয়ে সামলেছে বলে চোট লাগেনি, কিন্তু ভস্ম কিছু গিলে ফেলেছে। অবাক হয়ে সে ভাবল এত অন্যমনস্ক সে হয়েছিল কি করে? যেন তার মন একটা গভীর গহ্বর যা থেকে সরে যেতে গিয়ে সে পড়ে গেল। কিছু একটা ভাবতে গিয়েই এমন একটা ধাঁধা তৈরি হয়েছে মনে। তারপর সে অনুভব করল, একটা অযৌক্তিক অসম্ভব কিছু করে বসেছে সে—প্রায় আধঘণ্টা ধরে কারো কাছ থেকে পালানোর জন্যে সে এই পিছল পথে ছুটছিল অন্য যাত্রীদের বিশ্রামের সময়ে, আর যার কাছে থেকে পালানোর এই চেষ্টা সে যেন মৃত কেউ।

কিন্তু আসলে ভস্ম নয়, নিনা চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখল যেন সে-ই এই প্রথম দেখছে ব্যাপারটা, যতই সে ধরে নিয়ে থাক সাময়িকভাবে লাভার ভস্মে ঢাকা উপত্যকায় সে ছুটেছে, ধুলোর মতোই হালকা তুষাব যা কাল থেকে পড়ছে। আব আসলে দলের সকলের আগে এই এখানে সে ছুটে এসেছে, নিজের কাছে থেকে পালানোর জন্যেই, যেন নিজেকেই খুব ভয় পেয়েছে সে, কিন্তু একটা প্রশ্ন তাহলে থেকে যায়, ভয়ই বা পেল কে? হাত দুখানা যেন মচকে গিয়েছে এরকম ব্যথা কবছে, ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে সে হাত দুটোকে সহজ করাব চেষ্টা করল। তাহলে এই দাঁড়ায়, ভাবল নিনা, তার জীবনের সবগুলি বাত্রি মিলে একটা মৃত্যু, কিংবা সেই মৃত্যুগুলির প্রতীক তার দেহ। জীবনের আধাবে মৃত্যু। এরকম কোনো কথা হয় নাকি? আর তার কাছে থেকে পালাচ্ছিল সে?

ফ্লিন্ট কাল পর্যন্ত ভেবেছিল ববফপাড়ার মতো উঁচু পাহাড়ে উঠে পড়েছে তারা, কিন্তু আজ সকাল থেকে হিসেব করে নিজেই সে বুঝতে পেবেছে পবে, উঁচু বটে, অনেক উঁচুতেই তারা, বিশেষ কবে এই শেষ তিন দিনে, কিন্তু তুষারপাতের কারণ প্রথম শীতেব অবতরণ। শীত এসে পড়েছে তাহলে।

হ্যাঁ, এখন থেকে এসবই দেখবে সে, ঋতুব পরিবর্তন, পাহাড়ের বাঁক, আকাশেব চেহারা। এসব মিলে এমন একটা কিছু হতে পারে, যা একটা গোলকের মতো, যার মধ্যে বাস কবা যায়। এ ব্যাপারে তার মস্তিষ্কও সায় দিচ্ছে। মস্তিষ্কের যেন লেবুর মতো একটা ত্বক আছে, সেই ত্বক্‌টাই যেন এখন স্পর্শ পাচ্ছে; ভিতরের কোমল অংশটুকু যা সার, যার অনুভূতি আছে তা যেন শুকিয়ে গিয়েছে—স্মৃতি এবং যুক্তি সমেত। অর্থাৎ একেবারে নিকট এবং বর্তমান যা স্থান ও কালের দিক দিয়ে, তার বাইবে সে যাবে না। কাল একটা নিউটকে দেখে একটা বিকেল সে কাটাতে পেরেছে। আজ এই তুষার নিয়ে কাটাতে পারে সময়।

ফেরেন্স এই তিনদিন ধরে সিমারকে বোশাম্পের কথা বোঝানোর চেষ্টা করছে, সিমারের কাছে বোশাম্পের পরিণতির কথা শুনবার পর থেকেই ; কিন্তু কাল যখন রাত্রির বিশ্রামের জন্য তারা বসেছে পথেব ধারে, তখন কিন্তু ধোঁয়ার মতো অস্পষ্টতার মতো কিছু একটা তার চিন্তাকে ঢেকে দিচ্ছিল, আর তারই ফলে বোশাম্প সম্বন্ধে সে এতদিন যা বলেছে এবং ভেবেছে তা সবই যেন নতুন করে ভেবে দেখা দরকার হয়ে পড়েছে। তুলনাটা এই হতে পারে বোশাম্প অনেক আশা নিয়ে চলেছিল, অন্য অনেকেই তাকেই অনুসরণও করেছিল, কিন্তু অস্পষ্ট অন্ধকারের রাত্রিতে শহরের এমন একটা অংশে পৌঁছেছিল, যেখানে পথ তার অপরিচিত আর গলির সংখ্যাও অগণ্য। দু-তিনবার সে বলেছিল—এই পথ, এই পথ, আর প্রতিবারেই সেই একই চেহারার প্রায় নিবে যাওয়া ল্যাম্পপোস্টটার নিচে এসে পৌঁছেছিল সে, এবং তখন লজ্জায়, হতাশায়, আর একবার ব্যর্থ চেষ্টা করার তাগিদে সে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল, তখন সম্ভবত পোকারের আঘাতগুলোও সে

বুঝতে পারছিল না। তখন রাজপথে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, হতাশ মানুষরা বেরিয়ে পড়েছে, তাদের মুখ কঠোর একটা হিংস্রতায় কালো, কারণ তারা অনুভব করেছিল কেউ তাদের ঠকিয়েছে, যে পথ নিজের জানা ছিল না সে পথেই তাদের টেনে এনেছে।

ফেরেন্স আরো কয়েক ধাপ হাত ও পায়ের সাহায্যে উঠে মুখ তুলে দাঁড়াল, যেন কিছু একটা তখনই ভেবে নেয়া দরকার হয়ে পড়েছে, যদিও এই তুষারে পিছল ঢালু পাহাড়ের গায়ে পথ ছাড়া আর কিছু চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত নয়। এমন কি হতে পারে, বোশাম্প ঠিক মূল কথাটাকে জানত না? আর এই প্রশ্নটাই যেন সেই বিষয় যাকে ভালো করে লক্ষ্য করবার জন্যে সে চোখ তুলে চেয়েছে। হয়তো জানতো না, যার ফলে অনেক যুক্তি যা মূল পথটার দিকে এগিয়েছে বলে মনে হয়েছিল, তার কাছে প্রকৃতপক্ষে সেগুলো অন্ধ-গলি। যে জানতো সে সম্ভবত বোশাম্পকে অথবা বোশাম্পের মতো অনেককে চলতে নির্দেশ দিয়ে দূরে দূরে থেকেছে, কিংবা নিজের ভুল বুঝতে পেরে আত্মগোপন করেছে। এই চলার পথ যেমন একটা প্রবঞ্চনায় শেষ হতে পারে, তেমন কিছু হয়েছে তাদের যারা অনুসরণ করেছিল। অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে, এই উপত্যকার অনেক কষ্টের পথ চলার মতো বোশাম্পের ধৈর্য ছিল। যন্ত্রের মতো ভঙ্গিতে চড়াইটাকে বাগে আনবার চেষ্টা করতে লাগল তখন ফেরেন্স, যন্ত্রের মতোই আশা আর হতাশার অতীত হয়ে রইল তার হঠাৎ উদাস হওয়া মন।

সাতদিন ধরে বরফ পড়ার পর আজ আকাশটা পরিষ্কার হয়েছে আবার, অবশ্য সাতদিনে আব তিনদিনে কী তফাত এখন? কাঁধের ঘা-টার পক্ষে এই তুষারটাকে বরং ভালো মনে হচ্ছে জাবোব কাছে। সেজন্যেই সে কাল অনেক তুষার দিয়েছে কাঁধে, থাবা থাবা তুষার তুলে তুলে। কিন্তু জারো নিজেকে শোনালো কথাটা, এখন সে পথের উপরে, কাজেই প্রশ্নটা যা দাঁড়াচ্ছে তা এই পথ নিয়েই বলা যেতে পারে : অ্যাভলনের সরাই ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না। আর এটা যেমন খাঁটি কথা তেমনি আর একটি ব্যাপারকেও মানতে হবে : এই অপরিচিত পথে পথ চেনে এমন কেউ হয়তো আছে, নতুবা অ্যাভলনের সরাই থেকে আগে তারা যেমন দূরে ছিল তেমনি আছে। কিন্তু এখন আর বসে থাকাও চলে না, কারণ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে আর সকলে, এমনকি সেই কৃষকটিও যাকে দু-একজন এখন সেন্ট সাইমন বলে ডাকে। কৃষক কিংবা মেষপালক, তা ছাড়া আব কি হতে পারে? স্মক আব তোবড়ানো ক্যানভাসের টুপি দেখে তাকে অন্য কোনো দলে ফেলা যায় না, যদিও তার এই ঝুলঝুলে আলখাল্লার মতো স্মকটায় রঙের মিস্ত্রীর মতো এখানে ওখানে রঙ লেগে আছে বলে মনে হয়। এ থেকেই ভাবতে অবাক লাগে তার সেই দূরগ্রামে, যেখানে কোনো কৃষকের মজুব ছিল সে হয়তো, কিংবা সেই পাহাড়ের উপত্যকায়, যেখানে হয়তো সে মেষপাল চরাতো, সেখানেও রাজধানীর এই ওলোটপালটের সংবাদ গিয়েছিল। অবশ্য তার মুখোশ দেখে তার মনের কথা জানবার উপায় নেই, যেমন সব মুখোশের বেলাতেই হয়ে থাকে, এমনকি এমন দু-একজনও আছে মুখোশ ছাড়াও যাদেব চেনা যায় না, যেমন নিকোলা। জারো এই সময়ে এদিক ওদিকে তাকাল যেন কেউ তাকে দেখে ফেলেছে। আসলে ব্যাপারটা এই, নিকোলার কথাটাকে মনে না আনার জন্যেই সে নিজের কাঁধের ব্যথা দিয়ে এবং অ্যাভলনের আশা দিয়ে মনকে ভরে তুলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে এখন অনুভব করল নিকোলার দামী স্যুট, সোনার চশমা, আর মসৃণ আলাপ থেকে তাকে ভুল চেনা হয়েছিল, যেন তা একটা মুখোশের আড়ালে বলেই—এ কথাটা প্রকৃতপক্ষে সেন্ট সাইমনকে দেখেই তার মনে হয়েছে আজ সকাল থেকে।

কিন্তু এখন আর থামলে চলবে না, কারণ সকাল থেকেই শোনা যাচ্ছে আর শদুয়েক ফুট উপরেই পাহাড়ের মাথা, তার ওপারে পথ নিচের দিকে নেমেছে উপত্যকায়, এবং হয়তো তা এমন কিছু যা আশার অতীত, অন্তত ওদিকে সম্ভবত তুষারের এই দুঃসহতা নেই।

নিনা এখন চোখে খুব কমই দেখতে পাচ্ছে, চোখের উপরে হাত রেখে তুষারের উপর ঠিকরে আসা আলো থেকে চলবার চেষ্টা করেছে সে দুদিন থেকে। উদ্বাস্তুদের পায়ে পায়ে নরম তুষারের উপরে যেন লাঙলের চাষ পড়েছে, তুষার সরে গিয়ে কাদা বেরিয়ে পড়েছে—পিছল কাদা যা তুষার আর লাভার গুঁড়োয় তৈরি। কাল, তখন সন্ধ্যা হবে, হঠাৎ জোরে জোরে আলাপ করা কয়েকটা কথা সে শুনতে পেয়েছে, যদিও এমন হতে পারে তা তার মনের মধ্যেই কেউ বলে থাকবে ; এ সব কথা কে বলে তা অনেক সময়েই ধরাও যায় না অবশ্য; কিন্তু কথাটা এই, পাহাড়ের চূড়া থেকে দেখা গিয়েছে একটা সবুজ অধিত্যকা, সবুজ অধিত্যকায় আইভির লতা সমেত—আইভি ছাড়া আর কী, যদি তা আঙুরের না হয়—বাড়ি ঘর, হলুদ দেয়াল, লাল ছাদ, আর তাদের একপাশে সাদা গম্বুজের চার্চ। যেখানে তারা দাঁড়িয়েছিল তা থেকে কিছু নিচে, হয়তো পৌঁছুতে একদিন লাগবে তা হলেও অ্যাভলনের সরাই। এবার আর প্রবঞ্চনা নয়, যদিও এ সংবাদ আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি সংবাদ এসেছে, এবং তা আইজ্যাক সম্বন্ধেই; সে নাকি পথ হারিয়ে নয়, বরং তা ছাড়িয়ে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে কোথাও নেমে গিয়েছে, কবে তা কেউ জানে না। কতকটা প্রত্যাশিত, কারণ অনেক পিছনে থেকেও সে আর চলতে পারছিল না, তাহলেও হঠাৎ যেন দেখা যাচ্ছে সে নেই। কালো ফোলা ফোলা ঠোঁট দুখানা বাঁকা করে করে সে নিঃশ্বাস নিল থেমে থেমে আর তখনই স্মরণ করল, পড়ে গেলে চলবে না, এর আগে কোথাও সে শুনেছে এরকম অবস্থায় পড়ে গেলে কেউ ওঠে না। এখন কাছাকাছি কেউ নেই। চার পাঁচ দিন আগে সেন্ট সাইমনের সঙ্গে তার একটা বাঁক ঘুরতে মুখোমুখি দেখা হয়েছিল। নিনার মনে এমন একটা ভাব এসেছিল যা বহু অভিজ্ঞ একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রায় অস্বাভাবিক, একটা থমকে দাঁড়ানোর ভঙ্গি যা কতকটা লজ্জার মতো। কিন্তু সেন্ট সাইমন যখন চ'লে যাচ্ছে, নিনা স্পষ্ট করে তার নাম উচ্চারণ করে ডেকেছিল। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার—শরীর দুটোর পরিচয়ও এক রকমের কমরেডারি তৈরি করতে পারে যেন, নতুবা সেন্ট সাইমন তার পুরনো শক্ত রুটিটা ছিঁড়ে খানিকটা নিনার দিকে এগিয়ে ধরবে কেন? এখন আবার কাদা কাদা তুষারের দিকে চোখ পড়ল নিনার। যাত্রীদের পায়ে পায়ে পিছল ভস্ম-শিলার গুঁড়োয় কালো যে তুষার। কিছু পেলে সে অবশ্য খেতে পারত, আর এ পথে আসবার পরে সেন্ট সাইমনের সঙ্গেই সে রুটি ভাগ করে খেয়েছে। নিনার ফুলে-যাওয়া কালো ঠোঁট দুটো কিছু খাওয়ার ভঙ্গিতে নড়তে লাগল মৃদু মৃদু। তারপর আবার থেমে থেমে নিশ্বাস নিল সে। কিছু একটার কারণ দেখাল সে—কারণ, কথাটা শেষ পর্যন্ত তার মনের ছবি না হয়ে কারো কাছে হয়তো সে শুনেছে। এবার আর প্রবঞ্চনা নয়।

জারোর কথায় আবার ফিরতে পারি আমরা, যেহেতু জারো বেশ স্বচ্ছ করে চিন্তা করার চেষ্টা করছে। জারো বসেছিল, উঠে দাঁড়াল একটু সামনের দিকে ঝুঁকে, যদিও এভাবে হাঁটতে কষ্ট হয় কাঁধে, এ ছাড়া অন্য কোনো ভাবে সে চলতেও পারছে না। শেষ দিকে নিকোলাও এমন করে ঝুঁকে চলতো।

পার্লামেন্টের সেই সময়ে কিন্তু সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর সভ্যদের মাথার উপর দিয়ে তার তর্জনী দেখা যাচ্ছিল যার সাহায্যে স্পীকারকে সে অভিযুক্ত করেছিল তার শেষ বক্তৃতায়। কিন্তু মেজরিটির টেবলের মাইকগুলো থেকে বিশ্বাসঘাতক, সমাজদ্রোহী ইত্যাদি শব্দের ঝড়ের মধ্যে তার গলা শোনা যাচ্ছিল না, তার উপরে তার টেবলের মাইকটার তার কেউ ছিঁড়ে দিয়েছিল। নিকোলার গাল বেয়ে ঘাম আর চোখের জল ঝরে পড়েছিল। পার্লামেন্টের স্টেনো লিখে রেখেছিল—তার বক্তৃতা কিছু শোনা যায়নি। খুব স্বাভাবিক, খুব স্বাভাবিক। কিন্তু নিকোলা পার্লামেন্টে এসেছিল ব্যাপারটা জেনেই, মেজরিটি সভ্যদের আসনে পার্টির বিশেষ সভ্যরাই থাকবে যাদের কাছে সংবিধানটাই ছিল প্রতিক্রিয়াশীলদের, একটা অর্থহীন আইনের খসড়া, নিকোলা জানতো বিরোধী

দলের পঁচাত্তরজন সদস্যের একজন তাকে সেদিন হয়তো বিশ্বাসঘাতকতার অজুহাতে গ্রেপ্তার করা হবে। তা সত্ত্বেও সে পার্লামেন্টে গিয়েছিল। আর উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল পবিত্র সংবিধানের নামে সে স্পীকারকে সম্বোধন করছে।

হয়তো কাঁধে একটা অপারেশন দরকার হবে, আর সেটা অসম্ভবও নয়, কারণ এখন তারা আশা করতে পারে, ন্যায়সঙ্গতই সে আশা, অ্যাভলনের সরাই দূরে নয়। এবং এ থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যেন নিকোলা এবং বোশাম্পের পরে আর একটা পথ আছে যা অ্যাভলনেব দিকে চলে গিয়েছে।

কিন্তু নিকোলার সাহস ছিল, হ্যাঁ তাকে সাহস ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যেহেতু সে জানতোই এমন ব্যাপার হবে, এমনকি পার্লামেন্টের সিঁড়িতে উঠতে উঠতে যখন তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বিদ্রূপ করেছিল কোনো কোনো সদস্য, তখনই বুঝতে পারা গিয়েছিল।

যে কথাটা জারো ভাবতে চাচ্ছে তা এই : নিকোলাকে কিন্তু বর্তমানে বিশ্বাসঘাতক প্রমাণ করাই যথেষ্ট বিবেচনা করেনি ওরা, বরং মানবতার নামে এই অভিযোগ করা হয়েছিল, নিকোলার বন্ধুপ্রীতি অস্বাভাবিক, যাতে তার অতীতের যুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যাপারটা লোকে আর মনে না রাখে, আর সেই দলিলে নিকোলার আবাল্যবন্ধু জারো স্বাক্ষর দিয়েছিল। কিন্তু কিছুই কি এসে যায় কারো এখন? যদিও জারো যে উত্তাপটা অনুভব করছে হয়তো তা নিকোলার সাহচর্যের অভ্যস্ত স্মৃতি। এসে যায় না কিছুতেই আর, কাবণ যদিও তিন দিন ধরে ধরে চলে চলেও অ্যাভলনের অধিত্যকায় নামার পথটা পাওয়া যায়নি, এটাও সত্যি পাহাড়েব কিনারায় পৌঁছেই দেখা যায়, পর পর তিন দিন পথ বদলে চলেও দেখা গিয়েছে, অ্যাভলন যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই আছে, খুব দূরেও তারা সরে আসেনি।

ব্যাপারটা ফ্লিন্ট অভ্যাসে আনাব চেষ্টা কবেছিল, কিন্তু তাতে তার স্বাভাবিক দৃষ্টিই যেন নষ্ট হওয়াব উপক্রম। খুব কাছে দৃষ্টি আটকে রাখতে গিয়ে সে কীই-বা দেখবে আব, সহযাত্রীদের পোশাক, কিংবা তাদের মুখ দেখা ছাড়া, কারণ এখানে এই তুষারে নিউট নেই, ক্রোকাস ফোটাও সম্ভব নয়। এখন একথাটা সকলের মুখেই শোনা যাচ্ছে, অ্যাভলনের শহরটাকে দেখা গিয়েছে, যদিও এক সপ্তাহ হয়ে গেল তারা তাকে কেন্দ্র করেই এক পাহাড় থেকে আরো এক পাহাড়ে উঠে, এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে নেমে ঘুরে ঘুরে চলেছে। আকস্মিকভাবে, এবং প্রবল ভাবেও বটে, অনুভূতিটা হল তার, কতকটা কৌতুকের সঙ্গে মিশানো কৌতূহল · ফেরেন্সের বুদ্ধি? কিংবা কাঁধ নুইয়ে চলেছে যে জারো, অবশ্য সেন্ট সাইমনের মুখোশের কথাও আছে, কারণ তার আড়ালে ফেরেন্সের চাইতেও দৃঢ় চিবুক আছে কিনা কে বলতে পারে নিশ্চিত ভাবে। কিন্তু ওরা যেন অ্যাভলনের দিকে না চেয়ে পথের দিকেই চোখ রেখে চলে, যেহেতু তাতে অতীত এবং ভবিষ্যৎ কালকে এড়িয়ে চলা যায়, বিশেষ করে এই কর্দমাক্ত শীতের তুষাবে ক্রোকাস যখন ফুটবে না। অথচ ব্যাপারটা কি অভ্যস্ততায় তারই এসেছে? বরং অভ্যাসটার আবরণ ভেদ করে ভিতরটা আবার আজ ফুটে উঠতে চাচ্ছে, এবং হয়তো তা অ্যাভলন সত্যি হতে চলেছে বলেই। ভিতরের অনুভূতি যা ভুলতে পারেনি তা এই : ফ্লিন্টের বড়ো ভাই, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল, রাজপথের উপরে একটা ট্যাঙ্কের তলায় গুঁড়িয়ে গিয়েছে, আর তার মার তলপেটে, যা একটা সন্তান বহন করছিল, একটা বেয়োনেট বিঁধেছিল সীমান্তের তারের বেড়ার কাছে। কিন্তু অ্যাভলনে পথের ধারে হয়তো ক্রোকাস ফুটতেও পারে, ক্রোকাস ফুটতে পারেও হয়তো।

আবার একদিন, সিমারই প্রথম, সে গর্জন করে উঠল, যেন আনাড়ী কশাইয়ের ছুরিতে বেঁধা ষাঁড়ের মতো। পাহাড়ের একটা খাঁজে সে বসে পড়েছিল [এখন দুপুর হতে চলল] সকাল থেকে চলে চলে, যদিও বরফে পাহাড়ের গা পিছল হয়ে গিয়েছে এবং তীব্র শীতে যাত্রীদের হাত-পা

অসাড় হয়ে আসছে। একশ ফুট উপরে পাহাড়ের মাথা, যদিও এখন বাতাস তুষার বয়ে আনছে। ন দিন হল আজ, ঠিক ন দিন—একরশি পথ এগিয়ে আসেনি অ্যাভলন, যদি পিছিয়ে গিয়েও না থাকে। এই মাথার দিকে আর কেউ চেয়ো না, মুখ ফিরিয়ে নাও, মুখ ফিরিয়ে নাও। আবার কেউ তাদের প্রবঞ্চনা করেছে, যে হয়তো বোশেম্পের মতো রাজনীতির চোরাগলিতে পথ চেনে না।

উদ্বাস্তুরা এখন নামছে পাহাড়ের গা বেয়ে। কে বলেছে তা কেউ বুঝতে পারছে না, হয়তো পরিবেশ তাদের সকলের মনেই চিন্তাটাকে এনে দিয়ে থাকবে, আর ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কারো কথায় চিন্তাটা রূপ পেয়েছে। কথাটা এই, ক্রিটের গোলকধাঁধার চাইতেও ভয়াবহ এই বিপদ থেকে সরে যেতে হবে, যদি-বা পাহাড়ের নিচে কোনো পথ আছে, যে পথ অ্যাভলনের পথের দিকে ধীরে ধীরে উঠেছে, উচ্চাশার পাহাড়-চূড়ার চাইতে যা নিচে নিচে চলে।

নিনার মনে হয়েছে এই মৃত্যু—যে পচনশীলতাকে সে দীর্ঘদিন বহন করে এনেছে, যার কাছ থেকে একদিন সে পালাতে চেয়েছিল, ফুলে অসাড় হয়ে যাওয়া আঙুলগুলো দিয়ে যাকে সে ধরতে যাচ্ছে, অনেক রাত্রির জীবন প্রতিষ্ঠার ব্যঙ্গ প্রতিধ্বনি দিয়ে যে পচনশীলতা সব রেসারেকসনের অতীত হয়ে তার দেহের কোষে কোষে সঞ্চারিত হয়েছে। এখন দিনকে আর বোঝা যাচ্ছে না, অস্পষ্ট একটা আকাশ শুধু মাথার উপরে। উদ্বাস্তুরা আবার থমকে দাঁড়িয়েছে, দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে উঠেছে তাদের মুখ। আবার কেউ খবর এনেছে সামনে গভীর কেনিয়ন। সেতু? দড়ির একটা কিছু আছে বটে এপারে ওপারে বিস্তৃত। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল যাত্রীদল। আবার : অ্যাভলনের গুজবের, যা অর্বাচীন কোনো রাজনৈতিক স্বপ্নদ্রষ্টার ছড়ানো বলে বোঝা যাচ্ছে, এটাই পরিণতি—পঞ্চাশ বছর আগে যদি কেউ এ দড়ির সাহায্যে ওপারে গিয়ে থাকে এখনও যেন এক উদ্বাস্তুদের পক্ষে তা সম্ভব হতে পারে!

খবরটা উদ্বাস্তুরা এখন সকলেই জানতে পেরেছে, দড়ি ধরে যে ওপারে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল সে সেন্ট সাইমন। তাহলে এমন কি হতে পারে সেই নেতৃত্ব করে দলটিকে এনেছে এতদূর? আর তা যদি হয়ে থাকে, তবে সে তার যোগ্য কাজই করেছে, এ সাহসও তবে তাকেই দেখাতে হবে, অর্থাৎ অনেক সময়েই নেতাকে যেমন দেখাতে হয়।

ফেরেঙ্গে হাঁটুতে চিবুক রেখে ভাবছে। তুষার পড়ছে এখন, কিছুক্ষণ পরে অনেক কিছুই তুষারে আবৃত হয়ে যাবে।

নিনা কিন্তু পাগল হয়ে গিয়েছে, অন্তত তার বিড়বিড় করে বকা দেখে তা অযুক্তির মনে হবে না। সেন্ট সাইমন যখন দড়িটা ধরে চলতে শুরু করবে তখন সে কাছে ছিল, আর তখন সেন্ট সাইমন তার মুখোশটাকে খুলে ফেলেছিল, স্মক্ ফ্রকটাকে গুটিয়ে নিয়েছিল। বিপজ্জনক পথে যাত্রার উদ্যোগ বলা যেতে পারে।

কিন্তু কী দেখেছে তখন নিনা? সেন্ট সাইমনের মুখে নাকের বদলে শুধু দুটো গর্ত ছিল?

স্বর্গভ্রষ্ট

ভাড়াটে বাড়ি হিসাবে এ পাড়ায় প্রায় একক এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া দেয়ার জন্যই তৈরি হয় নি। পেন্সনপ্রাপ্ত কোন জেলা জজ শহরের সে সময়ের আধুনিকতম অঞ্চলে শেষজীবন প্রাগ্রসর আবহাওয়ায় কাটানোর জন্য এই বাড়িটা তুলেছিল। দেয়ালের গেরুয়া রং বিবর্ণতার পলি ফেলে, ছোট লনটার উপরে ডাল-সার দুটো অ্যাকেশিয়ার চারাকে অবশিষ্ট রেখে তার পরে সময় বয়ে গিয়েছে, আধুনিকতাকে আরও প্রায় এক মাইল দক্ষিণে সরিয়ে দিয়ে এবং সেই জজের আয়ুর সবকটি বালুকণাকে গ্রাস করে। জজের বাতগ্রস্তা এনেমিক বিধবা বাড়ির নিচতলার দুখানা ঘর ভাড়া দিয়েছে। ঘর দুখানার ভিতরের দেয়ালের ডিস্টেম্পারের খসে পড়ছে। কোন এক সময়ের ভাঁড়ার ঘরটাই এখন ফ্ল্যাটের রান্নাঘর হয়েছে—ধোঁয়া বেরিয়ে যাওয়ার অব্যবস্থায় কয়লা জ্বালানোর পরে সে ধোঁয়া ফ্ল্যাটটার ঘর দুখানাতে ঢুকে পড়ে অনেকক্ষণ—দেয়ালের গাযে এবং জজের আমলের ছিটের ঢাকনা দেয়া বার্নিশ কালিয়ে আসা একটু বা নডবড়ে সোফা, আলমারি, আলনার ফাঁকে ফাঁকে আটকে থাকে। বাথরুমটা তৈরি হয়েছে উপরে যাওয়ার সিঁড়ির নিচে রান্নাঘর দেয়াল লাগোয়া। একেবারে ছাদ ঘেঁষে যে একমাত্র জানলা তা দিয়ে আলো আসে না ফলে অষ্টপ্রহব ঘোলাটে বাল্বটাকে জ্বেলে র‍্যাখতে হয়। ফ্ল্যাটটার ভাড়া একশো টাকা।

নিজেদের উপার্জনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভাড়া দিয়ে এই ফ্ল্যাটে আপাতত সাঁপুই দম্পতী বাস করছে। বলীয়ান শরিকের নাম দ্বিজেন, আর কোমলতার বাড়ির নাম বেলা কিন্তু প্রকাশ্যে সে মৃণালিনী। দ্বিজেন এক মার্চেন্ট অফিসের কাস্টমস্ দপ্তরে কাজ করে। অর্থাৎ কাস্টমসের কর্মচারীদের কাছে অফিসেব পক্ষ থেকে তদ্বিরতদারক করে থাকে। কালো গলাবন্ধ কোট এবং ইংলিশ প্যান্ট পরে সে অফিসে যায়। সরু লতানো গোঁফ, মাথার সামনে চুল উঠে গিয়ে একটা ছোট টাক দেখা দিচ্ছে। এছাড়া তার সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আর কিছু খুজে পাওয়া কঠিন যদি না তার হলুদে গায়ের রঙের কথা বলতে হয়। এই রঙের সঙ্গে স্বাস্থ্যহীনতা জড়িত কিন্তু তার কতটুকু রক্তশূন্যতা এবং কতটুকু খোলা আকাশ বঞ্চিত হওয়ার ফল তা বলা শক্ত। কারণ এই শহরে সাঁপুইদের এখন তৃতীয় পুরুষ চলেছে।

দ্বিজেনে নিজেও একথা বলে থাকে। তার পিতামহ এই শহরে ছাত্রাবস্থায় এসেছিল এবং সে সময়ের জেনারেল এসেমব্লি কলেজে পড়েছিল। তার পিতা এবং সে নিজে স্কটিশচার্চ কলেজে পড়েছে ঐতিহ্যের আকর্ষণে। এই ঐতিহ্যরক্ষা দ্বিজেনের গর্বের বিষয়। তেমন এটাও তাদের পারিবারিক গর্ব যে তাদের পরিবারের লোকেরা এই শহরের বাইরে এই তিন পুরুষে কারো সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করেনি। দ্বিজেনের বাবা সারাজীবন স্কট লেনের ভাড়া বাড়িতে কাটিয়ে গিয়েছে। তার মামারবাড়ি অখিল মিস্ত্রি লেনে। দ্বিজেনের শৈশবস্মৃতির মধ্যে একটা স্মৃতি আছে যা বিশ্লেষণ করে এখন সে বুঝতে পারে তার বাবা অন্তত একটি বিষয়ে অযৌক্তিক রকমে রোমান্টিক ছিল। মাঝে মাঝে বাড়ি তৈরির কথা বলতো সে এবং নজির দেখাতো দ্বিজেনের পিতামহ কাশীপুরে একটা বাড়ি তুলেছিল একদা। দ্বিজেন এখন বাড়ি তৈরি করার কোন সঙ্কল্প পোষণ করে না কিন্তু তার পিতামহের সেই বর্তমানে অদৃশ্য বাড়িটাকে তার পারিবারিক আভিজাত্যের নিদর্শন মনে করে থাকে। তার কারণ এই যে সেই স্কট লেনের ভাড়াবাড়ির দুখানা ঘরে মানুষ হতে হতে সুন্দর পরিচ্ছন্ন

এবং সুপরিসর একটা কাল্পনিক বাড়িব কথা তার বাবাকে সে কয়েকবার বলতে শুনেছে। সে যাই হোক, স্কট লেন অখিল মিস্ত্রি লেন এবং হ্যারিসন রোডকে দ্বিজেনের বাস্তবজীবনের শিক্ষাক্ষেত্র বলা যেতে পারে—কারণ হ্যারিসন রোড পেরিয়ে স্কটিশচার্চ কলেজে যে শিক্ষা সে পেয়েছে তা বাস্তবজীবনে তাকে কোন সাহায্য করে না। এখন, এই স্কটলেন-অখিলমিস্ত্রিলেন প্রভৃতি স্থানের একটা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন এই স্থানগুলিব বাতাস, কিম্বা গলির সঙ্গে সমান্তরাল এবং সমায়তনের আকাশের। বাইরে থেকে কেউ গেলে নিঃশ্বাস নেয়ার ব্যাপারটা তার চিন্তার বিষয় হতে পাবে, কিন্তু দ্বিজেনদের তা হয় না। অবশ্য সে সংস্কৃতির মধ্যে যে একরকমের সংকীর্ণতা আছে তা দ্বিজেন অন্যের কাছে স্বীকাব না করলেও নিজেব কাছে করে। যথা দ্বিজেন তার বাবাব মতো 'পোলপার' বলতে পৃথিবীর পশ্চিম সীমান্ত বোঝে না। সে বর্ধমানে একবার গিয়েছিল এবং সে শহবের লোক যে এস্কিমো নয় সে বিষয়ে তার চাক্ষুষ জ্ঞান আছে।

কিন্তু তাই বলে তাদেব অনগ্রসরতাকেও উল্লেখ করতে সে ভুল কবে না। খবরকাগজ নিয়ে তারা যে রকম বাড়াবাড়ি করে সেটা আশ্চর্য বোধ হয়েছিল দ্বিজেনের কাছে। সে সময়কার একজন রাজনৈতিক নেতাব একটা ভাষণ নিয়েই তাদের উত্তেজনা। তাদের একজন জিজ্ঞাসা করেছিল তাকে—আজকের কাগজটা দেখেছেন। দ্বিজেন বলেছিল,—না, মশাই, নষ্ট করার অত সময় কোথায়? সে মনে মনে হেসেছিল, ডালহৌসী স্কোয়ারে যাওয়ার ট্রামরাস্তার ধারে যা রোজ ঘটছে তাই নিয়েই কাগজ। বলতে গেলে চোখের সম্মুখেই ঘটছে তার। বস্তুত অফিস এবং বাজার ছাড়া অন্য কোন বিষয়কেই সে আলোচনাব যোগ্য মনে কবে না। তার সুনির্দিষ্ট ধারণা এই বাংলাদেশ যেমন পৃথিবীর কেন্দ্র, তেমন বাংলাদেশ বলতে এই শহরকেই বোঝায়। যেহেতু এই শহরের সব কিছু তার চোখের সম্মুখে ঘটছে এবং অফিসের কাজ কবতে কবতে পৃথিবীব সব খবব নিশ্চয়ই জানা হয়ে যায়, ট্রামে আসতে যেতে যদি কোন খবর নেহাৎ অজানাই থাকে। সুতরাং কারো লেখা বা কথা থেকে জানাব কীই বা আছে? সুতবাং পিতামহ কালোরঙের চাপকানোর উপরে পাকানো উড়নি জড়িযে যেমন মার্চেন্ট অফিসে যেতো, পিতা কালোরঙের গলাবন্ধকোট এবং ধুতি পরে যেমন মার্চেন্ট অফিসে যেতো, দ্বিজেন সাঁপুইও তেমনি কালোরঙের গলাবন্ধকোট ও ইংলিশ প্যান্ট পরে মার্চেন্ট অফিসে যায়। যেমন পর পর তারা জেনারেল এসেমব্লি ও স্কটিশচার্চ কলেজে পড়েছে এবং এভাবেই তার জীবনের ঐতিহ্য সে নতুনতর কোন সাঁপুই-এর হাতে সঁপে দিয়ে একদিন বিদায় নিতে পারতো যদি নতুনতর কোন সাঁপুই থাকতো।

দ্বিজেন সাঁপুই নিঃসন্তান। তার এই পনেরো বৎসরের বিবাহিত জীবনে স্ত্রী বেলা একবারও অন্তঃসত্ত্বা হয় নি। সেটা বরং তাদের পক্ষে ভালোই হয়েছে। কারণ বেলাও চাকরি করে।

বেলার বয়স এখন পঁয়ত্রিশ হল। পনেরো বছর আগে তখনকার অপরিচিতা বেলাকে ঠিক কি রকম দেখাতো তা এখন দ্বিজেন মনে করতে পারে না। ন্যায়শাস্ত্রকে অবলম্বন করলে বলা যায় অবিবাহিত বেলার ত্বকে তখনও শেষ যৌবনের ঔজ্জ্বল্য কিছু অবশিষ্ট ছিল। তার ফলে এখনকার তুলনায় তার শরীরটাকে আঁটশাট মনে হতো, রংটাও এমন বাদামী বোধ হতো না। ট্রামেই আলাপ, তারপর একই সিটে পাশাপাশি বসা, তারপরে বিবাহ। এই পাশাপাশি বসার জন্যই পরিচয়ের এক পর্যায়ে যেমন দ্বিজেন তেমন বেলা বেশ খানিকটা পথ হেঁটে এসে বউবাজার ডিপোতে ট্রামে উঠতো। একেই প্রেম বলা যেতে পারে দ্বিজেনদের জীবনে।

প্রেম নিশ্চয়ই নতুবা দ্বিজেন এমন দুঃসাহসী হতে পারতো না। সে পরিচয়ের মাঝামাঝি সময়েই জানতে পেরেছিল এই শহরের স্থায়ী আভিজাত্যের সঙ্গে বেলাদের কোন সম্বন্ধ নেই। পদ্মানদীর ওপারের এক জেলা থেকে কিছুদিন হল তারা এসেছে এই শহরে।

এখনও তারা বেলা দশটাতেই ট্রাম ধরে। একই ট্রাম নয়। বেলা কিছুদিনের জন্য চাকরি ছেড়েছিল

বিয়ের পরে। এখন আবার উত্তর কোলকাতায় এক প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারি করে। দ্বিজেন পানের চৌকো জার্মান সিলভারের কৌটো নিয়ে ট্রামে ওঠার কিছুক্ষণ পরেই উলের থলে হাতে ঝুলিয়ে কাঁটা চালাতে চালাতে বেলাও ট্রাম ধরতে এগিয়ে যায়।

দুজনের চাকরির টাকায় এই ফ্ল্যাটভাড়া নিয়েছে তারা। দুজনের উপার্জনের টাকাতে সংসারও মোটামুটি ভালোই চলছিল।

কিন্তু কিছুদিন থেকে কিছু একটা ঘটছে। একটা অসামঞ্জস্য যা ঠিক কোন কোন বিষয়কে অবলম্বন করে আছে বলা না গেলেও এই ফ্ল্যাটে এলেই অনুভব করা যায়। এই অসামঞ্জস্য বোধ থেকেই যেন অসন্তোষ এবং অসহিষ্ণুতা দেখা দিয়েছে। কিম্বা অন্য কথায় অসামঞ্জস্য বোধটায় ধাক্কা খেয়ে খেয়ে তাদের মনে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে তারই ফলে তাবা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে। তাদেব দৈনন্দিন কার্যসূচীর কোন অদলবদল হয় নি। দ্বিজেন সাঁপুই অফিস থেকে এসে যেমন সোফায় কাৎ হয়ে পড়ে থাকতো এখনও তেমনই থাকে। বেলা অফিস থেকে এসে চা জলখাবাবের পব যেমন উলকাঁটা হাতে এবং চোখের সম্মুখে নভেল রেখে বসতো এখনও তাই বসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অসন্তোষটাকে অস্বীকাব করা যায না। ইতিমধ্যে একদিন দ্বিজেন এমন একটা চিন্তাও করেছে—বেলাকে তেমন ভালো দেখায় না আর। এটাকে তার মানসিক অবস্থার নমুনা হিসেবে নেয়া যেতে পারে যে পনেরো বছর আগে যাকে সে ভালোবেসে বিবাহ করেছিল এখন তার মুখ অথবা তার দেহ তাকে প্রফুল্ল কবে না ববং সেই মুখে সে ত্রুটি খুঁজে পায় এবং সেই দেহ তার কাছে অসুন্দব মনে হয। এসবের অবশ্যই কারণ আছে। তাদের আত্মীয়স্বজনদেব মধ্যে এরকম আলোচনা হয় দ্বিজেন কুলপ্রথাকে লঙ্ঘন করে অর্থাৎ শহরের পুরনো বাসিন্দাদের বাইরে গিয়ে স্ত্রী সংগ্রহ কবে ভালো করে নি। কিন্তু এই অসন্তোষ তা থেকে হয়েছে বলা যায় না। কারণ দ্বিজেন তার পিতার জীবনের ঐতিহ্যের বাহক হলেও বেলাকে বিবাহ করে সে প্রমাণ কবেছিল যে ঐতিহ্যের বাইরে যাওয়ার সাহসই তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। শহরেব এই অঞ্চলে ফ্ল্যাটভাড়া করার রুচি অবশ্য বেলার কিন্তু তাকে সমর্থন কবাও দ্বিজেনের সাহসিকতাব পরিচয়। বরং বলা যেতে পারে তাব এই সাহস থাকার ফলেই অসন্তোষের দিকেও একটা প্রবণতা ছিল তাব। এই অসন্তুষ্টির প্রকৃত কারণ কিন্তু খুব সহজে বর্ণনা করা যায়—তারা কখনও অবসর ভোগ করে নি। গত পনেরো বৎসরে দু'একবার মাত্র ডালহৌসী স্কোয়ার থেকে আউটরামঘাটে কিম্বা ইডেনউদ্যানে গিয়ে তারা বসেছে বটে। এই অবসরভোগ করাটা, প্রকৃতির অকৃত্রিমতার সঙ্গে গলিমণ্ডুকতার বাইরে সাময়িকভাবে সংযুক্ত হওয়া যে কত মূল্যবান তা তাদের জীবনে এখন প্রমাণিত হচ্ছে। দুপুরুষ ধরে যা চাপা ছিল সেটাই অসন্তোষের রোগ হয়ে দেখা দিয়েছে। ব্যায়াম করা, পরিশ্রম করা স্বাভাবিক, কিন্তু চাপা ক্ষয়রোগ তাতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। দ্বিজেন সাঁপুই এ ফ্ল্যাটে আসবার সাহসিকতায় তেমন যেন এই অসামঞ্জস্য-অসন্তোষ।

গত তিনমাসে এটা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে দ্বিজেন তার অফিসে বসে বসে একদিন যন্ত্রণাযুক্ত এই চিন্তা করে বসল : বিবাহের সময়ে বেলার বুক এবং নিতম্ব সুগঠিত ছিল বলেই তার লোভ হয়েছিল নতুবা বেলার মতো মুখের গড়ন সে কিছুতেই পছন্দ করতো না। মানুষ যা ভাবে তার কিছুটা প্রকাশ পায়ই। কিছু প্রকাশ পেয়ে থাকবে : প্রত্যুত্তরে বেলা বলে বসেছে ; অসুবিধা হয় তুমি তোমার ভাইদের সঙ্গে গিয়ে থাকতে পারো। আমার উপার্জনের টাকায় ফ্ল্যাটের ভাড়া হয় না, আমার একার খরচ চলবে।

দু'একদিন পরে আর এক সন্ধ্যায় সংসার নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। দ্বিজেন প্রায় প্রতিটি কথাতেই

বিরক্তি প্রকাশ করেছে। বেলা টেবিলে নভেল রেখে তার উপরে চোখ দিয়েছে। তার হাত দুটো উলের কাঁটা নিয়ে ব্যস্ত। এমন সময় দ্বিজেন লক্ষ্য করল বেলার চশমার লেন্সের নিচে নাকের পাশ গড়িয়ে চোখের জল দেখা দিয়েছে। দ্বিজেন যার পর নাই বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল কিন্তু পাশের ঘরের আলোর দিকে চোখ রাখতে রাখতে হঠাৎ তার চোখেও জল এল।

একদিন দ্বিজেন বলল, চলো, বেলা, আমরা বেরিয়ে আসি।

বেলা বলল—এই বয়সে ইডেনউদ্যানের কোন মাধুর্য নেই।

—তা নয়, আরও দূরে কোথাও।

বেলা বিরক্ত হয়ে উত্তর না দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

অন্য একদিন বেলাই বলল—চলো না হয় অন্য কোথাও।

আরও প্রায় একমাস পরে বেলাই আবার বলল—কোথাও গেলে হতো না?

ভাবছি।

আমাদের স্কুলের একজনের পরিচিত এক ভদ্রলোকের দেওগিরির কাছে একটা বাড়ি আছে। ছোট বাড়ি, সস্তাও। দু'এক মাসের জন্য ভাড়া নিলে হয়।

এরপর তারা কিছুদিন পরিকল্পনাটাব জন্য কত টাকা দরকার হবে, অন্য কোথায় কোথায় তার জন্য ব্যয় সঙ্কোচ করতে হবে, কতদিনের ছুটি নেবে তারা এসব বিষয়ে আলোচনা করল।

অবশেষে সত্যই তারা নভেম্বরের গোড়ায় বেরিয়ে পড়ল।

সাঁপুই দম্পতীর এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য আত্মাকে গ্লানিমুক্ত করা। তাদের যাত্রাও অন্তত একদিক দিয়ে শাস্ত্রে বর্ণিত যাত্রার সঙ্গে তুলনীয় হয়ে উঠল। বিলেতি ধর্মশাস্ত্রে পুরগেটেরিওর ব্যবস্থা দেয়া আছে যা পার হলে আত্মা বিমল হতে পারে। রেলের থার্ডক্লাস কম্পার্টমেন্টেই তারা এই পুরগেটেরিওর সাক্ষাৎ পেল। সকাল দশটায় গাড়ি ছেড়েছিল হাওড়ায়। বিকেল তিনটেতেই দ্বিজেন ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ করতে লাগল। তার এই প্রথম দীর্ঘ রেলভ্রমণে প্রথম দিকে সে নিজের এবং বেলার জন্য অবস্থানের একটা নির্দিষ্ট গণ্ডি অন্য যাত্রীদের থেকে পৃথক করে রাখবার চেষ্টা করছিল। পরে ভর্ৎসনা বিদ্রূপ এবং অনুযোগে সে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। বেলার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। সে গাড়ির দেয়ালে মাথা রেখে নিঃশব্দে বসে আছে কিন্তু কোন দিন তাকে এত ক্লান্ত দেখায় না স্কুল থেকে পরিশ্রম করে এলেও। সমস্তদিন ধরে যত যাত্রী নেমেছে তার চাইতে বেশী উঠেছে। দরজা থেকে বেঞ্চ পর্যন্ত মানুষ গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়িয়ে আছে, নিজেদের মোটঘাটের উপরে বসে চলেছে কেউ কেউ, এমনকি দুই বেঞ্চের মাঝেও বসেছে কয়েকজন। যাত্রীদের ওঠানামার বাক্‌বিতণ্ডা চলছে আর তা প্রায়ই শালীনতাকে ভ্রূক্ষেপ করছে না ; বিড়ির ধোঁয়া, ময়লা কাপড়চোপরের গন্ধে এই শীতকালের বিকেলেও গুমোট এবং বাতাসেরও অপ্রাচুর্য। খাঁচায় আটকানো চালানী মুরগীগুলোর মধ্যে উপরের দিকে যারা ঠোঁট গলাতে পারে তাদের পক্ষে নিঃশ্বাস নেওয়া কিছুটা সম্ভব হয়, ভাগ্যবলে তাদেরও মুখোমুখী আসন দুটো জানলা ঘেঁষে।

আলাপ করার চেষ্টায় দ্বিজেন বলল—কী রকম বোধ করছো?

বেলা কিছু বলতে গিয়ে থামল। ইতস্তত করল। তার মুখে একটা বিবর্ণ হাসি ফুটল। সে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

বেলাই তার কষ্টের কারণ এরকম একটা অযুক্তির কথা তৈরি করতে গিয়ে নিজের মনে সমর্থন না পেয়ে বিরক্তিতে ভ্রূকুটি করল দ্বিজেন। বালি চিবানোর মতো সব কিছু নীরস বোধ হল তার।

ছোট ধুলোঢাকা স্টেশনটার নাম দেওগিরি বটে। সারাদিন এবং সারারাত নরকভোগের পর আর কী আশা করা যাবে? স্টেশনে একটা কুলি পর্যন্ত নেই যে তাদের মালগুলো নিয়ে যাবে।

ট্যাক্সি বাস দূরের কথা, ছোট স্টেশনটার বাইরে কোন রকমের যানবাহনই দেখতে পেল না দ্বিজেন। কার কাছে সংবাদ পাওয়া যাবে ঠিক করতে না পেরে সে নিজেই চারিদিকটা ঘুরে এল। ছোট স্টেশনের গায়ে রেলের সীমা শেষ। তারপরেই দুখানা ছোট দোকান। দোকান দুটোর সম্মুখ দিয়ে ধুলোর পথ চলে গেছে। উঁচু নিচু ভাঙাচোরা রাস্তাটার দুপারে শালগাছে। ধুলোতে ঢাকা পাতা এবং কাণ্ড। দ্বিজেনের এমন আশঙ্কাও হল তারা ভুল স্টেশনে নেমে পড়েছে।

সে বিবর্ণ মুখে ফিরে এসে চিন্তা করার জন্য লটবহরের উপরে বসে পড়ল। কিন্তু আসলে পরিস্থিতিটাকে যত খারাপ মনে হয়েছিল তাদের কাছে ততটা হতাশ হওয়ার মতো নয়। যাদের বাড়ি ভাড়া নিয়েছে তারা, তাদেব মালিকে চিঠি লিখিয়ে খবর দিয়েছিল বেলা। সেই মালি এল। মালপত্রের পরিমাপ দেখে নিয়ে পাশের গ্রাম থেকে টাঙ্গা ডেকে আনল সেই। সেই অসমান পথে টাঙ্গার ময়লা চাদর-ঢাকা চটের গদিতে বসে চলতে চলতে দ্বিজেন নিজেকে সান্ত্বনা দিল হয়তো তার মতো লোকেরা এমন দেশভ্রমণই করে থাকে।

দেওগিরি শহরটা শহর এবং গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করছে। স্থায়ী বাসিন্দাব সংখ্যা হাজাবের কোঠায় কোনক্রমে পৌঁছুতে পরে। কিন্তু তার তিন চারটি রাস্তা অন্তত সুরকি দিয়ে বাঁধানো। সেই পাকা বাস্তা ধরে চললে কয়েকটি ইটের তৈরি বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো ছাড়াও দূরে দূরে ছোট ছোট টিলার মাথায় আরও কয়েকটি পাকা বাড়ি চোখে পড়ে। এই রাস্তা কয়েকটি, এই পাকা বাড়িগুলো এবং এখানকার দৈনিক বাজার থেকে এটাকে শহর বলা যায়, নতুবা সন্ধ্যার পরে পথের ধারের কেরোসিন আলোগুলো সত্ত্বেও চারিদিকের অন্য গ্রামগুলোর সঙ্গে একই অন্ধকারে ডুবে একাকার হয়ে যায়। সাঁপুই দম্পতী যে বাড়িটা ভাড়া করেছে সেটা এই শহরেরই পাকা রাস্তাগুলো ছেড়ে কিছুদূর গিয়ে, একটা টিলার উপরে কয়েক ধাপ উঠে একটা ছোট বাংলো। সস্তার জিনিস অনেক সময়ে যেমন হয় এক্ষেত্রেও তা হযেছে। বাংলোটির দুখানা শোয়ার ঘবের এবং বিশেষ করে রান্নাঘরের অবস্থা দেখে সাঁপুই দম্পতীর মনে হতাশাই দেখা দিয়েছিল। শোযার ঘর দুটিরই মেঝে ফাটা। একটির জানলা দবজা বন্ধ করে রাখতে হয় নতুবা জানলা-দরজার পাল্লা খুলে আসে। রান্নাঘরের টালির ছাদে বড় একটা ফুটো। দ্বিজেন উষ্ণ এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল ঘরদোরের অবস্থা দেখে। বেলার তখন কথা বলার মতো মনের অবস্থা ছিল না। প্রথম ধাক্কার পরে তারা কাটিয়ে উঠেছে এখন। এতগুলো টাকা খবচ করে এসেছে এবং দুমাসের জন্য বাড়ি ভাড়া নিয়েছে, কাজেই সহনশীল না হয়ে লাভ নেই। একটা সুবিধার কথা এই এখানে দুধ এবং মাংস সস্তা।

তা ছাড়া এখানে শব্দ কম। মাঝে মাঝে কুয়াশাটা প্রায় বেলা দশটা পর্যন্ত মাটির কাছাকাছি লেগে থাকে যেমন কোলকাতায় দেখা যায় না। আপাতত এইটুকুই দ্বিজেন আবিষ্কার করতে পেরেছে। এই কুয়াশাটা কেটে যাওয়ার পরে কোন কোন দিন সাঁপুই দম্পতি বেড়াতে যায়। সম্মুখে দ্বিজেন, তার কয়েক হাত পিছনে বেলা। দ্বিজেন সাঁই সাঁই কবে তার হাতের ছড়িটাকে ঘোরায় আর বেলা যথারীতি তার উল বুনতে থাকে।

ইতিমধ্যে বেলা একদিন বলেছিল : এখানে এসে লোকে কী কী দেখে তা কারো কাছে থেকে জেনে নিলে হতো।

—অর্থাৎ এখানে কী সুখ তা আমরা নিজেরা বুঝতে পারছি না।

তারপরে আর কথা হল না।

এ শহরটাকে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত বলা যায় না। যদিও এখানে ওখানে দু-তিনশ ফিট উঁচু টিলা অনেকগুলো আছে। স্টেশন থেকে আসতে শালগাছ চোখে পড়েছিল, কিন্তু ঠিক শালগাছের

দেশও নয়। শহরের চারিদিকেই গ্রাম—কখনও শহরের লাগোয়া, কখনও শহর এবং গ্রামের মধ্যে একটা বন বা একটা টিলার ব্যবধান।

একদিন বেলা প্রস্তাব করল, বনভোজন করলে হয়।

দ্বিজেন বলল, যে লোকটা সাজসরঞ্জাম টেনে নিয়ে যাবে তার খরচটা বইতে হবে।

—দুজনের খাবাব আমরা নিজেবাই বইতে পারবো।

সেদিন তারা বনে ঢুকেছিল। দুপুরবেলাটা বনে কাটিযে এসেছিল। এখানে ওখানে দুচারটে শালগাছ। মাঝে মাঝে ঘাসে ঢাকা জমি। ঘাসগুলোর রং এখন শুকনো পাতার মতো। কোথাও ছোট ছোট ঝোপ।

এরপর থেকে মাঝে মাঝে তারা বনে যেতো। দুপুব থাকতে বেরিয়ে পড়ে বিকেলের রোদ থাকতে থাকতে ফিরে আসতো। সঙ্গে তাবা একটা কম্বল নিতো পেতে বসার, কোন কোন দিন, আর এক ফ্লাস্ক চা।

হঠাৎ একদিন একটা বিপদ ঘটে গেল।

দ্বিজেন বলেছিল,—রোজই এক জায়গায বসছি। গাছপাতাগুলোও যে মুখস্থ হয়ে গেল। জাবরকাটার মতো বোধ হচ্ছে।

এরপরে তারা খানিকটা এগিয়ে গিযেছিল। তাবা কিছুদূর যাওয়ার পরেই বনটা ঘন হয়ে উঠেছিল। প্রায এক ঘণ্টা ধরে তারা হেঁটেছিল বনেব সরু সরু গলি ধবে। বসে বসে পুরনো গাছপালার জাবরকাটার চাইতে এ ববং ভালোই। কিন্তু তাবার আলোর যে অস্পষ্টতাকে বনের ছায়া ভেবেছিল আসলে সেটা ছিল মেঘেব ছায়া। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টি থেকে আশ্রয় পাওয়াব জন্য তারা খানিকটা সময় ছুটোছুটি কবল এবং তাবই ফলে পথ হারিয়ে ফেলল। বৃষ্টি থামল দু-তিন ঘণ্টা পরে, ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়েছে। এবং বনের পথে (তখনও গাছপালা থেকে টুপটুপ কবে জল ঝরছে) ঘুরে ঘুরে পরিচিত পথেব ধাবে কাছেও যেতে পারল না তারা। শীত, বৃষ্টির ফলে, অসহনীয় হয়ে উঠেছিল অন্ধকার, শহরবাসী এই দুটি প্রাণীর কাছে যা অজ্ঞাত জন্তুজানোয়াবেব হিংস্রতায পরিপূর্ণ, এবং ক্লান্তি যখন তাদেব সব বকমেই হতাশ করেছে হঠাৎ তারা একটা কুটির দেখতে পেযেছিল। কারণ হিসাবে এই বলা যায়, বড়গাছের বনের বাইরে ছোটছোট ঝোপঝাড়ের দিকে থাকবার চেষ্টা করেছিল তারা, এবং ছোট ছোট গলি যতই গন্তব্যে পৌঁছনোর লোভ দেখাক তারা বরং অজানা সুদীর্ঘ বড পথটা ধরেই চলেছিল।

কুটিবটার মেঝে মাটির, দেয়াল কাঠের। দেশলাই জ্বেলে পরে শুকনো ডালপালার যা হক একটা মশাল বানিয়ে ঘরটাকে পরীক্ষা করল তারা। ঘরের মেঝেতে ঘাস গজিয়েছে, দেয়ালের কাঠের ফাঁক দিয়ে বাতাস ঢুকছে, দরজাটা তাদের প্রথম ধাক্কাতেই নড়বড় করে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও এটাকে একটা আশ্রয় বলেই মনে হল।

এদিকে বৃষ্টি হয় নি। শুকনো ঘাস, কিছু ডালপালা সংগ্রহ করে আগুন জ্বালাল দ্বিজেন ঘরের মেঝেতে। সেই আলোয় দেখতে পেল দেয়ালের একদিকে দেয়ালের সঙ্গে আটকানো একটা ছোট কাঠের বাক্স। এরকম পরিস্থিতিতে আগুন যে মস্ত একটা সহায় তা মনে করে তারা যথেষ্ট ডালপালা সংগ্রহ করে আগুন জ্বালিয়ে রাখল। সেই বনের দারুণ শীতে একটিমাত্র কম্বলে নিজেদের দেহকে আবৃত করে সেই কাঠের বাক্সে রাতটা কাটালো তারা।

সকালের প্রথম আলোতে যখন তারা উঠে দাঁড়াল তখন বেলা বলল—কী আশ্চর্য! আলো দেখো।

দ্বিজেন বলল—অনেকদিন মনে থাকবে কিন্তু।

পায়ে পায়ে কিছুদূরে গিয়ে তারা রাত্রিতে অত শীত করার কারণটা খুঁজে পেল। কিছুদূরে একটা

বেশ বড় জলাশয়। আর কিছুদূরে গিয়ে তার আরও আশ্চর্য হওয়ার কারণ খুঁজে পেল। গত রাত্রিতে যেখানে এসে তারা কুটিরে আশ্রয় নিয়েছিল তার আধ মাইলের মধ্যেই শহরের প্রান্ত। তাদের কাছে অপরিচিত কিন্তু শহরের প্রান্ত সে বিষয়ে কোন ভুলই নেই।

ঠাণ্ডা লেগে গলাটা একটু কষ্ট দিচ্ছিলো বেলার। সেটা কমতেই দ্বিজেনই প্রস্তাব করল সেই কাঠের কুটিরে গিয়ে চড়াইভাতি করার এবং আর একটা রাত কাটানোর। বেলার গালে রং দেখা িল।

কিন্তু কয়েকদিন পবে দেখা গেল সত্যি তারা সেই কুটিরে গিয়েছে। দুপুরে কুটিবের বাইরে শুকনো ঘাসে ঢাকা জমিতে কম্বল বিছিযে শুয়ে আছে দ্বিজেন আব বেলা স্পিরিট ল্যাম্পে চা করছে কিছুদূরে একটা আসনে বসে।

শুয়ে থাকতে থাকতে দ্বিজেন ডাকল,—শোন, শোন, বেলা।

বেলা ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে গেল।

দ্বিজেন বলল—আমরা প্রায় এক মাস আরও আছি দেওগিরিতে। যে কদিন আছি বোজ এখানেই আসব। বলো তো রাতটাও এই ভাঙা কুটিরের কাটানোর ব্যবস্থা করে নেই। অন্তত আমাদের দুখানা কম্বল আর স্টোভ ইত্যাদি এ-ঘবে থাক। দরজায় একটা তালা ববং দিয়ে যাবো।

বেলা হেসে বলল—কিন্তু কুটিরটা যার—সে হয়তো এদিক থেকে শহবের প্রথম বাড়িটাব মালিকই—আপত্তি করতে পারে।

সেদিনই তারা আবিষ্কাব করল পৃথক পৃথক ভাবে। দ্বিজেন গিযেছিল জলাশয়ের দিকে। আর বেলা ইতস্তত।

দ্বিজেনই হঠাৎ চিৎকার করে ডাকল,—দেখো, দেখে যাও।

বেলা কুই কবে সাডা দিল।

কিন্তু দ্বিজেনকেই এগিয়ে আসতে হল।

ডেকে ডেকে বেলাব কুই শুনে শুনে দ্বিজেন এগিযে গিয়ে দেখল একটা হেলানো গাছের গায়ে হাত দিয়ে বেলা দাঁড়িয়ে আছে।

—কী?

—দেখো।

—এটা দেখছি কুল গাছ।

—তাই নয়? এদিকের এই বনটা কারো বাগান ছিল কোন সময়ে। ওদিকে অনেক আনারস গাছ দেখেছি।

বেলা লোভাতুরের মতো সেই হলুদ হয়ে আসা বড বড় কুলগুলোর দিকে চেয়ে রইল। বলল—গাছটা হেলানো দেখছো।

—তা দেখেছি।

আঁচলটা কোমরে জড়াল বেলা।

—পারবো?

—গাছে উঠে? দ্বিজেন হাসল। বয়স চল্লিশ হল।

—এখানে তো তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।

দ্বিজেন হেসে কিছু বলতে গেল কিন্তু তার আগেই বেলা হেলানো গুঁড়ি বেয়ে কিছুদূর উঠে গেল গাছটায়। প্রথম ডালটায় যে কয়টি কুল ছিল হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে নিল। তারপরই বয়সের দরুন হাত-পা শির শির করে উঠল। ভয়ে ভয়ে নেমে এল সে।

দ্বিজেন উজ্জ্বল চোখে দেখছিল। বেলা নামলে সে বলল, এবার আমার সঙ্গে এসো দেখো,

কি তোমাকে দেখাতে চাই।

পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল দ্বিজেন।

বেলা দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিল।

বলল—পদ্ম? আশ্চর্য!

দ্বিজেন হো হো করে হাসল, হাততালি দিল। আর বেলাব সেই পদ্মগুলো কলরব করে উঠল, চক্রাকারে আকাশে উঠে পড়ল, পাক খেয়ে খেয়ে আবার জলের দিকে নেমে এল।

—ওমা, হাঁস! এত! এতো শুধু বই-এ পড়া যায়।

সেই জলাশযে হাঁসের পাল নেমেছে।

এরপরে সেই কুটির যেন তাদের জাদু করল। সত্যি আর একটা রাত কাটাল তারা সেই কুটিরে, একই কম্বল গায়ে, নিজের দেহের উত্তাপে অন্যকে শীত থেকে আড়াল করে। এবং প্রায় প্রত্যেক দিনই তারা বেলা দশটা থেকে পাঁচটা কুটিরের কাছাকাছি অবণ্য আবিষ্কার করে বেড়াতে লাগল। শুধু দ্বিজেনের ভয় হতে লাগল একদিন যদি এসব আর ভালো না লাগে? কিম্বা কোন প্রতিবন্ধক দেখা দেয়।

ইতিমধ্যে দ্বিজেন এবং বেলা আবিষ্কার করেছে জলাশযটা কৃত্রিম। উপরের দিক থেকে যে ঝরনাটা বয়ে আসে তাব পথে এদিক ওদিক বাঁধ দিয়ে খানিকটা নিচু জাযগাকে প্লাবিত কবে এই জলাভূমিটাকে তৈবি কবা হযেছে। কোথাও হ্রদেব মতো জল, কোথাও হোগলা শরবনের মধ্যে শ্যাওলা-ঢাকা জলের চিহ্নমাত্র।

দ্বিজেন একদিন মন্তব্য কবল,—একেই স্বর্গ বলে, বেলা।

বেলা ছেলেমানুষেব মতো বলল—তা বলো। আমাব সেই কুলগুলো কিন্তু এতদিনে লাল টকটকে হয়ে পেকেছে।

দেখা গিযেছে স্বর্গে প্রতিবন্ধক এসে দেখা দেয়।

সেদিন তারা বনেব অন্যদিক দিযে তাদের প্রিয় এই কুটিরের দিকে অগ্রসর হয়েছিল বলেই পরে দেখতে পেযেছিল। কুটিরের সম্মুখে এসে তারা থমকে দাঁড়াল। কুটিরের ছাদ দিয়ে ধোঁযা উঠছে। আর কুটিবেব সম্মুখে একটা খাকি রঙের সুইস টেন্ট। স্তম্ভিত হযে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারা ফিরে যাবে কিনা ভাবছে এমন সময়ে দেখতে পেল তাঁবুব আড়ালে গাছটার নিচে একজন প্রৌঢ় বসে আছে। গায়ে তার সৈনিকের পোশাক, মুখের পাইপ থেকে অজস্র ধোঁয়া উঠছে, তার মাথাভরা লম্বা লম্বা চুলগুলো ধবধবে শাদা, কিন্তু তামাকেব ধোঁয়ায প্রকাণ্ড গোঁফগুলোতে পাটকিলে রং ধরেছে। কিন্তু স্বাস্থ্য ও চুলের রঙে বেশ বড় একটা পার্থক্য আছে।

বেলা বলল—মালিক নাকি?

দ্বিজেন বলল—আমাদের মতোই পথিকও হতে পারে।

দ্বিজেন সাহস করে এগোনোর আগে সৈনিকই তাদের দেখতে পেল এবং হাতের ইশারায় ডাকল।

এই ভাবেই আলাপ শুরু। সুইস টেন্ট থেকে চামড়া ঢাকা দুটো মোড়া এল। কুটির থেকে চা বিস্কিট এল। সাঁপুই দম্পতী জানতে পারল সৈনিক নিজেকে মেজর সিংহ বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসে। তার দুটো পা-ই হাঁটুর নিচে থেকে খোয়া গিয়েছে সেজন্যই বিশ্রামের সময়ে কম্বলে ঢাকা থাকে। এই জঙ্গল, জলা, কুটির, এবং দূরের ওই বাড়িটা তার। শীতকালে মাস দুয়েক এখানে থাকে সে। সুইস টেন্টেই বাস করতে ভালোবাসে শীত হলেও। দ্বিজেন যখন তাকে জানালো এ কুটিরে এবং কুটিরের কাছে তারা কিছুদিন ধরে সময় কাটাচ্ছে ভালো লাগে বলে, তখন মেজর সিংহ বলল সে এসেছে বলে যদি তারা না আসে তবে সে মর্মান্তিক দুঃখিত হবে।

যেখানে দুজন ছিল সেখানে তিনজন। আর তৃতীয় ব্যক্তি এমন যে দ্বিতীয়দিনের শেষে সাঁপুই

দম্পতি চিন্তা করল এতদিনে তাদের একটা অভাববোধ পূর্ণ হল। যে অভাববোধটা থাকা এখন সঙ্গত বোধ হচ্ছে। কারণ মানুষকে এত সুখী আর কখনও যেন দেখা যায়নি, অথচ তার সুখেব উপকরণ চা, তার তামাকের কৌটা আর পাইপ আর সুইস টেন্ট। বন্ধুবান্ধব, সন্তানসন্ততি নেই, আত্মীয়স্বজন থাকলেও অনুপস্থিত, বৃদ্ধ জাঠ-চাকব ভবসা এমন একজন খঞ্জ—অথচ গোঁফে চারা দিয়ে পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে, কোঁচকানো কোণ চোখদুটিতে হাসিভরা।

তৃতীযদিনে বেলা মেজর সিংহের কাছ থেকে আদায় করে ফেলল ইতালিব কোন যুদ্ধে তার দেড়খানা পা উড়ে গিয়েছিল আর ভূমধ্যসাগবের কোন জাহাজে আধখানা পা কেটে দিয়ে ডাক্তাররা তাকে দুপায়ে খোঁড়া বানিয়েছে।

সেদিন বাসায় ফিরতে বেলা বলল—ছুটি কিছু বাড়িয়ে নিলে হয় না।

—এখনও একমাস আছে। ভালোই লাগছে কিন্তু। হাসিমুখে বলল দ্বিজেন।

প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তিনদিন যায়নি সাঁপুই দম্পতী।

সেদিন অন্যান্য দিনের চাইতে আগে গিয়ে তারা একটু অবাক হল। তাঁবুটা আছে কিন্তু মেজব সিংহ আর তার চেযার অনুপস্থিত, এমনকি কুটিরে তার চাকরও নেই। অনেকক্ষণ তারা অপেক্ষা করল। অবশেষে চাকর এসে তাদের দেখতে পেয়ে খবর দিল মেজর ঝর্ণাটার উজানে আছেন। ঝর্ণা ধরে প্রায় আধমাইল গিয়ে মেজর সিংহের দেখা পেল তারা। চেয়ারটায় আজ চাকা লাগানো, কিম্বা এটা আর একটা চাকা লাগানো চেয়ার, তার উপরে মেজর হুইল বঁড়সি নিয়ে বসে আছে। এমন অদ্ভুতভাবে স্তব্ধভঙ্গি তার যেন মনে হচ্ছে জীবন্ত মানুষ নয়।

মেজর সিংহ হেসে বলল—মাছ আমার হাতে ধবা পড়ে না। এই একটা ব্যাপারেই আমি ভাগ্যকে মানি।

বেলা বলল—তা হলে বৃথা চেষ্টা কেন?

মেজর বলল—এমন ঠাণ্ডা বিষয় আর নেই।

সেদিন বেলা তাব কাছে আদায় কবল আব একটা গল্প—কি কবে একরাতে মানুষের সব চুল সাদা হয়ে যেতে পাবে। শেষ মুহূর্তে মৃত্যুব হাতও মানুষ এড়াতে পারে যদিও তা কদাচিৎ ঘটে।

একটা দিনকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করে তুলল বেলা। মেজর সিংহকে সে রেঁধে খাওয়াবে এই প্রস্তাবে সে তাকে রাজি করল। কুটিবে সে গেল রান্নার উদ্যোগ করতে আর তখন দ্বিজেন বসল শিকারের গল্প শুনতে।

মেজরের কাছে সেদিন জানা গেল মাঝে মাঝে তাব চাকর পাখি শিকাব করে। হরিণও পাওয়া যায় জঙ্গলে।

এর পরে দ্বিজেন, যে বন্দুক কোনদিন হাতে করেনি, সেও মেজর সিংহের চাকরকে সঙ্গে করে শিকারে যেতে লাগল। কোনদিন হাঁস, কোনদিন হরিতাল, বেশীর ভাগ দিনই হাঁস শিকাব করতো মেজরের চাকর। প্রথম যেদিন দ্বিজেন একটা হাঁসকে বন্দুকে বিঁধলো সেদিন তার দাম্ভিক বলে বোধ হল।

সেদিন রাত্রিতে নিজেদের বাসায় ফিরে বেলা বলল—কিছুই বাদ দেবে না?

দ্বিজেন হাসিমুখে বলল—কোলকাতায় কেউ বিশ্বাস করবে? একটু থেমে বলল, আবার, আয়নায় ইদানীং নিজের মুখ দেখেছো? বয়স পনেরো বছর কমে গেছে।

একদিন দ্বিজেনকে লজ্জায় পড়তে হল। মেজর সিংহ বলল—দ্বিজেনবাবু আমাদের কথা ভুলে যাচ্ছেন।

মেজর সিংহ হাসতে হাসতে বলেছিল কথাটা, কিন্তু দ্বিজেন নিজেই স্মরণ করল গত একটা সপ্তাহ সে এসে দশ মিনিটও দাঁড়ায়নি বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে চাকরকে সঙ্গে করে। ফিরতে

দু-একদিন বেলা শেষ হয়ে গিয়েছে।

দ্বিজেন বলল—আজ আর যাচ্ছিনে।

—ভারি লজ্জায় পড়বো যদি না যান। বলল মেজর সিংহ।

কিন্তু দ্বিজেন সেদিন প্রথম দিনের মতো মোড়া চেপে বসল।

ঘরোয়া কথা হল। মেজর জানতে পারল সাঁপুই দম্পতীর সন্তানসন্ততি নেই।

সে বলল—বোধ হয় দু-একটি থাকা ভালো। লোকে তাই বলে।

বেলার গালে লজ্জার চিহ্ন দেখা দিল যখন সৈনিকজনোচিত খোলাখুলিভাবে মেজর বলল—এখনও সময় যায়নি।

মেজর সেদিন বলল আলাপের এক জায়গায় কথার পিঠে ঃ বাঁচাটা এত ভালো পৃথিবী এত ভালো যে কল্পনাও করতে পারা যায় না। আর পৃথিবীটা এখন ক্রমেই ভালো হয়ে উঠছে। যুদ্ধ হবে না আর এই পৃথিবীতে। যুদ্ধ করার মতো লোভী দস্যু আব নীতি-অন্ধ গোঁড়া বদমাস দু-চার জাত আছে বটে কিন্তু সমাজে তাদের স্থান নেই।

সে যখন কথা বলছিল তখন একটা স্নিগ্ধতাও যেন চারিদিকে দেখা দিল। শুকনো বাদামী ঘাস থেকে একটা যেন সুগন্ধ উঠছে। ওদিকে কয়েকটা পাখি হঠাৎ কী একটা মৃদু আনন্দে খুশি হযে ডেকে উঠল।

দ্বিজেন এবং বেলার সেদিন বাড়িতে ফিরে মনে হল তারা যেন এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে।

কিন্তু ছুটি একদিন শেষ হল এবং কলকাতার গাড়িতে উঠে বসল তারা। শুরুতেই ভিড। ‘বসবার জায়গা পাওযা গেল এই ভাগ্য।

কিন্তু দ্বিজেন হাসল, ঠেলাঠেলি কবে মালপত্র আর বেলাকে নিয়ে যে দু-মিনিটে উঠতে পাবে সে, যেন একটা খেলায় জিতেছে—এমন খুশি হয়ে উঠল।

বেলা বলল—এবাবও রাত জাগতে হবে।

দ্বিজেন হাসিমুখেই বলল—বাড়ি গিয়ে ঘুমাবো। একরাত বইতো নয়।

একটু পরে সে বলল—সেই বৃষ্টির বাতে কুটিরে মনে আছে।

গাড়ি ছাড়তে দ্বিজেন বলল—ওই যা ভুল হয়ে গেল।

—কী?

—মেজর সিংহের ঠিকানাটা আনা হয় নি।

—আমি এনেছি। কেয়ার অব পোস্টমাস্টার, দেওগিবি লিখলেই পাবেন।

—বাস্তবিক তোমার এত বুদ্ধি।

অফিসের এবং স্কুলের লোকরা স্বীকার করল চেঞ্জটা সত্যি কাজের হয়েছে। দুধ-মাছ সস্তা বুঝি! সাঁপুই দম্পতী তাই বলল তাদের। কিন্তু মেজর সিংহের কথা অথবা সেই সুইস টেন্ট এবং কুটিরের কথা তারা কাউকে বলল না।

দ্বিজেন বলল—তুমিও বলো নি?

—না। আমাদের মনে থাক।

—এ বিষয়ে আমরা কৃপণ।

কিম্বা সঞ্চয়ী বলো। এই বলে হাসল বেলা।

তারা যেন নতুন মানুষ হয়েছে।

দ্বিজেন বলল—পৃথিবীটা সত্যি ভালো, স্বর্গই বলা যেতে পারে।

সময় যেন লঘুপক্ষ পারাবত, তাব পাখার কম্পনই দিনরাত্রি। স্বর্গ থেকে এসেছে তারা সঙ্গে

এনেছে মন্দারের মালা। তার সুগন্ধ পেল তারা। স্বামী-স্ত্রীর সংসার। স্ত্রীর চালচলনে পরিবর্তন স্বামীর চোখে ধরা পড়ে তা সামান্য হলেও।

দ্বিজেন খানিকটা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতেই বলল—কী হল, বলো তো? ব্যাপার কী?

বেলা লজ্জায় মুখ রাঙা করে মুখ নামাল।

দ্বিজেনের মনে হল সুখে তার দমবন্ধ হয়ে যাবে।

দু-একদিন পবে দ্বিজেন বলল—ক্লিনিকে যেতে হয়।

—আর দুদিন যাক।

কিন্তু আরও একমাস পরে তারা ক্লিনিকের মতামত নেয়াই উচিত বোধ করল। কারণ বেলার বয়স হয়েছে।

শনিবারের দুপুরে তারা ক্লিনিকে যাবে স্থির করেছিল। বেলা ট্যাক্সিতে গিয়ে বসেছে, দ্বিজেন ড্রাইভারকে পথ বাতলে দিচ্ছে যদিও তার দরকার থাকে না কলকাতার ট্যাক্সিচালকদেব কাছে, এমন সময়ে পোস্ট অফিসের পিওনকে দেখা গেল।

—কি?

—রেজিস্টাবি আছে।

—সই করে চিঠি নিল দ্বিজেন। ট্যাক্সিতে উঠে বসল।

খামটা লম্বা মোটা কাগজের।

—আরে এ যে দেখছি মেজর সিংহের কাছে থেকে আসছে। দ্বিজেন বিস্মিত হল।

—কই দেখি দেখি। বেলা বলল।

—দাঁড়াও, খুলি খাম।

—তুমি তাঁকে চিঠি দিযেছিলে তা তো বলো নি। এ কথাও লিখেছিলে নাকি।

—নিশ্চয়। খাম খুলে মোটা কাগজে লেখা চিঠিটা বার করল দ্বিজেন।

বিস্ময়ে সে প্রায় চিৎকার করে উঠল। 'আরে, এ কী! কী অদ্ভুত।'

চিঠিটাতে জড়ানো একটা এনুয়িটি পলিসিও ছিল। চিঠিতে দু-চার লাইনে যা লেখা আছে সাঁপুই দম্পতীর সন্তানের শিক্ষার জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকাব একটা এনুয়িটি পলিসি দিতে পেরে মেজর সিংহ নিজেকে সার্থক মনে করছে।

দ্বিজেন বলতে গেল এই তো স্বর্গ। কিন্তু তার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেল। মনের এই গভীর কালো খাদের মধ্যে পড়ে যেতে যেতে সে ভাবল—এই অপরিসীম বদান্যতা কি অকারণ? তার মনের কালো ট্যাক্সির চারিদিকে কোলকাতার গলিগুলোকেও আবৃত করে দিতে লাগল।

বেলা সিটের পিঠে মাথা রেখে নিঃশব্দে বসে রইল।

একটি খামারের গল্প

জাফরুল্লা ব্যাপারীব খামারে এখন সকাল হচ্ছে। তাব উঁচু ডারিঘবের ছাদের ওদিকে যদি আকাশে এখনও কোন রং থাকে তবে এদিক থেকে তা দেখা যাচ্ছে না। এদিকে বড়জোব একফালি মরচে ধবা মেঘ দেখা যাচ্ছে।

আসফাফ উঁকিঝুঁকি দিয়ে বলদগুলোর পিঠের উপব দিয়ে দিনের আলোর খোঁজ করছিল। আলো দেখতেই সে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল যেন ঘুম থেকে। তার এ চেষ্টা ব্যর্থ হল কাবণ কেউ দেখল না, ছমির পর্যন্ত ধাবে কাছে ছিল না। আসলে সে আদৌ ঘুমোয় নি, এবং তার রাত্রির আশ্রয় এই বলদদের ঘরে সে ভোর ভোর সময়ে এসে ঢুকেছে।

এই বড় চালা ঘরটার জাফরুল্লার ছ' জোড়া বলদ থাকে। তাব একপাশে এক মাচায় ঘুমোয় আসফাক। তাকে উঠতে দেখে বলদগুলোও উঠে দাঁড়াল। রাত্রির জড়তা কাটিয়ে তারা মলমূত্র ত্যাগ করল। বাষ্পে যেন ঘরটা ভরে গেল। আর তার মধ্যে দিয়ে মুখ বার কবল আসফাক। বছর ত্রিশেক বয়স হবে তার। রোগা লম্বাটে চেহারা। চোখ দুটো এত ভাসাভাসা যে মনে হয় ঠেলে বেরিয়ে আসছে। চিবুকে গোটা দশ পনেরো চুল তার দাড়ির কাজ করছে।

আসফাক যেন অবাক হয়েই চারিদিকে চাইতে লাগল। ডাবিঘরের একটা জানলা খোলা। তাব সামনে ধান মাড়াই-এর ঘাস-চাঁছা মাটি, যার বাঁদিকে ধানের মবাই আর ডানদিকে বলদদের ঘর যে ঘরে আসফাক শোয়। ধানের মরাই-এর পিছনে খড়েব মঠ আকাশেব গায়ে ঠেকেছে। মঠেব মাথায় শিমুল গাছের ডাল। তার উপরে একটা পাখি বসে আছে। অত উঁচুতে পাখিটাকে ছোট দেখাচ্ছে। তাদের দেশে এমন সব মাঠের মাঝখানে থাকে বাঁশ। এখানে শিমুল গাছটা বাড়ছে, মঠও উঁচু হচ্ছে। ধান মাড়াই-এর মাটির যে দিকে ডারিঘর তাব বিপরীত দিকে টিনের দেয়ালের সেই ঘর যার একপাশে তামাকের গুদাম, অন্যপাশে জাফরুল্লার প্রকাণ্ড সেই সিন্দুক খাট। এই খাটেই থাকে জাফরুল্লা। বিস্মিতের মতো দেখতে লাগল আসফাক। অথচ এমন পরিচিতই বা কী তার— সাত বছর হল, দশ হতে তিন বাদ।

এমন সময়ে কে যেন খুক করে কাশল। আসফাক চমকে উঠে কাছিম যেমন খোলায় গলা ঢুকিয়ে নেয় তেমনি করে সরে গেল দরজা থেকে। জাফরুল্লার টিনের দেয়ালের শোয়ার ঘরের দিকে চাইল। না সেদিকে কোন জানালা খোলে নি। বরং ছমিরই আসছে।

তখন তার মনে পড়ল এতক্ষণ সারারাত ঘুমিয়ে এই মাত্র ওঠার যে অভিনয় করার চেষ্টা করছিল সে তার কোনো মানে হয় না। কারণ ছমির দেখেছে তাকে ফিরে আসতে। সে যতই চেষ্টা করুক ছমিরের নিশ্চয়ই মনে থাকবে আসফাক সন্ধ্যায় না ফিরে রাত শেষ করে ফিরেছে।

ভোর ভোর রাতেব সেই দৃশ্যটা মনে পড়ল তার।

ডারিঘর পর্যন্ত এসে সে তখন থমকে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণ সে কোন সাহসে এগিয়েছে তা যেন খুঁজেই পেল না। অন্ধকার ছিল বলেই বোধ হয় সাহস।

এগোবে, না পিছবে ভাবছে সে এমন সময়ে একজন বেরিয়ে এল অন্দরের দিক থেকে হাতে পাটকাঠির মশাল।

আসফাক এগিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

'কে?'

'আসফাক।'

'আসফাক?'

'জে।'

'জে না। আমি ছমির। আসলা?'

একটা অবসন্নতায় তার শরীর ঝিমঝিম করে উঠেছিল। টলতে টলতেই যেন সে বলদদের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ছমির ডারিঘরের ভিতরের দিকের বারান্দায় তামাক সাজতে বসল। কী করবে এখন আসফাক? রোজ সকালে যেমন বলদগুলোকে খুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে তেমন কিছু করবে!

এতে আর সন্দেহ নেই যে এবারেও ব্যাপারটা বোকামিই হয়ে গিয়েছে। অথচ তখন সেটাকেই একবার ঠিক কিছু বলে মনে হয়েছিল।

আর এ সবের জন্য সে হ..কমবাবুই দায়ী। সরকারি-কর্মচারী। রাজ বদলেছে। গল্পে শোনা রানীর আমল তো আর ফেরেনি। তাই বলে সরকারি কর্মচাবীরা তো আর বদলায় না। বিশেষ করে তার হাকিমের মতো পোশাক। টুপি পর্যন্ত ছিল।

সেই হাকিমই দায়ী কিন্তু, এই স্থির করল আসফাক। জাফরুল্লা ব্যাপারীর দ্বারীঘরে সে বসেছিল দপ্তর বিছিয়ে। গ্রামেব অনেক লোকই গিয়েছিল তার সঙ্গে দরবার করতে। দুদিন ধরেই চলছে। অন্তত তাই ধারণা হয়েছিল আসফাকের। তাদের অনেকের অনেক অভিযোগ কর্মচারীটি শুনেছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে কাগজেও টুকে নিচ্ছিল। আর এসবই শুনতে পেয়েছিল আসফাক সেই ঘরের দাওয়ায় বসে তামাকের গুঁড়োয় গুড় মিশিয়ে ছিলিমের উপযুক্ত তামাক বানাতে বানাতে। তারপর অবশেষে জাফব খেতে গেল। এমন কি তার অন্য চাকররাও। তখন এদিক ওদিক চেয়ে আসফাক হাকিমেব সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার পরনে নেংটি। হাত দুখানা চিটে গুড় আর তামাকের গুঁড়োয় কালো।

হাকিম বলেছিল, 'কী চাও?'

'জে।' আসফাক ঘরের আসবাব পর্যবেক্ষণ করল যেন।

'কী দরকার তাই জিজ্ঞাসা করলাম।'

'জে।'

আসফাক বলাব মতো কিছু খুঁজে পেল না।

হাকিম উঠে দাঁড়াল। তার তখন বিশ্রামের সময়। সেই ঘরেই তার বিছানা পাতা। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এদিকে দশখানা গাঁযের মধ্যে জাফর ব্যাপারীর মতো ধনী কেউ নেই, লোকে অবশ্য বলে অমন মেহেদি রাঙান দাড়িও না, শহরের হাকিমরা এলে জাফর ব্যাপারীর এ দ্বারীঘরেই থাকে। টিনের ছাদ কাঠের দেয়াল। যেন ডাক বাংলোর মতোই সাজানে।

হাকিম চেয়ারে শুয়ে সিগারেট ধরাল। কিছুক্ষণ ধোঁয়া ছাড়ল। যেন ঘরে আর কেউই নেই। তারপর পাশ ফিরে যেন আসফাককে দেখতে পেল।

'কী যাও নি? এখানেই চাকরি কর?'

'জে।'

'কতটাকা পাও?'

'তিন টাকা।'

'বলো কী! খেতে পরতে দেয়?'

'জে।'

'তিন টাকা।' হাকিম হাসল। 'বলি মাইনা টাইনা পাচ্ছ তো?'

'না।'

'না?'

'জে।'

হাকিম আবাব হাসল। 'কতদিন পাও না?'

'দশ সাল।'

হাকিম হো হো করে হেসে উঠল। এই অদ্ভুত কথা শুনে এবং আসফাককে দেখে তাব খুব মজা লেগেছে সন্দেহ নেই। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কার চাকর? জাফর ব্যাপাবীর?'

আসফাকের মুখে তখন হাসি ফুটে উঠেছে। সে নিজের বুদ্ধিমত্তায় আশ্চর্যও কম হয়নি। সে ভেবে উঠতেই পারল না এমন নালিশ সে কি করে সাজিয়ে গুছিয়ে করতে পারল। কারণ হাকিমের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কতটুকু উচ্চারণ করেছিল আর কতটুকু চিন্তা করেছিল সে হিসেব করার চাইতে অনেক উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল সে তখন। বরং যা উচ্চারণ করেনি সে কথাগুলোকেই স্পষ্ট কবে বলেছে এমন অনুভব করছিল সে তখন। নতুবা তিনটাকা মাইনা দশ বছর না পাওয়াটা কথা নয়। বরং শুধু সেটা বললে মিথ্যা নালিশ হযে যাবে। মাইনা বন্ধ আছে হয়তো তিন সাল এবং তা আসফাফ চায়নি বলেই। নালিশ হল অব্যক্ত মনের কথা, অনেক কথা। প্রথম এসে দশ বিঘা জমি পেয়েছিল সে চাষ করতে। কিন্তু সে জমিতে খোরাকির ধান ফলাতে পারতো না। সে জমি কি ধান ফলানোর? জাফরুল্লাকে বখরা দেওয়ার পর যা থাকতো তাতে ছ মাসের খোরাক হত। বাকি ছ মাসের ধান সে ধার নিতো আর ধান উঠলে ন' মণ দিয়ে ধার শোধ করতো। কিন্তু ন' মণ দিলে ছ' মাসের খোরাকও থাকে না। ডাঙা জমি। জমির বিরুদ্ধেও নালিশ করেছে সে মনে মনে। তারপর একদিন জাফরুল্লা তার খাওয়া পরার ভার নিল। কেমন যেন কিসের একটা টানে টানে সেখানে পৌঁছালো আসফাক। আর খাওয়া পরা ছাড়া তিনটাকা মাস মাইনার কথা নিজেই প্রস্তাব কবেছিল সে। হাকিমকে কি এসব কথাও সাজিয়ে গুছিয়ে সে বলেনি!

হাকিমের সম্মুখ থেকে চলে আসতে আসতে আসফাফ নিজেকে অদ্ভুত রকমে ভারমুক্ত মনে করল। এসব নালিশ শুনলে গ্রামেব লোকে ঠাট্টা করতে পাবে। অবশ্য গত দশ বছরে কি একবারও সে নালিশ করেছে? হাকিমও হেসেছে বলতে পারো। তা হলেও—

কি অদ্ভুত কাণ্ড! দুপুরে আসফাক সেদিন খেতেই পারল না। তারও আগে ঝোরায় স্নান করতে গিযে উত্তেজনায় যেন তার দম বন্ধ হয়ে এসেছিল। স্নান কবে ভিজে গায়েই খানিকটা সময় সে ঝোরার পার ধরে দুপুর-রোদ মাথায় ঘুরে বেড়াল। অদ্ভুত একটা শক্ত কাজ করে বসেছে। তার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠেছিল তখন। হাকিমকে কিনা সব বলে দিয়েছে।

কিন্তু হঠাৎ তার গা ছমছম করে উঠেছিল। হাকিম সাহেব কি ব্যাপারীকে সব বলে দেবে? এতক্ষণ বলেও দিয়েছে হয়তো। তা হলে?

প্রায় বিকেল হলে আসফাক ফিরেছিল ব্যাপারীর বাড়িতে সেদিন। তখন আগুই ধান মাড়াই করছে ব্যাপারীর অন্য চাকররা দ্বারীঘরের সামনের চত্বরে। তারা যেন আসফাককে দেখেও দেখতে পেল না। আসফাক এদিক ওদিক চেয়ে ব্যাপারীকে খুঁজল। তাকেও দেখতে পেল না। একথা সব চাকরই জানে যে আসফাক বিকেলে যদি কিছু কাজ করে তবে তা জাফরুল্লার তামাক সাজা আর দড়ি পাকানো। তখন চাকররাও ছিলিম পেয়ে থাকে তার কাছে চাইলে। কিন্তু সেদিন যেন কেউ তা চাইছে না। চারিদিক থম থম করছে। বাতাসও চলছে না। খড়ের উপরে বলদগুলো চলছে তারই শব্দ কানে আসছে। আর মাথার উপরে মশা ওড়ার শব্দ।

এমন সময়ে মুন্নাফ বেরিয়ে এসেছিল অন্দর থেকে। মুন্নাফকে কে না চেনে এ গের্দে? জাফরুল্লা

ব্যাপারীর একমাত্র ছেলে। তার চার নম্বর বিবির দরুন চার বিবির ওই এক সন্তান।

সে এসে খুঁজল এদিক ওদিক চেয়ে। তারপর আসফাককে দেখে তার দিকে এগিয়ে এল। আর তখন দু পা পিছিয়ে সরে পড়ার চেষ্টা করেছিল আসফাক।

'এই যে মিঞা সাহেব, শোন। আব্বাজানের ওষুধ ফুরায়ে গিছে সলসলাবাড়ি যাওয়া লাগে।'

আসফাক ধীরে ধীরে বলেছিল, 'সল্লাবাড়ি?'

'হ্যাঁ, পিরহান পরে আসো।'

আসফাক সেই বলদদের ঘরে গিয়ে দেওয়ালে গোঁজা জামাটা ঝেড়েঝুড়ে গাযে দিয়ে এসেছিল। আর মুন্নাফ তাকে খুচরোয় আর নোটে মিলিয়ে আটদশটা টাকা এনে দিয়েছিল আর একখানা কাগজ। সলসলাবাড়িব দোকানটাও চেনা। কাগজ দেখালেই ওষুধ দেবে।

আসফাক হাঁটতে শুরু কবেছিল।

ব্যাপাবীর বাড়ি থেকে বেরিযে খানিকটা পথ খুব তাড়াতাড়ি এসেছিল আসফাক। ওষুধ যা কিনা মানুষের চূড়ান্ত বিপদেব সময় লাগে। ব্যাপারীর বয়স হয়েছে, তিন কুড়ির কম নয়। আজকাল কঠিন কঠিন অসুখ হয়। কযেকমাস আগেই একবার শহর থেকে ডাক্তার এসেছিল। যাওয়া আসার মোটর ভাড়া দুশ টাকা নিয়ে গিয়েছিল ডাক্তার। তা এমনটাই মানায় জাফবকে। এখনও আটশ বিঘা জমি তাব—তার পাঁচশ বিঘাই একলপ্তে শালমারির বনেব সীমা পর্যন্ত।

আসফাফ তাড়াতাড়ি হাঁটতে সুরু করেছিল কিন্তু সলসলাবাড়ি যখন কাছে এসে পড়েছে পথেব উপরে হঠাৎ সে থেমে দাঁড়াল। অভ্যাস মতো কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করার দিকে মন চলে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা অস্বস্তির মতো কিছু মনে দেখা দিল। কিছু ভুলে গেলে যেমন হয়। তারপর সেই অস্বস্তিটাই যেন উষ্ণ হয়ে উঠল। আর আসফাকের মনে পড়ল হাকিম ঘটিত ব্যাপারটা। আজ যা সে করে ফেলেছে তার তুলনা তার নিজের জীবনে নেই। কিন্তু ঠিক সে কথাই নয়। অন্য কারও কিছু যা আরও উষ্ণ। এই চিন্তাগুলোই যেন তার গতিকে শ্লথ কবে দিল। যেখানে সে তখন পৌঁছেছিল সেখান থেকে দুটো পথে সলসলাবাড়ি যাওয়া যায়। একটা পথ সোজা গিয়ে উঠেছে হাটখোলায় যেখানে ওষুধের দোকান। অন্যটা সলসলাবাড়ির পশ্চিমে গিয়ে উঠেছে। প্রথমটি আলের পথ দ্বিতীয়টি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের। আসফাক নিজেকে যুক্তি দিয়েছিল—পথ তো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের, আলের পথ তো গ্রামেব লোকের মনগড়া কিছু। ও পথেই যেতে হবে এমন কোন কথা নেই। সেবার যে ডাক্তার এসেছিল সেও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পথে।

আসফাকের মনে হল একবার একটু জিরিয়ে নিলে হয়। ওষুধ আনতে বলেছে তাই কি মানুষ জিরোবে না। প্রায় পাঁচ মাইল পথ সে হেঁটে এসেছে। আলের পথে তিন মাইল হত হয়তো। জিরিয়ে নিতে তখন সে একটা গাছতলায় বসেছিল। সলসলাবাড়ির বন্দরে যখন সে ঢুকল তারপরে তখন সন্ধ্যা পার হয়েছে। এরকম সময়ে তার মনে একটা কথা উঠল · দেরি হয়ে যাচ্ছে না? ওষুধ আনার ব্যাপার তো। আসফাক এই কথাটা শুনেই ওষুধেব দোকানের দিকে না গিয়ে অন্য এক দোকানের সামনে বসে পড়েছিল। সেখানে বসেও অনেক দেরি করে ফেলেছিল। আর দেবি করতে পারার আনন্দেই খুঁত খুঁত করে হেসেছিল সে।

আসফাক দেরি করে ফেলেছে। কাজের ভার নিয়ে এমন দেরি করতে পারে সে—এ তার সম্বন্ধে কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু এটা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। ফিরেই তো এসেছে সে। এরকম বোকামি তার নতুনও নয়।

সেই সেবারের কথা। ব্যাপারটা ঘটবে আগেই জানা ছিল। অনেকেই বলেছিল তাকে। সংসারে থাকার মধ্যে ছিল তার বাবা আর মা। মার বয়স অনেক হয়েছিল। চুলগুলো ছিল শণের নুড়ি, আর চোখেও সে ঝাপসা দেখতো। কাজেই তার মৃত্যু ঘটার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন।

কিন্তু তার বাবা যোয়ানই ছিল বলতে হবে। চুলও পাকেনি। অথচ মায়ের মৃত্যুর দু চার সপ্তাহের মধ্যেই তারও মৃত্যু হল। তখনই বুঝতে পারা গিয়েছিল অঘটন কিছু ঘটবেই। বাড়ি বলতে একখানা চৌরী খড়ের ঘর যার বারান্দায় রান্না হত ; অন্য আর একখানা ঘর ছিল যার বেড়া ছিল ফাটানো বাঁশের, আর ছাদ ছিল খড়ের চালা। এই ঘরে একটা নড়বড়ে মই, একটা লাঙ্গল থাকতো এক কোণে। কিছু দড়িদড়া থাকতো। অন্যদিকে থাকতো একটি বুড়ো বলদ যার পিঠে একটা পাকাপোক্ত রকমের ঘা হয়েছিল। ছবিঘা জমি চষতো আসফাকের বাবা। জমির মালিক বুধাই রায়। বাবার মৃত্যুর পরই আসফাক শুনতে পাচ্ছিল এবাব নতুন আধিয়াব আসবে। এই ছ বিঘা জমিতে সে সোনা ফলাবে। ও আব আসফাকেব কর্ম নয়। কি বলিস আসফাক? আসফাক হেসে বলতো—হেঁ। আসফাক নিজেই জানতো সে বোকা। লোকের মুখে শুনে শুনে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহের কারণই দেখতে পেতো না সে। কাজেই খড়ের ওই চৌরীখানা যে ছাড়তে হবে এ বিষয়েও সে নিঃসন্দেহ ছিল। কিন্তু এত সব জেনেও কি হল। সেই সকালে নতুন চাষী যখন বাড়ি দখল নিতে এল তখন কাব কাছে দখল নেবে তা খুঁজে পেল না। কারণ গোয়ালঘরের চালার নিচে পাট তামাক রাখার জন্য আসফাকের বাবা যে বাঁশের টোং মাচা বেঁধেছিল সেখানে লুকিয়ে আসফাক তখন ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। গরমে যত ঘামছে তার চাইতে ভয়েই বেশী। চোখ বন্ধ করে সে সেখানে পড়েছিল একটা দিন একটা রাত্রি। অথচ কী ছিল ভয়ের? নতুন বর্গাদাব তো আদালতেব পেয়াদা নয়, পুলিসও নয়।

আসফাক এখন চাবিদিকে চেয়ে চেযে দেখল। এটাই তার বোগ ঃ পরে সে ঠিক বুঝতে পাবে, কিন্তু যখন বোঝা দরকার তখন যেন সব গুলিযে যায়। সে লোকের মুখেও শুনেছে যেটা আগে হওয়া দরকার সেটা তার বেলায় সময পার করে দিয়ে—যেমন কথা বলতে শেখা।

এখন ছমিরের মনোভাবটা বোঝা দরকার। ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে তার এই দেবি কবাব ফলে তা কিছুটা বোঝা যাবে। সে ছমিরের দিকে এগোতে যাচ্ছিল। পিছিয়ে আসতে হল তাকে, কে যেন জাফরুল্লার ঘরেব জানালাটা খুলছে। জানালাটা খুলল কিন্তু কিছুই ঘটল না।

এমন বিস্ময় কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, এই কিছু না ঘটা। আসফাক এবার সত্যি বিস্মিত হল। এতক্ষণেও এটা তার নজরে পড়ে নি! এর মধ্যে জাফরুল্লার দু ছিলিম তামাক পুড়ে যায়। আসফাককেই দিতে হয় ঠিক করে। সে না থাকলে ছমির দিতে পারতো। কিন্তু দেখো ছিলিম ধরিয়ে নিজেই টানছে ছমির।

তাহলে? তা হলে কি ব্যারামের মুখে ওষুধ না পেয়ে জাফরুল্লা—(বাক্যটা চিন্তাতেও শেষ করতে পারল না সে।) স্তম্ভিত আসফাক চিবুকে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল তার দেরি করার এই ফল দেখে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সে ছমিরের দিকে।

মৃদু স্বরে সে বলল, 'তা, ছমির, ব্যাপারী—?'

'ব্যাপারী শহরে, মুন্নাফও।'

জমির ছিলিমে সুখটান দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চলেও গেল।

আসফাক বসে পড়ল। অবসন্নতায় শরীর যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। রাত্রিতে ঘুম হয়নি। কাল দুপুর থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। আর ভয়—যা এইমাত্র একটা চূড়ান্ত একটা ধাক্কা দিয়েছে তাকে।

কিন্তু এটার একটা ভালো দিকও আছে। খানিকটা সময় পাওয়া গেল। বসে থাকতে থাকতে বুদ্ধি এল আসফাকের মাথায়। বুদ্ধিটাকে আর একটু পাকা করে নেয়ার জন্য নতুন করে ছিলিম ধরিয়ে নিল সে। অবশেষে স্থির করল—ছমির বা অন্য কোন চাকর হয়তো এখনও ব্যাপারটা সবটুকু বোঝেনি। সময় মতো ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে এটা কৈফিয়ত হিসেবে দাঁড় করানো যায় কি

না দেখতে হবে। দেরি হয়নি ফিরতে, ঘুমই দায়ী।

রোজকার মতো কাজ সুরু করল সে। সেটাই কৌশল হিসাবে ভালো হবে। বলদগুলোকে ছেড়ে দিল। অন্যান্য দিনের মতো হেইহাই করে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল। না তাড়ালে খড়ের মঠে মুখ দেবে।

খামার থেকে কিছু দূরে এক চিলতে বন আছে। এক চিলতে বনই বটে, ত্রিশ চল্লিশটা শাল গাছ। এই বনের পাশ দিয়ে নদী। নদীর ওপারে কাশের ঝোপ একেবারে জলের ধার ঘেঁষে। নদীতে এক হাঁটু জল। এপার থেকে ঢিল ছুঁড়লে ওপাবে গিয়ে পড়ে। কিন্তু স্রোত আছে। জলটাও ঘোলা। এই নদীর জল সব জায়গাতে এক রকম নয়। সলসলাবাড়ির পশ্চিমে এর জল স্বচ্ছ। পাথরের কুচি মিশানো বালির খাত—অনেকটা চওড়া কিন্তু শুকনো। তার উপর দিয়ে অনেকগুলো ধারায় তিবতিব্ করে বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে আছে আসফাক সেখান থেকে সিকি মাইল গেলে ব্যাপারীর দহ—জাফরুল্লার নাম থেকেই নাম। সেখানে জলটা বেশ গভীর। জলের রঙও প্রায় নীল। আর তার পাশেই জাফরুল্লার খামার বাড়ি। নদী সম্বন্ধে এই দার্শনিক আলোচনা কবে আসফাক আবাব খামারেব দিকে ফিরে গেল।

তার তখন মনে হল—যাই হোক, ছমির কী ভাবছে তা এখনও বোঝা যায়নি। এবং এটা মনে হতেই তাব মুখটা বিষণ্ন হয়ে গেল। টোঁকটা পার হতেই সে দেখতে পেল ঝোরার ধার ঘেঁষে একটা জমিতে চাষ দিচ্ছে কয়েকজন কৃষাণ। জলবৃষ্টি নেই অথচ জমিটা যেন জলে টইটম্বুর। আসফাক বুঝতে পারল হেঁউতির বীজ দেয়া হবে। হ্যাঁ, ছমিরও আছে ওদের মধ্যে। কিন্তু এত লোকের মধ্যে কি কথাটা বলা যাবে? বরং অন্য সময়ে। বলদগুলোর ঘরটা এখনও সাফ করা হয়নি। আসফাক ফিরে গিয়ে ঝুড়ি করে গোবর ফেলতে শুরু করল। যেখানে সেখানে ফেললে চলবে না। হয় খামারের পিছনে ডাঁইতে জমা করতে হবে, কিংবা তামাকের ক্ষেতে। অন্যদিনের চাইতে বেশি মন দিয়ে সাফ করলেও ঘরটা সাফ করতে খুব সময় লাগল না। আর তারপরেই আবার তার ছমিরের কথা মনে হল। আশ্চর্য, ছমির নিজে থেকে কিছুই বলছে না।

ডারিঘরের বারান্দা থেকে ছিলিম নিল আসফাক, বেশ বড় একদলা তামাক। খড়ের নুড়ো পাকানো ছিল। তাতে আগুন ধরিয়ে নিয়ে কৃষাণরা যেখানে চাষ দিচ্ছে সেদিকে গেল সে।

সেখানে পৌঁছে আলের উপরে বসে ছিলিম ভরল আসফাক। নুড়ো ভেঙে আগুন ধবাল তামাকে। তখন একজন করে কৃষাণ আসতে লাগল হাল ছেড়ে রেখে। তিনটে হাল চলছে। ছমির ছাড়া আরও দুজন। নসির আর সাত্তার। সবশেষে ছমির এল। ছিলিম নতুন করে ভরল আসফাক। তার হাতে ছিলিম তুলে দিয়ে সে নিঃশব্দে ছমিরের দিকে চেয়ে রইল। ছমিরও নিঃশব্দে তামাক টানতে লাগল।

অবশেষে আসফাক বলল, 'কেন, জমির হেঁউতি?'

'তা না তো কী?'

'আর কেউ চাষ দেয় না কিন্তুক। জল ঝরি নাই।'

ছমির ছিলিমটা ফিরিয়ে দিল আসফাককে।

'কেন, ছমির—?'

'কী?'

'না। তাই কই।'

ছমির আল থেকে নেমে গিয়ে আবার লাঙ্গল ধরল। চাষীদের পা কাদায় ডুবে যাচ্ছে। বলদগুলোরও সেই অবস্থা। নদী থেকে জল তুলে এই কাদা করা হয়েছে।

কিন্তু ছমির এবারও কথা বলল না। তা হলে তার ফিরতে কত দেরি হয়েছে তা কি জানে না ছমির?

জানে, নিশ্চয়ই জানে। দম মেরে আছে। ব্যাপারী ফিরলে লাগাবে সাতখানা করে।

আসফাকের হাতে তামাকটা বৃথা পুড়তে লাগল। লাগাবেই বা কী ছমির? ব্যাপারী শহরে যাওয়ার আগে কি জেনে যায়নি নিজেই।

হঠাৎ কথাটা মনে এল। সে কি ইতিমধ্যে এদের কাছে অচ্ছুৎ হয়ে গিয়েছে? সে একটা গল্প শুনেছে ইতিপূর্বে দাগী আসামীদের নাকি এরকম হয়। তাব নিজের গ্রামের লোকরাও কথা বলে না। বললেও তা না-বলাব সামিল। অথচ দেখো ওরা নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে পর পব একই রেখায় হাল চালাতে চালাতে। সাত্তার হাসলও যেন একবার কিছু বলে। আসফাক কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করল।

কিন্তু কি আশ্চর্য দেখো, সে যে বসে আছে এখানে তা যেন ওরা দেখছে না। অনেকক্ষণ ধরে আসফাক ওদের আলাপেব পরিধিতে ঘুরে ঘুবে বেড়াল যেন। সে যেন দলে ঢুকে পড়তে চায়, আর ওরা তাকে দলে নেবে না স্থির করেছে।

শেষে আসফাক বলল, 'বুঝলা না?'

কিন্তু ওবা যেন শুনতেই পেল না।

দ্বিতীয় বারও সে প্রায় চিৎকার করেই বলল, 'বুঝলা না?'

এবার সত্তাব বলল, 'কও?'

'হ্যাঁ। বুঝলা না,' আসফাক বলল, 'কাল ভুলুয়া না কী বলে তাই লাগছিল।'

সত্তার হাল ধরে ততক্ষণে কিছুটা দূরে চলে গিয়েছে। সেখান থেকেই বলল, 'তা লাগে অনেক সময়।'

আসফাক বলল, 'সন্ধে থেকে দুপুর রাত—শেষে দেখি শালমারির বনে চলে গেছি।'

এবার নসির দাঁড়িয়ে পড়ল। ভুলুয়া অপদেবতা, যে নাকি মানুষকে পথ ভুলিয়ে মারে। নসিরের বয়স হয়েছে। শুনে সে অবাকও হল। নসির বলল, 'শুনছো না, সাত্তার! আসফাক কয় ভুলুয়া লাগছিল পাছে। কোথায় গিছলা, আসফাক?'

'সল্লাবাড়ি।'

'সলসলাবাড়ি?' নসির কথাটা যেন ভালো করে জেনে নিল।

'সলসলাবাড়ি?' সত্তার বলল, 'ও সেই, ব্যাপারীর ওষুধ আনতে!'

আসফাকের বুকের মধ্যে ধক ধক করে উঠল—জানে, এরা সবই জানে তা হলে!

সাত্তার বলল, 'তা আসফাক, ভুলুয়া লাগলে বসে পড়া লাগে। হাঁটা লাগে না।'

নসির বলল, 'বুঝলা না, সাত্তার, আমার বড় চাচার একবার লাগছিল ভুলুয়া। তা সে অন্যখানে।'

নসির আর কী বলল তা আসফাক শুনতে পেল না, কারণ প্রথমে সাত্তার, তার পিছনে নসির এবং সবশেষে ছমির হালের পিছন পিছন আবার দূরে চলে গেল গল্প করতে করতে। ভুলুয়া লাগার গল্পই।

দূর থেকেই সে দেখতে পেল ওরা যেন হাসছেও। বিমর্ষ মনে সে ভাবল—ওরা নিশ্চয়ই গল্পটাকে বিশ্বাস করেনি। মিথ্যাটা ওরা ধরে ফেলেছে। তা ছাড়া সকলেই জানে ভুলুয়া পিছনে লাগে বোকাদেরই।

হঠাৎ আসফাক উঠে দাঁড়াল। কী সর্বনাশই সে করে ফেলেছে। সাত্তার আর নসির হয়তো জানতো না তার দেরি করে ফেরার কথা। তারাও এখন জেনে ফেলল। একা থাকাই ভালো ছিল। এই আর এক বোকামি হল তার।

কিন্তু কী করবে এখন সে? কোথায় যাবে? যা সত্যি তা সকলের সম্বন্ধেই খাটবে। একটা অন্যায় দিয়ে আর একটা ঢাকতে গেলে, তারপর সেটা ঢাকতে আর একটা—এমন করে অন্যায়ের জাল তৈরি হল, আর তাতে জড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়লে। অন্যদিন কত কাজ থাকে হাতে। আজ তাও নেই। কিছুই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

নিজের চারিদিকে তাকিয়ে দেখল আসফাক সে তামাকের ক্ষেতের কাছে এসে পড়েছে। যতদূর চোখ যায় একখানা বাদামী কাগজ যেন বিছানো আর তার উপরে সমান দূরে দূরে সবুজের ছোপ। কিন্তু এখানে কেন এল সে? এখানে কী কাজ আছে? কথাটা চিন্তায় ফুটে ওঠার আগেই আবেগটা দেখা দিল। এই ক্ষেতেই, এই তামাকের ক্ষেতে কাজ করতে গিয়ে জাফরুল্লার কাছে থাপ্পড় খেয়েছিল আসফাক একদিন। কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল আসফাকের। সে মাথা কাত করে কানটাকে কাঁধের উপরে চেপে ধরল যেন শব্দটাকে থামাতে। কোন দিকেই এখন তার যাওয়ার নেই। এখন শুধু অপেক্ষা করে থাকতে হবে। এখানে লোক নেই। এখানেই বসে ভেবে নেয়া যেতে পারে।

আলের উপরে বসল আসফাক। চেষ্টা করে সান্ত্বনার মতো একটা চিন্তা নিজের মনে ফুটিয়ে তুলল সে। কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করছিল—তা সে বোধ হয় না খেয়ে থাকাব জন্যে। কাল দুপুর থেকেই খাওয়া হয়নি তার। তারপর তামাকের ক্ষেতের খুঁটিনাটি লক্ষ্য করতে লাগল। তা এটা দেখার মতো কিছু বটে। তাকিয়ে দেখো, যতদূব চোখ যায় তাকিয়ে দেখো—একটা ঢিল দেখতে পাবে না, কিংবা একটা ঘাস। যে জমিতে গোবর সাব দেয়াব জন্যই দু'কুড়ি গোরুবাছুর আছে জাফরের। গর্ব করার মতো কিছু বটে। আসফাকের কৃষক মনে অকৃত্রিম প্রশংসার ভাবটাই দেখা দিল। সে নিজে বোধ হয় এ জমিব সব কাজ শিখতে পারেনি। এ জমির কাজ প্রকৃতপক্ষে কেই বা জানে? আর সেই কিনা গিয়েছিল তামাকের পাতা ঝুরতে। জল দেয়ার জন্য দহেব মধ্যে যে টিউবকল, বসে তা পাম্প কর—আচ্ছা। জমির ঘাস তোল খুঁটে খুঁটে—তাও খুব। কিন্তু পাতা ঝোবা? জাফর নিজে ছাতা মাথায় অষ্টপ্রহর দাঁড়িয়ে থেকে মুনিষ দিয়ে পাতা ঝোরায়। আসফাক তাদের দেখাদেখি দা হাতে করে একটা গাছে কোপ দিতেই ছুটে এসে থাপ্পড় কষিয়ে দিয়েছিল জাফর।

স্বীকার করতেই হবে বুদ্ধি আছে জাফরেব। সেই হেঁউতি বিছনের ক্ষেতটা ভাবো। আর কেউ কি ভাবতে পাবে ডোঙা দিয়ে জল ছেঁচে এই না-বৃষ্টির দিনে হেঁউতির বিছন বোনা যায়? আর এই তামাকের ক্ষেত? বুড়ো বুড়ো লোকেরাও তাকে জিজ্ঞাসা না করে এক পা এগোয় না এই তামাকেব ক্ষেতে।

তা বুদ্ধি আছে বটে জাফরের। আট শ বিঘা জমি এখনও তার। নতুন আইনে দুশ বিঘা খসেই নাকি এই। তখন ব্যাপারীর বাড়িতে খুব গোলমাল লেগেছিল বটে। তারপর জাফর তা কাটিযে উঠল। চার বিবি তার, আর এক ছেলে। সকলেই নামেই জমি লিখে দিল সে। শেষে বাড়ির পাঁচজন চাকরের নামে। আসফাকের নামেও জমি লেখা হয়েছিল তখন। তারপর জাফর সকলকেই একশ টাকা করে নগদ দিয়ে পাঁচ হাজার টাকার খত লিখিয়ে নিয়েছে জমিগুলোকে খাই-খালাসী বন্দোবস্ত দেখিয়ে। বুদ্ধি আছে বটে। সেই জমিতে ধান হয়, আর তামাক।

আসফাক যেখানে বসেছিল সেখান থেকেই সে ছমিরদের আবার দেখতে পেল। তাদের একজন ছিলিম ধরাতে বসল। অন্য দুজন গেল জাফরুল্লার বাড়ির দিকে। আজই বোধ হয় ওরা ধান ছিটোবে।

হ্যাঁ, ধান। শুধু এ শব্দ দুটোই তার মনে এল পূর্বাপর বিচ্ছিন্ন হয়ে।

দু-তিনটে আল পার হলেই সেই আল যেখানে ওদের তিনজনের একজন ছিলিম ধরাতে বসেছে। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আসফাকের মনে হল—ও যদি ছমির না হয়ে সাত্তার কিংবা নসির হয় তবে কিছু খবর নেওয়া যায় ওর কাছে। একটা প্রশ্ন হঠাৎ উঠল তার মনে—জানা দরকার

জাফরুল্লা কখন ফিরবে। এটা ছমিরকেও জিজ্ঞাসা করা যেতো। কিন্তু তা করা হয়নি। কিন্তু যদি ছমির হয়?

সে যেখানে বসেছিল তার কিছুদূরে একটুকরো জমি। দূর থেকে বাতাসে দোলা গাছগুলো দেখলে মনে হয় ধান। কিন্তু আউশ নয়। ছন বলে। ঘর ছাওয়ার ছন। কচি অবস্থায় বলদ খায়। কিন্তু বেশি খেলে সহ্য হয় না।

হঠাৎ ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল সে। তারপর সে কড়ে গুনল সালগুলো। চার সাল হল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে হাসল খুঁত খুঁত ক'রে। কেউ পারেনি ধান ফলাতে। ছনই হয়। তিন বছর প্রাণপাত করেছিল আসফাক। দশ বিঘায় আট ন মণ ফললে খুব। চার সাল হল সে ওই জমি ছেড়েছে।

জমিটার দিকে অবাক হয়ে সে চেয়ে রইল। ওটার প্রায় চারিদিকেই জাফরুল্লার চৌরস সরস জমি। তার মধ্যে ওটা যে ও রকম তা কেউ ভাবতেই পারবে না। এত কচকচে বালিই বা কি করে এল এখানে তাও বোঝা যায় না। কিন্তু তার চিন্তা ঘুরে গেল। জাফরুল্লা কখন ফিরবে এই ভাবতে ভাবতে এদিকে মন চলে এসেছিল।

সে স্থির করল আর দেরি করা উচিত হবে না। হয়তো ও ছমির নয়। আর—আর সেই ভুলুয়া লাগার গল্পটাকেও হেসে উড়িয়ে দিতে হবে। দেরি করে ফিরেছে সে, কিন্তু খুব দেরি হয়েছে একথা স্বীকারই বা করবে কেন।

আল কয়েকটি পার হয়ে ধানবীজেব জমিটাব কাছে গেল আসফাক। ছমির নয় সাত্তার।

কথা বলার আগেই আসফাক হাসল খুঁত খুঁত করে।

সাত্তার বলল, 'ছিলিম?'

আসফাক হাত বাড়াল। ছিলিমটা দিল সাত্তাব।

সাত্তার বলল, 'পিঁপড়ে চলতেছে। বৃষ্টি হতে পারে কিন্তুক।'

আসফাক বেশ খানিকটা ধোঁয়া গিলে কাশল। ছিলিমটা সাত্তারের হাতে ফিরিয়ে দিল।

বলল, 'পারে বোধ হয়।'

'হলে হেঁউতির চাষ আগুই হবে মনে কয়।' বলল সাত্তার।

আসফাক বলল, 'কী যেন বলব মনে হল।'

'কী বলবা, সেই ভুলুয়া—' সাত্তার হাসল।

'আরে না—কী কও।' আসফাক গড় গড় করে হাসল।

তারপর সে বলল, 'ব্যাপারী গেল কখন দেখছো না?'

'কেন সেই হাকিমের সঙ্গে। সন্ধের পর ভকভকি আসছিল তার। তারই সঙ্গে ব্যাপারী গেল। আর মুন্নাফও। হাকিমই পেড়াপিড়ি করল।'

'অ।'

ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় লাগল আসফাকের। তার পরে সে আবার হাসল। ভারমুক্ত বোধ হল যেন হঠাৎ নিজেকে। সে একটু জোরে জোরেই হেসে উঠল দ্বিতীয় বার।

একটু পরে সে বলল, 'বুঝলা না, আচ্ছা ও কিসের হাকিম কও তো।'

'কেন, শোন নাই? ডিস্টিট্ বোডের। সড়ক নাকি হবে একটা তারই মাপজোখ।'

'তা—' একটু ভাবল আসফাক, 'আচ্ছা—'

'কী?'

'লোকে কিন্তু দুঃখ কষ্টের কথাও বলতেছে।'

'জমির উপর দিয়ে সড়ক যাবে। সে সম্বন্ধে দু-এক কথা হইছে।'

ছিলিমটা সাত্তারের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়াল আসফাক। নিঃশব্দে সে হাঁটতে সুরু করল। এ সব ক্ষেত্রে কাজ করতে করতে এসে ধরানো ছিলিমে টান দিয়ে আবার কাজের দিকেই ফিরে যাওয়াই প্রথা। বিদায় দেয়া নেয়ার জন্য ধাক্যব্যয় করতে হয না। অন্তত এখন প্রথার এই নিঃশব্দ দিকটা আসফাককে সুবিধা দিল। আশ্চর্য লাগছে। কাল বিকেল থেকে কী হয়েছে তার, একটার পর একটা জালেই যেন জড়িয়ে পড়ছে। কে জানতো যে হাকিমটাও এমন? সে ভেবেছিল ম্যাজিস্টর!

আলের উপর দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে সুরু করল সে। খুব একটা দরকারি কাজই যেন মনে পড়েছে। সেই ভঙ্গিতে চলতে চলতেই সে যেখানে বলদগুলোকে বেঁধে রেখে এসেছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। এটার পিঠ চাপড়াল, ওটাকে ধাক্কা দিযে রোদ থেকে ছায়ার দিকে সরিয়ে দিল। যেন সব কয়েকটি ঠিক খাচ্ছে কি না দেখল। তারপর তাদের কাছাকাছিই একটা গাছের ছায়ায় বসে পড়ল। এখন ওরা সব খেতে গেল।

জাল ছাড়া আর কি? বিস্ময়ের জাল। এটাই তার সব বোকামির শেষ বোকামি—ডিস্টিট্ বোডেব হাকিমকে ম্যাজিস্টর ভাবা। বালি চিবিয়েছে সে। আর তাও কি না এমন হাকিম যে হয়তো সে সব কথা জাফরুল্লাকে বলেও দিয়েছে।

সব কথাব সাব কথা সে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে। উৎকণ্ঠায় ঢোক গিলল আসফাক। কিন্তু এমন ঠকাই বোধ হয় তাব নসিব। চিরকালই ঠকতেও হবে।

ধীরে ধীবে একটা উদাসীনতায় তার মন ভবে গেল। এমন ঠকার পরে বোধ হয় কিছুতেই কিছু এসে যায় না। গাছের গায়ে হেলান দিযে বসল সে। তার অনুভূতি হল সে যেন কথা বলছে জাফরুল্লার সঙ্গে। হ্যাঁ, শোধবোধ, ব্যাপারী, তোমার আমার শোধবোধ : না কথাটা বোধ হয তামাম শুধ। কী জানি। মোট কথা শেষ পর্যন্ত ওষুধ আনলেও আমিও খুব দেবি করেছি। অসম্ভব দেবি। কবুল। তা তুমিও মর নাই।

হাকিমেব কাছে থেকে সবে আসতে আসতে তার মন অস্পষ্ট ভাবে যেন একটা পুরনো পরিচযের সম্বন্ধই অনুভব করল জাফরের সঙ্গে। তা সাত সাল হল।

ধরতে গেলে ধীরে ধীবে জাফর তাকে অন্য চাকবদের থেকে আলাদা করে নিয়েছে। সেই থাপ্পড়ের ঘটনাটা ঘটলেও। তামাকের ক্ষেতে তাকে যেতে হয় না। ধানের ক্ষেতে বেচাল বর্ষায় ঘাস বেশী হলে দু একদিন নিড়ানি নিয়ে বসতে হয়। কিন্তু ভারি পরিশ্রমের কাজ ধীরে ধীরে তার কাছে থেকে দূরে সরে গিয়েছে। বলদদেব দেখা শোনা, দড়ি পাকানো, রাখালদের খবরদারি কবা, তামাক বানানো, বাজাবসওদা করা—এসবই তাব কাজের ফিরিস্তি। আর মুন্নাফ—তাও দেখো—জাফরুল্লা ব্যাপারীর চার বিবির ঘরের এক ছেলে তার উত্তবাধিকাবী, দশ বছরের সে ফুটফুটে ছেলেটার ডাক শোন। কী না, মিঞা সাহেব। কখনও সে আসফাক বলে না।

আর এ ছাড়াও প্রমাণ আছে। প্রায় তিন সাল পুরনো হল ব্যাপাবটা।

জমি নিয়ে কাজিয়া। যদিও জাফরুল্লার দাড়িটা তখনই সবটুকু সাদা, তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পুলিস। সঙ্গে সঙ্গে তার আটদশজন চাকর আধিয়ারকেও।

সে যখন যাচ্ছে আসফাককে ডেকে বলেছিল—'আসফাক, বাপজান, ইদিক, শোন। সব দেখে শুনে রাখবা কেমন? আসফাক বড় ভালো ছাওয়াল।' সেই দশ বিঘা জমির কথা। ঘুষ?

এই শুনে, তাকে নিয়ে যেতে দেখে, আর জাফরের চার বিবি আর মুন্নাফের কান্নার সামনে আসফাকের চোখেও জল এসে গিয়েছিল।

সেবার প্রায় পনরোদিন জাফর অনুপস্থিত ছিল। সে সময়ে আসফাক কী না করেছে। ধান তামাকের ক্ষেত-খন্দ দেখাশোনা তো বটেই জাফরের বিবিদের তদ্‌বির তদারক পর্যন্ত। আর বলদ কটি যা তার আসল জিম্মি তাদের চেহারা তেমন কোনদিনই আর হবে না সেই পনেরোদিন

আসফাকের কাছে আদর যত্ন পেয়ে।

অবশ্য জাফর যখন ফিরে এসেছিল তখন তেমন খোঁজ নেয়নি তার। জাফরকে কোনদিক দিয়ে ক্লিষ্ট দেখায়নি। ববং তারপর থেকে তার সাদা দাড়ি মেহেদি দিয়ে রাঙাতে শুরু করেছে।

জাফর কি তবে ঠাট্টা করেছিল তাকে? অমন অবস্থায় কেউ ঠাট্টা করে না।

না—তখন সেই বরং পালিয়ে বেড়িয়েছিল। আব তার কারণ ছিল। সে কথাটাই আবার মনে আসতে চাচ্ছে। গৃহপালিত পশু যেমন লাঠি দেখে শরীর গুটিয়ে নেয় তেমন যেন কথাগুলো তার মনের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে চাইল। উদাসীনতাটা ফেটে ফেটে যাবে মনে হল। তামাম শুধ বলে যে ঔদাস্যটা এসেছিল মনে।

বলদগুলোকে গাছের ছায়া দেখে বেঁধে দিয়ে আসফাক ফিবে চলল জাফরুল্লার বাড়ির দিকে। যেতে যেতে ভাবল—কী করা যায় এখন? তার মনে হল দড়ি পাকালে হয়। কাল সারাদিনই তা হয়নি। কিন্তু এখন তো ঠিক কাজের সময় নয়। দুপুর হয়েছে। কাল থেকে খাওয়া নেই। ক্ষুধা বোধ হচ্ছে। রাত্রিতে ঘুম হয়নি।

সেই ফেরাই তো ফিরে এসেছে সে। এখন সব চুকে যাবে। এই রকম একটা মনোভাব হল তার।

দুপুবটা কাটল। খানিকটা ঝিমিয়ে, খানিকটা উদাসীনতায়। ছমির এসেছিল চলেও গিয়েছে। সে চলে গেল আসফাকের মনে পড়ল ছমির হাটে যাচ্ছে। সপ্তাহের হাট।

আসফাক ডারিঘরের বারান্দায় বসেই দড়ি পাকায়। সেখানেই উঁচু বাঁশের আড়টায় পাট আছে, আর তার কাছে লাটাই। লাটাই ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ দড়ি পাকাল আসফাক। তারপর তার বলদদের কথা মনে পড়ল।

সে যখন বলদদের খোঁজে যাচ্ছে ছমিরেব সঙ্গে আবাব দেখা হল। ছমিব তাহলে হাটে যায়নি। টাকা পয়সা ধামা আনতে অন্দবে গিয়েছিল।

মুখোমুখি দেখা হতে আসফাক বলল, 'হাটে যাও একা?'

'একা না। রাখালও যাবে।'

'ও, আচ্ছা।' এই বলে আসফাক পা বাড়াল।

ছমির বলল, 'এক কথা—'

'কী?'

'আজ তো তুমি আছ। তা আমি আজ বাড়ি যাব। কী কও?'

'আর কে থাকবে?'

'কেউ না।'

'কেন ব্যাপারী?'

'আজ রাত্তিরে আসবে না।'

ছমির চাকর বটে কিন্তু এই গ্রামেই তার বাড়ি আছে। কাল রাত্রিতে সে বাড়ি যায়নি। জাফরুল্লার বাড়িতে পাহারা দিয়েছে। আজ আসফাককে সে কাজের ভার দিয়ে সে বাড়ি যেতে চায়।

আসফাক বলল, 'আচ্ছা যায়ো।'

এই বলে সে হাঁটতে শুরু করল।

সে হাকিমও কিনা 'ম্যাজিস্টর' না। এই কথাটাই আবার মনে হল তার।

খানিকটা দূর গিয়ে সে ভাবল : ছমির আজ থাকবে না। তা হলে সেই যে আসফাক জাফরুল্লার ঘববাড়ি পনেরো দিন পাহারা দিয়েছিল আজও তেমন হল।

কিন্তু তফাতও দেখো। সেবার সে বুক ফুলিয়ে বেড়াতো। আর এবার?

ঘাড় কাত করে থুথু ফেলল আসফাক।

ঝোরার পাশ দিয়েই তার পথ। পথের ধারে একজায়গায় দু-তিনটে পিটুলি গাছ। আসফাকের মনে পড়ল জাফর একদিন বলেছিল—বড় গাছটাকে খড়ির জন্য কাটলে হয়। আসফাক স্থির করল এবারও যদি জাফরের দু চারদিন দেরি হয় ফিরতে গাছটাকে সে কাটবে।

কিন্তু তফাত দেখো। সেবার যা ছিল এবার তা নয়। আর এসব কিছুর জন্যই দায়ী সেই হাকিম।

পিটুলি গাছটার নিচে একটা পুরনো গোবরের স্তূপ। অনেকটা উঁচু। উপরটা শুকিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে। ঢিপিটার পাশে একটা বড় মোরগ চরছে। প্রকাণ্ড খয়েরী রঙের মোরগ। মাথার ঝুঁটি টকটকে লাল। আধা ওড়া আধা ছোটাব ভঙ্গিতে সে ঢিপিটার উপরে লাফ দিয়ে উঠল। তারপর পাঁয়তারা কবাব ভঙ্গিতে একবাব ডান একবার বাঁ পা দিয়ে গোবরের শুকনো আবরণটা সবাতে লাগল। আর তখন আসফাক তার পায়ের বড় বড় নখগুলোও দেখতে পেল। পুরনো সাব হয়ে যাওয়ায় কিন্তু উপবের স্তরের চাইতে নরম গোবর বেরিয়ে পডল। কিন্তু ঠোঁট না নামিয়ে নিজের এই আবিষ্কারেব গর্বে গলা ফুলিয়ে মোগরটা কক কক কক করে ডাকল। ঝপ করে একটা শব্দ হল। আসফাক দেখল মোরগটার কাছে একটা মোটাসোটা তাব মতোই বড় মুরগী উড়ে এসে পড়ল। কিন্তু মোরগটা এক ধাক্কা দিযে সেটাকে সরিয়ে দিল। সেটা ঢিপিব একটু নিচে পা দিযে গোবরেব স্তবটাকে খাবলাতে লাগল। মোরগটাও আবার বড় বড নখওয়ালা পা দিযে গোবরেব আবরণটাকে ভাঙতে সুরু করল। ঝুপ করে আর একটা শব্দ হল। আর একটা মুরগী এসে পড়ল। আর তা দেখে মোরগটা অত্যন্ত বিরক্ত হযেই যেন তাব গোবরশৃঙ্গ থেকে নেমে পডল। যেন তার পুরুষোচিত পবিশ্রমের পথে এরা বাধাস্বরূপ। কিন্তু ঠিক তা নয়। গোবরের আড়াল থেকে আব একটি মুরগী আসছিল সেটিকেই পছন্দ হল তাব। তার দিকে তেড়ে গেল।

আসফাক ঢিপিটার পাশ দিয়ে গেল। মোবগটা তাকে গ্রাহ্য কবল না।

হাকিম তার মনের উপবে যে শক্ত স্তবটা জমেছিল সেটাকে ওই মোবগটাব মতো খাবলে দিয়েছে। নীচের নরম কিছু বেরিয়ে পড়েছে।

কিন্তু কযেক পা যেতে না যেতেই থমকে দাঁড়াল আসফাক। সেই পুবনো কথাটাই যেন আবাব মনে পডল। সেবার যখন জাফর ফিরে এসেছিল আসফাক বেশ কিছুদিন পালিযে বেড়াতো।

সারাদিন তার মনে যে উদাসীনতার ভাবটা ছিল সেটার চাপেই যেন সে ক্লান্ত হয়ে উঠল। যে বোঝা প্রথমে তোলাব সময়ে হালকা থাকে অনেকক্ষণ বয়ে নিয়ে গেলে সেটাই সহ্যের বাইরে চলে যায়। হাঁপাতে লাগল আসফাক। বলদ যেমন স্তব্ধদৃষ্টিতে চেযে থেকে নিঃশব্দে হাঁপায়— তেমন করেই যেন হাঁপাতে লাগল সে।

বুদ্ধি আছে জাফবের। জমি রাখার মতো অন্য অনেক ব্যাপারেই তার বুদ্ধিব প্রমাণ পাওযা গিয়েছে। এটাই যেন চিন্তা তার। কিন্তু অসংলগ্ন হয়ে গেল। সে হাসল খিক খিক করে—ওই মোরগটাই জাফরুল্লা। তারপর একটা উষ্ণতা তার মনে ঢুকে পড়ল এদিক ওদিক থেকে। ক্লান্তির মতোই সেই উষ্ণতা কিংবা ভয়ের মতো। ভয়েই যেন বিনবিন করে ঘাম ফুটল তাব মুখে।

অনেকদিন আগেকার কথা। তা সাত সাল হবে।

চালার নিচের লুকানো জায়গা থেকে নেমেই আসফাক হাঁটতে সুরু করেছিল। অবশেষে এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছিল সে যেখানে উত্তর আকাশের গায়ে নীল মেঘের মতো পাহাড় সব সময়েই চোখে পড়ে। আর দেশের চেহারাও বদলে গিয়েছিল। শালেব জঙ্গল। তারপব কৃষকদের ঘর বাড়ি জোতজমা। হলুদ ফসল। তারপর আবার সবুজ বন। এমন করে বন আর কৃষকের জমি পর পর। সাধারণত মানুষ দিনে হাঁটে রাত্রিতে বিশ্রাম করে। আসফাক তখন উলটোটাই করছিল। কিন্তু চতুর্থ দিনে ব্যাপারটা অন্যরকম হল। আগের দিন সন্ধ্যায় পথের ধারের একটা জমি থেকে

শসা চুরি করেছিল সে। কিন্তু আজ কী হবে এই ভাবতে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। অদ্ভুত দৃশ্য তার সামনে। জঙ্গলের মধ্যে নীল নীল আলোর চোখ। আরও দূরে দপ্ দপ্ করে মেটে মেটে আলো জ্বলছে। তার কাছাকাছি সাদা সাদা যেন কী সব। আর দু এক পা এগিয়ে গিয়েছিল আসফাক আর তখন সে আবিষ্কার করেছিল অস্পষ্ট আলোতে। আট দশটা মোষ চরছে। আর সেগুলোর পিছনেই চার পাঁচটা তাঁবু। হাত তিনেক উঁচু একটা বাঁশের আড়ের উপর দিয়ে একটা করে রং করা কাপড় দুদিকে নামিয়ে এনে চারটে খোঁটায় কাপড়ের চার কোনা বাঁধা। সেই তাঁবুর মধ্যে পুরুষ মেয়ে শিশু। রান্না হচ্ছে। সকলে একই সঙ্গে কথাও বলছে, যেন ঝগড়া লেগেছে। কিংবা ভয় পেয়েছে।

এই তাঁবুর বস্তির কাছাকাছিই কমরুনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার। আব ক্ষুধাই ফিরিয়ে এনেছিল তাকে। চেয়ে চিন্তে কিছু পাওয়া যাবে না?

আসফাক লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিল তাঁবু খুলে নিয়ে লোকগুলো কোথাও যাওয়ার যোগাড় করছে। একটা করে তাঁবু ওঠে আর মোষেব পিঠে তাঁবু আব অন্যান্য সবঞ্জাম চাপিয়ে একটা করে দল রওনা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব তাঁবু উঠে গেল, সব দল রওনা হয়ে গেল। আর তখনই সে দেখতে পেয়েছিল খানিকটা দূরে যেন একটা মোষ তখনও বাঁধা আছে। হ্যাঁ, অন্য সব মোষ যেমন করে বাঁধা ছিল—একটা পা লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধা। আর একটা ঝোপের আড়ালে, অন্য তাঁবু—গুলো যেখানে ছিল তার থেকে কিছু দূরে একটা ছেঁড়াছেঁড়া তাঁবুও যেন। আশ্চর্য, ভুলে গেল নাকি?

ঝোপের আড়ালে আড়ালে চলে তাঁবুটার একেবারে কাছে গিয়ে চমকে উঠেছিল আসফাক। সেই তাঁবু ছিল কমরুন আর তাব স্বামীর। স্বামীর বসন্ত হযেছিল, রাত্রিতেই তার মৃত্যু হয়েছে। কমরুন ফুঁপিযে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সে সময়ের কথা সব মনে আসে না। আসফাক মনে করতে পারে না কেন সে না পালিয়ে কমরুনের কান্না শুনতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। অনেকক্ষণ সে নিচের চিবুকে হাত দিয়ে ঠায দাঁড়িয়েছিল। কামরুন কাঁদতে কাঁদতে মুখ তুলে নাক ঝেড়ে আর একবার কাঁদতে শুরু করার আগে আসফাককে দেখে থাকবে।

তারপর কবর দেয়া হয়েছিল কমরুনের স্বামীকে। একটা সুবিধাও জুটে গিয়েছিল। বর্ষার শেষে মাছ ধরার জন্য কারা একটা গর্ত করে রেখেছিল। সেই গর্তেই মৃতদেহটাকে রেখে নদীর চরার পাথরকুচি মিশানো বালি আঁজলা আঁজলা তুলে গর্তটাকে বুজিয়ে দেওযা গিযেছিল। কিন্তু এদিক ওদিক থেকে বড় বড় পাথর গড়িয়ে এনে আসফাক যখন সেই গর্তটার উপরে রাখছিল বালিতে, আছড়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করেছিল কমরুন।

বিকেলের দিকে কমরুন যখন তার তাঁবুর কাছে ফিরে এল তখনও আসফাক তার সঙ্গেই আছে।

কমরুন নতুন কবে তাঁবু খাটিয়ে বসলে আসফাক বলল, 'খাবার নাই?'

আশ্চর্য ক্ষুধার কথাটা সে এতক্ষণ ভুলেই ছিল। এটা তার বোকামির লক্ষণ যে আসল কথাটাই সে ভুলে গিয়েছিল। এর আগেও এমন হয়েছে দু-দুবার। যে দুদিন তার বাপমাকে কবর দেয়া হয়েছিল।

কিন্তু খাওয়াটা অত সোজা ব্যাপার নয়। কমরুনই বরং কতগুলো সরু সরু বাঁশের টুকরো নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সন্ধ্যার একটু আগে। আসফাককে একটু দূরে থাকতে বলে সে নদীর ধারে ধারে এগিয়ে গিয়েছিল। বক সাবধানী শিকারী, কিন্তু বকের চাইতেও সাবধানে কমরুন একটা বাঁশের টুকরোয় আর একটাকে লাগিয়ে সরু লম্বা একটা নল তৈরি করে তাই দিয়ে একটা বককে ঠুকে দিয়েছিল। সেই বকটাকে পুড়িয়ে খেয়েছিল কমরুন আসফাককেও দিয়েছিল খেতে।

কিন্তু স্বামীকে কবর দেয়ার পরের দিনে যে অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটে গেল তার মতো আশ্চর্য

ব্যাপার আর কিছু নেই। এমন কি কমরুনের তাঁবুর কাছে দুই হাঁটুর উপরে হাত দিয়ে ঘের তৈরি করে তার মধ্যে আসফাকের মাথা গুঁজে বসে থাকাও তার তুলনায় কিছু নয়। খুব ভোর থাকতে উঠেই নদীর দিকে গিয়ে থাকবে কমরুন। মোষটাকে দড়ি ধরে খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে বেঁধে দিল আসফাক। তারপর কমরুনকে খুঁজতে বেরুল। নদীর ধারে ধারে কিছুদূর গিয়ে কমরুনের বাঁশের টুকরো কটিকে দেখতে পেল সে। তার পাশে দুটো ডাহুক দড়িতে বাঁধা। একটা তখনও নড়ছে। কিন্তু কমরুন কোথায়? অবশেষে দেখা গেল তাকে। ঘাগরা জামা পাথরে রেখে সে স্নান করছে। পাহাড়ি নদী। স্বচ্ছ জল স্নানের উপযুক্তই বটে, কিন্তু এক হাঁটুর বেশী নয়। গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে রাখবে কমরু এমন সুযোগ কোথায়?

সকালেই একটা ডাহুক পুড়িয়ে খাওয়া হয়েছে। আর একটা বাঁধা আছে। কাল চলবে। কমরুন এতক্ষণ কি সেলাই করছিল। এখন শুয়ে পড়েছে তাঁবুর ছায়ায়। দুপুরে এখন কাজ নেই।

বিস্ময়ের মতো শোনালেও জন্ম-দরিদ্র আসফাক সেই প্রথম নারীদেহ দেখেছিল। তখন ঘাগরায় জামায় ঢাকা আছে বটে। আসফাক এখন ভেবে পায় না কি করে অমন সাহস হল তার। কমরুন তাকে ঘুষি মেরেছিল। সেই শক্ত ঘুষি কানে লেগে অন্য সময় হলে আসফাক অজ্ঞান হয়ে যেতো কিন্তু সেই প্রথম আসফাক যেন আকাশের কোন শক্তির সন্ধান পেয়েছিল বুকের মধ্যে। আর কী সর্বগ্রাসী মাধুর্য! কমরুনের মুখে, তার একটু খোলা ঠোঁট দুটিতে, নীল মীনা করা পিতলের নাকফুলে, আধবোঁজা চোখ দুটোতেও একটা হাসি তারপরে ফুটে উঠেছিল।

এরপর মোষের পিঠে তাঁবু চড়িয়ে কমরুন একদিন হাঁটতে শুরু করেছিল। আর তার পিছন পিছন আসফাক।

কমরুনই বা কী করবে? দলের সন্ধান পাওয়া গেলে আসফাক তার সঙ্গে থাকতো কিনা তা ভেবে লাভ নেই, হযতো থাকতো না। কিন্তু জাফর ব্যাপারীর গ্রামে এসে অন্য একটা ব্যাপারও ঘটল। মোষটা যে বুড়ো তা কমরুনেব কাছেই শুনেছিল আসফাক। তার একটা চোখের মণিও সাদা হয়ে গিয়েছিল বয়সের জন্য। কিন্তু সে বার্ধক্য যে এমন তা বোঝা যায়নি। একদিন সেটা কাদার মধ্যে বসে পডল। দুদিন ধরে মোষেব তদবিব চলল। গাছগাছডার দাওয়াই যা জানা ছিল কমরুনের সে সব প্রয়োগ করা হল। কিন্তু তৃতীয় দিনের সকালে এসে দেখা গেল শেয়াল খেতে আরম্ভ করেছে। সেই কমরুন এখন জাফরুল্লার চার নম্বর বিবি।

তা বুদ্ধি আছে জাফরুল্লা ব্যাপারীর। এখানে আসার মাস পাঁচ ছয় পর থেকেই ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল, যদিও আসফাক তা তখন ধরতে পারেনি। কবেই বা সে ঠিক সময়ে ধরতে পারবে? তখন সেই বেলে ডাঙা জমি চষতো আসফাক। কমরুন যেতো আসফাকের অন্দরে কাজ করতে। তারপর বন্দোবস্ত উলটে গেল। আসফাক সারাদিন জমিতে কাজ করতো, আর কমরুন বাতভোর ব্যাপারীর বাড়িতে ধান ভানতো, চিড়ে কুটতো। এই কৌশলে তফাত করে বাখল দুমাস। তারপর নিকা করেছিল কমরুনকে। জাফরুল্লার চার নম্বর বিবি—তার একমাত্র উত্তরাধিকারীর মা।

কিন্তু, আসফাক নিজের অবস্থিতিটা বুঝবার জন্য এদিক ওদিক চাইল, কিন্তু—। পিছন দিকে জাফরুল্লার বাড়ি চোখে পড়ল। চোখ মিটমিট করল সে। যেন দেখতে চায় না।

আসফাককে এমন কেউ দেখলে বলতো পক্ষাঘাত হয়েছে। চোয়ালটা অবশ হযে গিয়েছে। মুখটা হাঁ করা।

সেই সেবার যখন জাফরুল্লাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

তখন একদিন বলদ বাঁধতে গিয়েছিল আসফাক দহের ধারে। বলদদের যখন সে বাঁধছে কেউ যেন মৃদুস্বরে ডেকেছিল আসফাক, ও আসফাক। বাতাসটায় জোর ছিল, শব্দটা ঠিক এল না। একবার সে মাথা তুলে শুনতে পেল কে যেন 'কুই' করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। বাতাসটা

আরও জোরে উঠে পড়েছিল। পথের পাশের বড়ো বড়ো ঘাস। সেগুলো বাতাসের তোড়ে ছপ ছপ করে গায়ে লাগছে। আসফাক পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাল। ফাঁক খাওয়া এই ঝড়ো বাতাসে ঝড় উঠবে কি না তা বোঝার চেষ্টা করল। এমন সময়ে বাতাসে ভেসে কী যেন একটা তার গায়ে এসে পড়ল। সেটা গড়িয়ে পায়ের কাছে পড়লে আসফাক দেখল টোপা কুল। সে বিস্মিত হল। এদিকে টোপাকুলের গাছ কোথায়? দহের ওপারে একটা আছে বটে। ওপারের টোপাকুল এপারে এসে পড়বে এত জোর বাতাসে? কাজেই সে ওপারের দিকে ফিরে তাকাল। আর তখন সে দেখতে পেল। সাঁকোর উপরে, সাঁকোটা প্রায় পার হয়ে এসে, দাঁড়িয়ে আছে কমরুন। বাতাসে তার চুল উড়ছে। মাথার কাপড় খসে গিয়েছে। পায়ের কাছে এলমেলো কাপড়ের ঢেউ ওঠানামা করছে। আঁচলে তার টোপাকুল। আঁচলে সামলে, শাড়ি সামলে সে আর এগোতে পারছে না।

'ও আসফাক, আসফাক।'

'কী?'

'নামায়ে দাও।'

কমরুন। জাফরুল্লা ব্যাপারীর চার নম্বর বিবি কমরুন।

আসফাক এগিয়ে গিয়ে কাছে দাঁড়াল। আর তখন ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন কোলে ওঠে তেমন করে আসফাকের গলা জড়িয়ে ধরে কমরুন সাঁকো থেকে নামল। কেমন যেন লজ্জা পেয়ে হাসল সে। সাঁকো থেকে নেমেছে বটে কিন্তু তখনও পায়ে মাটি ছুঁলেও কমরুন তার দুহাত দিয়ে আসফাকের গলা জড়িয়ে ধরে আছে। একবার সে মুখ তুলল, আসফাকের মুখটা দেখল, তারপরে আসফাকের কাঁধের উপরেই মুখ রাখল। যেন তখনও সাঁকোটা পার হচ্ছে।

তারপরে মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়াল সে আসফাকের মুখোমুখি। বাতাস আর এক পাক খেলে গেল। খানিকটা ধুলো উড়িয়েও গেল। বাতাসের জন্যই কমরুনের পদক্ষেপগুলো অসমান হচ্ছে। কয়েক পা গিয়ে পথের ধারে বড় বড় ঘাসগুলো যেখানে বাতাসে কাত হয়ে পড়েছে শুয়ে পড়ল কমরুন, যেন হঠাৎ পড়ে গিয়েছে। বাতাস যেমন শব্দ করছে তেমন যেন খিল খিল করে হাসল সে।

আসফাক বলল, 'পড়ে গেলা?'

কমরুন হাসল। তার চোখ দুটো (তার চোখে সুর্মার টান ছিল) ঝিকমিক করল। মুখটা গাঢ় বাদামী হয়ে উঠল। আসফাক অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একটা মুহূর্ত। আর তখন ধনুকের ছিলার মতো উঠে পড়ল কমরুন। হাসল সে। তারপর দৌড়ে পালাল।

কমরুনের অমন ভালো হয়নি। বিশেষ যখন জাফরুল্লা বিদেশে। তা ছাড়া সেখানে কেউ ছিল না। সেই বাতাসের মতোই তার রক্তের মধ্যে কী একটা চঞ্চলতা দেখা দিয়েছিল। তাতে যেন দম বন্ধ হয়ে যায়। তার চাপে কী হয়? সব নিষেধ, সব বাধা ভেঙে মানুষকে একটা দিশেহারা গতির মতো কিছুতে পরিণত করে। তার টান আর বাধার টান এই দুই রশির টানে দম ফেটে যায়। চোখের সম্মুখে সব অন্ধকার হয়ে যায় আর সে অন্ধকার যেন রক্তের মধ্যে এলমেলো চঞ্চলতা তারই ঢেউ। দহের জল যেমন লাফাচ্ছিল তখন।

চাকররা সারাদিন কাজ করে। সন্ধ্যা লাগতে লাগতেই তাদের খাবার দেয়ার নিয়ম। আজও কিছুক্ষণের মধ্যেই ছমির এসে খেতে ডাকল আসফাককে। কিন্তু নিজে সে খাবে না। বাড়ি যাবে। সে কথাটাই আবার মনে করিয়ে দিল। কিন্তু ছমিরদের দিনের কাজ শেষ হয়েছে। তাকে এখন কতগুলো কাজ করতে হবে। আসফাক বড়বিবির ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বড়বিবি যথারীতি মোড়ায় বসে ফুরসি টানছে। তার সামনে গিয়ে ওষুধের শিশি আর পয়সা নামিয়ে রাখল আসফাক।

'কে, আসফাক?'

'জে।'

বড়বিবি হাসল। নিঃশব্দ হাসি কিন্তু তার মুখের পেশীগুলোর মধ্যে চোখ দুটো ডুবে গেল হাসির দমকে।

হাসি থামলে বড়বিবি বলল, 'কেন, পথ হাবাইছিলা!'

'জে।'

আবার ফুরসিতে মন দিল বড়বিবি।

মেজবিবি আজ খাবারঘবের মালিক। কথা সে কার সঙ্গেই বা বলে? আসফাফ আর তার মতো দুজন বারান্দায উঠে বসতেই সানকি করে ভাত দিয়ে গেল মেজবিবি। একবাবও সে কিছু জিজ্ঞাসা করল না আসফাককে। যেন এ রকম কাণ্ড রোজই করছে সে।

খাওয়া যখন মাঝামাঝি হঠাৎ দমাদম পা ফেলে রসুইঘরে এল ছোটবিবি। তার পায়ের মল ঝমঝম করে বাজল। তার ভাব দেখেই বোঝা যায় এবার কী হবে। চাকররাও এ ওর দিকে চেয়ে চোখ টিপল। মাঝে মাঝে যা হয়। ঘরের মধ্যে কথাগুলো চাপা গলায় হচ্ছে কিন্তু অন্যদিনেব মতো বাইরে থেকেই কানে যাচ্ছে। মেজবিবিব দিকে ছোটবিবি যদি অমন ছুটে আসে বুঝতে হবে ঝগড়া হবেই। এ ঝগডায় কেইবা দৃক্‌পাত করে এখন? আসফাকের কিন্তু কানে গেল কথাগুলো। আর তখন তার অনুভব হল সবই ঠিক আগের মতোই। মাঝখানে তার দেরির ব্যাপারটা। আর তাও এরই মধ্যে লোকে ভুলে যেতে বসেছে।

অবশ্য অতটা বলা ঠিক হয়নি। ঝি নিয়ে ঝগড়া শেষ কবে ছোটবিবি আবাব বার হল রসুইঘব থেকে। তখন আসফাকদের খাওযা প্রায হযে গিয়েছে। ধাপ বেযে নামতে নামতে থামল ছোটবিবি।

বলল, 'আসফাক?'

'জে।'

'পবী ধরছিল?'

আসফাফ লজ্জিত হযে মুখ নামাল।

অন্য চাকররা অস্ফুট শব্দ করে হাসল।

অন্য চাকবদের বাড়ি যাওয়ার তাগাদা ছিল। ছিলিমে দুটান দিয়ে চলে গেল তারা। তখন আসফাক খুঁতখুঁত করে হাসল ছিলিম টানতে টানতে। পরী ধরার কথা বলেছে ছোটবিবি।

ছিলিমটা ঢেলে নতুন করে ছিলিম ভরল আসফাক। তা পরীর মতোই দেখতে বটে ছোটবিবি, সলসলাবাড়ির পথে আসফাককে পরী ধরুক আর নাই ধরুক। চোখের কী জেল্লা, নাকফুল আর কানফুলের কাঁচগুলোর চাইতে যেন সুর্মার টানের মধ্যে বসানো চোখের মণি দুটো বেশি ঝকঝকে। আর ঝগড়া—কী ঝগড়াই না করতে পারে। অমন যে আদবের মেজবিবি সেও পালাতে পথ পায় না। আজ রসুইঘরেও চুপ মেরে গিয়েছিল ছোট বিবির মুখের সামনে।

অন্ধকারে পা ছড়িয়ে বসল আসফাক। আরাম করে বসে ছিলিমে আগুন ধরাল। সবই ঠিক দেখো আগের মতোই। মাঝখানে হাকিম সাহেবের পাগলামি। অন্ধকারে স্নিগ্ধতায় তার শরীর জড়িয়ে আসতে লাগল। ছিলিম ঢেলে সে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল। ছোটবিবির ঝগড়াটায় যে কৌতুক তাই যেন দিনশেষের রসিকতা যা ভাবতে ভাবতে ঘুমোতে যাওয়া যায়।

আসফাক ঝগড়াটা যেন আবার শুনতে পেল।

ছোটবিবির বলল, 'নুরীকে বলছিলাম পা দাবাতে।'

'এদিকেও তরকারি কোটা লাগে।'

'মানুষের তো ব্যাথা বিষও হতে পারে।'

'বাব্বা। এক রাত বাড়ি নাই তাতেই এত গায়ে ব্যথা।'

'সে বিষ হয় তোমাব।'

'বেশ, হয়। নছিব কবা লাগে।'

'অত দেমাক দেখায়ো না। নছিব? তবু যদি ক্ষ্যামতা থাকতো।'

'ক্ষ্যামতা?'

'তা না? তা না হলে কমরুনবিবিকে আনা লাগে না। আমি আর বডবিবি না হয় বাদ, তুমি কেন পতিত থাকলে?'

বলদদের ঘরে ঢুকে আসফাক শোওয়ার যোগাড করে নিল। কিন্তু তখনই শোওয়া হল না তার। তার মনে পডল কিছু কাজ বাকি আছে। জাফরুল্লা বলেছিল কয়দিনের মধ্যেই তামাক বাঁধার চটি বাঁশ লাগবে। সোজা নয় প্রয়োজনটা। পাঁচ ছয়টা আস্ত বাঁশের চটি করতে হবে। তাও আবার মাপ মতো হওয়া চাই—লম্বায় পোন হাত, চওড়ায় দুই সুত, আর মোটা কাগজের মতো। তামাকেব ডাঁটা একহাতে ধরে অন্যহাতে ডাঁটাগুলোব উপরে তিন পাক বেঁধে দিতে হবে। কাল সকালে বাঁশ কাটা হয়েছে। শুকিয়ে গেলে চটি উঠবে না। আব ব্যাপারী ফিরে এসে যদি দেখে—।

আসফাক তার মাচা থেকে উঠে দাঁডাল। সে ঠিক করল দু'তিন ঘণ্টা কাজ করা যাবে এখন। আর তা করাও দরকার।

কিন্তু একটা টেমি না হলে কী করা যাবে? উঠে দাঁডিয়ে সে অন্দরের দিকে গেল। বডবিবির ঘবেই থাকে তেল। কিন্তু ভিতর থেকে ফুবসির শব্দ পাওয়া গেলেও ঘবেব দরজা বন্ধ। বসুইঘবের দিকে আলো চোখে পডল। সেদিকে এগোতেই মেজবিবিব গলাব সাডা পাওযা গেল।

'কে?'

'আসফাক।'

'কী চাই?'

'না। একটি টেমি।'

'ছোট বিবির দুয়ারে দেখো।'

ছোটবিবির দুয়ারে টেমি পাওয়া গিযেছিল। কিন্তু একটু লজ্জাও পেতে হল। চাকর হলেও পুরুষ তো। বাড়িতে পুরুষ নাই, আর নুরীও পুরুষ নয়, কিন্তু আবরু থাকা দরকার।

কাটাবি দিয়ে বাঁশ থেকে চটি তুলতে বসল আসফাক টেমির আলোয়। একবার তাব মনে হল—আচ্ছা তিনি বিবিকে দেখলাম কিন্তু কমরুনকে দেখা গেল না। সে কি ব্যাপারীর সঙ্গে গেছে?

তারপর সে কাজ করতে বসল।

টেমিটায় তেল নাই। মিটমিট করছে। রাত্রির অন্ধকারটাও গভীর হয়ে আসছে। চটি তুলতে তুলতে অন্ধকারের দিকেও চাইছিল আসফাক। চারিদিক সুমসাম হয়ে গিয়েছে। বলদদের ঘর থেকে মাঝে মাঝে বলদের নিঃশ্বাসের কানে আসছে। আর নিজের হাতের কাটারি বাঁশের উপরে সে মৃদু শব্দ করছে।

সেবার কিন্তু দড়ি পাকিয়েছিল আসফাক। সেবার মানে ওই যে পনেরো দিনের জন্য যখন জাফরুল্লাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। তখন কিন্তু এমন সুমসাম হয়ে যেতো বাড়িটা। আজও তেমনি। শুধু ব্যাপারী এবার তাকে দেখাশোনা করতে বলে যায়নি। তা হোক। কেমন একটা আলসেমি লাগছে। এবার সে শুতে যাবে। এই টুকরো কটা শেষ হলেই হয়।

কাজ করতে করতে হঠাৎ সে থামল। সেবার কিন্তু শোওয়ার আগে বাড়ির চারিদিকটা দেখে আসতো। বিবিরা ঘরের দরজা দিল কিনা খোঁজ নিতো। শুধু দহের পারের সেই ঘটনার পরের তিনচারদিন সে শুধু বড়বিবির ঘরের সামনেই দাঁড়াতো।

বাঁশ আর কাটারি সরিয়ে রাখল সে। উঠে দাঁড়াল। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কী যেন লক্ষ্য

করল। চিবুকে হাত রাখল। কিছু যেন একটা মনে আসছে, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছে না কী সেটা। সে ঘরের দিকে চলল। শোবে এখন সে।

কিন্তু এবারেও তার শুতে যাওয়া হল না। তার মনে হল কমরুন বিবিকে আজ সে দেখেনি। খবর নেয়া দরকার। সত্যি কি জাফর তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে? নিতে হলে মেজবিবিকেই নিতো। খুবসুরত ছোটবিবিরও সে সুবিধে নেই। ওরা যেমন বেহিসেবী—বিবিরা দরজাটরজা ঠিকঠাক দিল কি তা দেখবার জন্য অন্দরের দিকে পা বাড়াল আসফাক। আর কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ যেমন একটা আলসেমি লেগেছিল কাজ করতে করতে তেমন কিছু একটা অনুভব করল সে আবার। তারপর গা শিরশির করে উঠল। গলার কাছে উৎকণ্ঠা যেন একটা দলার মতো ঠেলে উঠল। আবার তার মনে পড়ল সেবাবেও এমন নিঃসঙ্গ ছিল ব্যাপাবীব বাড়ি।

সে অন্দরের দিকে একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে গেল। সে অনুভব করল—দেখো এ ব্যাপারটাও সে আগে বুঝতে পারেনি, অন্য সব ব্যাপারের মতো। ভাবো তো কতদিন দেখা হয় না কমরুনের সঙ্গে। সেবাবের সেই সাঁকোর কাছে কথা হওয়ার পর আর কথাও হয়নি। অন্য বিবিদের তদারক না করে সে সোজা কমরুনের ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তখন তার রক্ত পাগল হয়ে উঠেছে।

'কমরুন, কমরুন, ঘুমাও? ওঠো'। ফিসফিস করল আসফাক।

কমরুন তখনও ঘুমোযনি। ঘরের মেঝেতে পাটি পেতে বসে কি একটা সেলাই করছে সে।

ডাক শুনে কমরুন সেলাই নামাল হাত থেকে। উঠে এল জানালার কাছে।

'কে। সর্বনাশ! আসফাক?' কমরুনের মুখ একেবারে রক্তহীন হয়ে গেল।

সে ফিসফিস করে বলল, 'ব্যাপারী বাড়ি নাই'।

'জানি'।

'তা হলে'। কমরুন যেন হাঁপাচ্ছে।

যন্ত্রচালিতের মতো কমরুন দরজা খুলে দিল। দরজা খুলে দিয়ে ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল সে।

'আসফাক—' কমরুন কী বলবে খুঁজে পেল না।

আসফাক বলল, 'কমরুন, কী খুবসুরত দেখায় তোমাকে'।

কমরুন বলল, 'রাগ কবো না, আসফাক, আমি একটু ভেবে নিই। তুমি বসো'।

আসফাক কমরুনের দিকে চেয়ে রইল। হলদে সাদায় ডুরি একটা শাড়ি পবনে তার। গলায় একেবারে নতুন একটা রুপোব চিকহার লণ্ঠনের আলোয় চিকচিক করছে। আসফাকের বাঁদিকে কমরুনের বিছানা। মশাবিটা তোলা। সাদা ধবধবে বিছানায় দু একটা মাত্র কোঁচকানো দাগ।

'কেন কমরুন—'

'কী আসফাক?'

'তুমি কেমন আছ। তাই খোঁজ নিতে আসছিলাম।'

'তুমি রাগ করো না আসফাক।'

'না। রাগ কি!'

দরজার কাছে ফিরে গেল আসফাক।

কমরুন এগিয়ে এল।

আসফাক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলল, 'দুয়ার দেও কমরুনবিবি।'

যন্ত্রচালিতের মতো দরজা দিতে গিয়ে থামল কমরুন। ফিসফিস করে বলল, 'শোন। আমি মুন্নাফকে শিখায়ে দিছি। আমি যতদিন বাঁচবো সে তোমাকে মিঞাসাহেব কয়ে ডাকবে'।

আসফাক ফিরে গেল বিবিদের তদারক করে।

নিজের শোবার মাচটায় গিয়ে বসে তার যে অনুভূতি হল কথায় দাঁড় করালে তার অর্থ হয়—এ কমরুন সে কমরুন নয়।

কোন কোন কথা আছে উচ্চারণের সময়ে তার যতটা অর্থবোধ হয় পরে তার চাইতে বেশী গভীর মনে হতে থাকে।

কথাটা তো ঠিকই—এই ভাবল আসফাক—জাফরুল্লা ব্যাপারী তাকে অন্য চাকরদেব চাইতে আলাদা দেখে। তা না হলে, সেবার তাকেই বা সব কিছুর ভার দিয়ে যাবে কেন? আজ কমরুনও বলছে সে মুন্নাফকে শিখিয়ে দিয়েছে যাতে সে আসফাককে মিঞাসাহেব বলে ডাকে। একে যদি খাতির না বলে কাকে বলবে?

মিঞাসাহেব, মিঞাসাহেব না? এই বলল আসফাক মনে মনে। হাসলও সে।

কিন্তু ঠিক ওভাবে বলল কেন কথাটা কমরুন? অবাক কাণ্ড দেখো কমরুনের কথাবার্তা কেমন বিবি সাহেবদের মতো। হঠাৎ যেন চিড় খেল তার সামনের অন্ধকাবটা। এদিক ওদিক তাকাল সে। আসলে তা তো নয়। আসফাকের মনেই কথাটা বিদ্যুতেব মতো চমকে উঠেছে। কেন, কমরুনবিবি ওভাবে ওকথা বলে কেন? রাগ করতে নিষেধ করে সে তা না হয় বোঝা যায়। কিন্তু তার সঙ্গে ওকথা কেন? এমন ঠাট্টা জাফরুল্লার অসাক্ষাতে চাকররা করে বটে। তা দু-একবাব শুনেছে আসফাক। কিন্তু তারা তো কত কী-ই বলে— বড়বিবির নাকি রোজ এক বস্তা চিড়ে লাগে নাস্তায়। ছোটবিবি নাকি বাত্রিতে উড়ে কোথায যায় সে জন্যেই তার চোখ দুটো অমন ধারালো। মেজবিবি নাকি মন্তরে বশ করেছে ব্যাপারীকে। দাড়িতে যে বং দেখো সেটাই ওযুধ মেজবিবির। তেমনি মুন্নাফ সম্বন্ধেও একটা ঠাট্টা আছে তাদের।

আসফাকের মনের এই চিড়খাওয়া ফাটল দিয়ে বিবিদের ঝগডার কথাগুলো ভেসে উঠল। মেজবিবির সঙ্গে ছোটবিবির ঝগড়া। ঝগড়াটা ঠিক নয়। ঝগডায় যে সংবাদ ছিল। মেজবিবিও তা হলে পতিত থাকল কেন? কমরুনবিবি কি তা হলে মুন্নাফকে কোমরে নিযেই ঢুকেছিল ব্যাপাবীব ঘবে? আর তা যদি হয়, তবে মুন্নাফ কি—? সে জন্যই কি মুন্নাফ তাকে নাম ধবে ডাকে না, আর তার মা তাকে শিখিয়ে দিয়েছে আসফাককে সম্মান করতে।

আর জাফর কি জানতো? জেনেই, কমরুনকে দেখে তার অবস্থা বুঝতে পেবেই তাকে নিকা করেছিল?

অদ্ভুত কথাতো! ভারি অদ্ভুত কথা! এছাড়া কোন কথাই তার মন তৈরি করতে পারল না। আর কথা তৈরি না হলে কি চিন্তা করা যায? কিন্তু চিন্তা কখনও কখনও বুকের একটা কোণও ভরতে পারে না। সেই খালি অংশগুলোতে যেন এই রাত্রিব অন্ধকারও ধূসর হয়ে উঠতে লাগল, কখনও যেন সেই আকাশে চোখে দেখা যায় এমন মেটে রঙের বাতাস বয়ে গেল, কখনও গোটা আকাশটাও গলে গলে ধারা হয়ে নেমে এল কোন কালো রঙের ধানক্ষেতের উপরে, যাব বুকে একটা কাঠি পোঁতা অনেক স্রোতকে বিভক্ত করে। হাকিম সাহেবের কথা নয়। আরও গভীর আরও ব্যাপক কিছু। এমন টান এই স্রোতের।

ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল আসফাকের। ধড়মড় করে সে সজাগ হল। ঠিকই শুনেছে যেন সে, জাফরুল্লা ব্যাপারী তাকে ডাকছে। মাচার উপরে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে সকালের দিকে বোধ হয় তন্দ্রা এসেছিল তার। অনেক বেলা হয়ে গেলে যেমন করে চাকররা তেমন করে চোখ ডলে মাচা থেকে নামলো সে।

কিন্তু জাফরুল্লা নয়। মুন্নাফ ডাকছিল। বেলা একটু হয়েছে। কিন্তু যতটা আশঙ্কা করেছিল তা নয়।

মুন্নাফ বলল, 'উঠছো আসফাক।'

'উঠলাম। কখন আসলে?' আসফাক হাসল বিবর্ণ মুখে।

'ভোরে'।

'কেন, শহর থেকে রাত্তিরে রওনা দিছলে। আন্ধারের পথ তো।'

'লরিতে আসলাম যে। তা দেখো নাই! আব্বাজান লরি কিনছে একখানা। সে জন্যেই তো শহরে যাওয়া'।

'ও'।

'এখন থেকে আর গোরুগাড়িতে তামাক পাট যাবে না বন্দবে। লরিতে যাবে। কী ভক্ ভক্ হরন। আর কত বড় বড় চাকা। ডারাইবারও আসছে'।

'ও। তা মুন্নাফ'।

'আর মুন্নাফ না। শোন তোমাকে এক কথা কই, আসফাক। বলদ এড়ে দাও। আব্বাজানের ঘুম ভাঙার আগেই বলদ নিয়ে দূরে চলে যায়ো। আম্মা কয়ে দিয়েছে'।

আসফাক বলদদের গলার দড়ি খুলে দিতে লাগল। বারোটা বলদই বেবিয়ে পড়ল দিনের আলোয়।

মুন্নাফ দরজার কাছে থেকে কিছুদূরে সরে গিয়েছিল।

সেখান থেকে সে ডাকল, 'শোন, আসফাক, আব এক কথা কই'।

আসফাক এগিয়ে গেল। তার বুকের ভিতরে ভয় ধকধক করতে লাগল। সেই গল্প জানো তো? খুরপি চুরির জন্য চোরকে ধরলে খুঁজে খুঁজে তার সব পুরনো চুরি ধরা পড়ে। কিন্তু কী আর গোপন থাকবে? সেতো নিজেই নিজেব কাছে ঢাকতে পারছে না। দেরি তো দেবি, হাকিম সাহেবকে যা বলেছে তা নিজেও সে ভুলতে পারছে না। গোপন করাও যাবে না। জাফরুল্লা এসে গেছে, জাফরুল্লা এসে গেছে। সেবার তবু সেই দহের ধারে উষ্কখুষ্ক চুল ছিল কমরুনের, সাদামাটা শাড়ি ছিল পরনে।

'আম্মা বলেছে আব্বা খাওয়ালওয়া করে না শুলে তুমি বাড়িতে আসবা না।'

আসফাকের মনে একটা প্রশ্ন দেখা দিল। একটু ইতঃস্তত করল সে, কী ভাবে আরম্ভ করা যায় তা খুঁজতে দেরি হল।

'কেন, মুন্নাফ, তুমি আর মিঞা সাহেব বলবা না আমাকে'?

মুন্নাফের মুখে লজ্জার মতো কিছু একটা ভাব দেখা দিল, 'না। আব্বা বলছে চাকরকে তা বলা লাগে না'।

ঠিক এমন সময়ে কে যেন ডাকল—আসফাক।

কে যেন নয়, চিনতে কি ভুল হয়? এই বজ্রগর্জনের মতো স্বর। টিনের দেয়ালের ঘরের জানলা খোলা। সেই খোলা জানালায় মেহেদিরঙানো দাড়ির খানিকটা দেখা গেল।

আসফাক বলদগুলোর পিছনে দৌড়ে চলার মতো হাঁটতে সুরু করল।

'আকাশের চেহারা ভালো নয়, আসফাক। বলদ দূরে নিস না'।

আকাশের দিকে তাকালো আসফাক। আকাশে কালো মেঘ নেই। দিনের আলোয় যে আকাশ ঝকঝক করে তাও নয়। এমন নোংরা আকাশ আর কোনদিনই দেখেনি সে। বলদদের ঘরের মেঝের মতো কাদা মাখা যেন। আর রাত্রিতে ঘুম না হলে যেমন হতে পারে তেমন ফ্যাসকা। মোটকথা এমন রঙচটা আকাশ সে আর কখনও দেখেনি।

বিপ্লব

তখন আমাকে কিছুদিন বাইরে বাইরে থাকতে হচ্ছিল। আত্মকর্মফলে মজেছিলাম। বিষয়টা যখন নিজের চোখে পড়ল কষ্টের সীমা রইল না। অথচ ঠিকঠাক পঞ্চাশটি টাকা বেশি পাব বলে এই চাকরি স্বীকার করেছিলাম। বোধ হয় সে কথাটাও বলতে হবে —চাকরিটা, যাকে চাকরির বাজারে একজিকিউটিভ বলে, অর্থাৎ অধস্তন কর্মচারীর নিয়োগ, বদলি, ছুটির হুকুম দেয়াব ক্ষমতা, আর তাদের ভুলত্রুটি ধরার অধিকার, বিশেষ করে এই শেযেবটি। ইতিমধ্যে অন্তত একজনের এমন ত্রুটি ধরে ফেলেছি যে সেন্ট্রাল পুলিশে খবর দেয়া দরকার হয়ে পড়েছে। এই ঘটনা থেকেই অধস্তনদের চোখে তখন আমার চরিত্র নির্ণয় হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে ওরা বলছিল চলাফেরার জন্য একটা কিছু কেনা দরকাব, না হয় ভালো দেখে সেকেন্ডহ্যান্ড হোক।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় আমি যখন বাইরের বারান্দায় বসেছিলাম সব দিক দিয়েই যেন দমে গেলাম। শ্রাবণের সন্ধ্যা। কাজেই বাতাসটা বাদলস্নিগ্ধ। ডেকচেয়ারে বসে আকাশের কিছুটা চোখে পড়ছিল। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা সদর রাস্তা থেকে বেরিয়ে আসা একটা গলি। এপারে আমাদের বাড়ি, ওপারে খানিকটা খোলা জমি, জমিটার শেষে একটা পুকুর যার উপরে এই শ্রাবণে কচুরিপানার গাছগুলো সবুজের একটা সমারোহ। পুকুবের দূবপ্রান্তে একটা লাইটপোস্ট। সেখানে আলো আছে। আমার পিছনে ঘরের মধ্যেও আলো জ্বলছে। ছেলেরা পড়ছে সেখানে। আমাব বাঁ হাতের দিকে আমার ভাই-এর চেম্বার বারান্দাব শেযে। এখন সেখানে মক্কেলদের ভিড় নেই। আমার প্রায় সামনেই জাপানি গেটটার উপরে ঝাঁকড়া পেযারা গাছটাকে অন্ধকারে ফুলগাছ মনে হচ্ছে। ছেলেদের একজন শেকস্‌পীয়রেব নোট মুখস্ত করছে। আমার বাঁদিকে বারান্দার উপরেই একসারি টব। নিমগাছেব মতো চেহারা অথচ অত্যন্ত ছোট ঝাঁকড়া সেই বাহারে গাছগুলোর নাম জানি না। তার পাতার ফাঁকে পুকুরের ওপারের আলোটাকে গাছের ফাঁকে দেখা চাঁদের মতো মনে হচ্ছে। বারান্দার কাঠের থামগুলোও সবুজ রঙের। সব মিলে অল্প আলোর ফলে সবজেটে এক অন্ধকার ছিল বারান্দায়। ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ল, এখন আব শেকস্‌পীয়র পড়ি না। কিন্তু তার বদলে কী করি? এর চাইতে ওকালতি ভালো ছিল। একটু ঈর্ষা নিয়েই যেন এখন বন্ধ. লোকশূন্য ছোট ভাই-এর চেম্বারের দিকে চাইলাম। কিন্তু সেই বা কী করে? দিবারাত্রি মক্কেলদের বোঝা বয়ে বেড়ানো ছাড়া। এখন বেড়াতে গিয়েছে ফিরে এলেই নথি নিয়ে বসবে না? কাল সকালেই আমাকেও পরিদর্শনে যেতে হবে। দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল। এই অস্পষ্ট অন্ধকারে সবুজ বারান্দায়—ছেলেরা তাই নাম রেখেছে—বসার সুযোগ কাল সন্ধ্যায় আমার থাকবে না। তখন আমার মনে হল শেকস্‌পীয়র পড়া—শেকস্‌পীয়র কেন কোন পড়াই —আমার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। ঈর্ষার মতো কিছু যার স্বরূপ এই অস্পষ্ট অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না তাই অনুভব করলাম। নিজের সঙ্গে তর্ক হল। পেশা তো একটা থাকতে হবে। ওকালতি, ডাক্তারি, ছাত্র পড়ানো এক এক করে আলোচনা করলাম, ওজন করলাম। কিন্তু কিছুই আমাকে সেই আত্মগ্লানির ডেকচেয়ার থেকে তুলতে পারে এমন মনে হল না। ভদ্র এই শব্দটার পক্ষে নিজের জীবনকে একান্ত হীন মনে হল। খুব কষ্ট হল। আর কোনদিনই উঠতে পারবো এমন মনে হল না। তখন উঠে গেলাম ঘরের ভিতরে। এ ঘরে ছেলে দুটি পড়ছে। বসলাম টেবলটার কাছে। বারান্দার সবুজ স্নিগ্ধ অন্ধকার থেকে ঘরের আলোয় এসে কিছুক্ষণ যেন পথ খুঁজে পেলাম

না। পাছে ওরা আমার সেই অবস্থা দেখে ফেলে, আমার মুখ আড়াল রাখার জন্যে টেবলেব উপর থেকে একটা বই কুড়িয়ে নিলাম। 'মধুসূদন' সম্বন্ধে একখানা সাধারণ বই। পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় এসে থামলাম। পংক্তি কয়েকটি আবার পড়লাম, তারপর ছেলেদের বললাম, এই পংক্তি কটি পড়ছি। লেখকের নাম বলবো না, কার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে তাও বলবো না। তোমরা বলো দেখি। সেই জায়গাটা পড়লাম যেখানে বলা হয়েছে : কাল প্রসন্ন, সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও। তাহাতে নাম লেখ, শ্রীমধুসূদন। ভালো লাগল যখন ছোটছেলেটি বলল—ভাষা দেখে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা। মনে হল তখন যা হারিয়ে যাচ্ছিল খুঁজে পাওয়া গেল। এখন তা হলে অতীতের সঙ্গে নিসম্পর্ক হই নি আমরা। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীমধুসূদনের সঙ্গে খুব দুরান্বয়ী সংযোগ হলেও সংযোগ যে আছে আমাদের মনের এটাই তখন ভালো লাগল। ভালো লাগার মতো একমাত্র কিছু।

ছেলেরা যখন খেতে গেল গৃহিণী এলেন। বললাম তাঁকে। তিনি সব শুনে বললেন, আগে ভদ্রলোক তাদেরই বলতো যারা নিজের হাতে কাজকর্ম করতো না। গান বাজনা কাব্যি নিয়ে দিন কাটাতো। সে অভ্যাস রক্তে থেকে কখনও কখনও বিরক্ত করে।

একটু বিরক্তি বোধ করলাম, বললাম আমি কি বলেছি, কাল থেকে আর চাকরি করব না?'

গৃহিণীর বেশিক্ষণ থাকার কথা নয় তখন। ছেলেদের দেখতে গেলেন। আমি তখন ভদ্র জীবনের কথা চিন্তা করলাম। অনুভব করতে প্রয়াস পেলাম, আমার যে কষ্টটা বোধ হয়েছে সেটা ভাবপ্রবণতা। লোকে নিশ্চয়ই আমাকে ভদ্র সমাজের বলেই মনে করে যখন সুট পরে কর্মস্থলে যাই।

সে রাত্রিতে ঘুমাতে দেবী হয়েছিল। ট্যুওরে যাওয়ার টুকিটাকি গোছানো হচ্ছিল শোবার ঘরের আলোয। আমি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ একটা চীৎকার শুনে উঠে বসলাম।

'কী হল?'

ধোবাবাড়ি ফেরৎ প্যান্টে বোতাম বসাচ্ছিলেন গৃহিণী। বললেন, 'কিছু নয়। ওরা কথা কাটাকাটি করছে।'

বললাম, 'কী আশ্চর্য! এখন এত রাতে। পাড়াপ্রতিবেশীব ঘুমের সময়। তাও বোঝে না।'

'হঠাৎ ঘুম ভেঙেছে বলে তোমার তাই মনে হচ্ছে। এমন জোরে আর কি বলেছে?''

'তাই?'

গৃহিণী রসিকতার চেষ্টা করে বললেন, 'তুমি বলেছিলে ঢাকা জেলার ভাষা তোমায় বার্ণসের কবিতা মনে করিয়ে দেয়।'

কথাটা মিথ্যা নয়। বিশেষ করে ঢাকা জেলার ভদ্র মেয়েদের ভাষা সম্বন্ধে বলেছিলাম। বললাম, 'কিন্তু আমি আরও অনেক কিছু বলেছি, বলেছিলাম ও জায়গাটুকু কিনবো।'

উত্তর দেয়ার আগে গৃহিণী চিন্তা করলেন। প্রায় দু বছর আগে কেনায় প্রস্তাব করেছিলাম। আমাদের বাড়ির পশ্চিমে লাগানো বাড়িটা ছিল শহরের এক উঠতি দোকানদারের। হঠাৎ দোকানদারের মৃত্যু হল। তার পরিবারে উপার্জন করার মতো আর পুরুষ ছিল না। তার বাড়ির ঘরগুলো তখন ভাড়া দেয়া শুরু হয়। তাদের বাইরের দিককার ঘরে একবার ভাড়াটে আসে। দুই বন্ধু। তাদের একজন বিবাহিত। একদিন মাঝরাতে চেঁচামেচি হল। অদ্ভুত ব্যাপার! চেঁচামিচি থেকে যা বুঝলাম তা এই দুই বন্ধুর একজন ঘরে শোয়, অন্যজন বাইরে বারান্দায়। প্রতিবেশীরা আবিষ্কার করেছে এই ঘরে বাইরে শোয়ার ব্যাপারটা তারা একটা রীতি অনুসারে পালটে নেয়। যার স্ত্রী বলে মেয়েটি পরিচিত সেই বন্ধুটি বলল : ওর জ্বর বলে আজ ঘরে শুয়েছে। কিন্তু এ কৈফিয়ৎ প্রতিবেশীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হল না। ছি-ছি। তখন আমি বলেছিলাম যত টাকাই লাগুক ও জায়গাটা আমি কিনে নেব। বাড়ি বাড়াতে পারবো না। বাগানে হবে। তা না হক, জঙ্গল হবে।

একটা ব্যবধান তো হল।

পরদিনই সেই দুই বন্ধু-ভাড়াটেরা চলে গিয়েছিল। তখন রাত্রির সেই গোলমালের উত্তেজনা নেই। গৃহিণীর সংসার সম্বন্ধে পরিকল্পনা আছে। বলেছিলেন তিনি, 'জঙ্গল হওয়ার চাইতে গরীবদের আশ্রয় কি ভালো নয়? তা ছাড়া নিজের বাড়ি এবং প্রতিবেশীর বাড়ির মধ্যে জঙ্গল বা বাগানের ব্যবধান রাখা এক রকমের উন্নাসিকতা।'

জায়গাটা কেনা হয় নি।

বললাম, 'তাই ভালো ছিল না, জায়গাটুকু কিনে নেয়া?'

গৃহিণী বললেন, 'দারিদ্রই। আর কিছু নয়। ছোটছেলেটার দুধ বড় মেয়েটা খেয়ে ফেলেছে। ভাত খাওয়ার কিছু ছিল না। মা বলেছিল দুধটা থেকে ঢেলে নিস। মেয়েটা সবটাই ঢেলে নিয়েছে। কতটুকুই বা ছিল'।

'তার জন্যে এমন চেঁচামেচি? অভদ্র ইতরতা! অত বড় মেয়েটাকে মারবে'?

'এখন থেমে যাচ্ছে। ঘুমাও তুমি।'

অল্প ভাড়ার বাড়ি হলে যা হয় · সঙ্গতিহীন লোক এসে বাসা করে। দেখতে পাচ্ছি ওই এক বাড়িতেই নানা সময়ে নানা লোক আসছে। উঠেও যাচ্ছে। অধিকাংশই নানা অফিসের পিওন শ্রেণীব চাকুরে। কিন্তু অনেক সময়েই শহরের ভাসমান এক শ্রেণীর উদ্বাস্তু।

এসব বিষয়ে হেডক্লার্কবাবু বিশদ খবব রাখেন। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন, 'এবা, যারা, ছোটখাট ব্যবসা করে। ওপারেও তাই করতো। জমিজমার কাজ জানে না যে গ্রামে যাবে।'

একদিন একটা বিস্ময়ের কারণ ঘটে গেল। ভোরের গাড়ি ধরতে হবে। রাত তিনটেতে ঘুম ভেঙে গেল গৃহিণীর ডাকে। পাশ ফিরে শুতে গিয়ে শুনতে পেলাম তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন—কাল রাত্রিতে দাড়ি কামাই নি ; স্নানের জল প্রস্তুত। বিরক্তিতে মন ভরে উঠল। গজগজ করতে করতে উঠলাম। গৃহিণী চা এনে দিলেন। তিনি অবাক হলেন। বললেন, 'শরীর ভালো নেই'?

বললাম, 'ভদ্রলোকেব পেশা বটে'।

গৃহিণী কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে স্টোভের ধারে খাবার তৈবি করতে বসে গেলেন।

দাড়ি কামিয়ে, স্নান শেষ করে, ঘরে ফিরে টেবলের ধারে বসেছি আয়নার সম্মুখে, এমন সময়ে শুনতে পেলাম কেউ যেন কিছু পড়ছে। পরীক্ষার আগে ভোর রাতে ছাত্ররাই তেমন পড়ে থাকে। শব্দটা গৃহিণীর কানেও গিয়েছিল। পাশের ঘরে টেবলে খাবার গোছাতে গোছাতে তিনি শুনছেন মনে হল। সেখানে গেলে তিনি বললেন, 'মাঝে মাঝেই পড়ে, কী পড়ে বলো তো?'

অবাক হওয়ার কথাই। শুনলাম কাদম্বরী পড়ছে কেউ। সেই ধীরমন্থর সমাসজড়িত গদ্যকাব্য।

কিন্তু অবাক হওয়ার সময় নয় তখন। আর্দালি এসে গিয়েছে, সাড়া পেলাম। ট্যাক্সিকে বলা ছিল। সেটাও মৃদু হর্ণ বাজিয়ে এসে থামল দরজায়। ঘড়িতে গাড়ির সময়। ওদিকে বিছানা বাঁধছে আর্দালি। এদিকে কোটে হাত গলাচ্ছি আমি।

প্রায় সপ্তাহ পরে বাড়িতে ফিরলাম। অন্তত পাঁচদিন তো বটেই। আজ আর আফিসে যাবো না স্থির করলাম। গেলেও বিকেলের দিকে। দুপুরে দিবানিদ্রার শেষে উঠে বসেছি। গৃহিণী কাছে এসে বসলেন। খবরের কাগজের খোঁজ করলাম। ছোট মেয়েটা কাগজ আনতে গেল। সেই অবসরে গৃহিণী বললেন, 'আবিষ্কার করেছি, বুঝলে।'

'কী আবিষ্কার এমন?'

'সংস্কৃত কে পড়ে জানো? রামেন্দু রায় ওর নাম। পাশের ভাড়াটের বাবা। ভদ্রলোকে সংস্কৃতে এম-এ পড়তে পড়তে লেখাপড়া ছেড়ে দেন।'

'বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'না হলেও সত্যি।'

'তা আবার পরীক্ষা দেবে নাকি?'

'বলো কী? ষাট বছর তো হবেই বয়স।'

'তা হলে? কী জানি।'

বিকেলে বাড়ির সামনে গলি রাস্তাটায় পায়চারি করছিলাম। সঙ্গে ছোটমেয়েটা পায়ে পায়ে চলছে আর বকবক করছে। এমন সময়ে দৃশ্যটা চোখে পড়ল। পাশের সেই বাড়িটার প্রবেশ পথে যে ঘরখানা তার দেয়ালের গায়ে একটা ইঞ্চি ছয়েক লম্বা এবং দুতিন ইঞ্চি চওড়া টিনের পাত বসানো। তার গায়ে যেন কিছু লেখা আছে। সাধারণত এ বাড়িটার দিকে চোখ তুলে তাকাতে আমার সঙ্কোচ বোধ হয়। নানা ধরনের লোকই তো থাকে সেখানে। কারো সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায় এবং পরে সেটাই প্রতিবেশী হিসাবে পরিচয়ের সূত্রপাত হয় তা আমি চাই না। কিন্তু ওই নেমপ্লেটটা আমার কৌতূহল আকর্ষণ করেছিল। চোরা চোখে পড়ে নিলাম—মোক্তার রামেন্দু মোহন রায়, বি-এ।

এই তা হলে সেই রামেন্দু যে মাঝে মাঝে কাদম্বরী পড়ে।

বাসায় ফিরে গৃহিণীকে বললাম আমার এই আবিষ্কারের কথা।

গৃহিণী বললেন, 'ঠিকই ধরেছো'।

'কিন্তু বলো তো, কথাটা মনে হল, কাদম্বরী ভোর সকালে কেন পড়তে হবে এবং অমন লোককে শোনানোব মতো জোরে জোরে'।

'শোনানো নাকি কথাটা'? গৃহিণী হাসলেন।

এটা একটা উত্তর হতে পারে।

বললাম, 'কিন্তু তা হলেও কাদম্বরী সত্ত্বেও প্রতিবেশীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আমি চাই না'।

'এ কথা বলছো যে'?

'তুমি আলাপ করতে ভালোবাসো'।

'এমন তো হতে পারে', গৃহিণী বললেন, 'তোমাকে মানে আমাদের শোনায় না কাদম্বরী'।

'তুমিই বলেছ শোনানোর কথা। আমি ধরে নিয়েছিলাম নেমপ্লেটে নামের শেষে যে জন্য বি-এ কথাটা লেখা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যই হবে'।

'ওই বাসায় আরও নানা ভাড়াটে আছে'।

'আছে বলেই মনে হয়। কি করে থাকে ভাবতে আশ্চর্য লাগে'।

বললেন, 'তাদের থেকে নিজের পার্থক্য জানাতে চায়'।

'বলো কী!' আশ্চর্য হয়েছিলাম।

'তুমিও তো বাগান কিম্বা জঙ্গলের ব্যবধান রাখতে চাও'।

একটু চেপে থেকে কথাটাকে অন্য খাতে চালিয়ে নিলাম। গৃহিণীকে তাঁর আলাপ করাব দুর্বলতার কথা বলে এই খোঁচাটা পেলাম। কিন্তু গৃহিণী এক কাপ চা করে আনলেন। চাটা ভালো হয়েছে দেখলাম। অনুভব করলাম এটা কলহ মিটিয়ে নেয়ার চেষ্টা।

চা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিন্তু কী দারিদ্র্যে দিন কাটে। কাল ওদের সারাদিনের বাজারের ফর্দ শুনলাম বারো আনা পয়সা। অথচ পাঁচজন খায়'।

'আমাদের এই বাংলাদেশেই আরও অনেক আছে'।

আলোচনাটা হল না। সুতরাং তিনি চিরুণী নিয়ে জানলার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন এবং চুল খুলে দিয়ে তার সংস্কারে মন ছিলেন। কিন্তু যাকে এড়াতে চাও তাই ঘুরে ঘুরে আসে নতুবা জীবনকে

গল্পের চাইতে বিচিত্র বলেছে কেন।

গৃহিণী বললেন, 'দেখে যাও'।

উঠে যেতে হল জানলার গোড়ায়। সেখান থেকে পশ্চিমের রাঙা আকাশটা চোখে পড়ল। তার আভায় পিচের রাস্তাও যেন রঙীন দেখাচ্ছে। দু একজন লোক চলেছে সে পথে।

'দেখলে'। বললেন গৃহিণী মাথাব উপর দিয়ে ফিতেটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে তার এক মাথা দাঁতে কামড়ে ধরে।

'কী'?

'সিনেমায় যাচ্ছে বোধ হয়। তাই নয়'।

'অদ্ভুত কথা। ক্রিয়াটার কর্তা কোথায়'?

'ওই। প্রতিবেশিনী'।

একটি স্ত্রীলোক যাচ্ছে বটে গলি দিয়ে। পরনে মাঝারি দামের একটা শাড়ি। বেশ মানিয়েছে কিন্তু। চেহারাটা ভালো বলতে হবে। আসনে ফিরে এসে বললাম, 'মানুষ যাবে বলেই, সিনেমা'।

'কিন্তু—'

'কী'?

'লোকটিকে চিনলাম না'।

'প্রতিবেশি না বলছো? তা তুমি প্রতিবেশিনীর আত্মীয় বন্ধু সকলকেই চিনবে এমন কি কথা আছে'?'

সেদিনটা রবিবার ছিল। আমাদের এই শহরে রোজ বাজার হয় দুবেলাই, কিন্তু প্রাচীনকালের রীতি মেনে রবিবারেও হাটও হয়। হাটে কতক জিনিস পাওয়া যায় যা বাজারে ওঠে না। কাঠের জিনিসপত্রই তার মধ্যে বেশি। রেডিমেড একটা মিটসেফ কিনবার ছিল। তাই গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছেলে ছিল। কাঠের দোকানগুলো যেদিকে বসেছে তার কাছেই একটা গাছ, গাছের ছায়ায় ছোট ছোট কয়েকটি দোকান। একটি চুড়িওয়ালী বসেছে তার দোকান সাজিয়ে। রবারের ছোট ছোট জুতো বিক্রি করছে লুঙ্গি পরা একজন পশ্চিমা দোকানদার। অনেকদিন এদিকে আসা হয় না বলেও বটে, সব কাঠের দোকান এখনও বসে নি বলেও বটে, এদিক ওদিক ঘুরে দেখছিলাম। এমন সময়ে লক্ষ্য করলাম ছেলেটি অন্যমনস্কের মতো কী দেখছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দ্রষ্টব্য কিছু দেখতে পেলাম না। সে হয় চুড়িগুলোর ঔজ্জল্যই লক্ষ্য কবছে নতুবা বলতে হবে গাছতলার নিচে যে ছোট চায়ের দোকানটা আছে সেটাই তার দ্রষ্টব্য। চায়ের দোকান— একটা তোলা উনুন, ছোট একটা কালিয়ে যাওয়া ভিজে টেবিলের উপরে সাজানো দু চারটে কাপ, সাত আটটা ছোট কাচের গেলাস। দুটো বেঞ্চ।

বললাম, 'কী রে?'

'খোকোদের দোকান'।

'খোকো? সে আবার কে? এমন নাম তো শুনিনি'।

কিন্তু এমন সময়ে কাঠের দোকানদাররা এসে গেল। গাড়ি থেকে তারা চেয়ার টেবল নামাতে সুরু করল। অনেক দেখে একটা মিটসেফ পছন্দ হল। সত্তর টাকা দাম। দোকানদার বলল—ভালো হবে না, বাবু মশায়। তবে রেডিমেড এর চাইতে ভালো হয় না।

হাসতে হল। বললাম, সুন্দর বলেছো'।

বাড়িতে ফিরেও মিটসেফটা নিয়েই খানিকটা সময় কাটল। গৃহিণী মন্তব্য করলেন, বছর পাঁচেক যাবে। সুতরাং হাটে যাওয়া সার্থকই হয়েছে। কেনার ব্যাপারে ছেলেরও কিছু বলার ছিল। সে শুধু সঙ্গেই ছিল না, পছন্দের ব্যাপারেও কিছু বলে থাকবে সে সময়ে। কিন্তু তাকে ঠাট্টা করার লোভ

সম্বরণ করা গেল না। বললাম, 'তুমি আবার পছন্দ করলে কখন? তুমি তো খোকোদের দোকান দেখছিলে'।

'ওমা তা কেন'?

'হ্যাঁ মা সত্যি। খোকোদের দোকান দেখে এসেছি'। বলল সে। আবিষ্কারটা যে মূল্যবান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তার মা বললেন, 'সত্যি! কী রকম দোকান রে'?

'বড় নয়। চায়ের দোকান'।

বললাম, 'কিন্তু কে এমন খোকো তোমাদের'?

গৃহিণী স্বর একটু নিচু করলেন। বোধ হয় কথাটা বলতে গিয়ে খেয়াল হল। বললেন, 'প্রতিবেশিদের ছেলে'।

ছেলে চলে গেলে হঠাৎ মন্তব্য করে বসলাম, 'ওই দোকানে সংসার চলে না বোধ হয়'।

'চালাতে হয়'।

প্রায় দশদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে স্থির করলাম কিছুদিন অন্তত বিশ্রাম করবো।

হাতমুখ ধুয়ে চায়ের টেবলে বসেই বললাম, 'বলো, এবার তোমাদের কথা, শুনি।'

অনেকদিন পরে ফিরেছি তো বটে। অনেক কথাই বলার ছিল গৃহিণীর। গোয়ালা দুধ খারাপ দিচ্ছে, এ সংবাদ থেকে সুরু করে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া যে মোটেই হচ্ছে না-সংলগ্ন অসংলগ্ন অনেক বিষয়ের খবরই পাওয়া গেল। কারণ তখন কথা বলার মতো মনের অবস্থা ছিল। দশদিনের প্রতিটি মিনিটের বর্ণনা দেয়া হয়ে গেলেও আরও যে অনেক কিছু বলা বাকি থাকবে সন্দেহ কী?

আমি বললাম, 'আর একটু চা দিও।'

টিপটে ছিল।

চা খেতে খেতে বললাম, 'এবার তোমাকে একটা ইলেকট্রিক স্টোভ দিচ্ছি কিনে'।

'না, তার জন্যেও তোমার এতদিন ধরে বাইরে থাকার দরকার নেই'।

কথাটা বলে ফেলেই গৃহিণী লজ্জিত হয়ে উঠলেন। তাঁর এই মনোভাবটাকে ঢাকার জন্যই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাজে কথা, যে কোন কথা, বলার মতো সুরে বললেন, 'আচ্ছা আফিম কেন খায় লোকে'?

'দুঃখ ভুলে থাকার জন্যে বলছো'?

'তাই মনে হয় না'?

'বড় লোকদের মধ্যেও কিন্তু আগে ওটা ছিল। সন্ধ্যায় মৌতাত। দুঃখ কী বলো। মীরজাফর শুনেছি আফিম মুখে ফেলে তখতই তাউসে বসতেন। সুন্দরীদের নাচ দেখতেন'।

'নেশা মানুষকে কোথায় নামিয়ে আনে দেখো'। গৃহিণী স্বরটাকে নামিয়ে আনলেন, বললেন, 'আজকাল যাচ্ছেতাই ঝগড়া হচ্ছে। তা দোষ দেয়া যায় না। ওই তো ছোট চায়ের দোকান। তা থেকে কীই বা আয় হতে পারে'।

'প্রতিবেশীদের কথা যত আলোচনা কম করা যায় ততই ভালো। তুমিও তো ওদের আলোচনার বিষয় হতে পারো'।

গৃহিণী ভাবলেন।

কিন্তু আলোচনা করার ইচ্ছা না থাকলেও অনেক সময়েই অনালোচ্য বিষয়ে ব্যক্তিগত জ্ঞানলাভ হয়। সেদিন সন্ধ্যাতেই হল। তুলনা দিতে বলতে হবে আমার ঘরে মৃদু করে দেয়া রেডিওতে গীটারের রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেল।

—লজ্জা করে না আপনের? আমার বলে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল আর আপনে দোকানে

বইলেই পয়সা সরান।

—ধ্যাম্ স্টুপিড। বাপের লগে কথা কইতে জানস না। চুপ থাক।

—লন নাই, লন নাই? দেখছে, খোকোই দেখছে। দুই আনা পকেটে রাখেন নাই? ভাত জোটে না তার নেশা?

—চুপ থাক। চুপ থাক। বাপের লগে কথা কইতে জানস না।

এই সুরু। তারপরে ধাপে ধাপে উঠতে লাগল। কিম্বা ধাপে ধাপে নামাই বলা উচিত বোধ হয়। কী কুৎসিত। মানুষের ভাষা কি এমন ক্লেদাক্ত হতে পারে। আলাপটা হচ্ছে বাপছেলেতে তা বোঝা যায়। রামেন্দু এবং তার ছেলে।

গৃহিণী এতক্ষণ একটা কথাও বলেন নি। ওদিকের গোলমাল যেন ক্লান্ত হয়ে থামল। তিনি বললেন, 'এখানে কি আর বাস করা যাবে'?

'এ রকম চললে, সত্যি মুস্কিল'।

'বুড়োটাও দেখো। আফিমের জন্যই পয়সা সরিয়ে থাকবে'।

পরদিন আমি যে বৃদ্ধকে দেখতে পাবো তা যেন গল্পের মতোই ঘটল। বারান্দায় বসেছিলাম। আর্দালি হাজিরা দিতে এসেছিল। বলে দিয়েছি জরুরী টেলিগ্রামেব খবর ছাড়া আর যেন কিছু বাড়িতে না আসে। ছোট মেয়েটাকে নিয়ে বসে সময় কাটাবো স্থির কবেছি। মনে হচ্ছে তাকে কথা বলতে শিখানো দরকার। বারমিশোলি যে ভাষায় সে কথা বলে সেটা আমার ভাষা নয়। এর কারণ সে আমার সঙ্গ পায় না।

এমন সময়ে দেখলাম রোগাটে চেহারার এক বৃদ্ধ আমাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। পোশাক পরিচ্ছদের জীর্ণতা সত্ত্বেও তার চলাফেরার ভঙ্গিতে একটা ভদ্রোচিত গাম্ভীর্য ছিল। আমার মেয়েটি তার দিকে ডাগর চোখ মেলে চেয়েছিল। সে চলে গেলে বলল, 'খোকোর দাদু'।

'তাই নাকি'?

মানুষকে দেখে কি তার জীবন সম্বন্ধে ধারণা করা যায়? একে দেখে কিন্তু আফিমের জন্য পয়সা চুরি করে নিজেব ছেলের কাছে তিরস্কৃত হতে পারে তা মনে হয়নি। তারপর মনে হল তার কাদম্বরী পড়ার কথা।

মানুষেব জীবনেব সঙ্গে নাটকের তুলনা দেয়ার অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটাও একটি যে তার জীবনের কিছু দৃশ্য কিছু অদৃশ্য থেকে যায়। দুটো অঙ্কের মাঝখানে ফাঁক থাকে। ফাঁকটা তার মনের ইতিহাস বলা যেতে পারে। আগের অঙ্ক থেকে পরের অঙ্কে যখন সে অবতরণ করে তখন আমরা ধরে নিতে পারি মাঝখানের যে সময়টুকু সে অদৃশ্য ছিল ততক্ষণে তার মন পরের অঙ্কের জন্য প্রস্তুত হয়েছে, পরিপক্ক হয়েছে। আমাদের প্রতিবেশীর জীবন, এবং আমাদের জীবনের সঙ্গে তাদের সংযোগ যেন এই সময়ে এক মধ্য অঙ্কে উপস্থিত হল।

একদিন খেতে বসে শুনলাম রামেন্দু বাবুর ছেলে চেঁচাচ্ছে—অত জিব্বা কিসের লাগে? দুধ লাগবো কেন? আর তোমারেও কই, জুনি, ফির দুই বেলা কইরা রাঁধবা তো...।

'চিল্লাও কেন'। বোধ হয় জুনিই বলল।

রামেন্দু বাবু খেতে বসেছিল সম্ভবত। সে বলল, 'বউরে বকনের কি আছে। আমি কইছিলাম বুড়া মানুষ, গাঁদালের বড়া মুখে রোচে'।

'ছাই রোচে না'? ছেলে চিৎকার করে উঠল খাইটা 'আমি মানুষ খাইটা মরি'।

বোধ হয় রামেন্দু বাবু খাওয়া ছেড়ে উঠে গেল।

জুনি বলল, 'এটা কী করলা'?

ছেলে বলল, 'না খাইছে, না খাইছে। এক পয়সার মুরোদ নাই, তার রাগ'।

রামেন্দু বাবুর গলা বলে মনে হল, 'কেন, তোর সংসারে আমি দুই শো ট্যাকা দিই নাই'।

'ওহ্, বড় দিছেন। এক বছর ধরে তাই খাইছে'।

গৃহিণী বললেন, 'বাস্তবিক, কিন্তু তুমি খাচ্ছ না'?

হাতের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এঁটো হাত একদম শুকিযে গিযেছে। নতুন করে ধুয়ে খেতে বসতে হয়। থাক এখন'।

মনে হল যে দু শ টাকার আবরণ, তা সে যতই অকিঞ্চিতকর হক, এতদিন ছিল ওদের দারিদ্র্যের উপরে সেটা ঘুচে গিয়েছে। এটা ওদের জীবনের চূড়ান্ত অঙ্ক।

রাত্রিতে, তা তখন বেশ রাত হয়েছে, ওদের সাড়া পেলাম আবার।

রামেন্দু বাবুর ছেলে বলছে, 'খায়েন নাই কেন'?

'খামু না। আমার খাওয়া ফুরাইছে'।

'রাগ করণের কী কাম। মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। দোকানে চা কিনুম সেখানে ছ ট্যাকা বাকি, চিনি কিনুম সেখানে পাঁচ ট্যাকা বাকি। আমি কত শালার হাত পা ধরে বেড়াই। উঠেন, ভাত খান'। রামেন্দু বাবুর রাগ পড়ল কি না বোঝা গেল না। বলল, 'কাল খামু'। জুনিও কিছুক্ষণ সাধাসাধি করল। রামেন্দু বাবু বলল, 'কাল খামু কইলাম'।

ভোর রাত হবে তখন। গৃহিণী কি গায়ে হাত দিয়ে ডাকলেন! অন্তত তিনি জেগে আছেন তা অনুভব করা গেল। কেউ স্তোত্র পড়ছে? ও হরি! এতো সেই কাদম্বরী। পত্রলেখার কথাই চলছে।

যোগাযোগ না হলে এমন ব্যাপার ঘটে না। কোলকাতায় যাবো সরকারি কাজে। গৃহিণী সঙ্গে যেতে চাইলেন। কারণটা সামাজিক। তাঁরা কিছুদিন কোলকাতায় থাকবেন। তাঁদের কোলকাতায় রেখে কর্মস্থলে ফিরে এসে মনে হল—আমারই বা এ ভুল কেন? সুতরাং মাস তিনেকের ছুটির ব্যবস্থা করে নিয়ে কিছুকাল এদিক ওদিক, কিছুদিন কোলকাতায় কাটানোর সংকল্প করলাম। সৌভাগ্য, চাকরি নামক বিষয়টা প্রতিবন্ধক হওয়ার চেষ্টা করেও রুখতে পারল না। গৃহিণী একদিন রসিকতা করে বললেন : এ কি বিপ্লব নাকি? ভদ্রজীবন যাপনের জন্য চাকরির প্রতি বিদ্রোহ?

প্রতিবাদ করার চাইতে চুপ করে থাকতেই ভালো লাগল।

কিন্তু গৃহিণীর কথিত বিপ্লব তো চিরস্থায়ী হতে পারে না। কাজেই আবার ফিরতে হল।

দুচারদিন পরে এক রাত্রিতে বললাম, 'আর যাই হক, ফাঁড়াটা কেটে গিয়েছে'।

'ফাঁড়া? ঠিক বুঝলাম না'।

'তোমার সেই প্রতিবেশীদের কথা'।

'ও মা, সত্যি! একদম ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা কি আছে? সাড়া পাইনি তো'।

ঠাট্টা করে বললাম, 'জুনি না কি নাম? সাড়া না পেয়ে যেন চলছে না'।

কৌতূহল কিন্তু বিষম বস্তু। পরদিন বিকেলে অফিস ফেরত বাড়িতে পা দিয়েছি মাত্র। গৃহিণী এগিয়ে এলেন। হ্যাটটা হাতে নিয়েই বললেন, 'যায় নি কিন্তু। দুপুরে আজ একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম'।

'বেড়াতে? কী সর্বনাশ, ওদের বাড়িতে? বাস্তবিক মাঝে মাঝে তুমি যে কী করো'?

'না, না শোন'।

চেয়ার পেতে দিয়ে, পাখা খুলে দিয়ে, গৃহিণী হাসি হাসি মুখে কাছে এসে বসলেন। বললেন : ওদের অবস্থা এখন একটু ফিরেছে। দেখলাম যেন ঘরদোরের দিকে একটু মন দিয়েছে ওরা। আর তা ছাড়া তুমিই কি আর চেঁচামিচিও শুনছো। দোকানটা এখন বেশ আয় দিচ্ছে বলতে হবে।

হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম, তা হবে'।

'দেখো, দারিদ্র্য মানুষের মেজাজ খারাপ করে দেয়। এখন একবারও তেমন বিশ্রী কথাবার্তা শুনতে পাও?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের ক্লান্তি জানানো ছাড়া আর কিছু করার রইল না আমার।

আরও শুনতে হল। আমাদের শহরে পূজোর মেলাটা বেশ কয়েকদিন ধরে চলে। মেলায় ওরা দোকান দিয়েছে জানা গেল। আর তাতে নাকি ভয়ঙ্কর বিক্রি। এত বিক্রি যে রামেন্দুবাবুর ছেলে বাড়িতে খেতে আসতে সময় পায় না। রামেন্দু বাবুকেও দোকানে গিয়ে বসতে হয়।

গৃহিণী ইতিমধ্যে একটি কাণ্ড করে বসেছিলেন। নিজের ছেলেমেয়েদের জামা বানানোর সঙ্গে ও বাড়ির খোকোর জন্যে একটা জামা বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাকে ডেকে সেটা দেয়াতে সে তো হাতে স্বর্গ পেল। জুনিও খুব খুসী হয়েছে। তাই বললেন গৃহিণী। কিন্তু এর ফল ভালো হল না। সেদিন ষষ্ঠী কিম্বা সপ্তমী হবে। হঠাৎ একটা ভারি গলায় চেঁচামেচি শুনলাম। রাত তখন গোটা নয়েক হবে। সেই কণ্ঠস্বর কখনও কান্নায় কাতর হচ্ছে, কখনও তর্জন করছে, কখনও যেন নিজের এক পায়ের সঙ্গে অন্য পা জড়িয়ে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে।

এই রকম শোনা গেল : দান? রাম মোক্তারের লাতিকে দান? ক্যাও? তা বেশ।

জুনি (সম্ভবত 'সেই) তাড়াতাড়ি এসে বাধা দিল, 'আপনে ঘুমান, রাত হইছে ঘুমান'।

'কেন? আমি নেশা করছি? এক্সেলেন্ট, দাদু কাল তোরে আমি জামা কিনে দিমু'।

জুনি বলল, 'না না আপনে ঘুমান, আপনে ঘুমান'।

'আমার লাতিরে জামা দেয়া! বড় লোক! বেশ।

'আপনে ঘুমান না, কী বিপদ!'

'শাটাপ। ঢাকার রাম মোক্তার পূজায় একটু ড্রিঙ্ক করবো না'।

গৃহিণীর চোখে জল দেখা দিয়েছিল। যে শাস্তি তিনি পেয়েছেন, তারপরে রসিকতা চলে না।

কিন্তু এটা একটা প্রক্ষিপ্ত ঘটনা। সত্যি ওদের দোকান পয়মন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে জানালা থেকে জুনিকে সিনেমায় যেতে দেখেছিলেন গৃহিণী, সেখানে দাঁড়িয়েই দেখলেন পরের দিন, রামেন্দুবাবু সত্যি পুজোর কাপড় জামা কিনে আনছেন। আর পূজোর মেলা ভাঙলে তিনি খবর যোগাড় করলেন (আঘাতটা যেন তাঁর কৌতূহলকে তীক্ষ্ণ করেছে)।

বললেন একদিন, 'শুনেছ, জুনির জন্য ব্রঞ্জের চুড়ি গড়াচ্ছে রামেন্দু বাবুর ছেলে'।

হেসে বললাম, 'বাণিজ্যে বসতি'।

অন্য একদিন মাঝরাতের কাছাকাছি ওরা আবার আমাদের আলোচনার বিষয় হল। মনে হল কোন উৎসব হচ্ছে ওদের বাসায়। একটা হ্যাজাক আলো জ্বলছে। ঘরের দাওয়ায় জন তিনেক খেতে বসেছে এরকম অনুমান হল। জুনি বোধ হয় এটা দিই, সেটা দিই বলে পরিবেশন করছে। কিন্তু অতিথি বোধ হয় একজন। আর দু তিনবার তার কথা শুনেই বুঝতে পারলাম সে বাঙালি নয়। সে রামেন্দুবাবুকে কাকাজি বলছে। ভাঙা ভাঙা বাংলায় অত্যন্ত মিষ্টি করে কথা বলছে। লোকটার কণ্ঠস্বর সত্যি মিষ্টি। আর কেমন যেন স্নিগ্ধ। তাকেই রামেন্দুবাবু, তার ছেলে এবং জুনি সেধে সেধে খাওয়াচ্ছে। তারপর জানা গেল তার নাম লছমন, বাড়ি মজফরপুর জেলায়, চন্দনপট্টিতে।

রামেন্দুবাবু বলল, 'গরীবের বাড়ির খাওন'।

'আমি কোন বড়লোক আছি'? লছমন উত্তর দিল।

বেশ স্নিগ্ধ একটা আবহাওয়ায় ওদের খাওয়া দাওয়াটা মিটল। ওরা পুজোর মেলার লাভলোকসানের আলোচনাও করল। তা থেকে এরকম অনুমান করা যায় লছমনেরও ছোট খাটো একটা ব্যবসা আছে।

বললাম, 'দেখো দরিদ্রের মর্যাদা দরিদ্রই বোঝে। বিদেশী দোকানদার লছমনকে ওরা কত আদর

করে খাওয়াচ্ছে'।

গৃহিণী বললেন, 'আর আমি যে বলেছিলাম ওদের কদর্যতার জন্য দারিদ্রই দায়ী'।

এই দার্শনিকতত্ত্ব বলে গৃহিণী সন্তুষ্ট হলেন।

এর পরে লছমনকে আমাদের গলি দিয়ে চলতেও দেখা দিয়েছে। তাকে বুড়ো বলাই ঠিক হবে। পরণে আধ ময়লা ধুতির উপরে মাঝারি ফরসা মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবি। পাকা ছোট করে ছাঁটা গোঁফ। মাথার চুলগুলো সবই সাদা। মুখে একটা শান্তভাব আছে। প্রায়ই সে সন্ধ্যাতেই আসতো। এবং হয় রামেন্দুবাবু কিম্বা তার ছেলের সঙ্গে বসে বসে গল্প করতো। মুখে মুখে ব্যবসার হিসাবও করতো তারা। সব কথা শোনা যেতো না, শোনা উচিৎও নয়। মন্তব্য করলাম—এ কিন্তু এক নতুন সমাজব্যবস্থা যাকে প্রশংসাই করতে হয়।

—তিন চার মাস পরে কিন্তু আবাব একদিন শুনতে হল।

গৃহিণী বললেন, 'বুঝলে, শোন, ব্যাপারটা কিন্তু—'

'কোন ব্যাপাব এমন জটিল হল?'

'লছমন বোধ হয়—'

'কী বোধ হল?'

'মানে গোপন মদ চোলাই-এর কারবাব কবে।'

'সে কী?'

'হ্যাঁ। আজ দুপুরে হঠাৎ দেশে চলে গেল। একসাইজে কে এক আত্মীয় আছে ওর। সেই সাবধান কবে দিয়েছে। ওদেব মুস্কিল। লছমনকে সব টাকা শুধে দিতে হল কিনা। তা কে যেন ধার দিয়েছে।'

'তাই বলছো?'

সংসারের কাজ ছিল। কিছুক্ষণ সে সবে ব্যস্ত থেকে গৃহিণী ফিরে এলেন। বললেন, 'আচ্ছা, মানে ওদের চায়ের দোকানটায় তা হলে'—

'এখন মনে হচ্ছে তাই। ভেবে দেখো নতুবা কী এমন লাভ হতে পারে সেই ছোট্ট দোকানে যাতে ব্রঞ্জের চুড়িও হয়।'

'পাপ তো?'

'অপরাধ বলো।'

'গল্পের বইয়ে কোকেন টোকেনের যে গোপন কারবাবের কথা পড়ি সে তো ভয়ঙ্কর সব ব্যাপাব।'

'ততটা না হলেও একই জাত।'

গৃহিণীর মুখটা বিশেষভাবেই বিবর্ণ দেখাল।

কিন্তু তেমন না হলেও ওদের সংসারের খিটমিট ঝগড়া যেন কমেছে। আর তা থেকে প্রমাণ হয় দারিদ্র্যের অবিরত যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের প্রতিবেশীদের মন কিছুটা সুস্থ হয়েছে।

একদিন অফিস ফেরত বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে থেমে দাঁড়াতে হল। দুপুরে অনেক বাড়িতেই মেয়েদের আসর বসে। তাই বসেছে যেন আমাদের লিভিংরুমে। বালকভৃত্য চায়ের কাপগুলো এগিয়ে দিচ্ছে। তাতে বুঝলাম আমি ঠিক আসরের মাঝখানে এসে পড়েছি। সুতরাং বাইরের বারান্দায় বসে রইলাম। কিন্তু তাঁরাও আমার সাড়া পেয়ে থাকবেন। আধঘণ্টার মধ্যেই তাঁরা চলে গেলেন। তিন চারজন এসেছিলেন মনে হল।

ঘরে গিয়ে বললাম, 'এতো ভালোই। মহিলা সমিতি করছো নাকি?'

গৃহিণী বললেন, 'না। ওরা সব এ পাড়ারই।'

তারপর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, 'আচ্ছা, মিষ্টির দোকানদার নাকি মিষ্টি খায় না।'

'তাই প্রবাদ।'

'কিন্তু মদেব বেলায় বোধ হয় তা হয় না।'

'তুমি নিশ্চয় জুনিদের কথা বলছো। সেও এসেছিল নাকি।'

'না। ওরা সব বলল আজকাল রামেন্দুবাবু নাকি সন্ধ্যার দিকে টলে টলে হাঁটে।

'ওই বুড়ো? ওরা বলেছে?'

'আর ছেলেটাও বোধ হয়।'

'এমনও তো হতে পারে এটা ওদের সুদিন দেখে প্রতিবেশীসুলভ হিংসা।'

'ঠিকই বলেছো।' গৃহিণী আমার সঙ্গে একমত হলেন। 'নতুবা দেখো, দেরিতে হলেও ওরা সব দিকেই নজর রাখতে সুরু করেছে। ছেলেমেয়ে কটি আজকাল লেখাপড়া করছে। ওদের ঠাকুরদা মানে বামেন্দুবাবু পড়ায়'।

কথাটা মিথ্যা নয় প্রমাণ পেলাম। জোরে জোরে হেঁকে হেঁকে পড়াচ্ছে ছেলেমেয়েদের কেউ। আমাদের এদিকেব ঘরে এসে বসলে শুনতে পাওয়া যায়।

কয়েকদিন পবে রিকসায় করে বাড়ি ফিরছিলাম। মনে হল যেন ওদের সেই লছমনকে দেখলাম। কৌতূহলেব সঙ্গেই লোকটিকে দেখলাম। আর দেখে আমাব ভালোই লাগল। গোলমালটা বোধ হয় মিটে গিয়েছে। এ লোকটি গোপন মদ চোলাই কবে কিন্তু মুখে এমন একটা স্নিগ্ধতা আছে যে তাকে দেখে বরং ভালোই লাগে।

বাড়িতে ফিরে তাই বললাম।

গৃহিণী বললেন, 'কিন্তু ওতো আর এদিকে আসে না। বরং আজকাল অন্য একটি লোক, বাঙালি সে, যে ওদের ওখানে আসে। লোকটার বন্ধুভাগ্য আছে।'

'এও হয়তো—'

'মদ চোলাই বলছো? তা মনে হয় না। আজকাল ওদের সহবাসীবা ওদের খবব দিয়ে থাকে।'

'কাজটা কি ভালো?'

'অন্যায় কিছু তো বলে নি। ওরাও বলেছিল ভাগ্যের কথা। একসঙ্গে কী একটা ব্যবসায় নামবে স্থির কবেছে তারই আলোচনা হয়।'

বলতে যাচ্ছিলাম সহবাসীদের পক্ষে ওটা পবচর্চা। কিন্তু গৃহিণীর সে কথা আমল দেয়ার মতো ভঙ্গী নয়! তিনি বললেন বরং, 'এর ব্যবসায় বুদ্ধি আছে, ওর টাকা আছে। ধনী নয়, তা হলেও—'

'তা হক! এমন করে যদি একটা সংসার উঠে দাঁড়াতে পারে মন্দ কী। যদিও প্রথমে লছমন পরে এই নরেনের আসাটা সেকালের গল্পের মতো সাজানো ব্যাপার। ওদের সংসারে এদের আবির্ভাব দেবদূতের মতোই।

কিন্তু ভাগ্য নামে একটি বিষয় আছে। অনেক ব্যাপারেই আমার মনে হয়েছে মানুষের চলার দুটো পথ আছে। তার প্রথমটি দীর্ঘ ক্লান্তিকর। অন্যটি অনেক ছোট কিন্তু বড় কষ্টের। ক্লান্তিকে ফাঁকি দিতে গেলে ভাগ্য কষ্টের শুল্ক আদায় করে। নতুবা ঠিক যখন ওদের সংসারে সব দিক দিয়ে লক্ষ্মীশ্রী লেগেছে তখনই কেন ওদের সকলেরই মেজাজ এমন রুক্ষ হয় উঠবে। যেন কী একটা রোগে সকলেই অসুস্থ।

গৃহিণী বললেন, 'দারিদ্র বরং ভালো। ওরা যেন সুদিনের মুখ দেখে সকলেই অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে।'

'কী ঘটল?'

'মাঝে মাঝে ঝগড়া হচ্ছে।'

'অর্থ একটা শক্তি। নতুন শক্তি অর্জন করলে কখনও কখনও হয় এমন।'

একদিন ওদের বাড়ি কোলাহল মধ্যের ব্যবধান ডিঙিয়ে আবার আমাদের ঘর থেকে শোনা গেল।

'ওই ছাইগুলা গিলছেন আবার।'

'শাট-আপ। মূর্খ। বাপের লগে কথা কইতে জানস না।'

'মূর্খ? ভারি আমার বি-এ পাশ বে। এক পয়সা কামাই হয় ওই বি-এ পাশে?'

'হ হ চুপ থাক।'

গৃহিণী কাপড়ে মুখ চাপা দিয়ে হাসলেন।

'ছি।'

গৃহিণী বললেন, 'তা, বাপু, তোমার আফিমের চাইতে ভালো।'

কিন্তু অন্য একদিন ব্যাপারটা কটু হয়ে উঠল।

'বলি কোন লাটসায়েব হইছেন। মাছ লাগবো রোজ।'

'কেন, মাছ কী দোষ করছে?'

'দোকান থিকা টাকা লন কেন?'

'রাখ রাখ।'

রামেন্দুবাবুর এই উপেক্ষাব ভাবটাই যেন তার ছেলেকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। সে বলল, 'অমন নোলা সাঁড়াসিতে টানে ছিড়া লাগে।' রামেন্দুবাবুর নেশার আফিম টুটে যাওয়ার মতো হল।

সে বলল, 'কী কলি, কী কলি?'

জুনি বললে, 'কি কও তুমি বাপরে। যাও, যাও।'

রামেন্দুবাবুর ছেলে গলা চড়িয়ে বলল, 'কমু না? আজ মাছ, কাল আম, পবশু দুধ। আমাবে সর্বস্বান্ত করতেছে তা দেখো না।'

'তোমার ছাওয়ালমিয়েরা খাতে চায় উনি করবো কী?' জুনি বলল। এমন সময় সেখানে একটা নতুন কণ্ঠস্বর শোনা গেল। রামেন্দুর ছেলেকে সে বলল, 'কী যা তা বলো। উনি বুড়া মানুষ। কয়দিন থিকে ভুগতেছে। তা আমি বললাম ডাল খাবেন না।'

'তা কলেই হয়।' এটা একটা হঠাৎ পরিবর্তন রামেন্দুব ছেলের ভঙ্গিতে। যেন অনেক উত্তাপ জল হয়ে গেল। আর কিছুক্ষণ ওবা কথা বলল কিন্তু কণ্ঠস্বর শমিত হওয়ায় আমাদের ঘরে তা শোনা গেল না।

বললাম, 'কোনটা ঠিক?'

'হয়তো দুটোই। অসুস্থ হলে মাছ খেতে হয় সাধ্য না থাকলেও। আর ঠাকুরদার পক্ষে নাতিনাতনীদের মাছ খাওয়াতে চাওয়া এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়।'

'তা হলেও অবস্থা বুঝে চলা উচিত।'

গৃহিণী বললেন, 'একটা কথা কী জানো। রামেন্দু বাবুর ভাগ্যটাই কেমন যেন। লোকে বলে ভাগ্যবানের বউ মরে। তা হলে ওর ডবল ভাগ্যবান হওয়া উচিত ছিল। পৃথিবীতে এই ছেলে ছাড়া কেউ নেই। ঢাকা শহরেই মোক্তারি ব্যবসা ছিল। পঞ্চাশের ধাককায় এসেছে।'

একটু চিন্তা করতে হল। কথাটাকে আড়াল কবার জন্য বললাম, 'সেই নরেন নাকি লোকটা যে থামাল।

একদিন বেটাবউএর সঙ্গেও ঝগড়া হল রামেন্দুর। জুনি বলল, 'একটুক পড়ালেও তো পারেন ছাওয়ালটাকে।'

'পড়ে তো। কেন দাদু, পড়িস্ না?'

'ছাই পড়ে। ঘোরে তো সকল সোময়।' আপনের এত আলিস্যি কেন?

'এ সব কী কও বউমা।'

'ঠিকই কই। আপনের ছাওয়াল কয় আগে দোকানে বসতেন। এখনে তাও যান না।'

রামেন্দুবাবুর ছেলে যেন কাছেই কোথাও ছিল।

সেও যোগ দিল 'ঠিকই তো বইয়া বইয়া খান। লজ্জা করে না?'

'বইয়া বইয়া খাই?'

'খান না?'

'পড়াশুনার তুই কী বুঝিস?'

'বুঝি না? আপনে এক নম্বরের ফাঁকিবাজ।'

'চুপ থাক। কালই যামু।'

'যান তাই। হাড় জুড়ায়।'

কী কুৎসিত। গৃহিণীকে বললাম, 'এদিকের ঘরটাতে জিনিসপত্র রেখে ভাঁড়ার কর। এদিকে আর বসা যায় না। ওদিকের ছোট ঘরখানা থেকে আলমারি সরিয়ে ফেলে বসার জায়গা করা যায় কিনা দেখো।'

বলা বাহুল্য রামেন্দুবাবু কোথাও যায় নি। এবং তার কারণ বোধ হয় নরেন। সে যেন জোড়া দিয়ে দিল। এরপর থেকে প্রায়ই দেখতাম নরেন আসছে আমাদের গলিটা দিয়ে। তার হাতে প্রায় সব সময়েই এটা ওটা থাকে। ওদের জীবনের সেই ঝড়ঝঞ্ঝার কালো আকাশে নরেনের কথাবার্তা এক ঝলক আলোর মতো। সে যে শিক্ষিত কিম্বা মহৎ কেউ তা না হতে পারে। কিন্তু তার ন্যায় অন্যায় বোধটা যেন তখনও অবশিষ্ট ছিল মনে হল।

এদিককার ঘরটাকে ভাঁড়ার করে আমরা যবনিকা ফেলে দিলাম প্রতিবেশীর উপরে। কিন্তু হঠাৎ আবার সে যবনিকা উঠল। যেন দৃশ্যান্তর দেখানোর জন্যই যবনিকা পাত।

কাদম্বরীর ভাষা যেমন গভীর রাতের শেষ প্রহরে ভেসে আসতো একরাতে শোনা গেল কেউ যেন কাঁদছে। না, ঠিক কান্না নয়। যন্ত্রণায় ঘুমের ঘোরে কেউ তেমন করছে।

'কী ব্যাপার?'

গৃহিণী বললেন, 'অসুখ করেছে রামেন্দুবাবুর! দিনরাত কাশতে শুনি। সারা রাত ঘুম হয় না। বালিশে হেলান দিয়ে বসে থাকে।'

'বলো কী?'

ঘটনাটা একদিন দিনের বেলায় প্রকাশ পেল।

রামেন্দুবাবুর ছেলে বলল একদিন, 'কি সারা দিন খকখক করেন। ডাক্তার দেখান না কেন?'

'ওষুধ খাইছি তো।'

'সারে না কেন? অসুখ নিয়া বইয়া থাকেন। আমার অকল্যাণ করেন কেন?'

'তোর অকল্যাণ? অখন যা, অখন যা। সারারাত ঘুমাই নাই মেজাজ ঠিক নাই আমার।'

'হাসপাতালে যান না কেন?'

'হাঁটা যায় না।'

'ওঃ মোটর লাগবো।'

প্রায় প্রতিদিনই এমন চলতে লাগল। কিছুদিন, প্রায় দুমাস বলা যেতে পারে, রামেন্দু বাবুর এই দুর্ভোগ ছিল। সারারাত বসে বসে হাঁপাতো। হাঁপানির শব্দের মতো সেই শব্দে রাতের অন্ধকার যেন থর থর করে কাঁপত।

একদিন জুনি বলল, 'দেখো, ঘরখানাকে কী করছে।' রামেন্দুবাবুর ছেলে সরজমিনে তদন্ত করতে

গেল বোধ হয়। তার গলা শোনা গেল—'ইস্ এগুলা কী? ঘরখানাকে কী করছেন! গন্ধে আসা যায় না।'

রামেন্দুবাবু ক্লান্ত সুরে বললেন, 'কী করি ক, বাইরে যাইতে পারি না।'

গৃহিণী বললেন, 'বুড়ো হলে যা হয়। মরণ রোগ ধরেছে এবার।'

রামেন্দু বাবুর ছেলেকে বলতে শোনা গেল, 'যা তা খান কেন?'

'কী যা তা খাই ক?'

'ডাক্তারকে তো সাড়ে পাঁচ টাকা দিলাম। বোগ সারে না কেন?'

'কী কই ক।'

'আমি রিকসা ঠিক করে দিতেছি। হাসপাতালে যান।'

'হাসপাতাল?'

রোগটার বাডাবাড়ি হয়েছে তা বোঝা গেল। বার্লি ছাড়া কিছু আর পারছে না খেতে। উঠে বসার শক্তিও আর বোধ হয় নেই।

রামেন্দু বাবু বলল, 'বউমা, ঘরটা সাফ কইরা দিবা?'

'কখন করি কন? এতো কাজ, সংসারে একা তো।'

জুনি তার মেয়েকে ডেকে ঘর সাফ করে দিতে বলল।

মেয়ে বলল, 'পারুম না। ঘিন্না করে।'

ইতিমধ্যে একদিন রামেন্দুবাবুর বোধহয় ভাত খেতে ইচ্ছা হয়েছিল। তা বোঝা গেল তার ছেলের হাঁকা-হাঁকি থেকে, 'মাছ লাগবো কেন? জুনি বলল, 'ভাত খাইব যে।'

'ও আমার বড় লাটসাহেব আইছেন। পলতার ঝোলে হয় না?'

রামেন্দুবাবু বলল, 'পয়সা তো দিছি।'

'কই পাইলেন পয়সা? ট্যাকা কামাই করেন?

'ছিল আমার।' রামেন্দুবাবু হাঁপাতে লাগল।

'চুরি করাব আর জায়গা পান না?'

দুঃসহ বোধ হল। কিন্তু ঠিক এই সময়ে নরেন এল সেখানে। সব শুনে বলল, 'কি হলো। আমি মাছ এনে দিচ্ছি।'

'না ভাই। তুমি দিনরাত খালি কেন পয়সা খরচা করবা।'

'থামো না।'

রামেন্দুবাবুর ছেলে সত্যি থেমে গেল।

গৃহিণী বললেন, আশ্চর্য লোক কিন্তু এই নরেন। সাহসও আছে। ওর রাগের মাথায় কেমন টপ করে থামিয়ে দেয়। কিন্তু ব্যবসায়ে তাহলে কী উন্নতি হল?'

বললাম, 'পাঁচ ছজন খানেওয়ালাতো বটে। বাড়িভাড়া আছে। ছেলেটাকে মেয়েটাকে স্কুলে দিয়েছে। ভদ্রভাবে থাকবার চেষ্টা করছে তো। তার পবে রামেন্দু বাবুর চিকিৎসা।'

'কিন্তু তাতে মেজাজ খারাপ হবে কেন?'

'ওটা বোধ হয় ছেলে রামেন্দুবাবুর কাছেই পেয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'নতুবা ভদ্রভাবে থাকতে হলে অনেক ঝকমারি। সে সব তো সইছেও বটে ওই সামান্য আয়ে। উঁচু দিকে ওঠার চেষ্টাও করছে রুচির সাহায্যে।'

কথাটা যে মিথ্যা নয় তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল।

গৃহিণী জানালার কাছে গিয়েছিলেন। হাসিমুখে ফিরে বললেন, 'শোন।' ওদিক থেকেই শোনা

যায় নাকি।

শুনলাম, জুনির গলাই, 'সিনেমায় যাব ভাবছি।'

'যাও বউমা, যাও। সারাদিন খাটবা। জিরান লাগে।'

স্ত্রীলোকের কৌতূহল অনেক সময়েই প্রয়োজনের অতিরিক্ত। রাস্তার ধারের জানালা থেকে গৃহিণী নড়লেন না। কিছুক্ষণ বাদেই বললেন, 'দেখো, দেখো। মেয়েটা রূপসী সন্দেহ নেই। সাধারণ একটা তাঁতের চেক শাড়িতে কী সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'দু তিনটে ছেলেমেয়ে আছে শুনেছি।'

'তা সত্ত্বেও।'

রাত্রিতে এর অন্য পরিণতি দেখা দিল। রাত দশটা পার হয়েছে। রামেন্দু বাবুর ছেলে দোকান বন্ধ করে ফিরেছে।

'কী বাঁধো এত?'

'ডিমের ডালনা।'

'কেন? দিনে মাছ খাইছো।'

জুনি রসিকতা করে বলল, 'মানুষের সখ হয় না?'

'ট্যাকা দিল আমার কোন শ্বশুর?'

'ছি-ছি এমন কও কেন। নরেন খাইবো।'

'নরেন' রামেন্দু বাবুর ছেলে এই কথাটা বলেই চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ বাদেই নরেনের গলা পাওয়া গেল। বোঝা গেল সে আরও কিছু কিছু কিনে এনেছে।

ওদের খাওয়া-দাওয়া মিটতে সেদিন প্রায় রাত বারোটা হল।

অন্য আর একদিন গৃহিণী বললেন, 'দেখো, জুনির জীবনে পরিবর্তন এসেছে। নতুন টাকাব ঝাঁজ কাটিয়ে উঠেছে। আজ সাবাদিন শ্বশুরের ঘর পরিষ্কার করেছে। কল থেকে জল টেনে এনে গা মুছে দিল। মাথা ধুয়ে দিল। শ্বশুরের বোগটাও বোধ হয় একটু কম। বেশ উজ্জ্বল দেখায় জুনিকে। ক্লান্তিটা কেটে গিয়েছে।'

একটা রসিকতা করার লোভ সম্বরণ করা গেল না। বললাম, 'হাকস্‌লির গল্প বোধ হয়। রুগ্ন স্বামীকে সেবা করতে করতে একটি মেয়ে একেবারে ভেঙে পড়েছে। ঠিক তখন আর একটি পুরুষ। হাকস্‌লি বলছেন ঃ তার বিছানা থেকে নেমে এসে স্বামীর রোগশয্যায় পাশে যখন দাঁড়ায় সেই মেয়েটি, তখন তাকে উজ্জ্বল তো দেখায় বটেই, স্বামীর সেবায় যেন আরও তন্ময় হয়ে যায় সে।

'হাকস্‌লি ছাই।'

'কেন? এটা কি মনস্তত্ত্বের দিকে ভুল?'

'ছি-ছি।'

কিন্তু ওরা যখন নতুন হয়ে উঠছে তখন রামেন্দুবাবু প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা বোঝার মতো, মৃত অবয়বের মতো যেন ওদের-সংসারে জড়িয়ে আছে। আজকাল এটা ওদের আলাপেও ধরা পড়ে যায়। ছেলে একদিন রাগ করে বলল, 'যান না কোন চুলায় যাইবেন।'

রামেন্দু বাবু বলল, 'আম কাঠের চুলাতেই যামু।'

গভীর ভাবে বিষণ্ন শোনালো রামেন্দুবাবুর এই কথা কয়েকটি। গৃহিণী বললেন, 'মিষ্টির দোকানদার রসগোল্লা খায় না, কিন্তু চায়ের দোকানে মদ বিক্রি হলে দোকানদার তা খায়।'

'বাপের মতো শাটআপ বলে না বটে, কথা জড়িয়ে জড়িয়ে যায় আজকাল যখন দোকান থেকে ফেরে।'

'চমৎকার। কী কাদাই ঘাঁটছি আমরা।'

দুপুরে সেদিন দোকান থেকে খেতে এসেছে ছেলে। রামেন্দু বাবু কথা বলল। আজকাল তার গলাটা অত্যন্ত মৃদু, 'দুইটা ট্যাকা দিবি।'

'কেন?'

'ডাক্তার আনাইছিলাম।'

'কেন?'

'বড় কষ্ট।'

'ট্যাকা?' দপ্ করে জ্বলে উঠল ছেলে। 'মরেন না কেন? হাসপাতালে যান নাই কেন?'

'গিছিলাম। সেখানে কি চিকিৎসা হয়?'

কিন্তু স্নান খাওয়া-দাওয়ার পর রাগ পড়ল ছেলের। রামেন্দু বাবুর ঘরের দরজায় দাঁড়াল সে।

'যখন তখন কন—কী কই ঠিক থাকে না।'

'থাক্, বাবা, থাক। নরেন বলছিল তাই ডাক্তার আনাইছিলাম। অখন আমার যাওয়ার সময়। যামু। ডাক্তার কী করবো?'

অভিমানের মতো শোনালো রামেন্দুবাবুর কথা।

পরদিন আবার ঝগড়া হল। জুনি ওষুধ আনিয়েছে তাই নিয়ে। চিৎকার করে মৃত্যুপথ যাত্রী সেই রুগীর সামনেই ছেলে তার মৃত্যু কামনা করল। কিন্তু তার পরেই রাগ পড়ে গেল। রামেন্দুবাবুর দরজায় এসে দাঁড়াল। ওষুধের শিশির লেবেল পড়ে দেখল। বলল—সেরে যাবে এইবার।

আশ্চর্য। কী দিয়ে তুলনা দেবো খুঁজলাম।

গৃহিণী বললেন, 'কী বদমেজাজ।'

বললাম, 'কিন্তু ও যেন নিজেকেও রেহাই দেয় না। দাঁড়াও, দাঁড়াও! মনে পড়ছে কথাটা। বৃশ্চিক নিজের মাথায় হুল ফোটায়।'

'হাকস্‌লি বলেছে নাকি?'

হঠাৎ সেই রবিবারের কথাবার্তা শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

রামেন্দুবাবুর ছেলে এ সময়ে দোকান থেকে ফেরে না।

'বাবা, বাবা।'

'উঃ?'

'আম খাইবেন?'

'না।'

'বাবা, মিষ্টি আম। রসগোল্লা খান একটা।'

রামেন্দুবাবু মৃদুস্বরে কী বললেন বোঝা গেল না।

গৃহিণী বললেন, 'সে কী?'

'ডাক্তার বোধ হয় কিছু বলেছে।'

'কী? তুমি শুনেছো?'

'ছেলে বোধ হয় শেষবারের মতো বাপকে খাওয়াচ্ছে। এই শেষ।'

গৃহিণী কেঁদে ফেললেন।

বিকেলে ডাক্তার এল। নরেন ছুটোছুটি করতে লাগল। ইনজেকশন দেয়া হল।

ছেলে গিয়ে বসল বাপের কাছে। 'বাবা, একটু খান।'

রামেন্দুবাবু অতি মৃদুস্বরে বললেন, 'কাল খামু।'

'বাবা, ও বাবা, লছমন দাদা আসছে। কই, বাবা, শোনেন।'

'কাল।'

ছেলে দোকান তদারক করতে গিয়েছিল বিকেলে। সন্ধ্যার পর কে একজন তাকে ডেকে আনল। দ্রুতপায়ে সে যখন রামেন্দুবাবুর ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল তখন জুনি এবং তার ছেলেমেয়েরা কাঁদতে সুরু করেছে।

গৃহিণী বলল, 'নরেন ছিল তাই।'

বললাম, 'আর কেন?'

'না, বলছি। হবিষ্যের সব যোগাড় করছে। খরচ তো আছে। নতুন কাপড় চোপড় কিনতে হয়। এ বাড়িতে থাকে এখন নরেন। ওদিকের এক ভাড়াটে উঠে গিয়েছে। সেই ঘরেই থাকে। আমি ভাবছি দুধ ফল কিছু পাঠিয়ে দেবো।'

'আলোচনার মতো গুরুত্ব নেই।'

'পরশুদিন শ্রাদ্ধ। ঘরদোর সাফ সুতরো করছে। কী খাটছে জুনি। নরেনও।'

'কালীঘাটে শুনেছি উপনয়ন, বিবাহ, এ সব হয় : শ্রাদ্ধ হয় না?'

'কী নির্দয় তুমি।' এই বলে গৃহিণী চলে গেলেন।

বিকেলে বাইরে সবুজ বারান্দায় বসেছিলাম। সেখানে গৃহিণী এলেন। বললেন, 'তোমার কথাই বোধ হয় ঠিক হতে চলল।'

'কী এমন কথা শুনি!'

'শ্রাদ্ধ ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে গড়াবে! আবার রাগে ফেটে পড়ছে লোকটা। নরেনকেও বলে দিল এ সব কথার মধ্যে এসো না।'

'কোনদিন না তোমাকে বলে।'

'চেঁচাচ্ছে শুনছো না।'

একটা চাপা চেঁচানির শব্দ যেন কানে এল।

সন্ধ্যাবেলায় মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা হল বোধ হয় রামেন্দুবাবুর ছেলের। শ্রাদ্ধটা হবে। তাই নিয়ে সে আলোচনা করছে শোনা গেল। এই গরম এই ঠাণ্ডা। অদ্ভুত তো।

শ্রাদ্ধটা খুব ঘটা করে করল না সে। শ্মশানবন্ধু কয়েকজনকে ডেকে থাকবে।

ইতিমধ্যে গৃহিণী মন্তব্য করলেন, 'বাস্তবিক কী বন্ধুভাগ্য দেখো। সারাদিন কী রকম খাটছে দেখো নরেন। বাজার করা, যজ্ঞের যোগাড় করা, রান্নার তদ্বির করা কি না করছে। আর জুনি। বাস্তবিক কী পবিত্রই দেখাচ্ছে তাকে। এমন দেখারও সার্থকতা আছে। কোরা চওড়া লালপাড় শাড়ী পরেছে যেন গরদ। এও নরেনই কিনে দিয়েছে। এমন কি ছেলেমেয়েদের নতুন জামা প্যান্টও।'

কিন্তু রাগারাগি ওরা করবেই, সন্ধ্যার পর রামেন্দুর ছেলে জিজ্ঞাসা করল, 'নরেন কই।'

'খাইব না কয়!' জুনি বলল।

'কেন?'

'জান্ না।'

কিছুক্ষণ পরে আবার শোনা গেল, 'কই গিছিলা।'

'নরেনকে কলাম।'

'খাইব না?'

'চা দিছি। খাইছে।'

'হুম্।'

জুনি বোধ হয় চলে যাচ্ছিল। ডাকল তাকে, 'শোন। কালকে কী করবার চাও।'

'মাছ মুখ।'

'কাম নাই।'

'কী কও?' হাসল জুনি।

'আমার বাপ আর চায় না কিছু।'

'কইছে। মাথা খারাপ হইছে নাকি?'

'মাথা খারাপ?' গর্জন করতে গিয়ে হঠাৎ যেন সে থেমে গেল। 'তা সে হউক। আর না।'

সন্ধ্যার পর নরেনের গলা শুনতে পাওয়া গেল।

সে বলল, 'কাল তো মাছ ছুঁতে হয়।'

রামেন্দুবাবুর ছেলে বলল, 'দরকার নাই।'

জুনি হেসে বলল, 'সারাদিন যজ্ঞের পর মাথা গরম হইছে। সবই হইব।'

নরেন বলল, 'লোকজন বলা লাগে।'

রামেন্দুবাবুর ছেলে বলল, 'তুমি আমার কাছে তিন শ টাকা পাও নবেন। আর শ্রাদ্ধে যা খরচ করছো তার হিসাবও করছি। তাও এক শ। তোমার টাকা আমি শোধ করে দিব।'

রাগ নয়, বিনীতও নয়। আশ্চর্য দৃঢ় স্বর।

নরেনের মুখ কি ফ্যাকাশে হল। সে বলল, 'আচ্ছা শোধ কোরো।'

'তুমি তো অনেকদিন বাড়ি যাও না।'

জুনি বলল, 'আহা, কী কও।'

'ঠিক কই না?'

গৃহিণী আমার দিকে ফিরে বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারছি না।' পরদিন সকালে হঠাৎ একটা গোলমাল সুরু হল। আফিস বেরুচ্ছি তখন। গৃহিণী বড় বড় চোখ করে তাকালেন আমার দিকে।

'যা মেজাজ। বলে হাসলাম।

'জানো। অনেক সময়ে ভয় করে।

হেসে বললাম, 'শ্রাদ্ধ কোথায় গড়াচ্ছে সে খবর নিতে যাওয়া কেন।'

বিকেল বাড়িতে ফিরতেই গৃহিণী ওদের খবর আনলেন। 'মচ্ছমুখ হয়নি।' চায়ের টেবলে বললেন তিনি।

'সে কি? নরেন পারল না রাগ থামাতে।'

'নরেন মাছ কিনে এনেছিল। তা অনেকটা মাছ। মাছ আর মিষ্টি। কয়েকজনকে খেতেও বলেছিল। রামেন্দু বাবুর ছেলে পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মাছ, মিষ্টিগুলো নর্দমায় ঢেলে দিয়েছে। আর—

'নিজের মাথার চুল ছেঁড়ে নি?'

'চুল নেই তো, কাল কামিয়েছে। থাকলে তাও করতো। নরেনকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে।'

'মদ খেয়েছিল বলো।'

'তাজ্জব। নরেনকে বলল, আর না। আর আইবা না।'

তিন চারদিন পরে সকালের দিকেও ওদের উঠোনে চেঁচামিচি শোনা গেল। বোঝা গেল নরেন এসে অন্য এক ভাড়াটের বারান্দায় বসেছে। রামেন্দুবাবুর ছেলে তাকে দেখে খেপে গিয়েছে। কিন্তু কীই বা করার আছে তার। সে নরেনকে যত গাল দিল অন্য ভাড়াটে ততই বলল, 'উনি তো আপনার ঘরে যায় নাই আপনে চেঁচান কেন।' রামেন্দুর ছেলে বলল, 'অনেক আছে মশায়। আশ্রয় দিবেন না। কাল সাপ।

জুনি হঠাৎ যেন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে যোগ দিল। বলল স্বামীকে, 'চুপ করো। লোকে কয় কী।'

রামেন্দুবাবুর ছেলে মনে হল থেমে গেল। হঠাৎ সে তীব্রস্বরে ধমক দিয়ে উঠল, 'চুপ, ছেনাল।'

গৃহিণীকে জানলার কাছ থেকে সরে আসতে বললাম। 'লোকটা পাগল হয়ে যাচ্ছে। মদে এমন হয়। সরে এসো।'

গৃহিণী বললেন, 'বোঝা যাচ্ছে না কিছুই।'

'বুঝেই বা কী লাভ?'

'আমার মনে হয দেনা এড়ানোর চেষ্টা। যাতে গালমন্দর ভয়ে এদিকে না আসতে চায় তারই ব্যবস্থা করছে।'

'মন্দ বলো নি কথাটা। তিন চার শ টাকা সারা জীবনে শুধতে পারবে না। নরেনের কিছু আটকেও রেখেছে হয়তো। নতুবা সেই বা আসবে কেন।'

তিন চারদিন পরে আফিস ফেরৎ গলিতে ভিড় দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ভিড়টা আমাদের প্রতিবেশীর দরজাতেই। ঘরে ঢুকে দেখি বিবর্ণ মুখে গৃহিণী ঘরের কোণে বসে আছেন। আমাকে দেখেও কথা বলতে পারলেন না। প্রায় মিনিট দশেক পরে বললেন, মেয়েটা বোধ হয় মরেই গেল।

'সে কী? কে?'

'জুনি।'

'কেন?'

'লাকড়ি দিয়ে মেরেছে, উঠোনে পড়ে আছে।'

'কেন?'

'কী জানি। চিঠি নিয়ে কী ব্যাপার। একটা রেজিস্ট্রি চিঠি নাকি এসেছিল জুনির নামে। লোকটা নিতে মানা করেছিল। বেরুনোর মুখে পিওনকে দেখে ভাগিয়ে দিয়েছিল। চিঠিটা নাকি নরেন পাঠিয়েছে। স্বামী চলে যেতেই জুনি পিওনকে ডেকে পাঠিয়ে চিঠিটা নিয়েছে সই করে ; আমরা যখন জানতে পারলাম তখন জুনিকে চড়চাপড় মারতে সুরু করেছে। প্রতিবেশীরা থামাতে গিয়েছিল। মার খেতে খেতেও মেয়েটা বলছিল—চুপ কর। লোকে শুনে বলে কী। লোকটা ততই চেঁচাল ইজ্জত গেছে, আছে আর কি! তারপর লাকড়ি দিয়ে মারল মেয়েটাকে যতক্ষণ সে পড়ে না গেল উঠোনে। আর তখন লোকটা হঠাৎ বাইরে গিয়ে বাইরের ঘরের দেয়ালে যে টিনের টুকরোয় রামেন্দুবাবুর নাম লেখা ছিল সেটা খুলে এনে জুনির গায়ের উপরে ফেলে দিল। এতদিনের এত রাগ, দিশেহারা বদমেজাজ যেন উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছিল।

ঘরের মধ্যেই আছে। প্রতিবেশীদের বলেছে নিজেই পুলিশে খবরটা দিতে। এই কিছুক্ষণ আগেও একবার নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিল—বাপই গিছে অখন আমি আর ভদ্রলোক কিয়ের? আর কেন ভদ্রলোক কইয়া পরিচয় দিমু? বাপ নাই, লজ্জা পাইব।'

ওদের ঘরটা যেখানে ছিল জায়গাটা আমি কিনে নিয়েছি। আর একবার এমন ঘটতে দিতে চাই না নিজের ঘরের অত কাছে। কিন্তু যেখানে রামেন্দুবাবুর নেম প্লেটটা পড়েছিল জুনির রক্তের দাগের মধ্যে পুলিশ লাশটা সরানোর পরে, সেখানে একটা বেদী তৈরি করে দিয়েছি আমি। কাজটা ভালো করি নি। কারণ বেদীর গায়ে কী লেখা যাবে ঠিক করতে পারছি না।

ভটওলা

লাইট রেলওয়ের গাড়িটা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই, অর্থাৎ শীতের সকালের কুয়াশা উঠে যাওযার আগেই, তার সীমান্ত স্টেশনে পৌঁছে গেল। পাঁচ-ছটি সাধারণ এবং একটি উচ্চশ্রেণীর কামরা, দেখলে ম্যাচবক্সের কথা মনে পড়ে, তা নিয়েই গাড়িটা। এই ছোট গাড়ির রেলপথ একটা জংশনে সাধারণ চেহারার গাড়ির রেলপথে সংযুক্ত। পথের স্টেশনগুলোতে কোন-না-কোন চা বাগানের নাম লেখা ছিল। বিরলযাত্রী সেসব স্টেশন চা বাগানের প্রয়োজনে তৈরি। কিন্তু এই স্টেশনে আসবার আগে পরপর দুটো স্টেশন দেখে তা মনে হয়নি। একটার কাছাকাছি কাঠের গুদাম দেখা গিয়েছিল অবশ্য। আর এটা? প্ল্যাটফর্ম বলতে কিছুই নেই, যদি পাথরকুচি ছড়ানো কয়েক হাত জায়গাকে সে সম্মান দিতে না হয়। তারপরেই আসবেস্টসের ছাদ দেওয়া দুখানা কাঠের ঘর, তার একটির সামনে ঘণ্টা দেয়ার একখণ্ড রেল ঝুলছে। কিছু দূরে চারটে রেল খাড়া কবা। সেগুলোর মাথায় একটা জলের ট্যাঙ্ক।

একটা সাধারণ ব্যাপার এই যে উচ্চশ্রেণীর কামবাটায় এখনও তিনজন যাত্রী আছে। স্টেশন দেখে এবং এই স্টেশনে পরস্পরকে দেখে তারা বিস্মিতই হল।

যাত্রী তিনজনের মধ্যে একজন প্রৌঢ়। মাথার চুল সামনের দিকে বিশেষভাবেই ফাঁকা। গোল সোনালি ফ্রেমের চশমার আড়ালে গোল গোল চোখ। দাড়ি নেই, সিগারের ধোঁয়ায লাল এক থোবা গোঁফ আছে। তাকে দেখে, বিশেষ করে তার চোখ পাকিয়ে তাকানোর ভঙ্গি থেকে, বুঝতে পাবা যায় সে একজন সরকারি কর্মচারী। অবশ্য খুব উঁচুধাপের কেউ নয়, কারণ তেমন কেউ কোন অবস্থাতেই এমন জায়গায় আসবে না। তাকে ইন্সপেক্টার শ্রেণীতে ফেলা যায় বরং।

দ্বিতীয়জন ব্যারিস্টার। তার পোশাক, তার চালচলন, তার বিয়ারের বোতল, তাব সিগারেট, এসবের মধ্যে ছাত্রশ্রেণীর ভাবটা, অথবা অ্যালবিনোদের দেশে ইনে পড়ার সময়ে অর্জিত ম্যানার্সের ছায়া যা মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে তা প্রকাশ পাচ্ছে। বয়সও পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি হবে না। আজকাল আভিজাত্যের রকমফের হয়েছে। তাকে দেখলে জমিদারির সঙ্গে সংযুক্ত একটু বিশেষ রকমে অসহিষ্ণু আভিজাত্যের কথা মনে পড়ে যাদের সংখ্যা আজকাল বিরল হয়ে আসছে।

তৃতীয় যাত্রী বয়সের দিক দিয়ে এদের মাঝামাঝি হলেও বরং প্রৌঢ়ের দিকেই ঝোঁকা। তার চেহারা, পোশাক এবং হাবভাবে এমন একটা অবর্ণনীয় সাধারণতা ছিল যা দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। এমনকী ব্যাংকের উপরে তার যে ছোট চামড়ার ব্যাগটি আছে তার গায়ে, সাধারণত ভ্রমণকারীদের ব্যাগে যেমন থাকে, অনেক এয়ার সার্বিসের লেবেল সাঁটা। সে যে ভ্রমণকারী এ রকম একটা ভাবই যেন ফলাও করে দেখাতে চায় সে। আর তা দরকারও কারণ সে পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের একজন গোয়েন্দা।

তিনজনের মুখেই বিস্ময়ের ছাপ পড়ল। এদিক-ওদিক চেয়ে ইন্সপেক্টার দেখতে পেল একজোড়া রেল তাদের গাড়ির নিচের থেকে বেঁকে বেরিয়ে গিয়ে একটা সাইডিং সৃষ্টি করেছে, আর তার উপরে পাথরের টুকরো বোঝাই দু-একটা ছাদখোলা মাল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এটা, সুতরাং, এই রেল কোম্পানিরই পাথর সংগ্রহ করার জন্য তৈরি একটা হল্ট—এই ভাবল সে।

ব্যারিস্টার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে এদিক ওদিক চেয়ে পোর্টার বা কুলি কাউকে দেখতে না পেয়ে নিজেই তার ভারি ব্যাগটাকে টেনে নামাল। তারপর স্টেশনের ঘর দুখানার দিকে এগিয়ে গেল। স্টেশনমাস্টারকে খুঁজে পেয়ে সে বলল তার ভারি ব্যাগটাকে সে রেখে যেতে চায়। পরে লোক পাঠাবে। স্টেশনমাস্টার রাজি হলে সে সিগারেট ধরাল, স্টেশন ঘর দুখানার এদিক ওদিকে অনির্দিষ্টভাবে সে পায়চারি করল একবার। তারপর ফিরে গিয়ে স্টেশনমাস্টারকেই জিজ্ঞাসা করল ভটওলার পথ জানে কিনা। স্টেশনমাস্টারের মুখ দেখেই বোঝা গেল এ রকম কোন নাম সে এর আগে শোনেনি। চিন্তা করার জন্যই তখন ব্যারিস্টার বারান্দায় রাখা কালো বেঞ্চটায় বসল।

ব্যারিস্টার যখন স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে কথা বলছে, প্রথমে ইন্সপেক্টার পরে টুরিস্ট নামল গাড়ি থেকে। ইন্সপেক্টারের সঙ্গে তার আর্দালি ছিল। ইন্সপেক্টার তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। আর্দালি তার বিছানা বাক্স ইত্যাদি নামাল। ততক্ষণে ইন্সপেক্টার আর একবার চুরুট ধরাল। আর্দালি বলল, 'জায়গাটার নাম ভটওলা তো? স্টেশনমাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলে হয় গাড়িটারি কিছু পাওয়া যায় কিনা'।

তার মনিব বলল, 'জিজ্ঞাসা করতে পারো কিন্তু লাভ হবে বলে মনে হয় না। বরং পুরনো কাঠগুদামের কথা জিজ্ঞাসা করো। সেখানে পৌঁছাতে পারলে উত্তর দিকে যেতে হবে, এই রকমই শুনেছি'।

আর্দালি চলে গেলে ইন্সপেক্টার তার গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে চিন্তা করল। এই স্টেশন থেকে তিন মাইল পশ্চিমে গেলে বনমহলের পুরনো কাঠগুদাম যা এখন পরিত্যক্ত হয়েছে। তারপরে রেলের পাথরভাঙা আড্ডা থাকার কথা, যদি পরিত্যক্ত না হয়ে থাকে। আরো উত্তরে ভটওলার মালভূমি পাওয়া যাবে। অফিসের নির্দেশ থেকে বনমহলের আইন মেনে চলছে না। কিন্তু তার আগে নিশ্চিত হওয়া দরকার মালভূমিটার কোন কোন অংশ বনমহল এবং খাসমহলের এক্তিয়ারে পড়েছে এবং গ্রামের লোকেরা কাকে খাজনা দিচ্ছে, আদৌ দেয় কিনা।

আর্দালির সঙ্গে সঙ্গে স্টেশনমাস্টার এল। সে সবিশেষ ঘাবড়ে গিয়েছে তার স্টেশনে এই যাত্রীদের নামতে দেখে। সে বলল, ভটওলার নাম সে কোনদিন শোনেনি। তবে কিছুদিন আগে কয়েকজন লোককে সে এই স্টেশনে আসতে দেখেছিল। চামড়ার ফিতে দিয়ে মাথায় বাঁধা কিন্তু পিঠের উপরে বয়ে নেয়া ঝুড়িতে তারা কমলা এনেছিল, চা বাগানের দিকে বিক্রি করতে গিয়েছিল। তারা বলেছিল তাদের বস্তি কাঠগুদামের ওপারে পাহাড়ে। যদি হয় তবে সেটাই ভটওলা নইলে এদিকে আর বস্তি কোথায়?

এ কথার পর ইন্সপেক্টার দেরি করা অযৌক্তিক মনে করল। কাঠগুদামের পরে রেলের পাথরভাঙা কুলিরা ভটওলা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে বলে আশা করল।

টুরিস্ট, অন্যদিকে, গাড়ি থেকে নেমে সোজাসুজি স্টেশনের গেটের কাছে উপস্থিত হল। সে ভাবল, এই দুজন যাত্রী যখন এ স্টেশনেই নেমেছে তখন তারা ভটওলার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। তা যদি হয় তবে তার কাজ এখান থেকেই শুরু হবে এবং তাকে বিশেষ সতর্ক হয়েই চলতে হবে। এ চিন্তাটা তার মুখে একটা সাময়িক উদাসীনতার ভাব ফুটিয়ে তুলল। কারণ পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের যে রিপোর্ট সম্বন্ধে সে তদন্ত করতে যাচ্ছে তা যদি আংশিক সত্য বলেও প্রমাণ পাওয়া যায় তবে সতর্ক হওয়ার যথেষ্ট কারণই আছে। ভটওলা সম্বন্ধে তার ব্রিফিং যতদূর সম্ভব নিখুঁত। যথা, তাকে জানানো হয়েছে ভটওলা গ্রামটা বর্তমান অবস্থায় রেকর্ডে এসেছে ত্রিশ থেকে পঁচিশ বছর আগে। এ অঞ্চলটাকে আভ্যন্তরীণ তেরাই বলা যেতে পারে। এই তেরাই অঞ্চলে একটি বন্য মালভূমির উপরে এই গ্রামে যেমন কল্পনা করা যায় না তেমন সুখস্বাচ্ছন্দ্যে একদল লোক বাস করে। গুজব এই, একজন বিপ্লবী পালিয়ে এসেছিল এখানে ত্রিশ বছর আগে। সেই এই গ্রামের

উন্নতি ঘটিয়েছে। কিন্তু পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট কিছুদিন থেকে সন্দেহ করেছে এটা একটা স্পাইং সেন্টার। এটা বিশ্বাস করাই যায় না শহর থেকে এতদূরে কয়েকজন সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত নাগরিক-রুচিসম্পন্ন মানুষ বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছাড়া বাস করতে পারে।

টুরিস্ট গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই আর্দালি এবং তার ইন্সপেক্টারও এগিয়ে এল সেদিকে এবং কিছুপরে ব্যারিস্টারও।

চার-পাঁচ ঘন্টা একই কামরায় বসে এসেছে তারা। সুতরাং প্রথম আলাপের দ্বিধা ছিল না। তখন তাদের নিম্নলিখিত আলাপ হল।

ইন্সপেক্টার টুরিস্টকে সরাসরি বলল, 'অনেকক্ষণ একসঙ্গে এসেছি কিন্তু কে কোথায় যাব তা জিজ্ঞাসা করা হয়নি'।

'তা হয়নি'। টুরিস্ট বলল, 'আপনিও কি ভটওলায় যাবেন'?

'ঠিকই ধরেছেন। আপনি'?

টুরিস্ট হেসে বলল, 'আমার কোন গন্তব্য স্থির নেই। বেশ কিছুদিন থেকে একটা গুজব শুনছি এদিকের এই ভটওলার। কিন্তু তা মৃগতৃষ্ণিকার মতো মারাত্মক ভূল কিনা কে জানে'?

ইন্সপেক্টার বলল, 'গ্রামটা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু পথটা খুঁজে পাওয়াই কথা। ভুলপথই মারাত্মক হতে পারে'।

এই বলে সে চোখ তুলে দিগন্তের দিকে চাইল। যতটুকু কুয়াশা কেটেছে সেখানেই বন দেখা দিয়েছে, বন এবং মাঝে মাঝে ন্যাড়া পাহাড়।

ইন্সপেক্টার বলল, 'আমি এ পথে কোনদিন আসিনি, আপনি?'

টুরিস্ট বলল, 'এগোনো যাক্, চলুন'।

এই সময়ই ব্যারিস্টার এসেছিল। ইতিমধ্যে সে তার ব্যাগ খুলে নতুন এক বোতল বিয়ার বার করে নিয়েছে। সেটা তার কাঁধ থেকে চামড়ার স্ট্র্যাপে ঝোলানো।

তাকে বরং অপ্রতিভই দেখল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কি, বাই এনি চান্স, ভটওলার দিকে যাবেন'?

ইন্সপেক্টার বলল, 'আমরা চারজন হলাম। এট' একটা যোগাযোগ যা গল্পে ঘটে না, জীবনে বরং ঘটে'।

'তা হলে আপনারাও ভটওলায় যাচ্ছেন'? ব্যারিস্টার আবার জিজ্ঞাসা করল।

'শ্যয়র'। টুরিস্ট মুখে একটা হাসি টেনে আনল।

এই যোগাযোগের ফলেই তারা একটা পার্টির মতো রওনা হল। পথের চিহ্ন একেবারেই নেই তা নয়। হাত দুয়েক চওড়া লালমাটির পথ, অসমান এবং কোথাও কোথাও আগাছায় ঢাকা। পথের দুপাশেই শাল গাছের সারি। পুরনো কাঠগুদাম পর্যন্ত এই পথেই চলল তারা।

গুদামটা বেশ কিছুদিন আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে তা বোঝা গেল। ঘরগুলোর কাঠের তক্তার দেয়ালের দু-একখানাই মাত্র আছে শ্যাওলা ঢাকা অবস্থায়। ছাদ কোনটারই সম্পূর্ণ নেই। এখানে তারা কিছুক্ষণের জন্য থামতে বাধ্য হল। কারণ পথটা এখানেই শেষ হয়েছে। ব্যারিস্টার তার বিয়ারের বোতল খুলল। ইন্সপেক্টারও তার অসংখ্য চুরুটগুলোর আর একটিকে ধরাল।

টুরিস্ট কপট আশঙ্কা জানিয়ে বলল, 'এরপরে আমাদের বনের মধ্যে পথ খুঁজতে হবে'।

ইন্সপেক্টার বলল, 'ঠিক তা নয়। আর খানিকটা পথ আমাদের জানা আছে। বরং উত্তরপূর্ব দিকে যেতে হবে আমাদের। সেখানে রেলের পাথরভাঙা কুলিদের বস্তি থাকার কথা'।

ব্যারিস্টার বলল, 'তারপর বুঝি আর পথ নেই?'

টুরিস্ট তার ব্রিফিং থেকে জানে ইন্সপেক্টারের পথ সম্বন্ধে ধারণাটা মোটামুটি ঠিক। কিন্তু সে চিন্তা করল। ইন্সপেক্টার বিনা দ্বিধায় ভটওলার পথের কথা বলছে। ব্যারিস্টার কিছুই বলেনি। এটা কি এক্ষেত্রে ব্যারিস্টারের ভান? তা সত্য হলে ব্যারিস্টারের উপরেই বেশি করে চোখ রাখতে হয়। অবশ্য, এর অন্য সিদ্ধান্তও হতে পারে যে ইন্সপেক্টরের সহজ ভাবটাই সন্দেহকে নিরস্ত রাখার কৌশল।

তারা আবার চলতে শুরু করলে টুরিস্ট ব্যারিস্টারের পাশে জায়গা করে নিল।

চলতে চলতে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি, কিছু মনে করবেন না, ভটওলা এস্টেটের আইনের পরামর্শদাতা। তা হলে ওদের চিঠি লিখলেই পারতেন, ঘোড়া কিম্বা লোক আসতে পারত'।

ব্যারিস্টার হাসল, বলল, 'আমি ভটওলাকে আইনের সাহায্য করি না। কিন্তু ঘোড়া পাঠাতে লিখেছিলাম'।

টুরিস্ট এই সংবাদটাকে আদায় করতে পেরে খুব খুশি হল কিন্তু মানসিক চঞ্চলতাকে সে অত্যন্ত ঔদাস্যে ঢেকে দিল। বলল, 'তা হলে'?

'ওদের পোস্ট অফিস আছে ওটা ভাবাই ভুল হয়েছিল'।

টুরিস্টের কাছেও এটা একটা আবিষ্কার, অন্যথায় এ উত্তরটার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। সংবাদটাকে নিজের মনে বসিয়ে নিতে সময় লাগল। সে স্থির কবল ব্যারিস্টার আইনের পরামর্শদাতা নয় তা ধরে নেওয়াই ভালো। ব্যারিস্টারের উত্তর দেয়ার ভঙ্গিই তা বলে। এরপরে, কিছু সময় পার করে দিয়ে, জানতে হবে তা হলে সে ভটওলায় যাচ্ছে কেন।

কিন্তু ইন্সপেক্টার বলল, 'ভটওলার এস্টেট ব্যারিস্টার রাখবে আইনের পরামর্শ দিতে এমন বড় নয়।'

টুরিস্ট বলল, 'এর আগেও তা হলে এদিকে এসেছেন, বলুন।'

ইন্সপেক্টার হাসল, সে হাসিতে অবশ্যই অফিসের গুমোর ছিল, বলল সে, 'কিছু খবর দিতে পারি আপনাদের।'

টুরিস্ট স্বভাবতই আগ্রহ দেখাল। কারণ ইন্সপেক্টার এবং ব্যারিস্টারের ভটওলা সম্বন্ধে জ্ঞান যদি আলাপে প্রকাশ পায় তবে তার কর্তব্য পালনে সহায়তা করবে।

ইন্সপেক্টার বলল, 'এই মালভূমিতে একটা পুরনো গ্রাম ছিল। সেটা বিশের দশকে ইনফ্লুয়েঞ্জা কিম্বা তেমন কিছুতে ফৌৎ হয়ে যায়। তারপর ত্রিশের দশকে আবার গ্রামটা গড়ে উঠতে শুরু করে। এখন মুস্কিল হচ্ছে বনমহল বলে মালভূমিটা তাদের, আর গ্রামের লোকরা বলছে মালভূমিটা তো তাদের বটেই, বনমহলের অধিকার করা অনেক জায়গা তাদের গ্রামের অংশ ছিল আগে'।

টুরিস্ট বলল, 'আপনি অনেক খবর রাখেন, আশ্চর্য'।

তার এই কপট বিস্ময় আর কারো লক্ষ্যে এল না। ব্যারিস্টার বলল, 'বনমহল দখল করতে এলেই তো হল না। তাদের, মানে গ্রামবাসীদেরও, স্বত্ব থাকতে পারে যা আদালতে প্রমাণ করা যায়'।

টুরিস্ট আবার হেসে বলল, 'আইনজ্ঞের মতোই বলেছেন, যদিও ভটওলার সঙ্গে আপনার আইনজীবীর সম্বন্ধ নয়'।

ব্যারিস্টার বলল, 'কিন্তু আত্মীয়তার সম্বন্ধে থাকতে পারে'।

'আচ্ছা'! টুরিস্ট সত্যি বিস্মিত হল এই সংবাদে। একটা আকস্মিক উদ্ঘাটন সে আশা করে নি।

ইন্সপেক্টার বলল, 'বলেন কি? তা হলে তো'—

রেলের পাথর যেখানে ভাঙা হতো সেখানে লোকজন নেই, কিন্তু পাহাড়ের গায়ে মানুষের

হাতুড়ির দাগ আছে। সেখানে তারা একটু থেমে দাঁড়াল। কারণ তাদের বাঁদিকে বনের মধ্যে সরু সরু পায়ে চলা পথ চোখে পড়লেও সেগুলোর কোনটি কতদিন ধরে বনের মধ্যেই পাক খাচ্ছে তা বলা কঠিন, এবং টুরিস্টও স্থির করল পথ দেখানোর ব্যাপারে তার পক্ষে এখানে কৃপণ হওয়াই স্বাভাবিক হবে।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই টুরিস্ট বুঝতে পারল পথ সম্বন্ধে ইন্সপেক্টার এবং ব্যারিস্টারের অজ্ঞতার মধ্যে সন্দেহ করার কিছু নেই, তখন সে তার পোলিটিক্যাল অফিসের ব্রিফিং কাজে লাগানোর জন্য প্রস্তুত হল। বলল, 'আমি যখন টুরিস্ট আমাকেই পথ খুঁজে নেয়ার ভার নিতে হবে।'

কিন্তু ঘণ্টাখানেক চলার পরে এমন একটা আশঙ্কা দেখা দিল যে তারা ভুল পথে চলে এসেছে। এই আশঙ্কার চাপেই ইন্সপেক্টার এবং ব্যারিস্টার পরস্পরকে দোষারোপ করল একবার, ভুল পথে চলে আসার জন্য যদিও কেউ অন্য কাউকে পথ চলার দায়িত্ব দেয় নি। টুরিস্ট সে আশঙ্কাকে উপেক্ষা করেই আগে আগে চলল কারণ সে তখন মনে মনে বিচার করছিল এর পর আলাপটাকে আবার কোথায় শুরু কবা যায়।

এরপরে তারা শুকনো চওড়া একটা নদীখাতে এসে পৌঁছালো। কোথাও কুচি শামুকের খোলা ছড়ানো, কুচিপাথরের সঙ্গে মিশানো বালি, অন্য কোথাও ঝাউএর ঝোপ। সে বালিতে এখানে ওখানে জন্তু জানোয়ারের পায়ের ছাপ। এখানে টুরিস্টকে বিলক্ষণ চিন্তিত দেখা গেল আর সেটা কপটও নয়। কারণ তার ব্রিফিং-এ এমন কোন নদীর কথা ছিল না। তাবও কারণ এই যে তার ব্রিফিং তৈরি হওয়ার পরে পাহাড়ী বন্যায় এ নদীটা তৈরি হয়েছে।

সেই নদীটাকে পার হয়ে যাওয়াই উচিত মনে করল তাবা। আর তা কবে ভালো হল। নদীটা পার হয়ে আর আধ ঘণ্টা চলে পাহাড়ের গায়ে এক সময়ে চাষ কবা হয়েছিল এমন চিহ্ন তারা দেখতে পেল। এটাকে তারা আবিষ্কারের মতো গুরুত্ব দিল।

তাদের এ আশাটা মিথ্যা হল না। সামনের চডাইটাব চূড়ায় উঠতেই বাঁ দিকেব উৎরাইএর খাঁজে খাঁজে বস্তিটাকে তারা দেখতে পেল। রং করা দেয়ালের দশ বারোটা বাড়ি অন্তত তাদের চোখে পড়ল।

আর কিছুদূর যাওয়ার পর ছবিটা আর একটু স্পষ্ট হল। একটা বড় বাংলোর চারিদিকে উপরে নীচে, পাহাড়ী মালভূমিতে যেমন হয়, আরো কয়েকটি ছোট ছোট বাংলো। কাঠের দেয়াল, খড়ের ছাদ, কোন কোন জানলায় কাচের সার্সি যার উপরে দিনের আলো চমকে উঠছে।

তারা লাল পাহাড়ী মাটির খাড়া পথ বেয়ে উঠতে শুরু করল। পথটার এ বাঁকে ও বাঁকে ছোট ছোট বাংলো ধরনের বাড়ি। কাঠের পাটাতনেব বারান্দায় টিনের কৌটায় ফুলের গাছ। অন্য একটি বাংলোর খড়ের ছাদ বেয়ে লাল ফুল সমেত একরকম লতা উঠেছে। অন্য আব একটির ছাদে একরাশ পায়রা। তারা গলা ফুলাচ্ছে, ঝুঁটি নাড়ছে, আকাশে পাক খেয়ে আবার বসছে এসে নিজের জায়গায়। ওদিকে খানিকটা সমতল জায়গা। নাশপাতি গাছে ফল ধরেছে। গাছের গোড়াতেও তার কিছু ছড়িয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু এতক্ষণেও একটা ঘুমন্ত কুকুর ছাড়া আর কোন জীবিত প্রাণীকে তারা দেখতে পায় নি। অবশেষে দেখতে পেল। পাকদণ্ডির মোড় ঘুরতেই তারা দেখতে পেল একটি পাহাড়ী যুবতী—পিঠের ঝোড়ায় ফল নিয়ে চড়াইটাতে উঠছে থেমে থেমে। তাদের দেখেই সে হাসল। ময়লা মোটা পশমে বোনা ছেঁড়াখোড়া গাউনের মতো জামা পড়া, কিন্তু হাসিটা তার ঝুড়ির ফলগুলোর মতো টাটকা।

অবশেষে তারা চড়াই-এর মাথায় বড় বাংলোটার সামনে পৌঁছালো। কাঠের মেঝে, কাঠের থাম, কাচের জানলা দরজা, খড়ের ছাদ, কিন্তু মনে হয় কোন এক সময়ে খড়ের উপরে পাথর-কুচি

মিশানো সিমেন্টও দেওয়া হয়ে থাকবে। গড়ন দেখে চা বাগানের বাংলোর কথাই মনে হল।

ভটওলার বৃদ্ধ ম্যানেজার তাদের অভ্যর্থনা করল। পাহাড়ীদের মতোই মুখাবয়ব, শুধু নাকটা সোজা এবং উঁচু, কান দুটো অস্বাভাবিক রকমে লম্বা যেমন বৌদ্ধযুগের মূর্তিতে দেখা যায়। মুখের রং তামার নতুন পয়সার মতো। পরনে সাদা পশমের সরুয়াল, আর মোটা দোরুখি কাপড়ের পাহাড়ী পিরহান। কোমরে বাঁধা কাঠের খাপে ভরা বেঁটে সোজা কিরিচ।

রুচির দিক থেকে চা বাগানে এক রকমের আধুনিকতা থাকে যাকে সহর থেকে অতদূরে গিয়ে দেখতে পেযে একটু বিস্ময়েরই বোধ হয়। এখানেও তেমন একটা আধুনিকতার ভাব আছে। টেবলে যে কাপড় পাতা হল তা ঘরে বোনা মোটা কাপড় হলেও পরিচ্ছন্ন এবং সাদা, চীনে মাটির পাত্রগুলোতে কোন নক্সা ছিল না, দামী পাত্রের মতো হাল্কাও নয় সেগুলো, কিন্তু সাদা এবং উজ্জ্বল ছিল। মোটা মোটা মিষ্টি ফুলকা রুটি, শুকনো মাংসভাজা, নাশপাতি আর আঙুর, আর দুধছাড়া এলাচগন্ধী চা দিয়ে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করল ম্যানেজার।

পথ নিশ্চয়ই ক্লান্তিকর ছিল। পাঁচ ছ ঘণ্টা একটানা চলে শীত সত্ত্বেও ঘর্মাক্ত হতে হয়েছিল। কাজেই ইন্সপেক্টার স্থির করল দুপুরের বিশ্রামের পরেই কাজের কথা হবে। ব্যারিস্টার তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলল না। প্রথমে মনে হল তার সামনে যে আহার্য দেয়া হয়েছে তাতে সে বিড়ম্বনা বোধ করছে, কিন্তু পরে স্বাস্থ্যবান যুবকের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক সে আহার্য এবং পানীয়র সদ্ব্যবহার করল। তারপর সে সিগারেট ধবিয়ে ম্যানেজারকে বলল সে তখন বিশ্রাম করবে। টুরিস্টের কিছুই করার ছিল না। ম্যানেজার হাসিমুখে বিশ্রামের প্রস্তাব করতেই তা গ্রহণ করল সে।

টুরিস্টের অভ্যাস নেই তবু সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ক্লান্তি ছাড়াও অন্য একটি কারণ ছিল। অনেকদিন এমন পরিচ্ছন্ন শয্যাব সুযোগ পাওয়া যায় নি এরকম ভাবটাই সে দেখাল। তা ছাড়া কোন বিষয়েই সে এখন তাড়াতাড়ি করতে চায় না।

তাকে একটু লজ্জিত হতে হল। ঘুম ভাঙতে সে দেখলো ইন্সপেক্টারের আর্দালি ডাকাডাকি করছে। তখন বিকেল হয়েছে।

আর্দালির সঙ্গে ভটওলার যে লোকটি এসেছিল, সে জিজ্ঞাসা করল, 'চা দেয়া হবে নাকি এখন?'

টুরিস্ট বলল, 'তোমাদের যেমন সুবিধা।' লোকটি চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে জানালো চা দেয়া হয়েছে।

বাংলোর বারান্দায় চায়ের টেবল। সামনের দিকে কাঠের রেলিং। টেবলটা অনাড়ম্বর কিন্তু রুচিপূর্ণ। বারান্দার নিচে খানিকটা ঘাসে ঢাকা জমি। তার একধারে বিচুলির স্তূপ। হঠাৎ তার পাশে একটা ময়ূর উড়ে এল। টেবলের পাশে পাঁচখানা চেয়ার। টুরিস্ট গিয়ে দেখলো ম্যানেজার এবং ইন্সপেক্টার অপেক্ষা করছে। নিজেদের মধ্যে কিছু আলাপও করছে।

টুরিস্ট সেখানে পৌঁছানোর কিছু পরেই একজন মহিলা এল সেখানে।

কোন কোন চেহারা আছে যা প্রথমে সাধারণ মনে হলেও পরে ধীরে ধীরে তার স্বকীয়তার জন্যই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। এই মহিলাটির ক্ষেত্রেও সে রকম হল। গলায় একছড়া লালপলার কাঠিহার। হাত দুখানা নিরাভরণ। রুক্ষ চুল এলোখোপায় জড়ানো। বয়স অনুমান ত্রিশ। রূপের কথায় বলতে হবে—মুখের গড়ন নিখুঁত ছিল না, গালে বরং মেছেতার দাগ ছিল। কিন্তু তার চোখ দুটোর আশ্চর্য বিশালতা এবং ঔজ্জ্বল্য, এবং চিবুকের অপূর্ব গঠন—এ দুয়ের ফলে একটা অসাধারণত্বই ছিল তার আকৃতিতে।

সে ঈষৎ হেসে নমস্কার করলে, ম্যানেজার তার পরিচয় দিল, এই বাংলোর অধিকারিণী বলে। নাম সুনয়নী দেঈ।

তখন টেবলের পঞ্চম লোকটিকে অপেক্ষা করা হচ্ছিল বোধ হয়। কারণ একজন চাকর এসে

বলল—ব্যারিস্টার সাহেব ঘরে চা চেয়েছেন, তাঁকে ঘরে চা দেয়া হয়েছে। তিনি শিকারে যাবেন বলছেন, বন্দুকের ঘরের চাবি চাইছেন।

সুনয়নী এবং ম্যানেজার বিব্রত বোধ করল। ম্যানেজারের মুখে বিড়ম্বনা একটা ছায়ার মতো ফুটল। সুনয়নীর চোখ দুটোতে একটা পরিবর্তন দেখা দিল এক মুহূর্তের জন্য। তারপর সে হাসল।

ম্যানেজার টুরিস্ট এবং ইন্সপেক্টারকে জিজ্ঞাসা করল তারাও শিকারে যেতে চায় কি না। টুরিস্ট সে বিষয়ে তার অপটুত্বের কথা জানাল। ইন্সপেক্টার বলল সে তার কাগজগুলোকেই আগে শেষ করতে চায়।

সুনয়নী উঠে গেল, কিছুক্ষণ বাদে ফিরেও এল। সে বন্দুকের ঘরের চাবি দিতেই গিয়েছিল। ফিরে এসে সেই চা বানাল। গৃহকর্ত্রী হয়েও ইন্সপেক্টার এবং টুরিস্টের সঙ্গে একই টেবলে বসতে দেখে ইন্সপেক্টার কৃতজ্ঞই বোধ করল।

চায়ের আসরেই ইন্সপেক্টার কাজের কথা তুলল।

সিগার ধরিয়ে সে খানিকটা নিবিষ্ট হয়ে ধোঁয়ার দিকে চেয়ে রইল। তারপর ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের গ্রামের কতটুকু গ্রামের লোকদের দখলে আছে আর কতটুকু বনমহলের সেটা আগে ঠিক করা দরকার। আপনি বলছেন যেটুকু আপনারা চাষ করে থাকেন তার বাইরেও এই গ্রাম আছে'?

ম্যানেজার বলল, 'পথে যে শুকিয়ে যাওয়া নদীটা দেখে এসেছেন গ্রামটা সে পর্যন্ত ছিল'।

টুরিস্ট বলল, 'কিন্তু এখন তো গ্রাম নয়, অরণ্য'।

'সে বন আমাদের গ্রামের জন্যই দরকার। মনে করুন মাংস—ও বন না থাকলে মাংস কোথায় পাবো আমরা? কিছু না খেয়ে তো বাঁচা যায় না'। এই বলে হাসল ম্যানেজার। 'তা ছাড়া আপনারা সেট্‌লমেন্ট থেকে যে খাজনা ধার্য করবেন তাও দিতে আমরা রাজী আছি'।

ইন্সপেক্টার চিন্তা করতে লাগল।

এই সুযোগ টুরিস্ট আলাপটাকে চায়ের আসরের দিকে নিয়ে এল। সে বলল, 'শুধু খাদ্যে তো মানুষ বাঁচে না। গান-বাজনা, সংবাদ, এ সবও দরকার'।

ম্যানেজার বলল, 'আমাদের গ্রামে একটা গানের সুর আছে। অন্য সব পাহাড়ী গ্রামের মতোই। তবে একেবারে পৃথক থেকে কিছু পৃথকও হয়ে পড়েছে। কাল দিনের বেলায় ওদের বলে দেবো। শুনবেন'।

টুরিস্ট চিন্তা করল, খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হল তাকে। সে স্থির করল সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করাই ভালো, বলল, 'রেডিও নেই আপনাদের?' টুরিস্ট অভ্যস্ত দৃষ্টিতে, কথাটা বলেই, এদিক ওদিকে খুঁজলো ওয়ারলেস টেলিফোনের শুঁড়োর জন্য। সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারের চোখ দুটোকেও সে খুব ভালো করে দেখে নিল। কারণ এরা যদি বাইরের কাউকে সংবাদ পাঠায় তবে ওয়ারলেসই কম কষ্টসাধ্য উপায় হবে।

ম্যানেজার লজ্জিত হল যেন এই রুচিহীনতার লক্ষণ প্রকাশিত হওয়ায়। সে বলল, 'হয়ে ওঠে নি'।

কিন্তু এ আলাপে বাধা পড়ল। আপাতত দেখতে গেলে তার কারণ হল ময়ূরটা। হঠাৎ সে একটা কর্কশ শব্দ করে উঠল। ইন্সপেক্টার টেবল থেকে এবং বাইরের দিকে চাইল।

তখন চারিদিকে যে আলোটা দেখা দিয়েছে তার রং হাল্কা খয়েরি, কিন্তু নাট্যশালার আলো ফেলার মতো কেউ যেন তা ফেলেছে, আর সেই আলোর গুণ এই যে তার অনুলেপনে সব কিছুই যেন হাল্কা খয়েরিতে আঁকা মনে হচ্ছে।

ইন্সপেক্টর বলল, 'ভারি সুন্দর তো। এদিকে এমন গোধূলি হয় নাকি'?

ম্যানেজার বলল, 'হ্যাঁ'।

ততক্ষণে টেবলের উপরে পোর্সিলেনের সাদা চায়ের সেটেও তখন হাল্কা খয়েরি রং লেগেছে।

এই পটভূমিতেই ব্যারিস্টারকে দেখতে পাওয়া গেল। বাংলোর বারান্দার নিচে ঘাসে ঢাকা জমিটা পার হয়ে গেল সে। তার হাতে বন্দুক, কাঁধে চামড়ার খাপে ঝোলান বোধ হয় বিয়ারের বোতলই। সঙ্গে যে লোকটি চলেছে তার হাতে আর একটি বন্দুক এবং টর্চ। বুঝতে পারা গেল শিকারে চলেছে সে।

রেলিং-এর উপরে ঝুঁকে প'ড়ে কিন্তু ম্যানেজারকে লক্ষ্য করে সুনয়নী বলল, 'বেশি রাত করা কি ভালো হবে'?

ব্যারিষ্টার কিছু বলল মুখ তুলে। তার মুখে সেই খয়েরি রঙের আলো পড়ল। কিন্তু কী বলল তা বোঝা গেল না।

সুনয়নী এবং ম্যানেজার আবার পরস্পরের দিকে চাইল। ম্যানেজার তারপর বলল, 'আপনাদের একটু চা দেয়া হক'।

ইনস্‌পেকটার বলল চায়ের আর প্রয়োজন নেই।

টুরিস্ট বলল, 'উনি তো আপনাদের এস্টেটের ব্যারিস্টার নন শুনলাম। কিন্তু মনে হল এদিকের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত'।

মনে হল ম্যানেজার যেন শুনতে পায় নি। আসলে সে উত্তর দেয়ার আগে চিন্তা করে নিল। একটু হেসে বলল, 'না। কিন্তু আপনারা কি ঘরে গিযে বসবেন'?

টুরিষ্ট বলল, 'বরং লনটায় গিয়ে বসি'।

ম্যানেজার একজন চাকরকে ডেকে বলে দিল। সে খান কয়েক বেতের চেয়ার পেতে দিল লনটায়, বিচুলির স্তূপটা যেদিকে দেখা গিয়েছিল তার কাছাকাছি। একটা বেতের নিচু টেবলও রাখল সে চেয়ারগুলোর সামনে আর তার উপরে সিগারেটের সরঞ্জাম।

ইন্সপেক্টারের মনে হল একটা মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছে। ফুলের নয় কোন ফলের হওয়ায়ই স্বাভাবিক।

ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল, 'আঙুরের কথা বলছেন'?

তখন বিষয়টা ওদের লক্ষ্যে এল। যেখানে বসেছিল তারা তার কিছু দূরেই টিলাটা কয়েক ধাপ নেমে গিয়ে খানিকটা সমতল হয়েছে আবার। সেখানে কেয়ারি করা। থলো থলো আঙুর সেই কেয়ারিতে। গাঢ় খয়েরিতে আঁকা একটা ছবি।

নিচের দিকে দৃশ্যান্তর ঘটল। নিচের বাড়িগুলোর কাচের সার্সিতে ডুবন্ত সূর্যের আলো পড়ায় মনে হল সে সব বাড়িতে আলো জ্বালানো হয়েছে। এই দৃশ্যের অনুকরণ করে বাঁয়ের দিকে চাইতেই সমস্ত পটটা চোখে পড়ল ইনস্‌পেক্‌টারের। হঠাৎ দেখে মনে হল বনে আগুন লেগেছে, গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে তারই শিখা উঠে পড়ছে। কিন্তু সেটা সূর্যাস্তের চিহ্ন। মুহূর্তে দৃশ্যটা বদলেও গেল। বন যেন বন নয়, যেন তা ফাল্গুনের সমারোহ। অন্য কখনও এমন দেখল যেন বনের সবগুলি গাছই পলাশ কিম্বা নদীর কঙ্কালটা যাকে সাদা দাগের মতো দেখায় তার গায়েও রং লেগেছে।

ইন্সপেক্টার বলল, 'এ জন্যই তীর্থযাত্রীদের আসা উচিত'।

টুরিস্ট বলল, 'আর আসেও তারা, কী বলেন'?

এই বলে সে ম্যানেজারের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল। ম্যানেজারের মুখে একটা পরম পরিতৃপ্তি হাসির মতো ফুটে আছে তা দেখতে পেল।

টুরিস্ট বলল, 'ব্যারিস্টার যেখানে শিকারে গেলেন সে সব জায়গাও নিশ্চয় সুন্দর? কিন্তু সে সব জায়গা কি আপনাদের গ্রামের মধ্যেই'?

ম্যানেজার বলল, 'আমরা তাই মনে করি। আগে যখন পুরনো গ্রামটা ছিল তখনও তার

অধিবাসীদের কিছু বন ছিল। নতুন গ্রামটা কি করে হল তা বলতে পারি'।

টুরিস্ট বলল, 'বলুন। শুনতে ভাল লাগবে'।

ম্যানেজার বলল, 'বামদেব ভট্ট থেকেই এই গ্রামের নাম ভট্টটোলা। এখন নাম হয়েছে ভটওলা।'

'বামদেব ভট্ট বলছেন'?

'তাই নাম ছিল।' ম্যানেজার বলল, 'দু বছব আগেও জীবিত ছিলেন তিনি। বছর ত্রিশেক আগে সমতল থেকে এই অঞ্চলে এসেছিলেন। শুনেছি তার আগে তিনি রাজনৈতিক ছিলেন'।

ইন্সপেক্টার বলল, 'বিপ্লবী ছিলেন? তখন অনেক বিপ্লবী আত্মগোপন করত'।

ম্যানেজার হেসে বলল, 'তা জানি না। বোধ হয় বিদ্রোহী বলা যায়'।

'তারপর'।

'এক এক করে অন্যেরা এল। যারা এসেছিল ফিরে যায় নি'।

কিছুক্ষণ ইন্সপেক্টার যেন এই কথাগুলোই ভাবল।

সে বলল, 'তখন কি আপনাদের এই গ্রামের সীমা ঠিক করা হয়নি?'

'না। প্রয়োজন হয়নি। এখন বনবিভাগ এই টিলাটা ছাড়া আর সব কিছু দাবি কবছে। আপনি দেখুন যদি কিছু কবা যায়'। ম্যানেজাব বলল।

টুরিস্ট বলল, 'বন থেকে মাংস পান বটে, কিন্তু সমতলের উপরে তা হলেও আমাদের অনেক ব্যাপারে নির্ভর করতে হয়। তাই নয়'?

ম্যানেজার বলল, 'খাওয়া পরাব জন্য বিশেষ নয়। কেবোসিন, কুইনাইন, বারুদ—এমন কিছু কিছু না কিনলে চলে না'।

'বারুদ'?

'হ্যাঁ, বন্দুকে এখনও ব্যবহার হয়। কিন্তু এখন এখানে ঠাণ্ডা পডবে। ঘরে গিযে বসা ভাল। ববং আলোর বন্দোবস্ত করি'।

ম্যানেজার চলে গেল।

সে উঠে যাওয়াতেই যেন বোঝা গেল সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে। আকাশেব কোথাও কোথাও লাল মেঘ আছে বটে, বনের মাথা থেকে আলো নিবে যাচ্ছে।

ইন্সপেক্টার বলল, 'অদ্ভুত নয'?

টুরিস্ট কিছু ভাবছিল। বলল, 'কী'?

'রাজনৈতিক নেতাব এই পালিয়ে এসে লুকিয়ে থাকা'?

টুরিস্ট বলল, 'এমন তো হতে পারে পুলিশের হাত থেকে পালান দবকাব ছিল'।

'কিম্বা বিপ্লব আর ভাল লাগছিল না'।

টুরিস্ট বলল, 'সেটাও শুনেছি প্রশংসার নয়। এসকেপিজম্ বলে'।

ইন্সপেক্টার আর একটি চুরুট ধরাল ফ্যাঁস করে দেশলাই জ্বেলে।

বাংলোর সিটিং রুম। ইতিমধ্যে আলোর বন্দোবস্ত হয়েছে। ইলেকট্রিক নেই, কাজেই হ্যাজাক জ্বলছে। টুরিস্ট এবং ইন্সপেক্টার যেতে যেতেই ম্যানেজারও এল। একটা টিপয় টেনে তার উপরে চুরুটের কেসটা রাখল সে।

ইন্সপেক্টার হেসে বলল, 'এ চুরুট কিন্তু আপনাদের সমতল থেকে আনতে হয়'?

'তা হয়'।

'ম্যানেজার বাবু, বামদেব ভট্ট সম্বন্ধে আর যদি কিছু বলেন শুনি'।

ম্যানেজার বলল, 'ওটা একটা ওয়ে অব লাইফ'।

ম্যানেজারের মুখে এই প্রথম ইংরেজি শুনে একটু বিস্মিত হল টুরিস্ট। খুশিও হল কারণ এটাকে

সে ম্যানেজারের একটা অসতর্ক আত্মপ্রকাশ মনে করল। একটা কপট হাসি মুখে এনে বলল, 'কিন্তু কী তার বিশেষত্ব'?

'যা দেখছেন তার বেশি কিছু নয়'। বলল ম্যানেজার। 'ভুট্টার রুটি, আঙুর, আর মাংস এই দিয়েই এখানকার জীবন। এটুকু যোগাড় করতেই সন্ধ্যা হয়ে যায়। সন্ধ্যার পরে, যাদের চোখের দৃষ্টি আছে, তারা পশম থেকে সুতো বোনে'।

ইন্সপেক্টার আবার বলল, 'আমার কিন্তু কৌতূহল হচ্ছে জানতে আপনাদের এখানে কি চা বাগানের মতো ব্যবস্থা—মানে এখানকার যত কিছু সবই কি একজন বা একটি কোম্পানির সম্পত্তি'।

ম্যানেজাব বলল, 'সব কিছুই ভট্টবাবুর। তিনি আসবার আগে কিছুই ছিল না'।

ইন্সপেক্টার বলল, 'তখন বলছিলেন এ সবই এখন সুনয়নীর'।

'হ্যাঁ। একটা উইল করে তাকেই সব দিয়ে গিয়েছেন ভট্টবাবু'।

'ইনি? মানে—'

ম্যানেজার একটা চুরুট ধরাল। তারপরে বলল, 'ওয়ারিশ'।

ইন্সপেক্টার বলল, 'কিন্তু তাঁর তো আরো ওয়ারিশ থাকতে পারে সমতলে। তাঁর বংশের লোক। তারা তো দাবি করতে পারে'?

'উইল আছে'। ম্যানেজার বলল, একটু হাসল সে। তারপর আবার বলল, 'তাতে বলা আছে, এখানে বাস না করলে ভটওলার সঙ্গে কারো কোন সম্বন্ধ নেই'।

একটু ভাবল ম্যানেজার। তারপরে বলল, 'দাবি করতে পারে। আপনাদেব সঙ্গে ব্যারিস্টাব এসেছেন'।

টুরিস্ট ভাবল ব্যারিস্টার যেখানে এই রাত্রিতে শিকার করছে সেখানে পবিক্রমা করা তার কর্তব্যের অঙ্গ হবে। কাল দিনের বেলায় শিকাবের প্রস্তাব যদি আসে তবে তা সুবিধারই হবে।

ইন্সপেক্টার চিন্তা করল। ত্রিশের দশকের বিপ্লবীদের কে কোথায় শেষ পর্যন্ত গিয়েছিল তা পুলিশের লোকরা অনেক চেষ্টা করেও সব সময়ে জানতে পারে নি। বামদেব ভট্ট হয়তো তেমন কেউ হবে কিম্বা বিপ্লবীদের গোপন, ক্বচিৎ প্রকাশিত এবং কুলিখিত ঘটনাপঞ্জীতে হয়তো তাকে মৃত বলা হয়েছে। তারপর তার মনে পড়ল ম্যানেজারের মুখের সেই ইংরেজি মন্তব্যটা—ওয়ে অব লাইফ। তার অর্থ দাঁড়ায় বিচ্ছিন্ন এই মালভূমিতে ভুট্টার রুটি, আঙুর, মাংস, আর ঘরে বোনা পেশমের মধ্যে জীবন যাপন করা! কিন্তু এরকম জীবনে অনেক বাধা আছে। এখানে বনমহল তার অধিকার ছাড়বে বলে মনে হয় না আর ব্যারিস্টার যদি উইল নিয়ে বাদপ্রতিবাদ করে তবে সেটা হবে ভিতর থেকে আক্রমণ।

কিন্তু তার এই চিন্তার উপরে কিছু একটা এসে পড়ল। লনে বা বারান্দায় থাকলে ব্যাপারটা আগে চোখে পড়ত, সূচনা থেকে ধীরে ধারে বাড়তে দেখা যেত। এখানে হঠাৎ নজরে এল। বাতাসের ঝাপটায় ঘরের আলোটা কেঁপে কেঁপে উঠল। দরজা জানলায় শব্দ হল। দূরের অন্ধকার দিগন্তে বিদ্যুৎ চমকে চমকে উঠল কয়েকবার।

ইন্সপেক্টার বলল, 'ঝড় উঠবে'?

ম্যানেজার বলল, 'বিকেলের মেঘ দেখে বোঝা উচিত ছিল'। এই বলে সে ভাবল।

ইন্সপেক্টার বলল, 'অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না। আপনার কী মনে হচ্ছে'?

'এদিকে নাও হতে পারে। দূরের পাহাড়ের গায়ে হয়ত। শীতকালের বৃষ্টি'।

এ সময়ে সার্সির গায়ে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি এসে পড়তে লাগল।

একজন চাকর এসে ঘরের জানলার পাশে একটা বাড়তি আলো রেখে গেল। আর তার পিছন পিছন সুনয়নী এল। কিন্তু সে বিব্রত হল। সে যেন দুএক মুহূর্তের জন্য ইন্সপেক্টার ও টুরিস্টের

কথা ভুলে গিয়েছিল।

ফিরে যেতে যেতে দরজার কাছে দাঁড়াল সে। ইতস্তত করল। তারপর বলল, 'কয়েকটা কাচের সার্সির পাশে আলো রাখতে বলে দিয়েছি'।

'কেন'? ম্যানেজার তার দিকে দু এক মুহূর্ত চেয়ে রইল। উত্তরটা যেন সে নিজের মনেই খুঁজে পেল। পরে বলল, 'তা ভালোই করেছ। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই বোধ হয়'।

কিন্তু তার অস্বস্তি প্রকাশ পেল যখন সে তার অ্যাসট্রেতে রাখা জ্বালানো সিগারেটটা ভুলে গিয়ে নতুন করে সিগারেট ধরাল।

তার এই অস্বস্তি থেকেই ইন্সপেক্টারের মনে পড়ল—তারা ঘরে থাকলেও ব্যারিস্টার এই ঝড়বৃষ্টি এবং অন্ধকারের মধ্যে বনে শিকার করছে। এই দুর্যোগে নিশ্চয় সে অসুবিধায় পড়েছে।

এ থেকেই তার কথা উঠল আবার।

ইন্সপেক্টার বলল, 'আপনারা কি ব্যারিস্টারকে এর আগে কখনও দেখেছেন'?

'সে কি ভটওলার সম্পত্তি দাবি করবে বলে মনে হয়? কিম্বা তার আত্মীয়তার দাবি সম্বন্ধে কি আপনি পরীক্ষা করেছেন'?

'জানি না'। ম্যানেজার বলল, 'কিন্তু ভট্টবাবুর চেহারার সঙ্গে ব্যারিস্টারের চেহারার এমন একটা মিল আছে যা থেকে ধরে নেয়া যায় একই বংশের লোক তারা'।

এই সময়ে একজন চাকর আবার ঘরে ঢুকল। সার্সির কাছে যে আলোটা রাখা হয়েছিল সেটাকে পাম্প করে উজ্জ্বল করে দিয়ে গেল।

ইন্সপেক্টার আবার বলল, 'ব্যারিস্টারের কোন বিপদ হবে না তো'?

সাধারণত হয় না। সঙ্গে যে লোকটি আছে সে ভটওলারই লোক। মাংস সংগ্রহ করে ফিরতে কখনও কখনও রাত্রি হয়। ঝড় বৃষ্টিও হয়। তা ছাড়া এটা বর্ষাকাল নয়'।

ম্যানেজার ঠিকই বলেছিল। মেঘটা ভটওলার উপর থেকে দক্ষিণে এবং সমতলের দিকে সরে গেল। টিপ টিপ করে বৃষ্টি চলতে লাগল।

ম্যানেজার বলল, 'একটু কফি দেয়া হবে'?

ইন্সপেক্টারের কফির দরকার ছিল না।

সে বরং বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। আর সেখানে গিয়ে সে দাঁড়ানোর কিছুক্ষণের মধ্যে দরজার কাছে সুনয়নীকে দেখা গেল। বারান্দার নিচেও কিছুদূর পর্যন্ত ঘরের আলো গিয়ে পড়েছে। তারপরে অন্ধকার।

সুনয়নী অস্ফুটস্বরে বলল, 'আমাদের কিছু করা উচিত'?

'আলো দিয়ে লোক পাঠানো যেতে পারে যদি বল'। ম্যানেজার বলল।

কিন্তু রাত তখন প্রায় আটটা। বাংলোর নিচের পথে দু একটা কুকুর ডাকল—পথে অস্বাভাবিক কিছু দেখলে যেমন ডাকে। তারপর অস্পষ্ট ছায়ার মতো দেখা গেল কেউ যেন উঠে আসছে।

ক্রমে ব্যারিস্টার বাংলোর আলোর সীমায় এসে পড়ল। এই বর্ষায় বাইরে থাকলে যেমন হয় তেমন হয়েছে তার অবস্থা। তাব পোশাক জলে ভিজে সপ সপ করছে। হাঁটু পর্যন্ত কাদা।

ম্যানেজার হেসে বলল, 'শিকার হল'?

ব্যারিস্টার এই কথায় পিছন ফিরে চাইল আর তখন বাংলোর লোকেরা দেখতে পেল কারণ তার সঙ্গের লোকটিও ততক্ষণে আলোর সীমায় এসে পড়েছে। শিকার তার পিঠে। বোঝার ভারে সে চলতে পারছেনা। বারান্দায় অবশেষে সে শিকারটা নামাল।

ব্যারিস্টারই বলল, 'নিজের মাংসই হরিণীর বৈরী'।

কিন্তু তখন শীতের বৃষ্টিতে ভিজে তার যে অবস্থা পোশাক না বদলালে চলে না।

ম্যানেজার বলল 'তাই।'

একটা তত্ত্ব এই যে মাছধরার পরে মাছের গল্প বলতে তীব্র একটা আগ্রহ হয় মনে। আর সে গল্পের শ্রোতার সামাজিক অবস্থিতি বিচার করে দেখা হয় না। শিকারের বেলাতেও বোধ হয় তা হয়, কারণ ব্যারিস্টার তার কফির পেয়ালা হাতে নিজেই ইন্সপেক্টারদের কাছে এসে বসল। চাকরই বরং তার কফির ট্রেটা বয়ে আনল।

সুনয়নীও এসেছিল। উৎকণ্ঠার পরে সেও তখন ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল।

ব্যারিস্টার বলল, 'বাংলোর আলো দেখে পথ খুঁজে পেতে সুবিধা হয়েছিল'।

তখন ইন্সপেক্টার হঠাৎ বুঝতে পারল সার্সির পাশে কেন বাড়তি আলো রাখা হয়েছিল।

ব্যারিস্টার তার শিকারের গল্প যা বলল সেটা কিছু নয়। কিন্তু বনে ঝড় উঠেছিল তার কথা উল্লেখ করতেই ইন্সপেক্টার বলল, 'বিপদ হতে পারত।'

সুনয়নী কিছু না বলে একটা কাপে কিছুটা কফি ঢেলে নিল।

ব্যারিস্টার হেসে বলল, 'আর শীতও। আমার মনে হচ্ছিল বরফও পড়ছে'।

ম্যানেজার বলল, 'তা হওয়ারই কথা। শীতের বৃষ্টি'।

ব্যারিস্টারকে ভিজে পোশাকে যেমন দেখেছিল সে দৃশ্যটা ইন্সপেক্টারের মনে পড়ল।

হয়তো সুনয়নীরও মনে পড়ে থাকবে। সে সামান্য হেসে চেয়ারের পিঠে রাখা তোয়ালেটা এগিয়ে দিল। তখন লক্ষ্য করল ইন্সপেক্টাব ব্যাবিস্টারের কাঁধের কাছে চুলের গোড়ায় তখনও জল লেগে আছে।

রাত্রিতেও খাওয়ার ব্যবস্থা টেবলে হল। ডিনারের কায়দায় টেবল সাজান হয়েছে। ম্যানেজার, ইন্সপেক্টার, টুরিস্ট এবং সুনয়নীও বোধ হয়। কিন্তু ব্যাবিস্টারও এল। বিকেলে ঘবে চা দিতে বলে যে পার্থক্যটার সূচনা করেছিল সে—সেটাকে আর রাখল না। তখনও সেই শিকারের গল্প করার ঝোঁকটাই তার মনে আছে।

সুনয়নীর একদিকে ম্যানেজার, অন্যদিকে ব্যারিস্টার, সামনে ইন্সপেক্টার এবং টুরিস্ট। গোল টেবলটায় উজ্জ্বল হ্যাজাকের আলো। একজন বুড়ো চাকর পরিবেশন করছে।

ম্যানেজার, দেখা গেল, এক সময়ে শিকার-পটু ছিল। আর সে ভালো গল্প বলতেও পারে। ব্যারিস্টারও তার শিকারের গল্প বলল আবার। কেমন করে ঝড় উঠল বনে। কেমন করে হরিণের দল সেই ঝড়ের শব্দে দিশেহারা হয়ে পড়ল।

সুনয়নী বলল, 'দিশেহারা বলেই শিকার হয়েছে'।

ব্যারিস্টার বিব্রত হল।

কিন্তু ম্যানেজার কথাটা থেকে সেই মৃদুপরিহাস দূর করে মধুর করে দিল। 'কারো কারো সাহসে সন্দেহ করা যায় না'।

সুনয়নীর পরনে গাঢ় লাল রঙের সিল্কের শাড়ি। চুলগুলো উঁচু করে বাঁধা। এত উঁচু যে তার সোনালি রঙের ঘাড়ের অনেকটা চোখে পড়ছে। গলায় স্ফটিকের মালা। কানে সাদা কাচের দুল। নিরাভরণ বাহু দুখানা কাঁধ পর্যন্ত নিরাবরণও বটে।

সে হাসল।

'পুরুষের সাহস আর মেয়েদের রূপ আজকাল দুষ্প্রাপ্য'। এই বলল ইন্সপেক্টার। সুনয়নী তার প্লেটের দিকে মুখখানা নামল। টুরিস্ট বলল, 'এ উক্তিটাকে আমি সমর্থন করি'। সে ভাবল: আপাতত দেখা যাচ্ছে, এক নম্বর এদের বন্দুকের লাইসেন্স নেই, দ্বিতীয়ত ওয়াইন তৈরির একসাইজ ডিউটি দেয় না। তিন নম্বর বনমহলে বেআইনী শিকার করছে। এসবও তার রিপোর্টে যাবে। রূপের কথাই তাকে মনে করিয়ে দিল। পোলিটিক্যাল গোয়েন্দাগিরি ছাড়াও, স্মাগলিংও হতে পারে, যেমন

কোকেন। সেখানেও রূপ থাকে।

সুনয়নী বলল, 'শুয়োর শিকার কিন্তু সব চাইতে উত্তেজনার ব্যাপার হতে পারে'।

'শুয়োর?'

'হ্যাঁ। জ্যাভলিন কিম্বা স্পিয়ারে'।

ব্যারিস্টার একটু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তাকাল তার দিকে।

সুনয়নী হাসল। সে কাচের জাগটা থেকে জল ঢেলে নিল আর সেই জাগ থেকে একটা আলো ঢেউএর মতো তার ডান হাত বেয়ে কাঁধ পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল তার মসৃণ ত্বকে খেলা করে করে।

ব্যারিস্টার বলল, 'বনে'?

সুনয়নী হাসল মুখ টিপে টিপে। সামনের মসৃণ জাগটার গায়ে হাত বুলাল সে।

ম্যানেজার বলল, 'ঘোড়ায় চড়ে শিকার করতে হয়'।

ব্যারিস্টার বলল, 'এখন থাকে'?

সুনযনী মাথা দোলাল। তার চোখ দুটোতে আলো পড়ল যেন।

ওয়াইন দিয়ে গেল চাকর। ব্যারিস্টাব বোতল খুলল। নিজেই সুনয়নীর গ্লাসটাকে পূর্ণ করে দিল।

সুনয়নী বলল, 'ধন্যবাদ'।

ব্যারিস্টাব ওযাইনেব স্বাদ নিযে বলল, 'জ্যাভলিনে শুযোব পাওয়া যায়'।

সুনয়নী হেসে বলল, 'আজ বাতে নয'।

শিকারেব নেশাব ব্যাপারে এরা খুব কাছাকাছি যেতে পারে সন্দেহ নেই। টুবিস্ট বলল, 'এ ওয়াইন কি ভটওলায় তৈরি'?

ম্যানেজার বলল, 'তেমন ভালো হয় না। হ্যাঁ'।

ইন্সপেক্টাব বলল, 'নিন্দার কিছু নেই'। উষ্ণ আহার্য এবং উষ্ণ পানীয়র জন্য গোল সোনালি চশমার পিছনে তার চোখ দুটোকে উজ্জ্বল দেখাল। সে লক্ষ্য করল সুনয়নীর গালে এখন একটা বড় তিল দেখা যাচ্ছে। আগে সেটা দেখা যায় নি।

টুরিস্ট বলল, 'কখনও কখনও আপনারা কি ওয়াইনও আনান সমতল থেকে'।

ম্যানেজার বলল, 'অকেশান হয়নি'।

ব্যারিস্টার আবার তার গ্লাস পূর্ণ করে নিল। সুনয়নী গ্লাসের দিকে হাত বাড়াতেই সে হেসে গ্লাসের উপরে হাত রাখল। মাথা দুলিয়ে বলল আর চাইনা।

ব্যারিস্টার বলল, 'শীত লাগছেনা'? সুনয়নী কি মাথা দোলাল?

তার নিরাবরণ বাহু দুটোই লক্ষ্যে এল।

ম্যানেজার বলল ইন্সপেক্টারকে, 'এর পরে কি বসবেন? কাগজপত্র দেখাতে পারি'।

ইন্সপেক্টার বলল, 'আপনার অসুবিধা নেই তো'?

ম্যানেজার বলল, 'বরং সুবিধাই হবে। কাল অন্য কাজ আসতে পারে'।

ব্যারিস্টার আর একটু ওয়াইন ঢেলে নিল।

সুনয়নী হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল। হাই তুলল সে হাত দিয়ে সেটাকে আড়াল কবল। সেটা একটা ঝিকমিক হাসিতে শেষ হল। 'আপনারা এখন কাজের কথা বলবেন' এই বলে সে বিদায় নিল। সে যখন চলে যাচ্ছে তখন তাকে পরিপূর্ণভাবে দেখতে পাওয়া গেল। তার সম্বন্ধে সুনিতম্বনী বিশেষণটাই তখন প্রযোজ্য হল।

ম্যানেজার বলল, 'আমরা এখন চুরুট ধরাতে পারি'।

ইন্সপেক্টার চুরুট ধরাল।

টুরিস্ট বলল, 'এসব দেখে আমারই আগ্রহ হচ্ছে শিকারে যাওয়ার'।

ম্যানেজার বলল, 'এ অত্যন্ত ভাল প্রস্তাব। কাল হয়ত সুনয়নী শুয়োর শিকারে যাবে'।

ব্যারিস্টার বলল, 'নিশ্চয়। ঘোড়াও দরকার হবে'।

ম্যানেজার বলল, 'বলে দেব। কিন্তু সেখানেই ইন্সপেক্টার সাহেবের এক্তিয়ারে যাচ্ছি আমরা। ওই অঞ্চলটাকে বনমহল বিশেষ করে দাবি করছে'।

ব্যারিস্টার বলল, 'আপনাদের কি কাগজপত্র নেই? সেগুলো আনিয়ে নিন। দেখা যাক। বন বলেই বনমহলের হবে এমন কথা নেই। রাইট অব পজেসন বলেও একটা কথা আছে'।

ইন্সপেক্টার বলল, 'তা আছে। কিন্তু সেটা তো প্রমাণসাপেক্ষ'।

এই বলে সে চশমা খুলে মুছে নিয়ে আবার পরল যেন তখন সে কাগজ দেখার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

টুরিস্ট ভাবল : সে এদের এই আলাপের মধ্যে ঢুকবার কোন পথ পাচ্ছে না। শিকারের কথায় তার বরং সুবিধা হ'ত। অন্তত ব্যারিস্টার আজ কোথায় শিকারে গিয়েছিল তা জানতে পারলে পথঘাট সম্বন্ধে ধারণা করা যেত।

কিন্তু ব্যারিস্টার আলাপটাকে সেদিকে যেতে দেবে কি?

ব্যারিস্টার বলল হেসে, 'প্রমাণ, দেখুন, প্রমাণের কথায়, সেটা যে কখন কোন দিক থেকে এসে যাবে, তাও আমরা জানি না'।

ম্যানেজার আলাপের ধারার এই নতুন গতি দেখে খুশি হয়েছে বোঝা গেল।

সে বলল, 'ওয়াইন আনতে বলি'!

ব্যারিস্টার বলল, 'অবশ্যই যদি তাতে অসুবিধা না হয়। বরং কাগজ দেখার কাজটা দিনের বেলার জন্য থাক। কারণ আমার ক্লায়েন্ট, আমি ভটওলাকে আমার ক্লায়েন্ট বলতে চাই যদি ম্যানেজার বাবু আপত্তি না করেন, নিশ্চয়ই আশা করতে পারে অন্য কাউকে কাগজ দেখানোর আগে আইনের পরামর্শ নেবে'।

ব্যারিস্টার সিগারেট ধরালো হাসি মুখে।

ম্যানেজার চাকরকে ডেকে ওয়াইন আনতে বলে দিল।

টুরিস্ট বলল, 'এখন সুন্দর একটি রাত্রি'।

ম্যানেজার বিস্মিত হল, তার মুখের দিকে চাইল। তারপর সে যেন ব্যাপারটাকে আন্দাজ করল। বলল সে, 'আমরা বোধ হয় ভুলে যাচ্ছি, এখানে এমন একজন আছেন যাঁর কাছে আমাদের এই কাগজ নিয়ে কথাবার্তা বিড়ম্বনার'।

ব্যারিস্টার লজ্জিত হল, বলল, 'সরি। নিশ্চয় নিশ্চয়। আমাদের বরং সাধারণ আলাপেই থাকা উচিত'।

ওয়াইন এল। ম্যানেজার বোতলটা খুলল।

পরিবেশন করল সেই। বলল, 'এ ওয়াইনটা খুব ভালো হবে বলে মনে হয় না। কাল আমি নিজে খুঁজে দেখব'।

টুরিস্ট চায় নি এভাবে সকলেই তার দিকে মনোযোগ দিক। সে এতে বরং বিব্রতই হয়েছিল। সে লজ্জার একটা অভিনয় করে বলল, 'আমি কিন্তু আপনাদের আলাপে কোন অসুবিধা বোধ করছিলাম না। বরং এই রাত্রিটার প্রশংসা করছিলাম'।

ব্যারিস্টার বলল, 'সে কিছু নয়। ওটা আমাদেরই কর্তব্য ছিল। ম্যানেজারবাবু, বরং কাল কী হবে তাই বলুন'।

ইন্সপেক্টার ভাবল : ব্যারিস্টার যা বলছে সেটা মিথ্যা নয়। আর যদি বনমহলের কাছে থেকে

এরা যদি কিছু আদায় করতেই পারে তবে তার ব্যক্তিগত ক্ষতি নেই। তবে রিপোর্টটা সে ঠিকঠাকই দেবে।

আলাপটা তখন আগামী সকালের শিকারের দিকে গড়িয়ে গেল।

টুরিস্ট চেষ্টা করল সংবাদ সংগ্রহ করতে কিন্তু যা ফল হল তাতে সে স্থির করল পদ্ধতিটাকে বদলে নিতে হবে। ইন্সপেক্টার ভাবতে গিয়ে একটা নিশ্চিন্ততাই বোধ করল। তার ফলে তার মুখে যা ততক্ষণে মদে আরক্তিম হয়ে উঠছে একটা শান্ত ভাব দেখা দিল। সে ভাবল : এই তদন্তের ব্যাপারে একজন আইনজ্ঞ থাকায় ভালই হবে। রিপোর্টে আইনের দিকটা আলোচনা তাকে করতেই হত। এখন সেটা সহজ হবে।

ম্যানেজারই বেশির ভাগ কথা বলল। যেমন হওয়া স্বাভাবিক, দেখা গেল, ভুট্টাব রুটি, মাংস, আঙুর এবং ঘরে বোনা পশমের এই পাহাড়ী গ্রাম ভটওলাকে সে ভালোবাসে। যদিও জীবনটা সব দিক্ দিয়ে খুব সুখের নয়। যা নিয়ে বনমহলের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে সে বিষয়েও কখনও কখনও অসুবিধা দেখা দেয়। দু বছর আগে হণিদের এক সংক্রামক ব্যাধিতে এদিকের জঙ্গলে মাংসের অভাব বিশেষ ভাবেই হয়েছিল।

অবশেষে ব্যারিস্টার বলল, কাল খুব সকালেই সে রওনা হয়ে যেতে চায় শিকারে। সুতরাং এখন সে বিদায় নেবে।

ম্যানেজার হাই তুলল। বলল, 'তাহলে আপনাদেব শোবার ঘব দেখিয়ে দিক'। সে চাকরকে ডাকল।

ব্যারিস্টার তার শোবার ঘর জানত। সে চলে গিয়েছিল। ম্যানেজারও বিদায় নিল।

টুবিস্ট এবং ইন্সপেক্টার চাকরের পিছন পিছন নিজেদের ঘরের দিকে চলে গেল।

সে সময়ে কথাটা হঠাৎ মনে হল টুরিস্টের। সে ভাবল : এ রকমও হতে পারে হয়ত এরা তাকে চিনে ফেলেছে। এবং ব্যারিস্টারের এটা একটা অভিনয় যাতে ম্যানেজার সাহায্য করছে। আর তা যদি হয় তবে তার সব পরিকল্পনাই নষ্ট হবে। তার মনে তখন বিশেষ অস্বস্তি দেখা দিল।

সে এটাকে দূর করার জন্য বলল, 'নতুন জায়গায় আপনার ঘুম কেমন হয়'?

'তা হয়'।

রাত্রিতে ঘুম যেমনই হক, টুরিস্ট সকালেই উঠেছিল। কিন্তু সে প্রস্তুত হয়ে বাইরে এসে দেখল তার আগেই অনেকে উঠেছে। সে ঘুমানোর আগেই ভেবেছিল ব্যারিস্টারের সঙ্গেই সে যাবে। কিন্তু বারান্দায় পৌঁছেই সে দেখল দুটো পনির পিঠে ব্যারিস্টার এবং সুনয়নী রওনা হচ্ছে। তাদের হাতে ছোট বর্শা আছে মনে হল।

ঘুমানোর আগে যা মনে করা যায় ঘুম ভাঙার পরে সেটাকেই সব সময়ে ধরে রাখা যায় না। ব্রেকফাস্টে কালকের শিকারের রোস্ট চিবোতে চিবোতে টুরিস্ট মনঃস্থির করল। ব্যারিস্টার শিকারে গিয়েছে, ম্যানেজার এবং ইন্সপেক্টার খুব সম্ভব জমির মাপজোখ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। এ অবস্থায় সে একা একা বনে ঘুরে বেড়াতে পারে যদি না ইন্সপেক্টারের জমি মাপার কাজে উৎসাহ দেখায়। নতুবা বাংলোর থেকে কিছু খবর সংগ্রহ করাকেই কর্তব্য বলে স্থির করবে সে। অনেক ভেবে শেষেরটিকেই সে উপযুক্ত বোধ করল। এবং ব্রেকফাস্ট টেবলেই সে ঘোষণা করল কোমরে ব্যথা বোধ করছে। ব্রেকফাস্ট শেষে যখন ম্যানেজার এবং ইন্সপেক্টার রওনা হচ্ছে, টুরিস্ট, সুতরাং, তখন বনে বনে ঘোরার এই সুযোগ নষ্ট হওয়ার জন্য নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিল।

ম্যানেজার বলল, 'কাল হবে। কালও বেরোনো যাবে'।

ম্যানেজার এবং ইন্সপেক্টার পায়ে হেঁটেই রওনা হল।

কিছুক্ষণ টুরিস্ট বারান্দাতেই বসে রইল। তারপর সে চাকরদের সঙ্গে আলাপ করতে শুরু করল। পুলিশের দারোগা যেভাবে সকলকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে সে রকম অবশ্যই নয়। বরং তাদের কাছে গিয়ে ভটওলা সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করে যতটুকু জানা যায় তার চেষ্টা করল। রান্নাঘরে বসেই সে তার লাঞ্চ খেল যখন ম্যানেজার এবং ইন্সপেক্টারের ফিরতে দেরি হতে লাগল। কিন্তু সে বিস্মিত না হয়ে পারল না চাকর এবং ঝিদেরও বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে। অভাবের কথা বলল একজন, অভাবের কথায় যে অভিযোগ থাকে তা নয়। কিন্তু অন্য কেউ যে কখনও এখানে আসে এ রকম সংবাদ কোথাও পেল না সে। বরং ঝি চাকরদের কথায় বিশ্বাস করতে হলে এটা একটা পাহাড়ী গ্রাম যা সময়ের ট্রাক লরি থেকে পথের ধারে পড়ে গিয়েছে। অন্য কথায় সভ্যতার কাছে হারিয়ে যাওয়া একটা দ্বীপ। সকাল থেকে সন্ধ্যা ভুট্টার ক্ষেত, নাসপাতি, আপেল, কমলার তদ্বির করা। মাংস ফুরিয়ে গেলে শিকার করা , পাহাড়ী ছাগলের লোম থেকে মোটা পশম বোনা। এছাড়া আর কিছু নয়।

অবশেষে ম্যানেজার এবং ইন্সপেক্টার ফিরল। তখন লাঞ্চের সময় পার হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। এবং ঠিক এই সময়েই টুরিস্টের মনে হল ইন্সপেক্টারের উপরেও তার নজর রাখা দরকার।

কিন্তু ব্যারিস্টার এবং সুনয়নী? টুরিস্টের মনের মধ্যে এ দুটি নাম যেন ধিক ধিক করে কাঁপতে লাগল। লক্ষ্য করার বিষয় এই লাঞ্চে তারা আসে নি এমন কি এখন বিকেলের চায়ের সময়ও পার হয়ে যাচ্ছে।

কালকের মতোই গোধূলি নামল। বারান্দায় ইন্সপেক্টার এবং ম্যানেজার এবং টুরিস্ট তখন সারাদিনের কথা আলোচনা করছে সুনয়নী এবং ব্যারিস্টারকে আসতে দেখা গেল। সারাদিনে তাদেব ক্লান্ত হওয়ারই কথা। কিন্তু ক্লান্তি সত্ত্বেও তাদের সুখী মনে হল এবং সেটা একটি কঠিন বিপজ্জনক কর্তব্য ভালোভাবে শেষ করতে পারার তৃপ্তি হতে পারে।

টুরিস্ট ভাবলো এখন বাকিটুকু কালকের মতোই ঘটবে। সেই ডিনার টেবল এবং ওয়াইন। অবশেষে হয়ত ইন্সপেক্টার এবং ব্যারিস্টারের বন মহলের দাবি নিয়ে অভিনয়। (অভিনয় হওয়াটা অন্তত অসম্ভব নয়।) আর তখন মনে হবে কাল রাত্রিতে যে ডিনারে শুরু হয়েছিল আজ রাত্রিতেও সেটাই চলেছে। কাল কখন শেষ হয়েছে, আজ কখন শুরু হল, তা বোঝা যাবে না।

এমন সময়ে একজন চাকর এসে বলল ইন্সপেক্টার স্নান করবে কি না। গরম জল দেয়া হয়েছে। রাত্রির খাবার সকাল সকাল দিলে তাঁদের আপত্তি আছে কিনা তাও জানতে চেয়েছেন সুনয়নী।

টুরিস্ট ভাবল · সে আজ একটা কাজই করতে পারে। পথ একটা নিশ্চয়ই আছে। যে পথে তারা এসেছে তা ছাড়াও। এবং সে পথে ব্যারিস্টার আজ কতদূর গিয়েছিল তা জেনে নিতে হবে। আর কাল সকালে সেই পথের খোঁজেই বেরিয়ে পড়তে হবে। কারণ পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের খবরে খুব মারাত্মক ভুল কখনও থাকে না।

ডিনারের মাঝামাঝি সময়ে ইন্সপেক্টার বলল, 'কিন্তু ভটওলার বর্তমান মালিক স্থির করে নেয়া দরকার হবে'।

'প্রমাণ করা দরকার জমিগুলো এখন যাদের দখলে আছে বন হয়ে যাওয়ার আগেও তাদের কিম্বা তাদের পূর্বপুরুষের দখলে ছিল'।

ব্যারিস্টার বলল, 'এখানে একটা চা বাগানও হয়'।

ম্যানেজার বলল, 'চা বাগান? সে মৃদুভাবে বিস্মিত হয়েছে বোঝা গেল।

ব্যারিস্টার বলল, 'সুব্রাভ এ জায়গা আমার ভাল লেগেছে'।

টুরিস্ট বলল, 'কিন্তু চা চালান দেয়ার সহজ পথ একটা দরকার'।

ব্যারিস্টার একটু থামল। (যেন ঘরোয়া ব্যাপারে টুরিস্টের এই অনুপ্রবেশে সে বিস্মিত হয়েছে।) তারপর ডিনার টেবলের আলাপের মতোই সহজ করে নিল সে। বলল, 'পথ আছে। পথ আরও ভালো করা যেতে পারে'।

টুরিস্ট তার আনন্দ গোপন করার জন্য তার প্লেটের দিকে মুখ নামাল। এমন অসতর্কতা উত্তেজনার সময়েই প্রকাশ পাওয়ার কথা। পথ না থাকলে যোগাযোগও থাকে না।

সুনয়নী হেসে বলল, 'চা বাগান করতে হলে থাকতে হয়'।

ইন্সপেক্টার বলল, 'তা দীর্ঘদিনই'।

'শ্যয়োর'। বলল ব্যারিস্টার।

ডিনাব শেষ হওয়ার আগেই ব্যারিস্টার বলল, 'ওয়াইন আসুক'।

ইন্সপেক্টার বলল, 'কিন্তু আজ রাত্রিতে কাগজগুলো দেখবেন'?

'নিশ্চয়। এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে রাজী আছি'।

ওয়াইন এল।

টুরিস্ট চিন্তা করল · ইন্সপেক্টার বারবার বনবিভাগের দাবির কথাতেই ফিরবে। আলাপটাকে বরং চা বাগানের কথায় রাখলে সুবিধা ছিল। সে সুযোগের অপেক্ষা করবে এই স্থির কবল।

অবশেষে কালকের মতোই ওয়াইনের শেষটুকু ঢেলে নিলে ব্যারিস্টার আব তখন সুনয়নী উঠে দাঁড়াল।

ম্যানেজার চুরুট ধরাল। ইন্সপেক্টার চেয়ারে পিঠ ঢেলে দিয়ে প্যান্টের বোতাম একঘর খুলে ভুঁড়িটাকে আলগা কবে দিল।

টুরিস্ট বলল, 'চা বাগান বোধ হয় এখানে ভালই হয়। কিন্তু এর আগে কেউ করে নি কেন ভাবছি। বন্দরে যাওয়ার পথ নেই হয়ত'।

ব্যারিস্টার বলল, 'নিশ্চয়ই আছে, কিম্বা ছিল। এ জেলার সদরে কি গ্রামের লোকরা যেত না?

টুরিস্ট মনে মনে নিজের পিঠ চাপড়ে দিল।

ম্যানেজাব বলল, 'কাগজপত্রগুলো আনি এখানেই'।

'ওয়াইনও'। বলল ব্যারিস্টার।

ইন্সপেক্টার বলল, 'উইলটাও'।

ব্যারিস্টার বিস্ময় প্রকাশ করল, 'উইল'?

ম্যানেজার বলল, 'তা আছে। ভট্টবাবুর উইলের কথাই'।

'কনটেস্ট করা যায়'? ব্যারিস্টার লঘুস্বরে বলল। 'আনুন, তাও আনুন'।

ম্যানেজার কাগজপত্র আনতে গেল। কিন্তু কাগজ দেখার প্রস্তাবটা সংশোধিত হল। দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সুনয়নী। তার ম্যানিকিওর করা নখের আঙুলগুলো সে রাখল দবজার চৌকাঠে। বলল সে, 'তাস খেলবে ব্যারিস্টার'?

ব্যারিস্টার বলল, 'নাথিং বেটার'!

দরজায় রাখা সুনয়নীর আঙুলের ফাঁকে একটা সিগারেট জ্বলছে, আর তা একটা মণির মতো।

'আসবে'? সুনয়নী হাসল।

ব্যারিস্টার চলে গেল।

ইন্সপেক্টার সিগারেট ধরাল। আর টুরিস্ট তখন ভাবল ধৈর্যের শেষ ফলে কিছু একটা সে নিশ্চয় পেয়ে যাবে। যদি ওদের ম্যাপ থাকে আর অভিনয়ের অতি নাটকীয়তার ঝোঁক যদি সেটাকে বার করে তবে ভালো করে দেখে নিতে হবে। অবশ্য এমনও হতে পারে সে ম্যাপটা ভুল কিছু।

ম্যানেজার কাগজপত্র নিয়ে ফিরল। কিন্তু তারা কিছু আলোচনা করার আগেই করিডরের ও পারে একটা ঘবের জানলা খুলে গেল, কিম্বা হয়ত কমিয়ে রাখা আলোটা উজ্জ্বল করা হল কাচের সার্সির ও পারে। সামনে টিপয়ে তাস। নিচে একটা সোফায় বসছে ব্যারিস্টার। অন্য একটি সোফার পিছনে দাঁড়িয়ে সুনয়নী।

ম্যানেজার কাগজপত্রগুলো একটা টিপয়ের উপরে রাখল। একটা একটা করে নিয়ে ইন্সপেক্টারের সামনে মেলে ধরে তাদের পরিয়ে দিল। এটা উইল, এটা পরচা, এটা তেরিজ ইত্যাদি। ইন্সপেক্টাব উঠে গিয়ে আলোটাকে বাড়িয়ে দিয়ে এল। বলল, 'ব্যারিস্টার থাকলে সুবিধা হত'।

ব্যারিস্টার তখন ওঘরে তাসগুলো শাফ্‌ল করল। সুনয়নী ড্রেসিং টেবলটাব পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে সোফায় বসল। ব্যারিস্টার তাস বাঁটল।

ম্যানেজার বলল, 'আপনি দেখুন, পরে না হয় ব্যারিস্টারের সঙ্গে আলোচনা করা যাবে'। চুরুটের ছাই ঝাড়ল সে।

ইন্সপেক্টার একটা কাগজ পড়তে শুরু করল। পড়তে পড়তে গোঁফের প্রান্ত আঙুলে নিয়ে খেলা করার মুদ্রাদোষ আছে তার।

ম্যানেজার বলল টুরিস্টকে, 'আমরা একটু স্বার্থপরের মতো কাজ করছি। আপনাকে ওয়াইন আনিয়ে দেব'?

'তা দরকার হবে না'। বলল টুরিস্ট, 'আমিও আপনাদের কাগজপত্রের আলোচনায় যোগ দিতে পারি যদি তাতে আপনাদের আপত্তি না থাকে। তাতে এ গ্রামটা সম্বন্ধে আমার ধারণাটা পরিষ্কার হবে'।

ম্যানেজার বলল, 'স্বচ্ছন্দে স্বচ্ছন্দে, এগিয়ে আসুন'।

টুরিস্ট মনের তলায় হাসল ; ওল্‌ড্‌ ফক্‌স্‌। জেলখানাব গারদ আর তোমার মধ্যে দূবত্ব খুব দূর নয়। বোঝা যাচ্ছে ব্যারিস্টার এবং সুনয়নীর পরিচয় অন্তত দু চার বছরের পুরনো যতই তুমি বল এই প্রথম এসেছে ব্যারিস্টার। নতুবা ব্যারিস্টার রাত্রিতে একা শিকারে যায় না, নতুবা সুনয়নী এবং সে সকাল থেকে সন্ধ্যা শুয়োর শিকারে কাটিয়ে আসেনা। আর এখনও দেখো।

মুখের সামনে তাস মেলে ধরেছে সুনয়নী। মনে হল দাঁতের দাগ পড়েছে তাসের ডগায়।

তাস চেলে অ্যাসট্রে থেকে সিগারেট তুলে নিল ব্যারিস্টার। ধোঁয়াটা পাক খেয়ে আলোটার দিকে এগিয়ে গেল।

তাস চেলে রিনরিন করে হেসে উঠল সুনয়নী। তাসগুলো গুছিয়ে ধরে ভাবল ব্যারিস্টার। হাতের তাস ফেলে আড়মোড়া ভাঙল সুনয়নী।

চাকর এল ও ঘরে। ট্রেতে মদের বোতল এবং গ্লাস। সুনয়নী সোফাটায় হেলে বসল। আব তার ফলে তার বুকে আলো পড়ল। বোতলের সিলটা খুলল ব্যারিস্টার। সুনয়নী সোফাটার হাতলে হাত বুলাল। নিজের গ্লাসটা ভরে নিল ব্যারিস্টার, তারপর তাস বিলি করল। সুনয়নী গ্লাসে ওয়াইন নিল।

টুরিস্ট ভাবল · এইসব তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যেই অদ্ভুতভাবে কোন কোনটি অপরাধের প্রমাণ হবে তা এখনই বলা যায় না। কাজেই এরা কাগজ দেখুক এবং ওরা তাস খেলুক। নিঃশব্দে লক্ষ্য করে যাওয়াই কাজ হবে তার। এবং যদি সম্ভব হয় ব্যারিস্টারের সঙ্গে ভটওলার কী সম্বন্ধ সে বিষয়ে ম্যানেজারকে দিয়ে আরও কিছু মিথ্যা বলিয়ে নিতে হবে।

সে একটু সরে বসল। তার ফলে তার মুখটার আধখানা অন্ধকারে পড়ল। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল সে।

উইলটা পড়ল ইন্সপেক্টার : আমি যখন পালিয়ে এসেছিলাম তার পরে অনেকদিন গিয়েছে।

আমার বয়স হয়েছে। এখন ধূসর বনে গেলে বিষণ্ণতা অনুভব করি। পরপর কয়েকদিনই এই রকম অনুভব করলাম। আগামী বসন্তে কি নতুন লাল পাতা দেখে ঈর্ষা হবে? লক্ষ্য করলাম মহুয়া গাছটিকে। পাতা ঝরে গিয়েছে। আবার নতুন হবে। কিন্তু মানুষ?

তাস তুলেই হাতের তাস ফেলে দিয়ে হেসে উঠল সুনয়নী। ব্যারিস্টার অবাক হয়ে তার দিকে, তার তাসের দিকে তাকাল। সুনয়নী গ্লাস থেকে সামান্য মদ ঢেলে নিল। তার চোখ দুটো টানাটানা দেখাল।

ইন্সপেক্টাব বিব্রত হয়েছে বোঝা গেল। উইলটা নামিয়ে রেখে সে চুরুট টানল দু এক মিনিট। তার লাল গোঁফগুলো তখন আরও লাল দেখাল। উইলটা পড়ল সে আবার · মানুষের তেমন উপায় নেই। গাছের অস্তিত্ব বৃদ্ধ অংশ থেকে নবীন অংশে আশ্রয় নিতে পারে। আমাদের এখানকার জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্যকে আমি অত্যন্ত ভালোবেসেছি। আমার সে ভালোবাসা কোথায় আশ্রয় পাবে?

ম্যানেজার হাই তুলল। হ্যাজাকে আলোটা লাল হয়ে আসছে। ম্যানটেলে তেল আসছে না। টুরিস্টের মনে হল কালও এমন হয়েছিল।

সে রাত্রিতে টুরিস্ট নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারল না। ম্যানেজাব এবং ইন্সপেক্টার স্থির করল বাকি কাগজ কাল দিনের বেলায় পড়া যাবে। ওরা তাস সামনে রেখে গল্প করছে এখন।

কিন্তু রাত্রিতে টুরিস্ট উঠে বসেছিল বিছানায়। তার মনে হয়েছিল কারা কথা বলছে। করিডরে দাঁড়িয়ে সে অনুভব করল এখনও যেন ওবা তাস খেলছে। কিন্তু আলোটা যেন বদলেছে। এটার চিমনি বোধ হয় নীল রঙের। নীল আলোটা কাঁপল। মশারির পাশ থেকে দুপা হেঁটে গিয়ে ড্রেসিং টেবলটার সামনে দাঁড়াল সুনয়নী। মাথার উপবে হাত উঁচু করে চুলগুলোকে এলো খোপায় জড়াল সে। তার মুখে হাসি দেখা দিল যেন। তারপব দরজা খুলে সেটাকে বাইবে থেকে চেপে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

এ গল্পটার কথা লোকে জানত না যদি ইন্সপেক্টার এবং টুরিস্ট চার পাঁচ বছর পবে তাদের অভিজ্ঞতাকে সেই ওয়েটিংরুমে আলোচনা না কবত।

ভুট্টার ফুলকা রুটি, হরিণীর রাং-এর রোস্ট, আর, একটু হালকা কিন্তু মিষ্টি ওয়াইনেব এবং শেষে উইলের কথা বলে ইন্সপেক্টার টুরিস্টকে জিজ্ঞাসা করল সে আর কখনও গিয়েছে কিনা ভটওলার।

টুরিস্ট বলল, 'না! পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট ঠিকই ছিল। কাছাকাছি এক চা বাগান থেকেই সেসব ব্যাপার হত। নিজেদের আড্ডাকে গোপন করার জন্য ভটওলার নাম ব্যবহার করত। বলা যেতে পারে, যে ভটওলায় আমরা গিয়েছিলাম সেটা নয় পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ভটওলা। কিন্তু সেই উইলের কী হল'?

'এই পাঁচ বছরে কেউ কনটেস্ট করে নি। একটা ইচ্ছাকে কেই বা কনটেষ্ট করতে পারে'।

টুরিস্ট আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তা হলে ব্যারিস্টার'?

ইন্সপেক্টার তার চায়ের কাপে চুমুক দিল।

কাপটা নামিয়ে রেখে অবশেষে সে বলল, 'বছর দুয়েক আগে বার লাইব্রেরীতে তাকে দেখেছিলাম হলদে, রোগা। পোশাক ছেঁড়া এবং ময়লা। ব্রিফের পিছনে ঘোড়ার ছবি আঁকছিল'।

ওগো মুগ্ধা

তার এক হাতে একটি নিকেল মোড়া সরু লম্বা কাঁচি। অন্য হাতে একটি চন্দ্রমল্লিকা। বাড়ির পিছন দিকের বারান্দায় সে উঠে এল।

তার রান্নাঘরের দরজা এখন বন্ধ। ঝি কয়লায় আঁচ দিয়েছে, টালির ছাদে বসানো চোঙ দিয়ে এখনও হালকা ধোঁয়া এঁকেবেঁকে বেরুচ্ছে।

সিঁড়িগুলোতে টবে বসানো অনেক ফুলের গাছ, সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেও একটা ছোটখাটো ফুলের আবাদে পৌঁছানো যায়। সেই আবাদ শেষ হয়েছে একটা ছোট তরকারি বাগানে। টম্যাটো গাছের ঝোপ তিনটিতে তেল চুকচুকে ফলগুলো এখন সবুজ। কপিগুলো ভালো হয়নি, পাতাগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে।

শোবার ঘরের ছাদ থেকে নেমে আসা লতাটার সমাদর যত না তার ফুলের জন্য তার চাইতে বেশি তার পল্লবের জন্য। কাঁচি দিয়ে একটি পল্লব কাটতে গিয়ে সে অবাক হয়ে দেখল একটি দলছাড়া মৌমাছি সেই পল্লবের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে কিম্বা এইমাত্র এসে বসেছে। সে মৌমাছিকে বোকা মনে করে তাকে বিব্রত করল না, অন্য আরেকটি পল্লব কেটে নিল।

স্নান হয়নি, সম্ভবত তার দেরি আছে। কারণ গলায় মাফলার জড়ানো দেখছি। ডান হাতের উপর থেকে শাড়ির আঁচলটা সরে যাওয়াতে উলের ব্লাউজের কিছুটা চোখে পড়ছে। কপালের উপরে ঈষৎ রুক্ষ দু'একগোছা চুল। সেই চুলে কযেক বিন্দু জল পাথরের মতো চকচক করছে। ফুল তুলতে গিয়ে শিশির লেগেছে কিম্বা মুখ ধুতে গিয়ে জল। এত সকালে প্রসাধন নিয়ে সে ব্যস্ত হতে পারে না। তার খোঁপাভাঙা চুল পিঠের উপরে আধখানা নেমে আছে, একটা রুপোর কাঁটার মাথা চোখে পড়ছে। হালকা সবুজে সাদা ডোরা বসানো তার শাড়িটা রাত্রির ঘুমে একটু অগোছালো।

পাশাপাশি তিনটি ঘরেব মধ্যেরটিতে সে ঢুকল। এটিতে তারা খায়, দুপুরে উল নিয়ে সে বসে, পাড়ার মেয়েরা কখনও এসে আড্ডা জমায়, তার ছেলে কাঠের ঘোড়ায় দিগ্বিজয়ে যাত্রা করে, অন্য কখনও ছবির বই দেখে অক্ষর পরিচয় করে। সব জানলা দরজা এখনও খোলা হয়নি, শুধু দরজার মাথায় বসানো ঘষা কাচের আলো-জানলা দিয়ে দিনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কী ভাবল। হাতের ফুল ও কাঁচি একটা চেয়ারের উপরে রেখে খাবার টেবিল থেকে চাদরটা তুলল। কাল রাত্রিতে ছেলেটা ঝোল ঢেলে ফেলেছিল তা মনে পড়ল। বাঁ দিকের দেয়াল-আলমারি খুলে ধোয়া চাদর বার করে টেবিলে বিছাল। তারপর ছোট ফুলদানিতে ফুল আর পল্লব বসাল।

তার ঘাসের চটিতে রঙিন কাঁথার ম্যাটিঙের উপরে কোনো শব্দ হচ্ছিল না। ডানদিকের ঘর থেকে খুক্ করে কাশির শব্দ হল। তার স্বামী তা হলে উঠেছে, দিনের প্রথম সিগারেট ধরিয়েছে। সে আর দেরি করল না। ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে তার দাঁত মাজিয়ে পোশাক পালটে প্রস্তুত করতে হবে, রান্নাঘরের কাজগুলো শেষ করতে হবে। এর মধ্যে স্বামী প্রাতকৃত্যাদি শেষ করে বাইরের বারান্দা থেকে সকালের কাগজখানা নিয়ে আসবে, টেবিলে গিয়ে বসবে চায়ের প্রতীক্ষায়।

সে ছেলের ঘরে ঢুকে তাকে জাগিয়ে, কোলে করে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

নাম তার গায়ত্রী। বিয়ের সময়ে স্বামী সরকারি কলেজে অধ্যাপক ছিল। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ববিভাগে। পাঁচ বছর ধরে এই বাংলোয় তারা বাস করছে। মাইল দু'এক দূরে খননকার্য চলেছে। গুপ্তযুগের এক নগরের ধ্বংসাবশেষ মাটির তলা থেকে আত্মপ্রকাশ করছে।

শহর থেকে দূরে এসে গায়ত্রী খুঁতখুঁত করেনি। কারণ সে রকম তার স্বভাব নয়। নতুবা অনেক হেতু ছিল তার অস্বস্তি বোধ করার। সে শহরের মেয়ে। সভা-সমিতি ছবি-থিয়েটার। সামাজিক প্রাণী ছিল সে বিয়ের আগে এবং পরেও। এখনও মনিঅর্ডার করে সে অনেক সমিতিতে চাঁদা পাঠিয়ে আসছে। দু' একটি সমিতির কার্যকরীসংস্থার সভ্য সে। অনুপস্থিতি সত্ত্বেও সে নির্বাচিত হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এখানেও সে একটি সমিতি করেছে—নারীত্রাণ সমিতি। স্থাপয়িতা হিসাবেও বটে, এ অঞ্চলের সবচাইতে বড় কর্মচারীর স্ত্রী হিসাবেও বটে সে এই সমিতির সভাপতি।

বড় কর্মচারী বই কি। অধ্যাপক হিসাবে তার স্বামী সম্মানার্হ ছিল, এখন সেটার সঙ্গে ক্ষমতার সংযোগ হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটদের যে-রকম ধরনের অধিকার আছে তেমনি কিছু কিছু যেন পেয়েছে তার স্বামী। খনন কার্যের তদ্‌বির তদারক ছাড়াও অধীনস্থ কর্মচারীদের ছুটি, নিয়োগ, বদলি ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পুলিসের ফাঁড়ি বসেছে। সেই ফাঁড়ির লোকেরাও আইনগতভাবে তাব স্বামীর কর্মচারী না হলেও তারাও তার কাছে পবামর্শ নিতে আসে। সাহেব বলে উল্লেখ কবে।

চাযের টেবিলে কাগজ পড়তে পডতে সাহেব কথা বলছিল। বড় অক্ষরে লেখা বড় খবরগুলো এক নিমেষে পড়ে ফেলে সে। ছোট খববগুলোতেই তার আকর্ষণ বেশি। ডিমে চামচ দিয়ে তেমনি একটি ছোট খবব পড়ে সে গায়ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সদরে 'নারী পুনর্বাসন সমিতি'র বাৎসবিক সভা হচ্ছে।

'তুমি কি এই সমিতির সঙ্গে সংযুক্ত নও'? সাহেব কৌতুকেব সুবে বলল।

'তা সংযুক্ত বই কি'।

সাহেব হাসল, 'এ অঞ্চলে, এ জেলাই বলতে পাবো, তোমাকে ছাড়া কোনো সমিতি হয না বলেই আমার ধারণা'।

'ভাবসাম্য বক্ষা করাব জন্য তুমি সমিতি মাত্রকেই বর্জন করেছ। সদরের ক্লাবের চিঠি এসেছে সেদিন, দু' তিন বছরের চাঁদা দাওনি'। গায়ত্রী হাসল।

'ওরা এখনও লিস্টিতে নাম রেখেছে নাকি'?

'চাঁদা পাঠিয়ে দেব'।

'তা দিও'।

গায়ত্রী বলল, 'তোমার কয়েকখানা পত্রিকা পড়ে আছে। পাতাও কাটা হযনি'।

'তাই নাকি? দিও তো পড়তে'।

সাহেব বলল কিছুক্ষণ পরে, 'হাসছ যে'।

'ভাবছি তোমার ছেলে তোমার মত হবে কি না'।

'তা একটু হবে'।

প্রাতরাশ শেষ হল। সাহেব সার্টের গলায় টাই বেঁধে দাঁড়াতেই গায়ত্রী এসে কোটটা ধবল। ততক্ষণে তার আর্দালি তার মোটরবাইক গেটের পাশে নামিয়ে ঝাড়পোঁছ কবে পবিষ্কাব করে বেখেছে। সাহেব বাইকে চেপে দস্তানা পরে ডান হাত তুলে বিদায় সম্ভাষণ জানাল। বারান্দা থেকে গায়ত্রী বিদায় দিতে হাসিমুখে বলল, 'বাই-বাই'। তার ছেলে বলল, 'ছকাল ছকাল এছো'।

আর্দালি গেট বন্ধ করে, গেটের পাশের ছোট ঘরটি থেকে তার নাগবা জুতো পরে বাজারের ঝোলা হাতে করে ঘুরে এসে দাঁড়াবে রান্নাঘরের কাছে। গায়ত্রী তাকে বাজারের টাকা দেবে।

আর্দালি বাজারে গেলে গায়ত্রী পত্রিকা নিয়ে বসল, ছেলেও তার ছবির বই নিয়ে এল।

আজ শুক্রবার তা গায়ত্রীর খেয়াল ছিল না। থাকলে অবশ্য এরই মধ্যে স্নানটা সেরে নিত। এই দিনটিতে তাকে এখানকার নারীত্রাণ সমিতিতে যেতে হয় কিম্বা সমিতির পক্ষ থেকেই কেউ আসে তার কাছে। দিনটিকে মনে করিয়ে দিতে সমিতির পক্ষ থেকে পঙ্কজিনী এল। তার অত্যন্ত নিঃশব্দ চলার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় সে এসেছে। তাব চলার দিকে হঠাৎ কারো চোখ পড়লে মনে হয়— এতক্ষণ

সে দাঁড়িয়েছিল, এইমাত্র চলতে শুরু করল। অত্যন্ত কালো, যার চাইতে কালো কল্পনা করা যায় না। ছিপছিপে চেহারা। পরনে নরুণ পাড় সাদা শাড়ি। সে ধীরে চললেও তার হাঁটার যে বিরাম নেই তার লক্ষণ– তার পায়ের আঙুলের ছোট ছোট কড়া যা ধূলিধূসর স্যান্ডেলের মধ্যে থেকে চোখে পড়ে। গায়ত্রী বলল, 'এসো'।

শুক্রবারের দিন যদি সে গায়ত্রীর সঙ্গে কোথাও সভা করতে না যায় তবে অনিবার্যভাবেই এখানে আসে। আধখানা বেলা কাটিয়ে যায়। শুক্রবারে শুরু করে রবিবারের সন্ধ্যা পর্যন্ত সে সমিতির কাজ করে বেড়ায়। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার সে একজন নার্সমাত্র। উপনিবেশ এবং গ্রামের সংসারগুলোই তার কর্মক্ষেত্র। বউদের সঙ্গে আলাপ করে বেড়ানোই তার কাজ। একটু বৈশিষ্ট্য আছে সে আলাপের, কখনও উঁচু গলায় নয়, কখনও প্রকাশ্য স্থানে নয়, সেসব কথাবার্তা। বাড়ির মধ্যেও কোনো ঘরের কোণ, কিম্বা দুই ঘরের মধ্যেকার সংকীর্ণ জায়গায় অথবা কোনো দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে সে বউদের সঙ্গে ফিসফিস করে আলাপ করে। কখনও নিজের হাত থেকে কোনো বউয়ের হাতে সংগোপনে কিছু দেয়। সে-ও হাত মুঠো করে সেই দান নিয়ে গোপন করে ফেলে। এর ফলে গ্রামের এবং উপনিবেশের কিশোর-কিশোরীদের কাছে সে কৌতূহলের ও রহস্যের কিছু। সে কোনো বাড়িতে ঢোকামাত্র ছেলেমেয়েরা সে কী করে দেখবার জন্য, সে কী বলে শুনবার জন্য হট্টগোল থামিয়ে চুপ করে যায়। কিন্তু তাদের কিছু সুবিধা হয়নি তাতে, রহস্য বেড়েই যাচ্ছে।

'আজকের খবর কী'? গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করল।

'ভালো, চানুদিদি চাঁদের খাতা হাতে বেরিয়েছেন'।

'পঙ্কজ, তোমার মতো কর্মী পাওয়া যে কোনো সমিতিব পক্ষেই সৌভাগ্য'।

গায়ত্রীর ছেলে এত ছোট যে পঙ্কজিনী তার সামনে প্রকাশ্যে কিছু বললেও সে কৌতূহল বোধ করে না। সুতরাং পঙ্কজিনী বলল, 'আপনি সেদিন ম্যালথাসেব কথা কী বলছিলেন যেন'?

'তা বলছিলাম, কিন্তু তার কথা কেন'?

'মন্দাকিনী বলছিল, তার স্বামী রাজি নয়। বলেছে-- তারা গরিব বলেই তাদের সম্বন্ধে এ রকম বাজে কথা লোকে ভাবে আব বলে'।

মন্দাকিনীর স্বামী সুরেন ব্রহ্ম তার স্বামীর অধীনে একজন কেরানি ; সুতরাং আর্থিক অবস্থায় তারা গায়ত্রীদের তুলনায় হীন। একথাও হয়তো মন্দাকিনী তার স্বামীকে বলে ফেলবে পঙ্কজিনীব পিছনে মেমসাহেব গায়ত্রী আছে। তারপর সুরেন ব্রহ্ম সে কথা অন্যান্য কর্মচারীকেও বলতে পারে। এই গোপন দাম্পত্য বিষয়ে সুদূর থেকেও সংযুক্ত হওয়ার লজ্জা অনুভব করল গায়ত্রী, বিব্রত বোধ করল সে।

'পঙ্কজ, থাক তা হলে মন্দাকিনীর কাছে আর যেয়ো না'।

'কিন্তু এ রকম কথা তো অনেকেই বলতে পারে। তার চাইতে শিক্ষিত লোকদের উল্টোপাল্টা কথার উত্তর তৈরি করে রাখা ভালো'।

'তা বোধ হয় ভালো। কিন্তু'।

গায়ত্রী উঠে গিয়ে আলমারি খুলল। মস্ত বড় এবং চওড়া আলমারি। আলমারি থেকে কিছু নেবার জন্যই পঙ্কজিনী এসেছে। দিয়ে দিলেই সে চলে যাবে। চলে যাতে যায় এ রকম একটা তাগিদই ছিল আলমারি খোলার মধ্যে। আলমারির একটি তাকে সমিতির খাতাপত্র, ক্যাশবাক্স, দুতিনটিতে কাপড়চোপড়, ফ্রক-ইজের দানের জন্য সংগৃহীত। দুটিতে অনেক ধরনের ওষুধে শিশি বোতল, ইংরিজিতে প্রয়োগক্ষেত্রের নাম লেখা আছে। সবচাইতে উপরের তাকে জন্মশাসনের উপকরণ।

পঙ্কজিনী উঠে এসেছিল। গায়ত্রীর ছেলের চোখে এই আসবাবটি একটা বন্ধ ঘর যা চকিতের জন্য খুলে আবার বন্ধ হয়ে যায়। তারার মতো চোখ মেলে ছেলেটি চেয়ে রইল, আমরা যেমন ভগবানের রহস্যময় কার্যকলাপের দিকে তাকাই। ঝপঝপ করে কিছু পঙ্কজিনীর মেলে ধরা আঁচলে ফেলে দিল

গায়ত্রী।

'ওষুধ'?

'থাক আজ'।

চিন্তা করার সময় পেয়ে মন্দাকিনীর বাবদে আর বিব্রত বোধ কবল না গায়ত্রী। বরং তার মনে হল এখন তার হাতে অনেক কাজ। আর্দালি বাজার কবে ফিরেছে। তার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে কী কী রান্না হবে ঠিক করে ঝিকে তরকারি কুটতে বলে দিতে হবে। ইতিমধ্যে তার স্নান হয়ে যাবে। তারপর সে রান্না করবে। ঘণ্টা দু'একের কাজ, নিজের হাতেই করে সে। তার ধারণা পাচিকাকে নিজের রুচিমতো রান্না শেখানোর চাইতে তাদের ধরে ম্যাট্রিক পাস করানো সোজা।

সে সুতরাং স্নানের ঘরে ঢুকেছে তখন। তাব ছেলে এ সময়ে বাজারের জিনিসপত্র নিয়ে ঝি এবং আর্দালিব সঙ্গে নানা কৌতূহলের প্রশ্ন করে, গল্প করে। স্নানের ঘরে জল ঢালতে ঢালতে এসবই কানে যায় গায়ত্রীর।

আজ সে শুনতে পেল ডাকপিওনের গলা, চিঠি আছে। আর্দালি তখন খোকাবাবুব সঙ্গে গল্পে ব্যস্ত। ডাকপিওন দ্বিতীয়বাব ডাকল। গাযত্রী স্নানের ঘর থেকেই একটু উঁচু গলায় বলল, বাইরে রেখে যাও। কথাটা বলতে সে বাইবের দিকে যে দেয়াল তার দিকে ফিরেছিল। সে সময়ে তার খেয়াল ছিল না সে দিকটাতেই আয়না। ত্রস্তভাবে সে নিজেকে আবৃত করল। তারপবেই অবশ্য তার মনে পড়ল তার চাবিদিকেই দেয়াল। তখন সে স্নান করতে করতেও দুএকবার আয়নার দিকেও তাকাল। সে লক্ষ্য কবল পিঠের দিকে ডান কাঁধেব নিচে একটা নীল রঙের তিল বেশ বড় হয়ে উঠেছে।

সেমিজের উপরে শাড়ি জড়িয়ে ভিজে চুল পিঠে ছড়িয়ে সে বান্নাঘবে গেল। রান্না শেষ করে সে স্নানের ঘরে হাতমুখ ধুয়ে প্রসাধন করবে। এখন তাকে বান্নাঘরে দেখে নেপথ্যের কথা মনে হচ্ছে।

রান্না করতে করতে একসময়ে সে চিঠির কথা মনে করল। সদরের দিকে বারান্দার টেবিলে দু'খানা চিঠি ছিল। সে চিঠি নিযে এল। প্রথমখানা খুলে সে বেশ কিছুটা উত্তেজিত হল। সদরের 'নারী সমিতি'র সেক্রেটাবি অনিমাদি চিঠি দিয়েছেন। সাধারণ বাৎসরিক সভা নয় : এবার তাবা একটি বাড়ি করতে পেরেছে এবং সে বাড়িতে তারা শহরের কয়েকজন পতিতাকে আশ্রয় নিতে রাজি করিয়েছে। আশ্রয়চ্যুতা মেয়েদের যারা পাতিত্যের দিকে পিছলে পড়ার মতো পথে ঘুবে বেড়াচ্ছে তাদেরও সেখানে রাখবার ব্যবস্থা হচ্ছে। শুধু আশ্রয় নয়, পুনর্বাসনেব ব্যবস্থাও। তার আরো ভালো লাগল বাড়িটার প্রস্তাবিত নামটা পড়ে— আশ্রম নয়, আশ্রয় নয়—নীড়। সমিতির সভ্য হিসাবে তার কাছে ছাপানো চিঠির সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারি তাকে ব্যক্তিগতভাবে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন যেতে— এককালের সহ-সভাপতি এবং প্রধানতম কর্মীদের একজন হিসাবে। মাছেব তবকারিটা বান্না করতে করতে সে গুনগুন করে গান গেয়ে চলল।

তরকারিটা নামিযে সেমিজের মধ্যে থেকে দ্বিতীয় চিঠিটা বার করল সে। দুতিন ছত্রের চিঠি। দামি চিঠির কাগজ, কোনায় নাম ছাপানো : ডক্টর মোহিত সেন। সে লিখেছে : শুনলুম তোমার সেই 'নারী সমিতি'র বাৎসরিক সভা হচ্ছে। যদি তুমি আসো, তা হলে জানিয়ে রাখি আমি ফিরে এসেছি। আশা করি তুমি তোমার ছেলে এবং আমাদের সাহেব কুশলে আছ।

রান্না নামিয়ে সাবান তোয়ালে নিয়ে সে যখন স্নানের ঘরে ঢুকেছে তার স্বামীর বাইকের শব্দ শোনা গেল, তারপরে ছেলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার স্বামী ঘরে এল।

সে যখন স্বামীর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল তখন নবাগত বসন্তের ভালোলাগার কারণটুকুই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

টেবিলের মাথায় ছেলে, দুপাশে দুজন। খেতে খেতে সাহেব উপনিবেশের দুচারটে খবর দিল। পক্স নাকি হয়েছে দুএকটি। সুতরাং ভ্যাক্‌সিনেশান। গায়ত্রী ছেলের হাত উল্টে দেখল গত বছরের টিকার

দাগ চোখে পড়ে কি না। সাহেব বলল, 'তা হলেও এবার দেওয়া উচিত'। গায়ত্রী একমত হল।

সাহেব বলল, 'খুঁড়তে খুঁড়তে শহরের একটা প্রধান অংশে একটি গলিরাস্তার ধারে কয়েকটি একই চেহারার ঘরের ভিত্তি পাওয়া গেছে। যদি বৌদ্ধস্তূপের অংশ হতো তা হলে বলতাম শ্রমণদের ঘর'।

'তোমার কী মনে হয়?'

'কত কী হতে পারে। মনে করো বারবণিতাদের ঘর ছিল'।

'রাখো রাখো। দোকানও হতে পাবে'।

'তা পারে না এমন নয়'।

কথা মোড নিল। ছেলের জলের গ্লাসে জল দিয়ে, 'অত জল খাসনে' বলে গায়ত্রী বলল সাহেবকে, 'সদরে একবার যাব নাকি ভাবছি'।

'কিছু কেনাকাটা আছে'?

'না, 'নাবী সমিতি'র বাৎসরিক সভা'।

'কবে যাবে'?

'পরশুদিন যেতে হয়'।

'সকালেব ট্রেনে গেলে সন্ধ্যায় ফিরতে পাববে'?

'তোমাদেব অসুবিধা হবে না তো'?

'কী এমন হবে। বাপ-বেটায় একদিন চালিয়ে নেব'।

কিছুক্ষণ পবে সাহেব বলল, 'সদরে যদি যাও একটা কাজ কোবো তো'।

'কী'?

'মোহিতেব খোঁজ নিও। ও আর চিঠিও দেয না'।

'যদি দেখা পাই, কী বলব'? চিঠির কথা গোপন কবে মনে মনে হেসে বলল গাযত্রী।

'বারবার করে আসতে বলবে'। সাহেব উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'ওর সঙ্গে আমাব কত গভীব প্রণয ছিল বলা কঠিন'।

'তা ছিল। আমার চাইতে ভুক্তভোগী কে'?

'হ্যাঁ, সেকালে তোমার ধারণা হয়েছিল মোহিত পুরুষবেশী কোনো নারী'।

'এটা তোমার বাড়াবাড়ি'।

কথাটা বলার সময়ে না হলেও অন্য কথায় যাওয়ার ক্ষণ-অবসরে সেসব দিনের কথা মনে কবে গায়ত্রীর কান দুটি হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। মোহিতের দিকে স্বামীর আকর্ষণ তার স্বামীপ্রেমের পথে বাধা হয়েছিল?

সাহেব বলল, 'মোহিত বিয়ে করেছে কি না কে জানে'!

'তা হয়তো করেছে'।

'না করলেই স্বাভাবিক হয়। ওর ভিতরে একটি সন্ন্যাসী আছে যে সেবা করে পরের কাজে লেগে তৃপ্তি পায়'।

সকালের গাড়িতে গায়ত্রী সদরে চলেছে। স্বামী এবং ছেলে তাকে তুলে দিয়ে গেছে।

রেলপথের ধারে কোথাওবা আমগাছে মুকুল, কোথাওবা মাঠে ঘাস ফুল তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। প্রথম শ্রেণীর কামরায় দ্বিতীয় যাত্রী এক অতিবৃদ্ধ হলুদ রঙের ট্যাস। তার দিকে পিছন ফিরে বসে গায়ত্রী চিন্তা করতে লাগল। সকালের মধুর বাতাস কপাল ছুঁয়ে যাচ্ছে।

সে ভাবল, মোহিতের চিঠিটার কথা স্বামীকে বলাই উচিত ছিল। বলা একটুও কঠিন ছিল না। মোহিত সম্বন্ধে তার বক্তব্য শোনার পরে হাসতে হাসতে বললেই হতো— তা হলে শোনো, মোহিতেরও এখন তোমার স্ত্রীর উপরে আর অভিমান নেই।

হাতের ছোট হাতঘড়িতে সে দেখল প্রায় একঘণ্টা হল ট্রেন ছেড়েছে। এখনও একঘণ্টা তো বটেই, তারপরে সদরে যাবার জংশন, সেখান থেকে অবশ্য আধঘণ্টা পরেই সদর। সভা বেলা তিনটেতে। ফিরবার ট্রেন সন্ধ্যার একটু পরেই, সাড়ে সাতটায়। সভা যদি তিন ঘণ্টা চলে, তা হলেও টেন ধরা যাবে, তখন আর মোহিতের সঙ্গে দেখা কবা যাবে না। যদি দেখা করতেই হয় তবে সভাব আগেহ— অল্প সময়ের মামুলি আলাপ।

এই রকম সভাটার জন্যই যেন দীর্ঘকাল সে প্রতীক্ষা কবে এসেছে। সদরের কলেজে তার স্বামী অধ্যাপক। তখন সে যে ছোট নারী সমিতি তৈরি করেছিল তার নানা কর্মসূচি ছিল। বয়স্ক মেয়েদের সেলাই শেখানো, খবরের কাগজ পড়ার নেশা ধবানো, হস্‌পিট্যালে মেয়েদের জন্য দু'একটা শয্যা বাড়ানো, এমনকী তাদের নিয়ে রবীন্দ্র উৎসব প্রভৃতি করা। কিন্তু তাদের সেই সমিতি এমন মহৎ কাজ শেষ পর্যন্ত করবে এ কল্পনা করা যায়নি। পতিতাদের পুনর্বাসনের কথা সব সমাজদরদীই ভাবে। হাতে-কলমে এ যেন উদাহবণ স্থাপন করা। সারা বাংলায় না-হোক অন্তত একটি শহরে হচ্ছে।

সেক্রেটারি অনিমাদি ভুবনবাবু উকিলের স্ত্রী। সহজে সমিতিতে আসেননি. যখন এলেন তখন সদরের হোমরা-চোমরাদের চোখে পড়ে গেল সমিতি। ভদ্রমহিলা কংগ্রেসেব বৈপ্লবিক দিনে কংগ্রেসি ছিলেন। যার ফলে পুরুষদেব সঙ্গে তর্ক করাব একটি নিঃসংকোচ ভঙ্গি জন্মেছে তার। তিনি ছাডা এত বড় কাজে হাত দিতে আর কেইবা সাহস পেত।

আরো অন্য অনেকে হযতো আসবে। অন্য অধ্যাপকদের স্ত্রীরা, উকিলদেব স্ত্রীরা। পরিচিতারা হয়তো অনেকেই আসবে।

সুতরাং খুশিতে একটা স্মিত হাসি ফুটে রইল তার মুখে।

আব সে নিজের দিক থেকেও খবর দিতে পারবে। সকলকে বলা যাবে না, তবে সে রকম অতিপরিচিত কাউকে যদি পাওয়া যায়, তাকে সে পঙ্কজিনী এবং তাব নিঃশব্দ সমাজসেবাব কথা বলবে। সমাজসেবা বইকি। দারিদ্র্য এবং স্বাস্থ্যহীনতা জীবনকে শ্মশান কবে দেয। তার থেকে রেহাই পাওয়াব সহজ পথই দেখিয়ে দিচ্ছে সে। স্বাস্থ্যেব কথাই ধবো—ও বস্তুটি ছাড়া স্বামী কিম্বা ভগবান কারো সেবাতেই লাগা যায় না। প্রেমের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নয়?

কিন্তু তুলনা হয় না। সংঘশক্তির সাহায্যে অনিমাদি যা করতে পেবেছেন, ভাবাই যায়নি। দেশে এখনও পতিতাবৃত্তি নিরোধেব আইন পাস হয়নি, এরই মধ্যে স্খলিতাদের শুধু নৈতিক বলে ফিবিয়ে আনা। 'নীড়'— কী সুন্দর নামটি এই 'নীড়'।

নারী যদি প্রেমকে বিলিয়ে দেয়, পণ্য কবে, কী থাকে তাব? কী থাকে সমাজের? মানুষেব গর্ব করার কী থাকে?

চায়ের পিপাসা পেল যেন। তার হাতব্যাগটায় চায়ের ছোট ফ্ল্যাস্কটাই শুধু সাহেব নিজের হাতে পুরে দেয়নি, চা-টুকু পর্যন্ত নিজে করে দিয়েছে। গায়ত্রীর মুখে মধুর হাসি তাব তৃপ্তিব প্রকাশ হযে ফুটল। চা খেতে খেতে তার মনে হল, গোপন করে কিছু ক্ষতি হয়নি, তবে এ রকম লোকের কাছে তিলমাত্র গোপন করাও যেন মানায় না। মোহিতেব চিঠিটার কথা।

মোহিতকে স্বামী একসমযে ভালোবাসত। তার জন্যই কি হঠাৎ নিজেব অজ্ঞাতসারে সে গোপন করল চিঠিটাকে। গুপ্ত বিদ্বেষ? নিজের মনকে এভাবে বিশ্লেষণ করে সে অবাক হল, মনঃবিশ্লেষণের মতো কঠিন ব্যাপারে এমন হাতে হাতে ফল পেয়েই যেন।

এখন সে জানে স্বামীর কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। মোহিতের চেহারা মেয়েলি বলেই তাকে সাহেব ভালোবাসত এটা ঠিক নয়। ভালোবাসার কারণ মোহিতের চরিত্রবৈশিষ্ট্য। আর বোধ হয় গায়ত্রীর নিজের চরিত্রেও সেবাব্রতের দিকে তেমনি একটা ঝোঁক আছে বলেই মোহিতের জায়গায় সে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

স্টেশনে নেমে হাতব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে বেরুতে বেরুতে হাতঘড়ির সঙ্গে স্টেশনের বড় ঘড়িটার সময় মিলিয়ে সামনে চাইতেই চোখ পড়ল মোহিতের মুখের উপরে। মোহিত বলল, 'ব্যাগটা দাও'।

'থাক না। কী এমন ভারি'। বলে গায়ত্রী ব্যাগটা দিল।

'ভালো আছ তো'।

'তা আছি'।

মোহিতের গলার স্বরেও কোনো পরিবর্তন হয়নি, তেমনি নরম ও অনুচ্চ।

একটা গাড়িতে বসে হুইল ধরে মোহিত বলল, 'এই গাড়িটা কিনেছি'।

'কেন হঠাৎ গাড়ি কিনলে যে'?

'আমার কি গাড়ি কেনা বারণ'?

'তুমি তো সন্ন্যাসী ছিলে, গৃহী হয়েছ নাকি'?

'কোনোটিই নয়'।

গায়ত্রী একটু-বা চোরা দৃষ্টিতে লক্ষ্য করল মোহিতকে। তেমনি ঈষৎ লাল চুলের মধ্যে তেমনি চেবা সিঁথি, মুখে তেমনি লাজুক হাসি। তার মনে হল এই মেয়েলি ভাবটা না থাকলে কোনো বৈশিষ্ট্যই থাকত না। বিদ্যার তীক্ষ্ণতাও তার দৃষ্টিতে নেই।

কিছু দূর যাওয়ার পর মোহিত বলল, 'সাহেব ভালো আছে তো'? কথাটা বলতে গিয়ে মোহিত লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

গায়ত্রী বলল, 'বেশ ভালোই আছে'।

গাড়ি মোড় নিলে গায়ত্রী বলল, 'তুমি কি আজ ছুটি নিয়েছ, মোহিত'?

'তা নিয়েছি'।

'যদি না আসতাম তা হলে কি আবার কলেজে যেতে ছুটি নাকচ করে'?

'না, মাছ ধরতে যেতুম'।

হঠাৎ এবার গায়ত্রী লজ্জিত হল। কারণ এতক্ষণ সে মোহিতের মেয়েলি লজ্জার কারণটা চিন্তা করে করে নিজের মনের মধ্যে তাকে অবগুণ্ঠনহীন করে ফেলেছে এবং সেকালের সেই রেষারেষিব দু'একটা ঘটনাও তার মনে পড়ছে। সেও লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

অনিমাদির বাড়িতে পৌঁছুতেই ওরা খবর দিল তারা সবাই সমিতির অফিসে। সেখানেই গায়ত্রীকে নামিয়ে দিল মোহিত।

'এখনি কি মাছ ধরতে যাবে'?

'তাই যাব'।

গায়ত্রীর মনে হল সে বলবে— দেখা করার কথা লিখেছিলে, এই তো তা হয়ে গেল। সে মনোভাবটাই সে প্রকাশ করল, 'সাড়ে সাতটায় ট্রেন। যদি সাড়ে ছটায় এখানে আসো একসঙ্গে স্টেশনে যাওয়া যায়'।

'তাই হবে'। মোহিত চলে গেল।

সমিতির পুরনো সঙ্গী সবাই নেই। অনেকের স্বামীই বদলি হয়েছে। কিন্তু যারা ছিল তারা গায়ত্রীকে দেখতে পেয়ে হৈ-চৈ করে অভ্যর্থনা করল। তখন কার্যকরী সমিতির একটা সভা চলছিল। সভা বানচাল হয়ে যাবার মতো হল। শুধু অনিমাদি সেক্রেটারি বলেই প্রস্তাবগুলো আলোচনা হল, সভা শেষ হল। কিন্তু তা শেষ হতেই অনিমাদি নিজেই এগিয়ে এলেন গায়ত্রীকে নিয়ে হৈ-চৈ করতে।

আলাপের মাঝখানে একসময়ে অনিমাদি বিদায় নিলেন। তাঁর বাড়িতে অসুখ, একবার না গেলেই নয়।

'কার অসুখ'? গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করল।

'দুই মেয়েই এসেছে। বড়মেয়ের এক ছেলের পান-বসন্ত। ডাক্তার বলেছে ভয়ের নয়, কিন্তু বাড়িভরা কাচ্চাবাচ্চা, ওদিকে রোগটাও ছোঁয়াচে। তোর স্নান-টানের ব্যবস্থা হয়েছে এস. ডি. ওর বাড়িতে। আমি যাব আর আসব'।

'তা জানি'। গায়ত্রী হাসিমুখে বলল।

এস. ডি. ওর গৃহিণীর সঙ্গে অতঃপর আলাপ হল। তার বাড়িতে স্নানাহার শেষ করে গায়ত্রী আবার সমিতির বাড়িতেই ফিরে এল; সমিতির ঘরে তখন স্বেচ্ছাসেবিকাদের মতো কয়েকজন কলেজ-ছাত্রী ফুলের মালা ইত্যাদি তৈরি করেছে। গায়ত্রী তাদের সঙ্গে জীবনের আদর্শ ইত্যাদি নিয়ে আলাপ করল।

শহরের উপান্তে একটি পাটগুদাম কিনে 'নীড়' স্থাপিত হয়েছে। চারিদিকে ঢেউতোলা টিনের উঁচু প্রাচীরের মধ্যে বড় একটা ঘর। পার্টিশান করে কতগুলো খোপ তৈরি হয়েছে। একটা রুক্ষ ঘাসে ঢাকা আঙিনা পার হয়ে সমিতির অফিস ঘর উঠেছে। তারই কাছাকাছি উঠেছে হাতের কাজ শেখানোর জন্য যারা নিযুক্ত হয়েছে এবং হবে তাদের জন্য মেসবাড়ি। প্রাচীরের বাইরে বুড়ো দারোয়ানের ঘর।

দ্বারোদ্‌ঘাটন হলে অনিমাদি ঘুরে দেখালেন— কোথায় মেয়েরা রান্না করবে, কোথায় তারা কাজ শিখবে। তারপরে এলেন তাদের শোবার ঘরে। প্রত্যেক ঘরে পাশাপাশি দু'খানা কেরোসিন কাঠের চৌকি। প্রত্যেক চৌকির উপরেই একটা নতুন বিছানা। ঘরের কোণে কোণে রংচটা দু'একটা টিনের বাক্স। যাদের এসব তারা ঘরে ছিল না। অনিমাদি ডাকলে তারা ঘরে এল।

আগেই গায়ত্রীর গা শিরশির করছিল, এবার তাদের চেহারা দেখে ঘিন ঘিন করে উঠল। অস্বাস্থ্যের কদর্যতা চোখে পড়ল। তার চাইতে বেশি— তার মনে হল— আর কি হয়? মনের দাগ কি ঘষে তোলা যায় এদের?

কিন্তু অনিমাদির সংস্পর্শে এসে আদর্শের উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠল সে। রোগ দেখে গা ঘিনঘিন করলেও ক্লেদ সাফ করার মতো একটা সাহস ফিরে পেল সে।

মহিলাদের সমিতি হলেও পুরুষরা অনেকে এসেছিল। এস. ডি ও সবশেষে চমৎকার বলল এই মহৎ সূচনাকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং যথাশক্তি সরকারি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। জজসাহেব আসতে পারেননি। অনিমাদির নির্দেশে গায়ত্রীকেই বক্তৃতা দিতে হল সমিতির পক্ষ থেকে। বক্তৃতার এক জায়গায় তার চোখে জল এসেছিল। সে চোখ মুছে দেখেছিল চশমার নিচে অনিমাদির চোখেও জল এসেছে।

সমিতির প্রত্যক্ষ সভ্য নয় এমন দু'একজন পরিচিত মহিলা এসেছিল সভায়। তাদের সঙ্গে আলাপ করল গায়ত্রী। দু'একজনকে সে নিমন্ত্রণ জানাল, দু'একজন তাকে নিমন্ত্রণ করল।

গল্প শেষ করে মহিলা সমিতির ঘরেও যেতে হল। সেখানে গায়ত্রীর জন্যই ছোটখাটো একটা চায়ের আসর ছিল। সে অনিমাদিকে এবং অন্যান্য মহিলাদের বারংবার ধন্যবাদ দিল এই মহৎ কাজের জন্য। ধূলিলুণ্ঠিত নারীত্বকে যারা বাঁচায় তারা নিশ্চয়ই সম্মানের ও সংবর্ধনার যোগ্য।

'আজ থেকে গেলে হতো গায়ত্রী'।

'বাড়িতে বলে আসিনি'।

'না না গায়ত্রীদি, আজ আমার বাড়িতে থাকো'।

'তা হবে না, ভাই'।

নানাদিক থেকে প্রস্তাবগুলো আসছিল।

ঘড়িতে সাড়ে ছটা বাজে। মহিলা সমিতির দরজার কাছে গায়ত্রী দেখতে পেল মোহিত তার জন্য অপেক্ষা করছে।

'বিদায় নেয়া হল'?

'হয়েছে'।

'চলো একটু চা খেয়ে নেয়া যাক'।

মোহিত একটা বড রেঁস্তোরাব সামনে গাড়ি থামাল।

'সে কি এখানে? আমি ভেবেছিলাম তোমার বাসায় যাবে'।

'বাসায় গিযে কী হবে? সেখানে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। তোমাকে চিঠি লিখে মনে হল পরে, চাকরটাকে পর্যন্ত ছুটি দিযেছি সাতদিনের জন্য'।

চা খেয়ে তারা যখন স্টেশনে পৌঁছাল তখনও ট্রেনের আধঘণ্টা দেরি। প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে করতে গল্প করল তারা।

একটু হেসে গায়ত্রী বলল, 'জানো, মোহিত, একসময়ে মনে হত তুমি আমার প্রেমের পথে কাঁটা'।

'সে ভাবটা সত্যি কি অনেক দিন ছিল তোমার'? মোহিতেব কৌতূহলটা স্নিগ্ধ।

'এ শহর থেকে চলে গিযেই তবে সে আশঙ্কা একেবারে গেছে'।

নীরবে কিছুক্ষণ পাশাপাশি হাঁটল তাবা।

'আচ্ছা, মোহিত, একটা ভারি কৌতূহল হয আমার, তুমি—

'কী আমি'?

গায়ত্রীর প্রশ্ন ছিল— বিযে কবলে না কেন। প্রশ্নটা উচ্চাবিত হওযার ঠিক আগেব পলকে তার মনে হল, কোথায় যেন সে পড়েছে, মেযেবা অর্থাৎ যাদেব এমন প্রশ্ন করাব সুযোগ হয়, তারা সকলেই এ জোলো প্রশ্নটা কবে।

গাড়ি আসাব সময পাব হল দু জনেব হাতঘড়ি এবং স্টেশনের বড় ঘড়িটাতেও। আব কিছুক্ষণ পায়চাবি কবে কাটাল তাবা, তারপবে মোহিত স্টেশন মাস্টারের কাছে খবর নিল। ডাউনে কী একটা গোলমাল হযেছে গাড়ি আসতে ঘণ্টাখানেক দেবি হবে।

পায়ে পায়ে তারা প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে চলে এল যেখানে সিগন্যাল পোস্টেব মাথায মিটমিটে একটা আলো জ্বলছে, আব তার ওপারে একটা গ্রাম্য সন্ধ্যার অন্ধকাব।

'সে সময়ে আমি কখনও তোমাকে অবহেলা দেখিয়ে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা কবেছি। তা কি তুমি বুঝতে পারতে মোহিত'? গায়ত্রী হাসল কি?

'পারতুম'।

'বিচলিত হতে না তো'?

'কী লাভ হতো তা হযে'?

স্টেশন মাস্টারেব বলা এক ঘণ্টা সময পাব হযে সাড়ে আটটা হল রাত্রি। মোহিত আবার খবর নিয়ে এল।

সে বলল, 'আরো আধঘণ্টা, তোমার আজ কষ্ট হল'।

'কিছু নয়। কিন্তু তুমি ফিবে কোথায খাবে'?

'রান্না করব'।

'বলো কি'?

'চাকরটা ছুটি-ছাটা নিলে তা করতে হয়'।

'মোহিত, তুমি তা হলে আর দেরি কোরো না'।

'না-হয় একটু দেরি হবে'।

'তা কি হয়! মাছ ধরেছিলে, সেগুলো এতক্ষণ পচে গেল'।

অবশেষে বিদায় নিল মোহিত।

'মোহিত'।

'কিছু বলবে'।

'মোহিত, তোমার চিঠিটার কথা কিন্তু সাহেবকে বলিনি'। গায়ত্রীর মুখে একটা নিঃশব্দ হাসি ঝিকমিক করল।

'তা করতে গেলে কেন'?

'তা আমিও বুঝতে পারছি না। তুমি কিন্তু গল্পে গল্পে কোনোদিন বোলো না সাহেবকে।'

মোহিত চলে গেলে একটা পত্রিকা খুলে বসল গায়ত্রী, কিন্তু পত্রিকায় তার মন বসল না। আজকের দিনটার এক-একটা ছবি ভেসে উঠতে লাগল তার মনে। ভারি ভালো একটা কিছু করল এরা।

তারপর তার মনে হল বাড়ির কথা, ছেলে, এবং সাহেবের সন্ধ্যাব আলো-জ্বালা কক্ষ। এরপরে সে ফিরে এল মোহিতেব কথায়। মোহিতের সঙ্গে এমন একা একা মিশবার সুযোগ এর আগে ঘটেনি, এত কথাও বলেনি। একটু দ্বিধা করতে হল তাকে। কথাটাকে ওজন করতে হল। কথা যদি না বলে থাকে তবে হঠাৎ তাকে নাম ধরে ডাকল কী করে? সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেই তা হলে একটা পরিচয় হয়েছিল যা সে নিজেই এতদিন জানতে পারেনি।

নটা বাজলে সে খোঁজ নিল স্টেশন মাস্টার খেতে গেছে। সহকারী বলল 'আপে কী একটা গোলমাল হয়েছে'।

'শুনেছিলাম ডাউনে কী হয়েছে'।

হাতঘড়িতে এগারোটা বাজল। ব্যতিব্যস্ত হয়ে গায়ত্রী এবার সামনে যাকে পেল তাকেই জিজ্ঞাসা কবল। সে একজন পোর্টার। সে বলল, 'স্ট্রাইক হযেছে জংশনে, গাড়ি যাওয়া-আসা বন্ধ। কখন আসবে কেউ জানে না'।

গায়ত্রী বিশ্রামঘরে ফিরে কপাল টিপে ধরে বসল। তারপর উঠে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পরেই সে বেরিয়ে এল। প্ল্যাটফর্মের ভিড় অনেক ফাঁকা হয়ে গেছে। গাড়ি আসবে না, এই কথা বলাবলি করে অন্যান্য যাত্রীরাও চলে যাচ্ছে। তা হলে? সারারাত প্ল্যাটফর্মে কাটানো যায় না বিশ্রামঘরে বসে। একবার সে ঘরটার খিলটিলগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিল। না। এরপরে শহরে যাবার গাড়িটাড়িও পাওয়া যাবে না।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বলল সে, 'চলো'!

কিন্তু কোথায় যাবে সে এই বাত্রিতে। অনিমাদির বাড়িতে যাওয়া যায়। কিন্তু বাড়িতে হয়তো তাঁর স্থানাভাব। তা ছাড়া পক্স হয়েছে। পান-বসন্ত বড্ড ছোঁয়াচে।

অনেকে নিমন্ত্রণ করেছিল কিন্তু এত রাত্রিতে গিয়ে কি তাদের বলা যায় আমি ফিরে এলাম। কী বিশ্রী! কিন্তু কোথায় যাবে সে? এখনি ড্রাইভার গন্তব্য জিজ্ঞাসা করবে। গায়ত্রী একটা সিদ্ধান্তের জন্য মনকে মথিত করতে লাগল। সে কি 'নীড়ে' আশ্রয় নেবে, সেই আশ্রয়হীনাদের সঙ্গে। সে বাড়িতে দারোয়ান তাদের মহিলা সমিতির পিওন ছিল। কিন্তু সেই স্বৈরিণীদের কথা মনে পড়তেই গা ঘিনঘিন করে উঠল তার। তারপরই সে অনুভব করল, মাথা গরম না হলে এমন উদ্ভট কল্পনা কেউ করে?

'কোন পথে যাব, মাইজি'?

এখনি বলতে হবে। কার বাড়িতে যাবে যে—এস. ডি. ওর বাড়িতে? কোথায়? ড্রাইভার গাড়ির গতি কমিয়েছে। এখনি হয়তো সে পিছন ফিরে তাকাবে। ছোট শহর, পথ ইতিমধ্যে নির্জন। গাড়ি একটা পানের দোকানের দিকে এগোচ্ছে। তার সামনে কয়েকটি লোক যেন অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। রাত এগারোটায় একা একা চলেছে সে। তাকে কি ভ্রষ্টা মনে করবে ড্রাইভার? আর—। শিউরে উঠল সে।

'মাইজি—

'তোমাকে যে বললাম কলেজের দিকে যেতে'।

কসুর মাপ করার কথা বলে ড্রাইভার গাড়ি ঘোরাল।

'হ্যাঁ, এই বাড়ি'।

'মোহিত, মোহিত'।

'কে'?

'মোহিত, দরজা খোলো'।

'কে গায়ত্রী? গাড়ি আসেনি'?

মোহিত দবজা খুলল। সেই নীল আলো-জ্বালা ঘরে ঢুকে নিজের হাতে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল গায়ত্রী।

'কী হল।'

'কিছু না'। গায়ত্রী অত্যন্ত বিবর্ণভাবে হাসল।

'কী করব এখন, মোহিত'?

'বিশ্রামের ব্যবস্থা'।

এটা মোহিতের শোবার ঘর। ঘবের একদিকে একটা বই-এব শেল্‌ফ, অন্যদিকে তাব বিছানা, ঘরেব অন্য দেয়ালে একটা গোল দেয়ালঘড়ি। তাব নিচে একটা ছোট লিখবার টেবিল। তার উপরে খান দুচার বই-এর পাশে টেলিফোন। একখানামাত্র চেয়ার। বিপরীত দিকে একটি বড় সোফা।

সেই সোফায় বসেছিল গায়ত্রী। মোহিত উঠে এসে গায়ত্রীর হাত ধবে তাকে টেনে তুলল, 'ওঠো। স্নানের ঘরে চৌবাচ্চায় জল আছে। আমি এদিকে তোমার খাবার ব্যবস্থা কবি'।

হাতমুখ ধুয়ে পোশাক পালটে ফিরে আসতে তার দেবি হল কারণ সে চিন্তাও করছিল।

সে ফিরে এসে দেখল মোহিত স্টোভ ধরিয়ে রান্নার যোগাড় করছে।

'তুমি সবো, মোহিত, আমি একটু চা কবে নি'।

'শুধু চা'?

'তা কেন। কাল সকালের জন্য রুটি মাখন কি কিছু কেনা নেই'?

এক টুকরো রুটি আর এক কাপ চা নিয়ে গায়ত্রী শোবাব ঘরে এসে দেখল মোহিত সোফার উপরে একটা বিছানা পাতছে।

চা খাওয়া হয়ে গেল।

গায়ত্রী বলল, 'শেষ পর্যন্ত এই হবে জানলে, আজ তোমাকে বান্না করে খাওয়াতে পারতাম'। সে হাসতে চেষ্টা করল।

'তা যদি জানতাম তা হলে কি মাছগুলো বিলিয়ে দিই'?

'ঘুমুবে না'?

'ঘুম কি হবে'?

'এত চড়া আলোতে ঘুম হয় না। রোসো'।

মোহিত বই পড়ার আলোটা নিভিয়ে আবার ঘুমের নীল আলোটা জ্বালল। নিজের বিছানা সে গায়ত্রীর জন্য ছেড়ে দিয়েছিল। সোফায় কোনোরকমে শুয়ে সে বলল, 'এ যেন একটা ষড়যন্ত্র। তোমায় চিঠি দিয়ে ডাকলুম, তা তুমি গোপন করলে। ট্রেন ফেল করে চলে এলে আরো গল্প করার জন্যে'। মোহিত হাসল। গায়ত্রী হাসবার চেষ্টা করল।

'আচ্ছা, মোহিত'—

'কিছু বললে'?

'না। ঘুমাও'।

দেয়াল ঘড়িতে খুব চাপা সুরে একটা বাজল।

'ঘুমুতে পারছ না'? মোহিতের গলা।

'গরম লাগছে না'?

'জানালা খুলে দেবো'?

'আমি দিচ্ছি'।

গায়ত্রী জানালা খুলে দিয়ে জানালার পাশে দাঁড়াল। বাইরে অন্ধকারের পর্দা।

'দাঁড়িয়ে রইলে যে'?

'বাতাসটা—

'জানো', মোহিত উঠে গিয়ে দাঁড়াল তার পাশে, 'অবাক লাগছে। তোমাকে যেন আজই প্রথম দেখলুম। প্রথম দেখাটা ভারি আশ্চর্য জিনিস'।

দেড়টা বাজল। সে শব্দে ঘড়ির দিকে আকৃষ্ট হয়ে গায়ত্রী কিছুক্ষণ ধরে টিকটিক শব্দটাও শুনতে পেল . তার বুকেও একটা শব্দ হচ্ছে যেন।

আকস্মিকভাবে টেবিলে ফোনটা বেজে উঠল।

'এত রাত্রে'? মোহিত বিস্মিত হয়ে ফোন ধরল।

'হ্যাঁ, আমি। বলছি। সাবাস। খুব যোগাযোগ করেছ তো। হ্যাঁ, তা তিনি তো রওনা হয়েছিলেন সাড়ে সাতটায়। ও। তা হলে এই শহরেরই কোথাও আছেন। আচ্ছা কাল সকালে স্টেশনে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখা পেলে জানাব তোমাকে ফোন করে। না ভয় কী? এখানে তাঁর পরিচিত লোকের তো অভাব নেই। হ্যাঁ, তা বইকি, তারা সবাই সমৃদ্ধিশালী'।

মোহিত ফোন ছেড়ে যখন ফিরল তখনও তার মুখে হাসিটা ধীরে ধীরে বিবর্ণ হচ্ছে।

'কে মোহিত'?

'সাহেব'।

'সে কী? আমাকে খোঁজ করছিল? গোপন করলে কেন? আ মোহিত, এ তুমি কী করলে'?

দুটো বাজল।

'ঘুমিয়েছ মোহিত'?

'না। ফ্যানটা কি খুলে দেব'?

'না। আলোটা বরং নিভিয়ে দাও'।

'আচ্ছা, মোহিত, কী পড়াও তুমি কলেজে'"

'অর্থনীতি।'

কথা এগুলো না।

'শোনো মোহিত, তুমি এখানে এসো'।

'কেন'?

গায়ত্রী নিজেই বিছানা ছেড়ে সোফায় মোহিতের কাছে গিয়ে বসল। চাপা গলায় বলল, 'আমরা কি জোরে জোরে কথা বলছি না'।

'না তো'।

'আমার যেন মনে হচ্ছিল, পাড়ার লোকরা শুনতে পাচ্ছে'। ফিসফিস করে বলল গায়ত্রী।

চারটে বাজল।

'বৃথা চেষ্টা'। মোহিত উঠে দাঁড়াল। 'চা করি একটু স্টোভ ধরিয়ে'।

আলো জ্বালল মোহিত। গায়ত্রীকে যেন চেনা যাবে না এমন রক্তহীন দেখাচ্ছে তাকে।

'তুমিই না হয় একটু চা করো। তারপর ভোর হতে হতে গাড়ি করে রওনা হব। ছটা নাগাদ পৌঁছে যাব সাহেবের বাংলোয়'।

চা খেয়ে দরজায় কুলুপ এঁটে গারাজ খুলে গাড়ি বার করল মোহিত।

চারিদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। পৃথিবীর চোখ বন্ধ।

'মোহিত'।

মোহিতের কাঁধ থেকে কুনুই পর্যন্ত বাহুতে গায়ত্রী বারবার নিজের দু হাত ঘষতে লাগল।

গাড়ি যখন শহরের সীমা ছাড়িয়েছে, মোহিত বলল, 'এই ভালো হল, শহরের কারো চোখেই তুমি পড়বে না।'

'কী অন্ধকার'! বলল গায়ত্রী।

'হ্যাঁ, যেন মাঝরাত'।

'মাঝরাত বলছ'?

'অন্তত গাড়ি চালানোর দিক থেকে'।

'আচ্ছা, মোহিত—

'কিছু বলছ'?

'এ বুদ্ধিটা, এই মোটরে যাওয়ার বুদ্ধিটা রাত এগারোটাতে করলেও চলত'?

'তা হতো। একথা বলছ যে'?

'কেন তবে, আচ্ছা মোহিত—

'জানো, গায়ত্রী, আমরা যেন এক নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছি রাত চারটে পর্যন্ত'।

কথাটাকে রসিকতার জাতে তুলবার চেষ্টা করে বিফল হল মোহিত।

'মোহিত, গাড়ির ভিতরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে গাড়ি চালাতে পারো'?

আলোটা নিভিযে দিল মোহিত। রাস্তাব ধুলো হেডলাইটের আলোয় পোকার মতো কিলবিল করছে।

'আচ্ছা, মোহিত, তুমি সাহেবকে গোপন কবলে কেন'?

চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে গাড়িটা থরথর করে কাঁপছে। গায়ত্রীর মনে হল একটা অন্ধকার নিঃসঙ্গ কুপেতে সে শুয়ে আছে। মেল ট্রেন ছুটে চলেছে। বাইরে কখনও আলোকিত স্টেশন ছিটকে যাচ্ছে। সে আধ ঘুমন্ত অবস্থায়. তার মনে হতে লাগল : কৃত্রিম। এই শব্দটাই বারবার মনে হতে লাগল একটা অব্যক্ত অনির্দিষ্ট আবেগের মতো। সম্মুখের গতিটাই যেন কৃত্রিমতার পরিহাস। শুধু অন্ধকারটা তাকে যেন শান্তি দিচ্ছে বলে সে জানালা খুলে চিৎকার করে কিছু বলছে না। শুক্তির দুটি ডালায় আটকানো অন্ধকার যেন।

তারপর তার স্বপ্নের পরিবর্তন হল। সে যেন দেখতে পেল কৃত্রিম রেল লাইনের পাশে ঘাসফুল ছুটে চলেছে। যেন রাজপথের ফাটলে ফুটে উঠতেও পাবে তারা!

'মোহিত'—

'কী'?

'না কিছু নয়, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যেন'।

'গায়ত্রী, কালকের রাত্রিটার কথা যদি সাহেবকে বলি সে কি রসিকতা হিসাবে নেবে না'?

'না ও নিতে পারে। আমরা দুজনে যে নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছি সেকথা অন্যকে বলে লাভ কী'?

শুক্তির ডালা কথাটা তার মনে আবার লাগল। যে গোপনতায় বাইরের বালি কাঁকর ঢুকে একটি মুক্তো তৈরি করার সূচনা করে সেখানে পৃথিবীর দৃষ্টি যায় না। মনের গভীরে যেন অবগাহনের শীতল অন্ধকার আছে মোহিতের ঘরের জানালা খুলে যে রকমটা চোখে পড়েছিল। গায়ত্রী গুনগুন করে গান গেয়ে চলল।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সাহেব আর্দালিকে পাঠাচ্ছিল স্টেশনে খবর করতে। এমন সময়ে গাড়ি থামল দরজায়। নামল গায়ত্রী, নামল মোহিত! তারপর সাহেব দুজনকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে

লাগল।

নিজেব ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণের জন্য মাথাটা ঝিমঝিম করল গায়ত্রীর। সে যেন নীল কিছু দেখতে পাচ্ছে। যেন মোহিতের ঘরের সেই নীল আলোয় এ ঘবের সবকিছু ছোপানো। রাত জাগলে মাথা ঘোবে, তার জন্যেই হয়তো এমন হল। এবং তার জন্যই নিজের পরিচিত ঘর নতুন নতুন লাগছে! অবাক অবাক বোধ হল।

মোহিতকে কি চিঠিটা গোপন রাখাব কথা বলা দরকার?

সে একটু স্পষ্ট গলাতেই গান করতে করতে ছেলের ঘরে গেল।

অনেক বেবুন

গল্পটা যখন বন্ধুদের কাছে মুখে মুখে বলি, যেমন কলকাতায় নেমে উৎপলকে, তখন তাদের মুখে-চোখে ফুটে উঠেছিল—আত্মপ্রশংসা ভাল নয় অত। ঠিক এ কারণেই গল্পের নায়ক 'আমি' রইল না, কণক হল।

—দার্জিলিং শহরটা বাংলাদেশে, এটা পূর্বকালে বানররাজা কিম্বা মহারাজ ভগদত্ত পূজিত কোনো পীঠস্থান ছিল। এর আসল নাম দুর্জয়লিঙ্গ। আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে লিখে পাঠিয়েছি। কণক এই বলল শকুন্তলাকে। এপাশের ওপাশের লোকেবা শুনতে পেল হয়তো। শকুন্তলা বলল—কিন্তু তুমি কি ততদিন এখানে থাকতে চাও যতদিন বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর না দিচ্ছে?

মুশকিলে পড়েছে কণক, নিজের গতিস্থিতি বলতে না পেরে নয়, শকুন্তলাকে বোঝাতে না পেরে। তাকে সে বুঝতে পারছে না। মাঝে মাঝেই সে কণকের কথা ফুঁড়ে দিয়ে একটা কিছু বলে বসছে, বসে বসে স্থির দৃষ্টিতে কণকের মুখের দিকে চেয়েও বলছে।

কণক বলল,—রইলুম এবার, ক্ষতি কী বল? শকুন্তলা হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে হেসে বলল, —তোমার টনসিলটা, ডাক্তার পাঁজা বলছিলেন—

ইতিমধ্যে শকুন্তলা স্ত্রীদের মত কণকের অসুখ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। কণকের টনসিলের কোনো অনুভব ছিল না। কিন্তু ঘরের ওরা সবাই যেন টনসিলটা তখন তখনই দেখবে। আসল ব্যাপারটা সে যেন বুঝতেই পাবছে না। শকুন্তলার চিন্তা কণকের চিন্তার পাশাপাশি চলছে না হাত ধরে।

অথচ আজ সকালে যখন কণকের হাতের আংটিটার দিকে মুখুয্যে জজের মেয়েটি লুব্ধচোখে চেয়ে কিচমিচ করল, —মাই! এমন টিবেটান টারকুইস! শকুন্তলা বলল,—এমন টারকুইস বড় একটা পাওয়া যায় না। ভাগ্যই বলতে হবে এটা পাওয়ার পেছনে। অর্থ নয়।

মুখুয্যেদের মেয়েটি কণকের দু'হাতের আঙুল কটি আগেই দখল করেছিল, নতুবা দার্জিলিং-এর চিড়িয়াখানা থেকে অনেক বেবুন হঠাৎ কি করে ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে পড়েছে এই মুখরোচক রোমহর্ষক আলোচনার মধ্যেও ঘরশুদ্ধ লোক সবাই একবার দেখতে চাইত টারকুইস কাকে বলে।

কিছুক্ষণ পবে কণক বুঝতে পেরেছিল, ভাগ্যই বলতে হবে। মঙ্গারামের দোকানে বসে পেতলের আংটিটা হঠাৎ পছন্দ হবার মূলেও ভাগ্য, ভাগ্য ছিল নিশ্চয় এটার শকুন্তলা কথিত মূল্য সম্বন্ধে সিদ্ধিটার অজ্ঞতার হেতুতে, তেমনি ভাগ্যের ব্যাপার ছিল উৎপল অসাধারণ কাচ বলে প্রশংসা করলেও কণককে লজ্জায় ফেলে না দেয়ার মধ্যে।

শকুন্তলা বলল,—তোমরা পুরুষরা চিরকালই খুঁতখুঁতে, শান্তি পাও না। দুমাসের জন্য এসে এত কেন? শহরের কী নাম কী এসে যায় তাতে?

—দু মাসের জন্য এসে?

—হ্যাঁ।

—কী এসে যায় তাতে?

—তা বৈ কি।

কণকের সন্দেহ হল। শকুন্তলা বোধহয় ভুলে গেছে এ শহরে কণকের বাড়ি আছে, ব্ল্যাক মার্কেটে ফেঁপে ওঠা বাড়ি নয়, পৈতৃক বাড়ি। ও হয়তো এখনও উৎপল সেনের কথাই ভাবছে, হয়তো কণককে

উৎপল সেন বলে ভুল করছে। কিন্তু হঠাৎ বলে ওঠা যায় না, আমি উৎপল নই।

একটু ম্লান হেসে শকুন্তলা বলল, —কিন্তু সামনে ডিসেম্বরের শীত, জানুয়ারির অন্ধকার। তখনও তুমি থাকবে? এমন তো নয় দার্জিলিং-এ থেকে চাকরি করতে হবে তোমায়!

কণক বলল,—তোমার কি ভাল লাগছে না এখানে? তা হলে কী দরকার বল, বাড়িওলাকে তো সিজনের জন্য আগাম দিই নি তিন মাসের ভাড়া, যে অন্তত দুমাস না থেকে গেলে গা পুড়বে। তার চাইতে চল কলকাতায়, নতুন মহলের ঝোলানো বারান্দাটা কী রকম হবে দেখিয়ে দেবে বলেছিলে।

শকুন্তলার মত কে আছে? কাকে এমন মানায় চাঁপা রংয়ের বেনারসির উপরে ফিরোজা রংয়ের কোটে? মলের যে কোনো কোণে দাঁড়াও শকুন্তলাকে নিয়ে, যে কোনো দিকে চেয়ে থাকুক সে, কনকের যে কোনো স্যুটের সঙ্গে এমনটা আর কেউ কোনো দিন ম্যাচ করে নি। এমন কি কোনো টাইও নয়।

তা হলেও সন্ধ্যাবেলা কণক তাকে বলল, —আমাকে তুমি গুলিয়ে ফেল মাঝে মাঝে।

—আমি? তুমি বরং কখন কার পোশাক পরে দাঁড়াও বোঝা কঠিন। শহর সম্বন্ধে আগ্রহ দেখে মনে হয় যেন এ শহরের কোনো আমলা, কিম্বা দোকানদার তুমি, ডিসেম্বরের শীতেও পেটেব দায়ে পড়ে থাকতে হবে।

—তাই মনে হচ্ছিল নাকি?

কণক বুঝতে পারল শকুন্তলা খুব সামলেছে আজ। দার্জিলিংযেব প্রতি স্নেহ বিচার কবতে গিয়ে কণক নিজেকে যেরূপ প্রতিপন্ন করছিল, শকুন্তলা ঘব সামলানোর সহজাত প্রবৃত্তিতে তা থেকে বাঁচিয়েছে। কণক ইঙ্গিতটা তাহলে ঠিকই ধরেছিল।

একদিন শকুন্তলা বলল—আশ্চর্য এই, যাকে সবল ভাবি, সেও দুর্বল।

কণকের একটা গুণ আছে, কেউ চোখ মেলে দেখবার চেষ্টা কবলে তাকে সাহায্য করার। শকুন্তলা যখন বুঝতে পেরেছে আপাত সবলের মধ্যেও অনেকটা দুর্বলতা থাকতে পাবে তখন তার মনের এই অবস্থাটিকে চারিয়ে দিতে পাবলে যে কোনো উদাহরণে সে পৌঁছে যেতে পারবে।

কণক বলল,—ধর না যার কথা হচ্ছে, ধব উৎপল সেন। শকুন্তলা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, —ধর তার কথাই।

(কণক যেন শকুন্তলার প্রতিবেশী, যেন তার ছেলের নিন্দা কবছে কণক আর ক্লান্ত দুঃখিত মায়ের মত সে বলছে, ধরে নিয়েছি ছেলে আমার খারাপ!)

কণক একটু বুদ্ধি করে বলল, —আমাদের সে উৎপল সেন নয়। পৃথিবীতে কত উৎপল সেনই তো আছে। শকুন্তলা বলল, —সেই উৎপল সেন হলেই বা ক্ষতি কি? শকুন্তলার কথা বলার ধবনটা যেন কণকের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ উৎপল এসে পড়েছে, তাকে কি আর এড়ানো যায়, সৌজন্য লঙ্ঘন না করে?

কণক বলল, সে উৎপল সেনকে কিন্তু খুব দুর্বল বলে বোধ হয় না। আর তা ছাড়া বোধ হয় আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি তার সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। তাকে ছেড়ে যদি এগিয়ে যাই এখন ক্ষতি হবে না বোধ করি।

শকুন্তলা উঠে এসে কণকের পাশে বসল যেন অত বড় ঘরখানায় অন্য সব আসন অন্য অনেকে দখল করে রয়েছে, এমন কি কণকের আসনটিতে মাত্র আর একজনেরই কোন রকমে বসবার জায়গা আছে। স্বর নীচু করে সে বলল,—উৎপল সেনের ছোটবোনটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল কাল। থাকে তো ভাড়াটে বাসায়, বললে যেন লভস্‌ডেলটা কিনেছে।

—তুমি কি কালই একবার নেহাত খোঁজ নিতে বল আমাকে, সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলল কণক।

—তোমার আবার কাল চা বাগানের মিটিং, এমনি কত কাজ।

পরের দিন সকালে কণক উৎপলের খোঁজে গেল লভস্‌ডেলে। উৎপল দেখা করল। উৎপল

সকালের প্রথম চুরুট ধরিয়ে নেমে এল, হাই তুলতে তুলতে। বলল,—লভস্‌ডেলটা আমিই কিনেছি।

যেন এই সাতসকালে সে লভস্‌ডেলটা কিনেছে এ খবরটা না জানলে কণক প্রভৃতির মহাবিপদ হতে পারে। যেন এই দুর্জয় ঠাণ্ডায় এ খববটা জানতেই এসেছে। এই অপমানকর ইঙ্গিত ছিল তার কথায়। কণক বলল,—তোমার বেগোনিয়াগুলো বেশ স্ট্রং হয়ে উঠেছে তো, বাহ্ ওগুলো কি নাস্ট্রাসিয়াম?

—লাগাতে হয়নি, বাড়ি কেনার সাথে সাথে পেয়েছি, ও সবের জন্য আরও সাতশ লাগল। সব শুদ্ধ বেয়াল্লিশ হাজার পড়েছে।

হাসি পেল কণকের। ব্ল্যাকমার্কেটে ফেঁপে ওঠা টাকা। এর পরে হয়তো বলবে উৎপল, বেয়াল্লিশ হাজার সাতশ পাঁচ। শেষের দুহাজার অনুল্লিখিত রাখার মত নজর নয় তার। চল্লিশ বলে মোটামুটি বলায় যে বিনয় আছে তা নেই।

কিন্তু মানুষের চরিত্রে, এমন কি গ্রোয়াগোর চরিত্রেও সৎদিক একটা থাকে। খবরটা পেয়ে কণকের মনে হল উৎপলের কোন কাজই এতটা অনুমোদন করার মত হয় নি কোনোদিন, যেমন এটা হল। এ যেন হঠাৎ প্রকাশিত গুণ। কণক আনন্দই বোধ করল। উৎপল সম্বন্ধে ভাবনামুক্ত হল সে।

উৎপল বলল,—বিয়েও করেছি।

এইটি সেই খবব। কণকেব মনে হল এখন একটি অ্যাট হোমের ব্যবস্থাতে উৎপলকে ডাকা যায় সস্ত্রীক। খবরটা শকুন্তলাকেও দেয়া দরকার। লভস্‌ডেলের খবর নয়, মেয়েরা বোধহয় বিয়ের খবর শুনতেই ভালোবাসে। শকুন্তলাও নিশ্চিন্ত হবে বৈকি একদিক থেকে।

বাসায় ফিরে দেখা গেল শকুন্তলা ফিরেছে। খবরটা মুখের আগাতেই ছিল, বলল কণক,—উৎপল, বুঝলে শকুন্তলা, উৎপল, আচ্ছা উৎপল সম্বন্ধে কী ধারণা তোমার বল তো?

ধারণা? কোনো লোক সম্বন্ধেই ধারণার কি প্রয়োজন আমার? (যেন ধারণা বস্তুটি একটি লজ্জাকর প্রবৃত্তি মানুষের।) হাতেব রুমালটিকে পাকিয়ে পাকিয়ে সে বলল—কিন্তু বলার আগেই কণক বুঝল সংবাদটি তার আগেই চড়াইটুকু ভেঙেছে।

কণক বলল,—লভসডেলটা কিনেছে বলল বটে, কিন্তু এতটুকু রুচি নেই, দামটাও শুনিয়েদিল। আসলে ঠকেছে। লভসডেলেব সম্মুখে একটা বাড়ি উঠতে কতক্ষণ? যদি তুমি বল লভস্‌ডেলের সে দিকটায় আমরাই না হয় বাড়ি তুলি একটা।

শকুন্তলা মর্মাহত হয়েছে উৎপল লভস্‌ডেল কেনায়?

অনেকদিন থেকে যে রকমটা বলাব সাধ ছিল কণকের তেমনি বলল—তাই, বুঝলে, শকুন্তলা, উৎপল আবার একটা বিয়েও করেছে।

—শুনেছি।

হো হো করে হেসে বলল কণক—তাও আবার ওই লভসডেলের জন্য—

—লভস্‌ডেলের জন্য?

—হ্যাঁ লভের জন্য নয়। মানে এসব পুরুষকে মেয়েরা বিয়েই বা করে কেন?

কথাটিকে আবও বদ্ধমূল করে দেয়ার জন্য কণক বলল আবার—বাড়ির জন্য বিয়ে শেষ পর্যন্ত, তুমি একবার খোঁজ করবে নাকি, শুধু বাড়িটা হাতানোর জন্যই—

কথা পড়তে পেল না, শকুন্তলা হাউই এর মত বলল,—খোঁজ!

সহজেই কণক ধরে নিতে পারল শকুন্তলার ঘৃণার ব্যাপারটা, ঠোঁটের কোণ দুটি কাঁপছে শকুন্তলার। কণক বলল—ভাগ্যি সব মেয়েরই লভসডেল থাকে না, নতুবা উৎপলদের হাত এড়ানো কঠিন ছিল। ধর, তোমারই যদি হত লভস্‌ডেলটা?

—যদি আমারই হত? শকুন্তলা ভ্রুকুটি করে উঠে দাঁড়াল, বোধ হয় সে সমগ্র পুরুষ জাতটির উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

কণক আবার বলল,—ধর যদি তোমারই হত?

শকুন্তলা জানলা থেকে মুখ ফিবিয়ে বলল—পুরুষরা নির্দয নির্মম। যে মেযেটি এত প্রেম দিল—কণক কথা যুগিয়ে দিল—তার চাইতে বড় হল কিনা ইটকাঠে গড়া বাড়ি। লভের চাইতে লভসডেল?

শকুন্তলা থেমেছিল, সে আবার বলল—তার চাইতেও বড হল কিনা বাডি! মাটিব তৈরি পৃথিবী, পিচে ঢাকা টাকার মহলে যাবার পথ!

—ছি ছি। ঠিক তাই, বলল কণক।

শকুন্তলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আধফেরা অবস্থায় উদাস সুরে বলল,—তাই চিরদিন ওদের পায়ের কাছে আমরা ফুলের মালা নিয়ে বসি। লাখো টাকার উঠতি সিঁড়িতে উধাও, ছুটতে ছুটতে একবারও যদি আমাদের ছেলেমানুষির দিকে হেসে ফিবে চাইত!

কণক অনুভব করল মেয়েদের কথা সব সময় বোঝা যায় না। মানুষকে খুশি কবতে যাওয়াও ফ্যাসাদ। কণক ভেবেছিল, উৎপল সেন বাড়ি কিনেছে এ খবর পেয়ে শকুন্তলা ক্ষুব্ধ হয়েছে ; প্রবোধ হিসাবে বোঝাতে গিয়ে ছিল, তার বাড়ি কেনাব মূলে রযেছে কেলেঙ্কারি। মিছে কথা বলাটাই খাবাপ। একটু কায়দা করে কণক বলল—এই হচ্ছে আমার গল্প। এখন আসল ব্যাপাবটা শোনো, শকুন্তলা, উৎপল সেন বাড়ি কিনেছে বউয়ের পাল্লায় পডে। বাড়ি কিনবার ইচ্ছাই ওব ছিল না, বিলেতে যাবার প্ল্যান ছিল, সব গেল ওই মেযেটির জন্য। পুরুষমানুষ কোথায় ছুটবে লাখো টাকাব পথে, পাযেব কাছে বসে যে মেয়েটি তার ছেলেমানুষি সঞ্চয়ের দিকে উদাস স্মিত হাসিতে এক আধবার চাইবে, তা নয় বুঝলে?

শকুন্তলা কণকের গল্প বলার কৌশলে অবাক হয়ে গেল, বলল,—উৎপল সেন বৌকে বাড়ি কিনে দিয়েছে?

—হ্যাঁ দেখো না কত নিচুতে উৎপল। বলতে কি শকুন্তলা তোমাব কল্পিত পুরুষেব একেবারে বিপরীত।

—বিলেতে যাবাব প্ল্যান নষ্ট করে? একটি মেয়েকে ভালবেসে ত্যাগ কবলে নিজেব ভবিষ্যৎ? শুধু ভালবেসে?

শকুন্তলা দুর্বোধ্য মুখাযবব নিয়ে সহসা চলে গেল। নতুন একটা বাডি কেনা যেন দবকাব হয়ে দাঁড়াল।

একটু বুদ্ধি করে শকুন্তলাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিল কণক : ও বাড়িতে যেন আমাকে খুঁজতে যেও না। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার মাথাধবার হেতুটা। আমাবও ফ্লুব মত বোধ হচ্ছে, খালি অস্বস্তি আব খালি খালি ভাব। নতুন একটা আশ্রয় যোগাড়েব চেষ্টায় আছি। যদি পারি পবশুদিন ঠিকানা জানাব, লক্ষ্মী মেয়ের মত দুটি দিন বাড়িতেই থেকো। উৎপলটা তো বিয়ে করে একেবারেই বযে গেছে। এখন তো আর তার সাথে আলাপ করে সুখ নেই।

নতুন বাড়ি কিনল কণক। নাম ছিল রওনাকে ক্য। প্যাশন ফ্লাওয়ার সামনের দিকে, পেছন দরজায় কন্বাশ্রম লিখিয়ে নিয়ে সব শুদ্ধ (উৎপলের মত পাই পয়সার হিসাবে বলা যায় না যে বাহাত্তব হাজারই বলবে) পঁচাত্তব হাজার পড়ে গেল।

আবার শকুন্তলার কথায় ফেরা যাক। তাকে আবার লিখল কণক · আমি হলফ করে বলতে পারি এ বাড়িটা আমার পুরোনো বাড়ির মত ড্যাম্প নয়। আমার শরীরটাও ভালর দিকে। এখন যদি সময় না পাও, আগামী সীজনে যে কোনো দিন পরীক্ষা করে দেখতে পারো। আমি চৌকিদাবকে বলে যাব, আগামী সীজনে যদি নাও আসি আমি, সে-ই সব ঘরের চাবি তোমাকে দেবে।

উৎপল সেনের বাড়ি গেল কণক। বলল তাকে—আর আমার এই নতুন বাড়িটার মস্ত গুণ, শকুন্তলার খুব পছন্দ হয়েছে। বুঝলে, তোমার এখান থেকে বেড়িয়ে ফিরবার সময় আমার বাড়িতে বসে দুবেলাই একটু চা করে খেয়ে যায়। মুখ কালো করছ কেন গোপনের ভঙ্গিতে? (এ জায়গাটায়

হো হো করে হাসল কণক) শকুন্তলার পরিচিত বলতে তুমি আর আমি, তোমার কাছে একটু এলই বা।

উৎপল বলল—আমার কাছে শকুন্তলা আসে না। যাক, বাড়ি কিনেছেন বুঝি?

—না কেনা নয় ঠিক। সঙ্কোচ প্রকাশ করল কেনার কথা বলতে, শিষ্টতাবোধ থেকে।

—তবে চুরি? মর্টগেজ রেখেছিল বুঝি কেউ, মেরে দিলেন সুদের দায়ে? পেছন ফিরে অন্তরালবর্তিনীকে লক্ষ্য করে উৎপল বলল,—এরকম একটা কিছু হবে আগেই বলেছিলাম তোমাকে।

পেছনেব ব্যক্তিটিকে দেখা গেল না ; কিন্তু এর পবে কণককে বাধ্য হয়ে বলতে হল, উৎপলের মত অনেক খবচ করেছি বলার সুবে নয় বরং খুব সস্তার বাড়ি এ রকম ঢং-এ—সস্তাই হল বলতে হবে। এক লাখের মধ্যেই হল।

তখন তখনই উৎপল চা খেতেও বলল।

উৎপলের স্ত্রী বললেন—ওই বাড়িটা কিনেছেন বুঝি আপনি?

—না আমি ঠিক নয়, মানে... শকুন্তলারই বাড়ি ওটা। একটু বুদ্ধি খরচ করে বলল কণক।

—শকুন্তলার নামে লিখে দিয়েছেন বুঝি? দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল উৎপলের স্ত্রীর।

উৎপলের স্ত্রী প্রায় উপাসনার দৃষ্টিতে তাকাল কণকের দিকে। সহজে কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে কণক। যে আনন্দ পাচ্ছে কথা শুনে, তাকেই বা আরেকটু আনন্দ দেয়া হবে না কেন? বলল সে—অবিশ্যি, শকুন্তলা ইচ্ছে করলে নামটা বদলেও দিতে পাবে, খারাপ লেগে উঠলে বিক্রি করেও দিতে পারে, দলিলটাই শকুন্তলার নামে।

দেখা গেল উৎপল তার স্ত্রীর সুখ সহ্য করতে পারে না। তার স্ত্রী যখন উদাস দৃষ্টিতেও ব্যাপারটা অনুভব করছিল, উৎপল খামোখা কথা বলে উঠল, বলল,—তুমি কি মনে কবো, কন্বাশ্রম নামটা রওনাকে রুসর চাইতে ভাল?

—ভাল নয় কেন?

—তার প্রমাণ শকুন্তলা ও নাম বদলে দিয়ে বাড়িব নাম রাখবে কণকনিবাস দেখে নিও।

—কোনো শকুন্তলাই এতটা অকৃতজ্ঞ হয় না।

হাসির ব্যাপার কিছু নয়, তবু উৎপল সিগাবেব গোড়াটা দাঁত দিয়ে কেটে ফেলে হো হো করে হেসে উঠল। কণক পরের কথায় থাকতে ভালোবাসে না, কাজও ছিল তার। দবজাব কাছে সে শুনতে পেল, শোনো প্রতিভা, তুমি কি মনে করো স্ত্রীর নামে বাড়ি লিখে দেয়া, স্ত্রীর বাড়িতে বাস কবা কোনো পুরুষেব পক্ষে উচিত? তুমি কি সেরকম পুরুষকে ভালোবাসো যে পরের বাড়িতে থাকে?

—স্ত্রী বুঝি পর?

সন্ধ্যায় কণক ফোনে শকুন্তলাব খোঁজ নিল।

—তোমার মাথাধরা এখনও কমে নি, নয়, শকুন্তলা?

—প্রায় তেমনি আছে।

—কাল বিকেল নাগাদ যাব নাকি দেখতে একবার?

—না, না, তেমন কিছু নয় তো, তাছাড়া কালই কলকাতায় নেমে যাচ্ছি।

—কালই যাচ্ছ?

—হ্যাঁ একটু ওয়ালটেয়ারে যেতে হবে। সুকুমারের কথা মনে আছে? সে বাড়ি করেছে একটা। চিরকালের সেন্টিমেন্টাল। লিখেছে, কুন্তলা, আমার 'সাকেত' তুমি না এলে সৈকতের মত লবণজীর্ণ হয়ে যাবে। তুমি কিছু মনে কোরো না যেন।

—এখনই না গেলে হয় না?

—কী করে হয় বলো? তোমার সাথে যে দিন কটা এখানে কাটিয়ে গেলাম তার স্মৃতি অমর হয়ে থাক, এখন হাসিমুখে বিদায় দাও। নাকি বিদায়ের সময় বিদায়ের কথা বলতে নেই?

—তা তো বটেই, তবে আমি বলছিলাম কি, ঐ রওনাকে রুর ব্যাপারটা।

—শুনলাম তুমি কিনেছ। কনগ্রাচুলেশনস্।

—এখনও সব কাজটা হয়নি কেনার। দলিলে সই দেয়া বাকি আছে। যদি কিছু মনে না করো, আমার বড় ইচ্ছে, ক্রেতার জায়গায় সইটা তুমিই কর।

—আমি? সে কী! কী সেন্টিমেন্টাল তুমি কণক!

—যদি সময় করতে পারো কাল...

—এতটার কি দরকার ছিল? (অনেকটা দ্বিধাজড়িত স্বর শকুন্তলার) এ তোমাদের, তোমাদের জাতের কি ছেলেমানুষী বুঝি নে। তা পাঠিও বরং কাল সকালের দিকে গাড়িটা। কিন্তু এমন করে জড়াচ্ছ কেন আমাকে?

শিষ্টতার সব চাইতে বড় পরিচয় কোথাও কিছু বাড়াবাড়ি না করা। আধুনিক রুচি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, বনেদিয়ানার রুচি শালীনতার পরিধেয়ে ঘরের বউয়ের মত মিতভাষিণী। দুপুরবেলায় খুব জোরে জোরে কলিংবেল বাজতে কণক বুঝতে পারল শকুন্তলা এসেছে। গাড়ি পাঠানোর প্রতীক্ষা করেনি। অনেকদিন পরে আসা, মন অবশ্যই বলল যেমন আছ, দরজা খুলে দাও, শকুন্তলা আসুক। কণক মনের এই আধুনিক উচ্ছ্বাসবৃত্তিকে হেসে শাসন করল, ধীরে ধীরে উঠে আলমারি থেকে নতুন স্যুট বার করে, প্যান্ট পরে, মোজা পালটে, চটি পায়ে দিয়ে, ধীরে ধীরে শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে দরজা খুলে ছিল।

ঢুকতে ঢুকতে উৎপল, শকুন্তলা নয়, বলল,— তাড়াতাড়ি কী ছিল আধা-ন্যাংটা হয়ে আসার? হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগে আজকালকার দিনে।

ঢোক গিলে কণক বলল,—তারপর আছ কেমন?

—ভাল আর কোথায় স্যার?

—সার, আবার কেন হে? একসঙ্গে পড়তুম যখন তখন তো নাম ধরেই ডাকতে, এখন না হয় তরুণ হবার জন্য আপনিটা ধরেছ।

সে বিস্মিত হবার ভান করে বলল,—এক সাথে পড়তুম, স্যার?

কণক রসিকতা করে বলল,—তাহলে হয়তো নয়। আমারই ভুল সম্ভবত। তারপরে কি মনে করে?

—আপনিই কণকবাবু, স্যার?

—মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, উৎপল।

—উৎপল? ও, আমাকে বুঝি, স্যার, উৎপল ভেবেছেন, আপনার কোনো সহপাঠী?

—না ভাবলেও চলবে।

সে ছলছল চোখে উঠে দাঁড়াল।

উৎপলের মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? অবশ্য ওদের ঘরে বাইরে কাল যে সব কথা হয়েছিল সেটা যদি কিঞ্চিৎ গভীরে গিয়ে থাকে এবং আর্থিক অবস্থা যদি উৎপলের মত হয়, মাথা খারাপ হওয়া বিচিত্র নয়। নতুবা এমন একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ নিয়ে উৎপল ঘর থেকে বেরুত না, সেই উৎপল যে নাকি দাড়ি কামানোর ব্যাপারটা একটা আর্টে পরিণত করেছে। চুলেও যেন পাক ধরেছে, নাকি পাউডার সেগুলি? কিন্তু কণক অধ্যাপক মাইতির কাছে শিখে শিখে বেশ ভালোভাবেই জানে পাগলের কথার প্রতিবাদ করতে নেই, বরং সায় দিয়ে যেতে হয়। কণক বলল—বলুন, আমাকে দিয়ে কি দরকার আপনার?

—আমি, স্যার, রিফিউজি, পাকিস্তান থেকে এসেছি।

—তা এখানে কেন? বেড়াতে?

—চাকরি করি, স্যার।

--তা কেমন লাগছে দার্জিলিং? তোমাদের ওদিকে বোধহয় পাহাড় দেখোনি এর আগে?

--না, স্যার, পাহাড় সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না।

--এই অভ্রভেদী সঙ্গীতের মত হিমাচল। সেই অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত! আর এত ওজোন, আর কমলালেবু। ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান, কী বলো?

--কিন্তু স্যার, একটা বাড়ির জন্য, মানে বাড়ির অভাবে কিছু ভাল লাগছে না।

—বাড়ি? বাড়ি কি চট করেই হয় হে? দু চার বছর অপেক্ষা করো, আস্তে আস্তে বাড়ি তোলো।

উৎপল যে এমন অভিনয় করতে পারে, কে জানত? করুণ হেসে সে বললে,—বাড়ি? শুধু একটা মাথা গুঁজবার ঠাঁই পেলে হত।

- দার্জিলিং--এ কি তার অভাব আছে?

--সে সব আমাদের ক্ষমতার বাইরে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কি করে টিকব, স্যার?

-তা তো বটেই, তা কীঅমিয়ভূষণ (৪) ২২ বা করবে? কষ্ট আজকাল সকলকেই করতে হচ্ছে।

উৎপল হাসল, বলল—কষ্ট জিনিসটার প্রায় সব রকমের সাথেই জানাশোনা আছে ছোটবেলা থেকে। এখানে আমি না খেয়ে এই দারুণ শীতে সুতোর জামা পরে কাটাচ্ছি তাতে কষ্ট অনুভব হচ্ছে না, কষ্টের কারণ টাকা পাঠাচ্ছি, সে হয়তো পাচ্ছে না। হয়তো কেড়ে নিচ্ছে ওরা। আমার স্ত্রী-পুত্র, স্যার, পাকিস্তানে পড়ে আছে।

লক্ষ্য করল কণক উৎপল সুতোর জামা পরে এসেছে। এই শীতে সুতোর ছেঁড়া-খোঁড়া কোট পরে বেরিয়েছে ঘর থেকে। একটু অদ্ভুত ব্যাপার বৈকি, নিছক রসিকতা করার জন্য উৎপল এতটা করতে পারে?

আরও ছিল লক্ষ্য করার বিষয় কথা বলতে বলতে তার চোখ জলে ভরে এল। ভিখারীরা কাঁদে বটে সুর করে, সুর করে কাঁদা কঠিন নয়। নীরব কান্নায় ব্যাটাছেলের চোখ ভরে জল ছলছল করে উঠবে এটা অভিনয়ের চূড়ান্ত। কণক কিছু বলবার আগে উৎপল উঠে দাঁড়াল, গোপনে চোখ দুটি মুছবার জন্য কম্পমান ঠোঁট দুটি দাঁত দিয়ে চাপতে চাপতে বলল,— তা নিক, সব কেড়ে নিক ওরা, শুধু প্রাণটুকু যেন থাকে। আমার স্ত্রীকে যখন রেখে আসি, তখন বিষণ্ণ মুখে শুধু একটি কথাই সে বলেছিল, বলেছিল, বিপদের সম্ভাবনা দেখলে সে আত্মহত্যা করবে। রোজ এখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি,—ভগবান আমার বোকা স্ত্রীকে সাহস এনে দাও।

কণকের গভীর বিস্ময় বোধ হল। করুণ ভূমিকার অভিনেতারা উদগত কান্না নিরোধের চেষ্টায় এমন কুণ্ঠিত হয়ে ওঠে না। তাহলে উৎপল কান্না লুকোবার জন্য এমন ছটফট করে কেন? তা হলে, তবে? উৎপল নয়? অথচ এমন সাদৃশ্য! কণক একটু দীর্ঘক্ষণ চোখ মেলে দেখল। তার অনুভব হল উৎপল না হতেও পারে। পোশাক পরিচ্ছদে উদাসীনতা আনা খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ রাখা খুবই সহজ, তার চাইতেও গভীর বৈলক্ষণ্য চোখে পড়ল। উৎপলের বৈশিষ্ট্য তার দাম্ভিক দৃষ্টির চঞ্চলতা। এর তো নেই, বরং বিপরীত। অপরিসীম দুঃখেও দাম্ভিকতা লুকানো যায় না, পারে না দাম্ভিকরা, দুঃখে বরং জ্বালাময় হয়ে ওঠে তাদের দৃষ্টি। উৎপলের মুখের চামড়া টানটান, এর যেন আলগা অদৃঢ়।

কণক বলল--কি করবে বলো, দুঃখ আসে মানুষের জীবনে। ধরো আমাদের যদি স্বাধীনতার জন্য একটা যুদ্ধই করতে হত ইংরেজদের সাথে। কত প্রাণহানি ঘটত, কত নারীকেই সম্ভ্রম হারাতে হত।

—জানি স্যার, তাছাড়া আরও শুনেছি—আমাদের মেয়েরা অল্পবয়সে মা হয়, সন্তানকে দুধ দেবার ঐশ্বর্য নেই তাদের দেহে।

কী অপরিসীম ঘৃণা তার সুরে, ব্যঙ্গের কী জ্বালা! কিন্তু থামল হঠাৎ. হাতজোড় করে বলল, আমাকে মার্জনা করবেন। আমি এসব বলতে আসিনি, একটা শুধু অনুরোধ করতে এসেছিলাম। আমার এক বন্ধু আর তার স্ত্রী কাল রাত্রি থেকে পুলিশ হাজতে আছে। শুনলাম পুলিশ সাহেব আপনার বন্ধু। যদি কোর্টে

মামলাটা না নিয়ে—শুধু একবার মেয়েটাব কথা ভাবুন।

কণক বলল,—অপরাধ করেছে? চুরি বুঝি? তোমরা চুরি করাটাকে অপরাধ মনে কবো না, তাই নয়?

লোকটি যা বলল সব কথা কণক গল্পের খাতিরেও উল্লেখ করতে পারবে না। তার ভাবতেও লজ্জা হয়। কাল বিকেলের দিকে ওর বন্ধু ও তার স্ত্রীকে পুলিশ ধবেছে গার্ডেন্স থেকে। লালসা কি মানুষের এত বড়? হতে পারে আজ সাত আট মাস বাবা-মা-ভাই-বোন নিয়ে একই ঘরে তাদের রাত কাটাতে হয়েছে, হতে পারে বয়সেও তারা বিপন্ন, কিন্তু নিরুদ্ধ হলেই কি তার প্রকাশ এত কদর্য হয়? ছি ছি, মানুষ যেন বেবুন, চিড়িয়াখানার বুড়ো ক্লেদাক্ত বেবুন।

এরপরে কণক কি করেছিল, মনে পড়ছে না। গা ঘামতে শুরু কবেছিল। গল্প উপন্যাসে পডা গেছে প্রেতাত্মা শুধু ভয় দেখাতে আসে না, করুন কাহিনীও জানাতে আসে। কিন্তু তখনও মানুষের মনে করুণা যতটা জেগে ওঠে তার চাইতে শতগুণ প্রবল হয়ে জাগে কি এমনি অনির্বচনীয় বিভীষিকা? দাবিদ্র্য মূর্ত হয় না, হলেও সেটা হয় অলঙ্কার শাস্ত্রে। এ কী হল তবে? পায়চারি কবে বেড়াতে লাগল কণক।

সন্ধ্যায় ফোনে ডাকল শকুন্তলা।

—কখন থেকে তোমার জন্য বসে আছি। মনটা ভাল ছিল না কণকের, সে বলল—বার হতে ইচ্ছে নেই, তুমি এসো বরং।

ফোনে একটি মেয়ের মতই হেসে লুটিয়ে পড়ল ও। শকুন্তলা বলল,—তা আমি জানি। উৎপল আমাকে এইমাত্র ফোন করেছিল। তুমি ওকে নাকি বাড়ি বয়ে শুনিয়ে এসেছ লাখ টাকাব কথা, ও তার পালটা জবাব দিয়ে গেছে দবিদ্রেব অভিনয় করে।

শকুন্তলা খিলখিল করে হেসে, উঠল।

রাগ হল কনকেব। (তাকে বোকা বানিয়ে যেতে পেরেছিল কিনা উৎপল, তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন) আশ্চর্য, কত খুশি হয় শকুন্তলা তাব পরাভবে? আব যে পরাভবটা এসেছে নাকি উৎপলের কাছ থেকে।

কণক বলল—ঠাট্টাও যদি হয়, এ কি বকম বেয়াড়া ঠাট্টা? মানুষের দুঃখ নিয়ে এমন রসিয়ে বসিয়ে অভিনয় করা কি হৃদয়হীনতাব লক্ষণ নয়? তাদের তোমরা কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারবে না, ভগবানের দোহাই, এত লঘুভাবে আলোচনা কোরো না তাদেব ব্যথাতুর হৃদয় নিয়ে। আমি ভেবে পাই না এমনি একটি হৃদয়হীন অভিনেতাকে কোনো কালে হৃদয় দেবার কথা ভাবতেও পেবেছিলে তুমি। ছি-ছি।

তথাপি শকুন্তলা হাসিব বেগ টেনে বলল,— তোমার পুরানো বাড়িতে অপেক্ষা করছি, আসবে না?

পুরনো বাড়িতে শকুন্তলাকে দেখে অবাক কণক। শুধু বসবার ঘর সাজায়নি, শুধু টেবিলময় সুখাদ্যস্তুপ নয়, কোথায় ছিল কে জানত, ময়ূরপঙ্খীমার্কা একটা খাট এনে পেতেছে কণকের খাটের লাগোয়া।

চা-পর্ব মিটলে শকুন্তলা বলল—প্রার্থনা আছে! কালকের ডাকগাড়িতেই যেতে হচ্ছে নেমে।

—ওয়ালটেয়ারে, সুকুমারের সাকেত দেখতে?

—ভোল নি দেখছি। সেখানে নয়, পুরীতে যাচ্ছি। দাদার আদেশ। বাড়ি কিনেছে নতুন। চিরদিনের পাগলা, আমি না গেলে গৃহপ্রবেশে আটকাচ্ছে।

—তুমি কি তোমার দাদার পদযুগল...?

—ছি-ছি, গুরুজন সম্বন্ধে অমন কথা বলতে নেই।

—কেন বলব না বলো? বুড়ো অধ্যাপক তিনি, পাঠ্যজীবনে অনেক কষ্ট দিয়েছেন, এখনও দেবেন। এমন হিংসা কেন তাঁর। তাঁর দিন ফুরিয়ে গেছে, তবু নিশ্চয়ই গাঁঠছড়া বাঁধা জীবনসঙ্গিনী সঙ্গে আছেন।

আমাকে বিদেশে এমন বে-মওকায় ফেলার কী সার্থকতা?

অপ্রতিভ মুখে হাসল শকুন্তলা, অনেকদিনের সাধ ওদের।

কণক বিরস মুখে বলল বাড়ি আর বাড়ি। কলকাতায় আছে আবার পুরীতে কেন? তোমরা অর্থাৎ বড়মানুষেরা যদি আর একটু কম কম বাড়ি করতে। এদিকে উৎপলের 'লভসডেল', ওদিকে সুকুমারের 'সাকেত' মাঝখানে তোমার দাদার বোধ করি জগন্নাথদর্শন। ছি ছি, যদি তোমরা টাকার জোরে এভাবে জমি ও বাড়ির উপাদানগুলি দখল না করতে, বাঁচত গরীবরা। কবে তোমাদের এই স্থূল জিনিসগুলির উপর মোহ দূর হবে? বাড়ির চাপে আমাদের মনুষ্যত্ব থেঁতলে গেছে। নিজেদের পরিচয় দেয়ার কিছু নেই আর, গেট থেকে বার হবার সময় ঠিক হয়ে যায় মূল্য, 'অমুক বাড়ির লোক' এই আমাদের পরিচয়। বর্বরতার চরমে উঠেছি। অথচ, অথচ শকুন্তলা, এই দার্জিলিং শহরে এই দুরন্ত শীতে চারটে দেয়ালের আড়াল জোটে না যাদের তারাও মানুষ।

শকুন্তলা ফ্যাকাশে মুখে সরে দাঁড়াল। কণকের মনে হল, আর দু'চারটে কথা, তাহলেই উৎপলের হৃদয়হীনতা প্রমাণিত করে দেয়া যাবে নিঃসংশয়ে। আর কোনো দিন তার ও শকুন্তলার মাঝখানে অতীত উৎপল ব্যবধান রচনা করবে না।

কণক বলল—জানো শকুন্তলা, মানুষের ছেলে সেও, যে স্ত্রীর সঙ্গকামনায় উৎপলের কাহিনীগত কেলেঙ্কারি করতে পারে। তবু আজ মনে হয় এ বিপুল ধরণীতে এখনও বাঁচবার আগ্রহ আছে তাদেরই, যত রুচিহীন প্রকাশই হোক। আর পাশাপাশি খাটের এই রাত্রিতে স্নায়ুকে উত্তেজিত করার জন্য শিয়রে রাখতে হয়েছে কুৎসিত ফরাসী গল্প। বাড়ির চাপে দৈহিক মন্যুষত্বও ধুলো হয়ে গেছে।

কণকের আশানুরূপ ঘটল ব্যাপারটা। শকুন্তলা কাছে এগিয়ে এল, মূর্ছামগ্নকে জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার কায়দায় কণকের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল আর্তস্বরে—ওগো, ওগো, কই তাকাও আমার দিকে, দেখো, দেখো আমি কে? কী বলছ এসব? কী হয়েছে?

অভিনয় উৎপল ভাল করে, কিন্তু কণকও পারে, পেরেছে। আশানুরূপের চাইতেও বেশী।

শকুন্তলা বলল,—আমি যাব না, তিনবার বলছি যাব না। লক্ষ্মীছাড়া উৎপলটার আর কাজ ছিল না, ছাই-পাঁশ ঢুকিয়ে দিল মাথায়।

বাইরে জল ধরেছে। হঠাৎ জল নামায় অভিনয় থেকে সহজে নেমে আসতে কণকের সুবিধা হয়েছিল; সেই জল এখন ধরেছে। ইলেকট্রিক হিটারে আতপ্ত দেহ, আলোয় ঝলমল করছে চোখ। ঘেরাটোপে টাকা প্রকাণ্ড সূর্যমুখী ঢং এব আলোটার ডাঁটের গোড়ায় শকুন্তলা ও কণক।

—কলকাতায় ফিরেই এরপরে আমাদের বিয়ে হওয়া উচিত, বলছিল শকুন্তলা।

কাচের জানলা দিয়ে সামনের প্রাচীরটা দেখা যাচ্ছিল, যাচ্ছিল না। কিচির কিচির শব্দ শুনে যেন চোখ তুলে দেখল কণক, চোখের ভুলও হতে পারে, গাঢ় ধূসর ছায়ামত দুটি প্রাণী, একটি গা ঘেঁষে আর একটি ; ভিজে প্রাচীরের উপর দিয়ে চলতে চলতে থেমে দাঁড়িয়েছে যেন—যেমন দার্জিলিং এ সহসা দেখা যায় না।

শকুন্তলা একটু লজ্জিত হয়ে আলোটা ঘুরিয়ে দিল।

—বেরুন? জিজ্ঞাসা করল কণক। কিম্বা সার্সির গায়ে ছায়া?

—যাও।

দুজনে জানালা থেকে সরে এল।

নাটক

বিয়োগ

পাত্র ও পাত্রী। শচীকান্ত, তার ছেলে শশিকান্ত এবং শ্রীমতী।

কাল। যে কোনো এক রবিবারের সকাল সাতটা থেকে দশটা।

স্থান। একটি ১৫×১২ ঘর। ঘরের দুটি দেয়াল আলমারি আছে, একটিকে বাথরুম, অপরটিকে রান্নার জন্য ব্যবহার করা যায়। ঘরে একটি খাট, একটি টেবিল, দুখানা চেয়ার ও একটা বই এর সেল্ফ, টেবিলের মাথায় দেয়ালে একটা টাইমপিসের মত ছোট ঘড়ি।

শশিকান্ত। [একটা ছোট ফুলগাছ সমেত রঙীন টব বিছানার তলা থেকে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।] কোথায় তোকে রাখি বলতো, কোথায় রাখলে রোদ পাবি? শীতকাল আসছে রোদ সরে সরে যায়। [টেবিলে টবটা রাখল।] এখানে চড়ুই মার্কা একটু রোদ আছে বটে, উড়ে যেতে কতক্ষণ। কিন্তু এইটুকু পেয়েই যদি তুই খুশি হস, আমিও খুশি। কেমন রোদ এসে পড়েছে—এই কচিরঙের পাতাটায়। (এক পাক পায়চারি করে এসে) শ্রী বলে এটা নাকি তোর জীবনের একটা ট্র্যাজেডি যে তুই কাগজেব তৈরি। কিন্তু কথাটা ভেবে দেখ সমস্ত পৃথিবীটা এমনি বঙীন কাগজে তৈরী কিনা। ওরা যাই বলুক আমি কিন্তু তোকে ভালোবাসি। আমার মনে হয় যে কাঠের পাল্প থেকে তোর কাগজ তৈরী, তার কোনো অণুতে হয়তো বা এমনি ফুল হযে ওঠাব স্বপ্ন ছিল। [টেবিলে বসে।] রস্ মনের কথা কটা লিখে নি। [খাতা খুলে লিখতে গেল। এমন সময় বাইবে কড়ার শব্দ। নেপথ্যে মেয়েলি গলায় বাব্বা কি ঘুম! শশিকাণ্ড স্বরটা চিনতে পেরে খুব খুশি হয়ে নিঃশব্দে হাসল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল, শ্রীমতী প্রবেশ করল। শশিকান্ত দরজা বন্ধ করে দিল।]

শ্রীমতী। কী হচ্ছিল?

শশিকান্ত। তুমি একটি অজাত কবিতার মৃত্যুর জন্যে দায়ী হলে।

শ্রীমতী। আমি আসায় তুমি যেন বিব্রত বোধ করছ?

শশিকান্ত। তা খানিকটা বৈকি। এত সকালে তো তুমি আস না কোনোদিন।

শ্রীমতী। রোজ সকালে কি আসা যায়? অত ছুটি দেবে কেন তারা--আর তাছাড়া যারা তাদের মেয়েগুলিকে স্কুলে পাঠায় তাদেরই বা ফাঁকি দিলে চলবে কেন?

শশিকান্ত। আর কটা তাছাড়া আছে?

শ্রীমতী। আছে। এত সকালে রোজ এলে লেখাপড়া হয় না আর একজনের।

শশিকান্ত। এর থেকে প্রমাণ হয় স্বপ্ন দেখার মতো তরুণ নয় তোমার ভালোবাসা। [শ্রীমতী কিছু না বলে মৃদু হেসে, রান্নাঘরের দরজা খুলে সেই ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। হাতের ছোট ব্যাগটা নামিয়ে রেখে হিটার জ্বেলে কেটলি চাপিয়ে দিল। কথোপকথনের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না]

শ্রীমতী। পথে আসতে আসতে প্রথমে ব্রাউনিং-এর একটা কবিতা মনে পড়ল, তারপর মনে হল জীবনে বড় কিছু করা, আর জীবনকেই বড় করা এ দুই এর মধ্যে কোনটা বেশী সার্থক এ চট করে বলা যায় না।

শশিকান্ত। হায়রে চিরন্তনী নারী, তুমি বোধহয় এর পরে বলবে দুজনে বেঁচে আছি, পাশাপাশি চলছি এই অনুভব কবি-শিল্পী-সেনাপতির কৃতির চাইতে অনেক মহৎ! তা বলো, কিন্তু তাতে তুমি বড় জোর অত্যন্ত একটি পুরনো কথা প্রমাণ করবে। পুরুষের পক্ষে সংসার ধর্ম পালন করা একটা সখের ব্যাপার, আর তোমার পক্ষে একটা বায়োলজিক্যাল সার্থকতা। একে যেন কে লাইফ-ফোর্স বলেছেন। এসব গবেষণাই প্রাক-যুদ্ধ ইওরোপের।—আবে ও কী? কেটলি বসালে? বাজারও করে এনেছ বুঝি? [শশিকান্তর মুখটা একটু ম্লান হল]

শ্রীমতী। আমি বাজারে গেলে বুঝি ভালো হয়? বাজারে যাওয়ার কাজ তোমার জন্যে তোলা আছে। [শ্রীমতী কেটলি নামিয়ে চা ভিজিয়ে দিয়ে রুটি সেঁকতে লাগল।]

শশিকান্ত। আজ সকালে যে বড় আসতে পারলে?

শ্রীমতী। মিথ্যে কথা বলেছি। স্কুলে বলেছি অসুস্থ ; তিন চার দিনের ছুটি চাই, বাড়িতে বলেছি পার্টির কাজে বাইরে যাচ্ছি।

শশিকান্ত। যদি স্কুলের লোক আর বাড়ির লোকে কথাবার্তা হয় তবে লজ্জায় পড়বে।

শ্রীমতী। স্কুল-কর্তৃপক্ষ পার্টি-বসদের ভয় করে।

শশিকান্ত। পার্টির ওরা যদি খোঁজ নেয়। আজ অবশ্য রবিবার।

শ্রীমতী। পার্টির কাছে আমি আর কেউ নয়। [শ্রীমতী চা ইত্যাদি এনে টেবিলে রাখল।]

শশিকান্ত। তা বেশ। তুমি না এলে আজ সকালে চা খাওয়া হত না।

শ্রীমতী। তুমি বুঝি ভাবলে আমি অতো সহজ লোক। চা খাওয়া হলে বাজারে যাও। মুটের মাথায় করে পাঁচ সাতদিনের বাজার করে আন। আর দেখো, মাছ নিয়ে এস। আমার ভারি দুর্নাম আমি নাকি মাছ রান্না করতে জানি না।

শশিকান্ত। টাকা কোথা থেকে আসবে বাজার করার এ আমি জিজ্ঞেস করব না। কিন্তু এ টাকা সংগ্রহ করতে গিয়ে কাকে কাকে বঞ্চিত করলে?

শ্রীমতী। বঞ্চিত আবার কে হবে? সন্ধ্যার পর দুটি ছেলেকে পড়াচ্ছি আজকাল। তাদের টাকা পেলে ঘাটতিটা পূরণ হবে। কিন্তু এবার তুমি বেরিয়ে পড়, রোদ চড়লে তোমার কষ্ট হবে।

শশিকান্ত। তুমি আসার আগে ওই কাগজের ফুলগুলি রোদে দিয়েছিলাম। তখন বুঝতে পারি নি, এখন মনে হচ্ছে সেটা আমার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা। বোধহয় আমার মনে হচ্ছিল আমি ওই কাগজের ফুলের মত।

শ্রীমতী। নিজেকে অত ছোট কেন ভাব?

শশিকান্ত। না, ছোট নয় তো, নিরর্থক মনে হয়। তখন মনে হচ্ছিল এ কাগজেব ফুলের কোনো অণুতে এখনও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অরণ্যের সূর্যতৃষ্ণা আছে, তেমনি যেন হয়েছে আমার। বৃথা সূর্যতৃষ্ণা।

শ্রীমতী। কবিদের ও রকম বোধ হয়।

শশিকান্ত। তুমি বলছ, অন্য অনেকে বলছে, কিন্তু শিরি, আমি কী ভাবছি জানো?—আমার এই আকুলতা, এই উদ্বেগ, এই সংহত প্রয়াস এর তো কিছুই মিথ্যা নয়, তবু কেন আমি মিডিওকার মাত্র? কেন আমি অসাধারণ কবি নই, কেন প্রতিভার স্ফুরণ হয় না? মাঝারি কবি কেন হব, যদি আমার আকুলতা মিথ্যা না হয়?

শ্রীমতী। তোমার 'ক্ষেপা খুঁজে ফিরে পরশ পাথর' মনে আছে?

শশিকান্ত। প্রবোধ তুমি আর কত দেবে? আমি, ভাবছি, কী আমার অপরাধ যে জন্য শত চেষ্টাতেও বঞ্চিত হব। এরকম কেন হয় পৃথিবীতে। ভাগ্য কেন বথচক্র গ্রাস করে কর্ণের পুরুষকারকে পরিহাস কবে।

শ্রীমতী। শোন, কই, মুখ তোল দেখি?

[শশিকান্ত ঘরের মেঝেতে পায়চাবি কবে এল]

শশিকান্ত। অবশ্য এসব কথা বলে তোমার মন খারাপ করে দেয়ার কোনো যুক্তিই নেই।

শ্রীমতী। তাও যদি বা থাকে, কাল রাত্রিতে খাওনি, কিম্বা কোনো হোটেলের অখাদ্য খেয়েছ, এ অবস্থায় লেখা আসছে না বলে নিজের উপরে বাগ করারও কোনো যুক্তি নেই।

শশিকান্ত। [হেসে ফেলল।] তোমার কথা শুনে মনে হয় সংসার করার ব্যাপাবে তুমি অত্যন্ত পাকা। পুরুষদের কি করে চালাতে হয় তা বেশ ভালোই জানো।

শ্রীমতী। সব পুরুষকে চালাতে জানা আব জীবনের একটি মাত্র পুরুষকে চালানো এক নয়। পাবছি কোথায়? বাজারে যাচ্ছ কোথায়?

শশিকান্ত। যাব। কিন্তু তোমাব ভাব দেখে মনে হচ্ছে তিন-চাব দিন তুমি এখানেই থাকবে।

শ্রীমতী। থাকব। থাকতেই তো এসেছি। কী হল? আমাকে বিযে করতে আপত্তি আছে?

শশিকান্ত। নিজেব ভার নিতে পারি না।

শ্রীমতী। সে আলাপ পরে হবে। [আলনা থেকে জামা এনে ছিল শশিব হাতে]

[শশি জামা পবে চটি পাযে গলিয়ে বওনা হচ্ছিল, শ্রীমতী চিরুণীটা এগিযে দিল। টাকা নিযে শশি রওনা হচ্ছিল।]

শ্রীমতী। কী মনে হচ্ছে বলব-- এমনটি আর পড়িল না চোখে আমার যেমন আছে।

শশিকান্ত। (হাসিমুখে।) তবু যদি দাবিদ্র্য না থাকত। একেই বোধহয় বুর্জোযাদেব দারিদ্র্য-বিলাস বলে।

শ্রীমতী। সে হবে। ফিরে এস। মাছ এনো কিন্তু।

[শশি প্রস্থান কবল, শ্রীমতী ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে দরজাব কাছে এগিযে গিযে, শুনছ, কাপড় কাচা সাবানও একটু এনো। শ্রীমতী তাড়াতাড়ি ঘর সাফসুতবো করতে লাগল। আলনা থেকে ময়লা জামা, বিছানাব ময়লা চাদর, বালিশেব অড় খুলে বাথরুমের দরজা খুলে তাব ভিতরে ছুঁড়ে দিল। তাব পর টেবিল গোছাতে লাগল। এমন সময়ে বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হল। শ্রীমতী শব্দটা শুনে ভ্রূ-কুঞ্চিত করল] [নেপথ্যে শশি আছিস?]

শ্রীমতী। [স্বগত] এ যে দেখছি নাম ধরে ডাকছে। কলেজের কেউ হবে নাকি? [প্রকাশে] কে? [নেপথ্যে . শশি এখানে থাকে?]

শ্রীমতী। [স্বাগত] না, এ খুব সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু ন্যাংটা বিছানা, কী বিশ্রি ময়লা। চাদরই বা কোথায়, কী পাতি! [একটু চিন্তা করে নিজেব হাত ব্যাগটার মধ্যে থেকে একটা শাড়ী বার করে তাড়াতাড়ি বিছানায় পেতে দিল।] নেপথ্যে : শশি কি এখানে থাকে না? এটাই তো একশ দুই এর ডি। [শ্রীমতী দরজা খুলে দিল। শচীকান্তকে দেখা গেল। এ দেশীয় ডাক্তারদের মত পোশাক তার। উভয়ে উভয়ের দিকে বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল।]

শচীকান্ত। আমাকে আপনি মাফ করবেন। আমি শশিকান্ত বলে এক মেডিকাল কলেজের ছাত্রকে খুঁজছিলাম।

[বিড়বিড় করে।] কী নামের কায়দা হয়েছে আজকাল, লেখাবি শশিকান্তই লেখা, না শুধু শশী।

যাই হোক আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, ট্রাবলস্ দিলাম। আচ্ছা চলি। [প্রস্থানোদ্যত হল।]

শ্রীমতী। শুনুন, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি শশিকান্তবাবুর কোনো নিকট আত্মীয় হবেন।

শচীকান্ত। ওটা পুরোনো কথা। শশিকান্ত আমার আত্মজ কাজেই তার চেহারায় আমার আকৃতির ছাপ থাকবেই।

শ্রীমতী। [দ্বিধা করে] শশিকান্তবাবু এই ঘবেই থাকেন। আপনি ভেতরে আসুন। উনি বাইরে গেছেন, এখনই ফিরবেন।

[শচীকান্ত ঘরে ঢুকল। সামান্য বিরতি। এর মধ্যে সে ঘরের চারিদিকে লক্ষ্য করে নিল। বিশেষ করে লক্ষ্য কবল বিছানায় পাতা শাড়ীটা। শচীকান্ত চেযারটায বসল।]

শচীকান্ত। আপনার নাম বুঝি কবিতা?

শ্রীমতী। [খোসামোদ্যান করে লজ্জিত] কেন বলুন তো?

শচীকান্ত। রমেশ বলছিল কিনা শশী আজকাল কবিতা নিয়ে আছে।

শ্রীমতী। [অপমানিত বোধ করে] আপনি ভুল করছেন। শশিকান্তবাবু কবিতা লেখেন। আপনার রমেশ সেই কথাই বলে থাকবে।

শচীকান্ত। তা বেশ। তুমি বোধ করি শশীর সহপাঠিনী। তোমাকে তুমি বলছি অপমান বোধ কর না যেন। তোমরা কি রুমমেটও নাকি?

শ্রীমতী। [বিব্রত] না, এই শহরেই আমাদের বাড়ি আছে।

শচীকান্ত। [বিছানায় পাতা শাড়ীর দিকে ইঙ্গিত করে] এখানে তাহলে অন্য কোনো মহিলা থাকেন?

শ্রীমতী। দেখুন এসব ধরনের কথাবার্তা বলা আমি পছন্দ করি না। আপনার ছেলে এলে তার সাথেই কথা বলবেন। [শ্রীমতী রান্নাঘরের দিকে সরে গেল।]

শচীকান্ত। বটে! তুমি আমার সর্বনাশ করবে আর আমি মুখে বলতেও পারব না।

শ্রীমতী। এ রকম সব কথা বলার কি অধিকার আপনার আছে, আমি বুঝতে পারছি না। [ফিরে দাঁড়িয়ে।]

শচীকান্ত। অধিকার! দেখো, বাছা আমরা সেকেলে লোক। মহিলা বলে কোনো বিষয় আমরা জানি না। নিজের মা-বোন-স্ত্রী আছে, আছে কুটুম্বিনী, এ ছাড়া কারও সঙ্গে একঘরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে আমরা অভ্যস্ত নই, কাজেই হয়তো কথাগুলি তেমন মধুর হচ্ছে না।

তুমি কি জানো এই যে ঘরে দাঁড়িয়ে কথা বলছ এ ঘরও আমার টাকায় ভাড়া করা?

শ্রীমতী। অতি নিম্নস্তরের অধিকার। যে টাকা আপনি পাঠান তাতে পনের দিনের পরে চলে না।

শচীকান্ত। তা হয়তো চলে না। টাকাটা বাপ-মা পাঠায় ছেলেকে, তার অন্য রকম একটা

মূল্য আছে। কিন্তু অন্য অধিকারও আছে। সেটা তোমার মত মেয়েরা বুঝতে পারবে না। তোমরা কি বিবাহিত?

শ্রীমতী। এ রকম ধরনের আলাপ আপনার সঙ্গে করতে চাই না। আপনি জেনে রাখুন আপনার ছেলের বয়স এবং আমার বয়স আমাদের সংবিধানগত অধিকার দিয়েছে, যার সমালোচনা আপনি করতে পারেন না। আমরাও আপনার মতই ভারতবর্ষের নাগরিক। [প্রায় কেঁদে ফেলল।]

শচীকান্ত। চমৎকার! কিন্তু আমি ডাক্তার, উকিল নয়। প্রয়োজন হলে আমি নির্দয় হতে জানি।

দীর্ঘ বিরতি

শ্রীমতী। [ক্লান্তস্বরে] আপনি শশীবাবুর বাবা, তাঁব অনুপস্থিতিতে আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।

শচীকান্ত। তুমি যদি মনে করে থাকো দুঃখ প্রকাশ করে আমার মন নরম করতে পারবে, তাহলে ভুল করেছ। আমি শশীর কাছে কৈফিয়ৎ নিয়েই চলে যাব। তারপব তোমরা তোমাদের সংবিধানগত অধিকার নিয়ে থেক।

শ্রীমতী। [হাসির চেষ্টা করে] আমি এমন কথা বলি নি যে আত্মীয়স্বজন সকলকে ত্যাগ করে শুধু সংবিধান নিয়ে থাকতে চাই। এমন কথাও আমি বলি নি শশীবাবুকে আমি ধরে রাখব আইনের সাহায্যে। আসলে ব্যাপার হচ্ছে আমাদের পরিচয়ের সূত্রপাতটা ঠিক হয় নি।

শচীকান্ত। [বিস্মিত হল] তুমি কী বলতে চাও?

শ্রীমতী। আপনি আমার বাবার মতই, চট করে রেগে যান।

শচীকান্ত। হতে পারে তাঁব এবং আমার একই রকম দুর্ভাগ্য।

শ্রীমতী। তা নয। এই মাত্র আমবা দু'জনে দু'জনেব যে পরিচয় পেলাম এটা হয়তো ঠিক নয়। শশীবাবুর কাছে আপনার লেখা চিঠি আমি পড়েছি। আমার মনে হচ্ছে আপনি যে কর্কশ ভঙ্গিতে কথা বললেন সেটা প্রফেশনেব ভঙ্গি, ব্যক্তিগত নয়।

শচীকান্ত। তুমি বলতে চাও তোমার ভঙ্গিটিও সত্যিকারের নয়।

শ্রীমতী। আমি আত্মরক্ষা করছিলাম।

শচীকান্ত। তা বেশ।

শ্রীমতী। কবিতার উপরে আপনার রাগ কেন?

শচীকান্ত। রাগ নয়, আমার সন্তান সম্বন্ধে আমার একটা পরিকল্পনা আছে। তাতে কবিতার স্থান নেই।

শ্রীমতী। আপনার ছেলে ডাক্তার হোক এই তো আপনি চান? সে বিষয়ে আমি তো আপনাকে সাহায্যও করতে পারি।

শচীকান্ত। [বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল।] তুমি কি রসিকতার চেষ্টা করছ?

নেপথ্যে : বাব্বা, কি রোদ। নামা, নামা। ছ' আনা? নে বাপু তাই নে, যা।

[শশিকান্ত একটা ছোট ঝুড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকল]

শশিকান্ত। বুঝলে, শিরি, বাজার করা আমার পোষাবে না। এই কাপড়খানা নাহক পাঁচ টাকা ঠকিয়ে নিল, অবশ্য তুমি বলতে পার কাপড় আনতে তুমি বলনি। কিন্তু ভেবে দেখ এক বস্ত্রে—
[শচীকান্তকে দেখে] এই রে। বাবা? কখন এলে? [নত হয়ে প্রণাম করল] একটু খবর পাঠাতে হত। আমি গিয়ে নিয়ে আসতাম স্টেশন থেকে। বাসা খুঁজতে খুব ঘুরতে হয়েছে তো? [শ্রীমতী রান্নাঘরে চলে গেল।]

শচীকান্ত। তা হয়েছে। রোদে ঘুরে এলি, বোস। ছাতা নিসনে কেন? যাদের মোটর নেই, তাদের ছাতা বওয়া শিখতেই হবে।

শশিকান্ত। বাড়ির খবর বল আগে। মা কেমন আছেন? নেপু?

শচীকান্ত। সবাই ভালো আছে। তুই জিরিয়ে নে, কথা আছে।

শশিকান্ত। তা হবে। কিন্তু তুমি জামা জুতো খোল। স্নান-টানের ব্যবস্থা কর। কথা বিকেলে হবে। তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

শচীকান্ত। আমি দুপুরের ট্রেনেই ফিরে যাব। তোর সাথে কথা বলতে এসেছি।

শশিকান্ত। এ রকম কষ্ট করে আসার বদলে, ডেকে পাঠালেও হত।

শচীকান্ত। তা হত না, নয়। একটু কাজও ছিল। লেখাপড়া কেমন হচ্ছে তাই বল আগে।

শশিকান্ত। খুব ভালো নয়।

শচীকান্ত। সে কি রে, নিজেই যদি বুঝতে পাবিস ভালো নয়, তবে শোধরাতে কতক্ষণ?

শশিকান্ত। আসল কথা হচ্ছে : ডাক্তারিটা আমার দ্বারা হবে না।

শচীকান্ত। হুঁ, আমি শুনেছি এমনি কি এক কথা তুই রবীন ডাক্তারকেও বলেছিস। আজ সকালে রবীন বলছিল। তোদের মেডিসিনের প্রফেসর রবীন।

শশিকান্ত। তাঁকে আমি সত্যি কথাই বলেছি।

শচীকান্ত। আসলে তোব ভুল কোথায় তা তুই বুঝতে পারছিস না। সার্জারির ক্লাসে গোড়ার দিকে এমন হয় অনেকের। অনেকে নার্ভাস হয়ে পড়ে। কিন্তু পরে সয়ে যায়।

শশিকান্ত। তা নয়। ডাক্তার হাতে আমি পারব না। সবাই কি পুলিশ হতে পারে? সমাজের রোগ ঘেঁটে বেডান যেমন, দেহের রোগ ঘেঁটে বেড়ান তেমনি। ও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোনো ডাক্তারী পরীক্ষায় কোনো দিন পাস করতে পারব না।

শচীকান্ত। পারবি। রবীন ডাক্তার যা বলেছে তা যদি সত্যি হয়, এবং সত্যি সেটা, তবে তোর কাছে অনেক কিছু আশা করা যায়। গতবারের টার্মিনাল টেস্টে যে রোগীকে ডায়াগনোস করতে বলা হয়েছিল একমাত্র তোর ডায়াগনোসিসই অসল ব্যাপারটার কাছাকাছি গেছে।

শশিকান্ত। অথচ আমি যে ওষুধ বলেছিলাম তা ওরা দিল না বেচারীকে।

শচীকান্ত। সে কথাও বললে রবীন। তুই নাকি একটা প্রেসক্রিপশানও করেছিলি। সেটা ছেলেমানুষি হয়েছিল। অতটা মরফিন দিলে নরহত্যা হয়।

শশিকান্ত। হত, তা আমি জানতাম।

শচীকান্ত। সে কী রে? বলিস কী?

শশিকান্ত। যে রোগীর বাঁচাবার প্রয়োজন নেই, ইচ্ছা নেই, বাঁচা যার পক্ষে অন্য সকলকে বিব্রত করা, তার মৃত্যুর ব্যবস্থা করা অন্যায় নয়।

শচীকান্ত। তোমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো দরকার। ডাক্তার আরোগ্যের ভার নেবে। বেঁচে থেকে কোনো রোগী কী করবে এসব লাভ ক্ষতি খতিয়ে দেখার ভার ডাক্তারের নয়। আসলে তুই অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছিস।

শশিকান্ত। তুমি আমার কথা সিরিয়াসলি নিচ্ছ না।

শচীকান্ত। তুই যেরকম বলছিস, তার চাইতে অনেক বেশি সিরিয়াস আমি। আমার ছেলে, বড় ছেলে, বাড়ির সেরা ছেলে স্নায়ুর দুর্বলতার জন্য ফিরে দাঁড়াবে, একি আমার জীবনের একটা সাধারণ দুর্ঘটনা!

শশিকান্ত। [করুণ স্বরে] আমি পারি না, তুমি বিশ্বাস করো বাবা।

শচীকান্ত। আচ্ছা, [একটু ভেবে] আচ্ছা তোকে আমি পরীক্ষা করি। আন দেখি তোর মেডিসিনের বই। না—থাক। দাঁড়া তোকে একটা ট্রায়াল কেস দি।

শশিকান্ত। [হতাশার হাসিতে] বল।

শচীকান্ত। মন দিয়ে শোন। আমি আজ যাচাই করে দেখব আমার বিশ্বাস সত্যি কিম্বা মিথ্যা। দেখব রবীন ডাক্তার কি করে ছাত্র পড়ায়। এবার কিন্তু প্রফেশন্যাল কথা।

শশিকান্ত। আমি শুনছি, তুমি বল।

শচীকান্ত। রোগীর বয়স চল্লিশের উপরে, রোগা, এনেমিক, নানা রকম চিকিৎসাতেও উন্নতি হচ্ছে না। রোগী বলে তার ভয়ানক কনস্টিপেশন। প্রথম প্রথম পার্গেটিভ দিতাম, কাজ হত। এখন অতি মাত্রায় প্রয়োগ করেও ফল হয় না। মোশন একরকম নেই বললেই হয়।

চার পাঁচ মাস থেকে তলপেটে একটা অস্বস্তিকর জ্বালা বোধ হচ্ছে। রোগী আহারাদির সুব্যবস্থা সত্ত্বেও ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়েছে। ক্লান্তি এত বেশি যে—

শশিকান্ত। এব্‌ডোমিন্যাল প্যালপেশনে—

শচীকান্ত। এ সেন্ডিং কোলনের কাছে টিউমারের মত হাতে লাগে।

শশিকান্ত। হু।

শচীকান্ত। মোটামুটি এই কেস হিস্ট্রি। কী মনে হয় তোর? রোগীকে প্রথম কী ব্যবস্থা দিবি?

শশিকান্ত। সর্বপ্রথম এক্স-রে ছবি নিতে বলব। ক্লিনিকাল পরীক্ষাগুলিও করতে হবে।

শচীকান্ত। [উৎসাহিত হয়ে] ভেরি গুড। আমিও তাই করিয়েছি। [এটাচি কেস থেকে এক্স-রে প্লেট বার করল।] এই যে রোগীর প্লেট। ভাল করে দেখে বল।

শশিকান্ত। [প্লেট দেখে] এই রকমই সন্দেহ করেছিলাম। এসেন্ডিং কোলনের ঠিক মাঝামাঝি একটা ছায়া পড়েছে দেখেছ?

শচীকান্ত। ওটা কী ব্যাধি?

শশিকান্ত। মৃত্যু।

শচীকান্ত। [চমকে উঠে] মৃত্যু?

শশিকান্ত। এটা টিউমার নয়। ক্যানসার বলে আমার ধারণা। আর ক্যানসার রোগীর অনিবার্য মৃত্যু। তোমাদের ডাক্তারী শাস্ত্র কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না।

শচীকান্ত। [বিবর্ণ মুখে] মৃত্যুকে পিছিয়ে দেয়া যায় দু'এক বছর।

শশিকান্ত। সেটা পরীক্ষা-সাপেক্ষ। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে রোগী যেন তোমার

নিকট কোনো আত্মীয়। বিবর্ণ হয়ে গেছ। ডাক্তারী চোখে দেখ, এমন একটা ক্যানসার-কেসে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা মানে তাকে দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট দেয়া।

শচীকান্ত। [একটু থেমে, কতকটা বিড়বিড় করে।] কিন্তু রোগী যদি কষ্ট সহ্য করেও বেঁচে থাকতে চায়? এর নিজের কতগুলি ছোটখাট সাংসারিক কর্তব্য শেষ হয় নি। সেগুলি না হলে পৃথিবীর কারো ক্ষতি বৃদ্ধি নেই, হলেও কোনো রংদার মহত্ত্ব নেই। তার বাড়িতে তার ছেলেমেয়ে স্ত্রী তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। এ অবস্থায় মরেও সে নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। মরতে চাওয়া স্বার্থপরতা, সে তো পালিয়ে যাওয়াবই সমান।

[সামান্য বিরতি, শচীকান্ত সিগার ধরাল। শশী তার টেবিলেব সামনে দাঁড়িযে এটা ওটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। শ্রীমতী বান্নাঘবের দরজাটা একটু ফাঁক করে এদের আলাপ মাঝে মাঝে শুনছিল। এবার সে এক কাপ চা হাতে করে বেরিয়ে এল।

শ্রীমতী। চা খান। পাস করল পরীক্ষায় শশীবাবু?

শচীকান্ত। পাস করবে না? তুমি কী মনে করেছ আমি জানি না। এক একটি বংশে পাঁচ সাত পুরুষে সে বংশের সবগুলি গুণ আহরণ করে একটি ছেলে জন্মায়, শশী আমার তাই। তুমি শুনলে অবাক হবে রোগটিকে বেশির ভাগ ডাক্তারই টিউমার বলেছে, আমারও তাই ধারণা ছিল। কিন্তু এখনকার দিনের সব চাইতে বড় স্পেশালিস্ট এবং শশী—এরাই মাত্র বলতে পেরেছে দ্বিধা না করে, এটা ক্যানসার কেস। এটা জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নয়, অন্য একটা কিছু।

শ্রীমতী। তাহলে শশীবাবুর অবশ্যই ডাক্তারি পড়া উচিত।

শচীকান্ত। [একটু থেমে] কিন্তু এও যদি না হত, যদি শশী আমার মত সাধারণ একজন ডাক্তারই হত তা হলেও তার কি ডাক্তারি পড়া উচিত নয়? সন্তান সম্বন্ধে সব বাপমায়েরই একটা পরিকল্পনা থাকে। আমারও ছিল। তোর ছোট ভাই নেপু এখনও বলে, বড়দা ডাক্তার হলে তোমরা দুজনে কনসাল্ট করতে পারবে। আমিও বলি কঠিন রোগী হলে আমি যদি ঘাবড়ে যাই, তোর বড়দাই তো পাশে এসে দাঁড়াবে।

শশীকান্ত। কিন্তু—

শচীকান্ত। কী কিন্তু?

শশিকান্ত। ওসব বীভৎস জিনিস নিয়ে, শুধু মৃত্যুকে সম্মুখে রেখে জীবনের প্রত্যেকটি দিন আমি কাটাতে পারব না। পৃথিবীময়,রোগী ছড়ান এ ভাবতেই আমার গা শিউরে ওঠে। কেন পারে না মানুষ গাছপালার মত সজীব প্রাণবন্ত হয়ে বাঁচতে?

শচীকান্ত। কেন পারে না তার আবিষ্কার হয়তো একদিন ডাক্তাররাই করবে। আজ আয় একটা ল্যানসেট আর কিছু কুইনাইন দিয়ে পৃথিবীর কিছু যন্ত্রণার লাঘব করা যায় কিনা দেখি।

শশিকান্ত। জানি সমাজে বাস করতে হলে জগন্নাথের রথের দড়িতে খানিকটা হাত দিতে হয়, কিন্তু আমি পারি না। পথের একপাশে অকাজের কাজ নিয়ে সময় কাটাতে চাই। আটপহর দিনভরে শুনছি কত বিচিত্র ধ্বনি, সে কথা বলতে চাই, খুব চেঁচিয়ে বললেও বলা হয় না। কিন্তু ডাক্তার হয়ে আমি কী করব? তারপরই বা কী হবে?

শচীকান্ত। সবাই যা করে তাই করবি। ঠিক যা বলতে যাচ্ছিস—আর সকলের মত তেমনি তুই অর্থোপার্জন করবি। যারা তোর মুখ চেয়ে আছে, যারা একদিন তোকে আশ্রয় কববে, তোকে আঁকড়ে বাঁচতে চাইবে, তাদের বাঁচাবি।

শশিকান্ত। শুধু বাঁচা আর পরিবার পালন করা?

শচীকান্ত। তোর বুড়ো বাপ-মা, ছোট ভাইবোন ..। আমার পেনশন নেবার বয়স হয়েছে।

শশিকান্ত। আমি?

শচীকান্ত। হ্যাঁ, তুই। তোর দৃঢ় শরীব আর সতেজ মন নিয়ে সকলেব আগে দাঁড়াবি। সব চাইতে বেশি সইতে হবে তোকে। বাড়ির বড় ছেলে তুমি। তুমি ছেলে--মানুষ নও শশী। সংসারটা দেয়া-নেয়া ছাড়া কিছু নয়। কেউ দাম না নিয়ে ছাড়ে না। বাপ-মায়ের প্রতি, ভাইবোনদের প্রতি তোমার কি কোনো কর্তব্যই নেই?

[শশী চঞ্চল হযে ঘরেব ভিতব এক চক্কব ঘুবে এল। কী বলতে গেল, তাবপব কাছে জানলাব কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাইবের দিকে চেয়ে রইল]

শ্রীমতী। আপনাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছে। দেখে মনে হয় শরীব ভালো নয়। স্নান আহার করে পরে আলাপ করলে হয় না?

শচীকান্ত। পৃথিবীর সব কাজই কি পবে করা চলে বাছা?

শশিকান্ত। [হঠাৎ ফিবে দাঁড়িয়ে।] কেন আমি নিজের খুশি মত বেড়ে উঠবার সুযোগ পাব না? কেন সমাজের ইচ্ছায় আমাকে চলতে হবে? [এগিযে এসে] কেন সমষ্টির ইচ্ছা আমার বুকে জগদ্দল পাথর হযে থাকবে?

শ্রীকান্ত। কোথাও কি কাউকে নিজেব খুশি মত বাঁচতে দেখেছিস? শুনেছি কোনো কোনো দেশে নিজের মত জীবিকা নির্বাহের পথ করার সুযোগ আছে। আর কোনো কোনো দেশে নাকি সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের সহায়তাও আছে, কিন্তু সে সব দেশেও এই জীবিকা পছন্দের ব্যাপারে রাষ্ট্রেব কর্তৃত্ব আছে, মতামতের ব্যাপার আছে

শশিকান্ত। তাই বলে একটা মিডিওকার জীবন ভগবান, ভগবান, আমি পারবো না। বাবা, তুমি আমাকে ডাক্তারি পড়তে বল না।

শচীকান্ত। বাপ-মার উচিত তার ছেলেকে ইচ্ছামত বাড়তে দেয়া। মুখে তাবা অন্য রকম বলে বটে কিন্তু ছেলে বড় হলে তাব সাহায্য পাবার গোপন ইচ্ছা বোধহয় অনেকেরই হয়।

[তিক্ত হেসে।] শুধু টাকার ব্যাপাব নয়। ছেলের যেমন নিজের খুশিমত বাঁচার ইচ্ছা হতে পারে, বাবারও তেমনি থাকতে পারে নিজেব জীবন সম্বন্ধে। বাবার জীবন ছেলেদের নিয়ে, কাজেই বাবা তার নিজের জীবন পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে ছেলের জীবন পবিকল্পনা করে। সেটা করতে না পারলে নিজের জীবনকেই ব্যর্থ মনে করে। কিন্তু অমন মুখ নীচু করে থাকিস না শশি। ফিরে গিয়ে আমি শান্তি পাব না।...তুই চিন্তা করে দেখ, আমিও তোর কথা বুঝতে চেষ্টা করি।

সামান্য বিরতি

শ্রীমতী। এত বেলায় ফিরে যেতে আপনার কষ্ট হবে কিন্তু।

শচীকান্ত। না, তেমন কিছু নয়। কিন্তু শশি, দু'এক বছরের মধ্যে যাতে অর্থ হবে এমন পথ ছাড়বার আগে আর একবার ভেবে দেখিস।

[টেবিলেব উপর এক্স-রে রিপোর্ট ছিল, ছবি ছিল। অন্যমনস্কভাবে শশী সেগুলো নাড়াচাড়া করছিল, তুলে দেখছিল। সহসা রিপোর্টটায় তার চোখ যেন আটকে গেল।]

শশিকান্ত। বাবা, কেমন ভুল করেছে রিপোর্টে দেখেছ?

শশীকান্ত। ভুল? না না ভুল নয়, ও কিছু নয। দে, দে তুলে রাখি।

শশিকান্ত। শচীকান্ত রায়! (রিপোর্টে পেশেন্টের নাম পড়ে) বাবা, এ রিপোর্ট তোমাব?

শচীকান্ত। পাগলামি করিসনে। (রিপোর্ট কেড়ে নিয়ে পকেটে পুরল।) ও কিছু নয়।

শশিকান্ত। বাবা, তোমার ক্যানসার হয়েছে?

শ্রীমতী। কী সর্বনাশ, আপনার! সে জন্য এত ক্লান্ত বোধ হচ্ছে আপনাকে।

শশিকান্ত। [গলার স্বর কেঁপে গেল] এত কষ্ট সহ্য করেও তুমি সংসার চালিয়ে যাচ্ছ। নিয়মিত টাকা পাঠাচ্ছ আমাকে। নিজের চিকিৎসার ব্যবস্থা—

শচীকান্ত। দেখ শশে, জ্যাঠামি করিস নে। উনি এলেন বাপের চিকিৎসা করতে।

শশিকান্ত। ক্যানসারের কষ্ট—

শচীকান্ত। ভারি তো নতুন কথা বললি। তোব এখানে বসে আছি একবারও টেব পেয়েছিস? ওটা আমারই নিজের একটা প্রেসক্রিপশন, বুঝলি? মরফিয়ার বেসে অন্য কয়েকটি। রবীন শুনে বলে পেটেন্ট কব। একবার খেলে প্রায় দেড়ঘণ্টা যন্ত্রণা টের পাওয়া যায় না।

শ্রীমতী। কিন্তু আপনার তো বিশ্রামের প্রয়োজন, চিকিৎসাব প্রয়োজন।

শচীকান্ত। [হেসে] সব প্রযোজন সব সময়ে মেটে না, মা লক্ষ্মী।

শশিকান্ত। এদেশে ওর চিকিৎসা নেই। তুমি এখনই ব্যবস্থা কর য়ুরোপে যাওয়ার, না, কোনো কথাই শুনব না। আমি আজই তোমার সঙ্গে ফিরব। মা কি এসব জানেন না?

শচীকান্ত। [ধমকের সুবে] দেখ শশে, যে যাব কাজ করবে। আমি চাই না তোমরা আমার বা তোমার মায়ের কর্তব্য স্থির করতে এস।

শশিকান্ত। তুমি কি টাকার জন্যে—

শচীকান্ত। সে সব কিছু নয়। অনেক ভেবেচিন্তে পৃথিবীতে কাজ করতে হয়। শোন, আমি যাচ্ছি। ট্রেনের সময় হয়ে আসছে। তুমি যা কর ভেবেচিন্তে করবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডাক্তারি পড়বে তুমি আমার কথায় এ আমি চাই না। সেও আমার ভালো লাগবে না। আমার মনে হচ্ছে তোমার কিছু যুক্তি আছে।

শশিকান্ত। তুমি দাঁড়াও বাবা, গাড়ি ডেকে আনি।

শচীনকান্ত। আরে দূর! রোদে তুই কোথায় যাবি? আমি এটুকু হেঁটেই যেতে পারব।

শ্রীমতী। আপনাকে কিছু বলব এমন কোনো দাবি আমার নেই, কিন্তু—

শচীকান্ত। আজকালকার মেয়েরা আগের মত লজ্জাশীলা নয়। অবশ্য তার জন্যে খুব বেশি ক্ষতিবৃদ্ধি হবে বলে মনে হয় না। রস। [এটাচি কেস খুলে সহসা একটা নেকলেস বার করল] এই নাও, ধর দেখি। [শ্রীমতীর হাতে গুঁজে দিল।]

শশিকান্ত। মার নেকলেস!

শচীকান্ত। যেমন বুদ্ধি তোমাদেব। তোমাব মা বললেন—এখানে এটাব তেমন দাম পাওযা যাবে না, শহবে গিযে বিক্রিব চেষ্টা কব।

* শশিকান্ত। বাবা।

শচীকান্ত। কী?

শশিকান্ত। তোমাব চিকিৎসাব টাকাব জন্য মা বিক্রি কবতে পাঠিযেছেন।

শ্রীমতী। আমি—আমি

শচীকান্ত। [হেসে] তুমি কী? তুমি কী কববে? এদিকে এস তো।

[শ্রীমতী কাছে এল। শচী নেকলেসটা পবিযে দিল।] যেমন বুদ্ধি, ক্যানসাব টাকায সাবে? * তা এটা বিক্রিব চাইতে ভালো হল। স্ত্রীব গহনা বিক্রি কবতে কাব ভালো লাগে বল? [হেসে] সে যেন নিজেকে অপমান কবা। কিন্তু শোন বাছা, আমাব মনে হয এখুনি সদ্য সদ্য বিযে কবা ভাল হবে না তোমাদেব। একটু অপেক্ষা কোব, শশে একটা উপার্জনেব পথ করুক। —না, না, খবদ্দাব ঘব থেকে বেরুবিনে। এ বোদ্দুবে অসুখ কবে।

[শচীকাণ্ড অদৃশ্য হল]

শশিকান্ত। [চিৎকাব কবে।) বাবা—

[নেপথ্যে] না, না।

[শশিকান্ত ফিবে দাঁড়াল, দাঁত দিযে ঠোঁট চেপে ধবে সে কান্নাব চেষ্টা কবতে লাগল। শ্রীমতীব চোখ দিযে টপটপ কবে জল পডতে লাগল।]

যবনিকা

* অন্তঃস্থিত অংশ লেখক কর্তৃক স্বহস্তে উত্তবাযণেব পৃষ্ঠায (পৃষ্ঠা ২০) সংযোজিত। তাবিখ জানা যাচ্ছে না।

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রোৎসব

রবীন্দ্রনাথকে যখন স্মরণ করি তখন অন্য দুজন কবির কথাও আমার মনে পড়ে যায়। একজন জার্মানদের জাতীয়কবি গ্যেটে অন্যজন ফরাসিদের ভলতেয়র। গ্যেটে পৃথিবীব আধুনিকতম মহাকাব্যের রচয়িতা বলেই নয়, তুলনাটা এই জন্যে যে একটি জীবনের অজস্র সাহিত্যের দানে একটি ভাষাকে তিনি পৃথিবীর ভাষার মানচিত্রে নির্দিষ্ট রেখায় এঁকে দিয়েছেন। ভলতেয়র যে স্মরণে আসছেন তার কারণ একটু অন্যরকম। কাল যখন চার্চের চারদেয়ালের মধ্যে গতিহীন হয়ে একটি আলোকহীন হ্রদে পরিণত হবে বলে মনে হয়েছিল,—ভলতেয়র তখন তাকে মুক্তি দিয়ে সূর্যের আলোয় স্রোতস্নান কবেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের দান গ্যেটের দানের মতোই আমাদের ভাষাকে মৃত্যুত্তীর্ণ করেছে, আর তাঁর মণীষা আমাদের সংস্কৃতিকে এক আধুনিক সূর্যের আকাঙ্ক্ষায় ভূমিষ্ঠ করেছে। কিন্তু এই তুলনার ব্যবহাব করতে গিয়ে মনে হচ্ছে, এ ভাবেই কি রবীন্দ্র প্রতিভাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি? সূর্যেব কিরণ যেমন ধানের শিস্ এবং আপেলকে সমান স্নেহে ধন্য করে, রজনীগন্ধা ও আঙ্গুরকে যেমন তা সমান প্রীতি দিয়ে সার্থক করে—রবীন্দ্রপ্রতিভাও তেমন যাকে ছুঁয়েছে তাকেই সার্থক করেছে। কিন্তু এমন সব জনসমাগমে কী আমরা আলোচনা করব? সে কি তাঁব কবিতা কিম্বা নাটক, অথবা তাঁর গান কিম্বা জীবন? মনে হয় এই উপলব্ধির বিষয়গুলির জন্য আত্মসমাহিত তন্ময় ধ্যানের পথই শ্রেয়। আর এর অন্য কারণ এই যে, আমরা একটা পাহাড়ের শেষ চূড়ায় পৌঁছুবার উচ্চাভিলাষ নিয়ে যখন যাত্রা শুরু করি তখন নতুন নতুন চূড়ায় পৌঁছে তার নতুন নতুন দিঙ্‌মণ্ডল দেখে বিস্ময় ও আনন্দে ভাবি এই বোধ হয় চূড়ান্ত কিছু। কিন্তু শেষ চূড়ায় পৌঁছানোর পর সমগ্রের সেই বিরাট দিঙ্‌মণ্ডল যখন চোখের সামনে খুলে দেয় তখন ইতিপূর্বে যে দিগ্মণ্ডলগুলিকে অনুভব করা গিয়েছিল তাদের যেন অপূর্ণ মনে হতে থাকে। বস্তুত রবীন্দ্রপ্রতিভাকে তার বিভিন্ন প্রকাশের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে অনুভব করতে গিয়ে যে বিস্ময় ও আনন্দে আমাদের চিত্তগুণ প্রসারিত হয়, আমরা আশঙ্কা করি, রবীন্দ্রপ্রতিভার সামগ্রিক উপলব্ধির তুলনায় তাও হয়তো অকিঞ্চিৎকর।

তা সত্ত্বেও এমন জনসমাবেশের সার্থকতা আছে। এ সমাবেশ একটি সত্যের প্রতিকী প্রকাশ।

কিন্তু এ আলোচনা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার আগে আমাদের যে পরিস্থিতিতে এই সমাবেশ ঘটেছে তার সম্বন্ধে চিন্তা করে নেয়া দরকার। এ যুগটা তো শুনেছিলাম বিজ্ঞানের যুগ। কেউ কেউ বলেছেন গগনচারী মানুষের যুগ। কিন্তু সত্যি কি তাই? স্পুটনিক এবং তাদের আন্তর্জাতিক সমধর্মীরা সবাইতো সেই ভি, টু রকেটেরই বংশধর যা বিবর্তনের ফলে অতিকায় হয়েছে। আর তা হয়ে প্রভুকে বদলাতে পারেনি, এখনও রাজনীতির সর্বশ্রেষ্ঠ জল্লাদরূপেই পরিপুষ্ট হচ্ছে। এযুগকে সুতরাং রাজনীতির যুগই বলা ভালো। এ সত্যকে নানা রকমেই প্রমাণ কিন্তু করা যেতে পারে। আর এই রাজনীতির যুগে যারা সব চাইতে ক্ষমতাবান হয়ে দেখা দিয়েছে তারা জাতিতে ফিলিস্টাইন। এদিক দিয়ে একধরণের ভ্রাতৃত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পৃথিবীতে। রাজনীতির নেতারা যখন পরস্পরের সঙ্গে যুযুধান তখনও তাঁরা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা বিভিন্ন পোশাকের আড়ালে ফিলিস্টাইন বটে।

এখন, তাদের একটা স্বভাবধর্ম আছে। যা কিছু ভালো যা কিছু সুন্দর তার দিকে একটা আকর্ষণ বোধ করে তারা। রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের মধুসূদন যেমন কুমুর দিকে তার স্থূলহস্ত বাড়াবেই, তেমনি তারাও করে থাকে। তাব কারণ প্রেম নয়। লালসার দাহ হলেও একটা যুক্তি থাকতো।

তাদের এই স্পৃহার পিছনে যা থাকে তা হচ্ছে নিজের অন্তরের গভীর কালোকে যে কোন উপায়েই হক গোপন করায় প্রয়াস। একথা স্বীকার করাই ভালো যে সাহিত্যের বুকের উপরে রাজনীতির পুরস্কারের জগদ্দল চাপিয়ে তাকে নিজস্ব করার চেষ্টায় যেমন তারা উদ্যোগী আমাদের রবীন্দ্রচেতনার দিকেও তেমনি তাদের স্থূলহস্তের স্পর্শ এগিয়ে আসছে। যে হেতু রবীন্দ্রনাথের একটি প্রভাব আছে জনচিত্তে সে প্রভাবটিকে কাজে লাগানোও রাজনৈতিক ফিলিস্টাইনদের উচ্চাশা। আমি যখন অচলায়তনের বিপ্লবী রাজনৈতিক উচ্চকণ্ঠব্যাখ্যা হতে শুনি তখন স্মরণ করতে বাধ্য হই, এই বিপ্লবীরাই একসময়ে রবীন্দ্রনাথে গ্রহণযোগ্য কিছু দেখতে পায়নি তৎকালীন রাজনৈতিক থিসিসের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না বলে।

বস্তুত এটা এ যুগের লক্ষণ যে সর্বত্র রাজনীতিকে দেখতে হবে, রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। রাজনীতি এখন সিংহাসনে আসীন, সবই এমন কি ললিত কলাকেও তার আজ্ঞাবহ হতে হবে—এই যেন এ যুগের প্রতিজ্ঞা। রাজনীতি কি ভালো নয়? নিসন্দেহে তা ভালো। কুইনাইন ভালো—তা প্রয়োজনেরও। কিন্তু যে সারা দেহে কুইনাইন মেখে বেড়ায় তার জয়ঘোষণার জন্য তাকে কি সুস্থ বলি? কিমিতি কিম্বা পদার্থবিদ্যা কি মূল্যবান নয়? তাই বলে তার সূত্রগুলি কি সনেটে বিধৃত করতে হবে? তা যে হবেনা তা সাধাবণমানুষ জানে কিন্তু অসাধারণ রাজনৈতিক ফিলিষ্টাইনরা জানে না, এবং এই না জানাটাই তাদের জাতীয়তাব লক্ষণ। তাঁরা চান আমাদের মনকে বাঁধতে, এমনি এমন সব সমাবেশেও। কিন্তু মন সে বাঁধন সইতে পারে না, কারণ সে বন্ধন আনন্দের পরিপন্থী।

এই আনন্দ, যার ছোঁয়ায় আমাদের কথাগুলি সৌন্দর্য হয়, কল্যাণ হয়, আমাদের চোখে, সবচাইতে মূল্যবান। কারণ আমরা বিশ্বাস করি ভবিষ্যতে মানুষের সংজ্ঞা 'বিশেষ জাতের পশু' থাকবে না, মানুষের সংজ্ঞা হবে একটি আনন্দময় সত্তা। কিন্তু আনন্দ তো খণ্ডিত নয়, তা তো নির্ভর করে মানুষের মনের সেই বিপুল মুক্তিতে যেখানে সব বাধাই দূর হয়ে গিয়েছে। এখানেই রবীন্দ্র স্মরণের মহত্তম সার্থকতা। আমরা যারা সাহিত্য এবং ললিতকলার অন্যান্য প্রকাশের দিকে ঝুঁকে পড়েছি আমাদের পতাকায় সেজন্য রবীন্দ্রনাথের নাম লিখে নিতে চাই। কারণ রবীন্দ্রনাথই আমাদের এই পৃথিবীর শেষ কবি যিনি একটি আনন্দের প্রত্যয়ে পৃথিবীকে বিধৃত দেখেছেন।

এ বিষয়ে যুক্তি দেয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে। আমাদের এই সভায় যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবং নাটকগুলি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অভিজ্ঞ। কাজেই বাহুল্য হবে যদি এখন সেগুলিকে এখানে বিশ্লেষণ করা হয়। সুতরাং যা অনুভব কবেছি তা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হবো। মানুষের মনের এই মুক্তি সব রকমের ভয় থেকে নয় শুধু, সব রকমের মন্ত্র থেকেও, সাম্রাজ্যবাদীর শৃঙ্খল থেকে নয় শুধু, জাতীয়তাবোধের সংকীর্ণতা থেকেও। আনন্দের ভূমি যে আনন্দময় সত্তায় মানুষ একদিন ভূমিষ্ঠ হবে সেদিন রাজনীতি তার তরোয়াল এবং শৃঙ্খল নিয়ে লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকবে না শুধু, আনন্দের পাদপীঠে স্থান চাইবে। রবীন্দ্রনাথ এখানেই মহোত্তম—যেখানে তিনি দীর্ঘ পরিক্রমার শেষে শিশুতীর্থে পৌঁছে নবজাতককে অভিনন্দন জানিয়েছেন চিরজীবিত বলে। মানুষের মনের বন্ধনক্ষয়ের শেষপর্বে আনন্দই বিরাজ করবে এই প্রত্যয়ই তো মানবতার প্রত্যয়। রবীন্দ্রনাথ এই প্রত্যয়ের কবি। আর আমরা যারা ফিলিষ্টাইন না হয়েও এই উৎসবে সমবেত হয়েছি—এটাই আমাদের আয়োজনকে ধন্য করেছে যে রবীন্দ্রনাথকে আনন্দের ভূমিতে অধিষ্ঠিত দেখতে পাচ্ছি।

প্রশ্ন হতে পারে মানুষ যদি আনন্দময় সত্তায় ভূমিষ্ঠ হয় তবু কি তা সার্থকতায় ধন্য হবে? আমাদের দুঃখজ্বালা সত্বেও, আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যলিপ্সার খণ্ডখণ্ড প্রত্যয় সত্ত্বেও আমরা স্মরণ করতে পারি, এই পৃথিবী দেবতার কাব্য, ইহার মৃত্যু নাই, ইহা ক্ষয় হয় না। রবীন্দ্রনাথ এই যুগে আবার এই সত্যে আমাদের বিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছেন, এটাই আমাদের রবীন্দ্রচেতনার সামগ্রিক উপলব্ধি হতে পারে।

সাহিত্যের ধারণা

কোন কোন সাহিত্যিকের কাছে কেন লিখি—এটা একটা সমস্যা হতে পারে। এ সমস্যার অর্থ এই নয় যে, লেখক হতাশ হয়ে পড়েছে লিখে কোন লাভ নেই দেখে। বরং যেন এমন একটা ঝোঁক আছে যে, হতাশা থাকা সত্ত্বেও লেখা হচ্ছে। এবং তারই কারণ অনুসন্ধান করেছেন অনেকে।

কোন কোন লেখক বলেছেন না লিখে উপায় নেই বলে লিখে থাকেন তাঁরা। তাঁদের এ কথা শুনে প্রথমেই যা মনে হয় সেটা হচ্ছে এই কেউ যেন কিছু যেন তাঁদের পেয়ে বসেছে, সেই লিখতে বাধ্য করে। এ ভঙ্গিটা পাঠক-সমাজকে অতীন্দ্রিয়ের সান্নিধ্যে এনে চমকিত করতে পারে, কিন্তু এ রকম কোন প্রেরণার উৎসে মানুষ আজকাল আর বিশ্বাস রাখে না। লেখকদের এ বক্তব্যেরই আর একটি রকমফের আছে। তাতে বলা হয়েছে অন্তরে প্রয়োজনের বেশি বাড়তি খানিকটা কিছু আছে বলেই সাহিত্য করা। সেই বাডতি কিছুর স্বরূপ নির্ধারণ কঠিন তো বটেই, কিন্তু বাডতি কিছু থাকলেই তা সাহিত্যের দিকে টানবে বা ঠেলে দেবে এমন নিশ্চয়তা দেখছি না। একই যুগে মানুষ এই বাড়তি কিছুর চাপে জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ হয় কেন? বাড়তি কিছু নিশ্চয় থাকে—সেটা অন্যের চাইতে পরিশ্রম বেশি করার সাহস ও সামর্থ্য—এক ধরণের বাড়তি জেদও যেন। কিন্তু এ বাড়তি কিছু পথ বলে দেয় না। পথে চলার শক্তি যোগায় বরং।

এ কথাটা সোজাসুজি বলে দেয়া ভালো, সাহিত্য করার পথটাকে আমরা সজ্ঞানে বাছাই করে নিয়ে থাকি। আব বাছাই করার ব্যাপারটা হয় পুরো মন দিয়ে। মনের চেতন বা অবচেতন অংশ কে কাকে কতটুকু সাহায্য করল এ ব্যাপারে তা বলতে যাওয়া বৃথা। সাহিত্যকে মন যখন সারা জীবনের সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করছে, তখন বাড়ির কে কতটুকু সাহায্য করবে, আয়োজনে কী তাদের প্রস্তুতি, সেটা নিয়ে বেশি আলোচনা করলে অতিথি বিড়ম্বিত বোধ করতে পারে।

বাছাই করাব কথা যখন বলা হয়েছে তখন এটা বুঝতে হবে সে আর যাই হক অন্তত অজ্ঞাতকুলশীল নয়। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—মানুষের বেলায় যেমন সাহিত্যের বেলাতেও তা হতে পারে—অনেকের কাছে যে অনেক ভাবে পরিচিত এবং সব পরিচয় যে-কোন একজনের জানা নয়। এটা স্বীকার করাই ভালো, তাব কোন পরিচয়টা সত্যিকারের পরিচয়, এ নিয়ে এখনও তর্কাতীত অবস্থায় পৌঁছানো যায় নি। কিন্তু এ কথাও সত্য, তার একটি পরিচয় সত্য বলে লেখকের কাছে প্রতিভাত হয়েছে, এবং সেটাই তার—কেন লিখির—উত্তর হতে পারে। এ বাছাই করার ব্যাপার থেকে আরও একটি বিষয় এই বলা যায় যে, লিখবার একটা উদ্দেশ্য আছে।

এ রকম একটা উদ্দেশ্যর কথা শোনা যায় সেটা হচ্ছে সৌন্দর্য সৃষ্টি। বলা হয়ে থাকে বহির্বিশ্বে সৌন্দর্য আছে—শিশুর হাসিতে, পাখির ডানায় চমকে ওঠা রোদে, কোন হিমবাহেব স্তব্ধ গাম্ভীর্যে। মহতেও আছে, ক্ষুদ্রেও আছে। মানুষ তার অনুকরণ করে যেমন অন্যান্য চারুশিল্পে, তেমনি সাহিত্যেও। তাহলে সৌন্দর্য সৃষ্টির কারণ কি এই অনুকরণ প্রবৃত্তি? পশুজগতে পরিবেশকে অনুকরণ করার একটা রীতি আছে—সেটা অনুকরণের জন্যই অনুকরণ করা নয়। আত্মরক্ষাই হেতু। আমাদের এই অনুকরণের ঝোঁক যদি অনুকরণের জন্যই অনুকরণ না হয়ে থাকে তবে তার সার্থকতা কোথায়? ঈশ্বর বহির্বিশ্বের সৌন্দর্যের স্রষ্টা। মানুষ ঈশ্বরের অনুকৃতিতে সৃষ্ট, সুতরাং ঈশ্বর যেমন বিশ্বজগতে সৌন্দর্য নিয়ে মাখামাখি করেছেন, আমরাও সাধ্যমত তা করে থাকি। ঈশ্বরের সৌন্দর্যসৃষ্টির হেতু

যেমন অনির্ণেয় আমাদের সৌন্দর্য-অনুকৃতির কারণও আমাদের কাছে তেমনি দুর্জ্ঞেয়। এ বলে কিছুক্ষণের জন্য প্রশ্নকে নির্বাক করে দেয়া যায় বটে। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস যার নেই, সে তবে সৌন্দর্য সৃষ্টি করবে কেন? অনুকৃতির যুক্তিটাকে রেখে বলা যায় প্রকৃতির কথা। মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম তাই প্রকৃতিকে অনুকরণ করে। কিন্তু ঈশ্বর থেকে প্রকৃতিতে আসা দুর্জ্ঞেয় থেকে পরিজ্ঞাতে আসার সামিল। ফুল সুন্দর কেন এর ঐশ্বরিক ব্যাখ্যা আর প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা এক নয়। ফুল সুন্দর, প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক বলবে, এইজন্য যে পতঙ্গকে আকৃষ্ট করতে হবে। সন্ধ্যার মেঘ সুন্দর এই জন্য যে সূর্যের আলোটা বিচিত্রভাবে পড়েছে মেঘে। দেখা যাচ্ছে সৌন্দর্যের কারণ আছে প্রকৃতিতে, উদ্দেশ্যও আছে কোন কোন ক্ষেত্রে। এ থেকে এ রকম একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানর দিকে ঝোঁক দেখা দিতে পারে—ঐশ্বরিক দুর্জ্ঞেয়তার কিম্বা প্রাকৃতিক পরিজ্ঞাতত্বের শিল্পে সৌন্দর্যসৃষ্টিরও একটা উদ্দেশ্য আছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যসৃষ্টির মূলে তো হয় সমপাতন, নতুবা আত্মবৃদ্ধি নতুবা বলতে হয় মানুষ বহিরঙ্গটুকুই অনুকরণ করতে পেরেছে, অন্তরঙ্গ অনুকরণ করার শক্তি তার নেই।

তা সত্ত্বেও, এ রকম শোনা গেছে, সৌন্দর্যই শেষ কথা। সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যই সৌন্দর্যসৃষ্টি! এ মত মানতে হলে বলতে হবে বহির্বিশ্বে যে সৌন্দর্য রয়েছে তা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এবং যথেষ্ট নয় বলেই এ ধরণের সৌন্দর্য সৃষ্টির একটা সার্থকতা আছে। যথেষ্ট হত যদি বহির্বিশ্ব, সে সার্থকতা থাকতো না। কিন্তু এ যুক্তিটাকে খুব সবল বলে বোধ হয় কেউই উপস্থাপিত করে না। কারণ এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মতো মাথা তুলে দাঁড়ায়—যে বহির্বিশ্বের ব্যপ্তি ও গভীরতাব অনুভবকে অ-যথেষ্ট বলার মতো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে বলা যায়, সৌন্দর্যকে সৌন্দর্য হিসাবেই দেখতে গেলে সেটা বহির্বিশ্বে প্রতিভাত সৌন্দর্যেব হেরফের। হয়তো ফটোগ্রাফ না হয়ে চিত্র। কিন্তু মনে রাখতে হবে চিত্রও এক রকমেব অনুকৃতি। যদি পরিপূর্ণতাই যথেষ্ট বিবেচিত না হয়, তার একটা অংশের অনুকৃতি কি করে তা হবে?

এ যুক্তিটাকে অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা কবেই বরং, সৌন্দর্যবাদীরা বলে থাকে—সৌন্দর্য এই জন্যই যে সৌন্দর্যই সত্য, এবং কেউ কেউ আর একটু এগিয়ে গিয়ে বলেছে—তাই কল্যাণ। (আর এ বলা থেকেই কি প্রমাণ হয়, সৌন্দর্য তখনই দাঁড়াতে পারে যখন তা সত্য এবং কল্যাণ?)

এ যুক্তিটাকে বুঝতে হলে, আগে সৌন্দর্য, সত্য এবং কল্যাণের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হয়। সেটা এক দার্শনিক দুরূহতা—যার শেষ নেই।

বলা বাহুল্য সৌন্দর্য, সত্য এবং কল্যাণ সম্বন্ধে এতক্ষণ যা বলা হল, তা শব্দগুলির সাধারণ-গ্রাহ্য বোধের উপরে নির্ভর করেই। বিশুদ্ধ সত্য বা কল্যাণ অথবা সৌন্দর্যের সংজ্ঞা দেয়া কঠিন হলেও, দেয়া যায়, এবং বিশুদ্ধ অবস্থায় সেগুলিকে বুঝবার মতো মনকেও আমরা কল্পনা করতে পারি। এবং হয়তো সেই বিশুদ্ধ অবস্থায় সত্য, সৌন্দর্য ও কল্যাণ একই হয়ে ওঠে। কিন্তু দুটি কারণে সাহিত্যে সেই বিশুদ্ধত্বের স্থান নেই। প্রথম কারণ এই যে, সেই বিশুদ্ধত্বে পৌঁছালে সৌন্দর্য, কল্যাণ ও সত্যর বোধ পৃথক থাকে না। যেখানে সত্য এবং অসত্যে, কল্যাণ ও অকল্যাণেও পার্থক্য নেই, সুন্দর ও অসুন্দরের প্রভেদ সেখানে লুপ্ত। দ্বিতীয়ত এই বিশুদ্ধত্ব নিয়ে সংসারে এবং সাহিত্যে দু-পাও চলা যায় না। পক্ষান্তরে এ কথাও সত্য, সৌন্দর্য, সত্য এবং কল্যাণের বোধ জনে জনে পৃথক। কিন্তু এ সত্যকেও আমরা সংসারে ও সাহিত্যে গ্রহণ করি না। তার কারণ আমার এবং আমার পাঠকের বোধে পার্থক্য আছে, এই যদি ধরে নিই, আমার কথা বলা হয়ে দাঁড়ায় নিরর্থক। আমার কল্যাণবোধ যদি রাষ্ট্রের অন্য সকলের কল্যাণবোধ থেকে পৃথক হবে বলে মনে, করি রাষ্ট্রের জন্য আমি কিছুই করতে পারি না। রাষ্ট্রের বেলায় আমি যদি ধরে নিই, আমি যাকে কল্যাণ ভাবছি অন্যেও তাকেই নিজের কল্যাণ বলে গ্রহণ করবে তবেই কল্যাণ করার দিকে আমরা অগ্রসর হতে পারি। কিন্তু স্বীকার করা ভাল, একই রাষ্ট্রে শ্রেণীতে শ্রেণীতে কল্যাণবোধ পৃথক ; এমনকি একই

শ্রেণীতে কল্যাণকে আত্মীকরণের পার্থক্য কল্যাণকে পৃথক করে।

সাহিত্যে তেমনি একজন বিদগ্ধ পাঠক কল্পনা করে নিয়ে কথা বলা হয়—যার বোধ সাহিত্যিকের বোধের সঙ্গে সমান। এবং তার বোধকেই সাধারণগ্রাহ্য বোধ করতে হয়, কারণ সেই সব পাঠক সাধারণের প্রতিভূ। এ দিক দিয়ে বিচার করা যেতে পারে। সুন্দর ও সত্য কি এক? সত্য তো অপ্রিয়ও হতে পারে, এবং অপ্রিয় বিষয়কে কখনও সুন্দর বলা হয় না। সুতরাং সত্য মাত্রই সুন্দর নয়। শরীরের ভিতরে অনেক সত্য যা আদৌ সুন্দর নয়। প্রিয় মিথ্যাও আছে। 'সুন্দর' একটা সুপ্রকাশিত মিথ্যাও হতে পারে? সুরার প্রিয়তাকেই উদাহরণ হিসাবে নেয়া যেতে পারে। কারো কারো কাছে সুরা নিশ্চয়ই প্রিয়। সুরা বলাধানের ভ্রান্তি জন্মায়। সুন্দর বং সত্ত্বেও অসত্যর উৎস। এটা কি সুন্দর অসত্য বলে নেয়া যায় না? মৃগতৃষ্ণিকাকেও এখানে বিষয় হিসাবে নেয়া যেতে পারে। মৃগতৃষ্ণিকা সুন্দর—দৃশ্য হিসাবে নিশ্চয়ই, এবং তা মৃগতৃষ্ণিকা হিসাবে সত্যও বটে। কিন্তু নীল বনরাজির সুজল আশ্বাস হিসাবে তার চাইতে মিথ্যা আর কী আছে, কিম্বা তার চাইতে ভয়ঙ্কর অকল্যাণই বা কী হতে পারে?

সব 'সুন্দর' সত্য নয়, এবং কল্যাণের কিনা তাও সন্দেহ আছে। 'সুন্দর' কল্যাণেরই বা কি করে হবে? শোনা গেছে নির্ঝরের মর্মর-জাত সৌন্দর্য কোন রমণীর মুখাকৃতিতে ছাপ রেখেছে। বলা বাহুল্য এটা চিরায়ত সার্বজনীন সত্য হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছে না। কিন্তু সীমায়িত সত্য হিসাবেও এ কবি-চিন্তার কতটুকু তাৎপর্য? লুসির মুখে যে শান্তির স্নিগ্ধতা দেখতে পাচ্ছি সেটা কি সে নগরে এসে পৌঁছালেও থাকবে? অন্য কথায় সৌন্দর্য যে কল্যাণ করেছে লুসির সেটা কি একটা কাব্যগত প্রত্যয় মাত্র নয়? যেহেতু সে প্রকৃতির কোলে মানুষ হয়েছিল, তার সেই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য-উপজাত কল্যাণ কি তাকে পথ দেখাতে পারবে? কপালকুণ্ডলাকে পেরেছিল? সৌন্দর্য কল্যাণে পৌঁছে যাচ্ছে, এব অন্য একটি উদাহরণও দেখানো হয়ে থাকে। গ্রীক সূরীরা বলেছে ট্র্যাজেডির বেদনাগূঢ় সৌন্দর্য মানুষকে বেদনা সম্বন্ধে সচেতন করে, মঙ্গল ও অমঙ্গলের পথের উদাহরণ তুলে ধরে মানুষকে কল্যাণ চিনতে সহায়তা করে। কিন্তু প্রকৃতই কি সেটা সৌন্দর্যের অবদান? একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে কল্যাণ যা করে সেটা ট্রাজেডিতে বর্ণিত মানবিক অভিজ্ঞতা। এবং অভিজ্ঞতা হিসাবে তা যে খুব সুন্দর তাও নয়।

যা কিছু সুন্দর তাই সত্য এবং কল্যাণের এটা বলা যেমন বিপজ্জনক, কোন 'সুন্দর'ই সত্য এবং কল্যাণের নয় বলাও তেমনি ভ্রমাত্মক। এমন কোন কোন প্রান্তিক উদাহরণ আমরা কল্পনা করে নিতে পারি, যেখানে একটি বিষয় যতখানি সুন্দর ঠিক ততখানি সত্য এবং ততখানি কল্যাণ। তা হলে সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি এই প্রান্তিক উদাহরণ সৃষ্টি করা?

বরং এর বিপরীতটাই যেন সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়। সাহিত্যে সৌন্দর্য, সত্য এবং কল্যাণ সর্বত্র সমানভাবে বিরাজ করছে, এটা আমাদের অভিজ্ঞতা নয়। রামায়ণে সৌন্দর্য আছে, কল্যাণও বলতে পারি তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা করে, কিন্তু সত্য? এ কথা আমরা বহুবার শুনেছি অযোধ্যার রামের চাইতে বাল্মিকীর রাম অধিকতর সত্য। অযোধ্যার রাম ও বাল্মীকির রাম পৃথক সত্য হতে পারে, কিন্তু একে অন্যের চাইতে অধিকতর সত্য হবে কেন? কাব্যে প্রোথিত সুন্দরতর বলে? তাই যদি হয় তবে সেটা বৃত্তে ঘুরে ক্লান্ত হওয়ার সামিল হবে—যেহেতু সুন্দর সেজন্যই সত্য, এই হবে একমাত্র ন্যায়। রামায়ণে সত্যকে বরং যেন দ্বিধাগ্রস্ত দেখতে পাই। কখনও 'সুন্দর'কে স্থান করে দেবার জন্য কখনও বা কল্যাণের শাসানিতে সত্য আত্মগোপন করেই থেকেছে। বলা বাহুল্য রাবণ দশমুণ্ড হওয়াতে আমাদের সত্যবোধ পীড়িত হয় না। রাবণের কেন পরাজয়? সে পাপী বলে? পাপী কী পৃথিবীতে পরাজিত হবেই এমন কোন কার্য-কারণ তত্ত্ব আছে? পাপ কী? তথাপি রাবণের পক্ষেও মৃত্যুটাই কল্যাণ—এই তত্ত্বই যেন প্রতিভাত হয়। আর এটা শুধু প্রাচীনকালেই

হয়েছে তা নয়। আধুনিকতর দিনে সেকস্‌পীয়রীয় চিন্তায়, 'সুন্দর' সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য নয়, এমন ক্ষেত্রেও কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্ন সু-কুএর নাম নিয়ে সত্যকে বিড়ম্বিত করেছে। লিয়র তার নির্বুদ্ধিতায় জন্য যখন বিব্রত বিড়ম্বিত, গ্লস্টার তার অসম্বৃত প্রবৃত্তির হাতে যখন নিহত, তখন সীমায়িত মানবিক চেতনার জন্য আমরাও হাহাকার করে উঠি। কিন্তু সেই অলোকসম্ভব সৌন্দর্য এবং আংশিক কল্যাণবোধের মধ্যে এই প্রশ্নও জেগে ওঠে এই অব্যবস্থিতচিত্ত চরাচরে 'কু' কি পরাজিত হয়? অন্যায় কি বিজয়ী হয় না, অন্তত ততবারই যতবার ন্যায় জয়লাভ করে?

বস্তুত সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ রকম ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, সুন্দর, কল্যাণ ও সত্যকে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত করার স্পৃহা কালের সঙ্গে সঙ্গে কমে আসছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও গর্কি কল্যাণকে রক্ষা করতে গিয়ে সত্য ও সুন্দর থেকে ভ্রষ্ট, জোলা সত্য ও সুন্দরকে স্থান করে দিতে গিয়ে কল্যাণ থেকে বিচ্যুত, ফ্লবেয়ার, সত্য ও সুন্দরকে বিধৃত করে কল্যাণকে বিস্মৃত।

[এখানে বলে রাখা ভালো সাহিত্যে 'সুন্দর' বলতে তার ভাষার প্রাঞ্জলতা প্রভৃতি গুণাবলীর সুষম প্রয়োগকৌশল, কিম্বা যথোপযুক্ত অলঙ্কারের সদ্ব্যবহার বোঝায় না। এগুলি সাহিত্যের এমন কতগুলি বহিরঙ্গ যা যে কোন শিল্পীকে আয়ত্বে আনতেই হবে, সাহিত্যের আসরে প্রবেশাধিকার পেতে হ'লে, তার সাহিত্যকে আলোচ্য হবার গৌরব পেতে হলে।]

এটা আমার বলবার উদ্দেশ্য নয় যে, সাহিত্যে সুন্দর কল্যাণ সত্যের অসম অবস্থিতি সাহিত্যের মূল্যহরণ করেছে। বরং বিপরীত। সাহিত্য, এই স্বীকৃতি পাওয়ার পক্ষে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের সমসহ অবস্থিতি অপরিহার্য নয়। আর এই বিষম অবস্থায় নিয়ে আসাটা, ব্যুৎপত্তিগত বা অন্য কোন অক্ষমতার ফলও নয়। বরং যেন পছন্দ করার ব্যাপার, পথ বেছে নেয়ার ব্যাপার। সাহিত্যিকের শিল্প যদি পাখির গান হত, বলা যেতো তাদের বৈচিত্র্য প্রকৃতিদত্ত, ওঁর উপর তার হাত নেই। পাখির গান পাখির সৃষ্টি নয়। সে বহন করেছে একটি ইতিপূর্বে নির্ধারিত সংঘটন। সাহিত্যিকের এমন সুবিধা নেই। তাকে কিছু বলতে হবে, এবং তা বলতে গিয়ে সে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের স্থির অবস্থানে আলোড়ন জাগিয়ে তোলে, বিচ্যুতি ঘটিয়ে বসে। আর এ সবই সে করে দায়িত্ব নিয়ে সজ্ঞান মানসে। শেক্‌স্‌পীয়র নিজে খুব ভালোভাবে জানতেন, নেমেসিস যদি সত্য হয়, পাপ যদি তার মৃত্যুবীজ নিজেই বহন করে, পৃথিবীতে পুণ্যের জয়ও বিশেষভাবেই দ্বিধাগ্রস্ত। করডেলিয়ার মৃত্যু হয়। আর করডেলিয়ার মৃত্যু হয় বলেই এই পৃথিবী ট্র্যাজিক। লিয়রের নিজের মৃত্যুর ব্যাপারটা সাহিত্যে স্বীকৃতি পাবার মতো উল্লেখযোগ্য নয়। আর ব্যাস জানতেন এই পৃথিবীতে পুণ্য বলো কিম্বা 'সু' বলো, তার বিজয়লাভের পথ আপাতত আত্মহনন বলেই মনে হবে, কিন্তু পৃথিবী ট্র্যাজিক কিছু বললেই শেষ কথা বলা হয় না। ট্র্যাজিক প্রাকনির্ধারণকে চেতনা দিয়ে লঙ্ঘন করার পরীক্ষায় নামার মতো উদার ব্যাপ্তিও আছে পৃথিবীতে। লক্ষ্যণীয়, ব্যাস এবং শেক্‌স্‌পীয়রের চেতনায় সু এবং কু এর দ্বন্দ্বে 'সু'এর দিকে তাদের পক্ষপাতিত্ব থেকে গেছে, যদিও তাঁরা জানতেন সু এবং কু-এর পরাজয়ের সমান সম্ভাবনা আছে। শেক্‌স্‌পীয়র কল্যাণবোধ 'সু'কে বিজয়ী করতে গিয়ে বেদনাদায়ক সত্যের সম্মুখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সুন্দরের খাতিরে সত্যকে উল্লঙ্ঘন করে নি। পক্ষান্তরে ব্যাস যেন জানতেন, একটা ট্র্যাজিক ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে যাওয়ার চাইতে জীবন গভীর। আর অনন্তকালের ব্যাপ্তির তুলনায় মানবীয় ক্লাইম্যাক্সের সংঘটন সময়টুকু এত অকিঞ্চিৎকর, যাকে সুন্দরের ও কল্যাণে খাতিরেও মূল্য দেয়া যায় না। সব ছেড়ে চলে যেতে হয়।

বস্তুত সত্য, কল্যাণ, সুন্দর প্রভৃতি যেন সাহিত্যিকের হাতে ধরা তুলির রং, কতটুকু কার প্রয়োগ হলে সাহিত্য তাঁর মনের মতো হয়ে ওঠে, অর্থাৎ তাঁর সাহিত্য-ভাবনা বিমূর্ত হয়ে ওঠে এ তিনিই জানেন। আমরা শুধু সম্পূর্ণটাকে দেখে মোহিত হতে পারি, আশ্চর্য—এই কথাটা বলে উঠতে পারি। আর তার বেশি সচেতন হওয়ার মতো যদি সামর্থ্য থাকে, সাহিত্যিকের সাহিত্য-ভাবনা আমার

নিজস্ব হতে পারে। এর এটাই হয়ত শেষ কথা, সাহিত্যের সার্থকতা। পাঠকের এই সংবিত্তি লাভ।

এরকম মত আছে, কিছু একটা সাহিত্যিক বলতে চান। এই পৃথিবীতে বাস করে এর অণুতে এবং সমগ্রতায় তিনি কিছু দেখে থাকবেন, অন্য অনেকে যা দেখে নি। সে কথাটাই তিনি প্রকাশ করতে চান। এবং যেহেতু সমগ্র চরাচরকে ভূর্জপত্র কিম্বা কাগজের পিঠে স্থাপন করা সম্ভব নয়, কলাকৌশল করে তারই ভ্রমোৎপাদন করতে হয়। এই ভ্রমোৎপাদনই তার আর্ট। তার হাতের রং হচ্ছে সত্য কল্যাণ ও সুন্দরের সাধারণগ্রাহ্য বোধ।

চিত্রণের উপমাটা রেখে আরও বলা যায়, রঙের প্রয়োগের তারতম্য শুধু পরিমাণগত নয়, আপাতন এবং গুণগতও বটে। তিন রং তেত্রিশ রং হয়ে দাঁড়াচ্ছে শিল্পীর হাতে। লোহিত যেমন একশ রকমের লাল হতে পারে, কল্যাণ বা সুন্দরও তাই হতে পারে। একেই অন্য কথায় কল্যাণ ও সুন্দর কিম্বা সত্যের বিভিন্ন মান আবিষ্কার বলা হয়ে থাকে। পিকাসোর ছবিতে কতখানি কোন আপাতনের কোন রং আছে, রেখার কোথায় কোন বক্রতার সুষমা,—এ কৌতূহল নিবৃত্ত হওয়ার পর, কারো কারো চেতনায় ধরা দেয় চিত্রটিতে বিধৃত পিকাসোর তৎকালীন নিজস্ব চেতনা। পিকাসোর সব প্রয়াস তখন সার্থক হয়, এবং চিত্রে বিধৃত পিকাসোর এই চেতনাই চিত্রটির ভাবরূপ। এই ভাবরূপকে এক চেতনা থেকে অন্য চেতনায় স্থানান্তরিত করা যেমন পিকাসোকে পিকাসো করে তেমনি সাহিত্যিককে নামের যোগ্য করে তোলে। সৌন্দর্যসৃষ্টি করা কিম্বা সৌন্দর্যকে সত্য ও কল্যাণ বলে প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য নয় সাহিত্যিকের। লিয়রের পরিণতি কিম্বা অন্য কারো পরিণতিই শেক্‌স্‌পীয়র নয়, পৃথিবীর ট্র্যাজিক ধারণাটাই সেক্‌স্‌পীয়র-চেতনা এবং সেটাই সাহিত্য এবং ততটুকুই যতটুকু পাঠকের আত্মীকরণ হয়।

কিন্তু এহো বাহ্য। ভাবরূপকে বা বিশেষ রূপ নিয়েছে এমন এক ধ্যানকে, স্থানান্তরিত করার এই প্রয়াস কেন? এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েই আবার নিজের অন্তরে ফিরে যেতে হয়। এই প্রয়াসের মূলে যে তাগিদ সেটাকে দুর্জ্ঞেয় বলে বোধ হতে থাকে। কেন হয় তার উত্তর নেই যেন। আব উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না বলেই ইতিপূর্বে অনেক বলেছে অনুকৃতির কথা। কিন্তু যা চরাচবে আছে তারই অনুকরণ? যেন—সর্বব্যাপী একটি চেতনা যে তাগিদে চরাচর সৃষ্টি করেছে সাহিত্যিকও সেই একই তাগিদে সৃষ্টি করে চলেছে। সেই সর্বব্যাপী চেতনার অংশ সাহিত্যিকের চেতনাও। সেজন্যই সাহিত্যিকের চেতনা এবং ধারণা-বিধৃত ঈশ্বরের চেতনার তাগিদও এক--সে তাগিদ নিজেকে আবিষ্কার করা। সর্বব্যাপী চেতনাই বা কেন করে এই প্রয়াস? আপাতত জনৈক ইহুদি দার্শনিকের মতো বলতে ইচ্ছা হয় · ত্রিভুজের তিন কোণ মিলে দুই সমকোণ হবেই। এটা অন্য কোন উপযুক্ত ভাষার অভাবে বলা যায় প্রকৃতিগত। তেমনি চেতনার এই আত্মানুসন্ধানও, সেই অর্থে ততখানি প্রকৃতিগত। এই আত্মানুসন্ধানের জন্য কখনও সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের প্রচলিত প্রত্যয়কে লঙ্ঘন করে করে সাহিত্যিক অগ্রসর হতে থাকে। পথে হয়তো পৃথিবীর ট্র্যাজিক ধারণাটা আবিষ্কার করা হয়। কিন্তু সেটাও শেষ কথা নয়।

কিন্তু ঈশ্বর একবার ভুল করেছিলেন। তিনি একটা প্রকল্প খাড়া করে সেটিকে পরে যেন প্রমাণ করতেও চেয়েছিলেন। মানুষকে তিনি ইডেন উদ্যানের চতুঃসীমায় আটকে রাখবেন ভেবেছিলেন। এটা যেন তাঁর আত্ম-আবিষ্কারের পথে ক্লান্তির চিহ্ন। ফল ভালো হয়নি। আত্মজের অসীম বেদনার মূল্যে সেই প্রকল্পকে নাকচ করাতে হয়েছিল। সাহিত্যিকরা যে অনুরূপ ভুল করে না তা নয়। মানুষকে কখনও কখনও প্রকল্পের ছকে ফেলে দিয়ে প্রাক্‌নির্ধারিত করার প্রয়াস করে সে। কিন্তু সাহিত্যিকের বারবার এই ভুল করে গেলে বোধ হয় চলবে না। তার আত্ম-আবিষ্কারের এখনও শেষ নেই। কোন প্রকল্প বলার সময় এসেছে—এ বলা শুধু ভুলই নয়। মনে রাখা বোধ হয় দরকার, আমাদের সমস্ত

প্রকল্প, এমনকি সত্য সুন্দর কল্যাণ সম্বন্ধেও, দাঁড়ায় বুদ্ধির উপরে। আর বুদ্ধি চেতনার একটা ক্ষীণাংশ মাত্র। নিজেকে আবিষ্কার করার ব্যাপারে বুদ্ধি খানিকটা বোধহীন। আর বুদ্ধি যে সত্তা-সারের সমগ্রতা ধরতে পারে না, দর্শন অনেকবার এ স্বীকারোক্তি করেছে। সেজন্যই আত্ম-আবিষ্কার আপাতদৃষ্টিতে দর্শনের "দায়" বলে ভ্রান্তি জন্মালেও মানুষ সাহিত্যের দিকে না ঝুঁকে পারে না।

কল্যাণ, সত্য ও সুন্দরের বোধ আত্মানুসন্ধানে চলতে চলতে পাওয়া, এমন হতে পারে, কিন্তু সেগুলিই উদ্দিষ্ট নয়। কেন এই আত্মানুসন্ধান, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা? হাতে বাড়তি সময় তার মনে বাড়তি কিছু তেজ আছে বলে? বরং এরকম মনে হয়, অতীন্দ্রিয় প্রেরণা না হক, কিছু একটা যেন বাধ্য করে এই অনুসন্ধানে। যা বাধ্য করে, তা এমন এক বোধ যে, দর্শন ইত্যাদি জ্ঞানবিজ্ঞান ইত্যাদি দিয়ে তো নিজেকে জানা হল না। সে সব দিয়ে যা জেনেছি তা আমাকে স্বস্তি দিচ্ছে না। সাহিত্য সৃষ্টির মূলে হয়তো এ অস্বস্তি থেকে দূরে যাওয়ার চেষ্টা।

সাহিত্য ও স্বাধীন চিন্তার দায়িত্ব

আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীর মনোরাজ্যে এখন নাকি সঙ্কট উপস্থিত। কোলকাতার বাইরে থেকে কানে আসছিল, এখন যেন কিছু অনুভবও করছি। এটার কারণ নাকি মুখ্যত চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ। এটা একটা ঘটনা, সঙ্কট আনবার মতো প্রচণ্ড ঘটনাই বটে।

কিন্তু এমনতর প্রচণ্ড ঘটনা কি আর ঘটে নি?

আমরা যাকে দেশ বলতাম তা যখন ভাগ হল, বহু লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হল, অথচ তারা মোঙ্গল, কালমুক বা তাতাবদের মতো শস্যশ্যামলা পৃথিবীর বিভীষিকা হল না, [কি করে এ ঘটনা আমাদের দেহে পোলিওর বিষের মতো বিস্তাবিত তা দেখতে পাচ্ছি] তখন মনোরাজ্যে সঙ্কট আসা সঙ্গত ছিল। তা আসে নি। অন্তত সে সময়ে কোন সাহিত্যিকের নেতৃত্বে কোলকাতা শহরের তাবৎ জ্ঞানীগুণী অধ্যাপক, ডাক্তার, শিল্পী, কবি, গল্পলেখক একত্র হয়ে ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণ কবে নি। করলে কী হতো সে আলোচনা এখন নিরর্থক। এ থেকে কি আমরা ধারণা করবো আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ছিলো না?

কথাটা বোধকরি একদিক দিয়ে সত্য। আসল কথাটা এই যে বুদ্ধিজীবী যার প্রতিশব্দ সেই ইন্টেলিজেন্সিয়া শব্দটা পলিটিকসের সৃষ্টি। প্রায়শই বুর্জোয়া শ্রেণীর একটা চিন্তাশীল অংশকে এই নামে অভিহিত করে কখনও তিরস্কাব, কখনও খাতির দেখিয়ে পলিটিকস কথাটাকে চালু করে দিয়েছে। এতদিন আমাদের চিন্তাশীল অংশটাকে শ্রেণী হিসাবে ধরে নিয়ে প্রকাশ্যে তার সঙ্গে সম্বন্ধ, মিলন অথবা বিরোধ স্থাপনের চেষ্টা কবেনি রাজনৈতিকরা, সে জন্যেই বুদ্ধিজীবীর সঙ্কট এমন ধরনের কথা আমাদের কাছে সুপরিচিত নয়। নতুন শুনছি বলে মনে হয়।

কিন্তু এটা আংশিক সত্য। প্রকাশ্যে না হলেও গোপনে রাজনীতি এবং চিন্তাশীল শ্রেণীর মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আঁতাত স্থাপনের চেষ্টা চলে আসছিল। (আর অগ্রসর হওয়ার আগেই রাজনীতি ও চিন্তাশীলতার পার্থক্য বলে নেয়া দরকার। চিন্তাশীলতার বিশেষ লক্ষণ, চিন্তার সসীমত্ব এবং অপূর্ণতার বোধ, নিয়ত আবিষ্কারের ইচ্ছা, তার ফলে যন্ত্রণা ও বিস্ময়। রাজনৈতিকের এগুলো থাকে না। বলে রাখা দরকার রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞানী এক কথা নয়। কারণ তার সত্য তার ডগমাকে বিপর্যস্ত করে না, সে প্রায়শই শেষ সত্যে পৌঁছে গিয়েছে, এবং তাকে পেয়ে স্বার্থপরতা এবং সুবিধাবাদের কাঁচিতে তার ডানা ছেঁটে দিয়েছে।) আঁতাতের কথা বলছিলুম। দেখা গিয়েছিল বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠি থেকে সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হয়েছে, প্রগতিবাদী এবং অপ্রগতিবাদী প্রযোজনায় কবি, ঔপন্যাসিক, চিত্রকর, গীতিকার এবং নট নড়াচরা করছেন। লক্ষ্য করা গেল এই আন্দোলনটার সঙ্গে ঐতিহ্যের যোগ নেই, কেমন যেন আমদানি করা, উপর থেকে চাপানো। কবিরা কাল্পনিক যন্ত্রণায় পীড়িত, ঔপন্যাসিক এমন একদল পাত্রপাত্রীকে টেনে আনছেন যাদের বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক চিন্তার প্রয়োগক্ষেত্রের বাইরে খুঁজে পাওয়া যায় না। এবং এক হাস্যকর পরিস্থিতিতে সুকান্তকে রবীন্দ্রনাথের চাইতে বড় প্রমাণ করার চেষ্টা হল এবং এক ট্র্যাজিডির নির্মম মুহূর্তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো জ্যোতিষ্ককে কক্ষচ্যুত হতে দেখলুম।

একদিক দিয়ে রাজনৈতিক চিন্তা প্রতিক্রিয়াশীলতার সারি। একজন যদি মন্ত্রী ঠেলে দেয়, অন্যে তবে পিল এগিয়ে না দিয়ে পারে না। সুতরাং সব রকমের রাজনৈতিক মতবাদের আঁতাত স্থাপন

করার মতো বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় খুঁজে বার করতে গিয়ে আমাদের দেশে বিশেষ পলিটিক্যাল অর্থে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বা ইন্টেলিজেন্সিয়া সৃষ্টি করা চলেছিল।

এখন এই আঁতাঁতটিকে বিশ্লেষণ করা দরকার। প্রয়োগক্ষেত্রে ও পক্ষদ্বয়ের চরিত্র বুঝতে পারলে—আঁতাঁতটার স্বরূপ বুঝতে পারা যাবে। প্রয়োগক্ষেত্র : পঞ্চাশ বছর ধরে শাসকের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শাসক ক্ষমতাচ্যুত হলে তার শাসন ব্যবস্থার আংশিক পুনর্বাসন, মিশ্র অর্থনীতি যা তীব্র বাম এবং গোঁড়া দক্ষিণের কাউকে খুশি করছে না। রাজনৈতিক পক্ষের চরিত্র : প্রকৃত চিন্তাশীলতার প্রতি আন্তরিক অশ্রদ্ধা এবং চিন্তাশীল শ্রেণীকে নিজের কাজে লাগানোর ইচ্ছা। সাহিত্যিকরা মানব হৃদয়ের স্থপতি, স্ট্যালিনের এই উক্তি এখানে স্মরণীয়। রাজনৈতিক কেন চিন্তাশীল লেখক সমাজের উপরে প্রভাব রাখতে চায় তা বুঝতে সুবিধা হবে। চিন্তাশীল শ্রেণীর চরিত্র : মানসিক হতাশা, এবং পরিশ্রমকাতর উচ্চাশা। স্থানকাল পাত্রের দিক দিয়ে সুতরাং আঁতাঁতের যাকে সুবর্ণসুযোগ বলে তা ছিল। এর সঙ্গে শুধু এই যোগ করে দিতে হবে যে, আমাদের দেশে এখনও সেই রসিক সমাজ সৃষ্টি হয়নি যা কবি, ঔপন্যাসিক, চিত্রকরকে তাদের হক বুঝিয়ে দিতে পারে। এরই ফলে আমাদের দেশে চিন্তাশীল শ্রেণী সৃষ্টির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তারা রাজনীতির সঙ্গে প্রকাশ্যে সাবসিডিয়ারি এলায়েন্সে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে আমরা যে প্রচণ্ড ঘটনার সম্মুখীন তা এই এলায়েন্সের ব্যাপারে একটা অস্থির অবস্থার সৃষ্টি করেছে। তারই ফলে রাজনীতি-সৃষ্ট চিন্তাজীবী সম্প্রদায়ের চিন্তায় সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

২

আমরা জানি সাবসিডিয়ারি এলায়েন্সে একটা আদর্শ ব্যবস্থা নয়। এবং সাধারণ আত্মসম্মান বোধ থাকলেই তা পীড়াদায়ক হয়। ইতিপূর্বে দুএকজনের ক্ষেত্রে মোহাপসরণ ঘটছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত ঘটনা বলে খুব একটা নজরে আসেনি। বর্তমানে যা ঘটছে এবং ঘটতে যাচ্ছে তাতে শ্রেণীগতভাবে উল্টো গাইতে হচ্ছে। এবং শ্রেণীগত মোহাপসরণ একটা সঙ্কটের রূপ নিচ্ছে।

অনেকদিন থেকে এঁদের মধ্যে যারা মার্কসের উপতত্ত্বে বিশ্বাস করেছেন, বিশ্বাস করছেন মার্কসলেনিনবাদী রাজ্য অযুদ্ধের উপাসক এবং অসাম্রাজ্যবাদী, বিশ্বাস করেছেন এবং করাতেও চেয়েছেন, তাঁরাই হঠাৎ এখন উল্টোটাই প্রমাণিত হতে দেখছেন। চীনেব এই যুদ্ধবাদী সাম্রাজ্যবাদিতা যেন প্রমাণ করছে মার্কসলেলিনবাদের মধ্যেও, অন্য সব পলিটিক্যাল মতবাদে যেমন, যুদ্ধবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ আছে। এটা একটা মানসিক যন্ত্রণার কারণ হতে পারে এবং তা নানাস্তরের চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছেই। তাঁদের একাংশে যত না বিশ্বাস করছেন, তার চাইতে ভান করেছেন বেশি। তাঁরা সহজেই উল্টো গাইছেন। কিন্তু অন্য অংশে যাঁরা সত্যিকারের বিশ্বাস নিয়ে এগিয়েছিলেন সঙ্কট প্রায় যন্ত্রণার রূপ নিয়ে এসেছে।

মার্কসলেলিনবাদকে পুরোপুরি গ্রহণ করেনি, তার সঙ্গে সহঅবস্থান করেছেন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এমন এক অংশ আছে। এঁরা অযুদ্ধবাদ, মানবীয় সম্ভ্রম, মানবতা প্রভৃতি কতগুলি মৌল বিষয়কে মূল্যবান মনে করেন। এঁরা মার্কসলেলিনবাদে ততটুকুই বিশ্বাস রেখেছেন যতটুকু তা প্রকৃত সাম্যের বাহক বলে মনে হয়েছে। যদিও এঁদের কাছে সে মতবাদ বিংশশতাব্দীর অপৌরুষেয় বাইবেল হিসাবে গৃহীত হয়নি। মার্কসলেলিনবাদী একটি রাষ্ট্রের মানবতাহীন জঙ্গী সম্প্রসারণবাদ তাঁদেরও আশাভঙ্গের কারণ ঘটিয়েছে।

এখানে একটি কথা বলে নেয়া দরকার। এটা মার্কস লেলিনবাদ সম্বন্ধে বর্তমান লেখকের মতামত নয়। এমন মার্কসলেলিনবাদী থাকতে পারেন যাঁরা প্রমাণ করতে উদ্যত আক্রমণকারী চীন প্রকৃত

মার্কসলেলিনবাদী নয়। পক্ষান্তরে এমন সুধীজনও আছেন যিনি বলেন মার্কসলেলিনবাদী পররাজ্য গ্রাস করে না, চীন মার্কসলেলিনবাদী সুতরাং চীন ভাবত আক্রমণ করেনি।

যাক সে কথা, বুদ্ধিজীবীমহলে তৃতীয় একটি অংশ আছে যারা মার্কসলেলিনবাদকে গোড়া থেকেই আর একটি মতবাদ মাত্র মনে করেছে। তাদের পক্ষে মার্কসলেলিনবাদে আত্যন্তিক বিশ্বাস না রাখার কারণ এই যে ইতিহাসে তারা দেখেছে যে কোন মতবাদে আত্যন্তিক বিশ্বাসের ফলেই ক্রুসেড, জেহাদ, ইনকুইজিসান প্রভৃতি ঘটে থাকে যা সব চাইতে বেশী দগ্ধ করে মানবতাকে। এদের মনোরাজ্যেও সঙ্কট উপস্থিত, কারণ এখন এই প্রতিরোধের প্রয়োজনে, জঙ্গীবাদী রাষ্ট্রকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে, তারাও জঙ্গীবাদীতে পরিণত হবে কিনা এমন প্রশ্ন জেগেছে তাঁদের মনে। কাবণ তারা মার্কসলেলিনবাদী না হওয়া সত্ত্বেও মানবতাবাদী, যদি এরকম কথা বলতে আপত্তি না থাকে। সুতরাং, যাঁরাই মানুষের জন্য ভাবেন তাঁদের চিন্তায় সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

৩

এ অবস্থায় আমরা যারা দর্শন অথবা সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত তাদেব প্রত্যেককেই ভাবতে হচ্ছে। তথাপি চিন্তাশীলদের কথা সাধারণভাবে বলতে বলতে হঠাৎ কেন সাহিত্যে চলে এলাম তা বুঝিয়ে বলার জন্য প্রসঙ্গান্তরে যেতে হবে। কারণটা এই নয় যে সাহিত্যের প্রতি আমাদেব পক্ষপাত আছে। সাহিত্যের পক্ষে যা সত্য চিত্রণের পক্ষেও তা সত্য, কিন্তু অন্য সব বিষয সম্বন্ধে নয। উদাহরণ দিচ্ছি। সঙ্গীতের কথা ধরুন। ইমন রাগ পাঠান, মুঘোল, ইংবেজ যুগে গাইবাব পব এই আমাদের যুগেও চলেছে। ওতে কখনও সঙ্কট আসেনি। যাকে আমরা সুন্দরতর ভাষার অভাবে আধুনিকসঙ্গীত বলে থাকি তাতে কিছু সঙ্কটের প্রভাব পড়তে পারে, কিন্তু তার কারণ তাব সঙ্গীতত্ব নয—যেখানে তা অনুকরণ নয়, সেখানে গানের কাব্যাংশে। সঙ্কট আরও নেই চিকিৎসক, ব্যবহাবজীবী প্রভৃতির বিশিষ্ট চিন্তার ক্ষেত্রে। আমাদের দেশে চিকিৎসাব কলাকুশলতা প্রয়োগ করতে বা আইনেব জ্ঞান মক্কেলের কাজে লাগানোর মধ্যে জাতীয়তা, অযুদ্ধ তজ্জাতীয় কোন কিছুরই প্রভাব নেই। যদি বলা যায় তাদের মনেও এ ঢেউ লাগছে এবং তাঁরা তা প্রকাশও করছেন, উত্তর এই হবে সেই বলাটা কি অপারেশনের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে অথবা পিনালকোডের কোনো উদ্ধৃতি করায়? যদি কোন ডাক্তার মনের যন্ত্রণা প্রকাশ করে থাকেন তবে সেই মুহূর্তেই তিনি সাহিত্যকর্ম করে বসেছেন অথবা দার্শনিক হয়েছেন। সুতরাং সাহিত্যিক এবং দার্শনিকদের কথা বললে তাদের কথাও বাদ পড়বে না। বাকি থাকল বৈজ্ঞানিক। এঁদের সম্বন্ধে সেই কথাই বলা যেতো চিকিৎসকাদি সম্বন্ধে যা বলেছি। এঁদের বিশেষজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে মানবতার কোন প্রশ্ন থাকে না। থাকলে তাঁদের বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চা ব্যাহত হতো। এবং যখন তাঁরা মানবতার কথা বলেন তখন তাঁরা ল্যাবরেটারির বাইরে। কিন্তু এদের সম্বন্ধে আমার অভিযোগও আছে। তাঁরা এখনও যুদ্ধযন্ত্র, গ্যাস, অ্যাটমবোমও তৈরি করে চলেছেন, বা সব করতে সাহায্য করছেন এবং পরে বলেছেন এটা খুবই খারাপ কাজ হয়ে গিয়েছে। অ্যাটমবোমা তৈরি করতে কেউ বাধ্য করেছে তাঁদের? কে সে? সে কি মৃত্যুর চাইতে বড়ো? বৈজ্ঞানিকদের মনে একটা সঙ্কট আছে ঃ সত্যকে তাঁরা আর অন্বেষণ করবেন কি না? অ্যাটমে পৌঁছানোর ফল ভালো হয় নি এমন যেন কেউ কেউ অনুভব করছেন। কিন্তু সে সঙ্কট আমাদের দেশে এখনও আসেনি, এবং আমরা যে সঙ্কটের কথা বলতে বসেছি তা থেকে তা বিশেষভাবেই পৃথক।

আসল কথায় ফেরা যাক, বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে ফিরি।

বৈজ্ঞানিকরা বলতে পারেন আমাদের তীব্র তিরস্কারের উত্তরে অ্যাটমবোমের প্রথম কল্পনা জার্মানদের, স্বজাতির গৌরবকে, আত্মশ্লাঘাকে সব প্রতিদ্বন্দ্বের উর্ধে স্থাপন করার জন্যে। এখন তার

চেন-রিঅ্যাকশন চলছে। এখন আত্মরক্ষার জন্য তারা সকলে অ্যাটমবোমা তৈরি করছে। ক্রমশ বড় হচ্ছে সে বোমা, জাতিগুলোর চাইতে তো বটে, মানুষজাতির চাইতেও। অ্যাটমবোমা তৈরি করাটাকে খারাপ বলছেন না, একবার তা করতে বসে কোথায় গিয়ে থামবেন তা স্থির করতে না পেরেই তাঁদের সঙ্কট। তাঁরা পরস্পরকে এবং আমাদের শুনিয়ে বলছেন আর বড় করা উচিত হবে না, তা হলে চূড়ান্ত খারাপটা ঘটবে। বলছেন না—এসো সবাই মিলে হাত গুটিয়ে নি বোমার কারখানা থেকে। মনে যদি কষ্ট থেকেও থাকে এখন তাঁরা নিরুপায়। যেন নিয়তি তাদের চোখ বেঁধে দিয়েছে। এটা সঙ্কটের চাইতেও ভয়ঙ্কর পরিণতি। সঙ্কটকালে মতিস্থির করতে না পারার ফল। অর্থাৎ জঙ্গী জাতীয়তাবাদকে অধিকার ছেড়ে দিয়ে, চিন্তার সঙ্কটের পাশ কাটিয়ে গিয়ে এখন তাঁরা রাজনীতির কর্মচারীমাত্র।

সঙ্কটটা তার প্রকৃতরূপে নেই, ব্যথার রূপ নিয়েছে। এ থেকে কিন্তু সঙ্কটটাকে চিনতে পারা যায়, ক্ষতচিহ্ন থেকে যেমন ক্ষতকে।

আমাদের দেশে সাহিত্যিকদের মনে যে সঙ্কট তার রূপ এমনই কতকটা বটে। মার্কসলেলিনবাদীর মধ্যে যাদের মোহাপসরণ হয়েছে তাঁরা এবং মানবতাবাদীদের মধ্যে যাঁরা মার্কসলেলিনবাদে বিশ্বাস রাখেন নি তাদের মনেও সঙ্কট দেখা দিয়েছে, কারণ যুদ্ধকে জঙ্গীবাদকে, সম্প্রসারণকামিতাকে তাঁরা ঘৃণা করেন এবং অনেক দূর থেকে হলেও পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিকদের যন্ত্রণাকে তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন। তাঁদের মনে আশঙ্কা হয়েছে জাতীয়তাবাদ তাঁদের নিয়তির মতো বেঁধে ফেলবে কি না।

৪

সঙ্কটকে এড়ানো যায় না বলেই আমাদের ভেবে দেখা দরকার জাতীযতাবাদ কী, কী তার উপাদান, তার সঙ্গে মানবতাবাদের প্রকৃতিগত বিরোধ আছে কিম্বা নেই, জাতীয়তাবাদী হলেই অযুদ্ধকে ত্যাগ কবা অপরিহার্য কিনা অথবা জাতীয়তাবাদ মানবমুক্তির পথেব কাঁটা কি না।

জাতীয়তাবাদ এই কথাটাকে এত আলগাভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যে কথাটার সংজ্ঞা দেয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এক অর্থে জাতীয়তাবাদের মতো জঘন্য সংস্কার আর নেই। সে অর্থে রবীন্দ্রনাথ তাকে ধিক্কার দিয়ে বিখ্যাত করে গিয়েছেন। অন্য অর্থে জাতীয়তাবাদ কিন্তু ঠিক তেমন নয়।

জাতীয়তাবাদের মূলকথা নিজের জাতিকে ভালোবাসা। যাকে ভালোবাসি তাকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাওয়া স্বাভাবিক। কাজেই জাতীয়তাবাদ নিজের জাতির প্রতিষ্ঠা, গৌরব ইত্যাদি কামনা করে। এই ভালোবাসা থেকে স্বদেশের নদীনালা আকাশবাতাস আলোর প্রতি ভালোবাসা এমন কি নস্টালজিয়া জন্মায়। তেমন যে করেই হক স্বজাতিকে অন্য সব জাতির মাথায় বসানোর আগ্রহ দেখা দেয়, অন্য জাতিকে ধ্বংস করে স্বজাতিকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা জন্মায়।

নিজের নিকটজনকে ভালোবাসে না অথচ দেশকে ভালোবাসে এমন লোককে আমরা অনেকদিন থেকে 'নন্দলাল' বলে চিনি। নিজেকে ভালো না বাসলে পুত্র কন্যাকে ভালোবাসা যায় না। শাস্ত্র প্রমাণ করছে স্ত্রীকে ভালোবাসি নিজেকে ভালোবাসি বলেই। সুতরাং নিজেকে ভালো না বাসলে দেশকে ভালোবাসা যায় না—এটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এবং কেউ স্বদেশকে ভালোবাসেনি অথচ সব দেশকে ভালোবাসছে এটা এমন অবৈজ্ঞানিক তথ্য যে চোখে দেখলেও প্রত্যয় করা উচিত হবে না।

আত্মপ্রেম প্রথমে, পরে মানবপ্রেম, জাতীয়তা পেলে পিছে বিশ্বজনীনতা। যে কোন মানুষের পক্ষেই যদি এটা সত্য হয়, সাহিত্যিকের পক্ষে এটা আরও প্রয়োজনীয় সত্য। কারণ স্বদেশ এবং

স্বজাতি শুধু একটা জমি এবং কিছু সংখ্যক মানুষ নয়, তা চিরায়ত ঐতিহ্যও বটে। এই ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া, ঐতিহ্যর প্রতি অপ্রেমকে বিচ্যুতি বলতে হবে, সাহিত্যের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। সাহিত্য এবং ঐতিহ্য কিভাবে সংশ্লিষ্ট এটা আমাদের আর অজ্ঞাত নয়।

এরকম একটা প্রশ্ন উঠতে পারে অন্য দেশের ঐতিহ্যকে নিজের করে নিয়ে সাহিত্য হতে পারে কি না। উপর থেকে দেখতে গেলে এর উত্তরে কেউ কেউ হাঁ বলতে পারেন। একবার শুনেছিলুম ট্যাসো, দান্তে, মিলটন এমন কি হোমারের আন্তর্জাতিক ঐতিহ্য বিধৃত করে লিখতে বসেছিলেন মাইকেল দত্ত। এটা এখন আমাদের স্কুলের বালকরাও জানে সে কবির নাম শ্রীমধুসূদন এবং তার রাবণ বা ইন্দ্রজিত হেক্টর, বংশীয় নয়। এ পোড়া বাংলাদেশে বিদ্রোহ চিরায়ত বলেই তাকে ব্রাত্য বলা হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বেও দেখেছি কোন এক সদাগর দেবতার সঙ্গে সংঘর্ষে নেমেছে। শেষ পর্যন্ত যদি পুজো করে থাকে তবে তা বাঁ হাতে এবং হেন্তালের বাড়িতে তার কোমর ভেঙে দেয়ার পর।

বস্তুত স্বজাতির ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষ যেমন উদ্বাস্তু হতে পারে এমন আর কিছুতে নয়।

সুতরাং জাতীয়তাবাদ বললেই আমাদের সঙ্কুচিত হওয়ার কিছু নেই বরং অনেকে ক্ষেত্রেই হৃষ্ট হওয়ার হেতু আছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে আমরা শ্রদ্ধা করে থাকি, জাতিস্বাতন্ত্র্যকে অশ্রদ্ধা করবো কেন? সাহিত্যিক অন্য অনেকের দেহ এবং মনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বর্ণনা করে, তাই বলে নিজের দেহটাকে পরিত্যাগ করে না, অথবা নিজের মন থেকেও বিচ্যুত হয় না। জাতীয়তাবাদী না হয়ে সাহিত্যিক হওয়া কঠিন। আন্তর্জাতিকতার জন্য জাতীয়তাকে ত্যাগ করা রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে উপেক্ষা করার সামিল।

কিন্তু জাতীয়তাবাদের অন্য আর একটি দিক আছে। নিজেকে ভালোবাসা অন্য সব ভালোবাসার উৎসমুখ হিসাবে শ্রদ্ধার বিষয় অথচ আত্মপরতার মতো জঘন্য কীই বা আছে? এ পর্যন্ত আমরা এমন কোন লোক দেখিনি যে আত্মপরতার প্রশংসা করেছে। তার অখ্যাতির নানা কারণেব মধ্যে মূলে যেটা আছে সেটা এই যে আত্মপরতা একটা মানসিক রোগ, নিজেকে ভালোবাসা নয়। ভালোবাসার স্বভাব বিস্তৃত হওয়া, নিজের থেকে সুরু করে পৃথিবীর সব দিকে আলোর মতো ছড়িয়ে পড়া। আত্মপরতা ঠিক উল্টো, সব জানালা বন্ধ করতে করতে যেখানে বাতাসও চলে না তেমন এক অন্ধকার কোণে আশ্রয় নেয়। এই আত্মপরতা যখন জাতীয় উন্মত্ততায় পরিণত হয় তখন অ্যাটম বোম তৈরি করে বৈজ্ঞানিকেরা আত্মরক্ষার কথা বলে। কারণ আত্মপরতা মানসিক রোগ বলে ওতে স্কিটসোফ্রেনিয়ার লক্ষণও দেখা দিতে পারে। এই অবস্থাতে জাতীয়তাবাদ অযুদ্ধ, আন্তর্জাতিকতা, মানবতাবাদ সব কিছুরই বিরোধী, এবং সব মানুষেব বিশেষ করে সাহিত্যিকের আন্তরিক ঘৃণার যোগ্য।

আমি অনুভব কবছি, সুধী পাঠক, আপনার মনে এরকম সন্দেহ জাগতে পারে; এও হয়, তাও হয় বলে আমি সঙ্কটটাকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছি। তা থেকে অনেক দূরে, সঙ্কটকে চেপে ধরার ঝোঁক আছে আমার। দুধ থেকে দই হয়, তারপর আরও লোকে খায়। সেই মহাদধিকে আমি প্রশংসা করি না। নিজেকে ভালোবাসা, আত্মপ্রেম সব প্রেমের উৎস। তা বিকৃত হয়ে আত্মরতি, আত্মপরতায় পরিণত হতে পারে। এটা আমাদের মানবিক দুর্ভাগ্য যে তা হয়ে থাকে, তাই বলে প্রেম মাত্রই রিরংসা অথবা সব ঝুটা হয় বলার মতো অবস্থাকেও আমি স্বাভাবিক মনে করি না।

অন্যদিকে জাতীয়তাবাদকে আন্তর্জাতিকতাকেও ভুল ব্যাখ্যা করার অবকাশ আছে। (আন্তর্জাতিকতা কথাটার চাইতে বিশ্বজনীনতা শব্দটা ভালো।) কোন কোন আন্তর্জাতিকতা ঘরের ঠাকুরকে ফেলে বিদেশের কুকুরকে কোলে নেবার সাধ। এরকম উক্তিকে সত্য নয় বলার মতো

জোর পাচ্ছি না। এরকমের হীনমন্যতা আছে যা এখন পর্যন্ত নয়, এখন আরও বেশী, পাশ্চাত্যদেশকে সব রকমে অনুকরণ প্রয়াসী; তাদের পিঠ চাপড়ানিকে সার্থকতার একমাত্র নিরিখ বলে মনে করে। কোথায় কোন পাগল ছাপার অক্ষরে কা কা, ক, ক, করছে অমনি আমাদের বিটনিক হওয়ার সাধ যায়। এখনও নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির কল্পনাকে আমরা সাহিত্যিকেরা চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা বলে অনুভব করি। এদের আন্তর্জাতিকতাকে আশ্রয় না করে উপায় নেই। এমন কাউকে কাউকে দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিকতাকে যারা প্রচারের পথ হিসাবে বেছে নিয়েছে। এ মনোভাবটাকে ছোট ছোট ঘটনা থেকে বুঝতে সুবিধা হবে। আসামে বাঙালী তখন প্রায় জেনোসাইডের সম্মুখীন, হঠাৎ কেউ একজন বলে বসলো তার জন্যে বাঙালীই দায়ী। এটা চিন্তার স্বকীয়তা নয়, এমন কি স্বেচ্ছাচারিতাও নয়, ববঞ্চ হিসেবীপনা। খবরের কাগজ গ্রোটেস্ক সংবাদ খুঁজে বেড়ায়, এই গ্রোটেস্কতম বিবৃতি তাকে হঠাৎ প্রচারিত করবে এমন মোহ থেকেই এ ধরনের চিন্তা অকারণে দেশদ্রোহী করে; মানবদ্রোহীও করে।

অন্য আরও এক ধরনের আন্তর্জাতিকতা আছে যাকে রাজনৈতিক বলা যেতে পারে। বিশেষ এক চিন্তক-গোষ্ঠী মার্কস-লেলিনের নামে এক আন্তর্জাতিকতার কথা বলে থাকে। সে যাই হক, এই বিশেষ ধরনের মার্কস-লেলিনিস্ট আন্তর্জাতিকতা বলছে শ্রমিকদের কোন বিশেষ জাতি নেই, কিম্বা বিভিন্ন দেশে বাস করলেও সব শ্রমিকই এক ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় এরকম চিন্তার কী ফল হতে পারে সেটা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। চীন আক্রমণ করেছে ভারতবর্ষ; তাতে ভারতের শ্রমিকের কীই বা এসে যায়; চীনা শ্রমিক এবং ভারতীয় শ্রমিক একই, সুতবাং ভারতীয় শ্রমিকরা চীনের এই আক্রমণকে অনায়াসে উপেক্ষা করবে, বরং চীনা শ্রমিকের এই উন্নতিতে (রাজ্যজয় উন্নতিসূচক) তারা সুখী হবে—এরকম একটা মনোভাব সৃষ্টির সাহায্য করতে পারে এবং এটাই এই ধরনের মার্কস-লেলিনিস্ট আন্তর্জাতিকতার উদ্দেশ্য· কম্যুনিজম যখন প্রসারিত হবে যেন অকম্যুনিস্ট দেশের এবং খাটি কম্যুনিজম যখন প্রসারিত হবে, তখন ব্রাত্যকম্যুনিস্ট দেশের শ্রমিকরা যেন জাতীযতার কথা বলে অগ্রসবমান কম্যুনিজমকে বাধা না দেয়।

বলা বাহুল্য, এ সব ধরনের আন্তর্জাতিকতা, মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক কারণে জাতীয়তাবাদ যখন জঙ্গী নয়, এমন কি মানবতাবাদী, তখনও জাতীয়বাদকে পয়লা নম্বর শত্রু মনে করে থাকে।

কিন্তু এ ছাড়াও আন্তর্জাতিকতার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। সে আন্তর্জাতিকতা একটা প্রোজ্জ্বল প্রেম। তাকে অসম্ভব বলেও মনে করি না আমাদের মতো সাধারণ লোকের পক্ষেও। আমি শেকসপীয়রকে রবীন্দ্রনাথের চাইতে কিছুতেই কম ভালোবাসি না। বেচারা চ্যাটারটনের জন্য যে কষ্ট অনুভব করি আমাদের পাড়ার সুকান্তর জন্য তা থেকে অন্য রকমের কষ্ট অনুভব করি না। মার্কস এবং নীটসে সমান উল্লেখযোগ্য কারণ তাঁরা মানুষকে তার অবস্থিতিকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন এবং যথাকালে ব্যর্থ হয়ে যাবেন কারণ আজ পর্যন্ত মানুষ কী এবং কেন তা বুঝবার মতো বলশালী হয়নি মানুষের মেধা। ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে সেই আত্ম-আবিষ্কারের দিকে এইটুকু বলা যায়।

এ ধরনের আন্তর্জাতিকতাকে তুলনা দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করা যেতে পারে। অসীম কালের এই ছোট তরঙ্গ যা আমার জীবনের আদি এবং অন্ত, সেখানে যে স্ত্রী মানুষটিকে আমার সন্তানের জননী হতে ডেকেছি তার মতো আর কাকে ভালোবাসি? কিন্তু তার ব্যক্তিত্বকে গ্রাস করলে ভালোবাসাও মরে যায়। আমি আমার পুত্রকে ভালোবাসি বলেই তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করি। এই আন্তর্জাতিকতা বিশ্বজনীনতা বলবো বরং জাতির সঙ্গে জাতির প্রেম কিন্তু জাত খুইয়ে নয় বরং বিজাতীয় বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা করে। এই আন্তর্জাতিকতা, সুতরাং, জাতীয়তাবাদের বিরোধী নয়, জাতীয়তাবাদের প্রসার।

৫

কিন্তু ঘর পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখেই অস্থির। যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সব আদর্শবাদকে কেউ আক্রমণ করে বসেছে, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে হলে তাকে প্রতিরোধ করতুম, বিশেষ করে তা যখন আমার স্বদেশে ঘটেছে তখন বিশেষভাবেই তাকে প্রতিরোধ করবো। ভয়টা এই জাতীয়তাবাদকে স্বীকার করতে গিয়ে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির শিকার না হয়ে যাই। রাজনীতিকে আমরা পরিচালনা করি না, তা করার মেজাজ এবং সময়ও নেই। রাষ্ট্রনীতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা আর পার্টির প্রয়োজন সিদ্ধ করা এক নয় তা আমরা সবাই জানি। এ ক্ষেত্রে যদি জাতীযতাবাদ সুস্থ আত্মপ্রেম থেকে বিকৃত হয়ে আত্মপর হয়ে ওঠে এবং আমাদের বুদ্ধিকে গ্রাস করতে চায়? তা করে এমন নজির আছে। আমাদের দেশে ইতিমধ্যে কাউকে ক্রোধে আত্মহাবা দেখতে পাচ্ছি। ভয় এই উচ্চ আদর্শবাদ এবং গোঁড়া ভাবোন্মত্ততা কাছাকাছি অবস্থান কবে। সাহিত্যিক মধুকর মধুব সৌরভ ভেবে উড়ে গিয়ে দেখছে ফ্লাইপেপার সেটা। তখন আর ফেরার সময় নেই। উদাহরণ রাশ্যায় এর জেদ এখনও কাটেনি। কী মর্মদাহ! কত আত্মহনন!

বিষয়টাকে বিশ্লেষণ করাও দরকার। রাশ্যায় যা হল তাও কি আদর্শবাদের পরিণতি? আমি তাঁদের সম্বন্ধে চিন্তা করে যা বুঝেছি, আদর্শবাদে কিছু খাদ ছিল। ক্রোধ এবং বিদ্বেষ তাঁদের আদর্শবাদের শুভ্রতাকে গোড়াতেই রক্তাক্ত করেছিল। তাঁরা একটিমাত্র শ্রেণীকে অন্য সকলের চাইতে উঁচুতে স্থান দিতে চেয়েছিলেন। তাঁবা ভুলে গিযেছিলেন শ্রমিক সম্বন্ধে এক আদর্শবাদী প্রত্যয় এবং রক্তমাংসের শ্রমিক এক নয়। তা সত্ত্বেও সেই আদর্শস্থানীয় প্রত্যয়কে তাঁরা মস্কোর পথে হাঁটতে দেখেছেন বলে এক ভুল ধারণার চশমা পড়েছিলেন চোখে। অন্যায়কে স্থানচ্যুত করতে যে বিদ্বেষকে ডাকবে, বিদ্বেষ তার ছেলেপুলেকে খাবেই। সুতরাং রাশ্যায় যা হয়েছে তার জন্য সাহিত্যিকের চিন্তার জড়তাই দাযী। প্রকাণ্ড ভুল করেছিলেন তাঁরা, আর এমন ভুল এই পৃথিবীতে ক্ষমা পায় না। কাবণ মানুষ শুধু বায়োলজিকাল এবং পলিটিক্যাল অস্তিত্ব নয়, সাইকোলজিক্যাল অস্তিত্বও বটে।

মানুষ ল্যাববেটারিব গিনিপিগ নয় যে তাকে ভয় না দেখিয়ে কোন মতবাদ অনুযায়ী অনেকদিন চালানো যাবে, লিকুইডেট না কবে। কিন্তু এটা রাজনীতিব কথা। যা আমাদের আলোচনার বিষয় নয় এবং যার সম্বন্ধে এমন একটা পারটিজান স্পিরিট আছে যার ফলে সুস্থ আলোচনা সম্ভব নয়। যুক্তির নামে পিটিশিও প্রিনসিপিয়াই আবর্তে মানুষেব মন ঘুরছে। সাহিত্যিকেব কথা বলছিলাম। সাহিত্যিক মানবতার জয় হবে এই উচ্চ আদর্শের আহ্বানে রাজনীতিকে মদৎ দিতে এগিয়েছিলেন তার ফল এখনও ভুগে যাচ্ছেন। আমি স্ট্যালিনের বিভীষিকাময় রাজ্যের কথা বলছি না যা নৃশংশতায় ইভান দি টেরিবিল্‌-কে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিল, আমি ক্রুশ্চেভের আমলের বরিস পাস্তারনক, এরেনবুর্গ এবং ইয়েভতুশেঙ্কোর কথা বলছি।

কিন্তু শুধু রাশ্যায বা কেন? আমি এমন চীনা উপন্যাস পড়েছি যার উপসংহার হচ্ছে, এবং এখন মহান মাওসে তুঙের নেতৃত্বে আমরা নতুন দিগন্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছি।' মনে করুন বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসগুলোতে লেখা হচ্ছে এক সময়ে, 'আমরা এখন মহান নেহরুর অথবা জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে অনেক ভ্রান্তির পথ পার হয়ে হয়ে, আমরা মানুষ সূর্যাভীপ্সাকে পার হযে হয়ে এগিয়ে চলেছি।' কী হতো তা আপনারা বুঝতে পারছেন।

এটা এমন কেন হল? অত্যাচারে উৎপীড়নে মানুষকে ছোট করে রাখা আমি সহ্য করব না এই তো আদর্শবাদ। কিন্তু কারো বুকে আমার পায়ের চিহ্ন এঁকে দেবো এ এক রকমের উন্মত্ত প্রলাপ। সাহিত্যিকরা কিছুক্ষণের জন্য রাজনৈতিক আদর্শবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে ভুলে গিয়েছিল আদর্শবাদ এবং ভাবোন্মত্ততা এক নয়। এবং তারই ফলে যেন বিস্মৃত হযেছিলেন প্রেম

এবং ক্রূরতা এক নয়।

কিন্তু এটা তো একটা উদাহরণ যার প্রয়োগক্ষেত্র আমরা সর্বত্র দেখতে পাবো। আর এটাই যেন একটা প্রথা হয়ে দাঁড়াবে সব দেশে যে সাহিত্যিকের এবং দার্শনিকের মনকে রাজনৈতিক গতিবিধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। রাজনৈতিক তৎকালীন মতামতকে সাহিত্যের বক্তব্য করে তোলার প্রয়াস সর্বত্র অনুভূত হচ্ছে। অবশ্যই আমরা এমন নজির দেখাতে পারি সাহিত্যিক যেখানে ক্রূরতা এবং নীচতাকে আদর্শবাদ বলে ভুল করেনি তখন তিনি জাতীয়তাবাদী হয়ে বিশ্বপ্রেমের সাধনা করতে পারেন এবং কোন কোন রাজনৈতিক অনিচ্ছাতেও তাকে মহান প্রহরী বলে শ্রদ্ধা জানায়। এবং তেমন স্বচ্ছ দৃষ্টি যা জাতীয়তাবাদের কতটুকু গ্রহণযোগ্য অনায়াসে ধরতে পারে সত্যই দুর্লভ। তাই এমন আশংকা হতে থাকে এই সঙ্কটে কিপলিং এর কাব্য সৃষ্টি হয় পাছে আমাদের দেশে। কারণ কিপলিং প্রমত্ত জাতীয়তাবাদের একটা বড় উদাহরণ।

যদিও আমরা জানি সাহিত্যিক যখন সুবিধাবাদের কাছে—সুবিধাবাদ এক রকমের চিন্তা-জড়তা—আত্মবিক্রয় করে না, যুদ্ধও তাকে ছোট করতে পারে না। তা ধর্মরাজ একা নয়, তার নিঃশব্দ অনুসরণকারী রক্তপায়ী ভীম এবং রুদ্রকর্মা গাণ্ডিবীও প্রমাণ করেছে। অর্থাৎ সাহিত্যিকের পক্ষে যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন প্রাপ্তি নিয়ে দু-চার সর্গ লেখা কিছুতেই সম্ভব নয় সিংহাসনের যত কাছেই তাকে বসতে দেয়া হক। জাতীয়তাবাদী হোমার পিলুস-পুত্রের ক্রোধকে গাইবার জন্য স্বর্গীয় মিউজকে আবাহন করেও হেকটরকে বড়ো করে ফেলেছেন। ক্রমওয়েলের পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও, নিজের কট্টর পিউরিটান গোঁড়ামি সত্ত্বেও, ঐশ্বরিক আদর্শবাদ প্রচারের প্রতিজ্ঞা নিয়ে লিখতে বসেও সত্যিকারের সাহিত্যিক স্যাটানকে ভালোবেসে ফেলে। কাবণ এই নয় শুধু যে স্যাটান পরাজিত মানুষের প্রতীক; বরং সাহিত্যের উদার ভালোবাসা যুদ্ধের দামামাঘোষ সত্ত্বেও পবাজিত শত্রুকে বুকে নিতে এগিয়ে যায়। এটাই মানবতার শেষ পরিচয়। তাঁর নিজের তৈরি ভাষায়, তার চিত্ত তখন purged of the baser fire, victorious

আখেরি হিসাব এই, সুবিধাবাদের মোহে না পড়লে, সাহিত্যিক অন্য কোন বাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে না—এমন কি পৃথিবীর সব চাইতে পুরনো এবং এখন পর্যন্ত সব চাইতে শক্তিমান পাপপুণ্যের মতবাদের কাছেও নয়। তুলনীয় সেক্‌পীয়র এবং কম শক্তি সত্ত্বেও অন্য অনেকে। এটাই আমাদের আশার কথা।

সঙ্কটটা পার হয়ে এসে, সম্পাদক মশায়, আমি আমার দুর্বলতার কথা ঘোষণা করতে পারি। পাপ- পুণ্যজড়িত মানুষকে ভালোবাসা ছাড়া আমার (আমাদের বলতে সাহস পাইনে, দুর্বলতার কথা যে) যদি অন্য দুর্বলতা থাকে তবে তা প্রেয়সীর গালের তিলটির প্রতি। এবং তার জন্য, সেই একটিমাত্র বালুকণার মতো তিলের জন্য আমি ওয়াশিংটন এবং মস্কো দুই-ই দিতে রাজী।

গল্পটা বলি, অনেকক্ষণ সে সুযোগ আমাকে দেননি, হাফেজ যখন বোখরা এবং সমরখন্দ বিকিযে দিতে চেয়েছিলেন তখন এ দুটো মহানগর ছিল বিশ্বজয়ী তৈমুরের রাজধানী এবং উপরাজধানী। মস্কো ওয়াশিংটনের বর্তমান পৃথিবীতে যুক্তভাবে যে প্রভাব, তৎকালীন পৃথিবীতে তৈমুরের একারই তা ছিল।

তৈমুর হাফেজকে তলব করে বললেন, প্রগল্‌ভ কমবক্ত্‌, তোমার গর্দান যাবে না কেন অরজ, করো। তুমি একটা মেয়েমানুষের গালের তিলের জন্য আমার রাজধানী বিক্রি করতে চেয়ে আমাকে অপমান করেছ।

হাফেজ বললেন, হুজরৎ, তাদৃশ প্রগল্‌ভতার জন্যই আমার এই গর্দিশ।

এবং এটাই আমারও বক্তব্য। স্বীকার করি সে জন্যই কিছু হবে না আমাদের জীবনে, স্টেট-স্বীকৃত লেখক হওয়া সম্ভব নয় বলে। কারণ প্রেয়সীর গালের তিলই আমার aestheticism, যেমন

হাফেজের ছিল।

এবং আশা রাখি আমাদের মধ্যে যদি হোমার বা ব্যাস নাও আসেন আর অর্থাৎ তেমন কোন সাহিত্য যদি সৃষ্টি না হয় যা হবে ইনটেলেক্ট্-এর শেষ আশ্রয়ের উইস্‌ডম আমাদের কেউ হয়তো ভলতেয়ার হতে পারে যে নিজের কাঁধে বয়ে একটা যুগকে মতান্ধতার চার্চ থেকে প্রশস্ত সূর্যের আলোকে পৌঁছে দেবে।

অনুমান করি

[মাদার লীলা, তোমার কাছে আমাদিগের অপরাধ কম নয়। সেই অপরাধের যে কারণ তাহার ফলেই দুই শতাব্দী ক্লেশ করিতেছি। অথচ এই কালে তুমি হয়তো কতবার আমাদের কোলে শিশুরূপে আসিয়া ক্রমশ আধুনিক ললনা পরে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছ। পরন্তু লক্ষ্য করো, এখনও বাঙালী-সংস্কৃতি বিদেশাগত ভাবের সন্তানধারণে সদা উন্মুখ। তুমি চার্ণক-বনিতা, তুমি কলকেতার গার্ডিয়ান সেন্ট, তুমি বাঙালী সংস্কৃতির আদি মহিলা! কিন্তু এবার বিদায় লও ; আমরা যেন ডিরোজিও এবং রেনেশাঁ নামক আজগুবী বিষয়টিকে নিন্দা করিতে পারি। আরম্ভ করিতেছি। নিবেদনমেতৎ অমিয়ভূষণদেবশর্ম্মণঃ।]

কতগুলো বিষয় আছে যা সম্বন্ধে আমাদের এ রকম ধারণা হয় যে, বিষয়টা সকলেরই বিশেষ জানা, তত্ত্বহিসাবে তাকে ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থাদিতে আলোচনা করা যায়, কিম্বা পণ্ডিতগণ তা নিয়ে কূট গবেষণা করতে পারেন, কিন্তু সাধারণভাবে সে সম্বন্ধে কিছুই আর বলার নেই। সংস্কৃতি এমন একটা বিষয়, অথচ ব্যাপারটা যে ঠিক সে রকম নয় তার প্রমাণ উপস্থিত করা খুব সহজ। সংস্কৃতি এবং কালচারকে অভিন্নার্থ জেনে কোন সরল লোক যদি প্রশ্ন করে, বিবেকানন্দকে ম্যান অব কালচার বলা যাবে কি? একটা উঠলে আর পাঁচটা তার অনুসরণ করতে পারে। সুভাষচন্দ্র সংস্কৃতিবান পুরুষ ছিলেন কি? কিংবা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অথবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর? বিবেকানন্দ গান করতেন বটে। সেজন্য তাঁকে সংস্কৃতিবান বলতে পারা যায়ও যদি, সুভাষচন্দ্র, স্যার আশুতোষ অথবা বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে এ রকম কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি যে তাঁরা গান করতেন অথবা নৃত্যের যে কোন পর্যায়ে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তা হলে? সরল লোকেরা অনেক সময়ে আমাদের বিপন্ন করে থাকে।

অথচ সংস্কৃতি সম্মেলন অথবা সংস্কৃতি উৎসবে যা আশা করা হয় এবং পাওয়া যায় তা নাচ এবং গান। অবশ্য কিছু কিছু বক্তৃতাও থাকে। অঙ্কের হিসাবে নাচ এবং গান যদি সম্মেলনের বারো আনা হয়, বক্তৃতা কবিতা-পাঠ ইত্যাদি চার আনা সময় নিয়ে থাকে। এ থেকে কি বলা যাবে সংস্কৃতি বা কালচার বারো আনাই নাচগান এবং চার আনা বক্তৃতা ইত্যাদি। এবং এখন দেখা যাক যদি কোন সম্মেলনে শুধু বক্তৃতা এবং কবিতা পাঠ হয় তবে তাকে অন্তত চার আনা সাংস্কৃতিক সম্মেলনও বলা হয় কিনা। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে বরং কবি সম্মেলন, সাহিত্যচক্র ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। এদিক দিয়ে বিচার করলে বক্তৃতা বা সাহিত্য আলোচনাকে সংস্কৃতি বলা যায় কিনা সন্দেহ। অন্যদিকেও দেখুন। কিছুদিন আগে কলকাতার এক বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একদল গুণী স্ত্রী পুরুষ লোকসংস্কৃতির অনুসন্ধানে আমাদের এদিকে এসেছিলেন। এবং সৌভাগ্যবশে তাঁরা তাদের লাভজনক প্রাপ্তির কিছু আমাদের উপলব্ধির আওতায় এনে দিয়েছিলেন। জানার সুযোগ হল, এদিকের কোন কোন ক্রমে তবলা ইত্যাদি যন্ত্রের বোলগুলি শহরে প্রচলিত বোল থেকে পৃথক। যথাঃ এরা যদি বলে 'আ ভালো ছোড়্‌দি ভালো এই ছোড়দি ভালো থাক্‌' তবে সাধারণ লোক বুঝতে না পারলেও গুণীজনরা বুঝতে পেরেছিলেন আসলে সেটা ধা ঘেনে নাক্‌দি ঘেনে নাক গদ্দি ইত্যাদি ছাড়া আর কিছু নয়। লক্ষ্য করা গেল, গুণীজনেরা লোকসংস্কৃতি বলতে গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত ছড়া, গান এবং নাচকে বুঝেছেন।

সুতরাং এই নিরিখে নেহরু, সুভাষচন্দ্র এবং রাধাকৃষ্ণনকে সংস্কৃতিবান বলা যায় কিনা সন্দেহ। (রবিঠাকুরকে নিয়ে কিছু মুস্কিল আছে। এমন কোন আলোচনা নেই যেখানে তিনি নিজের দাবী নিয়ে উপস্থিত থাকবেন না। তিনি গাইতেন, বেশ ভালোই গাইতেন, বাউল বেশে বেশে নাচতেও পারতেন না এমন নয়। সুতরাং নাচ গানের যোগ্যতার জন্যই তাঁকে কেউ সাংস্কৃতিবান বললে ঠেকানো কঠিন)

কিন্তু বাহুল্যেনালং। সংস্কৃতি অথবা কালচার কী তা বোঝাতে গিয়ে অনেক গুণীজন অনেক পুস্তকাদি লিখেছেন বলে জানি। কালচারের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণের চেষ্টা করতে গিয়েই কেউ কেউ স্থূলকায় বই লিখেও শেষ পর্যন্ত সংজ্ঞাটাকে দিতে পারেন নি বলে শুনেছি। বস্তুত কালচার কথাটাকে অনেক কিছু বোঝাতেই ব্যবহার করা হয়। নাচ গান তো বটেই, আর্ট, সাহিত্য, ঐতিহ্য, জাতীয় মানস, জাতীয় চরিত্র, আচার আচরণ, শিক্ষাদীক্ষা—সংস্কৃতি বলতে কী না বোঝানো হয়ে থাকে। এ সব চেষ্টার ফল একই সঙ্গে ক্ষতিকর এবং হাস্যকর হয়েছে। সংস্কৃতি সম্বন্ধে এই সব ধারণাকে আমরা যদি বিশ্লেষণ করি সহজেই দেখতে পাওয়া যাবে এগুলির একটাও সংস্কৃতির পরিবর্ত বা প্রতিশব্দ নয়। এমনকি সবগুলোর যোগফলও সংস্কৃতি নয়।

তা হলে সংস্কৃতি বলতে কী বুঝবো? অনুমান করি এ ব্যাপাবে দার্শনিক কূটত্বে প্রবেশ কবা লাভজনক হবে না। সংস্কৃতির পঞ্চাশটি সংজ্ঞা প্রচলিত আছে, চিন্তার জটিল কূটত্বে, শব্দের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দুরূহ ব্যবহারে যার প্রত্যেকটি অনন্যসাধারণ। দেখে শুনে মনে হবে সংস্কৃতির ব্যাপারে আমরা কেউ পিছপা হতে রাজি নই। কেউ কাউকে জমি ছাড়তে বাজি নই। গুণীজনেরা নিজের অথবা নিজের গোষ্ঠীর কৃতিকে বোঝাতে যা লাগসই মনে করেছেন সংস্কৃতিকে সেই সংজ্ঞাই দিয়েছেন। এমন হতে পারে, শেষ পর্যন্ত আমি যে সংজ্ঞাটাকে মেনে নেবো সেটা আমার অজ্ঞাতসারে ব্যক্তিগত জীবনের অথবা আমরা গোষ্ঠীর জন্য কল্পিত আদর্শ ছাড়া আব কিছু নয়।

কালচারের সংজ্ঞা আমার কাছে তো খুব সহজ বলেই মনে হয়। অভিধানে এই শব্দটির যে অর্থ দেওয়া আছে, সেটাতেই সংজ্ঞা বলে মানতে আপত্তি থাকা উচিত নয় বলেই মনে করি। যে কোন ব্যাপারেই সাধারণ উপলব্ধিকে মেনে নিতে রাজি আছি, শুধু সচেতন উপলব্ধি এবং গণ-উপলব্ধির মধ্যে যে পার্থক্য তাকে যদি অস্বীকার না করা হয়।

অতীতে যেমন বর্তমানেও কালচার কথাটা কাল্ট থেকে বিচ্যুত নয়। কালচার সেই গূঢ় (অনতিপ্রচার) অনুশীলন ক্রিয়া যা দিয়ে মনন ও ক্রিয়া-কর্মকে বিশেষ উদ্দেশ্যে দক্ষতালাভের জন্য পরিমার্জিত করা যায়। সংস্কৃতি শব্দটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই এই সংজ্ঞা আরও স্পষ্ট। সংস্কৃতি সেই অনুশীলন যা দিয়ে আত্মাকে মার্জিত উন্নীত করা যায়। অল্প চিন্তাতেই বুঝতে পারা যাবে আত্মাকে উন্নীত করা তখনই সম্ভব যখন চিন্তা ও কর্মে সেই দক্ষতা এসেছে যার সাহায্যে আত্মা তার উদ্দিষ্টকে আয়ত্ব করতে পারে।

পরন্তু কালচারের সংজ্ঞা যদি এত সহজ, আমাদের চিন্তায় তা হলে এত বিমূঢ়তা কেন এসেছে তাও ভেবে দেখা দরকার।

এমন এক সময় ছিল যখন মানুষ ধর্মে বিশ্বাস করতো। ধর্ম বলতে যা ধরে রাখে তাই নয়। কারণ ধর্ম সমাজকে বিদৃতও করে, বিপ্লব আনে, ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ধর্মকে বরং ঈশ্বর-চিন্তা ও ঈশ্বর-অনুভূতি সংযুক্ত অথবা ঈশ্বর-বিযুক্ত আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনা ও কর্মের সংগে যুক্ত করে দেখতে হবে। প্রত্যেক ধর্মই দীক্ষিত ব্যক্তির জন্য একটি গন্তব্য স্থান নির্দেশ করতো। এই গন্তব্যে পৌঁছতে

গেলে আত্মাকে উন্নীত, পরিমার্জিত, সংস্কৃত করা দরকার হতো। কালচার ছিল এই সংস্করণের উদ্দেশ্যে অবিরত অনুশীলন।

তারপর ডারউইন এবং মার্কস-এর চেষ্টায় এমন দিন এল যখন ঈশ্বরকে বিদায় নিতে হল। গন্তব্য মুছে গেল, আত্মা বলতে আর কিছু অবশিষ্ট রইল না যাকে উন্নীত অথবা পরিমার্জিত করা যাবে। কিন্তু কোন্ একটা গন্তব্যে পৌঁছানোর, কিছু একটাকে উন্নীত করার আগ্রহটা এখন পর্যন্ত যেয়েও যাচ্ছেনা।

এরই ফলে আমরা এখন গন্তব্য উদ্ভাবনের এবং আত্মার পরিবর্ত তৈবির চেষ্টায় নিযুক্ত আছি। আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে কান্তিবিদ্যা, সমাজতত্ব, ভূতবিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্রকে ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং প্রয়োজন অনুসারে মন, বুদ্ধি, আবেগ, জ্ঞান এমন প্রযুক্তিবিদ্যাকেও আত্মার পরিবর্ত হিসাবে উপস্থিত করেছি।

এখানে বলে নিতে চাই আত্মা এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার নসটালজিয়া নেই, যদিও ঈশ্বরকে অতীতে এবং বর্তমানেও বটে, মানুষের মনের সবচাইতে মূল্যবান আবিষ্কার উদ্ভাবনা অথবা সৃষ্টি বলে মনে করি। ইতিহাসের দৃষ্টিতে লোহা আবিষ্কার, এমনকি শ্রেণীসংঘাত-ভিত্তিক প্রগতির মতবাদ উদ্ভাবনের চাইতেও মূল্যবান, যদিও এখন তিনি আর তেমন কাজে লাগছেন না।

গন্তব্য উদ্ভাবনের এবং আত্মার পরিবর্ত তৈরির প্রক্রিয়াতে বিগ্রহদ্বেষী বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে এবং ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটেছে। কালচারের সংজ্ঞায় আমাদের চিন্তার যে বিমূঢ়তা দেখা দিয়েছে, অনুমান করি তা এই বিশৃঙ্খলা এবং বিচ্যুতির ফলেই।

আমরা যে সংজ্ঞা গ্রহণ কবতে চাচ্ছি, যা অনুসারে কালচার বিশেষ অনুশীলন, তার জন্য দীক্ষার প্রয়োজন আছে কিনা, এবং সেই অনুশীলন গূঢ় অথবা অনতিপ্রচার হওয়া দরকার কিনা, এটাও ভেবে দেখা যেতে পারে। সেকালে ধর্মের ব্যাপারে দীক্ষার প্রয়োজন ছিল, সাধনা উপাসনা গোপনে নির্জনে কবা হত।

আমাদের অবশ্যম্ভাবী এবং অনস্বীকার্য গণতান্ত্রিক ঝোঁক সত্ত্বেও আমাদের সমস্ত জ্ঞান বিশেষজ্ঞতায় সীমায়িত হওয়ার দিকে চলেছে। পপুলার গ্রন্থাদিতে আমরা কখনও কখনও দর্শনের আলোচনার দেখা পাই বটে, কিন্তু একবার ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারা যায় সে সব জনপ্রিয় গ্রন্থে যে আলোচনা তা খণ্ডিত অর্ধ-উচ্চারিত আবেগযুক্ত ভাষার ভেজাল মেশানো। বালকভোগ্য হালকা চায়ের চাইতে তার মূল্য বেশী নয়। আমার তো মনে হয়, কোয়ান্টাম মেকানিকস অথবা পরমাণবিক তত্ত্বের সঙ্গে জনপ্রিয়তা অথবা 'গণ' শব্দটাকে কোনদিক দিয়েই সংযুক্ত করা যায় না। এরকম একটা কিম্বদন্তি আছে, যে কোন লোকই বর্তমানে আপেক্ষিক তত্ত্ব, পারমাণবিক তত্ত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। কেউ যদি বিপরীত কথা বলে, তার তীব্র প্রতিবাদ হলে তা বিস্ময়ের হবে না। আসল ব্যাপারটা কী? আমাদের দেশের বিজ্ঞানের অধ্যাপকদের ধারণাই কি এই তত্ত্বগুলোর সম্বন্ধে স্পষ্ট? আমরা যখন দর্শন, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে আসি পরিস্থিতিটা খুব বদলায় না। আমরা আধুনিকতম সিদ্ধান্তের কথা শুনি এবং বলি। অন্তত একসিস্টেন্‌সিয়ালিজম্, লজিক্যাল পজিটিভিজম্ প্রভৃতি শব্দকে ঘন ঘন উচ্চারিত হতে শুনেছি। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা সাধারণ লোকে বিস্তর বললেও দর্শনের অধ্যাপকদের কিন্তু কিন্তু করতে দেখেছি। সার্ত্র বলেছেন বলে শুনেছি যে বিশ্বাসের অভাবে কবিতা শব্দাবলী এবং চিত্রকল্পের কামদার নকসা ব্যতীত কিছু নয়। এই বাক্যটিকে অদীক্ষিতের কানে তুলে দিলে কী হতে পারে তা ভাবতে বুক কাঁপে। অথবা আধুনিক বিমূর্ত চিত্রের কথা ধরা যাক। জনগণের কাছে কি তার কিছু সংবাদ আছে? সৌন্দর্য্য, গাণিতিক বিশুদ্ধতা অথবা বিশৃঙ্খলা,

আভ্যন্তরিক হট্টগোলের সদৃশ বহিঃস্থিত রংএর চিৎকার কিম্বা অন্য যাই হক, জনগণের কাছে তা সবই অর্থহীন রংয়ের ছোপ অথবা নানাবিধ অর্থহীন রেখার সমষ্টি। কিংবা মনঃসমীক্ষার কথা ধরা যাক, অনুমান করি সেটা বিজ্ঞান। কিন্তু সেই অষ্ট্রীয় মনস্তত্ত্ববিদ এবং তস্য ছাত্র কজন কী সাংঘাতিক ভাবে এবং কেন বাংলা সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করেছে তা আমরা জানি।

আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি জ্ঞানবিজ্ঞান কিম্বা কান্তিবিদ্যার অধিকারের বিষয়গুলোতে বিস্তার এবং গভীরতা সর্বত্রই এত অপরিমেয় যে দীক্ষিত ছাড়া অন্যেব কাছে তা অব্যাপার, অগণতান্ত্রিক শোনালেও মনে হয় সংস্কৃতি নামক অনুশীলনের ব্যাপারেও অধিকারটা অর্জন করতে হয়। জনগণের একজন বলেই দাবী করা যায় না।

এই বিশেষ অনুশীলন কি গূঢ় হতে হবে, অনতিপ্রচার হতে হবে? আপাতদৃষ্টিতে জনগণের কাছে লুকানোর কিছু নেই, কিন্তু যে কথাগুলো বলে আসা হল আবাব সেগুলোকেই মনে আনা যাক।

একটু লক্ষ্য করলেই অনুভব করা যাবে দীক্ষিত ব্যক্তিকেও তাব বিষয়টিকে সম্যক চর্চা করতে হলে জনগণের থেকে সরে যেতে হয়। এটা শুধু সেকালের তপস্যা বা উপাসনার বেলাতেই সত্য ছিল তা নয়, ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স ক্লাসে কোয়ান্টাম মেকানিকস্ আলোচনা করা যায় না, অথবা থ্রি-ইয়ার ডিগ্রি ক্লাসেও লজিক্যাল পজিটিভিজিমের আলোচনা লাভজনক হবে না, যদিও এক্ষেত্রে ছাত্ররা দীক্ষিত এবং তারা বিজ্ঞান এবং দর্শনের মন্দিরে প্রবেশ কবেছে বলা যায়। কিম্বা রাষ্ট্রনীতির কথা ধরি। এটাতো জনগণেরই বিষয, প্রায় প্রত্যেকেই মার্ক্সিজম লেনিনিজমের কথা বলে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে গোটা জাতটাই আপাতদৃষ্টিতে এই মতবাদের সচেতন উপলব্ধি-চালিত বলে মনে হয়। কিন্তু একথাটাও সকলেই জানে মার্ক্সিজিম্ ও লেনিনিজমের সত্যকারের ব্যাখ্যা দেখার অধিকার এবং যোগ্যতা সব সময়েই মাত্র কয়েকজনেরই থাকে, সেকালে ষ্টালিনের ছিল। ট্রটস্কি এবং অন্য অনেকেরই ছিল না, পরে দেখা গেল স্ট্যালিনেরও ঠিক ছিল না। ইদানিং মাও-সে-তুং এর আছে, লিউযের নেই বলে মনে হচ্ছে। কিমতঃ পরম? এ থেকেই গর্ভমন্দিরের কথা মনে আসে, মন্দিরের মধ্যে লুকনো মন্দির। অনুমান করি, এ বিষয়ে যদি কিছু করা হয়ে থাকে, গুরুত্ব বজায় রাখার চেষ্টাকে আরও কড়া করা হয়েছে। অনুরূপ ভাবে বলা যেতে পারে সংস্কৃতি যা দীক্ষিতের বিশেষ উদ্দেশ্য লাভের জন্য মনন ও ক্রিয়াকর্মের অনুশীলন তা গূঢ় অন্তত অনতিপ্রচার হতে হবে। আমাদের বিপরীত ইচ্ছা সত্ত্বেও।

এখানে এই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে কালচার যদি দীক্ষিত ব্যক্তির মনন ও ক্রিয়াকর্মের গূঢ় অনুশীলন হয়, তবে নৃত্য, সঙ্গীত, সাহিত্য এসবের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে কিনা। প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ। এর উত্তর দিতে গেলেই সাধারণত সংস্কৃতি বলতে নাচ গানকে কেন বোঝা হয তাও জানা যাবে। মানুষ শোয়, ওঠে, বসে, চলে, যায়, নিঃশ্বাস নেয়, ঘুমায় কিন্তু কোনটিই জীবন নয়। কিম্বা সবগুলোর যোগফলও জীবন নয়। এগুলোকে জীবনের প্রস্থান (State) বলা যেতে পারে। অনুরূপ ভাবে নাচা, কিম্বা গীটার বাজানো, সনেট লেখা কিম্বা ছবি আঁকা কালচারের প্রস্থান মাত্র হতে পারে। কিন্তু এখানে একটু সতর্ক হওয়া দরকার। বিশেষ অবস্থায় ঘুমানোটা কপট হতে পারে। কৃত্রিম হতে পারে, জীবনের পক্ষে অপ্রয়োজনের হতে পারে। আপাততঃ তাকে জীবনের প্রস্থান বলে মনে হলেও তা অন্যের ঘুমের অনুকরণ হতে পারে। তেমনি কারো গীটার বাজানো তার কালচারের প্রস্থান না হয়ে অন্যের কালচারের প্রস্থানের অনুকৃতি মাত্র হতে পারে, কারো সাহিত্যকর্ম তার কালচারের প্রস্থান না হয়ে অর্থোপার্জনের উপায় হতে পারে। কারো বিজ্ঞানচর্চা যেমন শুধুমাত্র ডিগ্রি লাভের এবং পরে বিদ্যালয়ের চাকরি পাওয়ার চেষ্টামাত্র হতে পারে, তেমন কারো গান তার সামাজিক জনপ্রিয়তার কারণ হিসাবে চর্চা করা হয়ে থাকতে পারে। ঘুমটা অপ্রয়োজনের হলে

বা কৃত্রিম হলে তা গাঢ় হবে না এমন নয়। বারবিট্যুরেটস্ সুগভীর ঘুম আনতে পারে, কেউ অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমানো আভিজাতের লক্ষণ মনে করে অপ্রয়োজনে ঘুমানোকে আর্টে এ পরিণত করেছে দেখা যায়। কাজেই ঘুম জীবনের প্রস্থান হলেও, যত গাঢ় ঘুম জীবন তত বলশালী, এমন নাও হতে পারে। এমন কি সব ঘুমই জীবনের প্রস্থান নয়। চলাটা জীবনের প্রস্থান ; চলাটার একটা পর্যায় দৌড়ে চলা, বিশেষ যখন চার মিনিটের কমে মাইল দৌড়ানো। কিন্তু সব জীবনের প্রস্থানই চার মিনিটের কমে মাইল দৌড়ানো নয় এবং এই রেকর্ড করা গতি, রেকর্ড করার উপযুক্ত জীবনের একমাত্র প্রমাণ নয়।

এরকম আপাতবিরোধের একটা কারণ আছে। খাওয়াটা জীবমের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু রন্ধনকুশলতা ও ভোজনপটুতা জীবনের পক্ষে অপরিহার্য নয়, তা বরং একটা বিশেষ প্রবৃত্তি অথবা ফাংশনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত চর্চা। নিঃশ্বাস নেয়াটা জীবনের পক্ষে অপরিহার্য, কুম্ভক প্রাণায়াম নিশ্চয়ই তা নয়। এসব করে কেউ যদি চব্বিশ ঘণ্টার জন্য কবরে থাকতে পারেন তবে বুঝতে হবে নিঃশ্বাস নেয়ার ফাংশনটাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়িয়ে ফেলেছেন চর্চা করে। এ ভাবেই সাহিত্য চিত্রণ ইত্যাদিতে দক্ষতা লাভও এই প্রয়োজনের অতিরিক্ত চর্চার ফলে হয়ে থাকে। যে কুম্ভক প্রাণায়াম করেনি তাকে জীবনহীন বলি না।

কখনও বা সাহিত্য কালচারের প্রস্থান বটে কিন্তু সাহিত্যে অসাধারণ কৃতিত্ব অসাধারণ সংস্কৃতির প্রমাণ নাও হতে পারে। মার্লো অথবা বোদলেয়রকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতী বলতে কেউ আপত্তি করবে বলে মনে হয় না। কিন্তু তাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। ফ্রাঁসোয়া ভিয়ঁকে সংস্কৃতিবান বলতে কারো আপত্তি থাকলে তাতে একদেশদর্শী বলা যায় না। (যেহেতু চুরি, জোচ্চুরি, খুনজখমি সমেত মাতলামি অথবা দূষিত ব্যাধি অর্জন করার মতো জীবনকে সংস্কৃতির লক্ষণ বলে মনে করতে এখনও দ্বিধা আছে।)

আমরা এরকম সিদ্ধান্তে আসতে পারি, কোন কোন ক্ষেত্রে নৃত্য, সঙ্গীত, সাহিত্য ইত্যাদি কালচারের প্রস্থান বটে, সর্বত্র নয়। এগুলো কালচারের প্রস্থান হলেও এগুলোতে উৎকৃষ্টতা লাভই সংস্কৃতির উৎকর্ষের প্রগাণ নাও হতে পারে। উপরন্তু, যে আদৌ দৌড়ায় নি, কিম্বা সাঁতার দেয় নি, কিম্বা রাগবি খেলেনি তাকে যেমন অজীব বলা যায় না, তেমনি সাহিত্যে উৎকর্ষ লাভ দূরে থাক দু-ছত্রের গদ্যও লেখেনি, অথবা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যার একমাত্র কৃতিত্ব অনেক কষ্টের আড়ালে জাতীয় সঙ্গীতে যোগ দেয়া, তাকেও সংস্কৃতিবিচ্যুত বলার যুক্তি নেই।

সংস্কৃতি তা হলে দীক্ষিত ব্যক্তির মনন ও ক্রিয়াকর্মের গূঢ় অনুশীলনের এক বিশেষ উদ্দেশ্য, যখন মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি ছিল, ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রশ্ন তোলা হলে বিশ্বাসের অভাব দেখা যায়নি, তখন ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভের পক্ষে আত্মাকে উপযুক্ত করে তোলা যে কালচার এবং সংস্কৃতির উদ্দেশ্য ছিল তা বলা কঠিন নয়। এখন কেউই করতে চাইবে না। তা কেন, কী উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছে তা বলা যায় না। পেননাইফ কেন, কী উদ্দেশ্য তার, তার কী কী গুণাবলী, অথবা অন্য কথায় কী তার সত্ব-সার তা আমরা নির্দ্ধারণ করতে পারি। এবং যে সব পেননাইফ এখনও অস্তিত্ব লাভ করে নি, তারাও কী রকমটা হবে তা বলে দিতে পারি। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। কী কী গুণাবলী থাকলে তাকে মানুষ বলা হবে, কী কী গুণের অভাবে তাকে মানুষ বলা হবে না— এটা বলা যায় না। আমরা বড়জোর বলতে পারি মানুষ এ পর্যন্ত এই রকমে চলেছে, ব্যবহার করেছে, কিন্তু ভবিষ্যতেও, বর্তমানে যেমন, সব ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ হবে যেমন বলে দেয়া যায়, ভবিষ্যতে মানুষ কী রকম চলবে, ব্যবহার করবে তা তেমনভাবে বলা যায় না। কাজেই মানুষের জীবনের কোন লক্ষ্য আছে কি না অথবা তার সংস্কৃতির কী উদ্দেশ্য হবে তা বলে দেয়া যাচ্ছে না।

কিন্তু এটা বলে দেয়া যাচ্ছে আত্মা অস্বীকৃত হওয়ার পরেও যে অনুশীলিত হয়, যাকে সংস্কৃত করা হয় তা মানুষের মন। এখন মন এই শব্দটা আমরা এত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছি যে আমি কী বোঝাতে চাইছি, আর আপনি কী বুঝছেন তার মধ্যে কতটা পার্থক্য থেকে যাচ্ছে তা জানা যাচ্ছে না। উল্টো দিক থেকে সুরু করলে সুবিধা হতে পারে, মন শরীরের অংশ বিশেষ নয়, মন তার অর্জিত জ্ঞান নয়। মনের সেই অবচেতন প্রস্থান যার কোন পরিবর্তন সাধ্য নয় তাও এখানে গণনীয় নয়। মন বুদ্ধিমাত্র নয়। অনুমান করি বিমূর্ত বিষয়কে বর্হিজগতের তুলনায় স্থাপন করে বলা যায় মন তাই যা বোধ এবং অনুভূতির সাহায্যে উপলব্ধি এবং অনুমান করে, জ্ঞান এবং সত্তা লাভের দক্ষতা অর্জন করতে পারে। আত্মা অস্বীকৃত হওয়ার পরেও মন থেকে গিয়েছে, এবং দেখা যাচ্ছে পাঁচটা ইন্দ্রিয় থেকে যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়ে থাকে তাতে সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না। এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির গভীরে, উর্ধ্বে এবং বাহিরে কে যেন কিছু অনুসন্ধান করে। আর এই অন্যতর উপলব্ধির লিপ্সা কখনও তাকে ত্যাগ করে না। ন জহাতি। এটা যেন মনের ক্ষুধা যা ইন্দ্রিয়গ্রাম তৃপ্ত হলেও পরিতৃপ্ত হয় না। একখানা ঝলসানো রুটি দূরে থাক প্রচুর শূল্যপক্ক মাংস, কেক এবং আঙ্গুরেও সে ক্ষুধা মেটে না, দু চার মাগ এইল দূরে থাক শীতলীকৃত ক্লারাটের হ্রদেও তা স্নিগ্ধ হয় না, হেলেনের চুমুতেও তাকে শান্ত করে না।

এই মানসিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি এক বিশেষ ধরণের উপলব্ধিতেই আছে। এই বিশেষ পরিতৃপ্তি অথবা উপলব্ধিতে পৌঁছানোর নানা পথ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু এই পরিতৃপ্তি অথবা উপলব্ধি একটা উদ্দেশ্য হতে পারে। যেহেতু আমরা ঠেকে ঠেকে শিখি, এই মানসিক ক্ষুধাব পরিতৃপ্তিকে আপাতত কালচার যে বিশেষ অনুশীলন তার উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করতে পারি। এ বিষয়ে নজির এই যে এক সময়ে অভিসারপরা গতিকেই আমরা সংস্কৃতির উদ্দেশ্য বলে মেনে নিয়েছিলুম যদিও পরে তাকে বাতিলযোগ্য মনে হয়েছে।

বলা বাহুল্য দৈহিক ক্ষুধাগুলো যেমন চোখের ক্ষুধা হতে পারে, এবং অখাদ্য দিয়ে যেমন কখনও কখনও সত্যিকারের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, কখনও স্বেচ্ছায় করা হয়ে থাকে, মানসিক ক্ষুধার বেলাতেও তা হওয়া সম্ভব এবং হয়েও থাকে। যা বাধ্য হয়ে করা হয়ে থাকে তা আলোচনায় না আনলেও চলে, কারণ বাধ্যতামূলক অনিচ্ছায় এই শব্দটাই প্রমাণ করে উপযুক্ত খাদ্য সম্বন্ধে তার জ্ঞান আছে, অনুশীলনের উদ্দেশ্য তার অজ্ঞাত নয়। দেখা যায় আমরা কখনও কখনও স্বেচ্ছায় অখাদ্য গ্রহণ করে থাকি। এ সব ক্ষেত্রে হয আমাদের কেউ প্ররোচিত করে, অথবা আমরা খাদ্য চিনি না বলে এরকম ভুল হয়ে থাকে। আমরা যখন নাচ, গান অথবা সাহিত্যকেই সংস্কৃতি বলে মনে করি তখন সেটা খাদ্য না চেনার তুলনা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা তখনই সব চাইতে বিপন্ন যখন প্ররোচনার ফলে খাদ্য চিনবার শক্তিটা হারাতে থাকি। আমরা এ অবস্থায় তৎকালীন ফ্যাশানের মঞ্জুরমতো ঘর বাড়ি, পোশাক, রেফ্রিজারেটার, গাড়ি এবং নানাবিধ গ্যাজেট সংগ্রহ করে মনের ক্ষুধার তৃপ্তিবিধান করে থাকি। এবং তখন একথা মনে থাকে না খবরের কাগজে এবং কিয়স্ক বিজ্ঞাপনে বণিকরা পণ্যদ্রব্যের যে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে তাই আমাদের প্ররোচনা দিচ্ছে, চোখের ক্ষুধার সৃষ্টি করছে, অখাদ্যকে খাদ্য বলে চেনাচ্ছে। তখন আমাদের মনে থাকে না মাটির মেঝে, খড়ের ছাদযুক্ত একটা বাড়ি যেখানে হ্যারিকেনের আলোটাই অত্যুজ্জ্বল বলে মনে হয়, সেখানে মনন এবং ক্রিয়াকর্মের এমন গূঢ় অনুশীলন সম্ভব যার ফলে প্রচুর সুপক্ক মাংস এবং কেক, এবং আঙ্গুর এবং মধু, ক্ল্যারাট এবং হেলেনের নিতম্ব, লম্বা মডেলের গাড়ি এবং নবতর গ্যাজেটও যে পরিতৃপ্তি দিতে পারে না, সেই পরিতৃপ্তি সম্ভব। অবশ্য এটাও প্রামাণ্য নয় যে একমাত্র মাটির মেঝে উপরে এবং খড়ের ছাদের নিচেই সংস্কৃতি অবস্থান করে। এ বিষয়ে সহজ সত্যটা এই সংস্কৃতি

যে অনুশীলন তার উদ্দেশ্য বস্তু-সংগ্রহ নিরপেক্ষ। এবং সেদিক দিয়ে যাকে আমরা জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বলি তার চেষ্টায় সেই উপলব্ধি নাও থাকতে পারে যা লাভ করা সংস্কৃতির উদ্দেশ্য। কিন্তু তা হলে এই উপলব্ধিটা কী রকমের? কার স্বাস্থ্য দেখে আমরা বুঝতে পারি তার দেহের ক্ষুধার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়েছে কিনা। অন্য কথায়, আমরা অনুমান করতে পারি প্রকৃত ক্ষুন্নিবৃত্তি কাকে বলে। এক্ষেত্রেও সেই বিশেষ উপলব্ধি হয়েছে, তার সাক্ষাৎ পেলেই আমরা বুঝতে পারি উপলব্ধি কাকে বলা হবে।

সুতরাং অনুমান করি আমেরিকান অথবা চাইনিজ ডলার, অথবা রুবল অথবা ষ্টার্লিং এর তারতম্যের সঙ্গে সংস্কৃতির সাপেক্ষত্ব নেই। সেই তৈলপাত্রের গল্পের কৃষক এবং নারদ যেমন হরিভক্তিতে পরস্পরের তুলনীয়, রোমের যে কোন সম্রাট এবং একজন ক্রীতদাসের পক্ষে যেমন প্রকৃত ক্রিশ্চিয়ান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তেমনভাবে একই সঙ্গে জনগণের এবং অভিজাতের পক্ষে সংস্কৃতিনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব। এবং অনুমান করি, এটা বলে দেয়া উচিত জনগণ যা কিছুতে তৃপ্তি পায় সেই নাচ গান হাসি তামাসা যেমন সংস্কৃতি নয়, তেমন নাচ গান সাহিত্যের যে সব ধরণ ধারণ চর্চার ফলে অনুপযুক্ত বোধে পরিত্যক্ত হয়ে গ্রামের আনাচে কানাচে স্থান পেয়েছে তাকে লোকসংস্কৃতি বলা উচিত হবে না।

উচিত নয় এজন্য যে তাতে জনগণকে ঠকানো হয়। একটা বিশেষ বয়স হলেই যেমন ভোটে অধিকার হয়, তেমন সংস্কৃতিতেও হবে এমন ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি না করাই ভালো। অখাদ্যকে খাদ্য বলে চিনিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস—ত্রিশ বছর পরে

ইংরাজিতে এরকম একটা বাক্‌চাতুর্য আছে যে কোন সাহিত্য ত্রিশ বছর বেঁচে থাকলে তাকে সাহিত্য বলা হবে, কোন সাহিত্যিকের আদর শতাব্দীকাল অক্ষুণ্ণ থাকলে, তাকে প্রতিভাবান বলা হবে, হাজার বছরের পরেও আলোচিত হলে তাকে হোমরের পাশে স্থান দেওয়া হবে। বাকচাতুর্য কখনই পুরো সত্য নয়, তাতে কিছু খাদ-মিশানো প্রজ্ঞা থাকে। কোন সাহিত্য যদি ত্রিশ বছর কাটতে না কাটতেই জনপ্রিয়তা হারাতে বসে তবে এরকম সন্দেহ হওয়া অযৌক্তিক নয়, যে তা নিতান্ত তৎকালিক প্রয়োজনের রম্যরচনা ছিল।

বিপ্রদাসের প্রকাশের বৎসর ১৯৩৫। আমাদের কাল থেকে কিছু বেশি ত্রিশ বছরের ব্যবধান।[১] এ আর অস্বীকার করা যায় না এই ত্রিশ বছরে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে, বিশেষভাবেই পেয়েছে। অন্তত আমাদের আশঙ্কা আছে ১৯৭৬এ তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব করা হয়তো আদৌ সম্ভব হবে না।*

আর সব কিছুর ইতিহাসের মতো সাহিত্যেরও ইতিহাস আছে, এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্রকে সত্যের খাতিরেই বেশ খানিকটা জায়গা দিতে হবে। সেখানে আগের এবং পরের ঔপন্যাসিকের সঙ্গে বিবর্তনের ধারায় কোথায় কতটুকু শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধ তার বিশ্লেষণ করা হবে, এমন কি সমকালীন সমাজ সম্বন্ধে তাঁর কতটুকু সচেতনতা ছিল তা নির্ণীত হবে। যে কোন ঔপন্যাসিকের পক্ষে ইতিহাসের সাহিত্যে এমন স্থান পাওয়া শ্লাঘার বিষয়, কিন্তু একজন সাহিত্যিকের পক্ষে ত্রিশ বছরেই ইতিহাসের অংশ হয়ে যাওয়া গৌরবের ব্যাপার নাও হতে পারে, কারণ ইতিহাস একরকমের কবরখানাও বটে।

অথচ শরৎচন্দ্র এক সময়ে কী বিস্ময়কর রকমে জনপ্রিয় ছিলেন তা এখনকার চল্লিশোর্ধ নরনারীর মনে থাকার কথা। কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না শরৎচন্দ্র বয়্যালটির মতোই জনগণের বিস্মিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন।

এখন, জনপ্রিয়তা শব্দটি সাহিত্যের আসরে গোলমাল সৃষ্টি করতে পারে। যে অর্থে এই শব্দটিকে কমিক এবং রম্যরচনা অথবা ফ্যাশান সম্বন্ধে ব্যবহার করা যায় শরৎচন্দ্রের ভাবগম্ভীর উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে সে অর্থ যে প্রয়োগ করা হচ্ছে না তা বলা বাহুল্য। গত ঋতুতে লেখা অনেক জনপ্রিয় গান এখন কানে গেলে কষ্ট হয়, কিন্তু চারশো বছরের পুরনো চণ্ডীদাস এখনও জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তার অন্য নাম জীবন্ত অস্তিত্ব। একথা অস্বীকার করা যায় না শরৎচন্দ্রের সাহিত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবন্ত বলে অনুভূত হচ্ছে না।

১। শুভদা এবং শেষের পরিচয়ের প্রকাশ কাল যথাক্রমে ১৯৩৮ এবং ১৯৩৯। কিন্তু শুভদার রচনাকাল ১৯৩৮এর অনেক আগে এবং শেষের পরিচয় অনেকাংশে শরৎচন্দ্রের নয়।

* সংযোজন : শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়েছিল। নানা সংস্করণে উপন্যাসগুলি পুনর্মুদ্রিত ও বিক্রিত হয়েছিল। একরকম জনপ্রিয়তাই প্রমাণিত বটে , কিন্তু যাঁরা শিল্পটাকে বুঝবেন, তার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরবেন তাঁদের উপেক্ষা অব্যাহত। এই সেদিন শরৎচন্দ্রের একটা উপন্যাসকে আলোচনার সময়ে একজন অধ্যাপক অবিশ্বাসভরে হেসে বললেন, আমি শরৎচন্দ্রে শিল্পবোধ আরোপ করছি। ওটা নাকি তাঁর তেমন ছিল না।

অবশ্য এরকম বলতে পারা যায় ১৯৩৫-এর পর থেকে ত্রিশ বছরে বাংলাদেশের উপর দিয়ে যে সময়টা চলে গেল ঘটনাপ্রসবের দিক দিয়ে তা একটি শতাব্দীর সমতুল্য! কী না ঘটেছে এই সময়ে? দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, শ্মশান—জাতি হিসাবে এ সবেরই অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়েছে। মানুষের সৃষ্ট সেই মন্বন্তরে শুধু ক্ষুধাখিন্ন মানুষেরই মৃত্যু হয় নি, মনুষ্যত্বেরও। কৌমার্যকে পণ্য করা হয়েছে, চটের থলে হাতে অন্ধকারে চলতে শিখেছি, সে অন্ধকার মনময় প্রসারিত হয়েছে, মানুষ অন্য মানুষকে পিটিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে স্বজাতি প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, ক্ষুধায় মানুষ আহার্য চেয়ে গুলি খেয়েছে, ভোট সংগ্রহের জন্য কি করে মিথ্যাচারকে একটা জাতীয় শিল্পে পরিণত করা যায় তার উচ্চমানের শিক্ষালাভ হয়েছে। আর এই দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, শ্মশান এবং রাজদ্বারে যারা আমাদের বন্ধু হতে পারতো তাদের হারিয়েছি। এ সবের যাতে কোন প্রতিবাদ না ঘটে সেজন্যই যেন সুভাষচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে কালটা বিচ্যুত হল!

কারো কারো পক্ষে অনুমান করা সম্ভব যে জাতিটা আমরা ছিলুম এখন আর তা নেই।

অন্য সব দেশের মতোই এদেশের সাহিত্য ব্যাপারটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের, তা না ধনীর, না সর্বহারার, অধিকাংশ সাহিত্যের মতো শরৎচন্দ্রের সাহিত্যও মধ্যবিত্তের সৃষ্টি মধ্যবিত্তের জন্য[২]; আর বাংলা দেশে গত ত্রিশ বছরে মধ্যবিত্ত সমাজ চেনার অতীত বদলে গিয়েছে। এটাকেই কারো কারো পক্ষে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের মূল্যহ্রাসের কারণ বলে মনে হতে পারে। তাঁদের যুক্তির সমর্থনে একটা সহজ উদাহরণ আমরা নিতে পারি। এক সময়ে একান্নবর্তী পরিবার আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল। শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য গল্পের[৩] পটভূমি এই একান্নবর্তী পরিবার। সেই পটভূমিতে যা স্বাভাবিক তেমন আভ্যন্তরিক ঘাতপ্রতিঘাতে কাহিনীগুলোকে পরিণতির দিকে এগিয়ে দিয়েছে। এই একান্নবর্তী পরিবার সাম্প্রতিক কালে একটা অর্থহীন শব্দ। ওটা যে ঠিক কী ছিল সে সম্বন্ধে জানার ইচ্ছাও আমাদের নেই। কেউ যদি বলেন এই সুন্দর গল্প কয়েকটি এমন একটা অবান্তর পটভূমিতে বসানো যে তার চরিত্রগুলোকেও আমাদের কাছে অবান্তর মনে হয় তবে তাকে সব দিক দিয়ে বিচার-বুদ্ধিহীন বলা যাবে না। অন্য দিকে তার এই কথাগুলো প্রমাণ করবে অন্তত তার কাছে এ সাহিত্যে আর জীবন্ত কিছু নয়! বলা বাহুল্য উপন্যাস আর রূপকথা এক নয়, এবং রূপকথার পটভূমি চূড়ান্ত অবান্তর হলেও তা বরং রসের পরিপোষক হতে পারে, কিন্তু উপন্যাসের ভিত্তি বিশ্বাস-উৎপাদন, সে বিশ্বাস টলে গেলে উপন্যাসই আর পাঠযোগ্য থাকে না।

মধ্যবিত্ত সমাজের পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তনের আগেকার সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে যদি এ কথাগুলি মনে হয় তবে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বরং আরও বেশী মনে হবে, কারণ আমরা অনেকদিন থেকেই শুনে আসছি তিনি সমাজ-সচেতন লেখক ছিলেন। শরৎসাহিত্যের সঙ্গে বর্তমান লেখকের যখন পরিচয় ঘটছে, তখন তাঁর এই সমাজচেতনতার দিকেই তৎকালীন মনীষীদের, রসজ্ঞ পাঠকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। শরৎচন্দ্র পতিতের পক্ষাবলম্বী, তিনি সমাজের বিচ্যুতির কঠোর সমালোচক, তিনি সমাজের অনেক অপশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, নূতন সমাজনীতি ও প্রেমের আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করার বিশেষত্বর জন্যই তিনি বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত—এ রকম একটা ভাবমূর্তি তখন পাঠকদের মনে সৃষ্টি হয়েছিল। এমনও শোনা গিয়েছে এমনভাবে সমাজসচেতন না হলেই তা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক হত, কারণ তখন সমাজের কি ভিতরে কি বাহিরে একটা আলোড়ন চলেছে, তা যেমন

২। সাহিত্য মধ্যবিত্তের সৃষ্টি হওয়া উচিত কি না, অথবা সাহিত্য মধ্যবিত্ত বিরোধী হলেও, অথবা শ্রেণীলোপ পেলে আমরা সবাই মধ্যবিত্ত হবো কি না, অনুমান করি তা নিয়ে আলোচনা এখানে অবান্তর হবে।

৩। বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, মেজদিদি, মামলার ফল, নিষ্কৃতি।

পরশাসন থেকে মুক্তির চেষ্টায় তেমন সমাজকে সবদিক থেকে আধুনিক করে নেয়ার প্রয়াসে। উপরন্তু এ কথাও সত্য শরৎচন্দ্র কোন প্রকাশ্য রচনার সাহায্যে এই ভাবমূর্তি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন নি।

সাহিত্যে কতটুকু সমাজ-সচেতনতা প্রকাশ পাবে, সর্বকালের পক্ষে সত্য কোন আধ্যাত্মিক সমস্যা সাহিত্যের হতে পারে কি না, হলে তা সৎসাহিত্যই হয় কি না—এ রকম ধরনের নানা তর্কবিতর্ক সম্বন্ধে আমরা অবহিত আছি। এটা নিঃসন্দেহে বলে দেয়া যায় আধুনিক কালে লেখকের সমাজচেতনতার ইদৃক্‌তা এবং ইয়ত্তার বিচারই রসবিচারের মূলকথা বলে মেনে নেয়াই প্রথাসিদ্ধ। যা দিয়ে সমাজের উপকার হয় না, তেনাহং কিং কুর্য্যাম এরকম বলাটাকেই ঠিক বলা বলে মনে করা হয়। এমন কি মন্ময় কবিতার ক্ষেত্রেও সেই মন কতখানি সমাজসচেতন এবং সেই মন কোন সমাজে বাস করেছিল তার হিসাব নিয়ে কবিতার মূল্য যাচাই হয়ে থাকে। আগেই যার সমাজসচেতন ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয়েছে, এখন যে অধিকাংশ সময়ে তার কথায় সমাজ সচেতনতার কথাই উঠবে, সেই দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষিত হবে, এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মতো।

সমাজের অবস্থার পরিবর্তনের ফলে শরৎচন্দ্র বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য যে সব উপাদান ব্যবহার করেছিলেন, তাতে আমাদের বিশ্বাস টলে গিয়েছে, তা আগেই বলা হয়েছে ; নূতন সমাজনীতি ও প্রেমের আদর্শের প্রতিষ্ঠাকারী শরৎচন্দ্রের এই সমাজসচেতন ভাবমূর্তি আমাদের চোখের সম্মুখে থাকলে কী ফল ফলতে পারে তা এখন লক্ষ্য করা যাক। ইতিমধ্যে আমরা ইঙ্গিত করেছি শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক সমাজ আর আমাদের সাম্প্রতিক সমাজ এক নয়। তাঁর সচেতনতা সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কাছে জীবন্ত নয়। এটাকে মেনে নিয়ে অগ্রসর হলে আমরা যা সব দেখতে পাব তাব উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে—ব্রাহ্মধর্মের দিকে বাঁকা দৃষ্টি ছিল শরৎচন্দ্রের, কৌলীন্যপ্রথা সম্বন্ধে ধিক্কার উচ্চারণ করেছেন, গ্রাম্যসমাজের নীচতা স্বার্থপরতাকে কষাঘাত করেছেন, যাকে আমরা পতিতা মনে করি শরৎচন্দ্র পড়ে মনে হবে সেও মহত্ত্বে অসাধারণ হতে পারে। শরৎচন্দ্রের বাল্যকালে ব্রাহ্মধর্ম কতটা বলশালী ছিল তার হিসাব না নিয়েও বলা যায়, তাঁর দত্তা ও নববিধান রচনা কালে তা সামাজিক শক্তি হিসাবে এমন কোণঠাসা হয়েছে যে, তার দিকে বাঁকা দৃষ্টিপাতের যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। কৌলীন্যপ্রথা বঙ্কিমযুগেই এমন দশায় পৌঁছেছিল যে, এমন কি বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ নিবারণ প্রচেষ্টার লেখা পুস্তিকাতে বঙ্কিমচন্দ্র ডন্‌কুইক্‌সোটিক উৎসাহ বাহুল্য লক্ষ্য করেছিলেন। সুতরাং বামুনের মেয়ের প্রয়োজন ছিল না, তা তখনই অবান্তর ছিল।

রমা ও রমেশের গ্রাম্যসমাজে নীচতা, স্বার্থপরতা, ছোটখাটো মানুষের ক্ষমতা লিপ্সার চক্রান্ত তখনকার দিনে হয়তো সত্য ছিল। কিন্তু এখন গ্রামে জমিদার নেই, শিরোমণি তর্কচুঞ্চুদের কোন প্রভাব আর চোখে পড়ে না। এখন পঞ্চায়েতেরা এসেছে, গ্রামপ্রধানরা এসেছে। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য করায়ত্ব করার জন্য ভোট সংগ্রহের মিথ্যাচার তর্কচুঞ্চুদের মিথ্যাচারের মতোই পীড়াদায়ক। রমা রমেশের গ্রাম্যসমাজের নীচতা রূপ বদলেছে বললে কম বলা হয়, বরং বাড়বাড়ন্ত হয়েছে তার, সেই গ্রাম্যতা নগরকেও আচ্ছন্ন করেছে ; তাকেই আমরা রাজনীতি বলতে ভালোবাসি। যে জন্য এই বাড়বাড়ন্ত অবস্থা তা আমরা আন্দাজ করতে পারি। কী করলে এই কদর্যতা দূর হতে পারে, সে সম্বন্ধে ইকোনমিক্সের সাধারণ ছাত্রও উপদেশ দিতে পারে, কিন্তু শরৎচন্দ্র মুক্তির কোন ইঙ্গিতই দেননি। এদিক দিয়ে সুতরাং তাঁর সমাজ সচেতনতাকে নিষ্ফল বলা যেতে পারে।

অন্যদিক দিয়ে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে আমাদের পূর্বসূরীদের আবিষ্কৃত সমাজ-সচেতনতা অবৈজ্ঞানিকও বটে। সাবিত্রীর মতো মেসের ঝি যদি বা সম্ভব হয় তাকে ভালোবাসা কোন সংস্কৃতিসম্পন্ন পুরুষের পক্ষেই কি সম্ভব? অথবা একজন নাচওয়ালীকে কি সত্যই তার আকাঙ্ক্ষিত

শুচিতাপূর্ণ প্রেমজীবনে প্রতিষ্ঠা করা যায়? যার চোখ কানা করে দেয়া হয়েছে, তার চোখ যদি বা ফিরিয়ে দেয়া যায়, তার চোখ যে কৃত্রিম তা কি সে বিস্মৃত হবে? অথবা যাকে খর্ব করা হয়েছে, পঙ্গু করা হয়েছে, বাড়তে দেয়া হয়নি তাকে আর সহজ স্বাভাবিক করা যায় না এটাই তথ্য। আমাদের এই পৃথিবীতে এমন কতগুলো বিষয় আছে যা কৌমার্যের মতো একবার হারালে চিরকালের মতোই হারিয়ে যায়। আমাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস এবং রোদন সত্ত্বেও। মেসের ঝি তার সমস্ত অতীতকে বিস্মৃত হবে, অভ্যাস চিন্তার ও অনুভূতির অনুষঙ্গ পিছনে ফেলে দেবে মনের শ্লেট মুছে দেবার এমন রাসায়নিক দ্রব আবিষ্কার হয়নি। চোখের জলের পক্ষেও এটা সম্ভব নয়।

অথবা নর্তকীর প্রেম কি এক আকাঙ্ক্ষিত শুভ্রতার দিকে ধাবিত হতে পারে? আর তা হলেও তার সামাজিক মূল্য কী? সমাজের চোখে প্রেমের মূল্য হয়তো সুস্থ সানন্দ পরিমণ্ডল রচনা করা, কিন্তু তেমন প্রেমের অন্য একটি পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। কারণ তেমন প্রেম কাগজের ফুলের মতো বন্ধ্যা হতে পারে না। সন্তান লাভ ছাড়াও হয়তো পুরুষের প্রেম তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হতে পারে, যদিও তেমন উদাসী ষোলোআনা পুরুষ কাল্পনিক মাত্র, স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রেম তখনই পরিতৃপ্ত যখন পুরুষের ক্রীড়ার স্বর্ণকলস দুটি প্রাণদায়িনী ক্ষীরে ভরে উঠেছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র যদি গল্পপর্ব রচনা করে রাজলক্ষ্মীকে সূতিকাগৃহে পাঠাতেন, তবে কুমারসম্ভবের নজির থাকা সত্ত্বেও আমাদের তো বটেই সমাজসচেতনতায় নিবদ্ধদৃষ্টি পূর্বসূরীদের পক্ষেও অট্টহাস্য সংবরণ করা কঠিন হত। অথবা যদি মানা যায় কমলের ঈপ্সিত স্বাধীন প্রেম ওই নারীদরদী শরৎচন্দ্রেও উদ্দিষ্ট সমাধান, তবে আমেরিকার সেই নায়িকাদের কথাও মনে আনতে হবে যারা ব্রেকফাস্টের পরে একবার, ডিনারের পরে আর একবার পুরুষ বদলানোর অধিকার রাখে। এতে একটা মাত্র অসুবিধাই হতে পারে, আর তা সমাজেরই, আর্টের নয়! কারণ এই স্বাধীনতা মেনে নিলে সমাজটা বুড়োদের, বিগত-যৌবনেদের এক শিশুহীন সমাজ হয়ে দাঁড়াবে কিছুদিনের মধ্যেই, কিন্তু নারীকে এমন অভিশপ্ত দেখার কথাও কল্পনা করতে চাই না, কারণ সেই শিশুহীন সমাজে চল্লিশোর্ধা নারী যদি বা উর্বশীর মতো আকাঙ্ক্ষিতা থাকে, তার দিকে ভ্রূক্ষেপ করার মতো কোন অস্তিত্বই থাকবে না।

অন্যদিকে শরৎচন্দ্রকে যেখানে বিপ্লবীর মতো সমাজসচেতন দেখায় সেখানেও অত্যন্ত পুরনো আদর্শে তার আত্যন্তিক বিশ্বাস ধরা পড়ে যায়। রাজলক্ষ্মী কখনই ভুলতে পারে না সে বিধবা, তার মাঝে মাঝেই মনে পড়ে যায় সে বঙ্কুর মাও বটে। রাজলক্ষ্মীর মাতৃত্ব অনেক কথায় বলা না হলেও আমরা জানি শরৎচন্দ্রের ধারণায় মাতৃত্বের নিবিড় ভালোবাসা নিজগর্ভে ধারণ করার উপরে নির্ভর করে না। সাবিত্রীর কখনও পদস্খলন ঘটে থাকতে পারে কিন্তু যখন আমরা তাকে দেখতে পেলুম আচার আচরণ রুচিতে হিন্দু বিধবার পুরনো আদর্শে বিশ্বাসী, এমন কি অমন যে কমল সেও, মনে পড়ছে, দিনে একবার হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে থাকে। আর সেটা যে তার নিরামিষবাদিতা নয় তাও বুঝতে দেরি হয় না।

সুতরাং সমাজসচেতনতা যার ভাবমূর্তি সেই শরৎচন্দ্রের চিন্তা এবং স্মৃতি হয় অবাস্তব এবং অপ্রয়োজনীয় নতুবা অবৈজ্ঞানিক। শরৎচন্দ্রের কালে যেমন ছিল আমাদের কালেও তেমন সমস্যার বিষয় আছে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের উপন্যাস থেকে সে সমস্যার সমাধান খুঁজতে যাওয়া সমাজের ক্ষতির কারণই হবে। কারণ কোন উপন্যাসেই সমাজের সমস্যাগুলোর সমাধান পাওয়া যায় না। এটা সব আর্ট সম্বন্ধেই মূলকথা যে, আর্টের নিজের সমস্যা আছে, আর সে সমস্যা সমাজের সমস্যা নয়। অস্বীকার করা যায় না যে, সাহিত্যের পথ বিচার এবং বিশ্লেষণের নয়, গঠন এবং বিশ্বাস উৎপাদনের। অস্বীকার করা যায় না একজন ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, অথবা কবি আবেগের ভাষাতেই কথা বলেন। আবেগ বরং বিচারশক্তিকে আবিলই করে। সে পথে সত্য উদ্ঘাটন হয় না। বিশ্বাস-উৎপাদন আর সত্য-উদ্ঘাটন এক নয়। এখন, সমাজসচেতনতা তখনই সমাজে প্রকৃত উপকার করতে পারে যখন,

তা সত্য আবিষ্কারের সহায়ক এবং সত্য আবিষ্কৃত হয় বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে। সমাজের বৈষয়িক অগ্রগতির পক্ষে সমাজতন্ত্রের পুস্তকই মূল্যবান, সাহিত্য নয়। সাহিত্যে সমাজ-সচেতনতা এই দিক দিয়ে প্রচলিত তৎকালীন মতবাদের প্রচারকারী হতে পারে। এই মূল কথাটা আমাদের মনে রাখা দরকার, জ্ঞানলাভের জন্য সাহিত্যপাঠ লাভের হয় না। জ্ঞানলাভের জন্য সাহিত্যপাঠ আর আলোর জন্য আগ্নেয়গিরির কাছে যাওয়া একই কথা।

অনুমান করি, এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, যে কোন সাহিত্যিক সম্বন্ধে সমাজসচেতন, সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, নারী দরদী এমন ভাবমূর্তি তৈরি করতে সাহায্য করা সাহিত্যিককে মুখোস পরিয়ে দেয়ার সামিল। যে মুখোস একটু পুরনো হলেই আর দর্শক টানে না। অতীতে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এমন অন্যায় করা হয়েছে বলে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে। এবং সে অন্যায়ের উৎস এখনও শুকিয়ে যায় নি। বলা বাহুল্য সে উৎস বিশ্ববিদ্যালয়ে, স্কুল এবং কলেজে। স্বীকার করা উচিত বলে মনে করি, বাংলাভাষায় ক্রিটিক বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন শরৎচন্দ্রের সময়ে। এবং শিক্ষকদের কাছে যা শিখেছি তাই এক কালে শরৎচন্দ্রের আর্টের জনপ্রিয়তার পরিবর্ধক ছিল। (মনে রাখতে হবে রিভিউয়ার এবং ক্রিটিক কদাচিৎ এক হয়ে থাকে। রিভিউয়ার বড়জোর ছমাসের জন্য কোন সাহিত্যিককে জনপ্রিয় অথবা জন-অনাদৃত করতে পারে।) এখন বোঝা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সমালোচকরা শরৎচন্দ্রের যে সমাজসচেতন ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিলেন প্রকৃতপক্ষে এখন পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার দিকেই প্রকৃত পাঠকের মন ধাবিত হয় এবং নিরাশ হয়ে ফিরে আসে।

শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা হ্রাসের অন্য আর একটি কারণ আছে, অনুমান করা যায়, সেটা অতীতের কৃতকর্মের ফল নয়। এমনকি জনপ্রিয়তার বাহুল্যের প্রতিক্রিয়াও নয়। আগে যে কারণটির কথা বলা হল তার মূলে যদি শরৎচন্দ্রের সমাজসচেতনতা থাকে, দ্বিতীয় এই কারণটির উৎপত্তি বর্তমান পাঠকের আত্মসচেতনতায়। এই আত্মসচেতন দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের পৃথিবীকে পুরুষহীন পৃথিবী বলে মনে হতে পারে। এ যুগে যেন পুরুষের চিন্তাশীল না হয়ে উপায় নেই, এযুগের উপন্যাসে পুরুষরা র‍্যাশানাল, ইন্টেলেক্চুয়াল, অসেন্টিমেন্টাল, সংঘর্ষের পথে ধাবমান, যন্ত্রণাদগ্ধ, তার চারিদিকে ক্ষয়িষ্ণুতা, তারা যখন কোন বিপ্লবের সমর্থক নয়, তখন হয় হাল্কাভাবে নিহিলিস্ট কিম্বা উদাসীনতার চরম উৎকর্ষ, কিছুতেই কিছু এসে যায় না, যখন নিজেকে চিনতে পারে তখন নিজের ঘরেই বাইরের লোক। প্রেমের ব্যাপারে নায়িকার যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, সে চোখে একটুকরো শূন্যতা থাকতে পারে, কিন্তু সেটা নীড়ের গভীরতা নয়, মুহূর্তের জলসঞ্চারে সে চোখ দুটি সমুদ্রের গভীরতা পাবে এমন কল্পনা করাই অনুচিত। আর নায়কই বা কোথায়? পুরুষ এখানে হোমোসেক্সুয়াল, কিম্বা কোন না কোন কমপ্লেক্সগ্রস্ত। নারীসঙ্গ তার দশটি অভ্যাসের মতো একটি উত্তেজক ব্যাপারে।

শরৎচন্দ্রের পৃথিবীকে যেন বর্তমানের পৃথিবী বলে মনে হয় না এ কালের পাঠকের কাছে। কর্তারা আফিমের মৌতাতে গুড়গুড়ির নল ধরে আছে, যেন তেমন মেজাজ কোনদিনই পৃথিবীতে সম্ভব ছিল। শ্রীকান্ত লোকটিকে লক্ষ্য কর, যেন সে শাস্ত্রোক্ত নিষ্ক্রিয় পুরুষ। এটাই অবশ্য শেষ কথা নয়। শরৎচন্দ্রের পৃথিবীতে পুরুষরা কখনও কখনও তীক্ষ্ণ, কিন্তু সে তীক্ষ্ণতা যেন অনুভূতির। শরৎচন্দ্রের পুরুষরা অলস নয়, ভোঁতা নয়, তারা হৃদয়বান, দুঃসাহসী, তারা অনেক ক্ষেত্রেই প্রচণ্ড রকমে আদর্শবাদী। হঠাৎ শুনলে এগুলিকে প্রশংসাসূচক বিশেষণ বলে মনে হলেও ঠিক এইগুলির জন্যই তারা আধুনিক পুরুষের লক্ষণাক্রান্ত নয়। অনুমান করি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের আত্মসচেতনতা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নিজের প্রতিকৃতি খুঁজে না পেয়ে হতাশ এবং তার ফলে বিমুখ।

কিন্তু লেখকের সমাজসচেতনতা এবং পাঠকের আত্মসচেতনতা একটা কৌতুকের সৃষ্টি করে

চলেছে, তা লক্ষ্যে আনতে হবে।'আর্টে নিজের অনুভূতির প্রতিকৃতি খোঁজা এবং সেখানে সমাজের পীড়ার ওষুধ পেতে চাওয়া, একই রকমের দোকানদারি[৪] কি না ভেবে দেখা দরকার।

দৃষ্টিগ্রাহ্য জগৎ সাহিত্যের পশ্চাদ্ভূমি মাত্র। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মতো যে কোন বিশিষ্ট সমাজব্যবস্থাকে পশ্চাদপট হিসাবে ব্যবহার করতে পারে ঔপন্যাসিক। সেখানে তার উদ্দেশ্য সেই বিশিষ্টকে অতিক্রম কবে সর্বস্থানের এবং সর্বকালের মানুষটির সম্বন্ধে সার কথা বলা। কোন বিশিষ্ট সমাজের পক্ষে কী ভালো কী মন্দ তা বলার জন্য সাহিত্য নয়। তার জন্য সংবাদপত্র আছে। সমাজ-সচেতনতা ততটুকুই সাহিত্যের কাজে লাগে, যতটুকু গঠনের দিক দিয়ে পাঠকমনে বিশ্বাস উৎপাদনে প্রয়োজন। অন্যদিকে আর্ট যেখানে আর্ট, সেখানে আমাদের আবেগকে উত্তেজিত করা অথবা অনুভূতিকে প্রভাবিত করা তার উদ্দেশ্য নয়। বরং তার শেষ ফল ভারমুক্তি অপসৃতি হতে পারে। চিত্র, ভাস্কর্য, আমাদের দেশের ক্লাসিক সঙ্গীতে, ইউরোপীয় যন্ত্রসঙ্গীতে এ সত্যটা সহজেই ধরা পড়ে। সাহিত্যের উপাদান শব্দ নিয়ে। সে শব্দ সাহিত্যের বাইরে সমাজের নানা শাস্ত্রে ব্যবহার হয় বলে, সাহিত্যে তাদের দেখা পেলেই সেই কাজকর্ম এবং শাস্ত্রাদির স্মৃতি মনে আসে। এরই ফলেই সাহিত্যের উদ্দেশ্য নিয়ে গোলযোগ ঘটে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা বলে দেয়া যায় আমাদের অনুভূতিকে আরও আবেগভূয়িষ্ঠ করা, আরও ফলাও করে বলা, যে আবেগে আমরা ঈষৎ স্পন্দিত, তাতেই কম্পমান করে দেখানো, সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। বরং যে আবেগে আমাদের হৃদয় মথিত, তারই জ্বলে জ্বলে অবশেষে নিঃশেষে পুড়ে যাওয়াই সাহিত্যের উদ্দেশ্য হতে পারে। সুতরাং, সাহিত্যে আমাদেরই অনুভূতিকে আরও রংদার করে বলা হল কি না, তার খোঁজ করা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। এজন্য সাহিত্যে ঠিক আমাদের কালের কথা বলা হল কি না, এ প্রশ্ন তোলা অর্থহীন।

একালিনীকে নিয়ে ঘর করার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা থাকা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু তাই বলে সে কালের তাঁরা কুরূপা ছিলেন, এরকম বলা এমন একটা অদাক্ষিণ্য যাতে আমাদের একনিষ্ঠতার সাড়ম্বর ঘোষণার সঙ্গে অন্য অনেক কিছুর অভাব ধরা পড়ে।

আমাদের মনে এরকম একটা ধারণা হয়েছে যে, আমরা আগেকার মতো আবেগসর্বস্ব নই, বরং বুদ্ধিজীবিতা আমাদের সাধারণ লক্ষণ। কিন্তু এ ধারণাটাকে যাচাই করে নেয়ার দরকার আছে। আমরা কি আরও বেশি আবেগ চালিত নই? আগেকার দিনে যাকে সংযম নামে পুরুষের অর্জনীয় গুণ বলে মনে করা হতো, আমরা আত্মপীড়ন নামে এখন তাকে পরিত্যাজ্য মনে করছি। আমাদের ক্রোধ, অসূয়া, ঘৃণা, ভালোবাসা কি আগেকার চাইতে বিচারশীল হয়েছে! তা যে হয়নি, তার প্রমাণই বরং পাওয়া যায়। আমরা বর্তমানে যে যুদ্ধের আয়োজন করি, তা আরও ব্যাপক ধ্বংসের। এই তো সেদিনই ইজরায়েলীদের নিঃশেষে ধ্বংস করার স্লোগান উঠেছে। আমরা কলেজ ল্যাবরেটরি এবং ট্রাম সমান অকুণ্ঠচিত্তে পুড়িয়ে থাকি। যারা ভালোবেসে বিবাহ করে, তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা বেড়ে চলেছে। এ থেকে আর যাই বলা যাক আমরা অসেন্টিমেন্ট্যাল অথবা ইন্টেলেকচুয়াল তা বলা যায় না।

শরৎচন্দ্রের নায়করা হয়তো আমাদের মতো যন্ত্রণাদগ্ধ নয়, হয়তো সবদিক দিয়ে তাদের জগৎ আমাদের পৃথিবীর মতো এমন পোড়ামাটি নয়, হয়তো বা তাদের আকাশ এমন নীরস কার্বনে পূর্ণ

৪। জনসমাজে দোকানদারের অস্তিত্বের যুক্তি আছে। দোকানদারি প্রবৃত্তি অথবা দৃষ্টিকোণ আর্টের ক্ষেত্রে অচল। সমাজ সম্বন্ধে কথা বলার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু কেমিস্ট্রি অথবা ফিজিক্সের তত্ত্ব নির্ধারণের ব্যাপারে সকলের যেমন তা নেই, আর্টের ক্ষেত্রেও তা নেই।

হয়ে ওঠেনি, কিন্তু সেজন্যই তারা অগ্রাহ্য হয়ে যাবে, এটা যে মনীষা সাহিত্য বিচার করে তার প্রমাণ নাও হতে পারে।

আমাদের কখনও কখনও এরকম অনুমান হয় পুরাকালে শরৎচন্দ্র এবং তার পাঠকদের মধ্যে সমাজসচেতনবাদীরা, নারীদরদীরা যেমন একটা বড় ধরনের প্রাচীর তুলেছিলেন, আমাদের কালেও বর্তমানবাদীরা, বুদ্ধিজীবীরা ঠিক তেমনই কিম্বা তার চাইতে বড় একটা প্রাকার গড়ে তুলছি।

অন্যদিকে এ ধরনের ব্যাপার ঘটতে দেয়ার জন্য শরৎচন্দ্র এবং তার শিল্পের অবলম্বনও খানিকটা দায়ী। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যে ভাবমূর্তি বিশ্ববিদ্যালয়েব পণ্ডিত-সমালোচকরা[৫] গড়ে তুলেছিলেন, শরৎচন্দ্র তার কোনও প্রতিবাদ করেন নি। অনুমান করি, তার একটা কারণ এই শরৎচন্দ্রের নিজের মধ্যে কোথাও দ্বিধা ছিল। কে একজন বলেছেন বলে মনে পড়ছে, শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসগুলোকে সাজালে দেখা যাবে তিনি নারী সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণাকে আঘাত দিয়ে পরবর্তী লেখায় আবার প্রচলিত ধারণাকে মেনে নিয়েছেন, তারপরে আবার নতুনতর লেখাব সে ধারণাটাকে কঠিনতর আঘাত দিয়েছেন। এটা সে সময়ের মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল—এই দ্বিধার ভাব। যখন শরৎচন্দ্র লিখে চলেছেন এবং পণ্ডিত সমালোচকবা আলোচনা করছেন তখন আমাদের জাতিটা নানাদিকে আদর্শবাদী ছিল। স্বাধীনতালাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষায় আমাদের মন বিপ্লব চাইছিল একদিকে, অন্যদিকে নিজেদের পুরনো ঐতিহ্য আদর্শকে অস্বীকার না করে সমাজ মানসকে শুধরে নেয়ার চেষ্টা চলেছিল। শরৎচন্দ্র শিল্পী হিসাবে সমাজ-মানসের এই প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেন নি।

এর ফলে অনেকক্ষেত্রে gestalt এর অভাব ধরা পড়ছে। অনুভব করা যাচ্ছে সমাজের চলমান ঘটনাবলি সম্বন্ধে প্রথম প্রতিক্রিয়াকেই শরৎচন্দ্র কোন কোন ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা বলে মনে করেছেন। এর ফলেই বিশ্বাস উৎপাদনের বাহুল্য এবং প্রাধান্য ঘটে থাকে। এই উপাদানের বাহুল্য এবং প্রাধান্য তৎকালীন জনপ্রিয়তাই লাভ করতে পারে মাত্র। অন্যদিক এই উপাদানের বাহুল্য এবং প্রাধান্য থেকে শিল্পীর, সামাজিক প্রাণী হিসাবে, পক্ষপাতিত্ব প্রমাণ করা সহজ হয় সমকালের সমালোচকদের পক্ষে।

অবশ্যই আমাদের স্বীকার করতে হবে, ঔপন্যাসিকদের শিল্প অবলম্বনই এমন যে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তাকে অনেক সামাজিক খুঁটিনাটির বর্ণনা দিতে হয়। চিত্র ভাস্কর্য, সঙ্গীত ইত্যাদির কথা বাদ দিলেও সহোদরা কবিতার যে সুযোগ আছে কনিষ্ঠ উপন্যাসের সে সুযোগ নেই। আমাকে তোমার বীণা কর যেমন নাকি অরণ্যকে করেছো একথা গদ্যে বলা হলে আমরা আদৌ বিশ্বাস করবো না যে কোন সময়ে অরণ্য কোন মরুতের বীণা হয়েছে। কিন্তু যখন শুনি 'মেক্ মি দাই লাআর ইভেন্ অ্যাজ দি ফবেস্ট ইজ্' তখন আমরা এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় যে অরণ্যের অন্য অনেক গুণাবলির মধ্যে পশ্চিম বাতাসের বীণা হওয়াও অবশ্য একটি। যখন কবিতায় শুনি মাটির আকাশের নিচে লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা পাখা মেলছে তখন আদৌ অবিশ্বাস করি না সেই বিবৃতিকে। অথবা যখন শুনি কেউ বলছেন নিষাদ, তুমি প্রতিষ্ঠা পাবে না শাশ্বত কাল, তখন রোস্টেড্ ডাকের ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও নিষাদের অপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধে এবং তার শাস্তির যথাযথতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

ঔপন্যাসিকের এ রকম ধরণের সুবিধা নেই এ জন্যই বিশেষ করে ঔপন্যাসিকদের বিশেষ দুর্বলতা

৫। একথা এখন আর গোপন নেই সমালোচক প্রধানত দুই শ্রেণীর। পণ্ডিত-সমালোচক এবং সৃজনশীল সমালোচক। সাহিত্যের সংসারে দুইএর অস্তিত্বের যুক্তি আছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সম্বন্ধে এখনও বিশিষ্ট কোন সৃজনশীল সমালোচকের দেখা পাওয়া যায়নি।

থাকে বিশ্বাস উৎপাদনের ব্যাপারে। এই দুর্বলতার রন্ধ্রেই তাদের তৎকালীন জনপ্রিয়তায় শনি প্রবেশ করে থাকে। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তা হয়েছে।

কিন্তু কোন সাহিত্যিক সম্বন্ধে, যদিও তিনি বহু সম্মানিত অভিধার যোগ্যতা অর্জন করে থাকেন, এগুলিই শেষ কথা হতে পারে না। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধেও নয়। যখন আমরা সমাজসচেতনতা-ভিত্তিক প্রাকার এবং সাহিত্যে নিজের কাল্পনিক প্রতিকৃতি দেখার স্পৃহারূপ প্রাচীরকে টেনে নামিয়ে দিতে পারবো, এবং উপন্যাসের উপাদানগত সাধারণ দুর্বলতা সম্বন্ধে যদি অবহিত থাকি, এবং যাকে আজকালকায় ভাষায় "চালু লব্‌জ"[৬] বলে তার সমস্যা যে সাহিত্যের রসবিচারে গ্রাহ্য নয়, এ যদি জানা থাকে, তবে আমরা দেখতে পাবো, শরৎচন্দ্রের নানা ত্রুটি সত্ত্বেও, (অন্যান্য সাহিত্যিকের ও তা আছে)[৭] শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের জনপ্রিয়তা নামক সমস্যা মূলত কি করে বই পড়তে হয় এটা না জানার সমস্যা।

এটা স্বীকার করাই ভালো, অনেক বই পড়লেও কি করে বই পড়তে হয় তা আমরা অনেক সময়েই জানি না। এ জন্যই আমরা এক সাহিত্যিকের সঙ্গে অন্য সাহিত্যিকের তুলনা দিয়ে থাকি। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ভালো কিম্বা শরৎচন্দ্রের তা নিয়ে আলোচনা করি, James Joyce কিম্বা Jane Austen বড় তা নিয়ে বিতর্ক করে থাকি। এবং এরই এক পর্যায়ে যা ঔপন্যাসিক আদৌ বলতে চায়নি, তা কেন বলা হয়নি, এই প্রশ্ন তুলে থাকি।

অনুমান করি বই পড়তে জানার একটা পরীক্ষা এই হতে পারে, যে একই সঙ্গে পাঠক বিভিন্নের স্বাদ গ্রহণে সক্ষম স্বাদের পার্থক্য বোধ থাকা সত্ত্বেও। ফ্লবেয়ার, ডস্টয়েভ্‌স্কি, (উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে) যদি কোন পাঠকের কাছে সমান মূল্যবান বোধ হয়, চার্টার হাউস অব পারমা এবং টেস্‌ যদি সমান আদরের বই হয়, তবে বুঝতে পারা যাবে সে পাঠক বই পড়তে জানে। বলা বাহুল্য, ক্লাসিক পড়বার ঐতিহাসিক মূল্যায়নের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। বই পড়তে শেখার সব চাইতে বড় সুবিধা এই, সব ক্লাসিক লেখককে সমকালীন রূপে দেখতে পাওয়া যায়।

এ রকম ভাবে বই পড়তে শেখার পরে আমবা দেখতে পাবো শরৎচন্দ্রের উপন্যাস অনেক সমকালীন উপন্যাসের মতোই পঠনযোগ্য, রসসিদ্ধ এবং সেজন্যই উপভোগ্য। সে রকম পাঠক কী কী খুঁজে পাবেন তা বলা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু খুব সহজে খুব সাধারণভাবে যা শরৎচন্দ্রে পাওয়া যাবে তাকেই উদাহরণ হিসাবে উপস্থিত করা যায়। তা করতে গিয়ে, এটা খুব অন্যায়ের হবে যদি আমরা আমাদের পূর্বগ রসবেত্তাদের তাঁদের প্রাপ্য দিতে কুণ্ঠিত হই। মুখ্যত প্রেমই যে শরৎচন্দ্রকে বারবার আকর্ষণ করেছে, এ ধারণাটা তাদের আলোচনায় অনুপস্থিত নয়, যদিও যতটুকু পরিস্ফুট থাকা উচিত ছিল তা নেই।

শরৎচন্দ্রের এই প্রেম অবশ্যই মোরাভিয়া কল্পিত বৃষের ধেম্বারোহণ নয়, কিম্বা ডাইলান টমাস[৮] কথিত বিভিন্ন গ্ল্যান্ডের রসস্রাব নয়, অথচ এমন যৌনাকর্ষণ নয় যা পরিবর্তে নিঃশেষিত হতে পারে। অথবা কৌতূহল নিবৃত্তিতে ফুরিয়ে যায়। অন্যদিকে এই প্রেম অবশ্যই প্রুড্‌ নয়, বরং নিঃসংশয়ে

৬। Contemporary Vocabulary.

৭। Nahum Tate এবং Bentley কর্তৃক ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা কতখানি হাস্যকর, এবং ইতালীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক ট্যাসোর উপরে প্রভাব বিস্তার কি পরিমাণে হৃদয়বিদারক তা স্যার মরিস বাউরা এত সুন্দরভাবে আমাদের জানিয়েছিলেন যে তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা না করলেও চলে।

৮। ডাইলান টমাস সম্বন্ধে বলা একথাটা আমার নিজের পরীক্ষিত নয়। নামটা ডাইলান অথবা ডিলান তা আমার জানা নেই, কারণ ইংলন্ডে ওয়াকিবহাল মহলে কিভাবে উচ্চারিত হয় তা জেনে এসেছেন এমন কোন ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

এমন স্বাস্থ্যবান যে, সাইকাইআর্ট্রিস্টদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। প্রেম এখানে এমন যে তা অনায়াসেই কুলনাশিনী হতে পারে, প্লাবন ঘটাতে পারে। একদিকে যেমন তা সুসংস্কৃত ধর্মাধর্মের বিচারের প্রতি নিজের উপেক্ষা জানাচ্ছে, অন্যদিকে তার গতিশীল জীবনের কেন্দ্রে নিজস্ব একটা আদর্শের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ করা যায় না। একে কি পেগান বলা যাবে?

এখানে অবশ্যই এই প্রশ্ন উঠতে পারে 'প্রেম' একটা শব্দ মাত্র কি না। কিম্বা একটা কিছুর কৃত্রিম ছদ্মবেশকে এই নাম দেয়া হয়েছে। প্রেমকে হাতে তৈরি করা গেলে তাকে কৃত্রিম বলতে আপত্তি ছিল না বরং আমাদের সেই সৃষ্টির তাৎপর্য দিয়ে আলোচনা করা যেতো। প্রেম একটা আবিষ্কার। আলো এবং দহনক্রিয়া কারো কারো চোখে এক হলেও মানুষেব মন এ দুটোব পার্থক্য আবিষ্কার করেছে। এখন আর এ দুটোকে এক করে দেখা সম্ভব হচ্ছে না, যদিও সাম্প্রতিককালে এ বিষয়ে চেষ্টা চলছে। হীরা এবং কার্বন হয়তো মূলত এক কিন্তু কার্বনের কর্ণভূষণ কেউ পরে না। মানুষ হযতো মূলত পশু কিন্তু সকাল বেলার দাড়িকামানোর থেকে সুরু কবে এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত আমরা যে পশু নয় তা অস্বীকার করার চেষ্টা থেকে যাচ্ছে।

শরৎচন্দ্রই বাংলা উপন্যাসে প্রথমে প্রেম এনেছেন বলা অযুক্তির, কোন সাহিত্যিক প্রথম কী আনলেন তা বলা নিতান্ত অসাধ্য, কিন্তু এটা বলা যায় এমনভাবে প্রেমের জন্যই প্রেমের কথা এই প্রথম এতখানি করে বলা হল—যে প্রেম দহনক্রিয়া নয়, যাকে আলো বলা যেতে পারে, যদিও সে আলো নিয়ে আমরা কোন গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবো কি না তা আদৌ চিন্তার বিষয় নয়।

হয়তো আলোর স্বভাবই এই, নিছক উৎসবের জন্য আলো জ্বালালেও তা কোথাও না কোথাও অন্ধকার দূর করবেই। উৎসব থেকে অন্যত্র মন নেয়ার অবসর যদি ঘটে, আমরা তখন পরিচিত বিষয়কে নতুন করে চিনতে পারবো এমন সম্ভাবনা থাকে। আমাদের পূর্বগ সমালোচকদের এ জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে হবে যে তারা শরৎচন্দ্রের জ্বালানো এই আলোতে দেখতে পেযেছেন যে কৃপণচিত্ত মানুষের নীতিবাগীশ নিষ্ঠার চাইতে উদারচিত্ত লাম্পট্য অধিকতর সহনীয়।

কিন্তু এটা দেখতে পাওয়া আলোর সার্থকতার হিসাব নয়। এমন কিছু না হলেও আলোব জন্য আলো জ্বাললেও ক্ষতি নেই। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এই আলো কখনও একটা অসংস্কৃত মুক্তাব রূপ নিয়েছে[৯] কখনও পদ্মরাগই তার তুলনা[১০] কখনও তা একটি সুন্দর বেলোআডি কাচ।[১১] কোন সাহিত্যের মূলসূত্র বলে কিছু থাকে কি না তা আমার জানা নেই। সে রকম বলা অসঙ্গত না হলে বলা যেতো এই প্রেমের ধারণা শরৎ সাহিত্যের মূলসূত্র বলে ধরে নিয়ে অগ্রসর হওয়া চলে। মূলসূত্র অবশ্যই সাহিত্য নয়। সাহিত্যে মূলবক্তব্য খোঁজাও নীতিশাস্ত্রীয় অথবা দার্শনিক ঘোষণা খোঁজাব অন্য নাম, যা সাহিত্যে উচিত নয়। দুঃখবাদ কোন সাহিত্যের মূলসূত্র না হতে পারে, কিন্তু দেখা গিয়েছে সেই বিশেষ দুঃখবাদকে বুঝতে পারলে, সেই সাহিত্যের রসগ্রহণে সুবিধা হয়। শরৎচন্দ্র যেখানে সার্থক, কোন শিল্পীই সর্বত্র সার্থক নয়, সেখানে তাঁকে বুঝতে তাঁর প্রেমের ধারণা আমাদের সাহায্য করতে পারে।

এখানে এই প্রশ্ন উঠতে পারে শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে এরকম কোন ঘোষণা রেখে গিয়েছেন কিনা। মিলোর ভিনাস যে ভাস্করের সৃষ্টি, সে তো সামাজিক মানুষের বিগ্রহ-পূজার প্রয়োজনেই একটা প্রতিমা তৈরি করেছিল, কিন্তু যা সে সৃষ্টি করেছে বলে আমরা মনে করি সে সম্বন্ধে তার কোন ঘোষণা নেই।

৯। দেবদাসের অপরিপক্কতা সত্ত্বেও এ তুলনা দেয়া যায় বলে মনে করি।
১০। গৃহদাহের সম্বন্ধে আমাদের এ তুলনার মূলে অন্তর্নিহিত দাহের ভাবটা কাজ করে থাকবে।
১১। যেমন দত্তা।

রচনাপ্রসঙ্গ

আমার সম্বন্ধে
কৌরব ২৫, সেপ্টেম্বর

মধু সাধুখাঁ
সারস্বত প্রকাশ ১ : ৮, অগ্রহায়ণ,
গ্রন্থপ্রকাশ : বাণীশিল্প, দাম কুড়ি টাকা, পৃষ্ঠা ৬৮
উৎসর্গ : শ্রীমান সুখেন্দ্র চক্রবর্তী চিরজীবিতেষু

ফ্রাইডে আইল্যান্ড অথবা নরমাংস এবং তাহার পর
এক্ষণ ৮ : ৪, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ; এই সংখ্যাটিতে শুধুমাত্র এই উপন্যাস এবং শেষপাতায় লেখক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল।
গ্রন্থ প্রকাশ : প্রতিভাস, দাম কুড়ি টাকা, পৃষ্ঠা ১৪৮
উৎসর্গ : আমার পুত্র অপূর্বজ্যোতিকে

যেহেতু দুটি উপন্যাস সম্বন্ধেই অমিয়ভূষণ নিজের মত সাক্ষাৎকারে এবং বসবোদ্ধা সমালোচককে চিঠিতে জানিয়েছেন, এই সুযোগে তার কিছু অংশ সংকলিত করা অপ্রযোজনীয় হয় না।

মধু সাধুখাঁ সম্বন্ধে
হারামজাদা কি সাধে বলেছি? বলে আবার প্রাণ দিহ, আবার দেখিবা দিহ—এত সত্ত্বেও নিজের পৌত্র অথবা প্রপৌত্র হয়ে এই নদীর দেশেতেই জন্মাতে চায়। নিলাজ নদী, নিলাজ সময়, নিলাজ মানুষ।

(সাক্ষাৎকার 'কথা বলতে বলতে' . তাপস ঘোষ, মুজিবর রহমান, প্রচেতা ঘোষ এবং সুবিমল মিশ্র .

বইটার ভাষার একটা বৈশিষ্ট্য আছে শেষ বিচারে সেই নদী হেন (জল ও সময়ের নদী) flowing, gurgling, slipping, circling, eddying, serpentine smoothness-এর নীচে depth ও continuity.

(অগস্ট নবীন কিশোরকে লেখা চিঠি)

আপনার, এরকম আমার মনে হল, এক বিষয়ে প্রিউমেজ রাফ্‌ল্‌ড্‌ হয়েছে, মদুর পাপবোধ। মদুর পাপবোধ সম্বন্ধে ইতিহাসের উপাদান যথেষ্ট, কিন্তু অতিরিক্ত বোধে প্রায়ই উপেক্ষিত। যেটুকু নাহলে নয়ই, নেয়া গেল। সাধ্য কী পেগান পেগান থাকে! কিংবা থেকেই যায় তা, উপরে উপরে উটকো কিছু সেমেটিক বোধ ঢোকে। নাহলে ইতিহাসকে অস্বীকার করে যেতে হয়। ১৫৮৬ খৃস্টাব্দ। ১২০০ থেকে ৩৮৬ বছর পরে সেমেটিক ethics, রাজকীয় ethics যেমন ধরে, মধু সাধুখাঁকে ধরেছে। দেখা যাচ্ছে সে হার্মাদি-মগাইতেও কথা বলে, ভাঙা ফারসিতেও। একই সঙ্গে পর্তুগিজ রোমান ক্যাথলিক এবং ফারসিভাষী মোগন-পাঠানী-ইসলামীদের সঙ্গে ওঠা বসা না হলে ভাষাগুলোতে কথা বলাব মত দক্ষতা আসে না। মদুর 'পরমাত্থ' 'ধম্ম' এসব বিষয়ে ঝোঁক ছিল। ঐতিহাসিক মধু সাধুখাঁর (খাঁ পদবী দ্রষ্টব্য) তা ছিল না বলি কি করে? ওদিকে মদু (সেসব সঙ্গীদের চোখে প্রকাশ্য না হলেও) সাতিশয় হারামজাদা অর্থাৎ না-পাকের চাইতে না-পাক, অর্থাৎ non-believer to the power n = হারামজাদা্‌ শুধু son of a bitch-র মতো হালকা ব্যবহার নয়। ইদানীং তার সঙ্গী এক মুসলমান যার utility নিষ্পাপ নয় বোধহয়, এক ইংলিশ ভ্রমণকারী (যারা শুধু দেশ দেখার জন্য দেশ দেখে কি?) যে জিসাস, ক্রুসিফিকেশন ইত্যাদি নিয়ে, ডাইনি পোড়ানো নিয়ে

আলাপ-গল্প করে, যে সম্ভবত পিউরিটান্ত না হোক্ প্রোটেস্টেন্ট। দেখা যাচ্ছে মধু 'লাউসি' শব্দটা উচ্চারণ না করলেও লাউস কাকে বলে জানে। ড্যাম্ কথাটা জানে। বলে, 'ড্যামেট, বোথ। নো উইমেন, ইউ সি।' কাজেই মদু কি করে বা একদম পেগান থেকে যায় ১৫৮৬ খৃস্টাব্দে! আমরা কি ধরে নিতে পারি তার সফেদ-গুল বিবিসাহেবা পাপটাপের কথা তুলে থাকবে—incestual cohabitation যেমন হয়। তাহলেও জলের তলা থেকে সূর্যের বিম্বের মতো। অর্থাৎ মদুর মধ্যে একটা self contradiction জন্মানোর সুযোগ থেকে গিয়েছে। তাহলেও সে শেষপর্যন্ত ১৫৮৬ খৃস্টাব্দে (পান্দর শো আট শককে বিস্মৃত না হয়ে) পেগান থেকে যায়। যেজন্য সে সাক্ষাৎ কালীমায়ের পুতি নয়—চলেও এবং যেন। যেন = as if এবং almost

ফ্রাইডে আইল্যান্ড সম্বন্ধে

উপন্যাসটা সম্বন্ধে যে তিন রকম মত পোষণ করা যায় তার ইঙ্গিত আপনার চিঠিতে আছে। এলেগোরিক্যাল, সিম্বলিক অথবা সোজাসুজি উপন্যাস। আমার তো মনে হয় আমাদের প্রত্যেকের জীবনের যে ঘটনাগুলো ঘটে তখন ঘটনা হিসেবে যেমন সেগুলি সুখের, দুঃখেব, নৈরাশ্যের হেতু হতে পারে, তেমনই সেই ঘটনাগুলোকে সমগ্র মানবসমাজেব পক্ষে সিম্বলিক রূপে কখনও কখনও চোখে পড়তে পারে। উপন্যাসটার নানা অর্থ সত্যই করা যায়। এটা অকস্মাৎ হয়েছে তাও নয়। আমি চেষ্টা কবেছিলুম, তুলনা দিই, একটা পাথর তৈরি করতে যার নানা ফ্যাসেট। এই নানা ফ্যাসেটযুক্ততার (পাথর বলেই তা মহামূল্য বলছি না) একটা ফল এই নানা কোণ থেকে আলো পড়ে আব নতুন নতুন রূপ চোখে পড়ে। অথচ সব ফ্যাসেট তো একটা কম্প্যাক্ট কিছুবই।

মনে করুন, কেউ যদি ভাবে এ উপন্যাসটার মূল বক্তব্য ডানিযেল ডিফোব এক উপন্যাস, অর্থাৎ একখানি বই এবং তার প্রভাব, অর্থাৎ আমাদের সভ্যজগতে বই কী প্রকাব প্রভাব বিস্তাব করে, তার পবিণতি কী, তা কী বকমের হাস্যকর ক্রুব ও অর্থহীন ঘটনা সব ঘটাতে পারে, এবং ঘটনা ঘটার পরে তা ইতিহাস হযে যায় ডকুমেন্টারিতে তোলার মতো, এবং আবও বই লিখতে সুবিধা হয়—তা সেই বই ডিফোর উপন্যাস হোক, ডস্ ক্যাপিটল হোক কিংবা বাইবেল। এবং নবমাংস ভক্ষণ চলতে থাকে। এবং যাবা তা করে তাবা অসভ্য নয। প্যান্ট কোট পরে এমন সভ্য এবং সে সময় টি ডিউম লডেমুস ইত্যাদি চিল্লাচিল্লিও হয। অথবা সংস্কৃতি এর একটা ফাসেট।

'ফ্রাইডে আইল্যান্ড' কতগুলি বিষযে পরীক্ষা। ভাষা বিষয়ে তো বটেই। প্রথমত ওটা সেকালের ভাষা নয়। স্বকপোলকল্পিতই বলা উচিত। পড়লে, অর্থাৎ ঠিক যতি দিতে জানলে বাংলা গদ্যকে ঝিয়েদের, বকবাজদের প্রাকৃতজনের ভাষা থেকে অন্য এক রকম এক ভাষা বলে মনে হতে পাবে। অপর এক মজুমদারের ভাষাও নয়—আশা করি তা লক্ষ্যে এনেছেন। বাংলো গদ্য যে ভয়ে মুখ ঢেকে গলিঘুঁজি দিয়ে পদাতিক হয়ে সুটসুট করে পালাবে, নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারবে না—এটা এক সময়ে আমার কাছে কষ্টের মনে হতে থাকায় ওই ভাষায় লিখে নিজের দুঃখ দূর করেছিলাম। আপনি ইংরেজিতে দক্ষ, আপনার কানে ইংরেজির ক্রিয়াপদের d, ed, t, en, ing যুক্ত ধ্বনিগুলি যে যে সুশ্রাব্যতার সুখ দেয়, বাংলার এছ, ছি, লাম, লুম প্রভৃতিতে কি তার এক আনাও পেয়েছেন? যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি তো আমাদের হারাম হ্যায়। হিন্দি, উর্দু, এমন কি উড়িয়া শুনে দেখবেন মনে হবে পুরুষরা সে ভাষা ব্যবহার করতে পারে। কাঁটা বেছে ফেলে নরম মাছের থসথসে খানিকটা মাংস দিয়ে আর কত লেখা চলবে? না, অস্ত্রে ঘাত দিয়ে নতুন ভাবে ভাষা গড়া যাবে না। একটা কৌশলই আছে, তা স্বরধ্বনির টানাপোড়েনে মন্ত্রের নকসা ফুটিয়ে তোলা।

দ্বিতীয় বিষয় : ড্যানিয়েল ডিফোর পুস্তককে আমি যা মনে করা উচিত তাই মনে করি, অর্থাৎ অনার্সের পরীক্ষায় short notes বলে বালক বয়সে পড়া যায়। ডিফোর সেই পুস্তক নিয়ে এত হৈ-হৈ ফ্রাইডে আইল্যান্ডে—এটা নতুন নয় ; অন্যান্য পুস্তকের সামনেও নরবলি দেওয়া হয়েছে। যথা বাইবেল, ডস ক্যাপিটাল। তাহলে ডিফোর বই এর সামনে নরমাংস ভক্ষণ করলে দোষ কী? তবুও তো ডিফোর বই এর কাল্পনিক আভিজাত্য (আমাদের সব ঐতিহাসিক আভিজাত্য যেমন, আমরা যে নিজেদের আর্য

ব্রাহ্মণবংশীয় মনে করি) সেই কাল্পনিক দ্বীপের অধিবাসীদের শিকড় যোগায়। আসলে আমরা যা কিছু করছি, ইডিওলজি, সবই কোন না কোন বইকে পূজা, এবং পূজাটা নিরামিষ নয় ; সে জন্যই শেষ কটা লাইন। ভগবান জানেন এরা শয়তান। ভগবান পারেন এদের শেষ করে দিতে। করেন না বোধহয় এজন্য যে ভগবান ক্রিশ্চিয়ানদের মতো অনুতাপ-বিধিকে বড় মনে করেন, সে জন্য শয়তানকেও অনুতপ্ত দেখতে চান।

কিন্তু অন্য ধর্ম বলে, অস্থি-মজ্জা পাশাপাশি থাকবে। কিংবা বলে তুমি কেহে পাপ করবে? ভগবানকে ভালবাসার সুযোগ পেয়েছিলে, আলাদা হয়ে সুযোগ নষ্ট করলে তোমার লোকসান। ভগবানেরও কিছু নয়, ধর্মেরও কিছু নয়। তোমাদের পুণ্য, টাকা-পয়সা-নোট, অ্যাটমবোম কিছুই ভগবানের আইনের মধ্যে পড়ে না। ভগবানের কিছু এসে যায় না তুমি penal code এর ধারা ভাঙলেও। শুধু তুমি সমাজব্যবস্থায় এমনভাবে conditioned যে ধারাগুলো ভাঙলে ভগবানকে ভালবাসার মত মনকে নষ্ট কর। এটা অবশ্য ফ্রাইডে আইল্যান্ডের বিষয় নয়। বলার কারণ এই যে বইটা লেখকের নিজস্ব ধর্মমতের ভিত্তিতে লেখা নয়। Dramatization of Christian Consumer Society বলে Christian morality আনা হয়েছিল।

শরৎ ১৩৮৪ উত্তরসূরীতে শ্রী তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় অমিয়ভূষণ সম্পর্কে যে রচনাটি লিখেছিলেন সেইটি পাঠে অমিয়ভূষণ মজুমদার উক্ত চিঠিটি দেন। চিঠিটি মূল্যবান মনে করে প্রকাশ করা হল : সম্পাদক।

(উত্তরসূরী ২৫ : ৩ বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮৫)

উত্তরসূরীর সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

গল্প : প্রথম প্রকাশ ও পুনর্মুদ্রণের তথ্য

প্রাচীন।। ক্রান্তি, নবপর্যায় ৩ : ৫, আষাঢ় ১৩৬১।
অগ্রন্থিত।

একটি শিকার কাহিনী।। গণবার্তা, শারদ সংখ্যা, ১৩৬৩।
গ্রন্থিত : গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত
অমিয়ভূষণ মজুমদারের গল্পসমগ্র, প্রথম খণ্ড

একটি মাঝারি মানুষের গল্প।। গণবার্তা, শারদ সংখ্যা ১৩৬৪।
গ্রন্থিত : গ. স. ১।

ইনফরম্যাল ডিনার।। নতুন সাহিত্য, ১০ : ১, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৬।
অগ্রন্থিত।

অহেতুক।। অনুক্ত, ৪ : ৩-৪, বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৬৬।
অগ্রন্থিত

দূরভাষিত।। সংহিতা, শারদ সংখ্যা ১৩৬৭।
পুনর্মুদ্রণ।। চিত্রকল্প, ৩ : ২, শারদ সংকলন,
গ্রন্থিত—গ. স. ১ (লেখকের সংযোজন ও সংশোধন সহ।)

অসমাপ্ত।। পূর্বপত্র, ১ : ১, আষাঢ়-ভাদ্র, ১৩৬৭
গ্রন্থিত : গ. স. ১

দি ক্যাসল॥ দর্পণ– সম্ভবত ১৯৬০ ।। (হিতেন্দ্র মিত্রের চিঠিতে পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য মেলে। 'দর্পণ সংগ্রহ করেছি। কিন্তু এখনও আপনার গল্পটি পড়ে উঠতে পারিনি। (৫. ৫ ১৯৬০-র পত্র)। আবার, 'এত ভাল গল্প ইদানীংকালের মধ্যে পড়েছি বলে মনে পড়ছে না। জেমস্ জয়েসের ডাবলিনারসের গল্পগুলি মনে পড়ছিল। (১৪.৬.৬০-র পত্র)
পুনর্মুদ্রণ . তারপর ২ · ১-২, নভেম্বর,

ডাউন কিউল প্যাসেঞ্জারে॥ গণবার্তা, শারদ সংখ্যা, ।। খসড়া পাণ্ডুলিপিতে নাম ছিল, ক্লাস টু।
গ্রন্থিত : গ. স. ১

রীতিমতো গল্প॥ চতুরঙ্গ ২৩ . ১, বৈশাখ-আষাঢ়,
গ্রন্থিত . গ. স. ১

বণিক লক্ষেশ্বর॥ পূর্বপত্র, ২ : ১, আষাঢ়-ভাদ্র,
অগ্রন্থিত।
চাঁদ বেনে (উপন্যাস) বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হলেও অমিয়ভূষণ এই উপন্যাসটি বহুবার লিখেছেন, পরিমার্জনা করেছেন, ইংরেজি ষাটের দশক থেকেই। উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি এই গল্পে স্বল্প পরিসরে কিন্তু স্বরূপে দেখা দিয়েছে।

অ্যাভলনের সরাই॥ গণবার্তা, শারদ সংখ্যা, । খসড়া পাণ্ডুলিপিতে শিরোনাম ছিল 'অ্যাভলনের সরাই অথবা একটি গুজবের পরিণাম'।
গ্রন্থিত . শ্রেষ্ঠ গল্প–বাণী শিল্প
শ্রেষ্ঠ গল্প– দে'জ

স্বর্গভ্রষ্ট॥ চতুরঙ্গ, ২৪ · ৩, কার্তিক-পৌষ,
পুনর্মুদ্রণ . সাহিত্যপত্র নবলিপি, ১১ : ৯, গল্পসংখ্যা, সেপ্ট
অগ্রন্থিত।

একটি খামারের গল্প॥ গণবার্তা, শারদ সংখ্যা,
মহিষকুড়ার উপকথার (পরিচয়, শারদ সংখ্যা,
অগ্রন্থিত।

বিপ্লব॥ জয়শ্রী, আশ্বিন,
অগ্রন্থিত।

ভটওলা॥ এক্ষণ, শারদ সংখ্যা ২ : ৩, শারদ সংখ্যা।
অগ্রন্থিত।

ওগো মুগ্ধা॥ প্রকাশকাল অথবা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত জানা যায়নি।
গ্রন্থিত . পঞ্চকন্যা (নিউস্ক্রিপ্ট)–১৯৬২

অনেক বেবুন।। উত্তরায়ণ (মজুমদারদের পারিবারিক পত্রিকা)। প্রকাশকাল অজানা। ১৩৬৫/১৯৫৮-র পরে আর এর অস্তিত্ব ছিল না।
বর্তমান পাঠ স্বাক্ষরিত পাণ্ডুলিপি থেকে নেয়া।
অগ্রন্থিত।

নাটক
বিয়োগ।। উত্তরায়ণ ১ . ৬-৭, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, যুগ্মসংখ্যা ১৩৬১
অগ্রন্থিত।

নাটকটি দুবার মঞ্চস্থ হয়েছে—প্রথম, পঞ্চাশের দশকে কোচবিহারের ডাক-তার ট্রেড-ইউনিয়নের সদস্যরা তাঁদের বার্ষিক উৎসবে অভিনয় কবেন। তিন দশকের ব্যবধানে কোচবিহারের মেঘমল্লার গোষ্ঠী নাটকটি মঞ্চে আনেন।

প্রবন্ধ
রবীন্দ্রোৎসব।। রামভোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় (কোচবিহার) রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যা মে ১৯৬১ (১৩৬৮)। অগ্রন্থিত।

সাহিত্যের ধারণা।। উত্তরসূরী, ৯ ৩, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৯। 'লিখনে কি ঘটে'। গ্রন্থে সংকলিত।

সাহিত্য ও স্বাধীনচিন্তার দায়িত্ব।। উত্তরসূরী, ১১ . ১, কার্তিক-পৌষ
অগ্রন্থিত

অনুমান করি।। ত্রিবৃত্ত (কোচবিহার, ৩ : ২ (শারদীয়া),
অগ্রন্থিত।
এই প্রবন্ধটি *সংস্কৃতিবিষয়ক অনুমান* নামে পুনর্মুদ্রিত হয় *গল্পকবিতা* পত্রিকায়
পুনর্মুদ্রণের সময় লেখক উদ্ধৃত এপিগ্রাফটি যোগ করেন .

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস—ত্রিশ বছর পরে।। উত্তরসূরী, ১৪ : ৪, শ্রাবণ-আশ্বিন
অগ্রন্থিত।